রংমশাল

সূচীপত্র ১৩৫২

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত
৩, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলিকাতা

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
অ		
অতি কিশোরের ছড়া	সুকান্ত ভট্টাচার্য	২৬১
অনেক চাঁদ	কা চ.	২৮৫
আ		
আমাদের লাইব্রেরি		১৮, ৪৩, ৬৯, ১৫৪, ৩৩৩, ৩৬৯
আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন	শিবরাম চক্রবর্তী	৪৯
আদিগঙ্গা	বিমলচন্দ্র ঘোষ	৭৭
আমার কান্না	মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়	১৬০
আমার বন্ধু ইঁদুর	রবার্ট ফনটেন	২৪৬
এ		
এমারজেন্সি ছড়া	প্রবোধচন্দ্র বসু	৩৩
এ্যাটম বম	সুধীর গুপ্ত	১০০
একটি সোশ্যালিষ্টিক ছড়া	পরিমল রায়	১০৬
একটি সন্ধ্যা	অমল চট্টোপাধ্যায়	১০৯
এক টুকরো	বিমলচন্দ্র ঘোষ	১১৫
একটি বালক ও কয়েকটি বই	বুদ্ধদেব বসু	১৯৪
একটি সকাল	পৃথ্বীশ ভট্টাচার্য	৩৬৩
এ বছরের অলিম্পিক	সুনীলকৃষ্ণ চট্টোঃ	৩২৮

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ও		
ওঠা	পরিমল রায়	২৭৮
ক		
কৈশোরক	সতী দেবী	৫৫
কাটতে পারে	পরিমল রায়	৮২
কাহিনী	শরৎচন্দ্র দত্ত	২৩৬
কালো বেড়াল	প্রবোধ ঘোষ	৩১১
কালীঘাট	সৌরীন্দ্রকুমার দে	৩৫১
ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব	দেবীপ্রসাদ	১০, ৩১, ৫৫
খ		
খেলার মাঠ		৬৮, ১১৮, ২১৪, ২৫৩, ২৯৩, ৩৭৪
খাদ্য	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৩
খোকা ঘুমলো পাড়া জুড়লো	আন্তন চেহ্বভ	১১১
খাসিয়া বুড়ো	দেবীপ্রসাদ	১৩৭
গ		
গোঁফ নিয়ে টানাটানি	শিবরাম চক্রবর্তী	২৬

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ঘ		
ঘুম তাড়ানি গান	মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়	১৩৬
ঘুম ছাড়ানো ছড়া	প্রবোধচন্দ্র বসু	১৪৮
ঘুম পাড়ানী	সুনীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	১৭৪
ঘুম পাড়ানী গান	সতী মুখোপাধ্যায়	২৮৪
ঘুম যেদিন ভাঙলো	শ্রীশামুক	৩০২
চ		
চলন্তিকা		১৯, ৪১, ৬৩, ৮৯, ১১৬, ১৫১, ১৮২, ২১১, ২৪৯, ২৮৯, ৩২৪, ৩৭৩
চশমা-পরা লোকটা	কামাক্ষীপ্রসাদ	১৩০
চিঠির বাক্স		১৫৩, ১৮৫, ২১৯, ২৫০, ২৯১, ৩২৬, ৩৭১
চাক্ষুষ	পরিমল রায়	২০২
চাঁদটা	অমল চট্টোপাধ্যায়	২০৯
ছ		
ছেলেটা	কামাক্ষীপ্রসাদ	২
ছাত্র	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৩
ছেলেবেলার স্বপ্ন	অমিতাভ মুখোপাধ্যায়	১৮১
ছোটো বড়	পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী	২০২
ছোটোবেলা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	২২৮
জ		
জিতুবাবুর জিৎ	অন্নদাশঙ্কর রায়	৪৯
জল পড়ে পাতা নড়ে	প্রেমেন্দ্র মিত্র	১৫৯
জাগরণ	প্রবোধ ঘোষ	৩৪২
ত		
তিনটি কবিতা	পরিমল রায়	৩৬৩
দ		
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ		৩৮
দিক	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৫
দেশ	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৫
দুটি নিষ্ঠুর কবিতা	পরিমল রায়	১০৬
দেবার মালিক ভগবান	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৩৭
দুটি কবিতা	ফল্গু কর	৩১৬

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
ধ		
ধাঁধা		২১, ৪৬, ৭২, ৯৩, ১২৩, ১৫৬, ১৯১, ২২৫, ২৬০, ২৯৯, ৩৩৯, ৩৮১
ধাঁধার উত্তর		২১, ৪৬, ৭২, ৯৩, ১২৩, ১৫৭, ১৯১, ২২৫, ২৬০, ২৯৯, ৩৩৯, ৩৮১
ন		
নকুলবাবুর আসল অসুখ	বংশীবদন মুখোপাধ্যায়	৮২
প		
পরের দিন বড়দিন	এডালবার্ট ষ্টিফটর	৮, ৩৪, ৫৬, ৭৭
পদীপিসির বর্মি বাক্স	লীলা মজুমদার	১৬, ২৪, ৫২
প্রেতের আহ্বান	প্রসাদ উপাধ্যায়	৭৩, ১০৭, ১২৭, ১৬২, ২০৬, ২৩৩, ২৭৮ ৩১৬, ৩৫৭
প্রথম চিঠি	অন্নদাশঙ্কর রায়	১২৬
প্রাণ	ফল্গু কর	২২৭
ব		
বিকেল	বুদ্ধদেব বসু	১
বস্ত্র	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৩
বুদ্ধির মাপ	দেবীপ্রসাদ	৮৬
বিকেলের গান	কামাক্ষীপ্রসাদ	১৯৩
বড়দের ছোটোবেলা	প্রেমেন্দ্র মিত্র	২৬২
বেদের কুকুর	প্রবোধ ঘোষ	২৭৩
বিশ্বাস কর		২২৩
ভ		
ভাঙতে পারে	পরিমল রায়	৫৪
ভ্রম সংশোধন		১০৯, ৩৭০
ভূতুড়ে	সৌরীন্দ্রকুমার দে	২৪০
ম		
মশাল	মাণিক বন্দ্যোঃ	৬, ৩২, ১৯৬
মজার দেশ	পরিমল রায়	১২৫
মেয়েরা নাকি ডিকটেটর নয়	শিবরাম চক্রবর্তী	১৬৭
মজার হিসেব		১৭৭

রচনার নাম	লেখকের নাম	পৃষ্ঠা
য		
যার চেয়ে নাই সুন্দর	ফল্গু কর	৩০১
র		
রংমশাল বৈঠক		১৮, ৪৩, ৬৬, ৯১, ১২০, ১৫৪, ১৮৬, ২২১, ২৫৭, ২৯৫, ৩৩১, ৩৭৬
'রংমশাল'	পরিতোষকুমার চন্দ্র	১১০
রবার্ট কোচ্ আর ক্ষুদে শয়তান	দেবীপ্রসাদ	১৯৬
ল		
লড়াই থামার পর	বিমলচন্দ্র ঘোষ	২৩
লড়াই ফেরত নানকুদা	শ্রীশামুক	৬০
লেখা	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৯৫
লিউএনহুক	দেবীপ্রসাদ	১৭৭
শ		
Shoe-শিক্ষা	বুদ্ধদেব বসু	১২
শ্বেত চক্র	কামাক্ষীপ্রসাদ	১৪৩, ১৭২, ২১০, ২৪১, ২৬৫, ৩০৫, ৩
শাল্ সামিয়া সোয়ালো	মহাশ্বেতা ঘটক	১
শিক্ষার চাকা	কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ী	৩
স		
সম্পাদকের দপ্তর		২০, ৪৪, ৭০, ৯২, ১২১, ১৮৯, ২২৩, ২৫৮, ২৯৭, ৩৩৫, ৩
সিংহ শাবকের শিক্ষা	সৌরীন্দ্রমোহন মুখোঃ	৪
সত্যিকারের এ্যাডভেঞ্চার	বংশীবদন মুখোপাধ্যায়	১
সাগর	ফল্গু কর	১
সত্যিকথার ঝুড়ি		১
সোনার বরণ চিল	অমল চট্টোপাধ্যায়	২
সোনালী রঙ	দিলীপ দে চৌধুরী	৩
হ		
হিজিবিজি	দিলীপ দে চৌধুরী	২

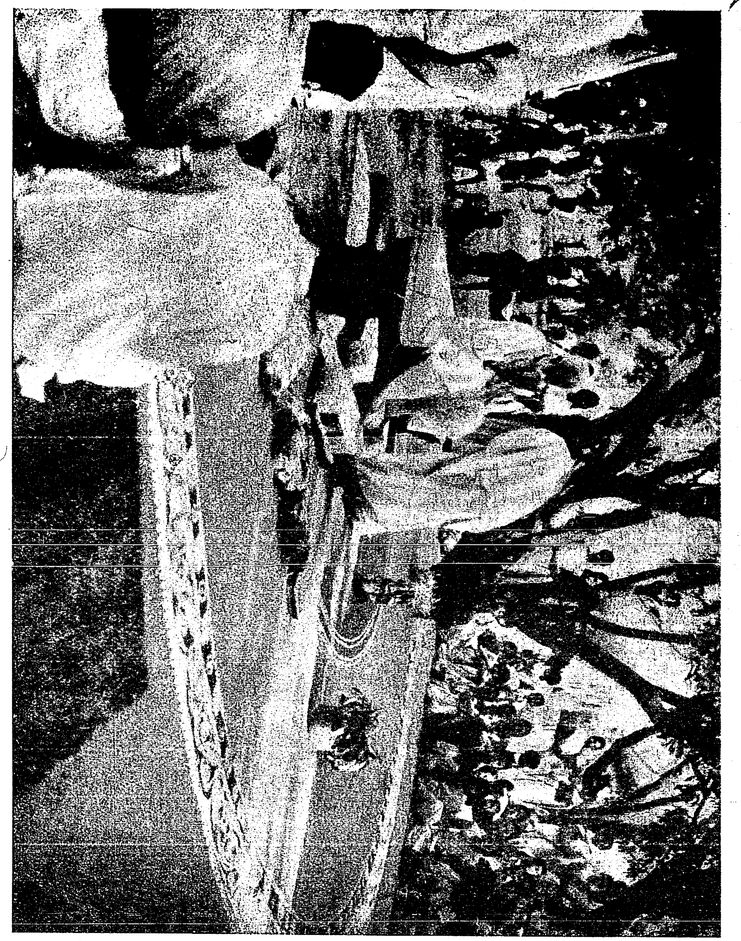

পঁচিশে বৈশাখ—

রংমশাল—

রংমশাল

[দশম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা : বৈশাখ, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

কবিতা

বিকেল

বুদ্ধদেব বসু

গাছের সবুজে রোদের হলুদে গলাগলি,
পাতায়-পাতায় হঠাৎ-হাওয়ার বলাবলি,
উঁকি দেয় বুকে ভীরু কবিতার ক্ষণ কলি—
আহা, বিকেল, সোনার বিকেল !
রুদ্ধ ঘরের রোগশয্যায় কোথা থেকে
সে কোন চিকণ রসের লিখন গেলো এঁকে।
শীতের শূন্য আকাশে রঙের কাঁপে কলি।
—আহা, বিকেল ! ক্ষণিক বিকেল !

ছেলেটা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

লুচি, বেগুন-ভাজা, মিষ্টি ইত্যাদি সাজিয়ে মা বললেন, "লক্ষ্মী ছেলে আমার! খেয়ে ফেলো তো বাবা।"

কিন্তু মণির ঐ এক গোঁ! কিছুতেই সে খাবে না। বললো, "আমার চিংড়ি-মাছের কাটলেট কৈ? চিংড়ি-মাছের কাটলেট না দিলে খাবো না।"

"তাড়াতাড়িতে ভুলে গেছি, বাবা। দেখলি তো, জিনিস-পত্র বাঁধাবাঁধির কত হাঙ্গাম! মাথার কি আর ঠিক থাকে! দিল্লি পৌঁছে যা খেতে চাইবি তাই করে দোবো। এখন খেয়ে নে।"

"না আমি খাবো না। কাটলেট না দিলে কিছুতেই খাবো না। কেন দেবে বলেছিলে?"

"লক্ষ্মী ছেলে আমার। তুমি তো সব বোঝো! কত বড় হয়ে গেছো। এখন কি আর বায়না করে? লোকে নিন্দে করবে যে! নাও খেয়ে নাও।"

মণির মুখচোখ কেঁদে-কেঁদে ফুলে গেছে। তার বয়েস তের বছর। দিব্বি বড়-সড় ছেলে। সত্যিই এ-ধরণের ছেলেমানুষী বায়না করার বয়েস তার নেই। তবু ভারি সে বায়নাটে, মায়ের ভীষণ আদুরে। কিছুতেই সে গোঁ ছাড়লো না। কাটলেট সে খাবেই। যেখান থেকেই হোক কাটলেট তাকে জোগাড় করে দিতেই হবে। নইলে কিছুতেই খাবে না।

টুটু তার চেয়ে অনেক ছোটো। কিন্তু ছোটো হলে হবে কি বায়না-টায়না সে করে না। সত্যিকারের লক্ষ্মী মেয়ে সে। নিজের প্লেট থেকে আলুর-দম দিয়ে লুচি খেতে-খেতে বললো, "খেয়ে নাও না দাদা! কেন মা'কে জ্বালাতন করছো?"

মণি তাকে দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে উঠলো। তারপর আবার সেই নাকি-স্বরে আরম্ভ করলো, "না আমি খাবো না। কিছুতেই খাবো না। কাটলেট না দিলে কক্ষোনো খাবো না।"

তার বাবা পাশের বার্থে জানালার ধারে বালিসে হেলান দিয়ে গল্পের বই পড়ছিলেন। মুখে লম্বা পাইপ। কড়া তামাকের গন্ধ সেই ফার্স্ট ক্লাস কামরার ভিতর ছড়িয়ে পড়েছে। সন্ধে হয়ে গেছে বলে তাঁর মাথার কাছের ইলেক্‌ট্রিকের ছোটো আলোটা জ্বালানো। কামরার অন্য আলোগুলো এবার জ্বালাতে হবে, নইলে অস্পষ্ট গোধূলির আলোয় ভিতরের জিনিস ভালো করে নজরে পড়ে না।

মণির সেই ঘিনঘিনে বায়নায় বিরক্ত হয়ে তিনি বই নামিয়ে উঠে বসলেন। বোধ হয় জোরে ধমকাতেই যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখতে-দেখতে ট্রেনের গতি কমে এলো। ইস্টিশান নেই, কেউ নেই, ট্রেন থামে কেন? জানালার বাইরে তিনি চাইলেন ব্যাপারটা কী দেখতে।

টুটু প্রশ্ন করলো, "এবারে কী ইস্টিশান বাবা? বর্দ্ধমান এলো-নাকি?"

ততক্ষণে ব্যাপারটা তিনি বুঝে নিয়েছেন। বললেন, "নারে, বর্দ্ধমানের এখনো দেরি আছে। সেই দামোদরের বন্যার কথা বলছিলুম না, এইখান থেকে সেটা স্থরু হয়েছে। ট্রেনের লাইন-টাইন সব উপড়ে ফেলেছিলো নদীর জল। আবার নতুন করে রাস্তা তৈরি হচ্ছে, লাইন বসানো হচ্ছে। তাই খুব আস্তে-আস্তে এখন চলবে। ঘণ্টাখানেক লাগবে জায়গাটা পেরুতে।"

"বারে, কী মজা!" টুটু বললো। "কেমন দেখতে দেখতে যাবো! ওমা গাড়ি যে একেবারে গরুর গাড়ির মতো চলেছে! বাবা তোমার পাশে বসে দেখবো।" বলে, খাওয়া শেষ করে, খালি প্লেটটা মা'র হাতে দিয়ে টুটু গিয়ে বসলো তার বাবার পাশে।

মা বললেন, "মণি, তুইও খেতে-খেতে বসে ছাখ না! অত বায়না কি করতে আছে? ছিঃ! টুটু তোর চেয়ে কত ছোটো, ছাখ তারও কত বুদ্ধি। তুই শুধু বোকার মতো না খেয়ে কাঁদতে-কাঁদতে চলেছিস্। লোকে দেখলে কী বলবে বল তো?"

ঘ্যানঘ্যান করতে-করতে তবু মণি বললো, "না আমি খাবো না, না আমি খাবো না।"

মা বিরক্ত হয়ে হাল ছেড়ে দিলেন। বললেন, "বেশ, আমিও খাবো না। আমার কষ্ট হলে তো তোর কোনো কষ্ট হয় না।"

তাদের বাবা এবারে ভারি বিরক্ত হয়ে উঠলেন। বললেন, "ছেলেটা এক্কেবারে বাঁদর হয়ে উঠেছে। আদর দিয়ে-দিয়ে তুমিই ওর মাথাটা খেলে। দিল্লি থেকে বেড়িয়ে ফিরেই ওকে আমি কোনো বোর্ডিং-এ ভর্তি করে দেবো। দেখি তাতে শোধরায় কিনা। উঠতে বেত আর বসতে বেত না খেলে সোজা হবে না এই ছেলে।"

শুনে মনির শোক আরো উথলে উঠলো। এতোক্ষণ মিইয়ে-মিইয়ে কাঁদছিলো বাবার বকুনি আর বোর্ডিং-এর বিভীষিকায় এবারে হাউ-হাউ করে লাগলো কাঁদতে। নাকের জল আর চোখের জল মিলে মুখটা কুঁচকে তুবড়ে তাকে বিশ্রী দেখাচ্ছে।

এমন সময় চেঁচিয়ে উঠলো টুটু, "এই-এই, ছাখো বাবা ছাখো। ছেলেটা মরবে পড়ে!"

তার বাবা জানালা দিয়ে ঝুঁকে বাইরে তাকালেন। মা-ও পাশের জানালা দিয়ে টুটুর সঙ্গে মুখ বাড়ালেন। সূর্যাস্ত অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। পশ্চিম আকাশের মেঘে এতোক্ষণ গোলাপী আলো লেগেছিলো। সেটাও মুছে গেছে। আরো একটু উপরকার মেঘে সূর্যের কোনো আলো না থাকায় সেগুলো কালো-কালো ভাঙা-ভাঙা পাথরের মতো দেখাচ্ছে। অন্ধকার বেশ জমে এসেছে। জানালা দিয়ে বাইরে চাইলে মাটি আর আগাছা আর ধোঁয়া মিলে একটা জমাট-বাঁধা ধূসরতা ছাড়া আর কিছুই ভালো করে বোঝা যায় না। সামনের ইঞ্জিন থেকে মাঝে-মাঝে যে-সব জ্বলন্ত কয়লা লাইনের পাশে ছিটকে পড়ছে সেই ছোট্ট-ছোট্ট লালচে আলো মাঝে-মাঝে পড়ছে নজরে। আর দেখা যাচ্ছে ত্রিপল আর হোগলার ছোটো-ছোটো ছাউনি। অনেকটা তাঁবুর মতো দেখতে। যারা লাইন সারাবার কাজ করছে এই সব ছাউনিতে তারা থাকে। ছাউনিগুলোর বাইরে খোলা জায়গায় পাথরের উনুন। সেখানে কাঠের আঁচে মাটির হাঁড়ি চড়ানো। মজুরদের রাত্রের খাবার তৈরি হচ্ছে। মেয়েরা কোলে ছোটো-ছোটো ছেলে নিয়ে দাঁড়িয়ে, ছোটো করে শাড়ি পরা, ছেলেগুলোর গা খালি, তারা ট্রেন দেখছিলো। অনেক মজুর লাইন সারাবার কাজ করছিলো। ট্রেন দেখে তারা লাইনের পাশে শাবলগুলো হাতে নিয়ে সরে দাঁড়িয়েছে। কেউ-কেউ শাবলে ভর দিয়েও রয়েছে।

টুটু কিন্তু তাদের দেখে চেঁচিয়ে ওঠেনি। সে আর্তনাদ করেছিলো অন্য একটা ছেলেকে দেখে। তাদের কামরার পা-দানিতে ছেলেটা লাফিয়ে উঠে দিব্বি চলেছে!

"নাম নাম, পড়ে মরবি যে!" বললেন টুটুর মা।

"না, ওকে নামতে বোলো না। নামতে গেলেই হয়তো টাল সামলাতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়বে। বরঞ্চ দরজাটা খুলে দাও। ভেতরে আস্থক। পরের ইস্টিশানে নামিয়ে দিলেই চলবে।" বললেন টুটুর বাবা।

কিন্তু যাকে নিয়ে এতো উত্তেজনা ও আলোচনা তার এতোটুকু মানসিক বিকৃতি নেই। সে যেন মজা পেয়ে গেছে। কামরার এতোগুলো ভীত সন্ত্রস্ত চোখের সামনে নিজের বাহাদুরি আরো ভালো করে দেখাতে চায়। এতোক্ষণ সে দু-হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছিলো। এবার হি-হি করে হেসে এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে একটা হাত বাইরের বাতাসে মেলে ধরলো, পা-দানি থেকে একটা পা-ও বাড়িয়ে দিলো বাইরে। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরে এক পায়ে দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসতে লাগলো, "হি-হি-হি।"

ইতিমধ্যে টুটুর মা কামরার দরজাটা খুলে ফেলেছেন। ছেলেটাকে বললেন, "ভেতরে আয়।"

"ক্যানে? ভেতরে আসবো ক্যানে?"

টুটুর বাবা ধমকে বললেন, "ভেতরে আয় বলছি।"

তাঁর গম্ভীর স্বর আর ভারি চেহারা দেখে ছেলেটা কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো। ট্রেনটা তখন একটা সাঁকোর উপর দিয়ে চলেছে। পাশে লাফিয়ে পড়া যায় না। তাই সে আর কোনো কথা না বলে ভিতরেই এলো। তাড়াতাড়ি দরজাটা বন্ধ করে দিলেন টুটুর মা।

ততক্ষণে টুটু সুইচ টিপে আলো জ্বালিয়ে ফেলেছে। সমস্ত কামরা বিদ্যুতের উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। এতোক্ষণে ভালো করে ছেলেটাকে দেখা গেলো। পরনে ছিটের হাফ-প্যান্ট, গায়ে একটা গেঞ্জি। গেঞ্জির বুক-পিঠ ছিঁড়ে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। ময়লা কুটকুটে। খালি পা। ধুলো আর কাদায় একাকার। চুলে তেল নেই। ধুলোয় প্রায় জট পাকাবার জোগাড়। বাঁ পায়ের একটা আঙুল ময়লা ন্যাকড়া দিয়ে জড়ানো আর বাঁ হাতে রয়েছে একটা গুলতি আর মরা একটা পাখী। পাখীটার ডানাগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া, বুকের উপরকার ধুলো-রঙের পালকের উপর রক্ত শুকিয়ে প্রায় কালো হয়ে গেছে। এমনভাবে পাখীটাকে সে ধরেছে যেন সেটা ন্যাকড়ার তৈরি।

কামরার ভিতরকার উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় এতো-গুলো ভালো জামাকাপড়পরা পরিষ্কার চেহারার ভদ্রলোকের সামনে পড়ে ছেলেটা প্রথমে যেন থতমত খেয়ে গেলো। দরজার পাশের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে ভালো করে দেখতে লাগলো তাদের।

টুটুর বাবা বললেন, "পা ফসকে পড়লে মরতিস্ যে!"

ততক্ষণে ছেলেটা অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়েছে। বললো, "ইস্! পড়তুম বৈকি! রোজ যাই আর আজ পড়তুম! ইস্!"

"রোজ যাস কি রে? কোথায় যাস?" প্রশ্ন করলেন টুটুর মা।

"ক্যানে, সকাল থেকে পাখ মারতে-মারতে চলি আর সাঁঝ হলেই এই ট্রেনে চেপে ফিরি।"

"কোথায় ফিরিস্? তোর গ্রাম কোথায়?"

"ওই হুথায়—", বলতে গিয়ে ছেলেটা থেমে গেলো। তারপর বললো, "ইস্! গ্রামের নাম বলি আর তুমরা পুলিশ ডাকো!"

হেসে টুটুর মা বললেন, "দারুণ স্যায়না তো!—হ্যাঁরে, তোকে পুলিশে দিয়ে কী লাভ হবে আমাদের?"

"সে কথা তুমরাই জানো!" বলে বাঁ থেকে ডান পা'য়ে ভর দিয়ে আলগা হয়ে ছেলেটা দাঁড়ালো তারপর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তাদের জিনিসপত্রগুলো দেখতে লাগলো।

"আচ্ছা, গ্রামের নাম না হয় না-ই বললি! বাড়িতে তোর কে আছে? এ-রকম করে ঘুরে বেড়াস্, কোনদিন যে ট্রেনে কাটা পড়বি। কেউ খোঁজ রাখে না?"

"ইস্! কাটা পড়বো আর কি!"

"আচ্ছা, কাটা না হয় না-ই পড়বি। কিন্তু বাপ-মা তোর খোঁজ করে না? তোর জন্যে ভাবে না?"

"বাপ-মা আবার ভাববে কী করে গো! তারা যে স্বগ্‌গে গেছে।" খুব সহজে ছেলেটা বললো, তারপর আবার তাদের জামাকাপড় জিনিসপত্র কৌতূহলী চোখ মেলে দেখতে লাগলো।

একটু থতমত খেয়ে চুপ করলেন টুটুর মা। ছেলেটা কিন্তু তাঁর ভাবান্তর লক্ষ্য করলো না। দেখা শেষ করে আবার বলতে সুরু করলো, "সেই যে ঝড় হোলো আর বান ডাকলো—তাতে বাপ-মা ভাই-বোন গরু-বাছুর সব ভেসে গেছে। আমি মামার কাছে ছিলুম কিনা, তাই ভেসে যাইনি।"

"তোর মামী নেই?"

"মামী থাকবে না কি গো! মামী আছে, মামা আছে, দুটো ছেলে আছে, ছাগল আছে, গরু আছে, জমি আছে—উই গাঁয়ে সব আছে।"

হেসে টুটুর মা বললেন, "তা তো বুঝলুম। কিন্তু তুই

এ সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত টো-টো করে বেড়াস সেজন্যে মামা ভাবে না?"

আশ্চর্য হয়ে ছেলেটা বললো, "ভাববে আবার কি গো! মামী বলে দিয়েছে আমাকে আর খেতে দেবে না। বলেছে ভিক্ষে করে চাল আনতে। ভিক্ষে মাগতে লজ্জা করে। তাই পাখ মারি। রাতে আগুনে ঝলসে খাই।"

মণি এতোক্ষণ চুপ করে শুনছিলো। বললো, "মাগো, কী নিষ্ঠুর! হ্যাঁরে, পাখী মারতে তোর কষ্ট হয় না?"

তাকে ভেংচে ছেলেটা বললো, "হ্যাঃ! আমি কি মেয়েলোক?"

"কেন ছেলেদের কি কষ্ট হতে নেই? আমার তো কষ্ট হয়।"

"ক্ষিধে পেলে আরো কষ্ট হয়," বলে ছেলেটা সস্নেহে মরা পাখীটার দিকে চাইলো।

খাবার কথায় মণির মার আবার কথাটা মনে পড়লো। বললেন, "নে মণি, শুনলি তো? গরীব লোকেরা খেতে পায় না, তাদের কত দুঃখু। আর তোর মুখের কাছে খাবার তুলে দিচ্ছি, সে খাবার তুই ছুঁড়ে ফেলছিস্। জানিস, এতে লক্ষ্মী রাগ করবেন।"

আবার সেই ঘ্যানঘ্যানে সুরে মণি বললো, "না আমি খাবো না। কাটলেট না দিলে কিছুতেই খাবো না।"

টুটু বললো, "মা, ওকে কিছু খাবার দাও না। আহা, বেচারা সমস্ত দিন খায়নি।"

ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে তাদের দেখছিলো আর অবাক হয়ে ভাবছিলো এতো সুন্দর-সুন্দর খাদ্য কী করে লোকে না খেয়ে থাকতে পারে। কিন্তু টুটুর কথায় যেন তার চমক ভাঙলো। একটু রেগে উঠেই বললো, "না, খাবার আমার চাই না। কেন, আমি কি ভিখিরি?"

মণি চোখমুখ পাকিয়ে উত্তর দিলো, "এঃ, বড় তেজ যে! তুই ভিখিরি নোস্ তো কি লাটসায়েব?"

"খবর্দার বলছি! গালাগালি কোরো না।" বলেই প্রায় তেড়ে এলো ছেলেটা। মণি ভয় পেয়েই গিয়েছিলো। তার মা'র কাছ ঘেঁষে বসে কি যেন একটা কথা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু দেখলো তার বাবা পাইপ নামিয়ে কটমট করে তার দিকে চেয়ে রয়েছেন। ফলে ভয় পেয়ে সে কেঁদে ফেললো। কিন্তু কোনো কথা বলতে সাহস করলো না।

টুটুও অবাক্ হয়ে গিয়েছিলো। এ কেমন ধারা খাপছাড়া ছেলে! সকাল থেকে কিছু খায়নি। অথচ খাবার দিতে গেলে যেন তেড়ে মারতে আসে! একবার তার ইচ্ছে হোলো ছেলেটাকে আর একবার বুঝিয়ে-সুঝিয়ে বলে খেতে। কিন্তু কাজ নেই বলে! যা গোঁয়ার আর যা পাগল-পাগল চোখ!

এমন সময় ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেলো। ছেলেটা দেয়াল ছেড়ে জানালা গলিয়ে মুখ বার করে ঝুঁকে কী যেন দেখলো। তারপর ফিরে এসে আবার দাঁড়ালো।

টুটুর মা বললেন, "হ্যাঁরে, আমি তো তোর মা'র মতন। আমি বলছি তোকে খেতে। খাবি না?"

"আমার মা'র মতন তুমি হতে যাবে ক্যানে?" বলে ছেলেটা হাসলো। "আমার মা তোমার চেয়ে অনেক ময়লা ছিলো, অনেক ছোটো ছিলো। তোমার মতো ভালো কাপড় কোনোদিন পরেনি। জুতো ছোঁয়নি। আমার মা'র মতন কি আর সবাই হতে পারে? আমার মা স্বগগে গেছে!"

আবার ইঞ্জিনের বাঁশি শোনা গেলো। ছেলেটা এবার কিন্তু জানালার কাছে গেলো না। এক লাফে মণির কাছে এসে ঠাস করে তার গালে চড় বসিয়ে দিলো তারপর মণির সামনেকার প্লেট থেকে এক খাবল লুচি আর আলুর দম তুলে কামরার দরজা খুলে চক্ষের নিমেষে ঝুপ করে নেমে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলো!

খারাপ পথ শেষ হাওয়ায় বাঁশি বাজিয়ে আবার ক্রমশ জোরে চলতে সুরু করেছে ট্রেন। জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে সেই ছোটো-ছোটো অস্পষ্ট ছাউনি চোখে পড়ে। উনুনে লাল আগুন জ্বলছে। উপরে হাঁড়ি চড়ানো।

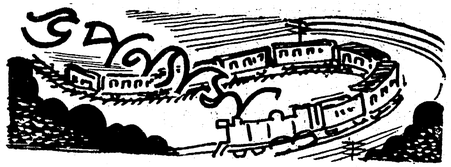

মশাল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[চুম্বক : ম্যাজিস্ট্রেট পুত্র স্থন্দর, সরকারি উকিল পুত্র মনোহর, পুলিশ সাহেব পুত্র শঙ্কর আর আড়তদার ব্যাঙ্কার পুত্র সলিল। দীননাথ চানাচুর বিক্রি করে। তার ছেলে কৃষ্ণদাস। কৃষ্ণদাস স্থন্দরদের সঙ্গে ইস্কুলে পড়ে, ফার্স্ট-বয় সে। একদিন মিছিমিছি তারা কৃষ্ণদাসের সঙ্গে ঝগড়া করলো। তারপর তার নামে মিথ্যে লাগিয়ে ইস্কুলের মাস্টার কামিনীবাবুকে দিয়ে কৃষ্ণদাসকে মার খাওয়ালো। এই অপমানের প্রতিশোধ কৃষ্ণদাস তুললো ছুটির পর স্থন্দরদের একাই মারধোর করে। কিন্তু স্থন্দরদের চাকররা কৃষ্ণদাসকে মেরে প্রায় আধমরা করে ফেললো। কিছুদিন পরে ইস্কুলের ফুটবল ম্যাচ দেখতে গেছে কৃষ্ণদাস। দীননাথ চানাচুর বিক্রি করছিলো। খেলার পর কৃষ্ণদাস তার বাবাকে আবিষ্কার করলো : স্থন্দররা তাকে মেরে প্রায় আধমরা করে দিয়েছে আর প্রায় কাণা করে দিয়েছে বাঁ চোখটা। বাপের চোখের দিকে চেয়ে থাকতে-থাকতে কৃষ্ণদাসের চোখে যেন শান দেওয়া ছুরির আলো ঝলসে উঠলো। কৃষ্ণদাসদের বাড়ির কাছেই পাগলা-ডাক্তারের বাড়ি। তিনি পরীক্ষা করে বললেন চোখ কাণা হবে না। তারপর এর কারণ জিজ্ঞেস করে ব্যাপারটা শুনলেন। কিন্তু কে যে খোঁচা দিয়েছে দীননাথ বললো না।

পরদিন ছুটির পর পাগলা ডাক্তার কৃষ্ণদাসকে ডেকে পাঠালো। সেখানে পৌঁছে বিস্মিত হয়ে কৃষ্ণদাস দেখলো স্থন্দররা চারজন আর শচীন সেখানে হাজির। তাকে দেখে পাগলা ডাক্তার বললেন মানুষের চোখ খুঁচিয়ে কাণা করে দেবার অসুখের চিকিৎসা তিনি করবেন। বলে স্থন্দরদের সবাইকে তিনি কড়া ডোজ ক্যাস্টর অয়েল খাইয়ে দিলেন জোর করে। মুখে বললেন কলেরার বীজাণু খাওয়ানো হোলো। স্থন্দরদের মুখেই জানা গেলো দীননাথের চোখে খোঁচাটা দিয়েছিলো শচীন। শচীনের দিদির নাম অমলা দেবী। তিনি মেয়ে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। তাঁদের বাড়িতে কৃষ্ণদাস আগে প্রায় যেতো। গোলমালের পর থেকে যায় না। শচীনকে নিয়ে অমলা দেবী কৃষ্ণদাসের বাড়িতে নিজে এলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস কিছুতেই ক্ষমা করলো না শচীনকে। এদিকে শচীনকে সত্যিই সে ভালোবাসতো। তাই কিছুদিন যেতে না যেতেই তার জন্যে কৃষ্ণদাসের খুব মন কেমন করতে লাগলো।]

আজ সকালে সূর্য্য উঠেছে ডগডগে লাল। চারিদিকে তুলো তুলো হাল্কা কুয়াশা। মানুষের মনের টক কষ্টের ছোঁয়াচ লেগে বাতাস যেন কেটে গেছে। সহরের প্রান্তে আবর্জনার স্তূপে কাল রাত্রে আগুন দেওয়া হয়েছিল তার কটু ধোঁয়াটে গন্ধ চারিদিক আচ্ছন্ন করে রেখেছে। গুমরে গুমরে এখনো আগুন জ্বলছে আবর্জনায়। ধোঁয়া উঠছে সোজা ওপর দিকে, সাপের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে।

রাস্তা ছেড়ে বুড়ো বংশী ক্ষেতে নেমে যায়। ডাক্তার বাবু বলেন, 'আল ধরে কি যাওয়া যাবে বংশী ?'

'পিছু পিছু আসেন ডাক্তারবাবু।'

আরও প্রায় আধ মাইল দূরে এই রাস্তা থেকে ডাইনে পীরপুরের মেটে পথ, অনেকটা ঘুরতে হয়। ক্ষেত ডিঙ্গিয়ে গেলে পথ সংক্ষেপ হবে বটে কিন্তু কুয়াশায় ভাল করে নজর চলছে না। তবে হানিফের অভ্যাস আছে, পথও তার চেনা, আল ভুল করে শস্য ক্ষেতের গোলক ধাঁধায় পাক খেয়ে বেড়াতে হয় তো হবে না। হানিফের পিছনে ডাক্তারবাবু চলতে থাকেন, তার পেছনে কেষ্ট এবং আরও দু'জন ভলান্টিয়ার স্থধীর ও নির্ম্মল।

প্রতিদিন ভোরে ডাক্তারবাবুর বাড়ীর পিছনের মাঠে ভলান্টিয়াররা জড়ো হয়, একেবারে সেই পাখীডাকা ভোরে। আজও একে একে প্রায় সবাই এসে জুটেছে, এমন সময় বংশী এসে হাজির। তার বাড়ীতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে কাল রাত্রে, একটা গাছ চাপা পড়ে তার দুই ছেলে গুরুতর রকম জখম হয়েছে।

'রাত্রে গাছ চাপা পড়ল কি করে ?'

'আজ্ঞে গাছ কাটছিল দু'ভায়ে। দিনে তো সময় পায় না—'

বংশীর বলার রকম দেখে ডাক্তারবাবুর মনে একটু সন্দেহ জেগেছিল, কিন্তু তিনি আর কিছু বলেন নি।

মাঠ পার হতে হতে দুধারে ধানের চারার শিশিরে তাদের কাপড় ভিজে গেল। বুড়োর বাড়ীর পৌঁছে দেখা গেল তার দুই জোয়ান ছেলেই বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে, মাথায় রক্তমাখা ন্যাকড়া জড়ানো, সারা গায়ে কালশিরের দাগ। একজনের বাঁ হাতটা কনুয়ের কাছে ভেঙ্গে গেছে। ডাক্তারবাবু তাড়াতাড়ি তাদের মাথার ন্যাকড়া খুলে ফেললেন। গাছ চাপা পড়ে মর মর হয়েছে শুনে তিনি ভাঙ্গা হাত পা মাথার জন্য যতদূর সম্ভব প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন। ভেবেছিলেন, তবু হয়তো হাসপাতালেই পাঠাতে হবে। ধোয়া মোছা ওষুধ দেয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করা পর্য্যন্ত ডাক্তারবাবু চুপ করে রইলেন।

তারপর বুড়োকে বললেন, 'গাছ পড়ে তো এরকম হয়না বাপু। সত্যি কথা বলো, কোন ভয় নেই।'

বুড়ো কি সহজে কোন কথা ফাঁস করতে চায়। কেবলি মাথা নাড়ে আর ভয়ার্ত্ত চোখ পিট পিট করে আর গাছ চাপা পড়ার কথা বলে। শেষে বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ সে হু হু করে কেঁদে ফেলল।

'পুলিশ মেরে খুন করে গিয়েছে ডাক্তারবাবু।'

'সাক্ষী আছে ?'

'আছে। দীনু ঘোষ আর হানিফ দেখেছে।'

'চলো দিকি যাই একবার ওদের কাছে।'

'কেন ডাক্তারবাবু ?'

'তোমার দুই ছেলেকে এমন করে মেরে গেল, তবু বলছ কেন বাবু ?'

দীনু ঘোষের বয়স হবে চল্লিশের কাছাকাছি। বেশ মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, এককালে লাঠিয়াল হিসাবে খ্যাতি ছিল। গরু বাছুরের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অবস্থা ভাল হওয়ায় লাঠি চর্চ্চা ছেড়ে দিয়েছে বছর দশেক। পাগলা ডাক্তারকে সে আদর করে দাওয়ায় চৌকী পেতে বসতে দিল।

পাগলা ডাক্তার বললেন, 'দীনু, তোমার কাছে শুনি একবার ব্যাপারটা।'

'কিসের ব্যাপার ডাক্তারবাবু ?'

পাগলা ডাক্তার আশ্চর্য্য হয়ে তার দিকে তাকালেন।

'ওই হাঙ্গামার ব্যাপারটা। ওর ছেলে দুটো কেন মার খেল কি বৃত্তান্ত।'

'কার ছেলে মার খেয়েছে ডাক্তারবাবু ? আমি তো কিছু জানিনা ?'

জানেনা। দীনু ঘোষ কিছুই জানে না। কিছু দেখা বা জানা দূরে থাক, ঘটনার সময় সে গাঁয়েই ছিল না।

হানিফের বয়স দীনুর চেয়ে কম, বেশ শক্তিশালী শক্ত চেহারা। সে দীনুর মত ভাণ করল না, মাটির দিকে চেয়ে সোজাসুজি জবাব দিল, 'আমি কিছু জানি না বাবু।'

'কিন্তু হানিফ—'

'আমি কিছু জানি না।'

পাগলা ডাক্তার একমিনিট চুপ করে থাকার পর প্রায় দশমিনিট একটানা কথা কয়ে গেলেন। তিনি চুপ করলে হানিফ একবার ঢোঁক গিলল কিন্তু বলল, 'আমি কিছু জানি না।'

গম্ভীরমুখে বিদায় নেবার সময় পাগলা ডাক্তার বুড়োকে বললেন, 'তোমার ছেলেদের আমি বাঁচাব, ভয় পেয়ো না। কিন্তু মরতে পার না তোমরা ? সবাই মিলে একসঙ্গে ?'

[ক্রমশ]

পরের দিন বড়দিন

এডালবার্ট স্টিফটার

[চুম্বক : দু-পাশের উপত্যকায় ছুটি গ্রাম : একটির নাম জিশ্‌চেড, অন্যটির নাম মিলস্‌ডর্ফ। জিশ্‌চেডের এক জুতোর ব্যবসায়ীর দুই ছেলেমেয়ে—কনরাড আর সান্না। তাদের দিদিমা ও দাদামশাই থাকেন মিলসডর্ফে। জিশ্‌চেড থেকে বেশ খানিকটা দূর মিলস্‌ডর্ফ। যে পাহাড়টা ডিঙিয়ে যেতে হয় তাকে লোকেরা 'নেক্' বলে। সেবার বড়দিনের আগের দিন সকালে কন্‌রাড আর সান্না মা-বাবা'র অনুমতি নিয়ে গেলো তাদের দিদিমা ও দাদামশাই-এর সঙ্গে দেখা করতে। সন্ধের অনেক আগেই দিদিমা তাদের ফেরৎ পাঠালো—কারণ দিনটা ভারি ছোটো আর ঠাণ্ডাটাও পড়েছে বেজায়। কিছুদূর আসতে না আসতেই স্বরু হোলো তুষার-বৃষ্টি। রাতও হয়ে এলো। কনরাড আর সন্না বুঝতে পারলো সেই পাহাড়ের মধ্যে প্রচণ্ড তুষার-ঝড়ের ভিতর তারা পথ হরিয়েছে।]

আবার তারা এগিয়ে চললো। কত চেষ্টা তারা করলো, কতবার মোড় ঘুরলো—কিন্তু নীচে নামবার কোনো লক্ষণই নেই। হঠাৎ-হঠাৎ দু-পাশের জমিটা খাড়া হয়ে ওঠে, মাঝের পথ দিয়ে তারা এগিয়ে চলে—কিন্তু কেবলি উপরে ওঠা। দু-পাশের সেই খাড়া জমি শেষ হবার পর তারা মোড় বেঁকে ভাবে এবার বুঝি নীচে নামতে পারবে। কিন্তু তখুনি নিজেদের ভুল বুঝতে পারে—আবার তাদের সামনে খাড়া চড়াই। তাদের ছোটো-ছোটো পা-গুলি ক্রমাগত পাথরে হোঁচট খেতে লাগলো। মাঝে-মাঝে পথের মধ্যেকার বড়-বড় খাপছাড়া পাথরগুলোর জন্যে আসল পথ ছেড়ে তাদের যেতে হোলো ঘুরে।

তারা লক্ষ্য করলো নরম তুষারের মধ্যে পা-গুলো ডুবে গেলেও আর তলাকার মাটির স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে না। মাটি বদলে যেন অনেক দিনকার পুরোনো শক্ত হয়ে জমে-যাওয়া বরফ তলায় রয়েছে। তবু তারা এগিয়ে চললো, চললো বেশ জোরেজোরেই। হাঁটতে বেশ পরিশ্রম হতে লাগলো। থামলেই চারিদিকের খাঁ-খাঁ শূন্যতা তারা অনুভব করে; হাঁটলে পায়ের নীচে তুষারগুলো মচমচ করে ওঠে; আর অন্য কোনো শব্দ নেই। আকাশ থেকে তুষারের ফুলকিগুলো নিঃশব্দে ঝরছে আর এতো বেশি পরিমাণে পড়ছে যেন চোখের সামনেই মাটির উপরকার ঝরা-তুষার উঁচু হয়ে উঠছে! তাদের নিজেদের চেহারাও একেবারে শাদা হয়ে গেছে। ফলে আশেপাশের শাদা জিনিসের সঙ্গে তাদের আর কোনো তফাৎ নেই। একবার যদি তারা পরস্পরের কাছ থেকে দুয়েক পা ছাড়াছাড়ি হয়ে পড়ে তা হ'লে একজন অন্যকে আর দেখতেই পাবে না!

তবু ভালো তুষারগুলো ভাগ্যিস বালির মতো শুকনো। ফলে পায়ের উপর থেকে ঝরে পড়ে যাচ্ছে। তাদের জুতো-মোজায় সেগুলো জমে আটকে যাচ্ছে না আর ঝরে যাবার পর কেনো রকম ভিজে স্পর্শ রেখে যাচ্ছে না।

অবশেষে আবার তারা কতকগুলো জিনিস দেখতে পেলো। সেগুলো আর কিছু না—বিরাট-বিরাট পাথরের টুকরো। দৈত্যের মতো তাদের চেহারা; এলোমেলো হয়ে পড়ে রয়েছে। তুষারে তাদের দেহ গেছে ঢেকে, তবু তাদের ফাটলে আর সর্বাঙ্গে তখনো তুষার ঝরছে। আগের বারের মতো এবারেও নজরে পড়ার আগেই পাথরগুলোর উপর তারা প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়লো।

আরো কাছে গিয়ে আরো ভালো করে তারা পরীক্ষা করে দেখলো! দেখলো সেগুলো বরফের চাঁই—তাদের সমস্তটাই জমা বরফ!

বরফের চাঁইগুলো তুষারে ঢাকা হয়ে পড়ে রয়েছে।

শুধু তাদের বিরাট পাশগুলোয় মসৃণ সবুজ রঙের বরফ চোখে পড়ে। সেইখান থেকে পাহাড় উঠে গেছে, যেন ফেনার সমুদ্র। কিন্তু তাদের ঢালু জায়গায় যেন অস্পষ্ট আলোর একটি ঝিকিমিকি আর ভিতর থেকে যেন ঠিকরে পড়ছে অদ্ভুত একটি ঔজ্জ্বল্য। যেন রাশিরাশি জহরৎ এক জায়গায় জমা করা। আর রয়েছে তুষারে ঢাকা গোল বল। পাথরের টুকরো এবং আরো নানা জিনিস, কোনোটা খাড়া কোনোটা বাঁকা, চারিদিকে দাঁড়িয়ে। জিশ্‌চেডের গির্জের চূড়োর মতো সেগুলো উঁচু। তাদের কতকগুলোর মধ্যে আবার বড়বড় গর্ত। সেই গর্তগুলোর আকার নানা ধরণের। কোনোটাতে শুধু একটা হাত, কোনোটাতে বা গোটা একটা মাথা কিংবা দেহ, কোনোটাতে বা খড়-বোঝাই গোটা একটা গরুর গাড়িই ঢুকে যেতে পারে। বরফের এই চাঁইগুলো ঘেঁষাঘেষি পাশাপাশি দাঁড়ানো, কাঁধ পর্যন্ত উঁচু। ফলে ছোটোছোটো ছাত আর গুহা নিজে থেকেই তৈরি হয়ে গেছে। সেই ছাতের পাশ থেকে তুষার ঝুলে রয়েছে, যেন দীর্ঘ শাদা থাবা। সেই বরফের মাঝখানে কালো বাড়ির মতো একটা বিরাট পাথর দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা দেখলো। সেটা এতো খাড়া যে তার দু-পাশে একটুও তুষার জমতে পারেনি। কিন্তু তা বলে সেটাই একমাত্র পাথর নয়। সে-রকম কি তার চেয়েও বড়বড় আরো অনেক পাথর বরফের মাঝে-মাঝে সারবন্দী দাঁড়িয়ে। যেন লম্বা একটি দেয়াল চলে গেছে। কিন্তু এই পাথরগুলো গোড়াতেই নজরে পড়ে না। অল্পঅল্প করে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সান্না বললো, "এখানে নিশ্চয়ই অনেক জল ছিলো। নইলে এতো বরফ হবে কী করে?"

উত্তরে তার ভাই বললো, "নারে, জল থেকে এ বরফগুলো জমেনি। এগুলো পাহাড়ের বরফ। পাহাড়ের চূড়োর কাছে এগুলো থাকে—দেখছিস না ঠিক সেইভাবে সাজানো।"

"হ্যাঁ দাদা, তাই তো," বললো সান্না।

"বরফের কাছ পর্যন্ত আমরা চলে এসেছি," বললো কনরাড। "আমরা এখন সেই পাহাড়টার ওপর, কোনটা বুঝেছিস? আমাদের বাগান থেকে যেটা দেখা যায় আর রোদে যেটা দুধের মতো শাদা দেখায়! এখন আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন: সেই বিকেলগুলোর কথা কি মনে পড়ছে আমরা যখন বাগানে বসে থাকতুম? কী চমৎকার লাগতো ভাব! চারদিকে মৌমাছিগুলো গুনগুন করছে, নেবু গাছের গন্ধ ভেসে আসছে আর আকাশের কোণ থেকে সূর্যকে যাচ্ছে দেখা!"

"হ্যাঁ ভাই, মনে পড়ছে।"

"পাহাড়টাকেও আমরা দেখতে পেতুম। কী অদ্ভুত নীল তার রঙ, ঠিক যেন আকাশের মতো। আর তার চূড়োয় শাদা তুষার। তখন অবশ্য গ্রীষ্মকাল, বাতাসটা গরম আর ফসল পাকতে সবে স্বরু করেছে।"

"হ্যাঁ দাদা।"

"নীচে, যেখানে তুষার শেষ হয়েছে সেখানে, কত রকম রঙই না দেখা যেতো—সবুজ, নীল, শাদা। সেটাই হচ্ছে বরফ। আমাদের উপত্যকা থেকে অনেক দূরে বলে ভালো করে দেখাই যেতো না। বাবা বলতেন, ও বরফ কোনোদিন গলবে না, যতদিন পৃথিবী থাকবে ততদিন ওখানকার বরফও থাকবে। প্রায়ই আমি লক্ষ্য করতুম বরফের অনেক নীচেও নীল রঙটা লেগে রয়েছে। সেগুলো হয় পাথর কিংবা মাটি আর মাঠ—এই কথাই আমার মনে হোতো। আর তারপরেই আরম্ভ হয়েছে ফার্ গাছের বন—ক্রমশ সেই বন নীচের দিকে নেমেছে। তাদের ভেতর নানা রকমের পাথর চোখে পড়তো। তারপর দেখা যেতো সবুজ মাঠ, তারপর আবার সবুজ বন, তারপর আমাদের জিশ্‌চেডের মাঠ আর ক্ষেত। তাহলেই দেখছিস্ সান্না, আমরা যখন সেই বরফের ওপর এসে পড়েছি এর পরেই তখন সেই নীল রঙের ওপর দিয়ে নামবো, তারপর ফার্ বন—যেখানে সেই সব পাথর রয়েছে, তারপর মাঠ, তারপর সেই সবুজ বন, তারপর আমাদের জিশ্‌চেডের

উপত্যকায়; আর তারপরেই খুব সহজে আমাদের গ্রামকে খুঁজে বার করে নোবো।"

"বুঝেছি দাদা," সান্না উত্তর দিলো।

ভিতর দিকে একটি পথ চলে গেছে। সেই পথ ধরে বরফের মধ্যে তারা চললো। সেই বিরাট চাঁইগুলোর মধ্যে তাদের মনে হতে লাগলো যেন ছোট্ট দুটি কালো বিন্দু নড়ে বেড়াচ্ছে।

তাদের স্বাভাবিক বুদ্ধি যেন বললো কোনো আশ্রয় নেওয়া উচিত। তাই তারা সেই ছাতওলা জায়গার মধ্যে ঢুকে পড়লো। দুদিকে বরফ, মাঝখান দিয়ে একটি পরিখা-পথ যেন এগিয়ে গেছে। সেই পথ ধরে তারা চললো। সেই পথটা যেন কোনো স্রোতের ছিলো। এখন অবশ্য স্রোতটা শুকিয়ে গেছে আর তার উপরটা শুকনো তাজা তুষার ঢেকে দিয়েছে। তুষারের চাঁই পেরিয়ে বরফের খিলেনদেয়া এই ছাতের তলা দিয়ে সেই স্রোতের পথ গেছে চলে। সেই পরিখাপথ ধরে, সেই ছাতের নীচ দিয়ে তারা ক্রমশ ভিতর থেকে আরো ভিতরে এগিয়ে চললো। জায়গাটা সম্পূর্ণ শুকনো, তাদের পায়ের তলায় শুকনো জমা বরফ। কিন্তু সমস্ত গুহাটাই অদ্ভুত একটা নীল রঙে ভরা, এরকম নীল রঙ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। আকাশের চেয়ে অনেক গাঢ় আর সুন্দর এই নীল রঙ। দেখে মনে হয় যেন আকাশের মতো রঙীন কাঁচের ভিতর দিয়ে একটি মেঘমুক্ত উজ্জ্বল দীপ্তি ভিতরে চুঁইয়ে পড়ছে। সরু আর মোটা নানা ধরণের খিলেন সেখানে রয়েছে। আর তাদের ভিতর দিয়ে নীচে ঝুলছে নানা ধরণের সরু মোটা ছুঁচলো বরফের লাঠি কিংবা রেশমের মতো ঝালর। এই পথ তাদের আরো অনেক ভিতরে নিয়ে যেতো। কত ভিতরে তারা জানে না। কারণ আর তারা এগুলো না। সেই গুহার মধ্যে আশ্রয় নিলেই যেন তাদের ভালো হোতো—বেশ গরম ভিতরে, তুষারও গায়ে পড়ছে না। কিন্তু এমন অদ্ভুত নীল রঙ চতুর্দিকে যে তারা ভয় পেয়ে গেলো আর ভয় পেয়েই আবার এলো বেরিয়ে। কিছুক্ষণ তারা সেই পরিখাপথেই চললো, শেষে হাতড়ে-হাতড়ে উপরে উঠলো। যথাসম্ভব বরফের উপর দিয়ে তারা এগিয়ে চললো।

"এবারে সামনের ওই অংশটা পেরুলেই বরফের ওপর থেকে আমরা নেমে যাবো," কনরাড বললো। "হ্যাঁ," উত্তর দিলো সান্না তারপর তার ছোট্ট হাত দিয়ে আরো শক্ত মুঠো করে কনরাডের হাতটা চেপে ধরলো। [ক্রমশ]

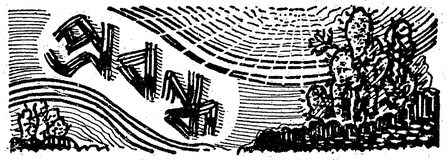

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

[চুম্বক: পার্কে ডাংগুলি খেলতে গিয়ে জগু, ঘোঁতোন আর পান্নালাল দেখলো এক জায়গায় এক ভদ্রলোক বক্তৃতা দিচ্ছেন ক্ষুদে শয়তানের উপর। ভদ্রলোকের সঙ্গে তাদের খুব আলাপ হয়ে গেলো। প্রায় রোজই পার্কে তাঁর সঙ্গে তারা তিনজন দেখা করে, প্রশ্ন করে, ভদ্রলোকও হাসিমুখে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন আর গল্পের মতো বুঝিয়ে দেন ক্ষুদে শয়তানের কথা। তারা শুনলো ক্ষুদে শয়তানরা আসলে বেজায় ক্ষুদি-ক্ষুদি এক ধরণের পোকা, তাদের চোখে দেখা যায় না। সেগুলির নাম জীবাণু। অনুবীক্ষণ দিয়ে তাদের দেখতে হয়। ১৬৬৫ সালে রবার্ট হুকি প্রথম এই জীবাণুদের দেখতে পান। জীবাণু অসংখ্য রকমের আছে। নানারকম তাদের চেহারা। কেউ গরম ভালোবাসে, কেউ ঠাণ্ডা ভালোবাসে, কেউ ও দুটোর মাঝামাঝি অবস্থা ভালোবাসে। তাদের আয়ু মাত্র কুড়ি মিনিট। তারপর দু-ভাগ হয়ে যায়। তখন একটার বদলে হয় দুটো জীবাণু। এই জীবাণুর দল আমাদের

চারদিকে কিলবিল করছে, হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে আর চটচটে জিনিস পেলেই আড্ডা গাড়ছে। এই জীবাণুদের প্রথম ভালো করে পরীক্ষা করেন লুই পাস্তুর। তিনি নানা রকম পরীক্ষা করে প্রমাণ করলেন জলাতঙ্ক, এ্যান্‌থ্রেক্‌স্ ইত্যাদি নানাধরণের অসুখের মূলে রয়েছে এই সব জীবাণুর দল। খাবার যে পচে যায়, গুড় যে গেঁজে যায় তা আর কিছুই নয়—সমস্তই এইসব ক্ষুদে শয়তানদের কীর্তি।]

জগু বেচারা খেতে-দেতে একটু ভালবাসে। তাই কোনো একটা কথা শুনলে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাই সবপ্রথম ওর মাথায় আসে। জীবাণু এবং জীবাণু-আবিষ্কার নিয়ে এত সব রোমহর্ষক গল্প শুনতে শুনতে ওর মাথায় ক'দিন থেকে তাই শুধু একটা কথাই বারবার ঘুরছিলো: এই সব ক্ষুদে শয়তানগুলো খায় কি? আর কেমন করেই বা খায়? এতদিন সাহস করে কথাটা ও পাড়তে পারেনি; কেননা, পেটুক বলে ওর রীতিমতো দুর্ণাম রয়েছে, এবং ফাঁক পেলে পান্না আর ঘোঁতন তাই নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়ে না। আজ কিন্তু আর থাকতে না পেরে অনেক আম্‌তা-আম্‌তা করে সেই কুৎকুতে ভদ্দরলোককে বলে বসল, "একটা কথা বলব, স্যর?" পান্না ওর দিকে অবাক হয়ে চাইল। ঘোঁতন ওর দিকে অবাক হয়ে চাইল। ভদ্দরলোক ওর দিকে অবাক হয়ে চাইলেন। বল্লেন, "নিশ্চই। বলো।" জগু বল্লে, "আচ্ছা স্যর, এই সব ক্ষুদে শয়তানগুলো কী খায় আর কেমন করেই বা খায় কিছু বলতে পারেন?" আর যাবে কোথায়? জগু যা ভয় পেয়েছিলো ঠিক তাই। ঘোঁতন একবার পান্নার দিকে আড়চোখে চাইল। পান্না একবার ঘোঁতনের দিকে আড়চোখে চাইল। আর যেই দু'জনের চোখাচোখি হল অমনি একসঙ্গে দু'জনে হাসতে সুরু করে দিল: হী-হী-হী, ঘোঁৎ-ঘোঁৎ-ঘোঁৎ। বেচারা জগু ত' লজ্জায় একেবারে সিঁটিয়ে যাবার জোগাড়।

ভদ্দরলোক অবাক হয়ে বল্লেন, "কী হল, অত হাসি কিসের?"

পান্না আর ঘোঁতন পরের পর বলে চল্ল, "তাও জানেন না স্যর? খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে জগুর বেশ একটু ইয়ে আছে যে স্যর!"

"ওর ন-মামা ওর নাম দিয়েছেন উদরেন্দ্র।"

"একদিন স্যর, সরস্বতী পূজোর দিন স্যর, জানেন স্যর……(তারপর জগুর দিকে চেয়ে)…বলব নাকি জগু?"

ভদ্রলোক দেখলেন বন্ধুদের হাসাহাসিতে বেচারা জগু মোটা শরীরটা নিয়ে ঘেমে নেয়ে উঠেছে, ঢোকটোক গিলে, ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে একাকার কাণ্ড বাধাবার জোগাড় করেছে। তাই ওকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যে ভদ্দরলোক বল্লেন, "তা এমন কি ও অন্যায় কথা জিগগেস করেছে, বাপু? জীবাণুকে বাঁচতে হয়, তোমার মতন, আমার মতন, আরও পাঁচজনের মতন। জানো, পণ্ডিতেরাও এ নিয়ে অনেক মাথা ঘামিয়েছেন।"

স্বয়ং পণ্ডিতেরাও মাথা ঘামিয়েছেন শুনে জগুর সাহস যেন ফিরে এল, তাচ্ছিল্য-ভরে বন্ধুদের দিকে একবার তাকালো,—ভাবখানা এই যে পেটুক বলে প্রশ্নটা ও করেনি, আসলে এর মধ্যে পাণ্ডিত্যের লক্ষণ আছে, তাই! পান্না আর ঘোঁতন দমে গেল।

ভদ্দরলোকের দিকে চেয়ে একটু বীরদর্পে জগু বল্ল, "পণ্ডিতরা মাথা ঘামান বলেই জিগগেস করছিলাম, স্যর। ওরা এসব কি বুঝবে? কিন্তু কথা হল, ক্ষুদে শয়তানগুলোর কি হাত-পা-দাঁত-মুখ আছে? না থাকলে তারা খায় কেমন করে?"

ভদ্রলোক বল্লেন, "ঠিক বলেছো। সত্যিই ওদের হাত-পা-দাঁত-মুখ নেই যে গবা-গব্ মাখবে আর কোঁৎকোঁৎ করে খাবার সাবাড় করবে। তবে, খাবার ব্যাপারে একদিক থেকে আমাদের সঙ্গে ওদের খুব মিল আছে। গোটা খাবারটা আমরা যেমন গপাস করে গিলে ফেলি না, দাঁত দিয়ে চিবিয়ে, ভেঙে চুরে মিহি করে তবে খাই, ওরাও তেমনি খাবার আগে নানানভাবে জিনিসটাকে

ভেঙে চুরে নেয়। তবে, ওদের না আছে দাঁত, না আছে মুখ, না আছে হাত। তাই খাবারটা ভেঙে নেয় অন্যভাবে। ওরা করে কি জানো? খাবারের মধ্যে প্রথমে নিজেরা সেঁদিয়ে যায়। তারপর নিজেদের শরীর থেকে একরকম রস বের করে খাবারটার মধ্যে ঢেলে দেয়। এই রস বেরুলে, খাবারটা ভেঙে চুরে তলতলে হয়ে যায়, আর তখন দেদার আয়েস ক'রে ওরা খেতে সুরু করে।"

"কিন্তু খায় কেমন করে? মুখ যে নেই!" [ক্রমশ]

Shoe-শিক্ষা

বুদ্ধদেব বসু

সেদিন রঙ্গুকে একটা চড় মেরেছিলাম ব'লে বুলু-দি আমাকে কী বকাটাই বকলেন! আমরা কারু উপর রাগ করলে পাজি গাধা শুয়োর বাঁদর যা খুশি তা-ই বলি তো—বুলু-দির বকুনি মোটেও সে-রকম না, কটোমটো গম্ভীর ভাষায় লম্বা-চওড়া সাফ বক্তৃতা একটি, যেন মাথার উপর আস্ত এক খানা ডিক্‌শনারি উপুড় ক'রে ঢেলে দিলে কেউ। আদ্ধেক কথার মানেই বোঝা যায় না। তা মানে না-বুঝলেও মানে লাগে বইকি। আমি—শ্রীসমীরণ তালুকদার—এই সেদিন মাত্র পুরো একটা ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে উঠলাম, দু'দিন বাদে কলেজে পড়বো, আমাকে কিনা অমন ক'রে বলা! যা রাগ হ'লো মনে-মনে! অথচ কিচ্ছু বলবার জো নেই, দশ বচ্ছর জয়পুরে কাটিয়ে বুলু-দি এই সেদিনমাত্র কলকাতায় এসেছেন—তাঁকে নিয়ে বাড়িতে-বাড়িতে হুলুস্থুল, আজ তাঁর অনারেই আমাদের বাড়িতে ভোজ—সাধ্য কী তাঁকে কেউ কিছু বলে! পিসিমা বিধবা মানুষ, বুলু-দি তাঁর একমাত্র মেয়ে, তিনি যে একটু বেশি মাতামাতি করবেন তা বুঝি, কিন্তু আমার মা-ও যেন খেপে গেছেন, ক'দিন ধ'রে বুলু ছাড়া তাঁর মুখে আর কথাই নেই। একবার বিয়ে হ'য়ে গেলে এই দিদি-টিদিগুলো আর মানুষ থাকে না—দেমাকে পা পড়ে না মাটিতে, রীতিমতো বড়ো-বড়ো ছেলেদেরও কচি খোকার মতো জ্ঞান করে—এদিকে মা মাসি পিসি বাবা কাকা মামা ইত্যাদি যে যেখানে আছে সবাই আদর দিয়ে-দিয়ে তাদের আর কিছু রাখে না। দু'চক্ষে দেখতে পারিনে এই বিয়ে-হওয়া দিদিদের।

হয়েছিলো কী—খাওয়ার পরে শুয়ে-শুয়ে একটা অ্যাডভেঞ্চারের নভেল পড়ছি—রঙ্গু কোত্থেকে একটা পাখির পালক নিয়ে এসে আমার কানে সুড়সুড়ি দিতে লাগলো। কানে পালকের সুড়সুড়ি এমনিতে মন্দ লাগে না, কিন্তু তখন, মনে করো, অমরকে নরখাদকেরা ঘিরে ফেলেছে, কিছুতেই পালাবার উপায় নেই, অথচ সে তো পালাবেই (বইয়ের শেষ পাতাটা আগেই উঁকি দিয়ে দেখে নিয়েছি, অমর তার কলকাতার বাড়ির বারান্দায় ব'সে চা খাচ্ছে—তাছাড়া অ্যাডভেঞ্চারের নভেলে নায়ক যত বিপদেই পড়ুক, কখনো সে মরবে না এ তো জানাই জানা)—এমন সময়ে কি কানে সুড়সুড়ি ভালো লাগে। আমি গম্ভীরভাবে একবার বললুম, 'উহুঁ!' কিন্তু রঙ্গু আমার নিষেধ অমান্য ক'রে আবার সুড়সুড়ি দিলে। তখন বেশ একটু বিরক্ত হ'য়েই আমি বললুম, 'আ—হা!' কথাটার রঙ্গু কী মানে বুঝলো জানি না, কিন্তু তারপরেই দেখি পালকটা সে আমার নাকের ভিতর ঢোকাবার চেষ্টা করছে। তখনই তো তাকে দিলুম এক চড়—হাবাটা ভ্যাঁ ক'রে কাঁদতে-কাঁদতে চ'লে গেলো। তাও তো আস্তেই মেরেছিলাম—কক্ষনো বেশি লাগেনি ওর—রঙ্গুটার ঐ রকমই ন্যাকা স্বভাব। আর যদি লেগেও থাকে আমিই তো ওকে হ্যাপি বয় কিনে খাওয়াতুম, চুকে-বুকে যেতো। মাঝখান থেকে বুলু-দির ফোঁপরদালালি কেন?

বুলু-দি বললেন, ছোটোদের কক্ষনো মারতে নেই, দোষ

করলেও না, গুরুতর অপরাধ করলেও না, এমনকি বকতে নেই পর্যন্ত, সব সময় আদর ক'রে, মিষ্টি কথা ব'লে তাদের শিক্ষা দিতে হয়, অন্যায় থেকে নিরস্ত করতে হয়, নয়তো ভবিষ্যতে তারা কিছুতেই সুস্থ স্বাভাবিক সুসম্পূর্ণ মানুষ হ'য়ে উঠতে পারে না। আমরা যাকে দুষ্টুমি বলি সেটা ওদের খেলা, আর খেলাই ওদের কাজ, তাই ওদের দুষ্টুমিতে কক্ষনো বাধা দিতে নেই, দুষ্টুমির বেগটাকে ভালো-ভালো দিকে বইয়ে দিতে হয়। একেই বলে সুশিক্ষা। এ-বিষয়ে পৃথিবীর সমস্ত বৈজ্ঞানিকরা একমত যে—

বুলু-দি প্রায় দশ মিনিট ধ'রে একটানা বললেন, আর মা, পিসিমা, বৌদি, ছোড়দি সব হাঁ হয়ে শুনলো। আর আমি? রাগে আমার গা পিটপিট করতে লাগলো, তক্ষুনি উঠে গনগনে রোদ্দুরে চ'লে গেলুম মণ্টুদের বাড়ি।

তাও তো ভাগ্যিশ জামাইবাবু আসেননি। শুনেছি তিনি মেটরলজিস্ট না ঘটরলজিস্ট, না মাথা-মুণ্ডু কী, খুব রাশভারি মানুষ, দারুণ বিদ্বান। আরো বড়ো একটা চাকরি নিয়ে জয়পুর থেকে কলকাতায় আসছেন—এখনো এসে পৌঁছতে পারেনি। বুলু-দি আগে এসে বাড়ি-ঘর-দোর সাজাবেন, তারপর মহাপুরুষটি আসবেন। এ-রকম একটা রোখা-চোখা দিদি আর কটমটে জামাইবাবুকে নিয়ে আমার জীবনে কী সুখ বাড়বে আমি তো ভেবে পেলুম না।

বিকেলবেলা বাড়ি ফিরে দেখি, বুলু-দি যাচ্ছেন। বাড়ি-সুদ্ধ লোক ট্যাক্সির ধারে রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে, যেন লাট সাহেবকে বিদায় দেয়া হচ্ছে। মা বললেন, 'কলু ডলুকে তো আনলি না আজ—'

'না, মামিমা, ওরা ভীষণ নিয়মে থাকে—একেবারে ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় ওদের খাওয়া-শোওয়া—কোনো অনিয়ম ওদের সয় না।'

'আর-একদিন সুবিধেমতো নিয়ে আসিস।'

'আনবো, কিন্তু কিচ্ছু খাওয়াতে পারবে না। যা তেল-মশলা তোমাদের রান্নায়!'

কথাটা শুনে আমার মাথার ভিতরটা চিড়িক ক'রে উঠলো। অথচ মা দেখি দিব্যি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসছেন। মা-রা যে কী!

বুলু-দি আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে তুমি এসেছো। রোদ্দুরে এত ঘোরাঘুরি করো কেন? মা-দিদিরা ঠিক কথাই বলে—তাতে রাগ করতে নেই। একদিন যেয়ো আমাদের বাড়ি—কেমন?

আমি গোঁজ হ'য়ে মুখ ফিরিয়ে রইলুম। ট্যাক্সি রওনা হ'লো।

এটা প্রায় এক মাস আগেকার কথা। ইতিমধ্যে ফুটবলের সীজন আরম্ভ হয়েছে, বুলু-দির কথা ভুলেই গেছি। এখন কালকের কথা শোনো!

কাল হ'লো কী—মাঠে তেমন জোরালো কোনো খেলা ছিলো না। ভাবছিলাম, সিনেমাতেই যাবো, না মণ্টুদের সঙ্গে দল বেঁধে পার্কে ব'সেই বিকেলটা কাটিয়ে দেবো—এমন সময় মা এসে বললেন, 'বুলু সেদিন একখানা শাড়ি ফেলে গেছে—দিয়ে আয় তো।'

আমি বললাম, 'বুলু কে?'

মা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললেন, 'আহা—কথা শোনো ছেলের! বুলু—আমাদের বুলু—তোর বুলু-দি।' মা-র গলার আওয়াজে ভালোবাসা যেন ঝ'রে পড়লো।

'উহুঁ, পারবো না।'

'পারবি না কী রে?—এমনিতে টো-টোর উপরেই আছিস, আর এইটুকু একটা কাজও তোকে দিয়ে হবে না! কী হচ্ছিস তোরা দিন-দিন!'

আমি বললাম, 'ভালো লাগে না আমার বুলু-দিকে।'

মা একটু হেসে বললেন, 'ঐ তো একদিন একটু দেখেছিস—এর মধ্যে আবার ভালো-লাগা মন্দ-লাগার কথা কী হ'লো! বুলু চমৎকার মেয়ে—আর ধীরেনের মতো ছেলে তো হয়ই না—তুই যা, গেলেই তোর ভাল লাগবে। ওরা নতুন এসেছে কলকাতায়—এমনিও তো মাঝে-মাঝে তোর যাওয়া উচিত।'

মা-র পিড়াপিড়িতে রাজি হ'য়ে গেলুম আমি। ঐ আমার একটা মস্ত দোষ—মা কিছু বললে না-না করতে-করতেও সেটা ক'রে ফেলি।

ধুতি-পাঞ্জাবি পরে পাকা বাবুটি সেজে গেলুম তো বুলু-দির বাড়ি। ল্যান্সডাউন রোডের সাহেবি অংশে ফ্ল্যাট নিয়েছেন তাঁরা। কার্পেট-পাতা মস্ত ড্রয়িংরুম, কত রকম আসবাব—দরজায়-দরজায় ভারি পরদা, তোমার-দিদির বাড়ি ব'লে তুমি যে হুশ ক'রে ভিতরে ঢুকে যাবে তা স্বপ্নেও ভেবো না। কী করবো ভাবছি, এমন সময় পাগড়ি-পরা বেয়ারা এসে কেমন একটু ট্যারচা চোখে আমার দিকে তাকালো। ভাগ্যিশ আমার মনে প'ড়ে গেলো যে যাদের বাড়িতে ড্রয়িংরুম যাকে তাদের সাহেব-মেমসাহেব বলতে হয়—তাই তো আমি চট ক'রে বললুম, 'মেমসাবকে খবর দাও। বলো যে বালিগঞ্জ থেকে তাঁর ভাই এসেছে।'

বেয়ারা পাখা খুলে দিয়ে চ'লে গেলো। আমি বসলুম।

একটু পরে মোটা-সোটা ফর্শা চেহারার ছুটি ছেলে এলো—দেখেই বোঝা যায় জন্ম থেকে দুধ ছানা ক্ষীর মাখন আর নানারকম ফল-টল খেয়ে মানুষ। তাদের পিছনে এলেন জামাইবাবু, বেঁটেখাটো গোলগাল ভালোমানুষটির মতো দেখতে—আর সর্বশেষে এলেন বুলু-দি। আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললুম—'মা আমাকে এই শাড়িখানা দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন—'

'বেশ, বেশ, বোসো। কলু-ডলু—এই যে তোমাদের এক মামা। আলাপ করো।'

কলু বললে, 'মামা! কী মজা!'

ডলু বললে, 'আর কোনোদিন আমরা মামা দেখিনি।'

আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ালো দু'জনে। আমার একটু ভালোই লাগলো—বাঃ, ছেলে দুটি ভারি স্মার্ট তো—এর আগে কোনোদিন আমাকে দেখেনি, অথচ কী রকম আলাপি! তাছাড়া মামা হবার একটা গৌরবও তো আছে। ওদের মাথায় হাত রেখে একটু আদর করতে যাচ্ছি, হঠাৎ কলু শাঁ ক'রে আমার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে বললে, 'দেখি কী আছে তোমার পকেটে।'

ওধার থেকে বুলু-দি বললেন, 'কলু, ও-রকম করতে নেই। ভালো হ'য়ে বোসো—ভালো হ'য়ে আলাপ করো মামার সঙ্গে।'

ডলু ততক্ষণে আমার বুক-পকেট থেকে ফাউনটেনপেনটি তুলে নিয়েছে। 'কী কলম এটা? পার্কার না শেফার? পেলিকান না ওয়াটারম্যান?

আমি হেসে বললুম, 'হ'লো না। এটা এভারশার্প।'

'এভারশার্প। দেখি, দেখি!' ডলুর হাত থেকে কলু ছিনিয়ে নিলে কলমটা, তারপর কলুর হাত থেকে ডলু। ঝপ ক'রে ক্যাপ খুলে ফেলে বললে, 'ওমা, কালি ভরে কোনখান দিয়ে?'

'দাও আমাকে, দেখিয়ে দিচ্ছি,' আমি হাত বাড়ালুম।

'থাক, থাক, আমিই পারবো—ও, বুঝেছি!' ডলু পিছনের স্প্রিং ঘোরাতে লাগলো। আমি মনে-মনে ওদের হাত থেকে কলমটি উদ্ধার করবার জন্য ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম, অথচ কী উপায়ে ভদ্রভাবে তা করা যায়, ভেবে পেলাম না।

এধার থেকে জামাইবাবু বললেন, 'ওদের দু'জনেরই কলকব্জায় খুব মাথা। কোনো-একটা জিনিশ হাতে পেলে তার একেবারে ভিতরটা খুলে না-দেখা পর্যন্ত ওদের স্বস্তি নেই।'

'ছেলেবেলায়,' ওধার থেকে বললেন বুলু-দি, 'যত পুতুল ওদের এনে দিয়েছি, তক্ষুনি পেট চিরে মাথা ভেঙে হাত-পা ছিঁড়ে এমন করেছে যে দেখে মনে হয়েছে কোনো এক্সপেরি-মেণ্ট চলছে ল্যাবরেটরিতে।'

'খুব মাথা ওদের,' মাথা নেড়ে বললেন জামাইবাবু, 'বড়ো হ'য়ে বৈজ্ঞানিক হবে দু'জনেই।'

'থাক, থাক', বুলু-দি একটু হাসলেন, 'হবে যখন হবে এখন থেকেই ওদের মাথায় ও-সব ঢুকিয়ে দিয়ে কাজ নেই। কলু, ডলু, কলমটি ভালো ক'রে দেখা হ'লে মামাকে ফিরিয়ে দাও—মামাকে বিরক্ত কোরো না।'

ঐ একটুখানি একটা কলমের মধ্যে ওদের মতো মাথা-ওলা ছেলে কত আর রস পাবে—ওটা রেখে দিয়ে মামা নামক জীবন্ত বস্তুটাকেই আক্রমণ করলে ওরা। চুল ধ'রে টানা, কাঁধে চড়া, কানে ফু দেয়া, হাতে-পায়ে শুড়শুড়ি দেয়া—সবই একে-একে হ'তে লাগলো। আমার ধবধবে ইস্ত্রি-করা পাঞ্জাবিটা ন্যাতার মতো হ'য়ে গেলো, চুল এসে পড়লো কপালে, মাথার শির দপদপ করতে লাগলো, ভিতরের গেঞ্জিটা ঘামে ভিজে গেলো। বুলু-দি আর জামাইবাবু মুচকি হেসে-হেসে বার-বার চোখোচোখি করতে লাগলেন। অবশেষে বুলু-দি বললেন, 'মামাকে পেয়ে কী-রকম আনন্দ হয়েছে ওদের। অনেকে আছে, ছেলেপুলে কাছে এলেই খেঁকিয়ে ওঠে। সেটা ঠিক না। ওদের ভালো-লাগার এটাই তো প্রকাশ। কিন্তু আর না। কলু, ডলু, এবার তোমরা চুপ ক'রে, শান্ত হ'য়ে, বেশ ভদ্রভাবে বোসো তো। কিছু খাবে, সমী?'

কলু ব'লে উঠলো, 'ক্যাঁচকলা খাবে!'

'আরশোলা খাবে!' বললে ডলু।

'ক্যাঁচকলা!' চেঁচিয়ে বললে কলু।

'আরশোলা!' আরো চেঁচিয়ে ডলু।

'ছি!' ওধার থেকে ধীর মধুর স্বরে বুলুদি বললেন। 'ও-রকম করতে নেই। ও-রকম করা ভালো না। ও-রকম যারা করে কেউ তাদের ভালোবাসে না। কলু, ডলু, শান্ত হও, চুপ ক'রে বোসো।'

এতক্ষণে আমার কী-রকম লাগছে তাও কি বুঝিয়ে বলতে হবে? ছেলে দুটোকে একের পর এক ঘাড়ে ধরে তুলে বেড়াল-বাচ্চার মতো জানলা দিয়ে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে না-দিয়ে কেমন ক'রে ছিলাম, আজ সে-কথা ভেবে অবাকই লাগছে।

বুলু-দি আবার বললেন, 'কলু, ডলু, লক্ষ্মী ছেলে, চেঁচিয়ো না, চুপ করো।'

অবাক কাণ্ড! এ-কথার পরেই ওরা চুপ ক'রে গেলো, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে আমার ঘাড়ের তলায় এক চিমটি। আমি উঃ ব'লে যেই পিছনে তাকিয়েছি, অমনি চিমটিটা স'রে এলো আমার কব্জির উপর। এবার আমি ব'লে উঠলুম, 'ও কী! চিমটি কাটছো কেন?'

আমার কথা শুনে কলু-ডলু হেসে কুটিপাটি।

'ছি ছি ছি, মামাকে বুঝি চিমটি কাটতে আছে!' বুলু-দি বললেন।

'লক্ষ্মী ছেলে, চিমটি কাটে না।' বললেন জামাইবাবু।

তক্ষুনি আমার দু' কানের পিছনে একসঙ্গে দুটো চিমটি।

বুলু-দি বললেন, 'কলু ডলু, কথা শোনো, এ-ঘর থেকে চ'লে যাও।'

জামাইবাবু বললেন, 'তোমাদের খাবার সময় হ'লো'

'যাও, ডলু। কলু, যাও।'

'এ-রকম করলে মামা আর কোনোদিন আসবেন না।'

'কেউ ভালো বলবে না তোমাদের।'

'তোমার মা-বাবার নিন্দে হবে।'

'চিমটি কাটতে ভালো লাগে, কিন্তু খেতে ভালো লাগে না, তা তো জানো।'

'তোমাদের কেউ চিমটি কাটলে কেমন লাগে তোমাদের?

এত ভালো-ভালো উপদেশের পরে কলু-ডলু যে জোড়া চিমটি কাটলো তাতে আমার ব্রহ্মতালু পর্যন্ত জ্ব'লে গেলো।

তখন জামাইবাবু বললেন, 'কী মুশকিল, চিমটি কাটতে ওদের বড্ড ভালো লাগছে, দেখছি। আচ্ছা, এক কাজ করো—আর একটি কাটো, একটি মাত্র, কলু একটি, ডলু একটি, তারপর আর না। তারপরেই এখান থেকে চ'লে যাবে কিন্তু।'

কিন্তু কাকে চিমটি কাটবে? হঠাৎ দেখি, আমার পায়ের দু'পাটি চটি উঠে এসেছে দু'হাতে, আর শপাশপ পড়ছে কলু-ডলুর পিঠে।

আজ দেখছি বুলু-দি রাগ ক'রে প্রকাণ্ড লম্বা চিঠি লিখেছেন মা-কে, তাতে কত শক্ত-শক্ত কথা, কত বই থেকে কোটেশন। তার জবাব লিখলাম আমি। একটি লাইন

শুধু। 'বুলু-দি, তোমার কথাই ঠিক, এর নামই সুশিক্ষা, কিংবা shoe-শিক্ষা।'

আশা করি এর পরে বুলু-দির সঙ্গে আমাদের বাড়ির আর সম্পর্ক থাকবে না। বাঁচা গেলো।

পদীপিসির বর্মি বাক্স

লীলা মজুমদার

[চুম্বক : ট্রেনে চেপে পাঁচুমামার সঙ্গে প্রথমবার মামাবাড়ি যাচ্ছি, পথে পাঁচুমামা একশ' বছর আগে পদীপিসির বর্মিবাক্স হারানর গল্প বল্ল। কেমন করে ডাকাত নিমাইখুড়োকে হাম্‌লা দিয়ে ধনরত্নেভরা বাক্স পদীপিসি গোরুগাড়ি করে গভীররাতে বাড়ি আন্‌লেন, অথচ গাড়ি থেকে নাম্‌তে না নাম্‌তে রহস্যজনকভাবে বাক্স অদৃশ্য হ'য়ে গেলো; কেমনকরে একবছর ধরে খুঁজেও সে আর পাওয়া গেলো না। কিন্তু বহুবছর বাদে মারা যাবার সময়ে পদীপিসি ফিক্ করে হেসে বলেছিলেন—"এই-রে! বাক্স কি করেছি মনে পড়ছে!" বলেই চোখ বুজেছিলেন। পাঁচুমামা নাকি ঐ বাক্স খুঁজে বার করবে।

ট্রেনে চিম্‌ড়ে চেহারা এক ভদ্রলোকও সন্দেহজনক কৌতূহলের সঙ্গে সমস্ত শুন্‌লেন। বুঝ্‌লাম কাজটা ভালো হ'ল না। গভীররাতে মামাবাড়ির স্টেশনে ঘোর অন্ধকারে নেমে দেখ্‌লাম তিনিও নামছেন। নানান্ ব্যাপারের পর মামাবাড়ি পৌঁছলাম। দিদিমা ও সেজ-দাদামশাইয়ের সঙ্গে আলাপ হ'ল। পাঁচুমামা সাবধান করে দিল বাক্সর কথা কাউকে কিছু না বল্‌তে। কারণ পাঁচুমামা বাড়িশুদ্ধ সবাইকে অবিশ্বাস করে। পরদিন সকালে দেখ্‌লাম দূর থেকে চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক বাইনকুলার দিয়ে বাড়িটা দেখ্‌ছেন। সেজদাদামশাইয়ের কাছে শুন্‌লাম কেমনকরে তাঁর ছোটকাকা পেছনের বারান্দা থেকে নীচে যাবার সিঁড়ি করেছিলেন ও তাঁর বাবা সেটাকে ও ছাদে যাবার সিঁড়িটাকে কাটিয়ে দিয়েছিলেন। পরে দিদিমার কাছে শুন্‌লাম পদীপিসির বাক্সর কথা। পদীপিসির লক্ষ্মীছাড়া ছেলে গজা সম্ভবত কোনও গোপন অন্যায় কাজ ক'রে হঠাৎ বড়লোক হয়ে গেছিল। সে এই সতু।

দুপুরে রান্নাঘরে কোলাহল শুনে দেখি চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক গোপনে সেঁদিয়ে ঘুষ দিয়ে চাকরদের হাত করেছে। বিপদ সন্নিকট অথচ পাঁচুমামা বেশী জোলাপ খেয়ে ফেলেছে; তার সঙ্গে পরামর্শ অসম্ভব। মনের ভাবনা মনে চেপে রেখে শুতে গেলাম। বাক্সটার এখন অবধি কোনও কিনারা হ'ল না।]

গজার উপাখ্যান শুন্‌তে শুন্‌তে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টেরই পাইনি। হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলো। রাতের অদ্ভুত চুপচাপের মধ্যে শুন্‌তে পেলাম পাহাড়ে পাঁশবালিশটার আড়ালে দিদিমা আস্তে আস্তে নাক ডাকাচ্ছেন। আর কোথাও কোনও আওয়াজ নেই। তারপর শুন্‌লাম দূরে হুতুমপ্যাঁচা ডাক্‌ছে, আর মাথার উপর পুরোন কাঠের কড়িগুলো মট্‌মট্ ক'রে মোড়ামুড়ি দিচ্ছে। বুঝ্‌তে পারছিলাম এসবের জন্য ঘুম ভেঙ্গে যায়নি। যার জন্য ঘুম ভেঙ্গেছে সে নিশ্চয় আরও অনেক লোমহর্ষণ। শুয়ে শুয়ে যখন শুয়ে থাকা অসহ্য হ'ল পা শিরশির করতে লাগলো আর গলা শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেলো, জল না খেয়ে আর এক মিনিটও থাকা অসম্ভব হ'ল, আস্তে আস্তে খাট থেকে নাম্‌লাম। আস্তে আস্তে দরজা খুলে বাইরে প্যাসেজে এসে দাঁড়ালাম। ঐ একটু দূরে সারি সারি তিনটে কলসিভরা জল রয়েছে, কিন্তু মাঝখানের ঘুরঘুট্টে অন্ধকারটুকু পেরোতে ইচ্ছে করছে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে

বাঁ পায়ের গুলিটা চুলকোচ্ছি আর মন ঠিক করছি এমন সময় কার পায়ের শব্দ শুন্‌তে পেলাম।

কি আর বল্‌ব! হাত পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে গেলো। যেদিকে শব্দ সেদিকে সেজদাদামশাইয়ের ঘর। কল্পনা করতে লাগ্‌লাম দাঁত দিয়ে ছোরা কাম্‌ড়ে ধরে হাত দিয়ে সিঁদ কাট্‌তে কাট্‌তে কাণে মাকড়িপরা, লাল নেংটি গায়ে তেলচুক্‌চুকে সব চোর ডাকাতেরা সেজদাদামশাইয়ের ঘরে ঢুকে ওঁর হাতবাক্স সরাচ্ছে, রূপোর গড়গড়া নিচ্ছে, মখমলের চটি পায়ে দিচ্ছে!!

এমন সময়ে ঠুস্ করে সেজদাদামশাইয়ের দরজা খুলে আর বিড়ি ধরাতে ধরাতে যে বেরিয়ে এলো বিড়ির আগুনে স্পষ্ট তাকে দেখে চিন্‌তে পারলাম সেই চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক—বগলে জুতো নিয়ে পা টিপেটিপে এগুচ্ছে। আমার ত আর তখন নড়বার চড়বার ক্ষমতা ছিলো না তাই চুপ করে ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলাম। লোকটা কিন্তু কি একটা পেরেক না কিসে হোঁচট খেয়ে 'দুর শালা!' ব'লে অন্ধকারের মধ্যে মিলিয়ে গেলো। একটু বাদেই নীচের তলায় একটা দরজা বন্ধ হ'বার শব্দ শুন্‌তে পেলাম।

এতক্ষণে আমার চল্‌বার শক্তি ফিরে এলো, ভাবলাম জল খেয়ে কাজ নেই। ঘরেই ফিরে যাওয়া যাক্। একবার বেরুল চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক, এর পরে হয়ত' বেরোবে দাম্‌ড়া ডাকাত। ফিরতে যাব এমন সময় একটা সাদা কাগজ উড়ে এসে আমার পায়ে জড়িয়ে গেলো। নিমিষের মধ্যে সেটা তুলে নিয়ে সবেমাত্র পকেট বন্ধ করেছি, এমন সময় আবার সেজদাদামশাইয়ের দরজা খুলে গেলো এবং এবার স্বয়ং সেজদাদামশাই বেরিয়ে এসে টর্চ হাতে নিয়ে আঁতিপাঁতি করে কি যেন খুঁজ্‌তে লাগ্‌লেন। আমি ত' এদিকে অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি ত' দাঁড়িয়েই আছি। ধরে ফেল্লে কি যে হ'বে ভাবা যায় না! এমন সময় সেই একই পেরেকে না কিসে হোঁচট্ খেয়ে সেজদাদামশাইও হাত পা ছুঁড়ে কত কি যে বল্লেন তার ঠিক নেই! ভালোই হ'ল, আমাকে দেখবার আগেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে ঘরে ফিরে গিয়ে বোধ হয় কিছু লাগালেন-টাগালেন।

আমি কি যে ভাব্‌ব-ঠাওর করতে না পেরে খানিকটা জল খেয়ে আবার গিয়ে শুলাম। পকেটে কাগজটা কর-কর করতে লাগ্‌লো, কিন্তু দিদিমা আলো নিবিয়ে দিয়েছেন। পড়বার উপায় নেই। রঙচঙে চৌকির উপর রোজকার মতন আজও দেশলাই মোমবাতি রাখা ছিলো, কিন্তু সব জানাজানি হ'য়ে যাবার ভয়ে আর জাল্‌লাম না। সকালের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অপেক্ষা করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। স্বপ্ন দেখলাম পদীপিসি এসে পেছনের বারান্দার দরজা থেকে আমাকে ডাকছেন। ইয়া ষণ্ডা চেহারা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, থান পরা, ছোট করে চুল ছাঁটা, কপালে চন্দন লাগা অবিকল পাঁচুমামা যেমন বলেছিলেন। এক হাত দিয়ে ইসারা করে আমাকে ডাকছেন আর অন্য হাতটা পেছনে রেখেছেন। আমি কাছে যেতেই বল্লেন, "বাক্স পেয়েছিস্?" আমি বল্লাম, কই না ত? "নিমিষের মধ্যে বাক্স কোথায় ফেলেছিলে যে একদুপুর ধরে খুঁজে খুঁজেও পাওয়া যায়নি, আমার আশা করছে যে আমি দু'দিনেই খুঁজে দেব! কোথায় রেখেছিলে?" পদীপিসি বল্লেন, "ভালো ক'রে খুঁজে দেখ্। পেলে তুই-ই নিস্। পাঁচুটা একটা ইডিয়ট্, জোলাপের পর্যন্ত ডোজ ঠিক করতে পারে না। তুই-ই নিস্। বাক্সের মধ্যে লাল চুনীর কাণের দুল আছে, তোর মাকে দিস্। আর দেখ, ঐ ব্যাটা চিম্‌ড়েটাকে আর ঐ বুড়োটাকে একেবারে কাইণ্ড অফ্ বোকা বানিয়ে দিস্। বিশ্বনাথের কৃপায় গজার আমার কোনও অভাব নেই, জুড়িগাড়ি কিনেছে, বাড়ি কিনেছে, গাঁজার ব্যবসা করেছে। আহা বাবা বিশ্বনাথ না দেখলে পাপিষ্ঠদের কি গতি হবে?" বলে আমাকে চুমু খেয়ে পদীপিসি ছোটকাকার তৈরী সেই কাঠের সিঁড়ি বেয়ে বাগানের দিকে চল্লেন, এবং পিছন

ফিরতেই দেখ্‌লাম যে হাতটা পিছনে রেখেছিলেন তাতে ইয়া মস্ত একটা গদা !!

গদা দেখে এমন চম্‌কে গেলাম যে ঘুমই ভেঙে গেলো। দেখ্‌লাম সকাল বেলার রোদ এসে পিছন-দিকের বারান্দা দিয়ে ঘরে এসে বিছানা ভরে দিয়েছে। কাটা সিঁড়ির দাগটা চক্‌চক্ করছে। হঠাৎ কেন জানি মনে হ'ল সিঁড়িটা একটা ভারী ইম্পর্ট্যাণ্ট জিনিস। [ক্রমশ]

ছেলে কাঁদানো ছড়া

অমল চট্টোপাধ্যায়

বলি, হায় হায় হায়
টগর দিদি ঘোড়ায় চড়ে
ঘোমটা টেনে যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।
বলি, হায় হায় হায়।

টগর দিদি টগর দিদি
মাথায় তোমার কী ?
কোথায় তোমার শ্বশুর বাড়ি
কোথায় তোমার ঝি ?
টগর দিদি টগর দিদি
আমার কথা শোন,
ঘোড়ায় চেপে যাচ্ছ কেন
মটোর গাড়ি কেনো !

টগর দিদি টগর দিদি
ঘোমটা খোল না,
একটি পান খেতে দোব
মিথ্যে বলি না।

টগর দিদি টগর দিদি
পান যে আমার নেই,
একটি এলাচ খেতে দোব
সঙ্গে নেবে ভাই ?

বলি, হায় হায় হায়
টগর দিদি ঘোড়ায় চড়ে
শ্বশুর বাড়ি যায়,
তোরা দেখবি যদি আয়।
বলি হায় হায় হায়।

আমাদের লাইব্রেরি

ছাতুবাবুর ছাতা : কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত ও সত্যজিত রায় চিত্রিত। প্রাপ্তিস্থান : সংকেতভবন, কলিকাতা। দাম ১া০

ছাতুবাবুর ছাতার মলাটে ঐ যে ভদ্রলোক লম্বা কালো কোট পরে ছাতা মাথায় আমাদের দিকে পেছন ফিরে হেঁটে চলে যাচ্ছেন, ওঁকে দেখবামাত্র সন্দেহ হ'ল ওঁকে আমি চিনি। তারপর ছাতুবাবুর ছাতার গল্পটা পড়ে বুঝলাম ঠিক সাক্ষাৎ দেখা না হ'লেও তিনি অবশ্যই আমার চেনা। মানে ওরকম অনেক দেখেছি, এমন কি ওঁকেও দেখা আশ্চর্য নয়। মাঝে মাঝে দাড়ি কামান, মাঝে মাঝে একমুখ বুনো গোঁফ-দাড়ি। কিপ্টে মানুষ, ছাতা কিনে তাকে ট্রামে হারিয়েছেন। তার দাম তুলবার জন্য বেয়াল্লিশ বছর আর ছাতা কেনা হবে না, এই সামান্য হিসেবটা সকলের টপ করে মনে না হলেও এখন আর বুঝতে বাকী নেই। তার মাঝে কিপ্টেদের সহায় যে ভাগ্যদেবী আছেন

তিনি যে আবার মাতালদের হাতে দিয়ে ছাতা ফেরত দেবেন এও ত' জানা কথা।

মোট কথা, ছোট গল্পে যেমন হওয়া উচিত, ঘটনাগুলো সবই আমাদের জীবনেও হ'তে পারত, কিন্তু হয় নি, অথচ হ'তেও পারে। শেষের গল্প ইজিচেয়ারেরও ঐ হাড়জ্বালানি পেটুক বুড়োর সঙ্গে যে কোনদিন পুরীতে না হোক ঝাঝা কি বভিনাথে আমাদের দেখা হবার সম্ভাবনা আছে।

গল্পগুলির পরিণামগুলিও কেমন গড়ে উঠেছে, যেন ঐ রকম না হয়ে উপায় নেই। বাস্তবিক পাতিরাম পালিয়ে গিয়ে এ-আর-পি না হলে তার আর নিষ্কৃতি নেই। হাবুলবাবুর কাবুল যাওয়া ঘটনাপরম্পরায় অবশ্যম্ভাবী। যে বেড়াল তাড়ালেও যায় না, দরকারের সময়ে সে অবশ্য পালায়। আর মিত্তির জ্যাঠার বাড়ীর শয্যা ও দুগ্ধ এ দুইকেই সন্দেহের চক্ষে যে দেখ্‌তে হবে সে ত' জানা কথা।

নিস্প্রয়োজনকে বর্জন করে ছোটগল্প লেখবার অন্তর্দৃষ্টি কামাক্ষীপ্রসাদের আছে বলে তাঁর কাছ থেকে অনেক আশা করছি। আর একটি গুণও আছে। কেবল শব্দের চালাকির উপর নির্ভর করে কোনো ছোটগল্প দাঁড়াতে পারে না, পরিস্থিতি পরিকল্পনা করবার শক্তি থাকা চাই। এই সত্যটুকুও কামাক্ষীপ্রসাদ অল্প বয়সেই আয়ত্ত করেছেন।

—লীলা মজুমদার

গত ২৬শে মার্চ ৮২ বছর বয়সে আর্ল লয়েড জর্জের মৃত্যু হয়েছে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের সঙ্গে লয়েড জর্জের নাম চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে জড়িয়ে থাকবে। গত মহাযুদ্ধে ইংলণ্ডের এক সংকটময় মুহূর্তে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করেন এবং তাঁরই পরিচালনায় ইংলণ্ড শেষ পর্যন্ত জয়ী হতে পেরেছিলো। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারি ম্যাঞ্চেস্টারে তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ছিলেন ওয়েলশ্ দেশের লোক, নাম উইলিয়াম জর্জ।

* * *

'সিলোন স্টেট কাউন্সিল' সিংহল দ্বীপের নাম বদলে 'শ্রীলঙ্কা' নাম দিতে চান। এখনো এ-বিষয়ে মতান্তর চলেছে।

* * *

ব্রিটেনে খাবারের জিনিস কম পড়েছে। শোনা যাচ্ছে কিছুদিনের জন্যে চাল আর দুধ সাধারণের ব্যবহারের জন্যে সেখানে পাওয়া যাবে না। চাল আসতো বর্মা থেকে আর দুধ আমেরিকা থেকে। ১৯৪২ সালের পর বর্মা থেকে চাল রপ্তানি হয়নি। আমেরিকাও বলছে পৃথিবীর মধ্যে ব্রিটেনেই সবচেয়ে বেশি খাদ্য মজুত করে রাখা আছে। সেই মজুত খাদ্যের পরিমাণ ৭০ কোটি টন (এক টন প্রায় ২৭ মণ)। সে-কারণেই আমেরিকা ব্রিটেনকে দুধ আর মাংস পাঠাতে অনিচ্ছুক। এর উত্তরে ব্রিটেনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে একজন মার্কিন সৈন্য একজন বৃটিশ সৈন্যের দ্বিগুণ, চারজন বৃটিশ মজুরের সমান এবং বারজন ফরাসি কিংবা বেলজিয়ান কিংবা ডাচ লোকের উপযুক্ত খাবার খায়। ভাবো একবার !

* * *

বাংলা দেশের উপর দিয়ে একের পর এক দুর্দিন ও দুঃসময়ের ঝড় বয়ে চলেছে। দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী পরপর এসে কোটিকোটি লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেললো। এখন এসেছে কাপড়ের দুর্ভিক্ষ। যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় নিশ্চয়ই দেখেছো কাপড়ের অভাবে কী ভীষণ এক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামে-গ্রামে কোথাও এক টুকরো কাপড় কিনতে পাওয়া যায় না।

নতুন কাপড়ের অভাবে অনেক শুভকাজ আটকে যাচ্ছে। তার চেয়েও মারাত্মক কথা নতুন কাপড়ের অভাবে অনেক মৃতদেহের সৎকার সম্ভব হচ্ছে না। কিছুদিন আগেই আমরা বহু লোককে ডাস্টবিন থেকে পচা খাবার কুড়িয়ে খেতে দেখেছি। এখন শুনছি মৃত ব্যক্তির গায়ের কাপড় অনেক জায়গায় লোকে চুরি করছে। এর পর কী তাই ভাবছি!

* * *

কলকাতায় হকি লিগ শেষ হয়েছে। এবারে লিগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মহামেডান দল। রানার্স-আপ হয়েছে মোহনবাগান। ফুটবলে এমন কোনো প্রতিযোগিতা নেই সগৌরবে মহামেডান দল যা পায়নি। হকিতে কিন্তু তারা এই প্রথম লিগ-চ্যাম্পিয়ন হবার সম্মান পেলো। ইতিপূর্বে আরো দুটি ভারতীয় দল হকি লিগ পেয়েছে—গ্রিয়ার আর মোহনবাগান।

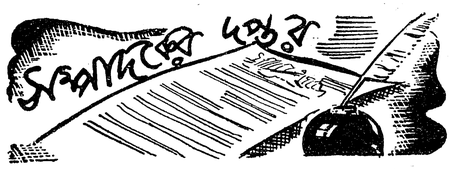

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

আর একটি বছর শেষ হোলো। রংমশাল এবার দশ বছরে পড়লো। এই নতুন বছরের নতুন আলোয় রংমশালের সঙ্গে আবার তোমাদের নতুন করে পরিচয় হোক।

এবারকার রংমশালে দেখবে অনেক নতুন ছবি দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে আরো বেশি ছবি দেবার চেষ্টা আমরা করবো। যারা নতুন গ্রাহক তাদের যাতে কোনো অসুবিধে না হয় সেজন্যে প্রত্যেকটি ক্রমশ উপন্যাসের একটি করে চুম্বক দেওয়া হোলো। সেগুলি পড়লেই আগেকার ঘটনাগুলি জানতে পারবে, কোনো অসুবিধে হবে না।

এবার থেকে 'রংমশাল বৈঠকে' তোমাদের লেখা নিয়মিত ছাপাবার ব্যবস্থা করেছি। তোমরা সবাই লেখা পাঠাবে। ভালো হলে নিশ্চয়ই ছাপানো হবে। একটি লেখা ফেরৎ গেলে যেন ভেবো না আর লেখা ছাপা হবে না। মনে রেখো গোড়াতেই সবাই ভালো লিখতে পারে না। সব জিনিসের মতো লিখতেও শিখতে হয় এবং এই শেখা ব্যাপারটা নেহাৎ সহজ নয়। তোমরা যে লেখাগুলি পাঠাবে সেগুলি সম্বন্ধে দুয়েকটি কথা বলতে চাই। প্রথমত লেখাগুলি ছোটো হওয়া দরকার আর হাসির হলেই ভালো হয়। লক্ষ্য করেছি অনেকেরই করুণ-রসাত্মক লেখার দিকে ঝোঁক বেশি। কিন্তু পাকা লেখক না হলে করুণ-রসের লেখা ভালো হওয়া খুব শক্ত। অনেকের মধ্যেই দেখেছি আর একটি ঝোঁক আছে। সেটি হচ্ছে ঋতুর উপর কবিতা লেখা। গ্রীষ্মে গ্রীষ্মের উপর কবিতা, বর্ষায় বর্ষার উপর কবিতা, ইত্যাদি। সেধরণের লেখায় কোনো প্রাণ থাকে না। অতএব সে-ধরণের লেখা পাঠিও না। শুধু যে গল্প কবিতাই ছাপা হবে তাই নয়, যদি কেউ খুব ভালো চিঠি লিখতে পারো সেই চিঠিও আমরা ছাপাবো। একটি কথা মনে রেখো: এমন কিছুর উপর লিখো না যা তোমরা চোখে দেখোনি কিংবা যার সম্বন্ধে তোমাদের কোনো স্পষ্ট অভিজ্ঞতা নেই। প্রত্যেকেই নিজের মতো দেখে, নিজের মতো করে অনুভব করে। লেখবার সময় এই কথাগুলো মনে রাখলে দেখবে লেখা কত ভালো হয়।

ধাঁধাঁর উত্তরদাতাদের নামও ছাপাবার ব্যবস্থা এবার থেকে করেছি। পত্রিকা পাবার দশদিনের মধ্যেই যারা উত্তর পাঠাবে তাদেরই নাম ছাপা সম্ভব। তিনটির বেশি নাম কেউ পাঠিও না। জায়গা বড় কম।

ধাঁধাঁর উত্তর

মুনকি, টুনকি আর বুলকির বাবা কাশী থেকে তাঁর তিন ছেলের জন্যে চব্বিশটা কৌটো এনেছেন। তাদের মধ্যে আটটা কৌটো নীল আর সেই নীল কৌটোর প্রত্যেকটার মধ্যে পাঁচটা করে চকচকে সিকি; আটটা কৌটো লাল, তাদের প্রত্যেকটার মধ্যে তিনটে করে চকচকে সিকি; আর আটটা কৌটো হলদে, তাদের প্রত্যেকটার মধ্যে একটা করে চকচকে সিকি। মুনকি, টুনকি আর বুলকি প্রত্যেকেই অনেকগুলো করে তিন-রঙা কৌটো পেলো আর মজা এই তারা হিসেব করে দখলো প্রত্যেকেই সমান সংখ্যায় চকচকে সিকি পেয়েছে। তা হ'লে বলতে পারো কি কটা করে লাল, নীল আর হলদে কৌটো তারা প্রত্যেকে পেয়েছিলো?

সোমবার থেকে শনিবার মোট বৃষ্টির পরিমাণ—
রবিবারের বৃষ্টির ৬ গুণ;
তা হ'লে রবিবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত মোট
বৃষ্টির পরিমাণ—$\frac{5}{6}$;
আর সোমবার থেকে শনিবার—রবিবারের বৃষ্টির ৭গুণ;
তা হ'লে রবিবারের বৃষ্টি থেকে শনিবারের বৃষ্টি বাদ দিলে—রবিবারের বৃষ্টি; অতএব শনিবার বৃষ্টি পড়েইনি।

উত্তরদাতাদের নাম: কেউ নির্ভুল উত্তর পাঠাতে পারো নি।

বেঙ্গল সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক লিঃ

—৬ই এ্যাপ্রিল, ১৯৪৫ তারিখে—

মূলধন ও রিজার্ভ ফাণ্ড ইত্যাদি	...	...	৫২,০০,০০০৲ টাকা
ডিপজিট	...	...	৬,৫১,১১,১৫২৲ টাকা
নগদ ও ব্যাঙ্কে	...	...	৯৩,০০,১০০৲ টাকা
সিকিউরিটিসমূহের বাজার দর	...	...	৪,৬৪,০৮,৫৮৬৲ টাকা
			৫,৫৭,০৮,৬৮৬৲ টাকা

ডিপোজিটের শতকরা ৮৫ ভাগের অধিক নগদ টাকার সামিল। সিকিউরিটিসমূহের বাজার দর খাতার দরের চেয়ে ৯,৩০,০০০৲ টাকা বেশী

আমানতের সম্পূর্ণ ও সর্বাপেক্ষা নিরাপদ স্থান

ম্যানেজিং ডিরেক্টর: মিঃ জে. সি. দাশ

ক্যালকাটা কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ।

ডিরেক্টার-বর্গ।

মিঃ জে. সি. মুখার্জ্জি

বার-অ্যাট্-ল—ভূতপূর্ব্ব প্রধান একজিকিউটিভ অফিসার, কলিকাতা কর্পোরেশন। ডিরেক্টার—আসাম-বেঙ্গল সিমেণ্ট কোং। ইত্যাদি

খান বাহাদুর এম. এ. মোমিন সি. আই. ই.

ডিরেক্টার—নিউ এসিয়াটিক ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ, আর্য্যস্থান ইন্সিওরেন্স কোং লিঃ। ইত্যাদি

মিঃ জি. ভি. সোয়াইকা

প্রোঃ—সোয়াইকা অয়েল মিলস্, ম্যানেজিং ডাইরেক্টর—সোয়াইকা কেমিক্যাল এণ্ড মিনারেল কোং লিঃ। সোয়াইকা ফার্টিলাইসর লিঃ, সোয়াইকা ষ্টাণ্ড অয়েল এণ্ড বার্ণিশিং কোং। ইত্যাদি

মিঃ এন্. সি. চন্দ্র

ডিরেক্টার—ন্যাশনাল ষ্টীল কর্পোরেশন লিঃ, বাসন্তী কটন মিলস্ লিঃ, মহালক্ষ্মী কটন মিলস্ লিঃ। ইত্যাদি

মিঃ বি. সি ঘোষ

কণ্ট্রোলার—হিন্দুস্থান কোঃ অপারেটিভ ইন্সিওরেন্স সোসাইটি লিঃ।

মিঃ ডি. এল. দত্ত

পার্টনার এ্যাঙ্গাস কীথ এণ্ড কোং।

মিঃ এস. দত্ত—(ম্যানেজিং ডাইরেক্টর)

ডিরেক্টার—এইচ দত্ত এণ্ড সন্স লিঃ, রামদুর্ল্লভপুর টি কোং লিঃ, ইণ্ডিয়া কলেক্টীভ ফার্ম। ইত্যাদি

আদায়ী মূলধন	১১,৪০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
গচ্ছিত আমানত	১,১০,০০০ টাকার উর্দ্ধে
কার্য্যকরী মূলধন	১,৫০,০০,০০০ টাকার উর্দ্ধে

জেনারেল ম্যানেজার—**জে. এন্. সেন,** বি. এ., এফ. আর. এস. (লণ্ডন)

[দশম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

লড়াই থামার পদ্য

বিমলচন্দ্র ঘোষ

সত্যি এবার থামলো লড়াই
থামলো হিটুর 'ভিটু' (V2)-র বড়াই,
আমরা চিবুই কাঁকর-কড়াই,
চিবোয় বোমা নিপ্পন !
জ্বললো আলো কলকাতাতে
কাগজ বিনা শালপাতাতে
পদ্য লিখি কল্পনাতে
কর্তারা যে কিপ্পন !

স্টালিন চাচা গুম্ফ পাকায়
ট্রুমান সাহেব মোটর হাঁকায়
চ্যি-গল-চিয়াং ওষ্ঠ বাঁকায়
চুরুট ফোঁকে চার্চিল,
লাট-বেলাটের প্রসাদচূড়ায়
যুদ্ধজয়ের নিশান উড়ায়
নতুন 'এপিক' লিখবে কে হায়
নেইকো হোমর ভার্জিল।

নেই বাজারে কাপড়-জামা
মিথ্যে হলো যুদ্ধ-থামা
ব্যাবসা করে বাঘের মামা
চোরকুটুরির গর্তে,
বিশগুণদাম দেয় যদি কেউ
নগরপালের লাগবে না ফেউ
চোরাই-নদীর যায় খেলে ঢেউ
নগদদামের সর্তে।

থামলো লড়াই পশ্চিমেতে
নানান জাতি উঠলো মেতে
বাঁধন ছিঁড়ে সভ্য হ'তে
বিশ্ব-বীরের সঙ্ঘে !
শেকলবাঁধা রুগ্ন পায়ে
আমরা প্রভুর পক্ষছায়ে
সামলে চলি ডাইনে-বাঁয়ে
আইনমানার সঙ্গে।

যুদ্ধজয়ের নতুন আলোয়
মিশিয়ে নানান মন্দে ভালোয়
মিলন হবে শাদায়-কালোয়
ব্যবসাদারীর সূত্রে ?

তেল চুকচুক তেলা-মাথার
বাড়বে কদর ব্যাঙ্কে খাতার
ধনিক পাবে লক্ষ্মীমাতার
সঙ্গে ধনে পুত্রে।

দিনমজুরীর পাষাণভারে
ধুঁকছে যারা অন্ধকারে
খেতখামারে অর্ধাহারে
কারখানাতে পচছে!
কে চায় তাদের মুখের পানে?
কী সান্ত্বনা তা'দের প্রাণে?
পদ্য-লেখার হয়না মানে
মনটা কেমন কচ্ছে!

পদীপিসির বর্মি বাক্স

লীলা মজুমদার

এই ত' সুবর্ণ সুযোগ সেই গোপন চিঠি পড়বার। পকেট থেকে তা'কে বের করে দেখলাম লাল কালীতে লেখা—শ্রীযুতবাবু বিপিনবিহারী চৌধুরীর কাছ হইতে ২০০৲ টাকা পাইলাম। স্বাঃ নিধিরাম শর্মা। পুঃ, সব অনুসন্ধানাদি গোপন থাকিবেক।

অবাক হয়ে ভাবছি সেজ-দাদামশাই কী উদ্দেশ্যে চিমড়েকে টাকা দিলেন; কী অনুসন্ধান? এ বিষম সন্দেহজনক! এমন সময় দরজা খুলে পাঁচুমামা ঝড়ের মতন ঘরে ঢুকেই দুম্ ক'রে দরজা বন্ধ ক'রে তা'কে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে বোয়ালমাছের মতন হাঁপাতে লাগল। মুখটা দেখলাম আগের চাইতেও সাদা, কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে, চুল উস্কোখুস্কো।

চিঠিটা পকেটে গুঁজে লাফিয়ে খাট থেকে নেমে বল্লাম, "কী হয়েছে পাঁচুমামা? আবার জোলাপ খেয়েছ?"

পাঁচুমামা শুকনো ঠোঁট আরও শুকনো জিভ দিয়ে চাটতে চেষ্টা ক'রে বল্ল, "খেন্তিপিসি এসেছে!"

আমি বল্লাম, "খেন্তিপিসিটা আবার কে?"

পাঁচুমামা আমসি হেন মুখটি ক'রে বল্ল, "পদীপিসি দিসেকেণ্ড!"

চিঠিটা পাঁচুমামার নাকের সামে নেড়ে বল্লাম, "ওসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে বৃথা সময় নষ্ট ক'র না পাঁচুমামা! স্বয়ং সেজ-দাদামশাই এতে ভীষণভাবে জড়িত আছেন এই দেখ তার প্রমাণ! পাঁচুমামা চোখ গোলগোল ক'রে চিঠিটা সবে পড়তে যাবে এমন সময় প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে দরজা গেলো খুলে আর সত্যি বলছি অবিকল আমার সেই স্বপ্নে দেখা পদীপিসির মতন কে একজন তোলোহাঁড়ির মতন মুখ করে ভিতরে এলেন। বুঝলাম, ঐ খেন্তিপিসি। পাঁচুমামা দরজার ঠেলা খেয়ে ছিটকে আমার খাটের উপর পড়েছিলো, সেখান থেকে সরু গলায় চেঁচিয়ে বল্ল, "কী করতে পার আমার তুমি? এমন কোনও স্ত্রীলোক জন্মায় নি যা'কে আমি ভয় পাই! জান আমার বুকের মধ্যে সিংহ—" এইটুকু বলতেই খেন্তিপিসি কোমরে কাপড় জড়িয়ে খাটের দিকে এক পা এগুলেন আর পাঁচুমামাও অন্যদিক দিয়ে টুপ্ করে নেমে খাটের তলার অগন্তি হাঁড়ি-কলসির মধ্যে সেঁদিয়ে গেলো।

খেন্তিপিসি তখন আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে আপাদমস্তক আমাকে কাঠফাটা দৃষ্টি ক'রে দেখতে লাগলেন, আর আমার হাত এমনি কাঁপতে লাগলো যে চিঠিটা খড়মড় খড়মড় ক'রে উঠলো। তাই শুনে খেন্তিপিসি এমনি চমকালেন যেন বন্দুকের গুলি শুনেছেন। কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সে-কথা উচ্চারণ করবার আগেই সেজ-দাদামশাই হন্তদন্ত হ'য়ে ঘরে ঢুকলেন।

খেন্তিপিসিকে দেখে একটু যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে বল্লেন, "আ খেন্তি, তুই আবার এখানে কেন?"

খেন্তিপিসি চায়না-ক্যাণ্ডেলপাওয়ারের চোখদুটো আমার ওপর থেকে সরিয়ে বরফের মতন ঠাণ্ডা গলায় বল্লেন, "কেন, তোমার কি তাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে? পূজোর সময় একটা কাঁচকলাও দিলে না, আমার ভজাকে যে কাপড় দিলে সেও অতি খেলো সস্তা রাবিস্। বাপের বাড়ি থেকে কলাটা-মূলোটা দূরে থাকুক কচুটারও মুখ দেখি না। তাই বলে বৌদির ঘরের কোণায়ও একটু জায়গা হবে না?"

পাঁচুমামা এখানে দুটো হাঁড়ির মাঝখান দিয়ে মুণ্ডু বের ক'রে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে বল্ল, "জায়গা হ'বে কি না হ'বে তাতে ত' তোমার ভারী বয়ে গেলো! এই ভর-সকালে আমার ঘরেই বা তোমার কত জায়গা——" বলেই কচ্ছপের মুণ্ডুর মতন সুট করে আবার অদৃশ্য হয়ে গেলো!

সেজ-দাদামশাই এবার গলা পরিষ্কার ক'রে পাঁচুমামাকে তাড়া দিয়ে বল্লেন, "এই পাঁচু হতভাগা, বেরিয়ে আয় বলছি। আমার একটা ইম্পর্ট্যাণ্ট কাগজ হারিয়েছে, খুঁজে দে বলছি, নইলে ভালো হবে না!"

সঙ্গে সঙ্গে খেন্তিপিসিও বল্লেন, "বেরো এক্ষুণি। তুই-ই নিশ্চয় আমার সুটকেশ থেকে বাড়ির নক্সাটা সরিয়েছিস। বেরো বলছি। তোকে আমি সার্চ করবই করব। না বেরোলে ঐ খাটের তলায় সেঁদিয়েই সার্চ করব! আমি জানি না তোদের সব চালাকি!! পদী-পিসির বাক্সর জন্য তোরাও ছোঁক-ছোঁক ক'রে বেড়াচ্ছিস! অথচ বাক্সতে আর কারুর অধিকার নেই। ওটা স্ত্রী-ধন, ওটা আমি পাব!"

সেজ-দাদামশাই রেগে বল্লেন, "তুই পাবি মানে? তোর ভজার পেটে যাবে বল্!! আমি আইন পাশ করছি তা জানিস, কেউ যদি পায় ত আমি পাব! জানিস আমি দুশ' টাকা খরচ ক'রে ডিটেক্টিভ লাগিয়েছি। ও বাক্স আমি বের করবই!"

এইবার দরজার কাছ থেকে একটা নরম কাশির শব্দ শোনা গেলো। দেখলাম চিমড়ে ভদ্রলোক সেখানে কালো আলস্টার প'রে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছেন। বিড়িটা এবার বের করে বল্লেন, "মনে থাকে যেন তিন ভাগের এক ভাগ আমার! যদি বাক্স পান আমার অদ্ভুত বুদ্ধির সাহায্যেই পাবেন!"

খেন্তিপিসি হঠাৎ আবিষ্কার করলেন খাটের তলা থেকে পাঁচুমামার ঠ্যাং দুটো অসাবধানতাবশত একটুখানি বেরিয়ে রয়েছে। আর যায় কোথা, নিমেষের মধ্যে হিড়হিড় করে টেনে পাঁচুমামাকে বের করে এনে, দুই চাপড় লাগালেন, তারপর বুকপকেট থেকে একটা মোটামতন কাগজ টেনে বের ক'রে বল্লেন, "তবে না নক্সা নিস্ নি!"

তারপর কাগজটা খুলে বল্লেন, "ঈশ্, দেখেছ সেজদা, ব্যাটাছেলে সংস্কৃতে উনিশ পেয়েছে!"

সেজ-দাদামশাইও অমনি বললেন, "কই দেখি দেখি!"

চিমড়ে ভদ্রলোকও এগিয়ে বল্লেন, "মানুষ হওয়াই একরকম অসম্ভব!"

পাঁচুমামা তখন একদৌড়ে আবার খাটের তলায় ঢুকলো এবং এবার পা গুটিয়ে সাবধানে ব'সে বল্ল, "আমার কলেজের পরীক্ষার রিপোর্ট দিয়ে তোমাদের কী দরকার শুনি? বিশেষত খেন্তিপিসির মতন একজন অকাট মুখ্যু স্ত্রীলোকের! নক্সা হারিয়েছে! দরকারী কাগজ হারিয়েছে! তাই আমার ওপর হাম্লা! আর ঐ ইজের-পরা ছোকরার হাতে যে কাগজটা আছে সেটা কী?"

পাঁচুমামার কাছে আমি এমন বিশ্বাসঘাতকতা আশা করিনি! কিন্তু তখন দেখলাম আপত্তিটাপত্তি করবার সময় নেই। দেখলাম খেন্তিপিসি, সেজ-দাদামশাই আর চিমড়ে ভদ্রলোক নিজেদের ঝগড়া ভুলে, পাঁচুমামার সংস্কৃতের নম্বর ভুলে, গোল হ'য়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন! শুনতে পেলাম ফোঁসফোঁস ক'রে ওঁদের ঘনঘন নিশ্বাস পড়ছে! বুঝলাম বিপদ সন্নিকট!

হঠাৎ "ও দিদিমা" বলে চেঁচিয়ে ধাঁ ক'রে আমার পেছনের দরজা দিয়ে বারান্দায় উপস্থিত হ'লাম। বুঝলাম দেয়ালে সিঁড়ির খাঁজকাটার কাজ শেষ হয়নি! নিমেষের

মধ্যে খাঁজের মধ্যে মধ্যে পায়ের বুড়ো আঙুল গুঁজে গুঁজে একেবারে ছাদে উপস্থিত হ'লাম! এবার আমি নিরাপদ, যদিও আমি এখন অবধি চা পাইনি তবু আমি নিরাপদ! আমি ছাদে শুয়ে খুব খানিকটা হাপরের মতন হাঁপিয়ে নিলাম। আমি জানি ওদের কারু সাধ্যি নেই ওপরে ওঠে!

আস্তে-আস্তে রোদ এসে ছাতটাকে ভরে দিল। আমার পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে দিয়ে ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে হাওয়া বইতে লাগলো। দেখলাম ছাতে রাশিরাশি শুকনো পাতা জমেছে কত বছর ধ'রে কে বা জানে। শুনলাম কত কত পায়রা বুক ফুলিয়ে বক্‌বকম্ করছে। দেখলাম বাড়ির সামের দিকে গম্বুজের মতন করা, তাতে খোপ খোপ আছে, পায়রারা তার মধ্যে থেকে যাওয়া আসা করছে। চারিদিকে একটা পায়রা-পায়রা গন্ধ।

ক্ষিদে যে পায়নি তা নয়। তবু যেই মনে হ'ল নীচে সব ওৎ পেতে বসে আছে, নেমেছি কি খপাং করে ধরবে, অমনি আর আমার নামবার ইচ্ছে রইল না। দরকার হ'লে ছাতে শুধু দিনটা কেন রাতটাও কাটাব স্থির করলাম।

কিছু করবার নেই, কিছু দেখবার নেই। চারদিকে পাঁচিল, উপরে আকাশ আর ক' শ' পায়রা কে জানে!

শুনতে পাচ্ছিলাম ওরা নানান্ সুরে কখনও রেগে চেঁচিয়ে, কখনও নরম সুরে ফুসলিয়ে, আমাকে ডাকছে।

আমি সে ডাকের কাছ থেকে যতদূরে পারি সরে গিয়ে একেবারে খোপওয়ালা গম্বুজের পাশে এসে দাঁড়ালাম। যেন পায়রাদের রাজ্যে এসেছি। খোপের ভেতর থেকে দেখলাম কচিকচি লালমুখো আমাকে অবাক হয়ে দেখছে, আর তাদের মারা চ্যাচ্যা লাগিয়ে দিয়েছে। সারিসারি খোপে শতশত পায়রার বাসা। চারিদিকে পায়রার পালক, পায়ের নীচে পায়রার পালকের নরম গালচে তৈরি হয়েছে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সব খোপে পায়রার বাসা এক কোণে দুটো খোপ ছাড়া।

(আগামীবারে সমাপ্য)

গোঁফ নিয়ে টানাটানি!

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

আমাদের লক্ষ্মণকে বাঙালীর দুর্লক্ষণ বলাই নাকি উচিত, কর্পোরেশনের বড়-মেজ-সেজ কর্ত্তাদের মতে। কিন্তু, তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি! কর্পোরেশনের সামান্য বেয়ারা হলে কি হবে, নিজের শক্তিতেই লক্ষ্মণ নিজের সেই জয়ধ্বজা বহন করে—তার নিজস্ব সেই গোঁফ!

গোঁফ তো আধুনিকতার চিহ্ন নয় তবু কেন লক্ষ্মণ এমন গোঁফ রাখে? একথা অনেকে ভেবেচে, বেশির ভাগ তার সহযোগী বেয়ারাদের মধ্যেই—তবে সেদিন হঠাৎ সেই কথাটা একজন বাবুর ভাবনার কারণ হয়ে পড়ল।

বাবুটি টানা বারান্দা দিয়ে যাচ্ছিলেন, সাপের মতো কি যেন একটা দেখে হঠাৎ তিনি চমকে উঠলেন।

"এই, এদিকে এসো। দেখিতো, মুখখানা দেখি একবার! একি! এ কী দেখছি?"

"আজ্ঞে, কী দেখচেন?" নিরীহ সুরে জিজ্ঞেস করেছে লক্ষ্মণ।

"গোঁফ? গোঁফ দেখি যে?"

লক্ষ্মণ লজ্জায় গুম্ফাবনত হয়ে রইলো, কিছু বল্ল না। একবার মনে হোলো যে বলে আজ্ঞে, ঠিকই দেখচেন, কোনো ভুল নেই, কিন্তু কথাটা বলা বাহুল্য বলে' তার বোধ হতে লাগল।

"শোনো! বেয়ারার চাকরি নিয়ে এমন গোঁফ রাখা উচিত নয়। কাল যেন ফের তোমাকে—মানে তোমার এই গোঁফকে আর না দেখতে হয়। মনে রেখো।"

যে গোঁফ আজকাল বাবুদের মুখেই বেমানান, বেহারার মধ্যে তার ঔদ্ধত্য একটু বেয়াড়া দৃশ্যই বই কি! নিছক আস্পর্দ্ধা বলেই বাবুটির জ্ঞান হতে থাকে।

কিন্তু পর দিবসেও আবার সেই গোঁফ দেখা গেল। "একি, আজো দেখচি তেমনি আছে—যথাস্থানে! কাল কী বল্লাম তোমায়?" বাবুটি এবার রীতিমত সর্পদষ্ট।

লক্ষ্মণ কী জবাব দেবে? সযত্ন-বর্দ্ধিত এই গোঁফটিকে মানুষ করে' তুলতে, মানুষের মতো করতে তার কতদিন কত মাস লেগেছে, এই কথা সে কী করে' জানাবে—সে ভাষা কি তার আছে?

"তোমাকে বল্লাম না ওটা লোপাট করে' আসতে? ...তুমি কোন ডিপার্টমেণ্টের বেয়ারা?"

লক্ষ্মণ তার ডিপার্টমেণ্ট জানালো।

"আচ্ছা, আমি দেখছি। এর কোনো প্রতিকার হয় কিনা দেখছি আমি।"

বাবুটি সেই ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুর কাছে গেলেন। —"দেখেচেন মশাই, আপনার বেয়ারার হিটলারি ছাঁটের গোঁফ দেখেচেন? আমি তো বারো বচ্ছর ধরে' কর্পোরেশনের কাউন্সিলারি করছি, কতো মেয়র, ডেপুটি-মেয়রই দেখলাম, কিন্তু আমার জীবনে এরূপ বেয়াড়াপনা দেখিনি।"

না, বড়বাবুও দেখেননি। কাজকর্ম্মের ঠেলায় অবসরের এতই অভাব যে সর্ব্বদা সব দ্রষ্টব্য জিনিস দেখা তাঁর হয়ে ওঠে না। "আচ্ছা, দেখব। দেখব বই কি।" তিনি আশ্বাস দিলেন কাউন্সিলারটিকে। "আপনি যখন বলছেন তখন দেখব না?"

"হ্যাঁ, দেখবেন। ভালো করে' দেখবেন। দেখলে চমৎকৃত হবেন একথা আমি হলপ করে' বলতে পারি।"

বাবুটি চলে গেলে বড়বাবু বেয়ারাকে হাঁক দিলেন। "কই দেখি গোঁফ"—একথা আর তাঁকে বলতে হোলো না, বেয়ারার সাথেসাথে আপনা থেকেই সেই গোঁফ দেখা দিল।

বড়বাবু একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন—সহসা তাঁর কথা সরল না। জেগে যেন তিনি দুস্বপ্ন দেখছিলেন—সামনে এবং স্বচক্ষে। কিছু না বলে' তিনি গুম হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ—ঝড়ের আগে ঠিক যেরকম গুমোট দেখা দেয়। তারপর তিনি ফেটে পড়লেন—ঝঞ্ঝাবাতে।

"কে তোমাকে গোঁফ রাখতে বলেছে?"

"আজ্ঞে, কেউ বলেনি।" লক্ষ্মণ আমতা-আমতা করে।

"তবে? তবে কেন রেখেচ?"

এ কথার কি উত্তর আছে? যাকে রাখো সেই রাখে, একথা নিশ্চয় এই কথার উত্তর নয়। অতএব, লক্ষ্মণের বিবেচনায়, চুপ করে' থাকাই ভালো। 'সব্ সে চুপ্ ভালা।' 'বোবার কোনো শত্রু নেই।'—ইত্যাদি বড়-বড় কথা স্মরণ করে' সে চুপ করে রইলো।

"আজই ওকে বিদেয় করে দেবে। ছুটির পর নাপিত ডাকিয়ে—বুঝেচ?"

এই বলে' বড়বাবু তাঁর সম্মুখ থেকে সেই অসহ্যতা বিদায় করে' দিলেন।

গোঁফ নিয়ে তো ভারী মুস্কিল হোলো—সমস্যায় পড়ে গেল লক্ষ্মণ। এই গোঁফের জন্য নিজেকে সে গরীয়ান্ মনে করত। আর সব বেয়ারাদের থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র, শ্রেষ্ঠ এবং স্বগোঁফধন্য জ্ঞান করত। সেই গোঁফ নিয়ে আজ একি টানাটানি! প্রাণ দেয়া সহজ কিন্তু গোঁফ দেয়া কি এতই সোজা? একটু চোখ বুজে চললেই মিলিটরি লরির তলায় নিজেকে ফেলা যায়—কিন্তু সজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করে' নাপিতের ক্ষুরের তলায় প্রাণের চেয়ে প্রিয় নিজের এই গোঁফকে বিসর্জ্জন দেয়া—নাঃ, এ তার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব না।

অতএব তারপরদিনেও তাকে গোঁফ নিয়ে হাজির হতে দেখা গেল।

বড়বাবু চেয়ারে বসে প্রথমেই ডাক দিলেন বেয়ারাকে।

আজকের সর্ব্বপ্রথম কাজ তাঁর মনে পড়ল বসতে না বসতেই। লক্ষ্মণ এল তার গোঁফ মুখে করে'—লক্ষ্মণ এবং তার গোঁফ—দুজনের কেউ গরহাজির নয়, দেখা গেল।

দেখলেন, কিন্তু কিছু বল্লেন না। "তোমার নামে আমি ওপরে রিপোর্ট করব।" শুধু এই কথা বল্লেন। আর বল্লেন—"ওই গোঁফ নিয়ে কদাচ আমার সামনে আসবে না। আমার ত্রিসীমানায় তুমি থেকোনা—এক্ষুণি দূর হও।"

লক্ষ্মণ দূরে-দূরেই রইলো—গোঁফ বাঁচিয়ে। পরের দিন, বড়বাবুর রিপোর্টের ফলে এক নম্বর ডেপুটি-চীফের সামনে তাকে দাঁড়াতে হোলো গিয়ে।

তিনি কিছুক্ষণ তাক্ করে থেকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোমার নাকের তলায় জঙ্গলের মতো ওটা কী? কিসের ঝোপ?"

"আজ্ঞে হুজুর, ঝোপ নয়, আমার গোঁফ।" বল্ল লক্ষ্মণ। কর্ত্তার এহেন কথায় সে হৃদয়ে আঘাত পেয়েছিল—তার গোঁফ অবধি বিচলিত হয়ে উঠেছিল। তার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ নেই, বিশ্বাস টলে গেছে। তবু সে মিনতিভরা মৌন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো কর্ত্তার মুখে।

কর্ত্তা কিন্তু আবার আক্রমণ করলেন—"গোঁফ হোক আর যাই হোক, ওকে তাড়াতে হবে। ওতে আমাদের কোনো কাজ নেই। তোমাকেই এখানে দরকার—তোমার গোঁফকে নয়।"

এ কেমন কথা? এতদিনের লালিত পালিত—এমন আদরের জিনিস—এক কথায় বিদায় করে' দেয়া? একটা বেড়াল পুষলেও লোকের মায়া হয়, আর এতো নিজের গোঁফ! লক্ষ্মণ মনেমনে উদ্বেলিত হতে থাকে।

"আগুন লাগিয়ে হোক, কোদাল চালিয়ে হোক, যা করে হোক ওই জঙ্গল সাফ করে ফেলা চাই। ছাগলে খায় কি? তাহলে ছাগলকে দিয়েও মুড়িয়ে নিতে পারো—মোটের ওপর, ওই বদ্‌খেয়াল ওখানে রাখা চলবেনা—বুঝেচ? যাও।" কর্ত্তার পরিষ্কার উপদেশ। পরিষ্কার করার হুকুম।

ছাগলের সঙ্গে এক নিশ্বাসে গোঁফের নামোল্লেখে লক্ষ্মণের মনে ব্যথা লেগেছিল। ছাগলে কী না খায়, গোঁফও হয়ত তার অখাদ্য না হতে পারে—কিন্তু কথাটা বলা পাগলের মত বলৎশক্তির পরিচয় নয় কি? গোঁফ ভেদ করে দীর্ঘনিশ্বাস পড়ল লক্ষ্মণের।

পরদিন ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবুকে আবার রিপোর্ট করতে হোলো ডেপুটি-চীফের কাছে। গিয়ে নিজ-মুখে তিনি প্রকাশ করলেন, "আজ্ঞে সার—এখনো।"

"এখনো—কী? কী এখনো?" তাঁর বুঝতে একটু দেরিই হয়।

"এখনো হিট্‌লার সেজে বসে আছে। সেই—সেই বাঁদরটা।"

"তা, তা আমি আর কী করতে পারি? গোঁফ—গোঁফ তো ওপ্‌ড়ানো যায় না? দাড়ির মতো তা যায় কি?"

"হ্যাঁ, যায় সার।...যদিও কখনো কাউকে ওপড়াতে দেখিনি, তবু মনে হয়, ওকাজ একেবারে অসাধ্য নয়।"

"না হোক। কিন্তু আমার কর্ম্ম না। আমার কর্ত্তব্যের মধ্যেও নয়। আমি সিনিয়র ডেপুটির কাছে রিপোর্ট দিচ্ছি—ওপড়াতে হয় যা করতে হয় তিনিই করবেন। কারো গোঁফে হস্তক্ষেপ করতে আমি ভালোবাসিনে। পরের গোঁফে পোদ্দারি করায় আমার উৎসাহ নেই, বয়সও নেই।"

এদিকে সেই কাউন্সিলারটিও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে' থাকবার ছেলে নন। পরের দিন ফের কি কাজে তিনি এসেছিলেন। গোঁফ দেখাটাই কাজ ছিল কি না কে জানে! কিন্তু গোঁফ দেখে তো তিনি আগুন হয়ে উঠলেন!

"একি!—এখনো—এখনো দেখচি যে? য়্যাঁ?"

"আজ্ঞে, যদি কিছু না মনে করেন একটা কথা জিজ্ঞেস করি," লক্ষ্মণ খুব কাচুমাচু হয়ে বল্ল, "বেচারীর দোষটা কোথায় দেখলেন, বলবেন একবার? এ কি কারো কোনো ক্ষতি করেছে?"

এই প্রশ্নের উত্তর আর ওকে না দিয়ে সটাং তিনি চলে গেলেন ডেপুটির কাছে। সমস্ত শুনে তিনি বল্লেন, "শুনে সুখী হবেন ইতিমধ্যেই ওকে আমি সিনিয়র ডেপুটির দায়রায় সোপর্দ্দ করে দিয়েছি। তিনি ভারী কড়া লোক, একবার কোনো কাজে হাত দিলে হেস্তনেস্ত না করে ছাড়েন না। গোঁফের বেলাও নিশ্চয় তার অন্যথা হবে না।"

শুনে সুখী হয়ে এবং নিশ্চিন্ত হয়ে কাউন্সিলারবাবু বাড়ি গেলেন।

পরের দিনও সগোঁফ লক্ষ্মণকে দেখা গেল। ওর সহযোগী বেয়ারারা একদৃষ্টে দেখল তাকিয়ে। এতদিন যারা ওর গোঁফ বা ওকে লক্ষ্য করেনি তারাও আজ ভালো করে ওকে দেখে নিল। সারা কর্পোরেশনের চোপদার থেকে কেরানী থেকে সুরু করে ভিন্নভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের কর্ত্তা অবধি কারো দেখার বাকী থাকল না। এমন কি, সেদিন যারা ভুলক্রমে ট্যাকসো জমা দিতে এসেছিল তারাও খবরটা শুনে গুম্ফদর্শনের পুণ্য অর্জ্জন করে' ধন্য হয়ে চলে গেল।

নিজেও দেখল লক্ষ্মণ। ফাঁক পেলেই পকেট থেকে ছোট্ট একটি আয়না বার করে নিজেও সে বারবার দেখছিল। দেখছিল আর তার চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছিল। আহা, এমন জিনিস আর হয় না! মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে সস্নেহে সে গোঁফের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল—ক্ষণে ক্ষণে।

"না! কক্ষণো না। জীবন থাকতে তোমাকে আমার কাছছাড়া হতে দেব না।" লক্ষ্মণ নিজের গোঁফকে সম্বোধন করে বল্ল, "কে তোমাকে আমার মুখ থেকে কাড়ে দেখি? পৃথিবীতে এমন কোনো শক্তি নেই যে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পারে। যতদিন চন্দ্র-সূর্য্য থাক্‌বে ততদিন তুমিও আছো আমিও আছি।"

এইরূপ ঘোরতর-প্রতিজ্ঞা করে গোঁফের সঙ্গে হরিহরাত্মা লক্ষ্মণ সিনিয়র ডেপুটির ঘরে এত্তেলা দিতে গেল।

তার ডিপার্টমেণ্টের বড়বাবু সেখানে দাঁড়িয়ে। তার যাওয়া মাত্র বড়বাবু কর্ত্তার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, "ওই দেখুন! এতবার বলা হয়েছে, এত করে' বলা হয়েছে—তবু কিছুতে ছাড়চে না। কামাচ্ছেও না, কমাচ্ছেও না।"

"কমাচ্ছে না?...ও! কামাচ্ছে না। বুঝেছি।"

"সমস্ত আদেশ অমান্য করেছে, উপদেশ উপেক্ষা করেছে, কারো কথাতেই কোনো কর্ণপাত করছে না। এমন কি স্বয়ং—"

"কেন হে, গোঁফ কামাচ্ছো না কেন?" সিনিয়র ডেপুটি শর্ক্ত হয়ে বল্লেন, "বাজারে নাপিত পাচ্ছ না নাকি?"

"হুজুর মা-বাপ। আপনি সব করতে পারেন। দয়া করে আমাকে গোঁফে মারবেন না, যদি মারতেই চান একেবারে প্রাণে মারুন।" লক্ষ্মণ কাঁদকাঁদ হয়ে পড়ল, "এই গোঁফ গেলে আমার আর কী থাক্‌বে? কী নিয়ে আমি বেঁচে থাকব তাহলে?"

"রাখতে পারো তোমার গোঁফ।" চোখের জল দেখে একটু সদয় হয়ে তিনি বল্লেন, "কিন্তু ঐ ভাবে রাখা চলবেনা। ঐ একটুখানি গোঁফ অসহ্য। রাখতে হলে ভালো করেই রাখো। সারা মুখময় ওদের গজাতে দাও—চাপচাপ হয়ে—যেমন ঘাস গজায়। মুসলমান আর্দ্দালিরা কিম্বা শিখরা যেমন রাখে।"

"তাহলে ওর আর থাকল কী হুজুর? ওকে তো তখন আর আলাদা করে চেনা যাবে না? সে থাকা না-থাকা সমান।"

"সে হয় না।...আপনি ওকে বোঝান।" বড়বাবুটির ঘাড়ে বেয়ারাকে ভালো করে' বোঝানোর ভার চাপিয়ে ডেপুটি-চীফ আসল-চীফের ঘরে কাজ নিয়ে গেলেন।

আবার নতুন করে বোঝাপড়া সুরু হোলো—বড়বাবু কত করে বলেন—বাপু বাছা করেন—মিনতি করেন—ভয় দেখান—অবশেষে তার গোঁফ জোড়া ভিক্ষা চান—হাত জোড় করতেও বাকী রাখেন না—কিন্তু লক্ষ্মণ অবুঝ। তার অতো সাধের গোঁফে কী করে সে সাবান মাখাবে, ক্ষুর লাগাবে—কোন প্রাণে কোপ বসাবে, ভাবতেই সে বারম্বার শিউরাতে লাগল।

সিনিয়র ডিপুটি ফিরতেই বড়বাবু বল্লেন—"ও কিছুতেই শুনছে না সার, কী করব!"

"শুনবে না আমি জানি। কিছু করতে হবে না। আমি চীফের কাছে রিপোর্ট করে দিয়েছি, যা করবার তিনিই করবেন।" বল্লেন সিনিয়ার ডেপুটি। তাঁর কর্ত্তৃত্ব এখানে নিস্ফল, তিনি বুঝেছিলেন। লক্ষ্মণ আরেক দিনের জন্য রেহাই পেল। সেদিন সারাক্ষণ সে আয়নার দিকে তাকিয়ে রইল। মুহুর্মুহু নিজের গোঁফসুধা পান করতে লাগল। রাত্রে স্বপ্ন দেখল কেবল গোঁফের।—

গুম্ফবতী রাজকন্যার দেশে গিয়ে স্রেফ নিজের গোঁফে চাড়া দিয়ে তাকে রাজ্যছাড়া করে আনবার সুখ-স্বপ্ন!···

পরদিন তাকে চীফের কাছে হাজিরা দিতে হোলো।

চীফ লক্ষ্মণের বিদ্রোহ-ঘোষণার কথা শুনেছিলেন— হাতের কাগজপত্র থেকে মুখ তুলে তীব্র তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাতে একবার তিনি তাকে দেখলেন। আপাদগুম্ফ তাকালেন— চকিতের জন্যই। তারপরে হুকুমের স্বরে বল্লেন—"গোঁফ উড়িয়ে দেবে।" আর কিছু তিনি বল্লেন না। এক কথাতেই যেন ঐ কথার নিষ্পত্তি হয়ে গেল—তাঁর হুকুমই চূড়ান্ত—অনেকটা এইরূপ ভাব দেখিয়ে ফের আবার নিজের কাগজপত্রে তিনি মনোযোগ দিলেন।

লক্ষ্মণের বুক কাঁপল কিন্তু গোঁফ কাঁপল না। সে এখন মরীয়া। ফাঁসিকাষ্ঠের সামনে এসে মানুষ যেমন মরীয়া হয়। দুর্গা বলে' একেবারে ঝুলে পড়ে যেমন! চাকরি যায় যাক, কিন্তু গোঁফ তার যাবে না।

লক্ষ্মণ পরদিনও গোঁফ বজায় রেখেছে, চীফের কানে গেল। তিনি সোজা মেয়রের কাছে রিপোর্ট করে দিলেন। মেয়র ডেকে পাঠালেন লক্ষ্মণকে।

মেয়রেরও গোঁফ আছে দেখে ভরসা এবং সাহস পেয়ে লক্ষ্মণ তাঁর পায়ের ওপর কেঁদে পড়ল, "প্রভু! প্রাণের দায়ে টাকা কামাতে এসেছি, গরীবকে গোঁফ কামাতে আজ্ঞা করবেন না।—আপনার নিজের গোঁফ আছে, নিজের গোঁফ নিয়ে আপনি ঘর করেন আপনি গোঁফের দরদ বুঝবেন—আপনার কাছে যেমন আপনার গোঁফ—আমার কাছে তেমনি—"

মেয়র বল্লেন—"গোঁফ কামাতে হবে কে তোমায় বলেছে? কর্পোরেশনের কোনো আইনে একথা নেই তো। ছোটই হোক আর বড়ই হোক এখানের কোনো কর্ম্মচারীর গোঁফ নিষিদ্ধ নয়। তুমি নির্ভয়ে তোমার গোঁফ রাখো। তবে যদি সেই কাউন্সিলারটি এরপর গোঁফের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আনেন এবং সে প্রস্তাব কর্পোরেশনের সভায় অধিকাংশ সদস্যের ভোটের জোরে পাশ হয়ে যায়, তখন—তখন তোমার গোঁফ ছাড়া কিম্বা চাকরি ছাড়ার কথা। এখন কী?" এই বলে নিজের গোঁফ চুমরে আরো তিনি বল্লেন—"আর তেমন প্রস্তাব এলেই আমিই কি তা উঠতে দেব মনে করো? প্রথমেই আউট-অব-অর্ডার করে দেব। কেবল তোমার খাতিরেই নয়, আমার নিজের গোঁফ বলেও তো একটা কিছু আছে! তার দিকে তাকিয়েই আমাকে তা করতে হবে। অতএব যাও, গোঁফ নিয়ে নির্ভয়ে নিজের কাজ করো গে। তোমার কোনো ভাবনা নেই।"

ভারতবর্ষের উত্তরে যেমন পাহাড়ে গোঁফের ঢেউ আর দক্ষিণে উত্তাল ঢেউয়ের গোঁফ তেমনি এই কর্পোরেশনও যদি ঊর্দ্ধে ও নিম্নে গোঁফের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকে— থাক্ না! মন্দ কি? মেয়র এই কথাই ভাবলেন।

সর্ব্বোচ্চ আদালতে জয়লাভ এবং অভয়লাভ করে' গোঁফ নাচাতে-নাচাতে ফিরে এল লক্ষ্মণ। এতদিনে তার মুখে দুশ্চিন্তার চিহ্ন উঠে গিয়ে আরামের লক্ষণ দেখা দিল। এক সঙ্গে আরাম-লক্ষ্মণকে দেখা গেল একাধারে।

কিন্তু কী আশ্চর্য্য, পরদিন লক্ষ্মণকে আর চেনাই যায় না। লক্ষ্মণ এসেছে, কিন্তু তার গোঁফ আসেনি! গোঁফ নেই—নাকের তলা একেবারে চাঁছা-ছোলা। এবং তার চেয়েও আশ্চর্য্য, লক্ষ্মণের আরামের কোনো কম্‌তি নেই।

আর সব বেয়ারা এসে ছেঁকে ধরল লক্ষ্মণকে, "আরে তোর গোঁফ গেল কোথায়? তোর অতো সাধের গোঁফ? বাড়িতে রেখে এসেছিস নাকি? কী হোলো গোঁফের?"

"কী আবার হবে—ফেলে দিলাম। গোঁফ আমাদের মানায় না।" লক্ষ্মণের নির্ব্বিকার ভাব, "আমাকেও না— চন্দ্রমোহনকেও না।"

"চন্দ্রমোহন? সে আবার কেরে?" সবাই আরো অবাক!

"চন্দ্রমোহন কে!!!" লক্ষ্মণ তাজ্জব বনে' যায়, "অবাক করলি বটে! কেন, সিনেমায় যাস না নাকি? দেখিসনি চন্দ্রমোহনকে? ছবিতে নেমেনেমে ভূত হয়ে গেল চন্দ্রমোহন?"

এই বলে' তক্ষুনি-তক্ষুনি চন্দ্রমোহনকে দেখাবার জন্যই যেন নিজের পকেটে হাত পুরে দেয়, "এই ত্যাখ্ চন্দ্রমোহন!"

একটা কাগজের টুকরো—কোনো চলতি সাপ্তাহিক থেকে কেটে নেয়া জনৈক সিনেমা স্টারের ছবি—ছবির তলায় লেখা:

"এই জনপ্রিয় অভিনেতাটি সম্প্রতি তাঁর বিখ্যাত গোঁফ কামিয়ে ফেলেচেন—তাঁর নতুন বইয়ে তাঁকে যেরূপে দেখা যাবে, এখানে তার প্রতিচ্ছবি দেয়া হোলো। তাঁর অসংখ্য ভক্ত তাঁকে নবরূপে দেখার আগ্রহে অধীর হয়ে আছেন নিঃসন্দেহ।"

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

জগু যেন একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল!

ভদ্দরলোক বল্লেন, "ওই ত' মজা! আচ্ছা, দুধের মধ্যে পাঁউরুটির টুক্‌রো কিম্বা জলের মধ্যে চিঁড়ে ফেলে দেখেছ ত' সেগুলো কেমন ফুলে ওঠে! ফুলে ওঠে কেন জানো ত? পাঁউরুটির টুকরো দুধটা শুষে নেয়, চিঁড়েগুলো জল শুষে নেয় বলে। যেমন ব্লটিং কাগজ কালি শুষে নেয় সেই রকম জীবাণুরাও খাবার ভেঙে গলিয়ে নিজেদের মধ্যে শুষে নেয়। মুখ না থাকলেই কি খাওয়া যায় না?"

জগু ত' একেবারে তাজ্জব, মনেমনে চটপট একবার হিসেব করে দেখছিলো খাবারের গাদায় ডুব মেরে খাবার শুষে নিতে না জানি কেমন লাগে! কিন্তু মনের কথা প্রকাশ হয়ে পড়লে পান্না আর ঘোঁতন ঠাট্টা করে আস্ত রাখবে না। তাই মুখের ভাবটা পণ্ডিতদের মতো করেই ও বল্ল, "বা-রে, এ ত' বেশ মজা করে খাওয়া! কিন্তু কী খেতে ওরা ভালোবাসে বলতে পারেন? আমাদের মতো চপ-কাটলেট পাঁপড় ভাজা ত' আর ওরা পায় না, আর ওদের নিশ্চয়ই পিসিমা-টিসিমাও নেই যে গরমকালে আমসত্ব আর শীতকালে পিঠে-পুলি বানিয়ে দেবে!"

ভদ্দরলোক বল্লেন, "এই ত', মুস্কিলে ফেল্লে! কী খেতে যে ওরা ভালোবাসে তার জবাব এক কথায় দেব কেমন করে? ধরো, তোমায় যদি কেউ বলে— মানুষ কী খেতে ভালোবাসে—তা হলে তুমি কি এককথায় উত্তর দিতে পারবে? চীনে-ম্যান আর্স্‌লা খেতে ভালোবাসে, তুমি ভালোবাস না। মাছ নইলে তোমার ভাত রোচে না, গুজরাটি বা মাড়ওয়াড়ির ছেলেকে মাছ দিলে ওয়াক তুলবে। কুলের চাট্‌নি তুমি ভালোবাসো, কিন্তু স্কুলের হেডপণ্ডিতমশাই তার জন্যে হয়ত কেয়ারই করেন না। আসলে, নানান লোকের নানান রুচি! ক্ষুদে শয়তানগুলোরও ঠিক তাই। ওদের কেউকেউ ভালোবাসে দুধ-মাখন, কেউকেউ পচা-পাতা, কেউ ভালোবাসে রক্ত খেতে, কেউকেউ গাছের শেকড়। আবার কারুর-কারুর মুখে ছেঁড়া বুট-জুতো ছাড়া আর কিছুই যেন রোচে না!"

জগু যে জগু, খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে যার প্রায় সবতাতেই উৎসাহ, সেও ছেঁড়া জুতো খাবার কথায় ঘাবড়ে গেল! বল্ল, "এ ম্যাগে! কি নিঘ্যিন্নে জাত!"

ভদ্দরলোক গম্ভীর মুখে বল্লেন, "তা আর কি করা যায় বলো? রুচি নিয়ে ত' আর তর্ক করা চলে না!"

জগু একটু আপত্তি করবার চেষ্টা করল, "তাই বলে স্যর পচা জুতো!"

ভদ্দরলোক বল্লেন, "শুধু পচা জুতো কেন? এঁটোকাঁটার বালাই ওদের একদম নেই। প্রায়ই দেখা যায় একদল জীবাণু খাওয়া-দাওয়া শেষ করে যে এঁটো ফেলে গেল তার ওপর জুটলো আর এক জীবাণুর পাল। এঁটো ছাড়া এই ক্যাঙলার দলের যেন আর কিছুই পছন্দ নয়। তারপর আবার, সেই দ্বিতীয়টা খেয়ে দেয়ে যে এঁটো ফেলে গেল তার ওপর এসে জুটলো আর একটা তৃতীয় দল। বড় একটা বাড়ি ভাঙবার সময় যেমন দলের পর দল লোক হুড়মুড় করে এসে বাড়িটাকে খানিকটা করে ভেঙে দিয়ে যায়, অনেকটা সেই রকম।"

পান্না আপত্তি করে বল্ল, "কিন্তু দলের পর দল মানুষ বাড়িটাকে শুধু ভাঙে। বাড়িটা ত' আর খায় না।"

ভদ্দরলোক বল্লেন, "তা ঠিক বলেছো! ক্ষুদে শয়তানগুলো শুধু ভাঙে না, খায়ও। কী ভাবে জানো? ধরো, কোথাও হয়ত এক টুকরো মাংস আঢাকা পড়ে রয়েছে। একদল জীবাণু তার ওপর এসে জুটবে। মাংস'য় প্রোটিন বলে একরকম জিনিস আছে। এরা সেই প্রোটিন ভেঙেচুরে তছনছ করবে, যতটা পারে সাবাড় করবে, তারপর সেই মাংস ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু যাবার আগে মাংসটার মধ্যে একরকম খুব খারাপ বিষ ওরা ঢেলে দেয়। তখন মাংসটা থেকে দুর্গন্ধ ছাড়ে না বটে কিন্তু সেই বিষ পেটে গেলে নানান রকম রোগ হয়। তাই ত মাংস বেশীক্ষণ আঢাকা ফেলে রাখতে নেই। তারপর, তারা চলে যাবার পর, আসে এক দ্বিতীয় দলের জীবাণু। তারা মাংসটাকে আরও খানিক খায় আরও খানিক নষ্ট করে, তারপর যায় চলে। তখন মাংসটা থেকে বেশ দুর্গন্ধ ছাড়তে সুরু করে। কিন্তু একদল জীবাণু আছে যারা এই দুর্গন্ধ পেয়ে নাকে রুমাল দেওয়া দূরের কথা খাবার জন্যে এর ওপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। যতটা পারে ততটা খেয়ে ছড়িয়ে এরা যখন মাংসটাকে ফেলে দিয়ে চলে যায় তখন মাংসটা থেকে রীতিমতো গ্যাস উঠতে সুরু করে। কিন্তু গ্যাস উঠলেও জীবাণু আসবার বিরাম নেই। আসে আর একদল জীবাণু, মাংসটাকে তারা গলিয়ে পচিয়ে একেবারে পাঁক করে ছাড়ে।"

"যাই বলুন স্যর," জগু বল্ল, "এরা ভারি নিঘ্যিন্নে।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "কিন্তু নিঘ্যিন্নে যদি বলো তাহলে এদের চেয়ে নিঘ্যিন্নে হল গাছগাছড়াগুলো। কেন না, পচামাংসর পাঁক গাছের তলায় ঢেলে দিলে গাছদের বেজায় ফুর্তি লাগে।—ওই হল তাদের রাজভোগ!"

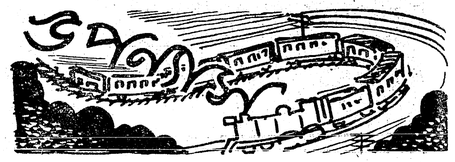

মশাল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ফেরার পথে দুজনেই চুপচাপ—কেষ্ট আর পাগলা ডাক্তার। কেষ্ট'র মন খুব খারাপ। মুখে তা সেটা ফুটেছে বেশ স্পষ্ট ভাবেই। পাগলা ডাক্তারের মুখ গম্ভীর। পাগলা ডাক্তার ফর্সাও নন, কালোও নন, মাঝামাঝি রঙ। গম্ভীর হলে তাঁকে একটু কালো মনে হয়।

'ওরা এমন ভীরু! ছিছি!' কেষ্ট বলে।

'ভীরু? হ্যাঁ, ভীরু বৈকি।' বলেন পাগলা ডাক্তার, 'কিন্তু ছিছি করার মতো ভীরু নয় কেষ্ট। কারণ আসলে ওরা ভীরু নয়। অবস্থা ওদের ভীরু করেছে। সেটা স্বাভাবিক।'

কেষ্ট বুঝতে পারে না। মানুষ ভীরু হয় কিম্বা সাহসী হয়, অবস্থার সঙ্গে তার কী সম্পর্ক!

'আছে বৈকি সম্পর্ক। সাহসী কি মানুষ অকারণে হয়, মিছিমিছি? এমনি-এমনি প্রাণ দিয়ে কেউ বীরত্ব দেখায়? অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালে যদি কোন লাভের ভরসাই না থাকে, বরং আরও বেশী ঘায়েল হবার ভয় থাকে, কেন লোকে তা দাঁড়াবে? ওদের একতা নেই, ওরা একা। ওরা জানে, একের বিপদে অন্যে এসে সাহায্য করবে না। একা বলেই প্রত্যেকে নিজেকে দুর্বল, অসহায় মনে করে।'

'কিন্তু ওরা কি জানে না সবাই মিলে এক হলে—'

'জানে। কিন্তু ও জানার কোন মানে নেই। এক হলে হয় বটে, কিন্তু কাজের বেলা এক যে সবাই হবে সে বিশ্বাস নেই। কখনো প্রমাণ পায়নি তো। একবার যদি এক হয়ে কিছু করতে পারে, তারপর বিশ্বাস আসবে, জোর পাবে। তখন দেখবে, আজ যাদের ভীরু ভাবছ তারা কত সাহসী। যেমন ধরো—'

পাগলা ডাক্তার বনের কাছের গাঁয়ের কথা বলেন, যে গাঁয়ের লোকেদের মাঝেমাঝে বাঘের অনাচার সইতে হয়। কেউ একা বাঘের সামনে পড়লে বীরত্ব দেখাতে বাঘ মারতে তেড়ে যায় না, সটান প্রাণ নিয়ে চম্পট দেয়। কিন্তু বাঘ মশায় সবার পক্ষেই জ্যান্ত বিপদ। কার কখন ঘাড় ভাঙ্গবে, ছেলেমেয়ে চিবিয়ে খাবে, গরু মারবে ঠিক নেই। বাঘটাকে মরতে তখন গাঁয়ের লোক দল বাঁধে—দা কুড়ুল, লাঠি বর্শা নিয়ে সবাই মিলে ঠেঙ্গিয়েই বাঘের দফা নিকেশ করে—বাঘের হাতেও হয় তো দু' একজন মরে, জখম হয়।—

'কারো প্রাণ যাবে, কেউ জখম হবে জেনেও ওরা বাঘ মারতে এক হয়। কারণ, আগেও ওরা এমনি ভাবে এক হয়েছে, বাঘ মেরেছে। যে গাঁয়ে কোনদিন বাঘ আসেনি, সেখানে একটা বাঘ নিয়ে ছেড়ে দাও—দেখবে কী কাণ্ড হয়। আদ্দেক লোক সাবাড় হয়ে যাবে—সবাই একসঙ্গে মিলে বাঘটাকে মারবার চেষ্টা করবে না। আবার ছাখো, বাঘ মারার বেলা যারা এক হয়, সাহসী হয়, জমিদারের অত্যাচারের বেলায় তারাই হয় তো ভীরু কাপুরুষের মতো ব্যবহার করে, পরস্পরের শত্রুতা করে, ভাবে যে নিজে বাঁচলে বাপের নাম।'

এই ঘটনা আর পাগলা ডাক্তারের কথাগুলি কেষ্ট'র মনে গাঁথা হয়ে থাকে। এত সহজ মনে হয় কথাটা অথচ এতদিন জানা ছিল না। কারণ না থাকলে কেন মানুষ ভীরু হবে? সাহসী হবে? এক বিষয়ে ভীরুতা দেখালেই যে মানুষ সব বিষয়ে ভীরু হবে তারই বা কী মানে আছে? শম্ভুর বড় ভূতের ভয়, কিন্তু সামনা-সামনি সে বোধ হয় বাঘকেও ভয় পায় না, হেডমাস্টারের সামনে দাঁড়িয়ে পর্যন্ত একটু না কেঁপে চটপট কথার জবাব দেয়। ক্লাশে ঐতিহাসিক বীরদের বীরত্বের কাহিনী শুনতে-শুনতে তার খটকা লাগে। মনে হয়, কথাগুলো বাড়িয়ে বলা হচ্ছে, একপেশে বিচার হচ্ছে। [ক্রমশ]

এমারজেন্সি ছড়া

প্রবোধচন্দ্র বসু

এক

আজকে দেখি ধরমতলার মোড়ে,
ডাস্ট্‌বিনেতে সেড্‌গুলো সব প'ড়ে।
অন্ধকারের বন্ধ করার মাঝা
চলতো ভালোই ব্ল্যাকমার্কেট কাজ।
বলো যদি—'হঠাৎ, ব্যাপার কি?'
ফোন ক'রে দাও—"হ্যালো, এ. আর. পি.॥"

তুই

আজ্‌কে
সাল্‌খে'
কাল্‌কে
        শালিমার,
এখানে
ওখানে
সেখানে
        কারবার।
পথ্যেতে
গন্ধেতে
খাদ্যেতে
        পেষন,
চালের
ডালের
মালের
        'রেশন'।

পরের দিন বড়দিন

এডালবার্ট স্টিফটর

জমা বরফ ছেড়ে ঝরা তুষারের পথ ধরে তারা খানিক নীচে নামার চেষ্টা করলো। ভাবলো এ-বারে বুঝি উপত্যকায় পৌছবে। কিন্তু খুব বেশি দূর যেতে পারলো না। দৈত্যের মতো চেহারা আর দুর্গের পাঁচিলের মতো উঁচু নতুন আর এক তুষারপিণ্ড দু-হাত বাড়িয়ে যেন পথ আগলে দাঁড়ালো—ডাইনে বাঁয়ে দু-দিকেই। সেই তুষারের শাদা চাদরের ভিতর এক আলোর অস্পষ্ট স্পন্দন। রকমারি তার রঙ—সবুজ আর নীল, এমন কি হলদে আর লালচে। বাঁকাভাবে ঠিকরোচ্ছে। আগেকার চেয়ে এখন তাদের নজর চলেছে দূরে, কারণ ইতিমধ্যে সেই ভয়ঙ্কর তুষারপাত কমে এসেছে অনেকটা। এখন সাধারণ তুষারপড়া দিনের মতো। বিপদের পরিমাণ তখনো তারা আঁচ করতে পারেনি, তাই হাল না ছেড়ে অতি কষ্টে হাতড়ে-হাতড়ে গ্লেসিআরের উপর উঠলো। ইচ্ছে, সামনেকার জমে যাওয়া ঝর্ণাটা পেরিয়ে অন্যপাশে নামার। ছোটো-ছোটো খাদগুলো পেরিয়ে, বরফই হোক আর পাথরই হোক শাদা টুপির মতো উঁচু-উঁচু ঢিবি দেখলেই তার উপর পা রেখে, যেখানে হাঁটা অসম্ভব সেখানে হামাগুড়ি দিয়ে অবশেষে তারা সেই দুর্গের পাঁচিলের মতো বরফের চুড়োয় এসে পৌছলো।

তারা ভেবেছিলো অন্য পাশে হামাগুড়ি দিয়ে নামবে। কিন্তু অন্য পাশ বলতে কিছুই নেই!

যতদূর তাদের নজর চলে কেবল বরফ আর বরফ, বরফ ছাড়া আর কিছুই না। কোথাও খোঁচা-খোঁচা, কোথাও ভাঙা-ভাঙা, কোথাও বা ঢিবি-ঢিবি বরফ—বরফের সেই ভয়ঙ্কর মরুভুমির উপর তুষার ঝরে এই কাণ্ড করেছে।

নীচে থেকে মনে হয়েছিলো সেটা বুঝি পাঁচিল। উপরে এসে তারা দেখলো আসলে তা নয়। ওপাশে তুষারের ঢালু পথ নেই। সেখানে উঠেছে বরফের নতুন দেয়াল। তার মাঝেমাঝে গর্ত, মাঝেমাঝে চিড়-ধরা অসংখ্য নীল রেখার জটিল সব ছবি ফুটে উঠেছে। সেই দেয়ালের পিছনে আবার দেয়াল, তার পিছনেও দেয়াল—দেয়ালের পর দেয়াল চলে গেছে, শেষটায় তুষারের ধূসরতায় দৃষ্টি হারিয়ে যায়।

কনরাড বললো, "সান্না এদিক দিয়ে আমরা যেতে পারবো না।"

"না", উত্তরে বললো সান্না।

"আমরা বরঞ্চ আবার উল্টোমুখে চলে অন্য কোনোখান দিয়ে নামতে চেষ্টা করি।"

"হ্যাঁ দাদা, তাই করি।"

যেখান দিয়ে বরফের এই পাঁচিলে চড়েছিলো আবার সেখানে ফিরতে তারা চেষ্টা করলো। কিন্তু কোনো পথ খুঁজে পেলো না। চারিদিকেই বরফ। কোন দিক দিয়ে এসেছিলো সেটাই গুলিয়ে গেলো। তারা এদিকে ঘুরলো, ওদিকে ঘুরলো—কিন্তু বরফের ধাঁধাঁ পেরিয়ে আসতে পারলো না কিছুতেই। যেন অদ্ভুতভাবে এই বরফের সঙ্গে তারা জড়িয়ে গেছে। নীচের দিকে নামতে চেষ্টা করে তারা দেখলো আবার বরফের উপরেই পৌচেছে। যেদিক দিয়ে কনরাডের মনে হোলো তারা এসেছে সেই দিক ধরে চলতে-চলতে অবশেষে তারা আরো ভয়ঙ্কর চেহারার বড়বড় বরফের চাঁই-এর উপর পৌছলো—দেখলে মনে হয় বুঝি সেই গ্লেসিআরের একেবারে কিনারে এসে পড়েছে—কিছুই বিচিত্র নয়! গুড়ি মেরে হাতড়ে-হাতড়ে তারা চললো। সেই বরফে-জায়গার ধারে বিকট চেহারার সব পাথর পড়ে রয়েছে—জীবনে এতো বিরাট জিনিস তারা দেখেনি। সেগুলোর উপর তুষারের শাদা চাদর, পাশগুলো যেন ঘষে মসৃণ করা। কেউ-কেউ বা এ-ওর গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে, অনেকটা কুঁড়ে ঘরের মতো দেখাচ্ছে। অনেকে আবার উপর-উপর শুয়ে, জাহাজের কদাকার খোলের মতো চেহারা। তাদের কাছেই দু-তিনটে পাথর মাথায় মাথা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। সেই পাথরগুলোর উপর ঠিক ছাদের মতো দেখতে আর একটা পাথর রয়েছে শুয়ে। পাথরের সেই স্তূপটা আপনা থেকেই ছোটো একটা বাড়ি বনে গেছে। সেই বাড়ির সামনের দিকটা শুধু খোলা—পিছন আর পাশগুলো ঢাকা। ভিতরটা একেবারে শুকনো—আকাশ থেকে সোজা মাটিতে ঝরায় তুষারের একটি ফুলকিও ভিতরে সেঁধুতে পারেনি। ভিতরে এসে ভারি খুসি হয়ে উঠলো তারা—যাক, বরফের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেছে। তুষারের বদলে এখন তাদের পায়ের নিচে চেনা মাটি!

ইতিমধ্যে অন্ধকার হয়ে এলো।

কনরাড বললো, "সান্না শোন্। সন্ধে হয়ে গেছে। এখন আর নীচে নামার সময় নেই। নামতে চেষ্টা করলে পাহাড় থেকে পড়ে যেতে পারি, কোনো বড় গর্তের মধ্যেও হুমড়ি খেয়ে পড়া আশ্চর্য নয়। তারচেয়ে বরঞ্চ এই পাথরগুলোর ভেতরেই আমরা ঢুকি। ভেতরটা বেশ শুকনো আর গরম। এখানেই আমরা অপেক্ষা করবো। শিগগীরই আবার সূর্য উঠবে আর তারপর আমরা পথ চিনে নীচে নামতে পারবো। কাঁদিস না, দোহাই তোর কাঁদিস না। দিদিমা আমাদের সঙ্গে যে-সব খাবার দিয়েছে তোকে সবটাই খেতে দোবো।"

সান্না কিন্তু মোটেই কাঁদেনি।

পাথুরে ছাতের এই ঘরে তারা শুধু আরাম করে বসতেই পেলো না, খুসিমতো ঘুরে বেড়ানোরও বাধা নেই। কনরাডের কাছ ঘেঁষে ইঁদুরের মতো চুপ করে সান্না বসে রইলো।

কনরাড আবার বললো, "দেখিস, মা মোটেই রাগ করবে না। বলবো এই রকম ভয়ানক তুষার পড়ার জন্যেই আমরা ফিরতে পারিনি। শুনে কিচ্ছু বলবে না, দেখিস। বাবাও বকবে না। শীত করলে কুঠুরেরা যেমন হাত দিয়ে শরীর থাবড়ায় সেই রকম থাবড়াবি—তা হলেই আবার গরম লাগবে।"

"হ্যাঁ দাদা, তাই করবো," বললো সান্না।

কনরাড বোধ হয় ভেবেছিলো আজ আর বাড়ি ফেরা যাবে না শুনে সান্না হয়তো কেঁদে কেটে একটা কাণ্ডই বাধাবে। কিন্তু সে রকম কিছুই সে করলো না। কী দারুণ পরিশ্রম যে গিয়েছে সে সম্বন্ধে কোনো ধারণাই তাদের নেই। তাই চুপচাপ বসে জিরিয়ে নিতে খুব ভালো লাগছিলো তাদের। হাত-পা ছড়িয়ে তারা বসে রইলো।

এবারে কিন্তু খিদেটা ভালো করে বোঝা গেলো। প্রায় এক সঙ্গেই দুজনে পকেট থেকে রুটির টুকরো বার করে খেয়ে ফেললো। তাদের দিদিমা যে কেক আর বাদাম

আর নানা সব টুকিটাকি খাবার পকেট ভরে দিয়েছিলো সেগুলোও খেলো তারা।

খাওয়া শেষ করে কনরাড বললো, "এবারে কিন্তু জামাকাপড় থেকে বরফ ঝেড়ে না ফেললে ভিজে যাবো।"

"হ্যাঁ দাদা," বললো সান্না।

সেই পাথুরে বাড়ির বাইরে এসে কনরাড প্রথমে তার ছোটো বোনের জামাকাপড় থেকে তুষার ঝেড়ে দিলো। তার কোটের কোন ধরে ঝাঁকি দিয়ে উড়িয়ে দিলো তুষার, তার মাথায় নিজের যে টুপিটা পরিয়াছিলো সেটা খুলে উপরকার তুষারও পরিষ্কার করলো; যেগুলো তবু গেলোনা রুমাল দিয়া ঝেড়ে দিলো। তারপর নিজের জামাকাপড়ের উপরকার তুষার যতটা পারলো করলো পরিষ্কার।

এতোক্ষণে তুষারপাত সম্পূর্ণ থেমে গেছে। তাদের গায়ে একটি ফুলকিও আর পড়লো না। পাথুরে বাড়ির ভিতরে এসে তারা চুপচাপ বসলো। একবার উঠে ফিরে এসে বসার পর তারা বুঝলো কী রকম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। বাছুরের চামড়ার থলিটা কনরাড খুলে ফেললো। দিদিমা যে কাপড়টা দিয়ে কাগজের ঠোঙা করে ছোটো বাক্সটা জড়িয়ে দিয়েছিলো সেটা খুলে নিজের দু-কাঁধে জড়িয়ে নিলো গরম হবার আশায়। থলির ভিতর থেকে দুজনকার দুটো ছোটো রুটি বার করে দুটিই দিলো সান্নাকে। সান্না খেতে সুরু করলো। গোটা একটা রুটি শেষ করে দ্বিতীয়টারও খানিকটা খেলো সান্না তারপর কনরাডকে চুপ-চাপ বসে থাকতে দেখে বাকীটা দিলো ফিরিয়ে। কনরাড অবশিষ্ট রুটির টুকরোটা খেয়ে ফেললো।

আর তারপর থেকে তারা বসে-বসে শুধু দেখতে লাগলো।

গোধূলির আলোয় সামনের ঢালু জায়গা যতটা দেখা যায় সবটাই নিরবচ্ছিন্ন তুষারের চকচকে একটি চাদর যেন। অন্ধকারের মধ্যে এখানে-ওখানে তুষারের ছোটো-ছোটো টুকরোগুলো অদ্ভুত রকম জ্বলজ্বল করছে। যেন দিনের আলো পান করে এখন তারা সেই আলো দিচ্ছে ছড়িয়ে।

পাহাড়ের উপর খুব চট করে রাত হয়ে যায়। এখানেও তাই দেখতে-দেখতে রাত হয়ে গেলো। অল্পক্ষণের মধ্যেই চারিদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠলো। তুষারগুলো শুধু এক রকমের ফ্যাকাশে আলোয় লাগলো জ্বলজ্বল করতে। কেবল যে তুষারবৃষ্টি বন্ধ হয়েছে তাই নয়, উপরকার মেঘে-ছাওয়া আকাশটাও ক্রমশ পাতলা হয়ে আসছে। তাদের নজরে পড়লো ছোট্ট ঝকঝকে একটি তারা। এদিকে তুষারের ভিতর দিয়ে সত্যিই মনে হয় যেন এক ধরণের জ্যোতি বেরুচ্ছে। আকাশ থেকে ওড়নার মতো এখন আর কিছুই ঝুলে নেই। তারা সেই গুহার ভিতরে বসে দেখতে লাগলো তুষার-মোড়া পাহাড়গুলো, একটির পর একটি সারবন্দী দাঁড়িয়ে রয়েছে—অন্ধকার আকাশের পটভূমিতে তাদের বেশ স্পষ্টই দেখা যায়। সমস্ত দিন ধরে তারা যত জায়গা ঘুরেছে তাদের মধ্যে এই গুহার ভিতরটাই সবচেয়ে গরম। ঘেঁষাঘেঁষি করে বসে বিশ্রাম নিতে-নিতে অন্ধকারের ভয় করতে পর্যন্ত তারা ভুলে গেলো। দেখতে-দেখতে অনেক তারা ফুটলো: এদিকে একটা দেখা যেতে না যেতেই ওদিকে আর একটা উঠলো আর খানিক পরেই মনে হোলো আকাশে আর একটুরো মেঘও নেই।

উপত্যকাবাসীরা এই সময় বাতি জ্বালায়। প্রথম বাতি জ্বালিয়ে টেবিলের উপর তারা রাখে আর বসার ঘরটা আলো হয়ে ওঠে। কোথাও বা শুধু একটা পাইন কাঠের মশাল জ্বলে, কোথাও বা টুকরির মধ্যে জ্বলে আগুন। শোবার ঘরের জানালাগুলো একটির পর একটি উজ্জ্বল হয়ে তুষারমোড়া রাতের মাঝখানে ঝলমল করে। কিন্তু আজকের দিনটা বড়দিনের ঠিক আগের দিন। নিশ্চয়ই আজ আরো অনেক-অনেক আলো জ্বলেছে আর টেবিলের উপর কিংবা ক্রিস্‌মস গাছের ডালে ছেলেমেয়েদের জন্যে নানা ধরণের পুতুল আর খেলনাগুলো সেই আলোয় ঝকঝক করছে। কত আলো যে জ্বলেছে নিশ্চয়ই আজ তা গুণে শেষ করা যাবে না—কারণ প্রায় প্রত্যেক বাড়ি কিংবা কুঁড়ে কিংবা ঘরে একটি কিংবা একটির বেশি ছেলেমেয়ে আছে আর তাদের প্রত্যেকের জন্যেই যীশুখৃষ্ট কিছু-না-কিছু উপহার এনেইছেন। তাঁর নির্দেশেই তো আজ এতো আলো জ্বলছে! কনরাডের দৃঢ় বিশ্বাস এখান থেকে তাদের গ্রাম বেশি দূর নয়। তবু, সেখানকার সেই অসংখ্য আলোর মধ্যে একটিকেও দেখতে পেলো না তারা। সেই ফ্যাকাশে তুষার আর অন্ধকার আকাশ ছাড়া কিছুই তাদের নজরে পড়লো না। দূরের সব জিনিস তাদের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছে। প্রত্যেক উপত্যকাতেই ছেলেমেয়েরা এখন কত কী না উপহার পাচ্ছে, শুধু তারা দুজনেই বরফের দেশে অনেক উঁচুতে এখন বসে। তাদের দিদিমার দেয়া কত রকমের মজার জিনিসগুলো সেই গুহার এক কোণে প্যাককরা অবস্থায় বাছুরের চামড়ার থলিতে পড়ে রয়েছে।

চারিদিকের তুষার-ঝরানো মেঘ পাহাড়ের ওপাশে ডুবে গেছে। তাদের মাথার উপরে ভারি সুন্দর গাঢ় নীল রঙের একটি চাঁদোয়া যেন টাঙানো। এতো গাঢ় নীল যে কালো বলে ভুল হয়। সেই চাঁদোয়ায় ভিড় করে রয়েছে অসংখ্য জ্বলন্ত তারা। সেই তারার ভিড়ের মাঝখানে দিয়ে যেন কে এঁকে দিয়েছে শাদা একটি ছায়াপথ। দুধের মতো তার রঙ, আলোয় চিকিমিক করছে। নীচেকার উপত্যকা থেকে এই ছায়াপথকে নিশ্চয়ই আগে তারা দেখেছিলো। কিন্তু এখনকার মতো এতো স্পষ্ট নয়। রাত ক্রমশ গভীর হয়ে উঠলো। তারা জানতো না সমস্ত তারাই পশ্চিমদিকে এগিয়ে যায়। জানলে তারাদের দিকে চেয়ে বলতে পারতো রাত কত হোলো। নতুন-নতুন তারা উঠছে আর পুরনো তারাগুলো অস্ত যাচ্ছে। তারা কিন্তু ভাবলো আকাশে বুঝি একই তারার ঝাঁক রয়েছে। তারার জ্যোৎস্নায় ক্রমশ তাদের চারিধার অল্পঅল্প করে আলো হয়ে উঠলো। তারা কিন্তু সেই আলোয় কোনো উপত্যকা বা কোনো গ্রাম দেখতে পেলো না। চতুর্দিকেই কেবল এক শাদা রঙ—শাদা ছাড়া আর কিছুই না। সেই কম্পিত শাদা আলোর অরণ্যে মাঝেমাঝে এখানে একটি কালো পাহাড়ের তরঙ্গ, ওখানে একটি কালো পাহাড়ের চূড়ো শুধু চোখে পড়ে। আকাশের কোনোখানে চাঁদের দেখা নেই। হয়তো সূর্যাস্তের সঙ্গে সে-ও অস্ত গেছে, নয়তো এখনো ওঠেনি।

অনেকক্ষণ বাদে কনরাড বললো, "সান্না, কিছুতেই ঘুমুবি না, জানিস্! মনে আছে তো বাবা কী বলেছিলেন? —'পাহাড়ে কখনো ঘুমুবি না, ঘুমুলে সেই বুড়ো এশেনজায়গের-এর মতো অবস্থা হবে। সে বেচারা পাহাড়ের ওপর এক পাথরে বসে ঘুমিয়ে পড়েছিলো। সে-ঘুম আর ভাঙেনি। সমস্ত শরীর ঠাণ্ডায় জমে যাওয়ায় লোকটা মরে গিয়েছিলো। মারা যাবার চার মাস পর পর্যন্ত সেই পাথরের ওপর সোজা খাড়াছিলো তার দেহটা—তারপর তাকে খুঁজে পাওয়া যায়।"

খুব ক্লান্ত সুরে সান্না বললো, "না দাদা, আমি ঘুমুবো না।"

ভালো করে জাগিয়ে রাখার জন্যে তার কোটের কোণ ধরে ঝাঁকুনি দিলো কনরাড।

কথাগুলো বলেই আবার কিন্তু ঝিমিয়ে পড়লো সান্না।

আরো খানিক পরে তার হাতের উপর কনরাড মৃদু একটি চাপ অনুভব করলো। ক্রমশ ভারি হয়ে উঠলো সেই চাপ। চেয়ে দেখলো সান্না ঘুমিয়ে তার গায়ের উপর এলিয়ে পড়েছে।

"সান্না ঘুমোসনি; দোহাই তোর ঘুমুসনি," বললো কনরাড।

"না," ঘুমের মধ্যে জড়ানো সুরে উত্তর দিলো সান্না, "আমি তো ঘুমুইনি।"

তাকে জাগাবার জন্যে কনরাড ঠেলা দিয়ে সরে বসলো। কিন্তু মেঝের উপরেই ঢলে পড়ে ঘুমুতে লাগালো সান্না। তখন তার দু-কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিলো কনরাড। সান্নাকে এইভাবে ঝাঁকাতে গিয়ে কনরাড অনুভব করলো তার নিজের শরীরটাও ঠাণ্ডা আর ভারি হয়ে উঠেছে। দারুণ ভয় পেয়ে সে লাফিয়ে উঠলো। তারপর বোনের হাত দুটো শক্ত করে ধরে আরো জোরে ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে

চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, "এই সান্না, একবার উঠে দাঁড়া। কিছুক্ষণ আমরা দাঁড়িয়ে থাকি তাহলে আর কষ্ট হবে না।"

"আমার তো শীত করছে না দাদা," উত্তরে বললো সান্না।

"হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোর শরীরটা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। দাঁড়া, উঠে দাঁড়া।"

"ফারের জ্যাকেট-টা তো বেশ গরম।"

"আয় তোকে ধরে দাঁড় করিয়ে দি।"

"না", সান্না জানালো, তারপর আবার গেলো চুপচাপ হয়ে।

তখনি হঠাৎ দিদিমার কথাগুলো কনরাডের মনে পড়লো: "এতো কড়া যে ছোট্ট এক চুমুক খেলেই সমস্ত ভেতরটা একেবারে গরম হয়ে উঠে। এক চুমুকে শীতকালের সবচেয়ে ঠাণ্ডা দিনেও শীত করে না।" বাছুরের চামড়ার থলিটা হাতে নিয়ে সে খুলে ফেললো তারপর মা'র জন্যে পাঠানো কালো কফি ভরা ফ্লাস্কটা হাতড়ে-হাতড়ে বার করলো। ফ্লাস্কে জড়ানো কাপড়টা সরিয়ে সজোরে খুলে ফেললো ছিপিটা তারপর সান্নার উপর ঝুঁকে পড়ে বললো, "এই কফিটা দিদিমা মা'র জন্যে পাঠিয়েছেন। এক চুমুক চেখে ছাখ, শরীরটা কী রকম গরম হয়ে ওঠে। কী জন্যে ব্যবহার করেছি জানলে মা কক্ষোণো রাগ করবে না।"

সান্নার কিন্তু শরীর আর মন ঘুমে ভেঙে পড়েছে। সে বললো, "আমার তো শীত করছে না।"

কিন্তু কনরাড ছাড়লো না। বললো, "বেশ তো, এটা খেয়ে নে, তারপর ঘুমুবি।"

ঘুমুতে পাবার সম্ভাবনায় সান্না আর আপত্তি করলো না। কনরাড তার মুখে কফিটা ঢেলে দিলো আর কোনো রকমে গিলে ফেললো সান্না। তারপর কনরাড নিজেও খেলো খানিকটা।

এই উত্তেজক পানীয়ের ফল প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই সুরু হোলো। ইতিপূর্বে কখনো কফি খায়নি বলে প্রতিক্রিয়াটা আরো বেশি করে তারা অনুভব করলো। ঘুমিয়ে পড়ার বদলে সান্না ক্রমশ সম্পূর্ণ জেগে উঠলো। নিজে থেকেই তখন সে স্বীকার করলো সত্যিই তার শীত করছিলো। এখন কিন্তু চমৎকার একটি গরম স্রোত তার শরীরের মধ্যে বইছে, ইতিমধ্যেই সেই স্রোত তার হাতে-পায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের মনে আবার ফুর্তি ফিরে এলো। খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে গল্পগুজবও করলো।

তিক্ত স্বাদ সত্ত্বেও যেই কফির ক্রিয়া কমে আসে অমনি তারা এক-এক চুমুক পান করে চলে। ক্রমশ তাদের কী দেহের স্নায়ুতে স্নায়ুতে যেন আগুন ধরে গেলো। তা ফলে ঘুমুবার প্রবল আগ্রহকে তার ঠেকিয়ে, রাখতে পারলো।

[ক্রমশ

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ

যুদ্ধপঞ্জী

৩রা সেপ্টেম্বর ১৯৩৯: পোল্যাণ্ড আক্রান্ত। ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করলো।

১৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯: জার্মান যুদ্ধ-জাহাজ 'এ্যাডমিরাল গ্রাফ্ স্পি' দক্ষিণ আমেরিকায় ডুবলো।

৩০শে মে, ১৯৪০: ডানকার্ক। মিত্রশক্তির সবচে সঙ্কটময় মুহূর্ত। ফ্রান্সের পূর্ণ পরাজয়। বৃটেনের সৈন্য আশ্চর্যভাবে বেঁচে ফিরলো কিন্তু তাদের দামী-দামী অস্ত্র সমস্তই ফেলে আসতে হোলো।

১০ই জুন, ১৯৪০: বৃটেন এবং ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইটালির যুদ্ধ ঘোষণা।

১৭ই জুন, ১৯৪০: ফ্রান্সের আত্মসমর্পণ। মার্শাল পেত্যাঁ ফ্রান্সের মন্ত্রী হয়ে জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ থামানোর চুক্তি করতে চাইলেন।

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০: ব্যাট্‌ল্ অফ বৃটেনের সুরু।

৫ই এপ্রিল, ১৯৪১: বৃটেন কর্তৃক এ্যাবিসিনিয়া জয়।

২২শে জুন, ১৯৪১: জার্মান কর্তৃক রাশিয়া আক্রমণ।

হিটলারের এই প্রকাণ্ড ভুলের জন্যে সমস্ত লড়াই-এর রঙ বদলে গেলো।

৭ই ডিসেম্বর, ১৯৪১: জাপান কর্তৃক অকস্মাৎ পার্ল হার্বার আক্রমণ। ফলে আমেরিকা লড়াইতে যোগ দিলো।

জুলাই থেকে অক্টোবর, ১৯৪২: এল এলামেইন। অকিনলেক রমেলের অগ্রগতি থামালেন। মণ্টগোমেরি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ লড়াই জিৎলেন।

৮ই নভেম্বর, ১৯৪২: উত্তর আফ্রিকায় মিত্রশক্তির অবতরণ।

২রা ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৩: স্তালিনগ্রাদ। রাশিয়া লড়াই-এর মোড় ঘোরালো। ফিল্ড মার্শাল পলাস এবং লেফ্‌টেন্যাণ্ট জেনারেল স্কিমিড্ রুষদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো।

১৩ই মে, ১৯৪৩: টিউনিসিয়া বিজয়।

নভেম্বর, ১৯৪৩: তেহেরাণে স্টালিন, রুজভেল্ট ও চার্চিল মিলিত হয়ে লড়াই সম্বন্ধে অনেক জরুরি আলোচনা করলেন।

৪ঠা জুন, ১৯৪৪: রোম বিজয়।

৬ই জুন, ১৯৪৪: "ডি"ডে। নরম্যাণ্ডিতে বৃটিশ সৈন্যের অবতরণ এবং তারপর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড এবং জার্মানির ভিতর তাদের অগ্রগতি।

২৫শে অগস্ট, ১৯৪৪: প্যারিস পুনরুদ্ধার।

এপ্রিল, ১৯৪৫: মিত্রশক্তির রাইন নদী অতিক্রম।

৮ই মে, ১৯৪৫: জার্মানির বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ।

নেতৃবৃন্দ

মার্শাল ইভান স্টেপানোভিচ্ কোনিভ: মাত্র ৪৮ বছর বয়স। সমস্ত মুখে গভীর রেখা, মাথায় একটিও চুল নেই। সোভিয়েটের শ্রেষ্ঠ মার্শেলদের মধ্যে একজন। জার'দের আমলে যুদ্ধে তাঁর হাতেখড়ি হয়। ডিনিপার, বাগ্ এবং ডিনিস্টারে জার্মান প্রতিরোধকে চূর্ণ করার বীরত্বের জন্যে মার্শাল পদে উন্নীত হন। তাঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে, "আগে সঠিকভাবে খবর নাও তুমি কী করবে বলে শত্রু আঁচ করে আছে, তারপর ঠিক উল্টো কাজ কর।"

মার্শাল জুকভ: দীর্ঘ দেহ, ভারি গড়ন, চোখের দৃষ্টি ইস্পাতের মতো। তাঁর খাটবার শক্তি অসাধারণ। কখনো ক্লান্ত কিংবা অসুস্থ হন না। এ-কারণে অনেকে তাঁকে 'হিউম্যান ডায়নামো' বলে। লালফৌজের নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। ১৯৪১ সালে মস্কোর গেট থেকে জার্মানদের হটিয়ে দেন, ১৯৪৩-এ লেলিনগ্রাডকে অবরোধ-মুক্ত করেন। ১৯৪৪-এ জার্মানদের কার্পেথিয়ান্সের পাদদেশে ঠেলে নিয়ে আসেন এবং অকস্মাৎ সমস্ত পোল্যাণ্ড অতিক্রম করে বার্লিনের মধ্যে প্রবেশ করেন।

মার্শাল ফেডোর টলবুখিন: লালফৌজের আর একজন বিখ্যাত সামরিক নেতা। ৫০-এর কম বয়স। স্তালিনগ্রাদে জেনারেল ফন পলাসকে যে পাঁচজন কম্যাণ্ডার বন্দী করেছিলেন ইনি তাঁদের একজন। উক্রেন এবং ক্রিমিয়াতে আশ্চর্য ক্ষমতার পরিচয় দেন। ফলে দক্ষিণ রাশিয়া থেকে নাৎসি সৈন্য পালাতে বাধ্য হয়। তৃতীয় উক্রেনীয় সৈন্যদলের অধিনায়ক হয়ে রুমানিয়া, হাঙ্গারি ও ভিয়েনা জয় করে

মার্শাল ম্যালিনোভ্স্কি'র সঙ্গে বল্কানে নাৎসিদের পরাজিত করেন।

মার্শাল কন্স্ট্যানটাইন রকোসোভ্স্কি: বয়স ৪৭ বছর। স্তালিনগ্রাদের চতুর্দিকে দুর্ভেদ্য বাধার সৃষ্টি করে ফন্ পলাস্-এর সৈন্যদলকে ঘিরে ফেলেন। কার্স্ক-এ জার্মান অগ্রগতি প্রতিহত করে ওয়েল পুনরুদ্ধার করেন। তাঁর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিদ্যুতের মতো দ্রুতগতি এবং নিখুঁতভাবে সৈন্য পরিচালনা করা। এ-বছর পূর্ব প্রুশিয়ায় তিনি আক্রমণ চালান এবং জার্মান 'ইস্টার্ন ফ্রণ্ট'-কে বিধ্বস্ত করেন।

জেনারেল ড্যুইট্ ডেভিড আইসেনহাওয়ার: সুপ্রিম কম্যাণ্ডার অফ এলায়েড ফোর্সেস্ ইন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট। মার্কিন রাজ্যের প্রথম পাঁচটি বিখ্যাত জেনারলের অন্যতম। ১৯৪২-এর নভেম্বরে টিউনিসিয়া জয় করেন। 'এ্যালায়েড ইন্ভেসন ফোর্স'-এর সুপ্রিম কম্যাণ্ডার হয়ে ফ্রান্স এবং জার্মানির নাৎসি প্রতিরোধ ব্যর্থ করেন। গত অক্টোবরে তাঁর ৫৫ বছর পূর্ণ হয়েছে। তাঁর পিতা একজন চাষী ছিলেন।

ফিল্ড মার্শাল সার বার্নার্ড্ল মণ্টগোমেরি: বৃটিশ জেনারেলদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত। 'মিড্ল্ ইস্ট' এবং 'নিয়ার ইস্ট'-এ ইংরেজদের অবস্থা যখন ক্রমশই খারাপ হয়ে পড়ছিলো এবং ধূর্ত জার্মান জেনারেল রমেল-কে কেউই যখন ঠেকিয়ে রাখতে পারছিলো না 'মণ্টি'র (এই নামেই ইনি সুপরিচিত) তখন ডাক পড়লো। রমেল-কে শুধু যে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন তাই নয় এক্সিস সৈন্যদলকে নানা জায়গায় পরাজিত করেন। তাঁর অধিনায়কত্বে 'এইট্থ্ আর্মি' এল এ্যালামিয়েন থেকে টিউনিসিয়া পর্যন্ত বিজয় পতাকা উড়িয়ে যায় এবং সিসিলি এবং অর্দ্ধেক ইটালি জয় করে। 'টোয়েণ্টি ফার্স্ট আর্মি'র অধিনায়ক হিসেবে তিনি উত্তর ফ্রান্স, বেলজিয়াম এবং উত্তর জার্মানি জয় করেন। বয়স ৫৫ বছর। ছোট্টখাট্ট মানুষ। ধূমপান বা মদ্যপান একেবারেই করেন না। ভারি নিয়ম-পাগলা লোক।

উপরোক্ত নেতৃবৃন্দ ছাড়া নিম্নলিখিত নামগুলিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

জেনারেল জর্জ মার্শাল (৬৫): চিফ্ অফ স্টাফ্ অফ দি ইউ. এস্. আর্মি।

জেনারেল ওমার এন্. ব্র্যাডলে: কম্যাণ্ডার অফ দি ইউ. এস্. টুয়েলফ্থ্ আর্মি গ্রুপ।

মার্শাল সার হ্যারল্ড আলেক্সাণ্ডার: সুপ্রিম কম্যাণ্ডার এলায়েড মেডিটারেনিয়ান থিয়েটার।

এয়ার চিফ্ মার্শাল সার আর্থার টেড্ডার: ডেপুটি সি-ইন-সি, ওয়েস্টার্ন ফ্রণ্ট।

জেনারেল জর্জ স্মিথ প্যাট্টন: কম্যাণ্ডার অফ দি ইউ. এস্. থার্ড আর্মি।

ফিল্ড মার্শাল সার এ্যালেন ব্রুক: চিফ অফ দি ব্রিটিশ ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফ।

মার্শাল জোসিফ্ ব্রোজ (অথবা মার্শাল 'টিটো'): যুগোস্লাভিয় নেতা। ইণ্ট্যার্ন্যাসন্যাল ব্রিগেডের হয়ে লড়াই করেছিলেন।

কয়েকটি খবর

এই যুদ্ধ আরম্ভ হবার পর থেকে ১৯৪৫-এর ২৮শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ব্রিটিশ কমনওয়েল্থ্ সৈন্যের হতাহতের সংখ্যা ১,১২৬,৮০২ (গত মহাযুদ্ধে ১,০৮৯,৯১৯)। ব্রিটিশ বেসামরিক নরনারীর হতাহতের সংখ্যা ৫৯,৭৯৩।

* * *

লড়াই আরম্ভ হবার পর থেকে ৩১শে মার্চ, ১৯৪৫ পর্যন্ত জার্মানির উপর বোমা-ফেলা হয়েছে ১,১৮৪,৭৫৮ টন। এপ্রিল ১৯৪৫-এর মধ্যে ব্রিটেনের উপর মোট ১০৪৮ রকেট বোমা, ৮০৭০ ফ্লাইং বম্ব এবং ৭৬২০ টন বোমা পড়েছে।

* * *

গোথা'র কাছে এক দু'হাজার ফিট গভীর লবণ খনির গর্ভে নাৎসিদের বিপুল গুপ্তধন পাওয়া গেছে। যে পরিমাণ সোনা পাওয়া গেছে শুধু তারই দাম ৫০,০০০,০০০ পাউণ্ড! সেই স্বর্ণপিণ্ড স্থানান্তরিত করার জন্যে ৩০টা বড়বড় লরির দরকার হয়েছিলো এবং এক দল মজুর ক্রমাগত ২৩ ঘণ্টা পরিশ্রম করে সেগুলো লরিতে বোঝাই করতে পেরেছিলো! আরো ২৭টা লরি লেগেছিলো বহুমূল্য শিল্প-সম্ভারকে স্থানান্তরিত করার জন্যে। সেই খনির মধ্যে ১৮৯ বড়বড় ট্রাঙ্ক পাওয়া গেছে। মুক্তো, হীরে, জহরত, সোনার ঘড়ি, হাজার হাজার আংটি ইত্যাদি জিনিসে ঠাসা ঐ বাক্সগুলো।

* * *

রুষ সৈন্য বার্লিন দখল করার পর সেই সহরের নীচে আর একটি সহর আবিষ্কার করেছে! গোলকধাঁধার মতো অসংখ্য পথ এই সহরের তলাকার সহরে। শুধু পথই নয়, মাটির তলায় বাড়ি, ফ্যাক্টরি ও রসদের গুদামও রয়েছে! মাটির তলাকার এই বিরাট সহর সম্বন্ধে বার্লিনবাসীদেরও বিশেষ কোনো খবর জানতে দেওয়া হয়নি। যারা পাহারা দিতো তারা শুধু গেটের কথাই জানতো। এমন কি অনেক অফিসাররাও এই সহরের ছোট্ট একটুখানি অংশের কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা জানতে পারেনি।

গত এক মাসের মধ্যে পৃথিবীর অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে।

২৫শে এপ্রিল সানফ্রানসিস্কো কনফারেন্স বসেছে ডাম্বার্টন ওক্স নামক স্থানের প্রস্তাব প্রমুখ পৃথিবীতে চিরন্তন শান্তিরক্ষার উপায় বিচার করবার উদ্দেশ্যে।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত সেখানে গিয়ে ব্রিটিশ সরকারের বিষয়ে ভারতবর্ষের নালিশ জানাতে ও অন্যান্য দেশের তুল্য ভারতের দাবী জানাতে চেষ্টা করেছেন। বলা বাহুল্য তিনি নানান্ভাবে বাধা পাচ্ছেন।

সভাকার্যে ব্রিটিশ ও মার্কিন-এর মধ্যে বিশেষ মতের মিল দেখা গেলেও রুষকে নিয়ে মুস্কিল। সে বল্ছে পোল্যাণ্ড গোড়া থেকে জর্মানদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে তাকে আসন দেওয়া হ'ল না, অথচ আর্জেণ্টাইনা গোড়াতে জর্মানদের সহায়তা করেছে তাকে দেওয়া হ'ল, এ অতি অন্যায়। রুষ এ তর্কে পরাজিত হয়েছে। ও শেষ অবধি রুষের কী মনোভাব দাঁড়াবে সেই নিয়ে জল্পনা চল্ছে।

এ মাসের প্রধান খবর: গত ৭ই এপ্রিল ইউরোপের যুদ্ধের অবসান হয়েছে। অ্যাডমিরেল ডোয়েনিৎসের আদেশে জর্মানির পরাজয়পত্র স্বাক্ষর হয়েছে। প্রাগের জর্মানরা কিছুদিন যুদ্ধ চালিয়ে, এখন সকলেই শান্তিভিক্ষা ও পরাজয় স্বীকার করেছে। তবে কোথাও মনের শান্তি নেই, কারণ রুষ, ইংরেজ ও মার্কিনে বহু মতভেদ চল্ছে।

এবার জাপানী যুদ্ধ দ্বিগুণ উৎসাহে চল্বে। সেখানে মার্কিন সৈন্য ইয়োজিমা ও ওকিনাওয়া দ্বীপ অধিকার করেছে। এখন তাদের অগ্রবাহিনী টোকিও থেকে মাত্র চারশ' মাইল দূরে আছে।

চীনারাও নানান্ ভাবে বিধ্বস্ত হয়েও ফু-চৌ নামে সমুদ্র বন্দর অবধি পৌঁছে গেছে।

আগামী সংখ্যায় নিশ্চয় সমস্ত ব্যাপার আরও অনেক এগিয়ে যাবে।

—লীলা মজুমদার

* * *

গত বছরের মহামন্বন্তরের কারণ সম্বন্ধে সঠিক খবর জানার জন্যে 'ফেমিন এন্কোয়ারি কমিশন' নামে একটি সঙ্ঘ গঠিত হয়। তাঁদের অনুসন্ধানের ফলাফল হালে ছাপা হয়েছে। এই অনুসন্ধানের ফলে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে দুর্ভিক্ষকে বন্ধ করা যেতে পারতো। কিন্তু নানা

ব্যবসাদারদের নৃশংসতার ফলে লক্ষ-লক্ষ নিরপরাধ মানুষ তিল-তিল করে মরলো। এই কমিশন হিসেব করে দেখিয়েছেন প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির মাথা পিছু এক হাজার টাকা করে লাভ করা হয়েছে। এই দুর্ভিক্ষে মোট মৃত্যু সংখ্যা ১৫,০০,০০০ !

* * *

ডাঃ জেরোম ডেভিস 'ইয়েল' বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। কিছুদিন আগে তিনি এক বিখ্যাত মার্কিন সাপ্তাহিক পত্রের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। ভারতবর্ষকে নানাভাবে দেখবার সুযোগ তাঁর হয়েছিলো। স্বদেশে ফিরে কিছুদিন আগে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন : শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ভারতবর্ষের দান পৃথিবী কোনোদিন ভুলতে পারবে না। রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত জহরলালের নাম চিরকাল বেঁচে থাকবে। কিন্তু শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ এই ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। ভারতবর্ষের দারিদ্র্য বিশ্ববিশ্রুত। তাদের ক্ষুধার উপযুক্ত খাদ্য নেই, পরবার মতো যথেষ্ট কাপড় নেই, থাকবার মতো বাড়ি নেই। প্রায় কুকুর-বেড়ালের মতো তারা বেঁচে আছে। তাদের স্বাস্থ্য ভেঙে গেছে। মৃত্যুহার অত্যন্ত বেশি। ১০০০টির মধ্যে ১৬৭টি শিশুর এক বছর বয়স হবার আগেই মৃত্যু হয়। গড়পড়তায় প্রত্যেক ভারতবাসীর বাৎসরিক আয় ৬৫৲ টাকা—যে টাকা প্রত্যেক ইংরেজের শুধু সিগারেটেই খরচ হয়।

* * *

'ন্যাশন্যাল শ্যেচোয়ান' বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সায়েন্স কলেজের' ডাঃ চৌ হু-ফু রসায়ন শাস্ত্রে মৌলিক গবেষণার জন্যে এ বছরের নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বলে জানা গেছে। প্রতীচ্যে ইতিপূর্বে দুজন নোবেল প্রাইজ পেয়েছিলেন। দু'জনেই তাঁরা ভারতীয় : রবীন্দ্রনাথ ও রমন। ডাঃ চৌ প্রতীচ্যের মধ্যে তৃতীয় এবং চীনদেশের মধ্যে প্রথম এই সম্মানলাভ করলেন। জার্মনি এবং ফ্রান্সে তিনি রসায়ন শাস্ত্র সম্বন্ধে পড়াশুনো করেন। পশ্চিম থেকে ফেরার পর চীন-এর 'ন্যাশন্যাল চেকিয়াং' বিশ্ববিদ্যালয়ে দশ বছর ধরে অধ্যাপকের পদে তিনি প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯৪৩-এ 'এক্সচেঞ্জ প্রফেসর' হয়ে তিনি ইংলণ্ডে যান। তাঁর নোবেল প্রাইজ পাবার খবর শুনে ডাঃ চৌ বলেছেন তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কী কারণে তাঁকে এই প্রাইজ দেওয়া হোলো। তিনি মনে করেন ১৯৪৪-এ ইংলণ্ডে তাঁর গবেষণা কাজের জন্যেই তাঁকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

ডাঃ চৌ চীন-এর নগণ্য একটি গ্রামে বাস করেন। নোংরা আর বিশেষত্ববর্জিত সেই গ্রাম। সেখান থেকে চেলিং নদী ধরে স্টিমারে চুংকিং পৌছতে পুরো একদিন লাগে।

ইংলণ্ডে এক বছর থাকার পর গত ফেব্রুয়ারিতে দেশে ফেরার পথে যখন তিনি ভারতবর্ষে পৌছলেন তখন পকেটে তাঁর একটি পয়সাও নেই। কয়েকটি বন্ধুর কৃপায় তিনি দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।

গত বছর থেকে বেতন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে কিছুই দেয় না। বর্তমানে তাঁর কোনোরকম চাকরি নেই। হোচুয়ান গ্রামে মাত্র একটি ঘরে সপরিবারে তাঁরা থাকেন। পরিবারের মধ্যে নিজে, তাঁর স্ত্রী ও ছ'টি ছেলেমেয়ে। সেই ঘরের ছাত ভাঙা ; ঝড়বৃষ্টির করুণার উপর নির্ভর করে তাঁদের থাকতে হয়। খবরের কাগজের এক প্রতিনিধি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি খবর দেন অত্যন্ত শস্তা ও খারাপ খাদ্যের উপর এঁ পরিবার বেঁচে রয়েছে, তাঁদের জামাকাপড়ও সস্তা আ ছেঁড়া।

নোবেল প্রাইজের আসল পরিমাণ ২০,০০০ মার্কি ডলার। কিন্তু ডাঃ চৌ-এর হাতে যখন নিজের দেশে হিসেব মতো ঐ টাকা এসে পৌছবে তখন তিনি পাবে মাত্র ৭০০ মার্কিন ডলার! এই ৭০০ ডলারে কো রকমে নিজের পরিবারকে এক বছরের জন্য তিনি খাদ্য

জামাকাপড় দিতে পারবেন। নতুন বাড়ি কেনা কিংবা অন্য ভালো বাড়ি ভাড়া করা ঐ টাকায় সম্ভব হবে না।

* * *

লড়াই থামার কিছুদিন আগে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডেলানো রুজভেল্টের অকস্মাৎ মৃত্যু হয়। ডেপুটি প্রেসিডেন্ট মিঃ ট্রুম্যান বর্তমানে আমেরিকার প্রেসিডেন্টের শূন্য আসন গ্রহণ করেন।

হঠাৎ খুসি

ফল্গু কর

আজকে আমার এমন হ'ল কেন
হঠাৎ খুসি মনকে দোলায় যেন
ফুলরা যেমন হাওয়ার বুকে ফোটে
নদীর ধারা ছলছলিয়ে ওঠে
তেমনি করে হঠাৎ অকারণ
খুসিতে আজ উঠল ভরে মন।
অবাক লাগে কেবল চেয়ে রই
মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে ওই,
আকাশ যেন অপরাজিতা ফুল
তারারা সব পরীর কানের দুল,
দুধের মত উপচে-পড়া আলো
লাগছে ভালো মায়ের মতো ভালো।
একটু আগেই ছিল রোদের তাপ
বাইরে ঘরে হাজার কাজের চাপ।
পৃথিবীটা অনেক পুরাতন
ভাবতে গেলে বিশ্রী লাগে মন।
হঠাৎ করে কোথায় কী যে হোলো
চাঁদের যাদু আলোয় ঝলোমলো,
পুরাণোকেই আবার চেয়ে দেখি
বদলে গেছে সব কিছু যে—এ কি !
নতুন চোখের পড়ল বুঝি আলো
যারেই দেখি তারেই লাগে ভালো !

আমাদের লাইব্রেরি

টাক্ ডুমা ডুম্ ডুম্ : জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রণীত ও শ্রীনন্দলাল বসু কর্তৃক চিত্রিত। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। দাম এক টাকা।

"টাক ডুমা ডুম"-এর গল্প আমাদের অতি প্রাচীন কালের গল্প। সেই শেয়ালের গল্প কে না জানে যে নাকের বদলে নরুন, নরুনের বদলে হাঁড়ি, হাঁড়ির বদলে টোপর, টোপরের বদলে বউ আর বউ-এর বদলে ঢোলক পেয়েছিলো ? এই অতি পরিচিত গল্পটিকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মেজ পুত্রবধূ এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্ত্রী। জ্ঞানদানন্দিনী ও তাঁর স্বামী শেষ জীবনের অধিকাংশ দিন রাঁচিতে কাটিয়েছিলেন। সেইখানে তাঁদের বড় নাতি ষোল বছর বয়স পর্যন্ত তাঁদের কাছেই মানুষ হয়েছিলেন এবং তাঁরই মনোরঞ্জনের জন্যে এই পুরোনো গল্পকে তিনি চমৎকার নাট্যরূপ দিয়েছিলেন।

বিখ্যাত শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসুর সাতটি সুন্দর-সুন্দর ছবি এই বইটিকে আরো মূল্যবান করে তুলেছে। প্রচ্ছদ-পটের ছবিটিও চমৎকার। ছোটোদের অভিনয় করার মতো ভালো বই বাংলায় খুব বেশি নেই। এই বইটি সেই অভাব অনেকাংশে পূরণ করবে।

কিপ্টে ঠাকুর্দা : শ্রীসুনির্মল বসু প্রণীত শিশু-প্রহসন। কুলজা সাহিত্য মন্দির। দাম ছ' আনা।

ছোট্ট বই। বেমালুম পাঞ্জাবির পকেটে চলে যায়। এই নাটিকায় সুনির্মল বসুর কয়েকটি সুন্দর কবিতা আছে। কিন্তু নাটক হিসেবে বিশেষ নতুন ধরণের নয়। রসিকতা-গুলি মামুলি এবং নাটকের গল্পাংশ দুর্বল।

জাপানী যুদ্ধের ছায়ায়: শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত প্রণীত। বিশ্বনাথ পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা। দাম এক টাকা।

ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন: "ব্রহ্মদেশ জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার ফলে, সেখানকার সামাজিক ও রাজনীতিক জীবনে সহসা যে বিপর্যয় দেখা দেয় এবং সেই বিপর্যয়ের আঘাতে উৎখাত হয়ে প্রবাসী ভারতবাসীরা যে সব দুঃখ কষ্ট ও লাঞ্ছনার ভিতর দিয়ে দেশে এসে পৌছান এই উপন্যাসে তারি একটি চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণনা করেছি। কাহিনীটা কাল্পনিক, সন্দেহ নেই।"

আজকাল বাজারে ছোটোদের জন্যে যে-সব রাশিরাশি আবোল-তাবোল খুনখারাপি আর ডিটেক্টিভ গল্পের বই বেরুচ্ছে তাদের ভিড়ে হঠাৎ এই বইটি পড়তে মন্দ লাগে না। সত্যের পটভূমিতে লেখা বলেই বইটি আজগুবি হয়ে দাঁড়ায়নি। শেষের দিকটা বড্ড তাড়াহুড়োয় লেখা বলে বইটি শেষ পর্যন্ত ভালো হয়ে উঠতে পারেনি।

একটি কথা: কাহিনীটা যখন সত্যিই কাল্পনিক তখন বাঙালীদের কাল্পনিক কাপুরুষতার উল্লেখ না করলেই লেখক বোধ হয় ভালো করতেন।

কে হত্যাকারী: শ্রীশিবরাম চক্রবর্ত্তী। বিশ্বনাথ পাব্লিশিং হাউস, কলকাতা। দাম এক টাকা।

আশ্চর্য সুন্দর বই। বইটির গোড়া থেকে শেষ পাতা পর্যন্ত রহস্যের চেয়ে হাস্যই বেশি আছে এবং পড়লেই বোঝা যাবে বাজারে যে-সব রাশিরাশি রাবিস এ্যাডভেঞ্চারে'র নাম দিয়ে প্রকাশিত হয় তাদের উপর কী রকম বিদ্রূপ শিবরামবাবু করেছেন। এই বইটি আমরা বিশেষ করে তোমাদের পড়তে অনুরোধ করছি।

ছাপা ও ছবি আরো অনেক ভালো হওয়া উচিত ছিলো।

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

এ-মাসের সবচেয়ে বড় খবরকে সবচেয়ে ছোট্ট করে বলা যায়: লড়াই থামলো! অর্থাৎ য়ুরোপের লড়াই শেষ হোলো, এখনো জাপান বাকী। শেষের দিকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিলো আজকালের মধ্যে লড়াই থেমে যাবে, তাই ৮ই মে'র (২৫শে বৈশাখ) সকালে খবরের কাগজের বড়বড় হরফে যখন পড়া গেলো জার্মানরা বিনাসর্তে আত্মসমর্পণ করেছে তখন সবাই খুব বেশি আশ্চর্য হয়নি: এই খবরের জন্যে সবাই যেন প্রস্তুতই ছিলো।

গত মহাযুদ্ধেও জার্মানরা হেরেছিলো, কিন্তু বর্তমান মহাযুদ্ধের এই যে পরাজয় তার সঙ্গে গতবারের পরাজয়ের কোনো তুলনাই হয় না। হিটলার, মুসোলিনি, হিম্‌লার এবং গোয়েবল্‌স্‌-এর মৃত্যু হয়েছে, গোয়েরিং ও অন্যান্য নাৎসি নেতারা আজ বন্দী। য়ুরোপ থেকে ফ্যাসিজিম আজ নিশ্চিহ্ন। জার্মানির সহর আর গ্রাম বোমার আঘাতে আজ বিধ্বস্ত।

যারা নিয়মিত খবরের কাগজ পড় তার জানো জার্মানদের এই পরাজয়ের মূলে রয়েছে লাল ফৌজের অসীম স্থৈর্য ও ধৈর্য, অদম্য শক্তি ও সাহস। কয়েক বছর আগেই জার্মান সৈন্য যখন রুষ দেশের গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে, সহরের পর সহর ছারখার করে, বোমায়-কামানে-বেয়োনেটে রুষদের ছিন্নভিন্ন করে স্তালিনগ্রাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিলো কেউ তখন কল্পনাও করতে পারেনি যুদ্ধের চাকা আজ এ-ভাবে ঘুরবে! বিদ্ধস্ত স্তালিনগ্রাদের উপর কোনোদিন ফাশিস্ত পতাকা উড়লো না। রুষদেশের স্ত্রী-পুরুষ প্রৌঢ় যুবক-বালক জার্মান সৈন্যের সেই অগ্রগতি রুদ্ধ করলো। শুধু

রুদ্ধ করলো না, তাদের পিছু হটালো এবং শুধু পিছু হটিয়েই ক্ষান্ত হোলো না স্তালিনগ্রাদ থেকে ঠেলে আনলো বার্লিন পর্যন্ত এবং বার্লিনের উপর ওড়ালো 'কাস্তে আর হাতুড়ির' লাল পতাকা। রুষদের এই আশ্চর্য বিজয়ের মূলে রয়েছে রুষজনগণের সমবেত শক্তি, সাহস ও চাতুর্য। তাই আজকের এই জয় জনগণের জয়।

গত দশ বছরেরও বেশি জার্মানির ফ্যাসিস্ত শক্তি পৃথিবীর বুকে ভয়াবহ কাণ্ড করে চলেছিলো। পৃথিবীতে বন্যা আছে, দুর্ভিক্ষ আছে, মহামারী আছে। দুর্বলের প্রতি রাজশক্তির অত্যাচারের কাহিনীও অজানা নয়। কিন্তু নাৎসি নেতাদের অত্যাচার ও নৃশংসতা পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। বীভৎস বিভীষিকার সৃষ্টি করে এই নাৎসি শক্তি, হিটলারের জার্মানি, এতোদিন প্রভুত্ব বিস্তার করেছিলো। নাৎসি জেস্টাপো এবং স্টর্ম-ট্রুপারের কাহিনী ক্রমশ আরো প্রকাশ পাবে এবং ভবিষ্যতের ছেলেমেয়েদের কাছে দৈত্য-দানব, রাক্ষস-খোক্কসের গল্প এই সব কাহিনীর কাছে নেহাৎই জোলো ও হাস্যকর ঠেকবে। হিটলারের দল আইনস্টাইন ও ফ্রয়েডের মতো বিশ্ববরেণ্যদের জার্মানি থেকে বিতাড়িত করেছিলো, টমাস মানের মতো শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকের অপমান করেছিলো। কত অসংখ্য জার্মান শিল্পী ও সাহিত্যিকদের তিল-তিল করে হত্যা করেছিলো তার সংখ্যা গুনে শেষ করা যাবে না। সাহিত্য ও শিল্প, মনুষত্ব ও মহত্ত্ব হিটলারের জার্মানিতে পদদলিত ও অপমানিত হয়েছিলো। হিটলারেরই এক পার্শ্বচর সেই বিখ্যাত উক্তি করেছিলো: Whenever I hear the word culture I feel for my revolver! (সংস্কৃতি'র কথা কানে এলেই রিভলভারের দিকে আমার হাত যায়।)

নাৎসিদের সৃষ্টি 'বিভীষিকার তাঁবুর' দরজা আজ খুলে গেছে। ভিতরে শুধু অসংখ্য নরকংকাল ও মৃত মানুষের খুলি। বছরের পর বছর অর্দ্ধাহার ও অত্যাচার সয়ে আজও যারা বেঁচে আছে তাদের চোখের দৃষ্টি ফাঁকা, আনন্দ ও বেদনাবোধের শক্তিও আজ লুপ্ত। কাগজে একটি ছবি দেখলুম—বুকেনওয়াল্ডের "ট্রফি টেব্‌ল্‌" (পুরস্কারের টেবিল)। সেই টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে মানুষের ছিন্ন মুণ্ড, ওষুধ দিয়ে ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে সেই সব মাথা সঙ্কুচিত করা, নাৎসিবন্দীদের দেহের এক একটি অঙ্গ কেটে সুন্দর কাঠের ফ্রেমে আটকানো, দেহের ছাড়ানো চামড়ার উপর নানা রকম উল্কি আঁকা ও মানুষের চামড়া দিয়ে তৈরি সুদর্শন টেবিল ল্যাম্পের ঢাকা! এই সব দেখেশুনে মনে হয় গত কয়েক বছর জার্মানিকে যারা চালনা করছিলো তারা ঠিক মানুষ ছিলো না। তারা যে কে, কেন যে তাদের এই ধরণের মানসিক বিকৃতি, এটা কোনো রকম অসুস্থতা কিনা—ভবিষ্যত তার বিচার করবে।

লড়াই থামলো। কিন্তু আমরা আজ উৎসব করবো কী নিয়ে? 'ব্ল্যাক আউট' উঠে গেছে তবু দেশের মুখে হাসি ফুটলো না। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে আমরা আজ জীর্ণ। আমাদের উপযুক্ত খাদ্য নেই, বস্ত্র নেই, ওষুধ নেই। আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা কারাগারে রুদ্ধ। আমাদের জাতীয় পতাকা আজও অপমানিত। তাই আমাদের কানে এই জয়োল্লাস অস্পষ্ট হয়ে ধ্বনিত হতে এবং আমাদের চোখে এই বিজয়ের রঙ ফিকে হয়ে ঠেকতে বাধ্য। লড়াই থামার আনন্দ তো সস্তায় বিলিতি জিনিস কিনতে পারার কিংবা আপিসে তিন দিনের ছুটির কিংবা ইস্কুলে ফলমিষ্টি খাবার আনন্দ নয়!

পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ মনীষী জর্জ বার্ণাড শ' লড়াই থামার খবর শুনে বলেছেন, "যে-সব নির্বোধরা এই শান্তি-পর্ব নিয়ে হৈ-চৈ আর উৎসব করছে—যেন সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে—তাদের দলে যোগ দিতে আমি রাজী নই। আসলে সম্ভবত য়ুরোপের সামনে এখন সবচেয়ে দুঃসময় অপেক্ষা করছে। বর্তমান য়ুরোপের ধ্বংস ও দারিদ্র্যের মধ্যে চিন্তাশীল লোকেরা কী করে আজ আনন্দোৎসব করতে পারেন? অসংখ্য মানুষ আজ অনাহারে শীর্ণ—তাদের

ভিতর ছোটো-ছোটো শিশুও আছে, বিরাট সহরগুলি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত, পথগুলি বন্যার জলে ভরা, লক্ষ-লক্ষ মানুষ নিহত ও বিকলাঙ্গ। কী করে আমরা ঘোষণা করতে পারি বার্লিন-কে আগুনে পোড়ানো মানেই জয়ী হওয়া? বার্লিন তো জার্মানদের রাজধানী নয়, শিক্ষায় ও সংস্কৃতিতে নিউইয়র্ক কিংবা লণ্ডনের মতো বার্লিনও সমস্ত পৃথিবীর রাজধানী। বহু শতাব্দীর পুরোনো এক সভ্যতাকে ধ্বংস করে তোমরা ভাবতে পারো না—এই হচ্ছে জয়। সে-সব দিন গত হয়েছে যখন লড়াই থামলেই বলা যেতো ওমুক দল বিজয়ী। এই লড়াই-এর ফলে ধ্বংস ও দারিদ্র্য এসেছে সকলেরই জন্যে। লড়াইকে কখনই কেউ বন্ধ করতে পারে না, চিরস্থায়ী শান্তি বলে কিছুই নেই। কামান, উড়ন্ত-বোমা কিংবা উড়োজাহাজ না থাকলেও যতদিন মানুষের ঘুঁষি আছে ততদিন সেই ঘুঁষি দিয়েই তারা লড়বে। এই সব নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাবের তা হলে কী দরকার? এই লড়াই-এর ফলে রাশিয়া যে য়ুরোপীয় জাতিদের ভিতর সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে বেরিয়ে এসেছে তার কারণ রুষদেশের জনগণ তাদের আদর্শ ও দেশের জন্যেই লড়েছে; অন্যান্য জাতি লড়েছে তাদের জমিদারদের জন্যে। আশাকরি এই ত্রিশক্তির ভিতর চিরকাল মৈত্রীভাবে থাকবে। তাদের মিলিত শক্তির পরিমাণ অসাধারণ। যদি তাদের মধ্যে কোনোদিন বিরোধ বাধে তাহলে ঈশ্বর আমাদের সহায় হ'ন!"

নরোত্তম কুণ্ডু আর তাঁর স্ত্রী আপেল খেতে বিশেষ ভালোবাসেন। হরিহর নরোত্তমের বাল্যবন্ধু। একদিন তিনি সস্ত্রীক নরোত্তমকে নিমন্ত্রণ করলেন। ঘরে ঢুকেই তাঁরা দেখলেন বিরাট এক টেবিলে সারবন্দী অনেকগুলো আপেল সাজানো রয়েছে। আপেল দেখেই তো নরোত্তম আর তাঁর স্ত্রী প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং চটপট ঘটা পারলেন তুলে নিলেন। হরিহর চুপচাপ দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করছিলেন। তিনি বললেন, "ভালো কথা, তোমরা আপেল নেবে নাও। কিন্তু কে কটা নিয়েছো গুনতে পাবে না। আমি একটা ধাঁধা বলছি, তার উত্তর ঠিকমতো না দিতে পারলে সব আপেলগুলোই কিন্তু ফিরিয়ে নোবো। তোমরা তো দেখেইছো আপেলগুলো সারবন্দী সাজানো ছিলো। প্রত্যেকটা সারিতেই আমি সমানসংখ্যক আপেল রেখে-ছিলুম। নরোত্তম দেখছি যতগুলো সারি ছিলো তার দশ-গুণ আপেল নিয়েছে। আর নরোত্তমের স্ত্রী দেখছি প্রত্যেকটা সারিতে যতগুলো আপেল ছিলো তার দশগুণ নিয়েছেন।—টেবিলে মাত্র একটি আপেল পড়ে রয়েছে।—এখন হিসেব করে বলতে হবে সবশুদ্ধু কতগুলো আপেল আমি কিনেছিলুম। ঠিক উত্তর দিতে না পারলে আমি কিন্তু আপেলগুলো বাড়ি নিয়ে যেতে দোবো না।"

তাঁরা স্বামী-স্ত্রীতে তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। আপেল খেতেই তাঁরা ভালবাসেন, হিসেব করতে নয়। তোমরা তাঁদের এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারো কি?

ধাঁধার উত্তর

এক ভাই পেয়েছিলো ২টো নীল কৌটো (১০টা সিকি), চারটে লাল কৌটো (১২টা সিকি) আর ২টো হলদে কৌটো (২টো সিকি)। অন্য দু'জনে প্রত্যেকে পেয়েছিলো ৩টে নীল কৌটো (১৫টা সিকি), ২টো লাল কৌটো (৬টা সিকি) আর ৩টে হলদে কৌটো (৩টে সিকি)।

উত্তরদাতার নাম

খুকু বাচ্চু ও ছোটোকাকা (২৩৬৭), যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), অলকা-দত্ত (১৬৯৯), সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (২৪২১), গোপাল ভট্টাচার্য (২৪০৭), সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২২৭৬), মৈত্রেয়ী দাস (২২৬৩), সর্বাণী রায় (২১১০), পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (২৪০১), সুব্রত সেনগুপ্ত (২২৭৪), সমীরগোপাল গোস্বামী (৭৮), রণজিৎ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩৯৫), মণিকা সরকার (২২৮৯), অরিজীৎ চক্রবর্তী (২৩৫৬), কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় (২৪১৪), রুপালী তালুকদার (১৩৫২), সুভাষচন্দ্র হোর (২০২৫), শচীন ভৌমিক (২৪৩৮), সুখময় দাশগুপ্ত (১৩০৯), সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), সমীরকুমার গুপ্ত (২১৬৩), সাধনা দাস (২১৯৪), শৈলেন্দ্রকুমার সরকার (২২২৬), তুষারকান্তি সিংহ (২১৩২), সৌরেন বোস (১৯৮৩), নির্মল গুহ ও সলিল গাঙ্গুলি (২০৯৪), কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য (২৩০১), মুক্তেশ্বর নন্দ (২৪৪৪), রেণুকা বিশ্বাস (১৬৬২), সৈয়দ নূরল আলাম (২০৬৬)।

রবীন্দ্রনাথঠাকুর

ছেলেমেয়েদের বই

কবিতা

কথা ও কাহিনী	১৷৷০
শিশু *	১৷৷০
শিশু ভোলানাথ	১৲
ছড়ার ছবি*	২৲

নাটক

মুকুট	৷৷০
শারদোৎসব	১৷০
ডাকঘর	৸০

গল্প

গল্পসল্প	১৷০
প্রবেশিকা গল্পগুচ্ছ	১৲

জীবনী

ছেলেবেলা	১৷৷০

* যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট কলিকাতা

রংমশালের নিয়মাবলী

১। হয় বার্ষিক না হয় যান্মাসিক গ্রাহক হতে হয়।

২। বৈশাখ থেকে বর্ষ আরম্ভ।

৩। নতুন-গ্রহক হলে মনি-অর্ডার কুপনে "নতুন গ্রাহক" এই কথাটি এবং নাম ও ঠিকানা স্পষ্টাক্ষরে লেখা থাকা দরকার।

৪। নমুনা সংখ্যার জন্যে সতের পয়সার ডাক টিকিট পাঠাতে হয়।

৫। অমনোনীত রচনার সঙ্গে ফেরৎ পাঠাবার ডাক-টিকিট না থাকলে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করে ফেলা হয় এবং এ-কারণেই ভবিষ্যতে সেই সব রচনা সম্বন্ধে কোনো খবর জানানো সম্ভব নয়।

৬। চিঠিপত্র লেখার সময় গ্রাহক নম্বরের উল্লেখ করবে এবং উত্তর পেতে হলে রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবে। গ্রাহক নম্বর এবং রিপ্লাই-কার্ড না পাঠালে কোনো চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় বলে দুঃখিত।

৭। রংমশাল বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। পত্রিকা না পেলে পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে আমাদের জানানো দরকার। দেরি হলে সব সময় দ্বিতীয় কপি পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হয় না।

৮। চিঠিপত্র, টাকাকড়ি সমস্তই নীচের ঠিকানায় পাঠানো দরকার।

৯। বাইরের এজেন্সির জন্যে আমাদের কাছে চিঠি লিখে বিশদ বিবরণ জানুন।

C/o সংকেত ভবন
৩নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট
পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

বিশেষ দ্রষ্টব্য : **জ্যৈষ্ঠ** মাসে যাদের চাঁদা শেষ হবে তারা **আশ্বিন** পর্যন্ত গ্রহক থাকতে চাইলে এক টাকা কিংবা **চৈত্র** পর্যন্ত গ্রাহক থাকতে চাইলে আড়াই টাকা মনি-অর্ডারে পাঠিও। তোমাদের কাছ থেকে অন্য রকম চিঠি না পেলে যথাসময়ে ভি. পি. তে পাঠানো হবে। ভি. পি. ফেরৎ দিয়ে আশাকরি আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত করবে না।

মেবার মহিমা

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

মূল্য—একটাকা

- সরল কবিতায় মেবারের গৌরবময় ইতিহাস
- বালক-বালিকাগণের পাঠপোযোগী
- জাতীয় চরিত্র-গঠনের শ্রেষ্ঠ উপাদান

প্রাপ্তিস্থান :

সংকেত ভবন
৩ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট
পোঃ আঃ এলগিন রোড
কলকাতা

কিংবা যে-কোনো ভালো বইএর দোকান

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta
Founded by Prof. K. N. Sen.

[দশম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : আষাঢ়, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

জিতুবাবুর জিৎ

অন্নদাশঙ্কর রায়

মাসী গো মাসী পাচ্ছে হাসি
মরছি ফেটে আহ্লাদে
ও মাসী, তুই পাল্লা দে।
হিটলার তো চিৎ হয়েছে
মুসোলিনি পটাং
জাপু এখন বর্মা ছেড়ে সটাং।
আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
সিঙ্গি ভালুক মিতে।
লড়াই যাবে থেমে
চীনে বাদাম সস্তা হবে ক্রেমে।
চীনে বাদাম! দো পয়সা!
চীনে বাদাম! এক পয়সা!
চীনে বাদাম! আধ পয়সা!
ও মাসী, দে
পয়সা দে,
আধলা দে।
মরছি ফেটে আহ্লাদে।
আমরা গেছি জিতে
আমরা মানে আমাদের সেই
ঈগলপাখী মিতে।
জারমানকে হার মানিয়ে
আমরা গেছি জিতে।
আমরা মানে আমাদের সেই
সিঙ্গি ভালুক মিতে।

আমার ধন্যবাদ জ্ঞাপন

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

প্রথম প্রচেষ্টা :

ডলু মাসি,

তোমার রুমাল-উপহার লাভ করে' আমি ধন্য হয়েছি, —তার জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। প্রত্যেক বছর

পূজোর সময় এম্‌নি এক একখানি রুমাল উপহার দিয়ে তুমি যে আমাকে স্মরণ করো তার কথা আমি আমরণ মনে রাখব। এজন্য আমাকে যে কি কৃতজ্ঞতাপাশে তুমি বেঁধে রেখেচ তা কেবল বিধাতাই জানেন। আরো আনন্দের বিষয়, এবারের রুমালে তুমি আমার নাম তুলে দিয়েছ—রুমালটাকে আমার মতই নামজাদা করে' ছেড়েচ। সেজন্যও আমি চিরঋণী রইলাম। কি করে যে বছরের পর বছর আমাকে, বিশেষ করে' আমার নামকে তুমি মনে রাখো, কিছুতেই ভুলে যাও না, তাই আমি বিস্মিত হয়ে ভাবি: সালু মাসি আমাকে একটা চিঠি লেখার প্যাড্ পাঠিয়েছেন। যদিও তাতে পাতা বেশি নেই, তবু এই কাগজ সঙ্কটের দিনে সেটা খুব কাজে-লাগবে। তোমার ঠাণ্ডা লেগেচে জেনে আমি চিন্তিত হলাম। মেসোমশাই কেমন আছেন? বেশী আর কি? এইখানেই ইতি করা যাক্। সালু মাসিকেও আবার লিখতে হবে। তাঁকেও ধন্যবাদ জানানো দরকার। আমার প্রণাম। ইতি।

তোমার স্নেহের
শিবরাম

দ্বিতীয় প্রচেষ্টা :

প্রিয় ডলু মাসি,

তোমার রুমালটি পেয়ে যে আমি কি পরিমাণ পুলকিত হয়েছি তা বল্‌তে পারি না। এবার পূজোয় ওইখানাই গলায় বেঁধে বেড়াব। আমার মনে হচ্ছে ওটা না এলে আমার পূজোর উৎসব এবার সম্পূর্ণ হোতো না। কিন্তু ওতে যে আমার নাম খোদাই করা হয়েছে সেটা কি তোমার নিজের হাতে বুনে তোলা? এত সুন্দর তোমার বোনার হাত আমি জানতাম না, স্বচক্ষে দেখেও আমার বিশ্বাস হচ্ছে না। কিন্তু একথাও তো নিশ্চয় যে আমার নামলাঞ্ছিত রুমাল রেডিমেড্ কোথাও কিনতে মেলে না, অন্তত এখনো বাজারে বেরয়নি। যাই হোক্, উপহার রূপে তোমার এই রুমাল পাঠানোর আইডিয়াটা চমৎকার। এটা আমার কাজে লাগ্‌বে—এই রুমালটাতো বটেই, এই আইডিয়াটাও। ধরো, যদি কদাচ তোমাকে বা তোমার কর্ত্তৃক প্রকাশিত আমার কোন মাস্তুতো বোনকে কখনো কিছু উপহার দেবার প্রয়োজন হয় তখন তোমার এই আইডিয়াটার, এমন কি, এই রুমাল্‌টার ওপরেই আবার খোদ্‌কারি করা যাবে। দুটোই আমি সযত্নে রাখলাম। সত্যি বল্‌তে কি, আমার এক বন্ধু আজ সকালে এসেছিলেন। রুমালটায় চোখ পড়বামাত্র তিনি আর্ত্তনাদ করে' উঠলেন—'কী সর্ব্বনাশ'!···সালু মাসি আমাকে একখানা অতি উপাদেয় লেখার প্যাড্ পাঠিয়েছেন। তোমার ঠাণ্ডা লেগেছে জেনে আমি বড় ভাবিত হয়ে আছি। নস্যি নিয়ে দেখেছ কি? ঠাণ্ডায় নস্যি নাকি খুব উপকারী। মেসোমশাই কেমন আছেন? তাঁকেও নস্যি নিতে বোলো। 'প্রিভেন্‌সন্ ইজ্ বেটার্ দ্যান্ কিওর্।' আর তুমি যদি এখনো নস্যির উপকারিতা পরীক্ষা না করে' থাকো পত্রপাঠ করতে দ্বিধা কোরো না। 'বেটার্ লেইট্ দ্যান্ নেভার্।'

আমার শতকোটি প্রণাম। ইতি
তোমার আদরের
রাম

তৃতীয় প্রচেষ্টা :

সবিনয় নিবেদন,

প্রিয় মহাশয়া, আপনি কি কৃপা করে' আমাকে জানাবেন, বছরের পর বছর কেন আমার প্রতি—এবং আমার ন্যায় হতভাগ্য আপনার অন্যান্য বোনপোর প্রতি আপনার ইদৃশ অহেতুক দয়া হয়ে থাকে? মার দয়াই মারাত্মক বলে' জানি, কিন্তু এখন তো বসন্ত কাল নয়, মাসিমা ইত্যাদির দয়া এই শরৎকালে কেন? বছরের পর বছর ধরে কেন আপনার এইরূপ উপদ্রব আমরা সইবো? আমরা তো কখনো আপনার কোনো ক্ষতি করিনি—কার্য্যতঃ নয়, যদি বা মনে মনে ক্ষতিকর চিন্তার প্রশ্রয় দিয়ে থাকিতো সে ক্বচিৎ। একে আমার রং তেমন ফর্সা নয়, তার ওপরে যদি এই কট্‌কটে লাল রুমালটা আমি গলায় বেঁধে বেড়াই তাহলে আমার এই চেহারার কেমন খোল্‌তাই

হবে তা কি আপনি একটুও ভেবেচেন? পাড়ার যত কুকুর আমার পেছনে লাগুক্, আর বিশ্বশুদ্ধ সবাই আমার দিকে প্যাট্ প্যাট্ করে চেয়ে থাক্—এই কি আপনার মনের ইচ্ছে? আর এক কথা—আপনার এই জাতীয় উপহার—কণ্ঠে ধারণ করা দূরে থাক্—পকেটের মধ্যে লুকিয়ে রাখতেও আপনার কোনো বোনপোকে কখনো দেখেচেন কি? এই লাল রুমাল তারা কোন্ কাজে লাগবে সম্ভবতঃ আপনি জানেন না। না জানাই ভালো। কিন্তু এই কথা আপনি জেনে রাখুন গোটা শারদীয় উৎসবকে বিভীষিকা করে' তুলতে আপনার এই একখানা রুমালই যথেষ্ট। এই কথাও আমি এখানে অনুযোগ করি, আপনার বোনও, ঠিক আপনার বংশের ধারা বজায় রেখে, এমন বিচ্ছিরি এক লেখার প্যাড্ আমাকে পাঠিয়েছেন যে তার দিকে তাকানো যায় না। আপনার ঠাণ্ডা লেগেছে—এই সুখবর পাওয়া গেল। আশা করি এই ঠাণ্ডা আশু বৃদ্ধি লাভ করে' উপযুক্ত পরিসমাপ্তি লাভ করবে। মেসোমশাই মানে আপনার স্বামীর সংবাদে আমাদের কোনোই আবশ্যকতা নেই। বরং তাঁর নিকট থেকে আপনার সংবাদ লাভের আশাতেই আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবো। ইতি

আপনার মায়াপাশ থেকে বিমুক্ত
কিন্তু রুমাল পাশে জড়িত
ভবদীয়
শিব্রাম্ চকর্‌বর্‌তি

চতুর্থ প্রচেষ্টা :

প্রিয় মাসিমা,

এইমাত্র তোমাকে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম, কিন্তু তাতে আমার মনের ভাব সম্যক্ ব্যক্ত হয়নি দেখে খস্‌ড়াটা ছিঁড়ে ফেল্‌তে হোলো। আমার ভাষার এমন শক্তি নেই, এত বহর নেই যে সে-ভাব প্রকাশ করে। 'আনন্দেরই জোয়ার থেকে এসেছে এক বাণ!'—রবীন্দ্রনাথের এই গানের দ্বারা যদি বা তার একটু ব্যক্ত হয়! সেই বাণ এসে আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে এই মাত্র বলতে পারি। অতএব আমার যে কথা না-বলা রইলো, এই চিঠির না লেখা লাইন্‌গুলির ভেতর থেকে নিজগুণে তুমি বুঝে নেবে এই আমার অনুরোধ। ঠাণ্ডাটা কি খুব জমাট্ ভাবে লেগেছে, সত্যি? চিরদিন ঠাণ্ডা বেচারা মেসোমশাই কিরূপ আছেন? ইতি, তোমারই শিব্রাম।

পঞ্চম প্রচেষ্টা :

আমার প্রিয় ডলু মাসি,
আবার তোমার রুমাল আসি,
দেখা দিল এবার পূজায়।
কাট্‌ছিল দিন যেমন মজায়
তেমনি তোমার রুমাল এসে
কাঁদিয়ে দিল অবশেষে।
আমায় বুঙিয়ে দিয়ে যাও,
তোমায় বলেছি কোথাও?
আমি বলেছি কখন্?
তবু যে এমন
সঙীন্ উপহারে
রঙীন করিলে আমারে?
পেয়েছিলেম প্রথম ভাগে
মাসির দেখা ফাঁসির আগে।
সেই মাসি কি নানান্ বেশে
ছড়িয়ে গেল দেশে দেশে?
সে যাই হোক্, কথাটা এই,
স্ফূর্ত্তি যা মোর রুমাল পেয়েই—
বলব কি তা? যায় না ঢাকা।
জিন্দাবাদ্ এই লাল পতাকা!
সন্দেহ হয়, মাসি তুমি,
বোধ হয় মোদের পিতৃভূমি
রুষের প্রতি তুষ্ট হয়ে
আর জাপের প্রতি রুষ্ট হয়ে
ভেবে আমায় নেহাৎ আপন
পাঠিয়েছ এই লাল আলাপন?

আমিও মনের আনন্দেতে
পাঠাই প্রলাপ পদ্যে গেঁথে—
লাল রুমালের লালসা মোর
উছ্‌লে উঠুক্ ছন্দ-মুখর—
পিছলে পড়ুক অন্ধ-মতন !
(মাপ কোরো মোর ছন্দপতন।)
মাসি, তোমায় হাজার প্রণাম।
জানায় কাতর এই শিব্‌রাম।

ষষ্ঠ প্রচেষ্টা :

প্রিয় ডলু মাসি,

তুমি জানলে অবাক হবে, বোধ হয় বিশ্বাস করবে না যে এই নিয়ে তোমাকে ছ' ছখানা চিঠি লেখার আমি চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে কারণেই হোক্, কোনটাই মনের মত না হওয়ায়—

সপ্তম প্রচেষ্টা :

প্রিয় ডলু মাসি,

ভাবলে অবাক্ হতে হয়—

অষ্টম প্রচেষ্টা :

প্রিয় ডলু মাসি,

কলম ধরলে, এক এক সময়ে—

নবম প্রচেষ্টা :

প্রিয় ডলু মাসি,

দশম প্রচেষ্টা :

প্রিয় সালু মাসি,

একাদশ প্রচেষ্টা :

মলু ডাসি,

দ্বাদশ প্রচেষ্টা :

বিচ্ছিরি ডলু মাসি,

ত্রয়োদশ প্রচেষ্টা :

আমি মারা যাচ্ছি। ঘরটা যেন আমার চারদিকে ঘুরছে। না কি—আমিই ঘুরপাক্ খাচ্ছি ? টস্ টস্ করে' চোখের জল পড়ছে—আমার এই প্যাডের ওপর—এই প্যাডের ওপর—

চতুর্দ্দশ প্রচেষ্টা :

প্রিয় ডলু মাসি,

তোমার এবারকার শারদীয় উপহারের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ। এ বছর সালু মাসির কাছ থেকে আমি একখানা রুমাল পেয়েছি। তোমার কাছ থেকে চিঠি লেখার প্যাড্‌খানা পেয়ে কী যে বাধিত হলাম কী বল্‌ব! এখানা আমার এত কাজে লেগেছে যে বল্‌তে কি, এর মধ্যেই চিঠি লিখে লিখে এটা শেষ করে' ফেল্লাম। আমার প্রণাম নিয়ো। ইতি

তোমার স্নেহবদ্ধ
শিবরাম।

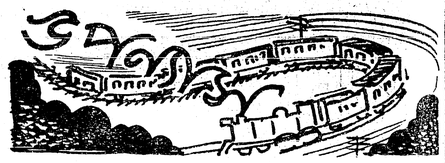

পদীপিসির বর্মি বাক্স

লীলা মজুমদার

তখন আমার গায়ের লোমগুলো খড়খড় ক'রে একটার পর একটা উঠে দাঁড়ালো' আর পা দুটো তুল্‌তুলে মাখনের তৈরী মতন হ'য়ে গেলো, কাণের মধ্যে স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম শোঁশোঁ করে সমুদ্রের শব্দ। যে আমি কোনওদিনও অঙ্কে চল্লিশের বেশী পেলাম না, সেই আমি কি তবে আজকে এক শ' বছর ধরে' কেউ যা পায় নি সেই খুঁজে পাব ?

খট্ ক'রে হাঁটুদুটো ফের শক্ত হ'য়ে গেলো আর আমি তরতর ক'রে গম্বুজের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে উপরে উঠে গেলাম। উপরে গিয়ে দেখি গম্বুজের চারিদিকটা গোলপানা

টে কিন্তু মাঝখানটা ফোঁপ্‌রা, কেমন একটু ভিজে ভিজে ন্ধ, আর ভিতরের দেয়াল কেটে লেখা খোঁচা খোঁচা রফে : "ইতি শ্রীগজার একমাত্র আশ্রয়।"

ধপাস্ ক'রে লাফিয়ে পড়লাম ওর ভেতরে। দেখলাম ম্বুজের গায়ে কুলুঙ্গির মতন ছোট তাক করা আছে, াধ হয় তারই বাইরের দিকটাতে যে খোপ আছে তাতেই ায়গার অভাবে পায়রা বাসা করে নি। তাই দেখেই ামার সন্দেহ হয়েছিল।

মাটিতে বসে দু' হাত দিয়ে কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে মাঝারি াইজের একটা বাক্স নামালাম। কি আর বল্‌ব! তার ং একটুও চটে নি, একেবারে চকচক্ করছে, আর ঢাক্‌নার পর আঁকা ড্রগনের সবুজ চোখ জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

কোলের উপর সেই বাক্স রেখে তা'র ঢাকনা খুলে ফেল্লাম। উপরে খানিকটা ছেঁড়া মতন হল্‌দে হাতে-তৈরী কাগজ, মাঝখানে একটা ছ্যাঁদা ক'রে সুতো চালিয়ে কাগজগুলো একসঙ্গে আট্‌কানো, যাকে বলে পুঁথি। তার এক পৃষ্ঠায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা, অন্য পৃষ্ঠায় খোঁচা খোঁচা হরফে গজা কি সব লিখেছে।

সেই পুঁথিও নামালাম। নামিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। বাক্সের মধ্যে আট দশটা সাদা লাল নীল সবুজ পাথর বসানো আংটি, হার, বালা আর এক জোড়া জলজলে লাল চুনী বসানো কাণের ফুল। বুঝলাম স্বপ্নে পদীপিসি এইটাই আমার মাকে দিতে বলেছিলেন। তাই সেটা তখুনি পকেটে পুরলাম।

তারপর পুঁথিটা খুলে, কি আর বল্‌ব, দেখ্‌লাম যে শ্রীগজার লেখা পড়া আমার সাধ্যি নয়।

বুঝলাম পুঁথিটা সেজ-দাদামশাইয়ের হাতে দেওয়া দরকার, বাক্সটা দিদিমাকে দেব, যেমন খুসি ভাগ ক'রে দেবেন। তখন আমি ওদের ক্ষমা করলাম। আমাকে গোল হয়ে মিছিমিছি আক্রমণ করার জন্য ওদের উপর একটুও রাগ রইল না।

বাক্সটা নিয়ে সে যে কত কষ্ট ক'রে দেয়াল বেয়ে গম্বুজের মাথায় উঠলাম, আবার দেয়াল বেয়ে বাইরের দেয়াল দিয়ে নাম্‌লাম সে আর কি বল্‌ব। তারপর বাঁদর তাড়ান সিঁড়ির খাঁজ বেয়ে নামাটাও প্রায় অমানুষিক কাজ। নেমে দেখি ওরা সবাই চক্রাকারে তখনও আমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে, কিন্তু আমার হাতে ধরা একশ' বছর আগে হারানো পদীপিসির বর্মি বাক্স দেখে সবাই নড়বার চড়বার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, কেবল ভ্যাল্‌ভ্যাল্ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

আমি কাউকে কিছু না ব'লে দিদিমার হাতে বাক্স দিলাম, আর ঢাক্‌নির তলাটা থেকে হল্‌দে পুঁথি বের করে সেজ-দাদামশাইয়ের হাতে দিলাম। সেজ-দাদামশাই অন্যমনস্ক ভাবে সেটা হাতে নিয়ে ওলটাতে লাগ্‌লেন। আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোকও অভ্যাস মতন নিঃশব্দে এগিয়ে ওঁর ঘাড়ের উপর দিয়ে দেখতে চেষ্টা করতে লাগ্‌লেন। কিন্তু সেজ-দাদামশাই খুব লম্বা আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক খুব বেঁটে হওয়াতে বিশেষ সুবিধে হ'ল না।

হঠাৎ সেজ-দাদামশাই বিষম চম্‌কে উঠে বল্লেন, "আরে, এ যে বাবার পদীপিসির ছোট বোন মণিপিসির বিয়ের আসন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই পুঁথি। এ কোথায় পেলি ? আরে এ হারানোর ফলেই ত পুরুত ঠাকুর ভুলভাল মন্ত্র পড়িয়েছিলেন আর তার ফলেই বাবার মণিপিসি আর পিসেমশাই সারাটা জীবন ঝগ্‌ড়া ক'রে কাটিয়েছিলেন।"

তারপর পাতা ওলটাতেই গজার হাতের লেখা চোখে পড়াতে আরও বিষম চম্‌কে গিয়ে বল্লেন, "শোন শোন, পদীপিসির ছেলে শ্রীগজা কি লিখেছে শোন। আরে এটা যে একটা ডায়েরীর মতন শোনাচ্ছে, না আছে তারিখ, না আছে বানানের কোনও নিয়মকানুন। ব্যাটা সাক্ষাৎ মাসির বিয়ের জায়গা থেকে বিয়ের মন্ত্রের পুঁথি চুরি করে তাতে কি লিখেছে দেখ :

"সোমবার—সর্বনাশ হইয়াছে। মাতাঠাকুরাণীর গোরুর গাড়ী উঠানে প্রবেশ করিতেই আগে নামিয়া আমার

হাতে বর্মি বাক্স গুঁজিয়া দিয়া মাতা ঠাকুরাণী অনন্ত তুলিয়া গিয়াছেন ও অভাসমতন বাড়ীশুদ্ধ সকলকে তাড়নপীড়ন করিতেছেন।

"মঙ্গলবার—আর পারা যায় না! বাক্স আমি কিছুতেই কাহাকেও দেব না, স্থির করিয়াছি; অথবা ইহারা যেরূপ খোঁজাখুঁজি সুরু করিয়াছে, বাক্স বগলে লইয়া উহাদের সঙ্গে সঙ্গে খোঁজা ছাড়া কোনও উপায় নাই। বগলে কড়া পড়িয়া গিয়াছে।

"শুক্রবার—সৌভাগ্যবশতঃ তাড়ীওয়ালার বাড়ীতে বাক্স লুকাইবার সুবিধা পাইয়াছি। খোঁজাখুঁজি বন্ধ হইলে বাড়ী আনিব।

"সোমবার—তাড়ীওয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করিয়া গাঁজার ব্যবসা সুরু করিয়াছি। বিষম লাভ হইতেছে। এদিক ওদিক ঘোরাঘুরিও করিতে হয়।

"শনিবার—জিনিষপত্র বহু কিনিয়াছি, বহু দানও করিয়াছি। ইহারা জিনিষ লয় অথচ আমাকে সন্দেহের চক্ষে দেখে তাই মনে করিয়াছি সহরে বাড়ী কিনিব।

"রবিবার—ঘটনাক্রমে গম্বুজের ভিতরকার এই নির্জন স্থান আবিষ্কার করিয়াছি। এখানেই আমার এই লিপি ও বাকী গুটিকতক অলঙ্কার রাখিলাম। ইহাদের বিবাহাদি হইলে উপহার দেওয়া যাইবেক্! ইতি শ্রীগজা।"

সেজ-দাদামশাই হতাশ গলায় বল্লেন, "তারপরই বোধ হয় ঠাকুরদা বাঁদরের সিঁড়ি কাটিয়ে দিয়েছিলেন, গজার আর কাউকে গয়না উপহার দেওয়া হয়নি। শেষে ত সে কলকাতাতেই থাক্‌তো শুনেছি। পদীপিসির ফিক্ ক'রে হাসারও কারণ বোঝা গেল। তাঁর মতে গজার থেকে বাক্স পাবার যোগ্য পাত্র আর কেইবা ছিলো।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর খেন্তিপিসি বল্লেন, "বাক্সে কি আছে?"

দিদিমা ঢাকনি খুলে দেখলেন। বল্লেন, "আমি ভাগ ক'রে দিচ্ছি। খেন্তি যদিও তুই আমার কাছ থেকে সেবার তিন শ' টাকা ধার নিয়ে শোধ দিস্‌নি, তবু এই হারটা তুই নে।" সেজ-দাদামশাইকে বল্লেন, "ঠাকুরপো, তোমার কথা যত কম বলা যায় ততই ভালো: তুমি এই হীরের আংটি নাও। এটা মেজ-ঠাকুরপোর ছেলেকে দেব; এটা পাঁচুর; এটা হ্যাড়ার প্রাপ্য; এটা পুটকী পাবে; এটা বুচ্‌কি পাবে; এই বালাজোড়া আমার ভাগ, আমার মেয়েকে দেব।" ব'লে মাকে দেবার জন্য আমার হাতে দিলেন। তারপর সকলের সাম্‌নে আমাকে আদর ক'রে বল্লেন, "বাকী রইল এই পান্নার আংটি, এটা দাদা তোমার, কারণ তুমি খুঁজে না দিলে এদের দ্বারা হ'ত না। এবার চল দিকিন্, কত পুলি বানিয়েছি হাত মুখ ধুয়ে খাবে চল। হ্যাঁ, বাক্সটা কিন্তু আমি নিলাম মশলা রাখবো।"

দিদিমার সঙ্গে চলে যেতে যেতে শুন্‌লাম খেন্তিপিসি পাঁচুমামাকে বল্‌ছেন, "তাকে দিল সাত নহর আর আমার বেলা এক ছড়া।" আর চিম্‌ড়ে ভদ্রলোক সেজ-দাদামশাইকে বল্‌ছেন, "স্যার আমার দু শ' টাকা।"

এম্‌নি ছিলো আমার প্রথমবার মামারাড়ী যাবার ব্যাপার।

সমাপ্ত

ভাঙতে পারে

পরিমল রায়

ভাঙ্‌তে পারে ঘটি-বাটি
বোতল শিশি—এই তো?
আর যে কিছু ভাঙ্‌তে পারে
হদিস্ জানা নেই তো?

ছাখো ভাঙ্‌তে পারে ঘুম,
ভাঙ্‌তে পারে গান,
ভাঙ্‌তে পারে রাগ, লজ্জা, অভিমান।
ঠাণ্ডা লেগে ভাঙ্‌তে পারে গলা,
চিমসে লোকের চুপ্‌সে ভাঙে গাল।
জলকাদা পথ ভাঙে যা'রা তা'দের
হাড়-ভাঙা সব হাল।

আড্ডা ভাঙে, সভা ভাঙে,
হঠাৎ ভাঙে ভুল,
আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ে
মন ভেঙে আকুল।
সিঁড়ি ভেঙে ছাতে ওঠে,
টাকা ভাঙায় খদ্দের
পুঁজি ভেঙে ঘরকন্না,
নেশা ভাঙে মদ্যের।

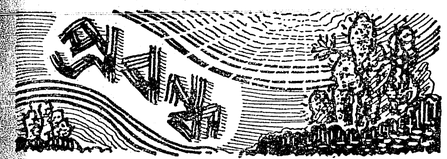

ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এদিকে যে রাত হয়ে গেছে সে খেয়াল কারুর ছিল না। ক্ষুদে শয়তানের গল্প বলতে বলতে কুৎকুতে ভদ্দরলোক স্থানকাল সব যেন ভুলে গিয়েছিলেন, আর শুনতে-শুনতে জগু পান্না এবং শ্রীযুক্ত ঘোঁতনেরও মনে ছিল না বাড়ি ফেরবার সময় হয়েছে। ইতিমধ্যে মাস্টারমশাই এসে হয়ত পেঁচার মত মুখ করে বাবাকে বোঝাচ্ছেন ছেলেগুলোর দ্বারা কিস্‌স্থ হবে না।

ভদ্রলোকই সকলের চমক ভাঙলেন। আকাশের জলজলে তারাগুলোর দিকে চোখ পড়তে প্রায় চমকে উঠলেন, "ওরে বাবা, বেজায় রাত হয়েছে দেখছি! এবার সবাইকার বাড়ি ফেরা ভালো।"

জগু প্রশ্ন করলে, "আপনারও কি মাস্টারমশাই আসবার ভয় আছে না কি?"

ভদ্রলোক হেসে ফেল্লেন। "না তা ঠিক নয়। তবে তোমাদের এ ভয় আছে! তাই।"

পান্না বলল, "কিন্তু ক্ষুদে শয়তানের কথা কি শেষ হয়ে গেল?"

ভদ্রলোক বল্লেন, "মোটেই না। এই ত সবে সুরু করেছি। আরো কত কথা বলবার আছে। পণ্ডিতেরা কী করে ক্ষুদে শয়তানের চাষ দেন, চাষ দিয়ে কী করে এদের সম্বন্ধে আরও অজস্র খবর জোগাড় করেন, তারপর সেই সমস্ত খবর জেনে কী ভাবে এই সব ক্ষুদে শয়তানদের সঙ্গে লোমহর্ষক লড়াই সুরু করেন—এ সব কথা বলতে ঢের সময় লাগবে! আস্তে আস্তে সব কথাই বলব। কিন্তু আজ নয়, আর একদিন।"

সম্পাদকের বক্তব্য:

জীবাণু সম্বন্ধে আরও অজস্র তথ্য দিয়ে "ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব" শীঘ্রই পুরো বই হিসেবে প্রকাশিত হবে। কবে বেরুবে সে কথা নিয়মিত রংমশালের পাতা ওল্টালেই জানতে পারবে।

কৈশোরক

সতী দেবী

কৈশোর দিন তন্দ্রায় বিহ্বল
আবির আবেশে ভরা,
ভাবনাবিহীন উৎসবে উজ্জ্বল
উচ্ছল হাসি-ঝরা।

মনের নদীতে জোয়ারের জল
মদির আবেশ ঢালে,
স্নিগ্ধ অতল রহস্য নীলিমায়
স্বপ্নের দীপ জ্বালে।

সত্য-জীবনে সুন্দর যারা নয়—
কঠিন বর্ণহীন,
সে-মায়া পরশে তখনি রঙীন হয়—
দুঃখ-স্বপ্ন-লীন।

গোধূলির আলো রাঙা অঞ্জলি হয়ে
দেখি মুঠো-মুঠো পড়ে,
কুচি ফুলেরা সান্ধ-সমীর ছুঁয়ে
অর্ঘ্যের মতো ঝরে।

মুক্তা-ছড়ানো চঞ্চল বারিধারা
বর্ষার মেঘ বহি,
ধরণীর বুকে নেমে আসে বাধাহারা
সংগীতে কথা কহি।

অনাগত দিন কত কল্পনা আনি
মনখানি ভরে থাকে,
কত সন্ধ্যার কত অশ্রুত বাণী
ইশারাতে যেন ডাকে।

কৈশোর মোর সোনার তরণী বেয়ে
কোন পথে ভেসে যাও ?
স্পন্দিত করি বিচিত্র গান গেয়ে
ময়ূরপঙ্খী নাও !

পরের দিন বড়দিন

এডালবার্ট স্টিফটার

ইতিমধ্যে মাঝরাত হয়ে গেলো! নিতান্ত শিশু বলে ইতিপূর্বে মাঝরাত পর্যন্ত কখনো তারা জেগে থাকেনি। বড়দিনের আগের দিনেও কখনো তারা মাঝরাতের চেহারা দেখেনি। যদিও উৎসবের আনন্দে তাদের মন ভরা থাকতো তবু বেশি রাত হবার আগেই ঘুমে ঢলে পড়ছে! মাঝরাতের ঘণ্টাধ্বনি কখনোই তাদের কাছে পৌঁছয়নি। অত কাছে থেকেও এই উৎসবে কখনই গির্জেয় ভোজের সময়কার অর্গানের গান শোনেনি তারা! আজ এ-সময় নিশ্চয়ই সমস্ত ঘণ্টাগুলো ঢং-ঢং করে বাজছে: মিলস্‌ডর্ফের ঘণ্টা বাজছে, জিশ্‌চেডের ঘণ্টা বাজছে। পাহাড়ের ওপাশে ছোট্ট একটি গির্জে আছে, তার মাথায় সুন্দর তিনটি ঘণ্টা। অতি পরিষ্কার তার শব্দ—সেগুলোও নিশ্চয় বাজছে এখন। পাহাড়ের নানা জায়গায়, মাঠের এদিক ওদিকেও অনেক গির্জে আছে। সব মিলিয়ে ঘণ্টাগুলো গুণে শেষ করা যাবে না—আজ ঠিক এই সময়টিতে নিশ্চয়ই সমস্ত ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে: এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের উপর দিয়ে শব্দতরঙ্গ চলেছে ভেসে। মাঝেমাঝে গাছপালার মধ্যে দিয়েও এ-গ্রামের শব্দ ও-গ্রামে শোনা যায়। কিন্তু তাদের কানে আজ কোনো শব্দই এসে পৌঁছলো না। কোনো রকম ধ্বনির স্পর্শ তারা পেলো না। এতো উঁচুতে কোনো শব্দই এসে পৌঁছতে পারে না। উপত্যকার ঘোরানো-ঘোরানো ঢালু পথ বেয়ে অন্ধকারের মধ্যে লণ্ঠনের আলোগুলো নিশ্চয়ই এখন নড়ে বেড়াচ্ছে এবং প্রত্যেক বাড়ির মাথায় ছোটো-ছোটো

ঘণ্টাগুলো বেজে চলেছে। এক গোলাবাড়ি থেকে আর এক গোলাবাড়ি পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে সেই শব্দ। সবাইকার মনেই এই শব্দ আজকের উৎসবের কথা মনে পড়িয়ে দিচ্ছে। কিন্তু এই সব দৃশ্যের কিংবা শব্দের ছিটেফোঁটাও তাদের কাছে পৌঁছলো না। তারাগুলো এখানে শুধু আকাশের গায়ে জ্বলছে, আর কিছু না।

কনরাড ক্রমাগত ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া এশেনজায়গার এর কথা ভাবতে লাগলো আর ফ্লাস্ক থেকে কালো কফি খেয়ে তারা চেষ্টা করলো নিজেদের গরম রাখতে। কিন্তু এই উত্তেজক পানীয়ের ক্রিয়া কমে এলেই সমস্ত শরীর যেন আরো বেশি ঝিমিয়ে পড়ে। এ-ভাবে কিছুতেই তারা ঘুমের হাত থেকে নিস্তার পাবে না। আহা, ঘুমিয়ে পড়ার মতো আরাম কি আর আছে! সব রকম যুক্তিতর্কই এই মধুর ঘুমের কাছে হার মানে। ঘুমিয়েই তারা পড়তো। কিন্তু প্রকৃতির এই উন্মুক্ত বিরাট রূপেরও একটা মোহ আছে। কী অদ্ভুত, কী বিরাট। তারই প্রচ্ছন্ন শক্তির প্রভাবে তারা জেগে-জেগে দেখতে লাগলো। প্রকৃতির সেই অপূর্ব বিরাট শক্তির সামনে দু-চোখের পাতা এক করা যায় না। হার হোলো ঘুমের। চারিদিকে অদ্ভুত স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতার কাছে বরফের একটি দানাও নড়তে যেন ভয় পায়। তবু তিন-তিনবার তারা বরফ ফাটবার বজ্রের মতো গম্ভীর শব্দ শুনলো। গ্লেসিআরের উপরটা দেখতে একেবারে জমাট-বাঁধা, স্তব্ধ। ভিতরে-ভিতরে কিন্তু সর্বদাই একটি গতি রয়েছে, দৃষ্টির অন্তরালে সেখানে ঘটছে নানা সব অদ্ভুত কাণ্ড। সেই সব গ্লেসিআর থেকেই ওই দারুণ শব্দগুলো ভেসে এসেছে। পিছন থেকে তিন-তিনবার তারা সেই বজ্রনির্ঘোষ পেলো শুনতে, যেন সমস্ত পৃথিবীটাই দীর্ণ চূর্ণ হয়ে গুঁড়িয়ে গেলো। অদ্ভুত ভয়ঙ্কর সেই শব্দ, বরফের দেশের চারিদিকেই সেই শব্দ ছুটে বেড়ায়। যেন বরফের প্রত্যেকটি শিরা-উপশিরা বেয়ে সেই শব্দ ছড়িয়ে পড়ে। তারার দিকে চেয়ে তারা শুধু জেগে বসে রইলো।

আর এইভাবে চেয়ে থাকতে-থাকতে হঠাৎ অদ্ভুত এক ব্যাপার তারা লক্ষ্য করলো: সামনেকার তারা'র ভিড়ে ফুলের মতো ধীরে-ধীরে অস্পষ্ট আলোর একটি রেখা যেন উঠলো জেগে, অস্পষ্ট ধনুকের মতো চেহারা। আর সেই আলোর ভিতর দিয়ে সবুজ রঙের মৃদু একটি কম্পন যেন ধীরে-ধীরে নামলো নীচে। দেখতে-দেখতে সেই ধনুকের মতো বাঁকা আলো স্পষ্ট হোলো, উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর! তারার দল ক্রমে এলো ফ্যাকাশে হয়ে। তারপর সমস্ত আকাশময় সেই আলোর আভা যেন ঠিকরে পড়লো, আর ছড়িয়ে পড়লো সেই কম্পিত সবুজ রঙ। জীবনের স্পন্দনের মতো কেঁপে-কেঁপে চললো তার স্রোত আকাশের সর্বাঙ্গে, তারা থেকে তারায়। সেই আলোর ইন্দ্রধনুকে ঘিরে আরো নানা আলো জ্বলে উঠলো, যেন মুকুটের চারিদিকে জহরৎগুলো ঝলমলিয়ে উঠেছে। আর সেই ঔজ্জ্বল্যে ছেয়ে গেলো আকাশের সর্বাঙ্গ। শেষে একটি ছোটো স্ফুলিঙ্গ আর মৃদু কম্পন সমস্ত আকাশ-বাতাসকে শিউরে দিয়ে যেন বয়ে গেলো। হয়তো সেই অভাবনীয় তুষার-ঝড়ের ভিতরকার বিদ্যুৎকে প্রকৃতি আর ধরে রাখতে পারছিলো না বলেই এই অপরূপ আলোর স্রোত হয়ে নিঃশব্দে সেটা বয়ে গেলো—নয়তো প্রকৃতির অজানা কোনো রহস্য এর ভিতর রয়েছে। ধীরে-ধীরে সেই আলো আবার অস্পষ্ট হয়ে এলো। প্রথমে মিলিয়ে গেলো ধনুকের চারিপাশের আলোগুলো, তারপর সেই আশ্চর্য আলোর ইন্দ্রধনু। ভালো করে বোঝাই গেলো না কখন মিলিয়ে গেলো। আবার সমস্ত আকাশময় স্পষ্ট হয়ে উঠলো হাজার-হাজার তারা।

তারা কেউ কাউকে কোনো কথা বললো না। শুধু বসে রইলো আর বড়-বড় চোখ মেলে আকাশের দিকে রইলো চেয়ে।

আর বিশেষ কিছুই ঘটলো না। তারাগুলো শুধু জ্বলজ্বল করে মাঝেমাঝে যেন কেঁপে-কেঁপে উঠলো। মাঝেমাঝে শুধু চোখে পড়লো দুয়েকটি উল্কা উপর থেকে নীচে ছুটে চলেছে।

তারাগুলোই শুধু জ্বলতে লাগলো। কিন্তু এক টুকরো চাঁদের আর দেখা মিললো না। অবশেষে নতুন একটি ঘটনা ঘটলো। সমস্ত আকাশটাই ধীরে-ধীরে উজ্জ্বল হয়ে এলো। সেই আলোয় আকাশের ঘন নীল রঙ এলো বেরিয়ে। যে অদৃশ্য তারাগুলো খুব ঝাপসা ছিলো সেগুলো হোলো অদৃশ্য। ফলে আগেকার মতো ঘন তারা ছিটোনো রয়েছে বলে আর মনে হোলো না। আরো কিছু পরে সবচেয়ে জ্বলজ্বলে তারার ঝাঁকও মিলিয়ে গেলো। এতোক্ষণে সামনের পাহাড়ের তুষারগুলো ভালো করে গেলো দেখা। শেষটায় আকাশের একটি অংশ হলুদ রঙে যেন জ্বলে উঠলো আর সেখানকার একফালি মেঘে লাগালো অগ্নিশিখার রঙ। সবকিছুই এখন স্পষ্ট দেখা যায়। দূরের তুষার-মোড়া চূড়োগুলো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, তাদের পিছনে নীল আকাশ।

"সান্না, ভোর হয়ে আসছে।"

"হ্যাঁ দাদা।"

"আরো একটু আলো হোক। তারপর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে এক দৌড়ে নীচে নামবো।"

আরো ফরসা হোলো। সমস্ত আকাশে তারার কোনো চিহ্ন নেই। ভোরবেলাকার সেই নরম আলোয় সব জিনিসই যেন স্নান করে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"হ্যাঁ, এইবার আমরা বেরুবো।"

"হ্যাঁ দাদা, এবার চলো।"

দাঁড়িয়ে উঠে তারা হাত-পা নেড়ে দেখতে গিয়ে টের পেলো অবসাদের কথা। সমস্ত রাত একটুও ঘুম হয়নি। তবু সকালবেলাকার আলো-বাতাস তাদের খানিকটা জোর দিলো। ভোরবেলার আশ্চর্য জাদু আছে! বাছুরের চামড়ার থলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে, সান্নার ফারের জ্যাকেটের বোতাম এঁটে দিয়ে কনরাড গুহার বাইরে পথ দেখিয়ে চললো।

তারা ভেবে রেখেছিলো দৌড়ে নীচে নামতে শুধু যতটুকু সময়—তারপরেই তো নিজেদের গ্রাম। তাই খাবার কথা একবারও ভাবেনি। থলিটাও পরীক্ষা করে দেখেনি সেখানে কোনো খাদ্য আছে কিনা।

সমস্ত আকাশ আলোয় আলো হয়ে গেছে। কনরাড চেষ্টা করলো পাহাড়ের চূড়ো থেকে নীচের উপত্যকাগুলো দেখতে। জিশ্‌চেড-কে চিনে বার করা মোটেই শক্ত হবে না। তারপর শুধু সোজা নেমে যাওয়া।

কিন্তু কোনো উপত্যকার চেহারাই তার নজরে পড়লো না। মনে হয় না যেন পাহাড়ের উপর থেকে তুমি নীচের দিকে দেখছো! এ-যেন এক অচেনা অদ্ভুত রাজ্য! এখানকার কোনো জিনিসের সঙ্গেই পরিচয় নেই। আজকে আবার আরো দূরের ভীষণ-ভীষণ চেহারার পাথরের চাঁই চোখে পড়লো। গতকাল সেগুলো নজরে পড়েনি। তুষারের উপর খাড়া হয়ে সেগুলো দাঁড়িয়ে! তারা দেখলো বরফ, দেখলো পাহাড়, দেখলো পাথরমোড়া ঢালু জমি—এগুলোর পিছনে হয় নীল আকাশ নয় তো তুষারের দিকচক্রবালের সঙ্গে মেশানো বহুদূরের পাহাড়ের নীল চূড়ো!

এমন সময় সূর্য উঠলো।

টকটকে লাল বিরাট চেহারার গোল একটা থালা যেন তুষারের সীমারেখা ভেদ করে আকাশে এলো উঠে আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাদের চারিপাশের সমস্ত তুষারের রঙ বদলে লালচে হয়ে গেলো। যেন কোটি-কোটি গোলাপ ফুলে ছেয়ে গেলো চারিদিক। আর পাহাড়ের উঁচু-উঁচু চূড়োগুলো তুষারের উপর সবুজ রঙের দীর্ঘ ছায়া লাগলো ফেলতা।

"সান্না, যতক্ষণ না পাহাড়টার একেবারে ধরে এসে পৌঁছোই ততক্ষণ সোজা পথ ধরে আমরা যাবো। তারপর নীচের দিকে দেখা যাবে।"

তুষারের ভিতর আবার তারা যাত্রা করলো। সমস্ত রাত ধরে তুষারগুলো আরো শুকিয়েছে। ফলে আরো সহজে পা বসে যায়। তুষারের বাধা না মেনে তারা জোরে-জোরে চললো। যত হাঁটে ততই তাদের হাতে-

পায়ের যেন জোর বাড়ে, দেহও হাল্কা হয়ে ওঠে। কিন্তু পাহাড়ের কিনারে তারা আর পৌঁছলো না, ফলে নীচের দিক দেখা গেলো না। একটি তুষারে ঢাকা জমি শেষ হয়, তো নতুন আর একটির হয় স্থরু আর প্রত্যেকটির প্রান্তেই আকাশ এসে নেমেছে বলে মনে হয়।

তবু না থেমে তারা এগিয়েই চললো।

আর অল্প পরেই আবার তারা সেই বরফের দেশে পৌঁছলো। এতোদূর পর্যন্ত কী করে যে বরফ আসতে পারে কিছুতেই তারা ভেবে পেলো না! তবু পায়ের নীচে তারা স্পষ্ট অনুভব করলো শক্ত আর মসৃণ জমি। যেখানে রাত কাটিয়েছে সেখানকার মতো বিরাট চেহারার বরফ এখানে নেই বটে তবু বরফের উপর দিয়েই তারা যে চলেছে সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। এখানে-ওখানে বরফের ছোটো-ছোটো টুকরো ছড়িয়ে রয়েছে। ক্রমশ সেই টুকরোগুলো সংখ্যায় বাড়তে লাগলো। অবশেষে এতো বাড়লো যে আবার তাদের হাৎড়ে-হাৎড়ে চলা স্থরু করতে হোলো।

তবু দিক ঠিক রেখে চলতে তাদের অস্থবিধে হোলো না।

বরফের নতুন-নতুন চাঁই-এর উপর তাদের আবার হাৎড়ে-হাৎড়ে উঠতে হোলো।

আবার তারা বরফের দেশেই এসে পৌঁছলো। আজকের পরিষ্কার রৌদ্রে তারা প্রথম দেখলো বরফের বিরাট ক্ষেত! কী বিরাট! অন্যপাশে আরো অনেক কালো-কালো পাথর রয়েছে। যেন ঢেউ-এর পর ঢেউ ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে আর তুষারে-ঢাকা শক্ত বরফগুলো ঘেঁষাঘেঁষি ঠাসাঠাসি হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—যেন ভিড় করে এগিয়ে আসছে তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে। সেই শাদা রঙের ভিতর অসংখ্য আঁকাবাঁকা নীল রেখা চোখে পড়ে। যেখানে বরফের চাঁইগুলো জমাট বেঁধে পড়ে রয়েছে সেখানে আরো নানা রেখা বেরিয়ে পথের মতো চলে গেছে। সেগুলো কিন্তু শাদা রঙের। এই পথ ধরে তারা চললো। না চলেই বা উপায় কি? খানিকটা বরফ পেরিয়ে না গেলে পাহাড়ের কিনারে পৌঁছন যাবে না, ফলে নীচের দিকে চেয়ে চেনাও যাবে না তাদের গ্রাম। কেউ কোনো কথা বললো না। কনরাডের পিছন-পিছন চললো সান্না। পাশ কাটিয়ে যেতে চাইলে সমস্ত জায়গাটাই যেন চওড়া হয়ে ওঠে। কিছুতেই যেন সেই বরফের হাত থেকে নিস্তার নেই। অবশেষে যেখানে যাবে বলে ঠিক করেছিলো সেখানে পৌঁছবার আশা ছেড়ে আবার তারা ফিরলো। উঠতে না পারলে মুঠো করে তারা তুষারপিণ্ডগুলোকে ধরবার চেষ্টা করে। ফলে সেগুলো গুঁড়িয়ে গিয়ে নীচেকার গাঢ় নীল রঙের বরফের গর্ত-গুলোকে যেন তুলে ধরে। কোথাও না থেমে তারা চললো ফিরে। এক সময় আবার তারা বরফের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে খোলা জায়গায় পৌঁছলো।

"সান্না, বরফের মধ্যে আর যাবো না। ওদিকে কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছি না। আমাদের উপত্যকা যখন পাচ্ছি না তখন সোজা পাহাড় থেকে নেমে যাওয়াটাই ভালো। তা হলে কোনো না কোনো উপত্যকায় এক সময় পৌঁছবোই। সেখানকার লোকদের বলবো জিশচেড থেকে আসছি। তা হলে নিশ্চয়ই সঙ্গে কাউকে দিয়ে আমাদের গ্রামে তারা পৌঁছে দেবে।"

সামনের পথ ধরে তুষারের উপর দিয়ে তারা নীচে নেমে চললো। কনরাড ধরলো সান্নার হাত। কিছুটা যাবার পরেই ঢালু পথ শেষ হোলো। সামনে আবার তুষার-মোড়া খাড়াই পথ স্থরু হয়েছে। ফলে সেদিক ছেড়ে একটি সরু নালি পথ ধরে আবার তারা নামতে স্থরু করলো। কিন্তু কিছু পরেই আবার ফিরে এলো জমা বরফে। ফলে সেই নালা'র একপাশের দেয়াল টপকে নীচে নামার অন্য পথ খুঁজতে লাগলো। এই চড়াইপথে এতো বেশি সোজা উঠতে হয় যে তাদের ভয় হোলো এবারে বুঝি পিছলে পড়ে। আরো খানিক তুষারের মধ্যে এদিক-

ওদিক ঘুরেও কোনো ফল হোলো না। সর্বত্রই সেই এক ব্যাপার: হয় হঠাৎ তুষার ভেঙে যায় আর তারা হুমড়ি খেয়ে পড়তে-পড়তে কোনো রকমে বাঁচে, নয়তো উপরে উঠতে-উঠতে মনে হয় সে-পথ একেবারে সবচেয়ে উপরের চুড়োয় নিয়ে ফেলবে। বারবার এই একই ঘটনা লাগলো ঘটতে।

এরপর তারা ভাবলো সেই লাল স্মৃতিস্তম্ভের কাছে ফিরে যাবার কথা। এখন তো তুষার পড়া বন্ধ হয়েছে আর আকাশটাও পরিষ্কার। ফলে সেখানে পৌঁছনো নিশ্চয়ই কঠিন হবে না। তারপর সেখান থেকে অনায়াসে তারা জিস্‌চেডে যেতে পারবে।

কনরাড তার বোন-কে এই কথা জানালো। কোনো আপত্তি না করে সান্না চললো পিছন-পিছন। কিন্তু কিছুতেই পথটা খুঁজে পাওয়া গেলো না।

পরিষ্কার রোদ উঠেছে। তুষারের পাহাড় আর তুষারের ক্ষেতে এতোটুকু দাগ নেই। তারা কিন্তু গতকাল কোন পথে এসেছিলো কিছুতেই তা চিনে বার করতে পারলো না। তখন তো চারিপাশের দৃশ্যই তুষারের পর্দায় যেন ঢাকা ছিলো, সামনেকার দুয়েক পা জমি ছাড়া আর কিছুই তারা দেখতে পায়নি। চারিপাশের সব কিছুকেই শুধু শাদা আর ধূসর বলে মনে হয়েছিলো। যে-সব পাথরের মাঝখান দিয়ে আসতে হয়েছে সে সবগুলোর চেহারাই গতকালকের দেখা পাথরগুলোর মতো। আজ আবার নতুন করে তুষারের উপর তাদের পায়ের ছাপ পড়তে লাগলো। তাদের গতকালকের পায়ের ছাপ নতুন তুষারের তলায় অদৃশ্য হয়েছে। শুধু তুষার আর তুষার। তবু তারা এগিয়ে চললো আর ভাবতে লাগলো এইবার বুঝি পৌঁছবে। আর তারা কোনো চড়াই পথ উঠতে চেষ্টা করলো না।

গতকালকের মতো আজও তারা মাঝখানে দাঁড়িয়ে পড়ে চেষ্টা করলো কোনো শব্দ শোনার। কিন্তু গত কালকের মতোই আজও তারা কোনো শব্দ শুনতে পেলো না—ক্ষীণতম শব্দও না। আর তুষার ছাড়া অন্য কিছু চোখেও পড়ে না: শাদা আর উজ্জ্বল তুষার—মাঝেমাঝে শুধু এখানে-ওখানো পাঁজরার মতো বেরিয়ে রয়েছে কালোকালো পাথর কিংবা পাহাড়ের চূড়ো।

[ক্রমশ]

লড়াই-ফেরত নানকুদা

শ্রীশামুক

বাড়িতে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। ইউরোপের মহাযু থেমে গেল, এবারে নানকুদা বাড়ি ফিরে আসছে। নানকু বাড়ি থেকে পালিয়ে যুদ্ধে নাম লিখিয়ে গেল বিদেশে আফ্রিকার মরুভূমিতে যুদ্ধ করলে, ফ্রান্সেও নদীর ধা ধারে চষা জমির উপরে, শেষে ইটালীর বরফের টুপিপ পাহাড় বেয়ে ধীরে ধীরে আসছিল এমন সময় সাদা নিশা উড়ল, শান্তির বিউগল্ বাজল—থামো এবারে সব।

ছেলের ফিরে আসবার চিঠি হাতে নিয়ে জেঠাই হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠেন। জেঠাইমার ঐ বড় ছেলে আজ চার বছর বাদে ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসছে খবরে কোন মা শুকনো চোখে চুপ করে বসে থাকে পারে?

আমাদের ছোট দলটির উৎসাহের ও উত্তেজনার সীম থাকে না। নানকুদাকে আমাদের সকলেরই ভাল লাগে ওর হাতের চড় চাপড়টা খায়নি আমাদের মধ্যে এমন কে কেউ কিন্তু খেলাধূলায়, পিকনিকে, মাঠে খেলা দেখতে কোন ভিড়ের মধ্যে যাওয়ায় ওকে যেন না হলে চলে না গোঁয়ার মানুষ বটে, তবে মনটি বড় ভাল। ওর নাম নি সারাদিন নানা রকম জল্পনা কল্পনা চলে, ওকে জিজ্ঞা বার জন্য নানা অদ্ভুত প্রশ্ন তৈরি হয়ে যায়। মোশিংকোর কটি শিং? মণ্টগোমারী নাকি মরে না, মর? ফরাসীদেশে বিড়ালের মাংস কেমন খেলে? ট প্লেন চালাবার আসল মন্ত্রটি কি? ইত্যাদি।

সেজে গুজে দল বেঁধে আউট্রাম ঘাটে গেলাম ওকে নতে। গিয়ে দেখি যেন মেলা বসে গেছে। কত লোক, ত মানুষ, রঙিন নিশানে নিশানে আকাশ দেখা যায় না। তালায় চমৎকার গোরার বাজনা বাজছে।

জাহাজ দেখা যেতেই এদিক থেকে রুমাল ওড়ায়, টুপি ড়ে, আনন্দের ধ্বনি করে—ওরাও উত্তর দেয় সামনে। হাজ ঘাটে লাগতে এক একজন সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসে র ভিড়ের মধ্যে ডুবে যায়। তাকে সকলে বুকে জড়িয়ে র, কোলাকুলি করে, কড়াকড়ি করে। কিন্তু নানকুদা , তাকে ত' দেখা যায় না। দুর্ভাবনায় জেঠাইমার পাল কুঁচকে যায়। গিনি হঠাৎ ভয়ে চীৎকার করে ঠে, এক বিশালকয়ে সৈনিক তাকে গাল টিপে আদর করলে—গালে রক্ত জমে লাল! মাথার উপর টুপি খুলে হাসতে দেখি আরে, এ যে আমাদের নানকুদা! গিনির চোখে জল কিন্তু হাসছে এবারে। কী ভয়ানক চেহারা হয়েছে নানকুদার। লম্বা আগে ছিল, এখন চওড়াতে বেড়েছে খুব। দুদিকের বুক খোলা কপাটের মত জামার ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে শরীরের পেশীগুলি আমের আঁটির মত চারিদিকে ফুলে ফুলে উঠছে! আমার বুকে এক ধাক্কা দিয়ে আদর করলে, মনে হলো হাড়গুলি ভেঙ্গে চুর হয়ে গেল। আর বিন্দু হ্যাণ্ডশেখ্ করবার জন্য হাত বাড়িয়েছিল কিন্তু হাতে হাত মিলতেই নেতিয়ে মাটিতে বসে পড়ে। এরা এমন ভঙ্গি করে যেন পক্ষাঘাত ধরেছে। মনে মনে তারিফ করতে হয়, হ্যাঁ লড়াই করতে হলে এমন চেহারা ও শক্তি হওয়া চাই বটে।

বাড়ি ফিরে নানকুদা দিনকতক সাজ পোষাক করে সকালে দুপুরে বিকেলে বেরিয়ে যায়, কখন ফেরে কিছু ঠিক থাকে না। শুনি সারা কলকাতা শহরটি চষে বেড়ান হচ্ছে। তারপরে আবার বেরোয় না সারাদিন। হয় নিজের ঘরে নানারকম ভয়ঙ্কর শব্দ করে ইংরিজি গান গায় যার মানে বোঝা যায় না—নয়তো কোন গল্পের বই হাতে এঘর ওঘর ছট্‌ফট্ করে ঘুরে বেড়ায়। আমাদের দেহের নানা জায়গায় ওর আদরের চড় চাপড় গাঁট্টা চিম্‌টির নানা নিদর্শন ফুটে উঠতে থাকে। এফটি জিনিসে কিন্তু ওর ব্যবহার বড় অদ্ভুত লাগে। আমাদের বাড়ির পাশে প্রকাণ্ড এক কাঠগোলা নতুন হয়েছে। সেখানে বিজলীর করাত দিয়ে বড় বড় কাঠের গুঁড়ি চেরা হয়। যখনই করাত চলতে সুরু করে সুইচ্‌সুই করে এক ভীষণ শব্দ হয়। আমাদের শুনে শুনে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে কানেই লাগে না। কিন্তু নানকুদা? যতবার ঐ শব্দ হবে সকালে দুপুরে বিকালে যেখানেই থাকুক নানকুদা চড়াৎ করে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে, খাটের তলা বা টেবিলের নীচে হলে ত' ভালই হয়। যুদ্ধে বোমার জন্য নাকি ঐ অভ্যাসটি এত বেশী ওদের করতে হয়েছে যে এখনো ভুলতে পারেনি। শুয়ে পড়ুক তাতে ক্ষতি নেই কিন্তু ঐ করাতের আওয়াজে ওর মুখ কেন অমন ফ্যাকাশে মেরে যায় বুঝতে পারি না।

বাবা একদিন ডেকে বলেন,—"দেখ নানকু, বাড়িতে এতগুলি ছেলেমেয়ে, সকলের গরমের ছুটিতে স্কুল বন্ধ, তুমি মিলিটারী কায়দায় একটু হাত পা ছুড়তে এদের শিখিয়ে দাও। তোমারও একটা কাজ হবে আর এরাও শরীরটি বাগিয়ে ফেলবে।

নানকুদা খুব উৎসাহে রাজী, যেন এমনি একটা কাজই খুঁজছিল এতদিন। দেরি না করে আমাদের আঠারোটি ছেলেমেয়েকে নিজের সৈন্যদলে ভর্তি করে নেয়! নানকুদা যখন মিলিটারী তখন একেবারে মিলিটারী, একচুল এদিক ওদিক হবার জো নেই। প্রথমে এক এক করে সোজা দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে শপথ নিতে হল, যে দেশের জন্য ও রাজার জন্য আমরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত আর সে জন্য আমাদের জেনারেলে—মানে নানকুদা—যা বলবে, যখন

বলবে, করব! মিনি এ এক মজার খেলা ভেবে বলে ওঠে, "বারে রাজা কই, আমাদের মধ্যে রাজা সাজবে কে?"

নানকুদার বাজের আওয়াজে ধমকানি খেয়ে মিনি কিছুক্ষণ অন্যদিকে চেয়ে চোখের জল সামলে নেয়! সৈন্য হওয়ার যে কত হাঙ্গামা কত বিপদ দু-চারদিনেই কিন্তু মালুম হয়ে গেল। যত রাজ্যের নিয়ম কানুন ও বাধা নিষেধ মনে রাখা ও মেনে চলা ভারি ঝক্কির কাজ। কল কব্জার তৈরি পুতুলের মত সমস্ত কাজ নিয়ম মাফিক হিসাব মত করতে হবে। সব চেয়ে নিদারুণ প্যারেড। প্যারেড মানে লাইন বেঁধে কুচকাওয়াজ, যখন তখন, ওর যতক্ষণ খুশি! আবার ভুল চুক হলে বেজায় শাস্তি। একবার বিনু ডাকবার দু'মিনিট পরে গিয়ে হাজির। তার জন্য কয়লার অন্ধকার ঘরে আধঘণ্টা বন্ধ থেকে হাঁফিয়ে মরতে হল। আমি একদিন বালতি নিয়ে স্নান করতে চলেছি সামনে হঠাৎ নানকুদা, স্যালুট করতে মনে ছিল না। আর কি, বাঁটুল ঠুকে মাথার উপর টরে টক্কা বাজিয়ে দিলে। ও, বলতে ভুলে গেছি ওর একটি ছোট লাঠি আছে, অনেকটা রুলের মত কিন্তু মাথাটি গোল। আমরা নাম দিয়েছি বাঁটুল। বড়ই মারাত্মক অস্ত্র, মারবার অনেক রকম কায়দা তা দিয়ে দেখান যায়।

দুচারদিনেই আমাদের প্রাণ যায়। কিন্তু না ছাড়লে ছাড়া যায় কি করে? ওদিকে সব শপথ নিয়ে বসে আছি যে প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। নিজে থেকে প্রতিজ্ঞা ভাঙতে লজ্জা করে, আবার বিদ্রোহী হলে নাকি মিলিটারী আইনে তার ভয়ানক শাস্তি। নানকুদার মুখ দেখে মনে হয় বড় খুশি, একটা কাজের মতন কাজ পেয়েছেন বটে। বাড়ির বড়রা কিছু বললেই পারতেন। —আহা নানকু কত লড়াই করে এসেছে, ওকে কিছু বলে কাজ নেই—এ দুদিনের খেয়াল আপনি মিটে যাবে—দুরন্ত ছেলেপিলেরা ত' খানিকটা শায়েস্তা হচ্ছে, মন্দ কি—বড়দের মুখে এই কথা!

শেষে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন, অবশ্য আমাদের আরো অনেক কিছু যন্ত্রণা ও শিক্ষা দিয়ে তারপর। আমাদের সৈন্যদল হঠাৎ গেল ভেঙে। তা না হলে আমরা সব ঠিক করে ফেলেছিলাম চার্চিল সাহেবকে এক চিঠি লিখে দি যে—হে সাহেব, তুমি আরেকটা যুদ্ধ লাগিয়ে দাও, নানকুদা গিয়ে লড়াই করুক, আর আমরা প্রাণে বাঁচি। যাক, কি করে সৈন্যদল ভাঙলো বলি। কদিন ধরে নানকুদা বলছে যে আমাদের শত্রুকে আক্রমণ করার কায়দা শেখাবে। শুনে আমাদের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। নিশ্চয় এ ওর নতুন উৎপাত।

একদিন দুপুরে ঘন মেঘ করে কালবৈশাখীর ঝড় উঠেছে খুব। কাঁচা আম কুড়ুবার ঝড়। ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, বিনু এসে ঠেলে তুলে দেয়। জেনারেল ডাকছে সকলকে, কাঠগোলায় সৈন্য সমাবেশ করতে হবে, শত্রুরা আসছে! চোখ রগড়াতে রগড়াতে সামনে গিয়ে দাঁড়াই। বাঁটুলের ঠোক্কর খেয়ে চমকে স্যালুট করি। সেদিন কারখানা কি কারণে বন্ধ। কোন লোকজন নেই, কিন্তু ঝড়ে যত রাজ্যের ধূলো ও করাতের গুঁড়ো ঘূর্ণি নাচ নাচছে। চারিদিক অন্ধকার। কাঠের গুঁড়ি ও চেরা কাঠের পাহাড় চারিদিকে। তার মধ্যে সবচেয়ে উঁচুটাতে উঠতে হুকুম হ'ল, বলে দেওয়া হল কি ভাবে কি করতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি যুদ্ধ করতে করতে শত্রুদের হটিয়ে ঐ পাহাড়ের চূড়োটা দখল করা চাই, ঠিক তিন মিনিটে! হাতে বন্দুক—মানে লাঠি নিয়ে আক্রমণ সুরু করে দিলুম। আধখানা উঠেছি এমন সময় চটাপট করে বৃষ্টি নামে। জলের মস্ত বড় বড় ফোঁটা। পিছন ফিরে তাকাই, যদি জেনারেল দয়া করে নামতে হুকুম দেয়। দেখি, বাঁটুল তেমনি উঁচু করে ধরা—উঠবার ইঙ্গিত। ঝমাঝম বৃষ্টির মধ্যে উপরে গিয়ে পৌঁছালাম। বিজয় গর্ব এক সেকেণ্ডও ভোগ করতে হল না। দু'দ্দাড় আওয়াজ করে চেরা কাঠ ও গুঁড়ি মাটিতে পড়তে থাকে; সঙ্গে সঙ্গে আমরাও কাঁচা আমের মতো টুপ্ টাপ্ পড়ি। ঐ কাঠগুলো ঠিক সাজান ছিল না, এতগুলি মানুষের ভারে টাল বিগড়ে গেল।

সেদিন সন্ধ্যায় বড়রা বাড়ি ফিরে দেখেন ঘরে ঘরে মিলিটারী হাসপাতাল! আঠারোটি সৈনিকের মধ্যে ষোলজন আহত! নিহত কেউ হয়নি বটে, তবে দুজনে গুরুতর জখম। বিনুর মাথা ফেটেছে, মিনির হাত গেছে ভেঙে!

নানকুদাকে দার্জিলিং-এ পাঠান হয়েছে, বাবার এক বন্ধুর বাড়িতে কিছুদিন থাকবে। আমরা খবর নিয়ে জেনেছি সে বাড়িতে ছোট ছেলেমেয়ে কেউ নেই।

জাপান যুদ্ধ এখন এমন অবস্থায় এসেছে যে ভবিষ্যৎ ব্যাপার অনেকটা নির্ভর করছে রাশিয়ার উপর। জাপানীরা সম্ভবতঃ রাশিয়ার নিরপেক্ষ মৈত্রী কামনা করছে। কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে মাঞ্চুরিয়াতে তা'রা রাশি রাশি সৈন্য সামন্ত জড়ো ক'রছে—যদি রাশিয়া মৈত্রী ভঙ্গ করে, জাপান আগে সাইবিরিয়া আক্রমণ করবে। এদিকে ওকিনাওয়ার যুদ্ধ প্রায় দু'মাস চল্ল, এবং সেখানে হেরে গেলে জাপান শান্তিভিক্ষা করবে কিনা এ বিষয়ে মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। ওদিকে চীনা সমুদ্রতীরে লম্বা ফালি একটা অংশ রক্ষা করবার জাপানীদের বিশেষ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে না।

ইয়োরোপের যুদ্ধ শেষ হ'য়েও গোলমাল মিটছে না, ফ্রান্স তার পূর্বকালের অধিকৃত সিরিয়া ও আলজিরিয়া ছাড়তে চাচ্ছে না, তারাও বশ্যতা স্বীকার করতে চাচ্ছে না।

সানফ্রানসিস্কো কনফারেন্সেও মতভেদের অন্ত নেই। পরাধীনদেশ সম্বন্ধে পাঁচটি প্রধান তন্ত্র—যথা ব্রিটিশ, রুষ, মার্কিন, চীন ও ফ্রান্স—এক পক্ষে ও অপর সাতাশটি ছোট রাজ্য অপরপক্ষে দাঁড়িয়েছে, এখন খোলা সভায় ভোট নেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

জার্মানীতে একটা নূনের খনির মধ্যে কোটি কোটি টাকার সোনা, রূপা, বহুমূল্য প্রাচীন ছবি, ইত্যাদি নাৎসিদের গুপ্তধন পাওয়া গেছে। নাৎসি সর্দারদের জন্য খোঁজ খোঁজ পড়ে গেছে। হিম্‌লার সত্যসত্যই ধরা পড়ে আত্মহত্যা করেছেন, এবং গোয়েবেলস্ ও হিট্‌লারের বাঁচামরা সম্বন্ধ গুজব ছাড়া আর কিছু ধরা ছোঁয়ার মধ্যেও আসেছে না।

ইংলণ্ড ও আমেরিকাতে অনেকেই ভয় পাচ্ছেন যে সাম্যবাদীদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক রকম বেড়ে যাচ্ছে।

—লীলা মজুমদার

* * *

লড়াই-এর দপ্তর থেকে হালে প্রকাশিত হয়েছে যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশরাজের প্রজাদের মোট হতাহতের সংখ্যা ১,৩০৫,৫০৫। এর মধ্যে বেসামরিক নরনারীর মৃত্যু-সংখ্যাও যুক্ত। ভারতীয় সৈন্যদের মোট হতাহতের সংখ্যা ১৬৩,৪৮৬ বলে জানা গেছে।

শত্রুর বোমায় ইংলণ্ডে যত লোক হতাহত হয়েছে প্রায় তত লোকই হতাহত হয়েছে গাড়ি চাপা পড়ে। গত বছরের শেষ পর্যন্ত গাড়ি চাপা পড়ে ৪১,০০০ পথিক নিহত এবং ১১৭,০০০ আহত হয়েছে। আমাদের দেশে ঐ সময়ে গাড়ি'র তলায় কত লোকের মৃত্যু হয়েছে এখনো সে-খবর জানা যায়নি।

* * *

এই লড়াই-তে সমুদ্রের তলাকার গাছপালার নানা রকম আশ্চর্য উপকারিতা আবিষ্কৃত হয়েছে। দু'বছর আগে ইংলণ্ডের 'মিনস্ট্রি অফ সাপ্লাই' থেকে একদল বৈজ্ঞানিককে সমুদ্রতীরে পাঠানো হয়েছিলো জলজ উদ্ভিদ সম্বন্ধে গবেষণা করার জন্যে। ফলে বর্তমানে সমুদ্রজ উদ্ভিদ নিয়ে ইংলণ্ডের প্রকাণ্ড একটি জাতীয় ব্যবসা গড়ে উঠেছে। জানা গেছে কেবলমাত্র একটি ফর্মেই বছরে

পনরো থেকে কুড়ি হাজার টন সমুদ্রজ উদ্ভিদ কাজে লাগাচ্ছে। ইংলণ্ড এবং স্কটল্যাণ্ডের নানা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এই আগাছাদের নিয়ে প্রায় কড়োকাড়ি করছে।

এই উদ্ভিদের বেশির ভাগই নিতান্ত সাধারণ। তাদের ভিতর থেকে ক্যালসিয়াম এ্যালিগ্‌নেট এবং আঠা-আঠা আর এক ধরণের জিনিস পাওয়া যায় এবং তাদের সাহায্যে এতো অসংখ্য ধরণের জিনিস তৈরি হচ্ছে যে ভাবলে সহজে বিশ্বাস হতেই চায় না। ক্যালসিয়াম এ্যালিগনেট থেকে অস্ত্রোপচারের নানা রকম সরঞ্জাম, ওষুধ, আগুনে পোড়ে না এমন কাপড়, এবং ওষুধ রাখার সব রকমের 'ক্যাপ্‌সুল' তৈরি হয়। শুকনো রক্ত তৈরি করায়, চোখ অপারেশনের সময় এবং রঙ ও প্ল্যাস্টিক তৈরির কাজে ঐ জিনিসটি লাগে।

অদূর ভবিষ্যতে জেলি কিংবা আইসক্রিম কিংবা কাস্টার্ড পুডিং তৈরি, হাসপাতালের নানারকম জটিল অস্ত্রোপচারের সময় কিংবা মোটর গাড়ির রেডিয়েটারের ফুটো সারাবার জন্য সমুদ্রজ উদ্ভিদ অপরিহার্য হয়ে উঠবে। পৃথিবীতে কোনটার যে দরকার নেই কে বলবে?

* * *

লড়াই-এর সময় রাশিয়ার লেখকদেব যাতে যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানা রকম অসুবিধেয় ভুগতে না হয় তার জন্যে 'ইউনিয়ান অফ সোভিয়েট রাইটার্স' (সোভিয়েট লেখক সংঘ) থেকে অনেক রকম ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। সহরের বাইরে ছোটো-ছোটো হোটেলগুলিতে লেখকরা যাতে খুব কম খরচে ভালো ঘর ও খাবার পায় এবং শান্তিতে লেখাপড়ার কাজ করতে পারে তার সুন্দর বন্দোবস্ত ছিলো। 'লিটারারি ফাণ্ড' থেকে লেখকদের সব রকম খরচ চালানো হোতো। ১৯৪৪-এ এই ফাণ্ড থেকে বার লক্ষ রুব্‌ল্‌স্ লেখকদের জন্যে খরচ করা হয়েছে। ১৯৪৫-এ ষোল লক্ষ রুব্‌ল্‌স্ খরচ করা হবে বলে ঠিক আছে। রাশিয়ার সমস্ত থিয়েটারে যত লাভ হয় তার থেকে শতকরা ২ রুব্‌স্‌স্ ট্যাক্স হিসেবে নিয়ে ঐ ফাণ্ডে জমা করা হয়।

* * *

শোনা যায় ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের যত টুপি আছে অত টুপি পৃথিবীর আর কারুর নেই!

* * *

এই লড়াইতে সবচেয়ে বেশি 'নিহত' হয়েছে বই। বোমার আঘাতে কেবলমাত্র ইংলণ্ডেই পঞ্চাশটি লাইব্রেরি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে, ফলে বই নষ্ট হয়েছে কোটি-কোটি। এমন অনেক বই নষ্ট হয়েছে যার কপি আর একটিও নেই। সে-সব বই আর কখনো ছাপা সম্ভব হবে না। য়ুরোপের অন্যান্য দেশের অবস্থা আরো শোচনীয়। লড়াই-এর জন্যে অসংখ্য লাইব্রেরি ছাই হয়ে গেছে, অনেক জায়গায় শত্রু সৈন্য সহরে ঢুকে ইচ্ছে করে স্থানীয় লাইব্রেরির সমস্ত বই নষ্ট করেছে। পোল্যাণ্ডের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—সেখানকার শতকরা ষাট থেকে সত্তরটি লাইব্রেরি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়েছে। য়ুগোস্লাভিয়ায় পাঁচশো থেকে ছ'শো লাইব্রেরি আগুনের গহ্বরে গেছে। গ্রিসের "এথেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ে"র প্রসিদ্ধ লাইব্রেরির ধ্বংসপ্রাপ্তি পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষিত লোকের কাছেই একটি শোচনীয় খবর।

চীন-এর পাইপিং বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং টিয়েনশিন্ লাইব্রেরির সমস্ত বই জাপানীরা লুঠ করেছে। শতকরা বাহাত্তরটি চৈনিক লাইব্রেরি তারা করেছে ধ্বংস। সৈনিকদের বিরাট লাইব্রেরি এবং ন্যাশন্যাল লাইব্রেরির সমস্ত বইও জাপানীরা আত্মসাৎ করেছে। সোভিয়েট রাশিয়া এবং ডেনমার্কের কত লাইব্রেরি যে নষ্ট হয়েছে তার সঠিক খবর এখনো জানা যায়নি।

আশার কথা মিত্রশক্তি আবার এই সব লাইব্রেরিগুলি গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। শোনা যাচ্ছে শীঘ্রই লণ্ডনে পৃথিবীর সমস্ত লাইব্রেরি'র কর্তৃপক্ষদের নিয়ে এক আন্তর্জাতিক অধিবেশন বসবে। সেখানে আলোচনা হবে

কী ভাবে পরস্পর পরস্পরকে বই ধার দিয়ে সংস্কৃতির রাজ্যের এই ক্ষতিকে পূরণ করতে পারে। সেখানে আরো আলোচনা হবে মাইক্রো-ফোটোগ্রাফির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য ছোটো-ছোটো বই কী উপায়ে ছাপানো সম্ভব।

* * *

অনেকেই হয়তো মনে কর একটি সহরে মহামারী হলে দূরের সহরে কোনো ভয় নেই। ধারণাটা খুব সত্যি নয়। গত মহাযুদ্ধে দেখা গেছে এক দেশের ছোঁয়াচে অসুখ অন্য দেশে ছড়িয়েছে। ভারতবর্ষে ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা আগে বিশেষ ছিলো না, গত মহাযুদ্ধে য়ুরোপ থেকে ঐ অসুখ এখানে আমদানি হয়। এই যুদ্ধেও টাইফাস্-এর মতো মারাত্মক অসুখ, যেটা শীতের দেশেরই বিশেষত্ব, ভারতবর্ষে এসেছে। আসামের ম্যালেরিয়ার কাঁপুনিতে অনেক কলকাতার বাবু এবং ইংরেজ গোরাকে হু-হু করে কাঁপতে দেখা গেছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কলেরায় কলকাতা ছেয়ে গিয়েছিলো। কলেরা ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পত্তি এবং বাংলাদেশই তার প্রধান উৎপাদনক্ষেত্র। অতীতে বহুবার এই মহামারী ভারতবর্ষের সীমারেখাকেও অতিক্রম করেছে। ১৮১৭ সালের ভারতীয় কলেরা, ১৮৩০ সালে পার্সিয়া ও রাশিয়া'র মধ্যে দিয়ে য়ুরোপে পৌছয়। ১৮৪১ সালে আর একবার এই অসুখ ঐ একই পথ ধরে ১৮৪৭ সালে য়ুরোপ এবং আমেরিকায় হাজির হয়। ১৮৫০ সালের এক মহামারী ১৮৫৩ সালে য়ুরোপে ছড়িয়ে পড়ে। শেষোক্তবারের মহামারীর এই অভিযান উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকায় মারাত্মক রূপ নেয়। ১৮৬৬, ১৮৬৯-৭৪ এবং ১৮৮৩-৮৭তে মেডিটারেনিয়ানের পথে ভারতীয় মহামারী য়ুরোপে গিয়েছিলো। কিন্তু ১৮৯২-৯৫-এর মহামারী স্থলপথে এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে য়ুরোপে পৌছয়—ভারতবর্ষের নর্থ-ওয়েস্ট-ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ থেকে পাঁচ মাসেরও কম সময়ে ঐ মহামারী লেলিনগ্রাদের সেণ্ট পিটার্সবার্গে পৌছয়, সম্ভবত হাম্‌বুর্গেও যায় আর তারপর অল্প কয়েকদিনের ভিতরেই ইংলণ্ড ও আমেরিকায় দেখা দেয়!

* * *

"ডি. ডি. টি." ওষুধের কথা আগেই তোমাদের জানানো হয়েছিলো। হালে খবর বেরিয়েছে যে গ্যামেক্সেন (gammexane) বা "৬৬৬" এই নামে এমন একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে যার বীজাণু নষ্ট করার শক্তি "ডি. ডি.টি."-র চেয়ে অন্তত পাঁচগুণ বেশি। এই ওষুধ পঙ্গপাল, মশামাছি, পোকামাকড়, ছারপোকা, বোল্‌তা ইত্যাদিদের চক্ষের নিমেষে ধ্বংস করে। যে-সব পোকামাকড় ভালো-ভালো জামা-কাপড় কোটে নষ্ট করে দেয় গ্যামেক্সেন তাদেরও নষ্ট করতে পারে বলে জানা গেছে।

* * *

নিউ ইয়র্ক রকফেলর ইন্সটিটিউটের ডিরেক্টর ডাঃ হার্বার্ট স্পেন্সর গেস্‌সার এবং ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ জোসেফ্ আরল্যাঞ্জার ১৯৪৪-এর শরীরবিদ্যা এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে'র নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন। মস্তিষ্ক ও মাংসপেশীর ভিতর দিয়ে যে তড়িৎপ্রবাহ বয়ে যায়, তাকে মাপবার এক সূক্ষ্ম যন্ত্র তাঁরা আবিষ্কার করেছেন।

* * *

একটা কথা খুব কম লোকেই জানে: আমরা প্রত্যহ প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক বেশি খেয়ে থাকি। আমরা যদি কম খেতুম তা হলে শরীরও অনেক ভালো হোতো এবং যারা খেতে পায় না তাদের জন্যেও হয়তো খাবার মিলতো। একশো বছর আগে ইংলণ্ডের হাস্যরসিক সিড্‌নি স্মিথ লিখেছিলেন: জীবনে যদি সুখী হতে চাও তা হলে যে-পরিমাণ খেতে পারো ঠিক তার অর্দ্ধেক খাবে। আমি হিসেব করে দেখেছি দশ থেকে সত্তর বছরের মধ্যে যতটা খাদ্য ও পানীয় খেলে চলতো তার চুয়াল্লিশ গাড়ি বেশি মাংস ও পানীয় খেয়েছি। ঐ খাদ্যের দাম সাত হাজার পাউণ্ড! এই অত্যধিক খাদ্য গ্রহণ করার ফলে সম্ভবত একশো জনের অনাহারে মৃত্যু ঘটেছে। হিসেবটা ভীতিজনক, কিন্তু কোথাও ভুল নেই।

যুক্তিদাতা

পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (২৪১)

হঠাৎ সে'দিন বন্ধু মোর এক বল্লে আমায় হেসে—
"কলম পিষে কী লাভ হ'বে, এই পরাধীন দেশে ?
হাজার হাজার কলমধারী দিনের পরে দিন,
বাঁচ্তে গিয়ে কলম পিষেই ক'রছে আয়ুক্ষীণ !
সেই ক'টা দিন কলম ছেড়ে ধ'রত যদি হাল,
অনেক বেশি সুখে তবে, কাট্‌ত সবার কাল।"
উত্তরে তা'র তখন আমি বুঝিয়ে বলি তা'রে—
"বাংলাদেশের ছেলে-বুড়ো যুক্তি দিতেই পারে।
এমন কেউই নেইক দেশে, যুক্তি যেজন মানে,
নইলে কি আর বাঁচ্তো সবে মুক্তিবিহীন প্রাণে ?
এইখানেতেই তাকিয়ে দেখ তোমার আমার মাঝে,
যুক্তি দিতেই সময় গেল—সবটুকু এর বাজে !"

পরীক্ষা হলে

বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬৯)

'ম্যাট্রিক' পরীক্ষা দিতে আজিকে আসা।
'টুলে' একা বসে ভাবি—নাহি ভরসা ॥
রাশি রাশি কালো মাথা   চারিদিকে হেথা সেথা
পাশের ছেলেটা মোর আশা-ভরসা
দেখে লেখা ছাড়া মোর নাহি যে আশা ॥

একখানি ছোট টুলে আমি একেলা
কি যে লিখি, দূর ছাই ! যায় যে বেলা :
পাশের ছেলেটা, দেখি   ঘাড় গুঁজে যায় লিখি,
এত ডাকি সাড়া নাই বুঝি বা কালা।
একখানি 'টুলে' বসে আমি একেলা ॥

গট্‌মট্ করে ওকে আসে এধারে ?
'গার্ড' বলে মনে হয় দেখে উহারে।
পাশ দিয়ে চলে যায়   এদিক-ওদিক চায়
রাশিরাশি কালো মাথা শোভে দু'ধারে।
'গার্ড' বলে মনে হয় দেখে উহারে ॥

"ও মশাই ! শুনছেন, একটু পাশে,
বারেক দেখান যদি লেখার শেষে।
নচেৎ উপায় নাই   এদিক ওদিক চাই
শুধু হলে 'পাশ মার্ক' যাই যে হেসে
বারেক দেখান যদি লেখার শেষে ॥

"যেটা খুসি বলে দিন করুণা করে
নইলে হইব 'ফেল' ফের এবারে।
এতকাল বাড়ি বসে   'সিনেমারে' ভালোবেসে
সকলই গিয়াছি ভুলি লিখি কী করে,
যেটা খুসি বলে দিন করুণা করে ॥

"ও মশাই ! ও মশাই ! দেখুন ফিরি।"
সময় যে আর নাই কি আর করি !
চোখ ফেটে জল আসে,   নামটি লিখিয়া শেষে
শূন্য খাতাটি দিয়ে আসিনু বাড়ি
ফেল আছে কপালেতে লেখা আমারই। *

---

* রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' অবলম্বনে

বেচুরাম ডাক্তার

বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য (১৩০৯)

ছোটখাট গ্রামটা,
'তালতলা' নামটা।
বেচুরাম ডাক্তার,
ভারী নাম-ডাক তার !
লাল জল, সাদাগুলি,
মুখে শুধু মিঠে বুলি,
এই নিয়ে কারবার,—
সারে যারা সারবার।

ম্যালেরিয়া রোগীরা,
কালাজ্বর ভোগীরা,
দাঁড়িয়েছে সার দিয়ে,
কম্বল গায় নিয়ে।
ডাক্তারখানা এই,
কারো যেতে মানা নেই।
ডেঁপো ছোঁড়া হারাধন,
অসুখেতে সারা হন !
ব্যাথা আছে বক্ষে,
জ্যোতি নেই চক্ষে।
মনে কিছু রবে না।
কেনই বা হবে না ?
গাঁজা আর যাত্রা,
এর নেই মাত্রা।
চেহারাটি দিনে দিন
হ'ল তাই অতি ক্ষীণ।

বেচারাম সরকার—
তারে ডাকা দরকার।

বেচু এসে ত্যাখে হাত,
বুক, পিঠ, জিভ দাঁত।
হারু বলে, "শোনো ভাই,
আমার তো জ্বর নাই।
ব'লছি যা শুনে নাও,
ওষুধটা ভালো দাও।
হাসি খেলি খাই দাই,
তবে চোখে ঘুম নাই।
বুকটায় বড়ো জ্বালা,
হ'য়ে গেছি ঝালাপালা।
আরো শোনো ব্যাধি এই
স্মৃতি মোর মোটে নেই।
শুনছি যা এবেলায়,
ভুলে যাব ওবেলায়।"

লাফ্ দিয়ে ডাক্তার
তুলে নিলো ব্যাগ তার।
"ওরে হারু, শোন্ শোন্,
ভিজিটের টাকা গোন্।
রোগটা ত' ভালো নয়,
একেব্যারে স্মৃতি ক্ষয় !
যদি দেরী হ'লে পরে
অতিশয় রোগ-ভরে
ভুলে যাস মোর কি,
তাহ'লে যে হবে কী" !

ভিজিটের টাকা নিয়ে
তাজাতাড়ি বাড়ি গিয়ে
বেচু হেসে সারা হন।
কেঁদে মরে হারাধন ॥

ফুটবল লিগের অর্দ্ধেক খেলা শেষ হয়েছে। লিগ টেবিলের প্রথম চারটি ক্লাবের নাম, পয়েন্ট ইত্যাদি তলায় দেওয়া হোলো :

	খেলেছে	জিতেছে	ড্র	হেরেছে	পয়েন্ট
ভবানীপুর	১২	১০	২	০	২২
মোহনবাগান	১৩	৯	৩	১	২১
মহামেডান স্পোর্টিং	১৩	৮	৪	১	২০
ইস্ট বেঙ্গল	১২	৭	৪	১	১৮

উপরের তালিকা থেকেই বুঝবে এ-পর্যন্ত ভবানীপুরেরই লিগ পাবার চান্স সবচেয়ে বেশি বলে মনে হয়। একটি খেলাতেও তারা হারেনি এবং ড্র করেছে মাত্র দুটি। গোলে ইসমাইল এবং ব্যাকে তাজ মহম্মদ ও ডি. পাল প্রত্যেকটি খেলাতেই প্রশংসনীয় খেলেছেন। কিন্তু হাফ ব্যাকের পোজিসনে কেউ-ই তেমন সুবিধেই করতে পারেনি। ফরোয়ার্ডদের মধ্যে রবি দাস, কে. রায় এবং বি. দাস বরাবর ভালো খেলেছেন। লিগ টেবিলের সবচেয়ে উপরে এখন পর্যন্ত থাকার সম্মান সত্ত্বেও এ-কথা সবাই বলবে ভবানীপুর একাধিকবার নেহাৎ যেন কপালজোরেই বেঁচে গেছে, বিশেষ করে ইস্ট বেঙ্গল এবং বি এ্যাণ্ড এ আর-এর হাতে। এখনো অর্দ্ধেক খেলাই বাকী তাই শেষ পর্যন্ত কী যে হয় কেউই বলতে পারে না।

মোহনবাগানও ভবানীপুরের মতোই না হেরে সমান তালে চলেছিলো কিন্তু তাদের শেষ খেলায় ইস্ট বেঙ্গলের কাছে এতো অসম্ভব খারাপ খেলে দু'গোলে হেরে গেলো যে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। প্রতিবারের মতো মোহনবাগানের ডিফেন্স এবারেও ভালো, (যদিও মান্নার গতবছরের সেই ফর্ম এ বছর আর নেই এবং দ্বিপেন সেনও দর্শকদের হতাশ করেছেন), কিন্তু চিরকালের সেই অভাব এবারেও ঠিক তেমনি আছে—স্কোরারের অভাব। মাঠের মাঝখানে তারা চমৎকার খেলে, গোলের কাছাকাছি পর্যন্ত সুন্দরভাবে বল আনে, তারপরেই ফরোওয়ার্ড লাইন-কে যেন ভূতে পায়—পাঁচ গজ দূর থেকেও ফাঁকা গোলে বল মারতে তারা পারে না। হয় বারের উপর দিয়ে বল উড়ে যায়, নইলে পোস্টের পাশ দিয়ে আউট হয়, নিদেনপক্ষে বারে লেগে বল ফিরে তো আসবেই! এই কারণেই যে-সব টিম্ লিগ টেবিলের তলায় টিমটিম করছে—যেমন ই. সি. সিগন্যালস্, রেঞ্জার্স, ডালহৌসি এবং পুলিস—তাদের সঙ্গে মাত্র দু-এক গোলে মোহনবাগান জিতেছে! মোহন-বাগানকে এখনো দুটি জিনিস ভালো করে শিখতে হবে: প্রথমে গোল খেলে একেবারে নেতিয়ে না পড়ে সেই গোল শোধ দেবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে খেলা এবং দ্বিতীয়ত গোলের ভিতরে বল মারা। তা না হলে 'ভালো খেলিয়াও পরাজিত'—এই হৃদয়বিদারক ও ক্লান্তিকর লাইনের উক্তি তাদের ভক্তদের বরাবর পড়তে হবে।

ইস্ট বেঙ্গল গোড়ার দিকে বেশ ভালো করে সুরু করেছিলো কিন্তু কালিঘাটের সঙ্গে ড্র হবার পর থেকে তাদের যেন কী হোলো! মহামেডান স্পোর্টিং এবং স্পোর্টিং ইউনিয়ানের সঙ্গে তারা ড্র করলো আর এরিয়ান তো প্রায় হারিয়াই দিয়েছিলো—শেষ মুহূর্তে কোনো রকমে গোল শোধ করে ড্র হয়। তাদের ফরোয়ার্ড লাইনে আপ্পা রাও, সুনীল ঘোষ, পাগ্‌সলি এবং সোমানা—চারজনেই অতি বিখ্যাত খেলোয়াড়। কিন্তু পাগ্‌সলির চাতুরি বয়সের সঙ্গে-সঙ্গে কমে এসেছে আর সোমানা আপ্পা রাও আগেকার সেই দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড় আর নয়। এ-টিমের ডিফেন্স খুব ভালো। হাফে কাইজার অসম্ভব খাটিয়ে খেলোয়াড়, ব্যাকে

পি. চক্রবর্তি (ক্যাপটেন) এবং গোলে কে. দত্ত প্রত্যেক খেলাতেই আশ্চর্য সুন্দর খেলেছেন।

মহামেডান স্পোর্টিং দলে এবার কয়েকটি মাত্র পুরোনো নাম চোখে পড়ে, আর সবাই নতুন ও তরুণ খেলোয়াড়ের দল। মোহনবাগান, ইস্ট বেঙ্গল এবং ভবানীপুরের মতো এই টিমও ক্রমাগত নতুন-নতুন খেলোয়াড় নিয়ে পরীক্ষা করছে। এই খেলোয়াড়দের মধ্যে করিম নওয়াজ ও রসিদুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মহামেডান দল ভিজে মাঠে বুট পায়ে বরাবরই খুব ভালো খেলে। তাই মনে হয় জল পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য টিম যে-রকম অসংলগ্ন খেলবে তাদের দল খেলবে সেই পরিমাণে ভালো।

বহুকাল পরে এবারে ক্যালকাটা বেশ ভালো টিম তৈরি করেছে। লিগ টেবিলের প্রথম চারটি টিমের কাছে ছাড়া ক্যালকাটা দল এ-পর্যন্ত আর কারুর কাছে হারেনি এবং বাজারে জোর গুজব যে কম্পটন, কার্টিস, জয়নেল এবং পাওয়েল-এর মতো নামজাদা ইংরেজ প্রফেসনাল খেলোয়াড়রা কিছুদিনের মধ্যেই নিয়মিত ক্যালকাটা দলে খেলবেন।

এ-বছরের খেলা দেখে কিন্তু একেবারেই তৃপ্তি পাওয়া যায়নি। খবরের কাগজে গোল সংখ্যার কথা পড়তে মন্দ লাগে না, কিন্তু যাঁরাই মাঠে গিয়েছেন তাঁরাই দেখেছেন কলকাতায় ফুটবলের স্ট্যাণ্ডার্ড কী দ্রুত অবনতির পথে চলেছে। বাংলাদেশের নাম আছে ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে ভালো ফুটবল খেলিয়ে প্রদেশ বলে। এইভাবে চললে সে-নাম বেশিদিন আর টিঁকবে না। একএকবার সত্যি-সত্যি ভয় হয় বাংলাদেশ বুঝি ফুটবল খেলতে ভুলেই যাচ্ছে!

কায়াহীনের কাহিনী: মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক সিগনেট প্রেস, কলিকাতা। দাম ২।০

আশ্চর্য বই। ভূতের গল্প, কিন্তু ভুতুড়ে নয়। মানে আজগুবি অসম্ভব জিনিস লিখে সস্তা উত্তেজনা বিলোতে চান না; খাঁটি সাহিত্য বর্ণনার গুণে অসম্ভব কথাও শুধু সম্ভব নয় অতি বড় বাস্তব হয়ে ওঠে। আজকাল যে সব র‍্যাজলা বই বেরুচ্ছে তা পড়তে পড়তে ত' ঘেন্না ধরে গেল; ছোটদের রুচিও নিশ্চয়ই ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। মণিলাল-বাবুর দুর্মূল্য গল্পগুলি বাজারে পাওয়া যেত না; সেগুলির উদ্ধার করে এবং সুন্দর ভাবে ছাপিয়ে প্রকাশক সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। এ বই পড়লে ছেলেমেয়েরা শুধু যে আনন্দ পাবে তাই নয়, তাদের রুচিও ভালো হবে।

সন্থরে মামা: সুনির্মল বসু; কুলদা সাহিত্য মন্দির। আট আনা।

ছোট্ট নাটক। পড়ে মনে হল অভিনয় করা গেলে আধঘণ্টা সময়ও লাগবে না। কিন্তু বই হিসেবে তেমন কিছু নয়; সুনির্মলবাবু যেন দায় সেরেছেন।

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

ইতিপূর্বে নিশ্চয়ই তোমরা একাধিকবার পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে কিংবা মঙ্গলগ্রহে যাবার জল্পনা-কল্পনার কথা শুনেছো। এ-নিয়ে অনেক গল্প-উপন্যাসও বেরিয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রকেটের অসাধারণ উন্নতি দেখে বৈজ্ঞানিকরা মনে করছেন পৃথিবী ছাড়িয়ে বেড়িয়ে আসার ব্যাপারটা অল্পদিনের মধ্যেই মানুষের আয়ত্তে এবার আসবে! কিছুকাল আগে চাঁদে যাবার পরিকল্পনার খবর জানা গিয়েছিলো এবং এমনো একটি খবর বেরিয়েছিলো যে চাঁদের জমির জন্যে ইতিমধ্যেই নাকি মার্কিনমহলে হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। এইসব হাস্যকর খবর বাদ দিয়ে পৃথিবী ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়া আজ কতদূর বিজ্ঞানসম্মতভাবে সম্ভব সেই কথাই বলবো।

অন্য কোনো গ্রহতে যাবার প্রধান বাধা হচ্ছে দুটি: প্রথমত সেই উড়োজাহাজটিকে এমন অসম্ভব একটি গতিতে যাত্রা সুরু করতে হবে যা মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে; দ্বিতীয়ত বায়ুহীন শূন্যে সেই জাহাজ এগিয়ে চলবেই বা কী করে? বাতাসকে ঠেলা দিয়েই উড়োজাহাজ এগিয়ে যেতে পারে কিন্তু যে শূন্যে বাতাস নেই সেখানে কাকে ঠেলা দিয়ে এগুবে? হিসেব করে দেখা গেছে মাধ্যাকর্ষণকে কাটিয়ে বেরিয়ে যেতে হলে প্রতি সেকেণ্ডে সাত মাইল গতির প্রয়োজন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নাৎসিদের V-2 থেকে দেখা গেছে রকেটের কী প্রচণ্ড শক্তি, কী অসম্ভব গতি। বৈজ্ঞানিকরা এখন ভাবছেন মঙ্গলগ্রহে যাবার জাহাজে এই ধরণের রকেটের ইঞ্জিন লাগাবার কথা। রকেটের পিছন দিক দিয়ে জলন্ত গ্যাস বেরুবার সময় জাহাজটিকে এমন জোরে ধাক্কা দিতে পারে যাতে অনায়াসেই সেকেণ্ডে সাত মাইল ছুটে চলা সম্ভব। V-2 সহজেই ৬০।৭০ মাইল উপরে উঠতে পারতো; ইতিপূর্বে পৃথিবীর উপর দশ মাইলের বেশি কেউ উঠতে পারেনি।

V-2'তে তরল অক্সিজেন এবং এ্যাল্‌কহল্‌ ব্যবহার করা হোতো। কিন্তু তা' ছাড়াও আরো একটি প্রচণ্ড শক্তির সাহায্যের কথা বৈজ্ঞানিকরা ভাবছেন। সেই শক্তির বৈজ্ঞানিক নাম হচ্ছে atomic energy। এই এ্যাটমিক শক্তি নাকি আশ্চর্য সব কাণ্ড-কারখানা করতে পারে। এক পেয়ালা জলের মধ্যে যে পরিমাণ এ্যাটমিক শক্তি আছে তার সাহায্যে নাকি মস্ত বড় এক জাহাজকে অতলান্তিকের মতো বিরাট সমুদ্রের এপার-ওপার করানো সম্ভব! এতোদিন এ্যাটমিক শক্তি'কে শুধু গবেষণাগারের জিনিস বলেই সবাই ভেবে এসেছে। এখন আবার জোর গবেষণা চলেছে এই অদ্ভুত প্রচণ্ড শক্তি'কে কী মন্ত্রে বশ করে মানুষের কাজে লাগানো যায়।

ধরে নেওয়া যাক এমন একটি উড়োজাহাজ বানানো সম্ভব হোলো পৃথিবীর আকর্ষণ-কে ছাড়িয়ে যেটি বেরিয়ে যেতে পারবে। তা হলেই কিন্তু সব বাধা অতিক্রম করা গেলো না। প্রথমত ধর সেই রকেটের মধ্যে যারা থাকবে তাদের অবস্থা কী হবে? তাদের শরীর ওই মারাত্মক গতির প্রথম ধাক্কাটা সহ্য করতে পারবে কি? এর উত্তরে অনেকে বলছেন সেটা সহ্য করা হয়তো খুব অসম্ভব নয়। এখনই তো আমরা দেখি অনেক পাইলট শূন্যে উড়ো-

জাহাজ নিয়ে ডিগবাজি খাচ্ছে। অঙ্ক কষে দেখতে গেলে ওই রকম ডিগবাজি খাবার ফলে তাদের শরীর মারাত্মক-ভাবে জখম হবার কথা, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা তো কই হয় না! অবশ্যই রকেটের প্রথম ধাক্কাটা সামলানো খুবই কঠিন ব্যাপার, কিন্তু যদি খুব পুরু করে গদি দেওয়া থাকে এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাও করা যায় তা হলে এই ধাক্কা সামলানোর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হয়তো নেহাৎ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে না।

ধরে নেওয়া যাক এই ধাক্কা সামলাবার ব্যাপারটাও সম্ভব হোলো। তারপরেই কিন্তু ভাবতে হবে পারিপার্শিক অবস্থার কথা। মহাশূন্যে বাতাস নেই। ফলে নিশ্বেস নেবার সরঞ্জাম সঙ্গে থাকার দরকার। বাতাস না থাকায় বাতাসের চাপও থাকবে না। বাতাসের এই চাপ না থাকলেও আমরা বাঁচতে পারি না। ফলে কৃত্রিম উপায়ে সর্বাঙ্গে এই ধরণের সমান একটি চাপের বন্দোবস্তও করতে হবে। বেঁচে থাকার মতো উত্তাপেরও প্রয়োজন। বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন বাতাস এবং উত্তাপের সমস্যার সমাধান সহজেই করা যাবে। কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ? পৃথিবীর প্রতি তোমার যদি টান না থাকে পৃথিবীরই বা তোমার উপর টান থাকবে কেন! ফলে কোনো জিনিসই নিচের দিকে পড়বে না, শূন্যে যেখানে যেটি আছে ঠিক সেখানেই সেটি থাকবে। সে-অবস্থায় অন্য কাজ তো দূরের কথা, খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। চা'য়ের পেয়ালায় দম বন্ধ হয়ে মৃত্যুও তখন অসম্ভব নয়! বৈজ্ঞানিকরা তাই ভাবছেন যে সেই জাহাজকে নিজের মেরুদণ্ডের উপর যদি ক্রমাগত ঘোরাবার কোনো ব্যবস্থা করা যায় তা হলে সেই জাহাজের ভিতরেই মাধ্যাকর্ষণের মতো একটি শক্তি জন্মাবে এবং তার ফলে এই সব অসুবিধে দূর হবে।

মহাশূন্যে ঐ তীব্র গতিতে যে-রকেট ছুটে চলেছে তাকে ঠিকমতো চালানোও খুব সহজ কথা নয়। ধর মঙ্গলগ্রহে আমরা যাবো। সবচেয়ে কম সময়ে সেখানে পৌঁছতে হলে পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে ঠিক কোন সময়ে ঠিক কোন দিকে মুখ করে আমাদের যাত্রা করতে হবে সে-সব কথা জটিল অঙ্ক কষে সঠিকভাবে জানতে হবে—এক চুল এদিক-ওদিক হবার জো নেই। মহাশূন্যের ভিতর যেতে-যেতে পৃথিবীর চেহারা দূর থেকে দেখে জাহাজের কাপ্তেনকে হিসেব করে জানতে হবে ঠিক কোনখানে তার জাহাজ রয়েছে। মহাশূন্যে সর্বদাই রাশিরাশি উল্কাপাত হচ্ছে। আকাশের সেই সব মারাত্মক টর্পেডোর হাত এড়িয়ে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া অত্যন্ত চতুর পাইলটের পক্ষেও অত্যন্ত কঠিন কাজ।

এর পরের প্রশ্ন হচ্ছে জাহাজ চালাবার তেল কিংবা কয়লা কোথায় পাওয়া যাবে? পৃথিবী থেকে বেরুবার সময় যে-পরিমাণ তেল-কয়লা সঙ্গে নেওয়া সম্ভব তাতে মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছনো যাবে না। এর উত্তরে বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন চাঁদ এবং মঙ্গলগ্রহ ও বৃহস্পতিগ্রহের মাঝখানে যে-সব উপগ্রহ আছে সেগুলিকে 'হল্টিং স্টেশন' বানাতে হবে। সেই সব ইস্টিশানে রকেট পৌঁছে তেল-কয়লা নতুন করে ভরে ফের যাত্রা সুরু করবে। এই শূন্যপথের মাঝেমাঝে কৃত্রিম উপগ্রহ হয়তো বানিয়ে রাখা সম্ভব হবে! অবশ্য যদি এ্যাটমিক শক্তিকে কাজে লাগবার কৌশল বৈজ্ঞানিকরা ইতিমধ্যে আয়ত্ত ক'রে ফেলতে পারেন তা হলে তো কথাই নেই: এক পেয়ালা জলে না হোক এক কুঁজো জলের ভিতর যে এ্যাটমিক শক্তি আছে তার সাহায্যেই আমরা হয়তো মঙ্গলগ্রহে বেড়িয়ে আসতে পারবো!

কিন্তু মঙ্গলগ্রহের আওতায় পৌঁছবার পর মঙ্গলগ্রহের টানে রকেট যখন উল্কাবেগে তার দিকে ছুটবে কী করে তখন তাকে থামিয়া ধীরে-ধীরে মাটিতে (?) নামানো যাবে? তখন অবশ্যই যে-শক্তি রকেটকে সামনে ঠেলছে সেই শক্তি দিয়েই রকেটকে পিছনে ঠেলা দিতে হবে—ফলে মঙ্গলগ্রহের টানকে উপেক্ষা করে খুসিমতো ধীরে-ধীরে নিচে নামা সম্ভব হবে। আর একটি বিপদের সম্ভাবনাও

আছে। বাতাসের সঙ্গে ঐ তীব্র গতিতে ধাক্কা খাবায় ফলে রকেটটি জলে যেতে কিংবা গলে যেতে পারে। তার জন্যে হয়তো বিশেষ ধরণের তাপনিবারক কোনো রকম আচ্ছাদন বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করবেন।

ভাবতে বসলে এতো সব বাধার কথা মনে আসে যে এক-এক সময় মনে হয় এই গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে যাবার ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত হয়তো মানুষের কল্পনাতেই থেকে যাবে। কিন্তু মানুষই উড়োজাহাজ বানিয়েছে, রেডিওর জাদু আবিষ্কার করেছে, বিদ্যুৎ-কে কাজে লাগিয়েছে! তাই কয়েক বছর পরে যদি তোমাদের কারুর কাছ থেকে চিঠি পাই, "সম্পাদক মশাই, এবার থেকে আমাদের রংমশাল মঙ্গলগ্রহের ঠিকানায় পাঠাবেন"—তা হলে খুব বেশি আশ্চর্য হয়তো হব না! তোমাদের পুরোনো ঠিকানা কেটে খুব সহজভাবেই হয়তো নতুন ঠিকানাটা টুকে রাখবো!

ছেলেটা বই খুলে জানালার ভিতর দিয়ে বাইরে চেয়েছিলো। পড়াশুনোয় একটুও তার মন নেই। তাই মাস্টারমশাই রেগে বললেন, "হারু, কী দেখছিস?"

"মোটরগাড়ি।"

"দেখতে হবে না, পড়।"

"পড়বো, কিন্তু তার আগে আপনাকে একটা কথা বলতে হবে।"

"কী কথা?"

"মাস্টারমশাই, এই এতোক্ষণের মধ্যে মাত্র তিনটে মোটরগাড়ি গেলো। সবকটার নম্বরই চার সংখ্যার আর সংখ্যাগুলো পরের পর। প্রথম গাড়িটাকে উল্টে দিলে দ্বিতীয়টার নম্বর হয়। তৃতীয়টাকে ওল্টালে-পাল্টালে কিছুই হয় না বটে কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় গাড়ির নম্বরের সমস্ত সংখ্যাগুলোই এলোমেলো হয়ে তার মধ্যে রয়েছে। ওই তিনটে নম্বর যোগ করলে হয় ১২৩০০ এখন বলুন দিকিনি গাড়িগুলোর নম্বর কি? নইলে কিন্তু পড়বো না!"

মাস্টারমশাই ততক্ষণ হিসেব করুন, কিন্তু ইতিমধ্যে তোমরা হারুর প্রশ্নের জবাব দিতে পারো?

ধাঁধাঁর উত্তর

মোট আপেলের সংখ্যা = ১২২১

হয় ১১টা সারি ছিলো আর প্রত্যেক সারিতে ছিলো ১১১টা করে না হয় ১১১টা সারি ছিলো আর প্রত্যেক সারিতে ছিলো ১১টা করে আপেল।

উত্তর দাতাদের নাম

যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), খুকু বাচ্চু ও ছোটোকাকা (২৩৬৭), সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২২৭৬), জানকীকান্ত পাল (২৪৫৩), সৈয়দ নূরল আলম (২০৬৬), তিতিল তাতা তোতা (২৩৫৬), বেণুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (২৩৮৫), জয়া পমপম আলতা (১২৫৬) সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় (২৪১৪), প্রসূন অরুণ শৈলেন ইত্যাদি (৪৬৭)

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

[দশম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা : শ্রাবণ, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

বস্ত্র

পুজো গেল, ষষ্ঠী গেল, জুটলো নাকো বস্ত্র,
যে-থান আছে, জায়গা নাহি ফোঁড়ে সীবন-অস্ত্র।
মরতে তবু করছি দেরি হায় যতদূর সাধ্য,
মরলে এখন, ভরসা নাহি, হবে যে আর শ্রাদ্ধ।

ছাত্র

জীবনটা কি কাটবে শুধু বেঞ্চিতে ও ডেস্কে?
মাঝে-মাঝে দেখো তোমার দুর্গত এই দেশকে।

খাদ্য

ভগ্ন দেহ ক্লান্ত শ্বাস
বদ্ধ ঘরে ছিন্ন বাস
রুক্ষ অন্ন শূন্য নুন
অদ্য ভক্ষ্য ধনুর্গুণ।

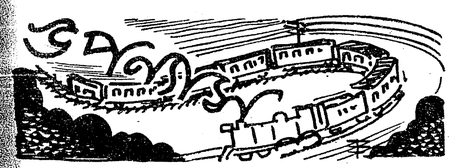

প্রেতের আহ্বান

প্রসাদ উপাধ্যায়

[প্রসাদ উপাধ্যায় একজন নামকরা লেখক; কিন্তু তাঁর এ নাম দেখে কেউ চিনতে পারবে না। ডিটেকটিভ হতে হলে যেমন ছদ্মবেশে চেনামহলে অচেনাভাবে ঘুরে আসতে হয়, ডিটেকটিভ গল্প লিখতে বসেও উপাধ্যায় মহাশয় তেমনি চেনামহলে অচেনা থাকতে চান ছদ্মনামের আড়ালে। এতে লাভ কি বুঝিনা; কিন্তু তর্ক করে তাঁর সঙ্গে পারলুম না। ছদ্মনামটা তাই মানতেই হল। তবে সুখের কথা, তাঁর প্রথম ডিটেকটিভ উপন্যাস তিনি রংমশালের পাঠক-পাঠিকার হাতেই দিতে রাজি হয়েছেন; সুখের কথা—বলছি কেননা যত পড়বে ততই দেখবে উপাধ্যায়ের উপন্যাস আর পাঁচজনের মতো নয়: বাহাদুর কা খেলার চেয়ে বুদ্ধির খেলাকে তিনি অনেক বড় বলে মনে করেন। —সম্পাদক]

প্রথম পরিচ্ছেদ

"ছুটি মানে একদম ছুটি"—কুনু বল্ল। অত্যন্ত ঢিলেঢালা গলা। ডেকচেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়েছে, পা দুটো সামনের নীচু মোড়ায় তোলা। কাঁধের তলায় পাতলা বালিস, চোখদুটো খোলা না বোজা বোঝবার জো নেই। সামান্য ডেকচেয়ারে কতখানি আরাম করে শোয়া যায় তার যেন একটা চরম দৃষ্টান্ত। গরম পাতলা চাদরটা কোমর পর্যন্ত টানা, তার উপর শীতের রোদ পোষা কুকুরের মতো লুটোচ্ছে। পাশে ছোট্ট টি-পয়; তার উপর একগাদা দেশী-বিলিতি পত্রিকা। কিন্তু কুনুর ভাবগতিক দেখলে মনে হয় না যে পত্রিকাগুলো তোলবার বা পাতা উলটে পড়বার মতো উৎসাহ আছে। ছোট্ট দালান। তারপর বাগান। শীতের বাহারি ফুল। তারপর পিচের পথ; তারপর এবড়ো-খেবড়ো কালো পাথর আর তারপর

সমুদ্র। যতদূর চোখ যায় নীল জলে সোনালি রোদ চকচক করছে। যেন ইস্পাত।

দালানের অন্য প্রান্তে হালকা বেতের চেয়ারে বসে অশোক। ছিপছিপে লম্বা শরীর, চোখদুটো এমনিতেই যেন জলজল করে। চওড়া কপাল; হালকা চুল; চুলগুলো উল্টোদিকে ঠেলে দেওয়া। সমস্ত চেহারায় নির্মল বুদ্ধির ছাপ। সামনে বেতের টেবিল, তার উপর চামড়ার একটা ছোট বাক্স। ইস্পাতের কুঁচোকাঁচা যন্ত্রপাতি আর ওষুধের ছোট বড় শিশিতে বাক্সটা বোঝাই। টেবিলের উপর নুয়ে পড়ে অশোক সেগুলো পরিষ্কার করছিলো। দু-একটা যন্ত্রপাতি বের করে শ্যাময় চামড়া দিয়ে ঘসছিল, ওষুধের দু-একটা শিশি বের করে আলোয় তুলে দেখছিল। কুনুর কথা শুনে অশোক অত্যন্ত শান্তভাবে মুখ তুললো, কুনুর দিকে স্থিরভাবে রইল চেয়ে। কুনু আবার বল্ল, এবার একটু বেপরোয়া ভাবেই, "ছুটি মানে একদম ছুটি।"

অশোকের চোখমুখে হাসির হালকা ছায়া খেলে গেল। "আর একদম ছুটি মানে?"

কিন্তু কুনুর শরীরে একটুও চাঞ্চল্য দেখা গেল-না। তেমনি আধবোজা চোখ; তেমনি নিস্পৃহ গলা। "একদম ছুটি মানে একদম ছুটি। চিৎ হয়ে হাই তুলব, যখন খুশি ঘুমোবো, যখন খুশি খাবো। আবার চোখ বন্ধ করব, আবার ঘুমোবো, আবার হাই তুলবো।"

"তার মানে ঘুমোতে ঘুমোতে হাই তুলবি না, হাই তুলে তারপর ঘুমুবি!"

"তা ইচ্ছে হলে ঘুমুতে-ঘুমুতেও হাই তুলবো বইকি!"

"আর ইচ্ছে না হলে?"

"না হলে তুলবো না।"

"বেশ, বেশ। তার মানে এককথায়, সুখে থাকতে চাস! কি বল?"

"তা চাই। কিন্তু সুখ কি সইবে?"

"কেন? কী হল?"

"তোর ওই ব্যাগটা? ও বিভীষিকাটাকে সঙ্গে না আনলেই পারতিস।"

"কেন, ব্যাগটা আবার তোর পাকাধানে কী মই দিল? তুই যদি ঘুমোতে-ঘুমোতে হাই তুলিস তা হলে ব্যাগটা নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না।"

"ব্যাগ ছেড়ে ব্যাগের মালিকও আপত্তি করলে শুনছি না।"

"তা হলে?"

"তবু তোর ওই ব্যাগটা দেখলে আতঙ্ক হয়, ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলা দূরের কথা, ঘুমই চটে যায়। এখুনি হয়ত কোনো দুর্মুখ এসে খবর দেবে কোথায় চুরি হয়েছে বা কার দামী জহরৎ উধাও হয়েছে আর অমনি তোর চেহারাটা বদলে যাবে; ওই ব্যাগ বগলে পুরে বলবি, 'কুনু, দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে নে'।"

"তা ব্যাগটা কী অপরাধ করল?"

"ওটাই ত তোর মাথার পোকা, তোকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে। সময় নেই অসময় নেই, নাওয়া নেই খাওয়া নেই, এখানে ওখানে যেখানে সেখানে তোকে ঘোড়দৌড় করাচ্ছে। আর, তোর অনিবার্য ল্যাঙ-বোট হিসেবে আমাকেও হচ্ছে ছুটতে।"

অশোক হাসতে লাগল। "এ কথা অবশ্য ঠিকই যে ব্যাগটা না থাকলে তদন্তের কাজ আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ত। বহুদিন ধরে বহু চেষ্টা করে একটা ছোট্ট চামড়ার ব্যাগে তদন্তের পক্ষে প্রায় সমস্ত দরকারী জিনিষপত্তর গুছিয়ে নিতে পেরেছি। কিন্তু তবু, তদন্তের জন্যেই ব্যাগ, ব্যাগের জন্যে ত' আর তদন্ত নয়! মিছিমিছি ব্যাগ বেছারার ওপর চটে লাভ কি বল?"

"সেই দৈত্য'র গল্পটা মনে আছে?" কুনু বল্ল, "সেই একটা লোক একটা দৈত্য তৈরি করেছিলো। তারপর, তৈরি করবার পর, দৈত্যটা চাইল সেই লোকটাকেই জলযোগ করে সেরে ফেলতে। তোরও হয়েছে তাই, ব্যাগটাই এখন তোর মাথা খাচ্ছে। ওটা দেখলেই তোর

মনের মধ্যেটা যেন চুলকোতে থাকে, শান্তিতে এক মুহূর্ত ছুটি ভোগ করতে পারিস নে। কোথায় চোর, কোথায় ছ্যাঁচোড়—তাদের জন্যে মন কেমন সুরু করে। আরে বাবা…"

কুনু হয়ত বক্তৃতাটা আরও খানিক্ষণ চালাতো। কিন্তু অশোকের দিদি, যাঁর বোম্বাইএর বাড়িতে ওরা দুজন বেড়াতে এসেছে, দালানে উপস্থিত হলেন, এবং তাঁর পিছন-পিছন ভৃত্য; ভৃত্যের হাতে প্রকাণ্ড ট্রে, এবং নানান্ রকম খাবার, চায়ের সরঞ্জাম এবং খবরের কাগজ ট্রের উপর। খাবার-দাবার দেখে কুনুর মধ্যে এতক্ষণ পরে সত্যিকারের উৎসাহ দেখা দিল। ডেকচেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসল, পাশের টি-পয় থেকে ধপাস করে মাসিক পত্রিকাগুলো মেঝয় দিল ফেলে। চাকর ট্রেটা নামিয়ে রাখল টি-পয়ের উপর, দিদি একটা বেতের চেয়ার টেনে হাসতে হাসতে বসে পড়লেন। চাকরটা চলে যাচ্ছিল, কুনুর ডাকে ফিরে দাঁড়াল। গম্ভীর ভাবে খবরের কাগজটা তার হাতে তুলে দিতে দিতে কুনু বল্ল, "এটা নিয়ে যাও।"

চাকর, অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে, এ নিয়ে আমি কী করব?"

কুনু বলল, "উনুন ধরাবি।"

চাকর আরও অবাক হয়ে বলল, "আজ্ঞে এ যে আজকের কাগজ!"

দিদি কুনুকে চেনেন, কিন্তু তার এ ধরণের ব্যাপার দেখে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। "কাগজটার ওপর হঠাৎ এত রাগ হল কেন?"

কুনু বল্লে, "ও এক অতি সর্বনেশে ব্যাপার। কোথায় এক কোনায় হয়ত কী খুন খারাপির খবর থাকবে, আর আপনার ভাইটি বলে বসবে কুনু, দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে বেরুতে হবে। বুঝছেন না দিদি, এই যে ছুটি, এত কষ্ট করে এই যে বেম্বাই আসা, সব একেবারে মাঠে মারা যাবে। ছুটোছুটিই সার হবে।"

আশাক অনুনয়ের সুরে বল্ল, "দোহাই তোমার কুনু। ঘুমুতে ঘুমুতে তুমি যতখুশী হাই তোলো, আমার একটুও আপত্তি নেই। কিন্তু সকালে চায়ের সঙ্গে কাগজ পড়তে না দিলে সত্যি আমার হজম হবে-না।"

কুনু মাতব্বরী চালে বল্ল, "ও সব বদ নেশা ছাড়াই ভালো, কী বলেন দিদি?"

দিদি হাসতে লাগলেন। দুই বন্ধুর মধ্যে কার দিক যে নেওয়া যায় ঠিক খেয়াল করতে পারছিলেন না। চাকর ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাবে দাঁড়িয়ে রইল। অশোক এবার প্রায় কাকুতি মিনতি সুরু করল। অগত্যা কাগজটা তাকে দিতেই হল; চাকরটা স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে চলে গেল।

অশোক ডুবল খবরের কাগজে। কুনু আর দিদি খাবার দাবারে মন দিল এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই তাদের মধ্যে গল্প গুজব খুব জমে উঠলো। অশোকের ভগ্নীপতি ভবতোষবাবু বোম্বাইতে ওকালতি করেন। আপাতত একটা মামলার ব্যাপারে পুনা গেছেন দিনকতকের জন্যে। দিদি যতবার বোম্বাই দেখতে বেরুবার কথা বলেন কুনু ততবারই আপত্তি করে জানায় ভবতোষবাবু ফিরলে একসঙ্গে সব বেরুনো যাবে। এটা যে তার আলস্যের ওজুহাত দিদি তা বোঝেন। কিন্তু কুনুর মতো চঞ্চল ছেলেকে আলসেমি করতে দেখে তাঁর বেশ মজাই লাগে। তাই রোজ সকালে ইচ্ছে করে কথাটা তোলেন।

আজকেও সেই কথা হচ্ছিল। দিদি বলছিলেন, "না ভাই, তোমার চেয়ে অশোকই দেখছি ছেলে ভালো। এই কদিন ত তুমি শুধু আলসেমি করেই কাটালে, কিন্তু অশোক ইতিমধ্যেই সমস্ত সহরটা চষে ফেলেছে।"

কুনু আড়চোখে অশোকের দিকে চাইল, প্রশংসা শুনে মুখের ভাবটা কী রকম হয়েছে দেখবার জন্য। কিন্তু চেয়েই কুনু চমকে উঠল। যা ভয় পেয়েছিলো ঠিক তাই। কাগজ পড়তে পড়তে অশোকের চেহারা একেবারে বদলে গেছে, চোখ মুখ একটু গম্ভীর, একটু থমথমে। অশোকের এ-চেহারার মানে কুনু বোঝে, তাই ঘাঁটাতে সাহস করে

না। দিদিও অশোকের দিকে একবার দেখলেন। চোখে চোখে দিদির সঙ্গে কুনুর কী যেন কথা হয়ে গেল। তারপর দুজনেই আবার অন্য কথা পাড়ল।

চায়ের পেয়ালাটা টেবিলে নিঃশব্দে নামিয়ে রেখে অশোক আস্তে আস্তে সোজা হয়ে দাঁড়ালো। কোন এক রহস্যের সন্ধান পেয়ে ওর দেহমন যেন উত্তেজনায় টান-টান হয়ে উঠেছে। তারপর দালানের একোণ থেকে ওকোণ পর্যন্ত পায়চারি করতে সুরু করল। কুনু বল্লে, "দিদি, লক্ষণ বড় খারাপ মনে হচ্ছে।"

যত উত্তেজিতই হোক না কেন, অশোকের কান সজাগ থাকে। কুনুর কথা শুনে পায়চারি থামিয়ে দাঁড়াল তারপর হোহো করে হাসতে হাসতে একটা বেতের চেয়ার কাছে টেনে পড়ল বসে। কুনু বল্লে., "তোর ভাবগতিক ত ভালো বলে মনে হচ্ছে না! দশ মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হতে হবে নাকি?"

অশোক হাসতে হাসতে বললে, "না না। আমাদের এখন বেরুতে হবে না। তবে ভবতোষদা খানিকক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন বলে মনে হয়।"

"তার মানে?" দিদি অবাক হয়ে বল্লেন, "ওঁর ত ফেরবার কথা দিন সাতেক পরে! তাছাড়া, উনি ত আর এমন একটা কেউ কেটা লোক নন যে বম্বে ফেরার কথা কাগজে বেরুবে!"

অশোক বলল, "তা অবশ্য বেরোয়নি।"

"তবে?" দিদি অবাক হয়ে প্রশ্ন করলেন।

অশোক নির্লিপ্ত ভাবে বল্ল, "কাগজে একটা ভুতের গল্প বেরিয়েছে।"

"ভুতের গল্প?"

"হুঁ।"

"আর তার থেকেই তোমার মনে হল উনি আজই ফিরে আসবেন?"

অশোক খুব জোর গলায় বলল, "নিশ্চয়ই।"

কুনু এবার প্রায় অধৈর্য হয়ে উঠে বল্ল, "হেঁয়ালী রাখ্। মনে হচ্ছে ছুটিটা মাঠে মারা গেল, ছুটোছুটি আবার করতেই হবে। কিন্তু ব্যাপারটা কী খুলে বল।"

অশোক বল্লে, "বিশেষ কিছু নয়। এখানে 'উদয় ভিলা' বলে একটা প্রকাণ্ড প্রাসাদ আছে দেখেছিস?"

কুনু বলল, "দেখব কেমন করে? একদিনও ত হাঁটতে বেরুইনি।"

দিদি বল্লেন, "ও অবশ্য দেখেনি, কিন্তু আমি দেখেছি। সান্ত ক্রস-এ। সমুদ্রের ঠিক ওপরে।"

"হুঁ", অশোক বল্ল, "সে বাড়ির মালিক প্রতাপচন্দ্র বাট্‌লিওয়ালা। কাগজে বেরিয়েছে যে উদয়ভিলায় ভুতের উৎপাত সুরু হয়েছে এবং প্রতাপচন্দ্র বার কতক ভুতের সাক্ষাৎ পেয়ে এত ঘাবড়ে পড়েছেন যে প্রায় মস্তিষ্ক বিকৃতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে বল্লে বাড়িয়ে বলা হয় না।"

কুনু হো হো করে হেসে উঠল। "খবরটা বোধহয় উল্টো ছাপা হয়েছে। ভুত দেখে মাথা খারাপ হয়নি, মাথা খারাপ হয়েছে বলেই ভুত দেখছে! যাই হোক ভবতোষদা ত উকিল, ওঝা নন! ভুত তাড়াতে এখানে ছুটে আসবেন কেন?"

অশোককে এ কথার জবাব দিতে হল না। কেন না কুনুর কথা শেষ হতে না হতেই একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল ফটকের বাইরে—ধুলোয় বোঝাই গাড়ি। দেখলেই বোঝা যায় অনেক দূর থেকে আসছে। তার মধ্যে থেকে নামলেন ভবতোষবাবু। নাদুস নুদুস মাঝবয়সী ভদ্রলোক।

[ক্রমশ]

আদিগঙ্গা

বিমল ঘোষ

আদিগঙ্গার ঘোলাটে ঢেউ জহ্নুমুনির কন্যা
চোখের জলে টাইটুম্বুর দু'কুল ছাপা বন্যা!
ভাঙা ঘাটের ফাটল বেয়ে বটের ঝুরি নামছে
পান্সী ডিঙি বজরা এসে জোয়ার দেখে থামছে।

কোন জগতের বাসিন্দা যে অলস মেদুর মনটা
সজল দুপুর ঢেউয়েয় নুপুর শুনছি সারাক্ষণটা।
জোলো হাওয়ায় হারিয়ে গেছে মিষ্টিফুলের গন্ধ
ছাইরঙা নীল আকাশখানা মেঘের কপাট বন্ধ।

টিনের চালে চপল তালে জলতরঙ্গ বাজছে
বিদ্যুতী রঙ্ সিঁথের সিঁদুর মেঘবালারা সাজছে,
মর্ত্যে গঙ্গা রুখতে গিয়ে অখ্যাতিটাই অর্জ্জন
ইন্দ্রলোকে উঠছে শোকে ঐরাবতের গর্জ্জন।

ভরাবাদর মাহভাদর ঝরছে আকাশগঙ্গা
বিষ্টি ধারায় টাইটুম্বুর ঝাপসা মনের সংজ্ঞা।

পরের দিন বড়দিন

এডালবার্ট স্টিফটর

অবশেষে কনরাডের মনে হোলো অনেক দূরের ঢালু তুষার-ঢাকা জমিতে যেন আগুনের লাল শিখা নেচে বেড়াচ্ছে। মাঝেমাঝে সেই শিখা কেঁপে-কেঁপে উপরে উঠছে, মাঝেমাঝে যাচ্ছে কমে। কখনো নজরে পড়ে, কখনো পড়ে না। স্থির হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইলো, সেদিক থেকে চোখ ফেরাতে পারলো না। আর নেচে-নেচে চললো সেই আগুন। তাদের মনে হোলো আগুনটা ক্রমশ যেন এগিয়ে আসছে। ক্রমশ আগুনের চেহারাটা বড় হয়ে উঠলো, তার নাচ চোখে পড়লো অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে। আর সেটা আগের মতো বারবার নজরের বাইরে চলে যায় না, যদি বা যায় অল্প পরেই আবার চোখে পড়ে। আরো খানিক পরে সেখানকার শান্ত নীল বাতাসের ভিতর যেন অত্যন্ত অস্পষ্ট একটি শব্দ ভেসে এলো। ভারি মৃদু সেই শব্দ, যেন একটানা বেজে চলেছে রাখালের শিঙা। আর তাই শুনে তারা দুজনেই উঠলো চীৎকার করে। খানিক পরে আবার তারা সেই শব্দ শুনলো। আবার চীৎকার করলো তারা। সেখান থেকে এক পা-ও নড়লো না। আগুনটা ক্রমশ এগিয়ে আসছে। তিনবারের বার সেই শব্দ শোনা গেলো—এবারে আরো স্পষ্টভাবে। আবার প্রাণপন জোরে চেঁচিয়ে উত্তর তারা দিলো। আরো খানিক পরে ভালো করে তারা আগুনটা দেখলো—আসলে সেটা আগুনই নয়, লাল একটি পতাকা, ক্রমাগত তাকে নাড়ানো হচ্ছে। আর সেই মুহূর্তেই আবার শোনা গেলো রাখালের শিঙার শব্দ, এবার অনেক কাছে এসেছে। আবার তারা উত্তর দিলো।

"সান্না, সান্না!" কনরাড চীৎকার করে উঠলো, "জিশ্‌চেড থেকে সবাই আমাদের খুঁজতে আসছে! পতাকাটা আমি চিনি। সেই বিদেশী লোকের কাছে পাওয়া এই পতাকা। সে আর এশেনজায়গের-এর ছোটো ভাই দু-জনে মিলে গার্‌স্-এর চুড়োয় উঠে এই লাল পতাকাটা পুঁতেছিলো যাতে নীচে থেকে পার্সন্ টেলিস্কোপ চোখে লাগিয়ে বুঝতে পারে তারা চুড়োয় পৌঁচেছে। সেই বিদেশী লোকটিই পার্সন্‌কে এই পতাকা দিয়ে গেছে। তুই তখন নেহাৎ বাচ্চা!"

"হ্যাঁ ভাই।"

আরো কিছু পরে পতাকার সঙ্গেই তারা দেখতে পেলো মানুষের সেই ছোটো দলটিকে। দূর থেকে তাদের মনে হচ্ছিলো কতকগুলি কালো-কালো বিন্দু যেন নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। থেকে-থেকে সেই শিঙা বাজতে লাগলো আর ক্রমশই এগিয়ে আসতে লাগলো সেই শব্দ। উত্তর দিতে তারাও ভুললো না।

অবশেষে সেই বরফের দেশে তারা দেখলো কতকগুলি মানুষ, তাদের মাঝখানে লাল পতাকাটা, হাতে পাহাড়ে ওঠার লাঠি। আরো কাছে এলে তারা লোকগুলিকে চিনতে পারলো। শেফার্ড ফিলিপ শিঙাটা বাজাচ্ছে, সঙ্গে রয়েছে তার দুই ছেলে, এশেনজায়গের-এর ছোটো ভাই আর জিশ্‌চেডের আরো কয়েকজন লোক।

"ঈশ্বরের জয় হোক!" চেঁচিয়ে উঠলো ফিলিপ। "ওই তো ওরা! সমস্ত পাহাড়টা মানুষে ছেয়ে গেছে। তোমাদের মধ্যে কেউ একজন সাইডার-অল্প-এ ছুটে গিয়ে ঘণ্টাটা বাজাও। ঘণ্টার শব্দ শুনলেই অন্য সবাই জানবে ছেলেমেয়েদের আমরা খুঁজে পেয়েছি। তোমাদের মধ্যে আর একজন ক্র্যাবস্টোন-এ গিয়ে পতাকাটা পুঁতে দাও। তা হলে আমাদের গ্রামের লোকেরা জানবে এদের পাওয়া গেছে। জানতে পারলেই তারা কামান দাগবে আর সেই চুল্লিটায় দেবে আগুন আর ধোঁয়া দেখলেই এখনো যারা পাহাড়ে খোঁজাখুঁজি করছে তারা ফিরে আসবে। আজই দেখছি সত্যিকারের বড়দিন!"

"আমি অল্প-এ চললুম," বললো একজন।

"আমি চললুম ক্র্যাবস্টোনে পতাকাটা পুঁততে", বললো আর একজন।

"আর আমরা সাইডার-আল্প পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের নিয়ে যাবো," বললো ফিলিপ।

ফিলিপের এক ছেলে পথ দেখিয়ে চললো আর একজন তুষারের ভিতর দিয়ে পতাকাটা নিয়ে গেলো ক্র্যাবস্টোন-এ।

এশেনজায়গের সান্নার হাত ধরলো, শেফার্ড ফিলিপ ধরলো কনরাডের।

পথটা ঘুরে-ঘুরে নেমেছে। এই চলতে হচ্ছে একদিকে এই আবার চলতে হচ্ছে ঠিক উল্টোদিকে। কখনো নিচে নামছে, কখনো চড়ছে উপরে। তুষারে সমস্ত পথ ভরা; কেবলি তুষার। ফলে সমস্ত দৃশ্যের মধ্যে কোনো পরিবর্তন নেই, একই রকম দেখতে। যে-সব জায়গা খাড়া নেমে গেছে সে-সব জায়গায় পাহাড়ে চড়ার লোহার জুতো পরে ছেলেমেয়েদের কোলে নিয়ে তারা পার হোলো। অনেক পরে তারা শুনলো ছোটো একটি ঘণ্টার শব্দ, নিচে বাজছে। সেই অস্পষ্ট মৃদু শব্দই প্রথম জানালো এতোক্ষণে তারা নিচেকার পৃথিবীর অওতায় পৌচেছে। অনেকটা নিচুতে যে তারা নেমে এসেছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই—কারণ তারা দেখলো তুষারের একটি চূড়ো তাদের মাথার অনেক অনেক উঁচুতে নীল শূন্যে রয়েছে দাঁড়িয়ে। কিন্তু তাদের মন রইলো সাইডার-আল্প-এর সেই ছোট্ট ঘণ্টাটির দিকে। সেখানেই সবাইকার জমা হবার কথা। যেতে-যেতে নিস্তব্ধ বাতাসে কামানের শব্দও গেলো শোনা। গ্রামের লোকেরা কামান দাগছে। কিছু পরেই তাদের নজরে পড়লো ধোঁয়ার কুণ্ডুলি আসছে উঠে।

ছোট্ট একটি ঢালু পথ অতিক্রম করতেই তাদের চোখে পড়লো সাইডার-আল্প। সেদিকেই চললো তারা। সেখানকার কুঁড়ে ঘরে আগুন জ্বলছে, তাদের মা রয়েছে সেখানে। এশেনজায়গের-এর সঙ্গে ছেলেমেয়েদের নামতে দেখে পাগলের মতো চীৎকার করে তুষারের উপর বসে পড়লো তাদের মা।

তারপরেই এলো ছুটে। ভালো করে তাদের সর্বাঙ্গ করলো পরীক্ষা। একই সঙ্গে চাইলো তাদের খাবার দিতে, আগুনে সেঁকে গরম করতে, খড়ের বিছানায় তখুনি শুইয়ে দিতে—ভেবে পেলো না কোনটা আগে করবে। ছেলেমেয়েদের কোনো ক্ষতি হয়নি দেখে তার আনন্দের আর সীমা রইলো না। তাদের তখন দরকার কিছু গরম

খাদ্যের আর বিশ্রামের। তখনি খাবার আনা হোলো তারপর তারা খড়ের বিছানায় লাগলো বিশ্রাম করতে। দলের আর সবাইকারো বিশ্রামের কম দরকার ছিলো না।

কুঁড়ে ঘরের উপরকার ছোটো ঘণ্টাটি না থেমে ক্রমাগত চললো বেজে। খড়ের বিছানায় খানিক তারা বিশ্রাম করলো তারপর নতুন আর এক দল লোকের সাড়া পেয়ে অন্যদের সঙ্গে তারাও ছুটে বাইরে এলো বরফের ঢালু পথ বেয়ে কারা উঠে আসছে দেখতে।

আসছিলো আর কেউ নয় সেই জুতোনির্মেতা—এক সময় পাহাড়ে-পাহাড়ে ঘুরে বেড়ানো যার নেশা ছিলো। তার হাতে পাহাড়ে ওঠার লোহার সরঞ্জাম। জুতোনির্মেতার সঙ্গে ছিলো তার বন্ধু আর প্রতিবেশীর দল।

তাকে দেখে তার স্ত্রী বলে উঠলো, "সেবাস্টিয়ান, এই দেখো এরা এসেছে!"

ছেলেমেয়েদের দেখে কিন্তু জুতোনির্মেতা যেন বোবা হয়ে গেলো, থরথর করে লাগলো কাঁপতে—তারপর এক দৌড়ে চলে এলো তাদের কাছে। কী যেন বলার জন্যে ঠোঁট নাড়ালো, কিন্তু কোনো স্বর বেরুলো না। শুধু দু-হাত দিয়ে তাদের জড়িয়ে ধরলো, ধরে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর চাইলো সে নিজের স্ত্রী-র দিকে আর তাকেও কাছে টেনে এনে ধরা-ধরা গলায় শুধু বললো, "সান্না, সান্না!"

আরো কিছু পরে তুষারের উপর থেকে টুপিটা কুড়িয়ে নিয়ে বন্ধুদের কাছে সে ফিরে গেলো। মনে হোলো অনেক কথা বুঝি বলবে। কিন্তু শুধু বললো, "ভাইসব, তোমাদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

আরো কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলো সবাই। বিশ্রাম পেয়ে ছেলেমেয়েদের দুর্বলতা অনেকটা কমলো। অবশেষে সেই জুতোনির্মেতা বললো, "আমরা সবাই যদি জড় হয়ে থাকি তা হ'লে ভগবানের নাম স্মরণ করে বেরিয়ে পড়া যাক।"

"সবাই জড় হবার সময় এখনো হয়নি," উত্তরে জানালো ফিলিপ। "কিন্তু যারা এখনো এসে পৌছয়নি আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডুলি দেখে তারা বুঝবে ছেলেমেয়েদের আমরা খুঁজে পেয়েছি। তারপর এই ফাঁকা কুঁড়ে দেখে বিনা দ্বিধায় গ্রামে ফিরে যাবে।"

তাদের দল আবার যাত্রার জন্যে প্রস্তুত হোলো। সাইডার-আল্প থেকে জিশ্‌চেড বেশি দূর নয়। এমন কি গ্রীষ্মকালে জিশ্‌চেডের বাড়ির জানালার ভিতর দিয়ে এই আল্প্‌ পাহাড়ের মাঠ আর ধূসর কুঁড়ে ঘরটি স্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু তার নীচেই দেয়ালের মতো খাড়াভাবে পাহাড়টা নেমে এসেছে। অনেকটা নীচু পথ। শীতকালে সে-পথে নামা যায় না। পাহাড়ে ওঠার লোহার সরঞ্জাম না থাকলে গ্রীষ্মকালেও সে-পথে ওঠা সম্ভব নয়। ফলে সেখান থেকে অনেকটা ঘুর-পথে নেক্‌ পর্যন্ত গিয়ে স্মৃতিস্তম্ভের কাছ থেকে জিশ্‌চেডের দিকে মোড় ঘুরতে হয়। পথে সাইডার-মেডো পড়ে। সেই মাঠ পেরিয়ে যাবার সময় জিশ্‌চেড-এর অনেকটা কাছে আসা যায়। সেখান দিয়ে যাবার সময় তাদের মনে হোলো গ্রামের কুঁড়ে বাড়ির জানালাগুলি যেন দেখতে পেয়েছে।

আল্প পাহাড় পার হবার সময় জিশ্‌চেড-এর ছোট্ট গির্জের ঘণ্টাধ্বনি স্পষ্ট তাদের কানে এলো।

আগের দিন থেকে ছেলেমেয়েদের জন্যে সবাই খুব ব্যস্ত হয়ে পড়ায় ধর্মজাযক গির্জেয় প্রার্থনার কাজ বন্ধ রেখেছিলেন। ভেবেছিলেন কিছু পরেই হয়তো তাদের খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পরেও তাদের খোঁজ পাওয়া গেলো না দেখে শেষে তাঁকে প্রার্থনার কাজ সুরু করতেই হয়েছে।

গির্জের ঘণ্টাধ্বনি কানে আসতেই তারা সবাই নতজানু হয়ে বসে প্রার্থনা করলো। ঘণ্টা বাজা শেষ হলে আবার তারা যাত্রা করলো সুরু।

জুতোনির্মেতা তার মেয়েকে কোলে নিয়ে চলেছিলো আর তার মুখ থেকেই শুনছিলো সমস্ত খবর।

নেক্‌-এর কাছে অরণ্যে প্রবেশ করার আগে তাদের

চোখে পড়লো অনেক লোকের পায়ের ছাপ। সেগুলো পরীক্ষা করে জুতোনির্মেতা বললো, "এ-জুতোগুলো আমার তৈরি নয়।"

অল্প পরেই ব্যাপারটা জানা গেলো।

তাদের সবাইকার সাড়াশব্দ পেয়ে অন্য একটি দল সেখানে এলো ফিরে। সে-দলটি মিল্‌স্‌ডর্ফের সেই রঙের কারবারীর। দুর্ভাবনায় রঙ তার ছাই-এর মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। মিল্‌স্‌ডর্ফের কয়েকজন লোক, তার কারখানার সমস্ত কর্মী এবং বাড়ির চাকরদের নিয়ে সে-ও খুঁজতে বেরিয়েছে। তাকে দেখা গেলো দলের আগে-আগে আসতে।

জুতোনির্মেতা সেই রঙের কারবারীকে দেখে চেঁচিয়ে বললো, "এই যে, এদের পাওয়া গেছে। পথ ভুল করে এরা গ্লেসিআর পেরিয়ে চলে গিয়াছিলো। ফার্ন-এর বড়-বড় খাদের ওপর পর্যন্ত পৌঁচেছিলো।"

"জয় ভগবান! ওই তো—ওই তো ওরা!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো রঙের কারবারী। "তারা যে পাহাড়ের চূড়োর দিকে গিয়াছিলো সে-খবর আমি আগেই জেনেছি। রাত্রে তোমার কাছ থেকে খবর পেয়েই বনের সমস্ত আনাচে-কানাচে লণ্ঠনের আলো দিয়ে ছেয়ে দিই কিন্তু কিছুই চোখে পড়লো না। যখন ভোর হয়ে এলো তখন দেখলুম লাল স্মৃতিস্তম্ভের পাশ দিয়ে যে পায়ে-হাঁটা পথ তুষার চূড়ার দিকে গেছে তার আশেপাশের ছোটো-ছোটো গাছের ডালপালা ভাঙাভাঙা। দেখেই বুঝলুম এই পথ দিয়েই তারা গেছে। কারণ হাঁটবার সময় তারা এই রকম ভাবে গাছপালা ভাঙতে-ভাঙতে চলে। তখনি ব্যাপারটা বুঝলুম। যে-পথ দিয়ে তারা গিয়েছে সে-পথ ছাড়িয়ে অন্য কোনো দিকে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ পথটা সরু আর গভীর, দু-পাশে তার পাঁচিলের মতো দেয়াল। তারপর নিশ্চয়ই তারা সেই বিরাট পাথরগুলোর কাছে পৌঁছয়। তারপর আবার সেই সরু পথ, তার ডানদিকে খাড়া হয়ে পাহাড়টা উঠেছে, বাঁ দিকে নামবার জায়গা নেই। ফলে ক্রমাগতই তাদের উপরে উঠতে হচ্ছিলো। এই খবর তৎক্ষণাৎ আমি জিশ্‌চেড-এ পাঠাই কিন্তু ফিরতি-পথে কাঠুরে মাইকেল বললো ইতিমধ্যেই তোমরা নাকি ওদের খুঁজে পেয়েছো। ওপরে উঠতে-উঠতে আমরা তখন প্রায় এক বুক বরফের মধ্যে এসে পড়েছি। মাইকেলের মুখে খবর পেয়ে নেমে এলুম।"

মাইকেল বললো, "ক্র্যাবস্টোনের ওপর লাল পতাকাটা পোঁতা রয়েছে দেখেই বুঝলুম এদের পাওয়া গেছে। আমি তো আপনাদের বলেইছিলুম দেয়ালের মতো সোজা পাহাড় বেয়ে এরা নামতে পারবে না—এই পথ দিয়েই ফিরতে হবে।"

নিজের জামাইকে উদ্দেশ্য করে রঙের কারবারী বললো, "ভগবানের কী দয়া দেখো—একটুও বাতাস বয়নি! আগামী একশো বছরের ভেতর এ-রকম আশ্চর্য তুষার কখনো পড়বে না। যেন একটা বাঁশের ওপর থেকে সোজা-সোজা ভিজে সুতো নেমে এসেছে! বাতাস বইলে ছেলে-মেয়েদের আর খুঁজে পাওয়া যেতো না।"

জুতোনির্মেতা উত্তর দিলো, "বাস্তবিক! ভগবানের কী দয়া!"

মেয়ের বিয়ে দেবার পর থেকে এ-পর্যন্ত রঙের কারবারী একবারও জিশ্‌চেড-এ যায়নি। আজ ঠিক করলো সবাইকার সঙ্গে সেখানে যাবে।

লাল স্মৃতিস্তম্ভের দিকে তারা সবাই চললো। সেখানে দেখা গেলো একটি স্লেজ গাড়ি অপেক্ষা করছে। কাজে লাগতে পারে ভেবে আগে থেকেই জুতোনির্মেতা গাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছিলো। তাদের মা'র সঙ্গে ছেলেমেয়েদের স্লেজে চড়িয়ে অনেক কম্বল আর ফার্ দিয়ে ঢেকে জিশ্‌চেডে পাঠানো হোলো।

বাকী দল দুপুরে পৌঁছলো।

পাহড়ে-পাহাড়ে আর যারা খুঁজতে বেরিয়েছিলো ধোঁয়ার সংকেত দেখে একে-একে তারাও ফিরলো। সব শেষে এলো ফিলিপ, ক্র্যাবস্টোনের চূড়োয় পতাকাটা পোঁত-

বার ভার সে নিয়েছিলো। তার ফিরতে সন্ধে হয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে তাদের দিদিমা জিশ্‌চেড-এ এসে অপেক্ষা করছিলো।

"আর কক্ষোণো শীতকালে ওদের নেক্ পেরুতে দোবো না", বললো তাদের দিদিমা।

এতো হৈ-চৈ দেখে তারা কি রকম যেন হকচকিয়ে গিয়েছিলো। গরম খাবার খাইয়ে তাদের বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হোলো। সন্ধের দিকে তারা খানিকটা সুস্থ হোলো। একে-একে প্রতিবেশী ও বন্ধুরা তখন খবর নিতে এসে বসার ঘরে গল্প করছে, তাদের মা শোবার ঘরে বিছানার পাশে বসে তখন মেয়ের হাত ধরে রয়েছে, এমন সময় সান্না বললো, "জানো মা, রাত্তিরে পাহাড়ে বসে থাকার সময় যীশুখৃষ্টকে আমরা দেখতে পেয়েছি।"

"ওরে আমার বাচ্চা দুষ্টু মিষ্টি মেয়ে!" আদর করে বললো তার মা, "যীশুখৃষ্ট যে তোদের জন্যে অনেক জিনিস পাঠিয়েছেন। শিগ্‌গীরই পাবি।"

মোমবাতি হোলো জ্বালানো, বাক্স খুলে উপহারগুলো হোলো সাজানো আর শেষকালে বাসার ঘরের দরজাটা হোলো খোলা। আর বিছানায় শুয়ে শুয়েই তারা দেখতে পেলো উজ্জ্বল, ঝকঝকে, সুন্দর ক্রিস্‌মস্ গাছ। ক্লান্তির কথা তাদের কারুর মনেই রইলো না। গায়ে জামা-কাপড় গলিয়ে এক দৌড়ে তারা গেলো উপহারগুলি নিতে। তার-পর ভারি খুসি হয়ে বিছানায় ফিরে পড়লো ঘুমিয়ে।

আজ সন্ধ্যায় জিশ্‌চেড-এর সরাইখানায় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক বেশি হৈ-চৈ। যারা গির্জেয় যেতে পারেনি তারা এবং বাকী আর সবাই এখানে এসে জমা হয়েছে। সবাই নিজের-নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছে, কে কী দেখেছে বা শুনেছে, করেছে বা করতে নির্দেশ দিয়েছে, কী-কী বিপদ ঠেলে হয়েছে এগিয়ে যেতে, ইত্যাদি। আর কী উপায়ে আরো ভালো করে খোঁজা যেতে পারতো নিজেদের মধ্যে সে-সব কথারও আলোচনা হচ্ছে।

এই ঘটনা জিশ্‌চেড্-এর ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে রইলো। অনেক দিন পর্যন্ত ঐ ব্যাপার নিয়ে চললো আলাপ-আলোচনা। অনেক বছর পরে পরিষ্কার দিনে পাহাড়টি যখন ঝকঝক করবে কিংবা কোনো বিদেশী পথিকের সঙ্গে তারা আলাপ-আলোচনা করবে—তখনো ঐ দিনটির কথা না বলে তারা পারবে না।

আর সেই দিন থেকেই ছেলেমেয়েরা যে এ-গ্রামেরই সম্পত্তি স্পষ্ট করে সবাই সে-কথা বুঝলো। তারপর থেকে তাদের আর বাইরের লোক বলে গ্রামবাসীরা ভাবলো না—ঐ পাহাড় থেকে এদের তারা জোর করে ছিনিয়ে এনেছে!

আর তাদের মা সান্না শুধু এখন তাদেরই মা নয়, সমস্ত জিশ্‌চেড-এরই মা।

ছেলেমেয়েরা পাহাড়টিকে কোনোদিনও ভুলবে না। বাগানে বেড়াবার সময় আগের চেয়ে অনেক বেশি মন দিয়ে তারা এবার থেকে পাহাড়টিকে দেখবে—পুরোনো দিনের মতো ভবিষ্যতে আবার সূর্যের আলো মধুর উত্তাপ ছড়াবে, নেবু গাছের সুগন্ধে ভরে উঠবে সমস্ত বাতাস, মৌমাছিরা বেড়াবে গুনগুনিয়ে আর সেই পাহাড়টিও আকাশের মতো নীল আর সুন্দর হয়ে ঝুঁকে দেখবে তাদের।

শেষ

কাটতে পারে

পরিমল রায়

কন্ধকাটা, মুণ্ডুকাটা, কাস্তে-কাটা ধান
আর কী কাটা যায় বল তো ওহে বুদ্ধিমান ?
দিন কাটছে, রাত কাটছে, কাটছে বারো মাস
ভালো-ভালো বইগুলো সব কাটছে রাশ-রাশ।
সাঁতার কাটে, জাবর কাটে, মায়া কাটায় মরে,'
অনেক লোক ছড়া কাটে সারা জীবন ভরে'।
সুতো কাটে তাঁতি এবং ময়রা কাটে ছানা,
লজ্জা হলে জিভ কাটে যে কা'র না আছে জানা ?
চেক কাটছে বড়লোক, টিকিট কাটে যাত্রী,
ভণ্ড সাধু তিলক কাটে সারা দিবস-রাত্রি।
দুষ্টু লোক কুষ্ঠি কাটে, চায় না কারুর ইষ্ট
গানের মাঝে তাল কাটলে বড়ই দুরদৃষ্ট।

নকুলবাবুর আসল অসুখ

বংশীবদন মুখোপাধ্যায়

"আমার নাম শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র পুরকায়স্থ। মশায়ের নাম ?" এখান থেকে ওখান পর্য্যন্ত হাঁমুখ, ফ্যাক্-ফ্যাক্ করে হাসছে আর পান চিবোচ্ছে আর বিনয়ে যেন হিমালয় প্রমাণ সমস্ত শরীরটা গলে গিয়ে গঙ্গা বওয়াচ্ছে। ভাগ্যি এই, যে লোকটার ভুঁড়ি প্রকাণ্ড বড়, নইলে হয়ত আমার আরও কাছ ঘেঁসে বসত এবং ত্যা-ত্যা করে কথা বলত। আমার ত' হাড়পিত্তি জ্বলে গেল; এ লোকটা যদি অমন করে গায়ে-পড়ে আদিখ্যেতা দেখাতে আসে তা হলে এখানে চাকরি করা আমার বেশীদিন পোষাবে না। মনে মনে ঠিক করে নিলুম, লোকটাকে মোটেই প্রশ্রয় দেওয়া নয়। তা হলেই পেয়ে বসবে। তবু ভদ্রতা বলেও ত একটা জিনিস আছে, সবিনয়ে যখন আলাপ করতে এসেছে তখন উত্তর না দেওয়াটা বড্ড খারাপ দেখাবে। লোকে ভাববে গুমোর! বিশেষ করে আমার বয়েস মাত্র ছাব্বিশ, লোকটার কম পক্ষে পঞ্চাশ ত' হবেই। অভদ্রতা করলেও যতটা ভদ্রভাবে করা সম্ভব তাই করতে হবে। উত্তর দিলুম, ছোট করে উত্তর দিলুম, "হরেন পাল"।

লোকটা আবার ফ্যাক্ ফ্যাক্ করে হাসতে লাগল, "ত অবশ্য আমি জানতুম।" এ আবার কোন ধরণের রসিকতা ? অবাক হয়ে গেলুম। নকুলচন্দ্র বল্ল, "আপনাদের পাশে ত' হরি মিত্তিরের গলি, সেটা থেকে বেরিয়েছে রামধন সরকার বাই লেন, তার শেষে চৌধুরীবাড়ী ? আমি গত বিশ বছর সেই চৌধুরীবাড়ীর একতলার ভাড়াটে।"

মনে মনে শঙ্কিত হয়ে উঠলুম। সেরেছে! পাড়ার লোক! তার মানে জমাতে পারলে শুধু আপিসে বদ্ জ্বালাবে না, বাড়ীও চড়াও করবে। সেই ভয়ে পাস কাটিয়ে যাবার মতো জবাব দিলুম, "ও"। কোনোরকম উৎসাহের ভাব প্রকাশ করলুম না।

লোকটা কিন্তু ছাড়বার পাত্র নয়। "আপনাদের বাড়ীর সবাইকে চিনি। মানে আলাপ অবশ্য নেই, কিন্তু সকলকে জানি। গত বিশ বছর ধরে দেখছি কি না। সব খবর রাখি। কোন দিন বাড়ীতে মাংস হয় তা পর্য্যন্ত বলে দিতে পারি।"

আবার বল্লুম, "ও"। এবারও গলা অত্যন্ত অবিচলিত।

লোকটা আবার বল্ল, "হেঁ-হেঁ। আপিসে এসেছেন ভালোই হয়েছে। আমি গত বিশ বছর ধরে আছি কি না। খুঁটি-নাটি সব জানি। যখনই বিপদে পড়বেন, মানে মুস্কিলে পড়বেন, তখনই বলবেন। পথ বাৎলে দেব।"

বলা উচিত ছিলো ধন্যবাদ। কিন্তু এতগুলো অক্ষর বল্লে যদি জমিয়ে বসে সেই ভয়ে আবার বল্লুম, "ও।"

লোকটা তাতেও দমে না। "আপনার বাবার সঙ্গে অনেক করে জমাবার চেষ্টা করেছিলুম। কিন্তু হেঃ হেঃ বড় রাসভারি লোক ছিলেন, একেবারে পাত্তাই পাইনি। জানেন ত সব—।"

কিছুই অবশ্য জানি নে। তবু সেদিক দিয়ে না গিয়ে আবার বল্লুম, "ও।"

লোকটা এবার নিরুপায় ভাবে চলে গেল, তবু যাবার সময় আত্মীয়তা দেখিয়ে বলতে ভুললো না, "টিফিনের সময় আমার টেবিলে আসবেন। বাড়ি থেকে খাবার আসে, একসঙ্গে বসে একটু খাওয়া যাবে।"

মোটেই ইচ্ছে ছিলো না একসঙ্গে বসে খাবার। কিন্তু উপায় নেই। টিফিনের সময় হবার ঠিক আগেই আবার এসে উপস্থিত! "কই এলেন না ? আমার আবার খাবার সময় একটু ইয়ে কি না, মানে তর সইতে পারি না। তাই আপনাকে ধরে নিয়ে যেতে এলুম।"

খাবার জন্যে সাধ্যসাধনা! একটু ভদ্রতা জ্ঞান থাকলেই কৃতজ্ঞ বোধ করা উচিত। কিন্তু জীবনে এই প্রথম বুঝলুম আমি ভদ্রলোক নই। কেননা, ভদ্রলোকের উপর আমার রাগে হাড়পিত্তি জ্বলে যাচ্ছিল। আবার সেই ত্যা-ত্যা ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে জমাবার চেষ্টা! সে যাই হোক, নিস্তার নেই কপালে। উঠতে হল, যেতেও হল পেছুপেছু! গিয়ে ত আমার চক্ষুস্থির! টেবিলের উপর থেকে কাগজপত্তর ফাইলটাইল সব মেঝেয় নামানো; টেবিল ভরতি খাবার! টিফিন মানে ত জলযোগ, কিন্তু এ যে দেখছি একমাসের দু'বেলার মতো খাবার, দুজনে হেসে-খেলে এই খাবার নিয়ে মরুভূমি পেরুতে পারে!

আমায় অবাক হতে দেখে লোকটা হে-হে করে হাসতে লাগল, তালে তালে দুলতে লাগল তার ভুঁড়ি, যেন দমকা হাওয়ায় নারকেল বনের দোলা। "হেঃ হেঃ! অবাক হচ্ছেন! হেঃ হেঃ! আসলে এই খাওয়াই আমার কাল হয়েছে! আরে মশাই, গত বিশ বছর ধরে ভাবছি মাইনে বাড়লেই একটা বড় বাড়ি দেখে উঠে যাব। মাইনে ঠিকই বেড়ে চলেছে, বিয়েথাও করিনি। কিন্তু বড় বাড়িতে যাওয়া আর মাইনেয় কুলিয়ে উঠছে না। কেন না, খাওয়াও বাড়ছে তেমনি। এই দেখুন না এখন ত' ছশো পাচ্ছি, তার মধ্যে পাঁচশো তেষট্টি যায় খাওয়ায় আর বাকি সাঁইত্রিশে কোনমতে জামাকাপড় বাড়িভাড়া ট্রাম ভাড়া আর চাকরের মাইনে দি!"

কথা বল্লেই কথা বাড়বার ভয়। আমি তাই চুপচাপ দুটো চপ আর একটা সন্দেশ খেলুম। লোকটা ইতিমধ্যে চটপট সাঁইত্রিশটা চপ শেষ করে রসোমালাই-এর হাঁড়িটা টেনে নিলো। রাক্ষুসে খাওয়া দেখে কেমন যেন গা বমিবমি করছিল। উঠে পড়লুম। বল্লুম টেবিলে অনেক কাজ জমে আছে। লোকটা হাঁ-হাঁ করে বাধা দিল, "সে কি মশাই! আপনার সঙ্গে অনেকগুলো দরকারি কথা ছিলো যে!"

"পরে হবে," বলে কোন মতে পালিয়ে আসার চেষ্টা করলুম। লোকটা পিছন থেকে বল্লে, "আচ্ছা, ছুটির পর একটু দাঁড়াবেন মশাই। বড় দরকারি কথা আছে।"

ছুটি হতে-না-হতে পালাই-পালাই করছিলুম, পাছে লোকটা এসে ধরে ফেলে। কিন্তু পারলুম না। শ্রীযুক্ত নকুলচন্দ্র পুরকায়স্থ একমুখ হেসে ঠিক উপস্থিত হলো। "চলুন একসঙ্গে বেরুনো যাক," একমুখ হেসে লোকটা বল্ল। "নিরিবিলিতে দু'টো কথা বলা যাবে।" উপায় নেই, একসঙ্গে বেরুতে হল।

পথে বেরিয়ে লোকটা যে কথা পাড়ল তাতে সত্যি আমার আপাদমস্তক গেল জ্বলে। অবশ্য পাড়ায় বিশ বছর আছে বলছে, কানাঘুষোটা জানা অসম্ভব নয়। কিন্তু ও কথা শুনলেই আমার গা রী-রী করে! ভনিতাটনিতা

করে লোকটা বলতে সুরু করল, "মানে আপনার দিদিমার দিদিমার দিদিমা যে কামরূপ কামাক্ষায় যাদুমন্ত্র শিখেছিলেন তা ত' জানিই। শুনেছি সে সব মন্ত্রতন্ত্রর কিছু আপনাদের বংশে এখনো আছে। আমায় যদি হালকা হবার একটা ব্যবস্থা করে দেন! এই লাশ টেনে-টেনে আর ত পারি নে!" কারুর দিদিমার দিদিমার দিদিমা যে কামাক্ষার ডাইনী ছিলেন এ কথা শুনতে কার ভালো লাগে? বিশেষত, আমি সত্যি জানি আমার দিদিমার দিদিমার দিদিমা ডাইনী ছিলেন না; আসলে কোন সিদ্ধ সন্ন্যেসীর চেলা ছিলেন বলে একটা চলতি কথা আছে। এখনো বাড়ির কাঠের সিন্দুকটায় পাকানো-পাকানো হলদে-হলদে কাগজ রয়েছে। স্বচক্ষে দেখেছি! অবশ্য মন্তর-টন্তর বিশ্বাস করিনে। তবে কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই।

একটু ভাবলুম। মনে হ'ল লোকটার হাত থেকে নিস্তার পাবার একটা উপায় আছে। বল্লুম., "বাড়ি ফিরে দেখব সত্যি কিছু আছে কি না। কিন্তু যদি কিছু পাই তা হলে শুধু একটা সর্তে আপনাকে দিতে পারি। আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন যে জীবনে আমার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করবেন না?"

"মানে পালেপার্বণে একটু গল্পগুজব?" লোকটা ক্ষীণস্বরে বল্ল।

মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করলুম, "একটা কথাও নয়। জীবনে নয়।"

"বেশ, তাই সই।" লোকটা অগত্যা বল্লে।

বাড়ি ফিরে পুরোনো কাঠের সিন্দুক খুললুম। হলদে কাগজে বাদামি লেখার কুণ্ডলি উটকে-পাটকে সত্যিই বের করা গেল—মন্তর নয়, ওষুধ। সেকালের যোগীরা নাকি এই ওষুধের জোরে শরীর একেবারে হালকা করে ফেলতে পারতেন। পারার গুলিটুলি দিয়ে কেমন করে যেন ওষুধটা তৈরি করতে হয়। যাই হোক, লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় ওষুধের ফরমূলাটা টুকে ফেল্লাম এবং পরের দিন আপিসে নিয়ে গেলাম।

"এনেছেন?" একগাল হেসে লোকটা আপ্যায়িত করল।

"এনেছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা মনে আছে?"

"হেঃ হেঃ"—লোকটা বল্ল, "আর বাক্যালাপ নয়? এই ত'?"

"হুঁ।"

"খুব মনে আছে। খুব।"

বের করে দিলুম।

পরের দিন লোকটাকে আপিসে দেখলুম না। তার পরের দিনও না। হালকা হতে গিয়ে একেবারে স্বর্গে গেল না কি? একটু অস্বস্তি হতে লাগল।

পরের দিন আপিসে এলো, লোকটা নয়, তার সেই ক্ষুদে চাকরটা যে রোজ খাবার আনতো। হাউমাউ করে আমাকে অনেক কথা বল্লে: তার সারমর্ম—বাবু পাগল হয়ে গেছে। সারাদিন সারারাত নাকি ঘর বন্ধ করে রয়েছে, মাঝেমাঝে চীৎকার করে বলছে খাবার করে দোরের কাছে রেখে যেতে। চাকর অবশ্যই প্রভুভক্ত, প্রচুর খাবার সাজিয়ে রাখছে দোরের কাছে। কিন্তু বাবু দোর খুলছেও না, খাচ্ছেও না—শুধু ভেতর থেকে চীৎকার করছে! একবার গিয়ে দেখা করতে হবে।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও চাকরের পেছু-পেছু গেলুম। চাকর ঘরটা দেখিয়ে দিল। দরজায় ধাক্কা দিলুম। ভেতর থেকে চীৎকার এলো, "কে?"

"আমি হরেন।"

"সঙ্গে কে?"

"আপনার চাকর।"

"ওকে বাইরে যেতে বলুন।"

চাকর নির্দেশ পেয়ে বাইরে চলে গেল। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, "জোরে ধাক্কা দিন। হালকা ছিটকিনি, ভেঙে যাবে।"

"ভাঙার কী দরকার? খুলে দিন না।"

"খোলবার উপায় নেই, ভাঙতেই হবে।"

অগত্যা ধাক্কা মেরে ছিটকিনি ভাঙতে হল। তারপর সত্যিই আমার চক্ষু স্থির! ঘরে কেউ নেই! গা-টা কি রকম ছমছম করতে লাগল। এইমাত্র গলা শুনলুম আর ঘর ফাঁকা! তা হলে ওষুধ খেয়ে মরে ভূতটুত হয়েছে না কি? তবু সাহস সঞ্চয় করে বল্লুম, "কোথায় আপনি।"

"এই যে!" শব্দটা যেন ঠিক মাথার উপর থেকে এল। সেদিকে চাইলুম। অবাক কাণ্ড! লোকটা কড়িকাঠে মাথা ঠেকিয়ে আকাশে ঝুলছে!

"ব্যাপারটা বুঝছেন?" লোকটা মাথার উপর থেকে বল্ল। আস্তে-আস্তে অবশ্য বুঝছিলুম। নিশ্চয়ই দিদিমার দিদিমার ফরমূলা অনুসারে নকুলবাবুর শরীর হালকা হয়ে গ্যাসের বেলুনের মতো হয়ে গেছে!

"চাইলুম রোগা হবার ওষুধ, করে দিলেন হালকা বেলুন! এখন একটা বিহিত করুন।" লোকটা আবার বল্ল।

গলার স্বর শুনে পিত্তি চটে গেল, যেন আমারই অপরাধ! বল্লুম, "বিহিত আবার কি মশাই? হালকা হবার ওষুধ চেয়েছিলেন, দিয়েছি। রোগা হবার ওষুধ ত চাননি। আর আপনার সঙ্গে না চুক্তি ছিল ওষুধ পেলে আর আমায় ঘাঁটাবেন না? আপনার কথার দাম নেই। আমি চল্লুম।"

বেরিয়ে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় মাথায় টপটপ করে গরম জল পড়তে লাগল—

চেয়ে দেখি লোকটা ভেউ-ভেউ করে কাঁদছে। "তিন দিন কিছু খেতে পাইনি, এক আপনার ওই আষ্টেলা ওষুধটা ছাড়া। আপনার শরীরে কি মায়াদয়া বলে কোনো জিনিস নেই।" ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সে বলে চলল, "না ভারি হবার ওষুধ নাই বল্লেন, কিন্তু খাবার দাবার ত একটা ব্যবস্থা করা উচিত!"

করুণা হল। একটু চিন্তাও করলুম। মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। বল্লুম, "হাত দিয়ে কড়িকাঠ ধরে আস্তে আস্তে ওই টালীটার দিকে এগুন। ওখানে যে সব মোটা মোটা বস্তা আছে তাই একটা আঁকড়ে ধরুন—সেটার ভারে আপনিও নেবে আসবেন।"

আমার নির্দেশ অনুশরণ করে লোকটা নেমে এল। গোগ্রাসে গিলল পর্বত প্রমাণ খাবার, তার চাকর দোরের পাশে ডাঁই করে রেখেছিলো। যতক্ষণ খেলো ততক্ষণ আমি তাকে টিপে ধরে রইলুম, পাছে কড়িকাঠে আবার গিয়ে পৌছয়।

কিন্তু পাকা বন্দোবস্ত ত একটা হওয়া দরকার। অনেক ভাবলুম। লোকটাও প্যানপ্যান করে অনেক কান্নাকাটি করলে। শেষকালে আবার আমার মাথায় একটা বুদ্ধির ঝলক খেলে গেল। বল্লুম, "দেখুন আপনাকে আমি বরাবরের মতো বাঁচিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এবার আর প্রতিজ্ঞা ভাঙবেন না?"

"আপনার গোলাম হয়ে থাকব," লোকটা মিউ-মিউ করে বল্লে।

"আমার গোলামের দরকার নেই; তবে আর কখনো আলাপ জমাবার চেষ্টা করবেন না বলুন।"

"কক্ষনো না। নাকে খৎ।"

"বেশ।"

করলুম একটা ব্যবস্থা। দর্জির কাছ থেকে বিরাট একটা ওভারকোট বানালুম—সমস্ত কোটটার মধ্যে পুরু শিষের পাত দিয়ে লাইনিং দেওয়া হল।

এখন কী গ্রীষ্ম কী শীত—নকুলবাবুর গায়ে রাতদিন সেই কোটটা। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন, "অসুখ।" অসুখটা যে কি তা আমিই জানি।

তবে লোকটা কথা রেখেছে। আমার সঙ্গে আর কথা বলে না। চোখাচোখি হলে শুধু কটমট করে চায়!

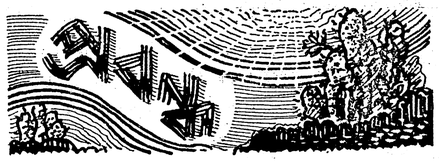

বুদ্ধির মাপ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগে ছিলো গায়ের জোরের যুগ; জোর যার মুল্লুক তার। এখন হয়েছে বুদ্ধির যুগ; বুদ্ধিঃ যস্য বলং তস্য। তাই আজ লড়াই করতে গিয়ে ভীমের মতো গোব্দা গদা আর ঘুরোতে হয় না, আকাশ থেকে টুকুশ করে ছোট্ট সুইচ টিপে একটি লাগসই বোমা ছাড়লেই কেল্লা ফতে। কিন্তু কথা হল বুদ্ধি জিনিসটাই বা কী রকম আর কার বুদ্ধি বেশী কার বুদ্ধি কম তাই বা ঠিক করব কেমন করে? সত্যিই, বুদ্ধি ত' আর মুদির দোকানের ময়দা নয় যে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে ওজোন করলেই বোঝা যাবে কতখানি! মাপব কেমন করে? চোখে দেখা যায় না, না যায় কানে শোনা, না যায় নাকে শোঁকা, হাত বাড়ালে যায় না ছোঁয়া! তাহলে? বুদ্ধি জিনিসটা ঠিক কী রকম? এ রকম প্রশ্ন করলেই অতিবড় বুদ্ধিমান লোক ঘাবড়ে যায়; মেপে দেখা ত' দূরের কথা।

পণ্ডিতেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক। বুদ্ধি খাটিয়ে ধরে ফেলেছেন বুদ্ধি জিনিসটা আসলে কি! ও কিছু নয়, মানুষের একটা গুণ—পণ্ডিতেরা বলেন—যেমন গুণ সত্যবাদীতা কিম্বা ফুটবল মাঠে ড্রিব্‌লিং করতে পারা। কিন্তু গুণ বললেই ত' চলে না, বলতে হবে ঠিক কী রকম গুণ! পণ্ডিতরা পিছ-পা নন, বুঝিয়ে দিয়েছেন "বুদ্ধি" নামের গুণটা ঠিক কী ধরনের।

ধরো, পাড়ার গয়লানী ফোন্তের মা'র রামছাগল। একেবারে নীরেট বোকা। আর ধরো তুমি—তুখোড় বুদ্ধিমান। তা হলে তোমার গুণ থেকে রামছাগলের গুণ বিয়োগ করলেই পড়ে থাকবে বুদ্ধি। সহজ হিসেব কি? করে ফেলো হিসেবটা। মানে, তোমার স... রামছাগলের তফাৎ কী একবার ভেবে দেখো।

ধরো, রামছাগলটা রোজই কর্ত্তার সামনে খব... কাগজ খেতে স্বরু করে, তারপর ধরা পড়ে, তারপর ম... খায়। পরের দিন কিন্তু আবার কর্ত্তার সামনেই কাগ... চিবোতে চায়; আবার মার খায়। আর এদিকে এক... ভাঁড়ার ঘরে কাসুন্দি খেতে গিয়ে ধরা পড়ে পিসিমার ক... ধমক খেয়েছিলে বলে পরের দিন থেকে পা টিপে-টি... লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি কাসুন্দি চেখে আসো। কাগজ খে... ভালো লাগে রামছাগলের, কাসুন্দি খেতে ভালো ল... তোমার; কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই তুমি ঠেকে শিখে... সামনে আর খাও না। আর রামছাগলটা এমন বোকা... ঠেকেও শেখে না, তাই রোজ কাগজ খেতে গিয়ে মার খ... তা হলে বুদ্ধির একটা লক্ষণ হল ঠেকে শিখতে পা... পণ্ডিতদের গুরুগম্ভীর ভাষায় যাকে বলে অ... অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। নয় কি?

তারপর ধরো, বাড়িতে বাবার অনেক বিজ্ঞ ... বেড়াতে এসেছেন। তুমি কি তাদের সামনে গি... ছেলেমানুষি করবে না কি? মোটেই নয়। বুদ্ধি... বলেই তোমার একটা স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান আ... তাঁদের সামনে তুমিও নিশ্চয়ই বিজ্ঞের মতো মুখ করে... থাকবে; মাঝে মাঝে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়বে পাছে... টের পেয়ে যায় যে তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ! কিন্তু ছাগ... কি ছাই সে বুদ্ধি আছে? বিজ্ঞ লোকের সভার মধ্যে ... ছেড়ে দাও—ল্যাজ নাড়িয়ে ব্যা-ব্যা করে বোকামি ... করবে। বুদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ তা হলে স্থান-কাল... জ্ঞান, পণ্ডিতদের ভাষায় যাকে বলে পুরো অব... হৃদয়ঙ্গম করা।

তৃতীয় লক্ষণটাও হাঙ্গামার নয়। ধরো, খেলতে ... লাগে বলেই তুমি ত আর দিনরাত খেলতে চাও না। ... আছে বলে আগাগোড়া সব দিক ভেবেই তুমি কাজ ক...

...নো; তুমি জানো পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় ...লা, এ নইলে শেষ পর্য্যন্ত ফেল মারতে হয়। রামছাগলও ...দ সবদিক ভেবে, আগাগোড়া হিসেব করে কাজ করতে ...রত তা হলে আর ভাবনা ছিলো না! অতএব বুদ্ধির ...তীয় লক্ষণ হল আগাগোড়া ভেবে কাজ করতে পারা। ... কি?

... তা না হয় হল। এ সব লক্ষণ মিলিয়ে না হয় বোঝা ...ল কে বুদ্ধিমান আর কে বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, ...র ঘটে ঠিক কতখানি বুদ্ধি তা মাপা যাবে কেমন করে? ... বুদ্ধি খাটিয়ে পণ্ডিতেরা বুদ্ধি মাপবার একটা উপায়ও ...বিষ্কার করেছেন। উপায়টা শিখে ফেললে তুমিই হিসেব ...রে বলে দিতে পারবে ছোটদারই বা বুদ্ধি কতখানি, ...টে খুকুরই বা বুদ্ধি কতখানি। এ উপায় যিনি প্রথম ...ক মতো আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম হল বীনে— ...ল্‌ফ্রেড্‌ বীনে। ফরসী ভদ্রলোক, তাই বানানটা ...INET হলেও উচ্চারণ বীনে। বেশীদিনকার লোক ..., মারা গেছেন ১৯১১ সালে—সেই যে বছর মোহনবাগান ...ল্ড পেয়েছিলো!

... ফরাসী সরকার থেকে বীনে-কে বলা হল ছোট ছেলে-...য়েদের বুদ্ধি মেপে দিতে, তা হলে ইস্কুলে ভরতি করবার ...য় বোঝা যাবে কাকে ঠিক কোন ক্লাসে ভরতি করা ...চিত। অনেক ভেবেচিন্তে বীনে কতকগুলো পরীক্ষা ...ক করলেন। ধরো, বছর আষ্টেক বয়েসের একজন ...ধারণ ছেলের একটা পরীক্ষায় পাশ করা উচিত; তা ...ল, সেই পরীক্ষায় একজন পাশ করলে বোঝা যাবে তার ...নের বয়স আট বছর। বীনে এই ভাবে দেখে শুনে হিসেব ...র নানান রকম পরীক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। এক ...কটা পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে বোঝা যাবে যে ...শ করল তার মনের বয়েস কত। মনের বয়েস কাকে ...ল বুঝছ? তোমার আসল বয়েস কত? ধরো চোদ্দ। ...ই বয়েসটাকে বলা যাক কুষ্ঠির বয়েস। কিন্তু বুদ্ধি মাপতে ...য়ে যদি দেখা যায় ১৬ বছর বয়েসের ছেলেদের জন্যে যে পরীক্ষা তা তুমি অনায়াসেই পাশ করে বসলে, তা হলে কী বলব? তখন ত' মানতেই হবে কুষ্ঠির বয়েস ১৪ হলেও তোমার মনটা ১৬ বছরের ছেলেদের মত। অর্থাৎ তোমার মনের বয়েস ১৬, যদিও কুষ্ঠির বয়েস ১৪। এদিকে কিন্তু "সৎপাত্র" কবিতার গঙ্গারাম, যে উনিশটিবার ম্যাট্রিক দিয়ে তবে ঘায়েল হ'য়েছে, তার বুদ্ধি মাপতে যাও, দেখবে বয়েসে ধাড়ি হলেও চোদ্দ বছর-এর পরীক্ষাও পাশ করতে পারছে না; তার মানে তার কুষ্ঠির বয়েস চৌত্রিশ-এর কাছ-বরাবর হলেও মনের বয়েস চোদ্দরও কম।

তা হলে আসল বয়েস আর মনের বয়েস সমান হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু বুদ্ধি মাপব কেমন করে? বীনে বললেন মনের বয়েসকে কুষ্ঠির বয়েস দিয়ে ভাগ দাও, বুদ্ধি কতখানি বেরিয়ে যাবে। যে ভাগফল পাওয়া যাবে তার নাম হল "বুদ্ধির ভাগফল," ইংরেজীতে বলে Intelligence Quotient; কাজের সুবিধের জন্যে ছোট করে বলা হয় IQ.। তা হলে তোমার IQ কত? মনের বয়েস যদি ১৬ হয় আর আসল বয়েস বা কুষ্ঠির বয়েস যদি ১৪ হয়, তা হলে $\frac{১৬}{১৪}$, অর্থাৎ $১\frac{২}{১৪}$ বা $১\frac{১}{৭}$। খুব ভালো বলতে হবে, কেন না সাধারণ বুদ্ধিমান ছেলের IQ. হল ১। গঙ্গারামের কত? মনের বয়েস যদি ১৩ হয় আর কুষ্ঠির বয়েস যদি হয় ৩৫ তা হলে $\frac{১৩}{৩৫}$; ১-এর চেয়ে ঢের কম, অর্থাৎ যাকে বলে গবেট।

বীনে যে সব পরীক্ষা করে মনের বয়েস ঠিক করতেন তার কতকগুলো নমুনা দেওয়া যাক: আগে মনের বয়েস তারপর তার জন্যে পরীক্ষাটা দেওয়া হল।

৩ মাস: এলোমেলো হাত না নাড়িয়ে হাতটা সোজা মুখের মধ্যে পুরতে পারা।

১ বছর: ঝুমঝুমি পেয়ে বড়রা যেমন নাড়িয়ে শব্দ করে তেমনি শব্দ করা।

২ বছর: চকোলেট-টা মোড়ক শুদ্ধ মুখে না পুরে মোড়ক ছাড়িয়ে মুখে পোরা।

৬ বছর: বাচ্চাকে চারটে মানুষের মুখের ছবি

দেখানো হল, তার মধ্যে কোনোটার নাক নেই কোনোটার চোখ নেই, এই রকম। অন্তত তিনটে ছবির সম্বন্ধে বলতে হবে কোনটার কী নেই।

৮ বছর : বলতে হবে কাঠ আর কয়লার মিল কোন দিক থেকে? বা ওই রকম কটা প্রশ্নের অন্তত দুটোর সঠিক জবাব দিতে হবে।

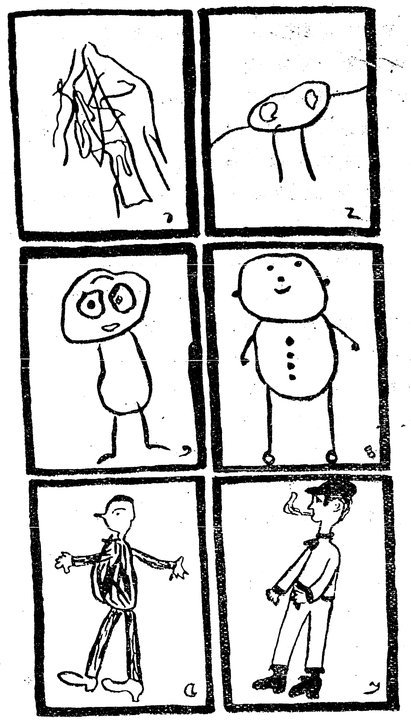

১২ বছর : ১০০টা প্রচলিত শব্দের মধ্যে অন্তত ৪০টার মোটামুটি মানে বলতে হবে।

১৪ বছর : "প্রেসিডেন্ট-এর সঙ্গে রাজার তফাৎ কি?" —এই রকম প্রশ্নের জবাবে ঠিক ঠিক অন্তত তিনটে পয়েন্ট বলতে হবে।

মনের বয়েস বের করবার জন্যে এই ত গেল একরকম পরীক্ষা। এগুলো বীনের আবিষ্কার। কিন্তু বীনে ছাড়াও অন্যান্য পণ্ডিতরা আরও নানান রকম পরীক্ষা ঠিক করেছেন। সেগুলোর মধ্যে নামকরা একরকম পরীক্ষাকে বলে Performance Test। যেমন ধরো একটা কাঠের বোর্ডের উপর নানান রকম, নানান মাপের গর্ত। ঠিক সেই সেই মাপের সেই-সেই রকম কতকগুলো কুঁচো কাঠের টুকরো দিয়ে বলা হল প্রত্যেকটা টুকরোকে তার নিজের গর্তে পুরে দিতে। পুরতে কতটুকু সময় যায় দেখে বোঝা যাবে মনের বয়েস কত। হালে দেখা গেছে Performance Test-এর মধ্যে ছবি আঁকার পরীক্ষাটা খুব কাজের। পাশে যে ছবিগুলো দেখছো সেগুলোর থেকে বোঝা যায়: (১) প্রথম ছবিটির শিল্পীর মনের বয়েস তিন বছরেরও কম, (২) দ্বিতীয়টির শিল্পীর মনের বয়েস ৪ বছর, (৩) তৃতীয়টির ৫ বছর, (৪) চতুর্থটির সাড়ে ছ' বছর, (৫) পঞ্চমটির সাড়ে ন বছর, এবং (৬) ষষ্ঠটির ১৬র কম নয়।

এই সব পরীক্ষা করে মনের বয়েস ঠিক করা কঠিন নয় এবং মনের বয়েস পেলে বুদ্ধি কতখানি তা বের করতে মুস্কিল হবে না কেন না মনের বয়েসকে আসল বয়েস দিয়ে ভাগ করলেই বুদ্ধি (IQ) কতটা তা বেরিয়ে যাবে। তবে সাবধান, গুরুজনদের বুদ্ধি ও ভাবে মাপতে যেও না! স্বয়ং বীনে বলেছেন এ ভাবে বড়দের বুদ্ধি মাপা যায় না। বছর ১৬র ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত চলে মাত্র।

জর্মান যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তাদের নেতারা কেউ কেউ ধরা পড়েছেন, কেউ কেউ নিরুদ্দেশ। এমন কি শত্রুভাব এতটা কমে গেছে যে মিত্রপক্ষকে জর্মানদের সঙ্গে মেলামেশা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মুসোলিনির জামাই কাউণ্ট চিয়ানে'র মুসোলিনির জন্য দু'বৎসর আগে প্রাণদণ্ড হয়েছিল। কারাগারে লেখা তাঁর স্মৃতিকথা এখন প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিছু কিছু ধারাবাহিক ভাবে অমৃতবাজারে বেরোচ্ছে। ইতালী ও জর্মানির গোপন কথা অনেক তাতে লেখা আছে, তবে এটুকু সন্দেহ হয় যে মুসোলিনির দল ওটাকে বিনষ্ট করেনি কেন? ওটা কি প্রকৃত ডায়েরি নয়?

জাপানকে অহরহ বোমাবর্ষণ করে বিধ্বস্ত করা হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে যে-কোনও দিন নাকি মার্কিন বাহিনী টোকিও বন্দরে হানা দিয়ে ডাঙায় নামতে পারে। কেবল সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

বর্মা থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হয়েও কিছুতেই যাচ্ছে না, প্রোমের কাছে সিট্যাং নদীর বাঁকে তারা মহা হাঙ্গামা সুরু করে দিয়েছে। তাদের নাকি ৭০০০ সৈনিক সেখানে একরকম ঘেরাও হয়ে আছে, তারাই এই উপদ্রব করছে।

চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুং মস্কো গিয়ে স্টালিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন, আবার নাকি চুক্তি সই করাতে যাবেন। অনেকের এই আশা যে ঐ চুক্তি সই হলেই রুসও জাপানের বিরুদ্ধে যোগদান করবে।

—লীলা মজুমদার

এ-মাসের সবচেয়ে বড় খবর আমাদের দেশের নেতাদের মুক্তি। দীর্ঘ কারাবাসের পর মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, জওয়াহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রাসাদ, ইত্যাদি দেশের প্রধান দেশনায়করা আজ মুক্তি পেয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমাদের আনন্দও মিশলো।

সরকারি জেল থেকে বেরিয়েই সরকারের সত্যিকারের নিমন্ত্রণে সিমলাতে সমস্ত নেতাদের যাওয়াও কম আশ্চর্য বড় খবর নয়। সমস্ত দেশবাসী খুব আশা করেছিলো যে বড় লাটসাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নেতারা এমন একটি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করবেন যাতে ভারতবর্ষে আজকের দিনের নানা অসুবিধে মিলিয়ে যাবে। যে কারণেই হোক সিমলার সভা সফল হোলো না। এটা অত্যন্তই দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই।

* * * *

ইয়োরোপের যুদ্ধে হারজিৎ যা হবার তা হয়ে গেছে। তাই এতদিন পরে উভয় পক্ষের অতি গোপন সব কথা-বার্তাও প্রকাশ করা হচ্ছে। ইংরেজরা নাকি ঠিক করে রেখেছিলো যে শত্রুপক্ষ যদি তাদের ঘরের দ্বীপ চড়াও করতে চায় তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে জ্বালতে হবে আগুনের বেড়াজাল। আগুনের তিন থাক বেড়া দিয়ে দেশ বাঁচাবার বন্দোবস্ত ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিল: প্রথম থাকের আগুন পুড়িয়ে দিত সমুদ্রের উপর শত্রুর সমস্ত জাহাজ-টাহাজ; দ্বিতীয় থাকের আগুন জ্বালানো হত সমস্ত উপকূলে এবং তৃতীয় দফায় আগুনের স্রোত ঢেলে দেবার বন্দোবস্ত ছিল পাহাড়-টাহাড়ের চূড়োর উপর থেকে। জার্মানরা নিশ্চই এমন কঠিন অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হিমশিম খেত।

* * * *

লড়াই-এ আগুন নিয়ে নাৎসিরা যে খেলার বন্দোবস্ত করেছিলো তা কিন্তু আরও সাংঘাতিক। খবর পাওয়া গিয়েছে যে জার্মানির ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিকেরা মিলে

একটা অতি সাংঘাতিক গোপন অস্ত্র তৈরি করবার তালে ছিলো: পৃথিবী থেকে হাজার পাঁচেক মাইল উপর এক অদ্ভুত মাচা তৈরি করে, সেই মাচার উপর থেকে বড় বড় আয়না (লম্বায় দু মাইল চওড়ায় দু'মাইল) বাগিয়ে ধরে সূর্যরশ্মিকে যদি টিপ করে ফেলা যায় কোনো দেশের উপর তাহলে সে দেশের আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, মুহূর্তে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। নাৎসিদের মৎলব ছিল ঠিক তাই!

* * * *

নাৎসিরা ও ধরণের দাবানল জ্বালিয়ে দেশ-কে দেশ সব নিশ্চিহ্ন করতে না পারলেও অন্যান্য দেশের ক্ষতি করেছে অসামান্য। শোনা যায় স্টালিন ঠিক করেছেন এই সব ক্ষতিপূরণের জন্য জার্মানির কাছ থেকে মিত্রশক্তি ৫,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড আদায় করবে।

টাকার ওই অঙ্কটা দেখে নিশ্চয়ই অনেকে চোখ গোল করে ফেলছো। কিন্তু লড়াই-এর যা লম্বা-চওড়া খরচের ফর্দ তার তুলনায় এ ত কিছুই নয়। টোকিওর ওপর শুধু একবার গিয়ে বোমা ফেলে আসতে মার্কিনরা ১১০,০০০,০০০০ টাকা খরচ করছে। বানানো কথা নয়, দস্তুর মতো খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।

* * * *

অবশ্য টাকার আর আজকাল দাম কী বলো? সেদিন কাগজে দেখলুম একজন সাঁওতালি কুলি মেয়ে রাঁচির একটা দোকান থেকে মাত্র একটা শাড়ি কিনেছে ৪৫০৲ টাকা দিয়া। সাঁওতালি যদি সাড়ে চারশোয় একটা শাড়ি কিনতে পারে তাহলে মার্কিন কেন একশো দশ কোটি খরচা করে একবার বোমা ফেলবে না? তবে তোমরা অবশ্য বলতে পারো যে রাঁচিতে যা ঘটে তা ত' আর সুস্থ বুদ্ধির লক্ষণ নয়!

* * * *

তবে রাঁচির কাছেই, পাটনায়, এক ভদ্দরলোক সুস্থ ছেড়ে তুখোড় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ধুতি-কাপড়-এর কী অসম্ভব দুরবস্থা তাত জানোই। পাটনাতেও কালো-বাজারওয়ালারা ভয়ানক দাম হাঁকছে ধুতির, যেমন আর সর্বত্রই হাঁকছে। অথচ রুমাল পাওয়া যাচ্ছিল একটু সস্তাতেই। ভদ্দরলোকের স্ত্রী চল্লিশটা রুমাল জোড়া দিয়ে একখানা ধুতি বানিয়ে ফেল্লেন; শুনেছি তাঁর সেই রুমালের বংশধর ধুতি কালোবাজারের ধুতির চেয়ে দুটাকা সস্তা পড়ছে।

* * * *

অবশ্য রুমাল দিয়ে ধুতি বানালেও কাপড় যা লাগবার তাই লেগেছে। না লেগেই বা আর উপায় কি? ধুতির ত' আর ট্যাবলেট্ করা যায় না যে একগাদা খাবার হাউমাউ না করে গিলে একটা বড়ি টপ করে গিলে ফেল্‌লেই কাজ চলবে! এই বড়ি দিয়ে জলযোগের ব্যবস্থায় একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সঙ্কলকে প্রায় হার মানাতে বসেছেন। সারাদিনের খাওয়া—ফলপাকুড় ভিটামিন প্রভৃতির পুরো ভূরিভোজ—তিনি বলছেন চারটে ছোট বড়ি দিয়েই সেরে নেওয়া যাবে! মন্দ কি? আজকাল খাবার-দাবারের যা হাঙ্গাম!

* * * *

শুধু খাওয়ার ব্যাপারই যে মানুষ সংক্ষেপে সারতে চাইছে তা নয়; সময় নিয়ে কার্পণ্য করতেও কম যাচ্ছে না। বিলেত থেকে এদেশে আসতে বড্ড সময় লাগত। হালে, একজন আকাশের পলটন একখানা উড়োজাহাজ নিয়ে বারো ঘণ্টায় এই সাড়ে চার হাজার মাইল চলে এসেছেন। মাঝে নাকি আবার কাইরোয় মিনিট চল্লিশ দাঁড়িয়ে ভদ্দরলোক পাঁচজনের সঙ্গে গপ্পগাছা করে নিয়েছেন।

* * * *

তবে বিলেত-ফিলেত যাওয়া-আসায় আজকাল আর তেমন বাহাদুরি নেই। লোকে লম্বাচওড়া কথা বেশি বলছে। সেদিন এক ভদ্দরলোক লণ্ডনের একটা টিকিট আপিসে ঢুকে চাঁদে যাবার জন্যে একটা টিকিট কিনতে চাইলেন। আপিসের লোকরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা

করে ঠিক করল ভদ্দরলোকের জন্যে একটা জায়গা রিজার্ভ রাখার। শোনা যায় ভদ্দরলোকের অবস্থা খুব ভালো এবং এর আগে নানান দেশ তিনি ঘুরেছেন। এ হেন লোককেও চাঁদে পেল?

* * * *

চাঁদে যেতে হলে বেলুনে চেপে যেতে হবে না রকেটে চেপে যেতে হবে ঠিক জানি না। তবে জাপানীরা শুনছি বেলুনে চেপে আরও এক পা বেশী যেতে চাইছে—একেবারে স্বর্গে। শুধু যেতে নয় আরও পাঁচজনকে তারা নিয়ে যেতে চায়। খবর পাওয়া গেছে যে জাপানীরা একরকম বেলুন বের করছে যাতে চেপে জাপান থেকে সমুদ্দুর পেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে আরোহী বেলুনের মধ্যেকার বোমাগুলো ফাটাবে আমেরিকার ঘাড়ে। তাতে অবশ্যই মার্কিনদের মুস্কিল। কিন্তু আরোহী জাপানীও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে। তবে জাপানীরা শুনেছি সখ করেও আত্মহত্যা করতে পারে; নিজের পেটে নিজে ছুরি মারা ত ওদের মধ্যে হামেসাই লেগে আছে!

* * * *

এ সব দেখে ত' বিজ্ঞান জিনিসটার উপরেই ঘেন্না ধরে যাবার কথা। চারদিকেই শুনতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মারবার ষড়যন্ত্র চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞান জিনিসটার আর দোষ কি বলো? মানুষ তাকে যে ভাবে ব্যবহার করবে সে ব্যবহৃত হবে সেই ভাবেই। এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যেও যে বিজ্ঞান কতখানি সাহায্য করতে পারে তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় রাশিয়ায়। শত্রু যদি গায়ে পড়ে আক্রমণ করে তাহলে অবশ্য রাশিয়ানরা বিজ্ঞানের সাহায্যে শত্রুবধ করতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আসল কাজ, রাশিয়ানরা বুঝেছে, জনগনের কল্যাণ। এবং ওদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার আসল উদ্দেশ্য সেইটেই। তাই পৃথিবীর যে বৈজ্ঞানিকই মানুষের মঙ্গল চায় তাঁর সঙ্গে রুষ বৈজ্ঞানিক-এর বন্ধুত্বের কথাটার একটা প্রমাণ ত' পাওয়া গেল হালে মস্কৌ সহরে। সেদিন ওদের বিজ্ঞান-শিক্ষা-কেন্দ্রের জন্মতিথি গেল এবং সেই উপলক্ষ্যে দুনিয়ার যত সব দিকপাল বৈজ্ঞানিক মস্কৌ গিয়ে বিজ্ঞানের যেন হাট বসালেন। আমাদের দেশ থেকেও ডক্টর মেঘনাদ সাহা গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি ত' রুষ-এর কথায় পঞ্চমুখ। আবার এদিকে, রুষ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রশংসা কম নয়: স্যর সি. ভি. রমণ এবং তাঁর গবেষণা নিয়ে রুষ বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রের সহকারী সম্পাদক দীর্ঘ স্তুতি করেছেন।

* * * *

রাশিয়ার কথা যখন উঠল তখন বলি: সেখানে নাকি ৩০,০০০ বুড়ো আছে যাদের প্রত্যেকের বয়েস ১০০ বছরের বেশি। তাই রাশিয়াকে "বুড়োর দেশ" হয়ত বলতে পারা যেত, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সেখানে খোকাখুকুর আধিপত্যও কম নয়। তাই এ দেশকে খোকার দেশও বলা চলে। কিন্তু খোকাখুকুর আধিপত্য সম্বন্ধে কথা বলতে হলে আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হয়।

তিনটি কবিতা

দিলীপ দে চৌধুরী (১৯৫১)

ষষ্ঠী

ওপাড়ার ষষ্ঠী
নিয়ে এক যষ্টি
কেরামতি করাতে
দুর্ভোগ বরাতে—
তেড়ে এলো মোষটি॥

আলমারি

এক যে ছিলো আলমারি
বাবুর হোলো চাল ভারি।
বন্ধ হলে খোলেন না
হাত লাগালে দোলেন যা !
দিলাগ তাহার হাল ছাড়ি ॥

কাব্য

লম্বা দেখে লিখেছি এক কাব্য
এরোপ্লেনের মতন তাতে চাপবো !
পড়লে তাহার শ্লোক
ভিরমি যাবে লোক,
কাগজ পেলে ভাবছি সেটা ছাপবো ॥

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

গত সংখ্যায় মঙ্গলগ্রহে যাবার কথা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে চাঁদে যাওয়া নিয়ে বড্ড হৈ-হল্লা পড়ে গেছে। সেদিন কাগজে দেখলুম ইংলণ্ডের একটা টিকিট আপিসে এক ভদ্দর লোক ঢুকে চাঁদে যাবার জন্যে টিকিট চেয়ে বসলেন। খবরটা এবারের চলন্তিকায় পাবে। সেদিন কাগজে খবরটা পড়ে আকাশ পাতাল সব ভাবছি এমন সময় পাড়ার নরহরি সমাদ্দার মশাই এসে উপস্থিত। একটু সেকেলে লোক, গলাবন্ধ কোট পরেন, হাতে বেঁটে মোটা লাঠি থাকে। সেই লাঠি দিয়ে মেঝেয় তাল ঠুকে ঠুকে কথা বলেন। ঘরে ঢুকেই বল্লেন, "দেখেছ ত ভায়া, খবরের কাগজ দেখেছ? চাঁদে যাবার টিকিট বিক্রী হচ্ছে!"

সবিনয়ে জানালুম খবরটা চোখে পড়েছে। সমাদ্দার মশাই বল্লেন, "সাহেব সুবোদের কথাই আলাদা। ওদের চাঁদে পেয়েছে।" চাঁদে পাওয়াটার ইংরেজী মানে জানো? পাগল হয়ে যাওয়া! ইংরেজীতে পাগল (lunatic) কথাটা যে চাঁদ (Luner) থেকেই এসেছে।

"ওহে সত্যিই ওদের চাঁদে পেয়েছে। তা নইলে চাঁদে গিয়ে চাঁদ দেখবার শখ হয়? ওদের চেয়ে ত বাপু আমার সেজ বৌমার ন' ছেলেটি ঢের বুদ্ধিমান! মাত্রই বছর দেড়েক বয়েস, চাঁদ দেখবার শখ অবশ্যই আছে কিন্তু তাই বলে চাঁদে বেড়াতে যেতে বায়না ধরে না। কোলে চেপে বলে দাদু চাঁদটা পেড়ে দাও, চাঁদ দেখব!"

সমাদ্দার মশাই-এর নবতম নাতিটির কথা উঠলে রক্ষে থাকে না। গড়গড় করে ঘন্টাখানেক তার বুদ্ধি, তার বিবেচনা শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে হয়। হলও তাই। সমদ্দারমশাই বকবক করে নাতির কথা বলে চল্লেন, চাঁদের কথা উচ্ছন্নয় গেল!

আমি কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবতে লাগলুম। সত্যি, চাঁদে না গিয়ে চাঁদকে পেড়ে আনা ত' মন্দ কথা নয়! তোমরা হয়ত শুনেই হেসে উঠবে; ভাববে যেমন ক্যাব্লা সমাদ্দার, তেমনি ক্যাব্লা তার নাতি আর তার চেয়ে ক্যাব্লা হল তোমাদের সম্পাদক! কিন্তু সত্যি বলছি, হাসির কথা নয়! চাঁদ ত ছোট কথা, আকাশশুদ্ধু গ্রহ-নক্ষত্রকে ঘরের মধ্যে পেড়ে এনে দেখা যায় বইকি! রকেটে চেপে বোঁ-বোঁ করে ঘোরার চেয়ে চেয়ারে বসে

হাতের গোড়ায় এদের ধরে দেখাটা নিশ্চয়ই মন্দ কথা নয়!

কিন্তু দেখব কী করে? পেড়ে আনা অমনি মুখের কথা কি না!—তোমরা নিশ্চয়ই অধৈর্যভাবে বলে বসবে। সহজ থকা সত্যিই নয়। তবে চেষ্টার অসাধ্য কী বল? এবারের সম্পাদকীয়তে সেই কথাই আলোচনা করা যাক: কেমন করে আকাশের একঝাঁক তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সব কটাকে মানুষ একটা ঘরে পুরে আরাম করে দেখতে পারে!

ব্যাপারটা খুলেই বলি। আকাশের পুরো রহস্য মানুষকে কী ভাবে চোখে দেখানো যায় এ নিয়ে পণ্ডিতদের মাথাব্যথার শেষ নেই। মনে রেখো, চোখে দেখানোর কথা বলছি—ছবি এঁকে বা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর কথা নয়। কেন না, স্বচক্ষে যদি দেখা যায় ঠিক কী ভাবে সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, প্রভৃতি তীব্র উজ্জ্বল জিনিষগুলো অন্ধকার মহাশূন্যে দৌড়োদৌড়ি করছে, তা হলে এদের সম্বন্ধে ধারণাটা যে রকম স্পষ্ট হবে সে রকম হাজার ছবি এঁকে হাজার বক্তৃতা দিয়েও স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। বড় বড় টেলিস্কোপ চোখে এঁটেও আকাশের পুরো ব্যাপারটা এক সঙ্গে কেউ দেখতে পায় না। কেন না প্রথমত যেন সূর্যের সঙ্গে আকাশে অন্য তারাটারাদের যেন লুকোচুরি খেলা লেগেই আছে। তাই একজনকে দেখা গেলে অন্যদের আর দেখতে পাওয়া যায় না; দ্বিতীয়ত, টেলিস্কোপ চোখে দিয়ে যদি একটা তারার দৌড় সত্যি দেখতে চাও তা হলে দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থাকলে হয়ত দেখবে তারাটা একটুখানি মাত্র নড়েছে; এ ভাবে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির গতির আসল ধারণা করা কঠিন।

তা হলে উপায়? পণ্ডিতরা প্রথম যে উপায়টা বের করলেন তা একটা কিম্ভুতকিমাকার। একটা মস্ত বড় ঘরের দেওয়ালে মেপে মেপে কতকগুলো ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব লাগানো হল: একটাকে সূর্যের মতো, একটাকে চাঁদের মতো ইত্যাদি করে। তারপর, একটা খাঁচার মধ্যে একটা লোককে বসিয়ে খাঁচাটা ঘরের মধ্যে এমনভাবে ঘোরানো হতে লাগল যাতে আকাশে সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির ভিড় ঠেলে পৃথিবী ঠিক যেমন পথে এগোয় খাঁচাটাও যেন ইলেক্‌ট্রিক-বালবের সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ঠিক সেই ভাবে এগুতে থাকে। এ ব্যবস্থায়, পৃথিবীর গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা করা অনেক সহজ হলেও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির গতিপথ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা হওয়া কঠিন। তা ছাড়া, ঝামেলাও বড় বেশি। পণ্ডিতেরা তাই আবার টাক চুলকোতে বসলেন: এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত কী ভাবে সম্ভব?

যাই বলো, পণ্ডিতদের টাকের তলায় সাধারণত বুদ্ধি গজগজ করে। উপায় একটা বের করতে তাই দেরি হল না। একেবারে হাতের মুঠোয় শুধু চাঁদ কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন পেড়ে আনবার একটা ব্যবস্থা তাঁরা বের করে ফেলেছেন। এই ব্যবস্থাটার নাম দেওয়া হয়েছে: 'প্ল্যানেটেরিয়ম'। জার্মানিতেই প্রথম এ ব্যবস্থা কাজে খাটানো গেছে; তারপর অবশ্য আমেরিকাতেও অনেকগুলো প্ল্যানেটেরিয়ম তৈরি হয়েছে।

যেন ভুতুড়ে কাণ্ড! বড় একটা হল ঘর, তার ছাদটা একটা বাটির ভেতর দিকের মতো গোল। ঘর ভরতি চেয়ার, কেবল হলের একেবারে মাঝখানটায় একটা কিম্ভুতকিমাকার দেখতে জটিল যন্ত্র। ঘরে লোকজন জমা হল; দরজা-টরজা বন্ধ করে ঘরটা অন্ধকার করে ফেলা হল। তারপর মাঝখানের যন্ত্রটা হল চালিয়ে দেওয়া। অমনি বাটির ভেতর দিকের মতো ঘরের গোল ছাদটার অন্ধকারে ফুটে উঠল এক আকাশ তারা, সূর্য চাঁদ প্রভৃতি আকাশের প্রায় প্রত্যেকে। যেন ভোজবাজি! শুধু তাই নয়—সেই তারা সূর্য চাঁদ প্রভৃতি সুরু করল যে যার পথে ছুটতে আর ঘরের লোক বসে বসে দেখতে লাগল চাঁদ ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবীর চারপাশে, পৃথিবী আবার তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঘুরছে সূর্যের চারপাশে; মঙ্গলগ্রহ শনিগ্রহ তাদের উপগ্রহ নিয়ে চলেছে যে-যার পথে; অনেক দূরে কোথায় কোন তারা আর একটা তারাকে যেন তাড়া করেছে—ইত্যাদি আকাশের প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে

চলেছে চোখের সামনে ঘরের মধ্যেকার নকল আকাশে! সাংঘাতিক ব্যাপার!

ম্যাজিক নাকি? ভোজবাজি ঠিক নয়, তবে ব্যাপারটা অনেকটা ম্যাজিকলণ্ঠনের মতোই। মাঝখানে যে জটিল যন্ত্রটার কথা বলছিলুম সেটা ভয়ানক রকম জটিল হলেও মোটামুটি ম্যাজিকলণ্ঠনের মতোই একটা জিনিষ! তার মধ্যে আলো জ্বলছে, তার গায়ে নানান রকম ফুটো, নানান রকম ইলেক্‌ট্রিক বালব-টালব লাগানো। অনেক অনেক হিসেব করে এইসব ফুটোটুটো করা হয়েছে, এই বালব-টালব লাগানো হয়েছে। যন্ত্রের মধ্যে আলো-টালো জ্বালিয়ে দেবার পর, তার উপরের ফুটোটুটো দিয়ে আলো গিয়ে পড়ে অন্ধকার গোল ছাদের গায়ে, তখন সেগুলোকে মনে হয় অন্ধকার আকাশে যেন গ্রহ-তারা-রবি! আর সেই যন্তরের ওপরের খোলোসটা এমন জটিল ভাবে ঘুরতে থাকে যে তার ফুটো দিয়ে বেরুনো গ্রহ-তারা-রবি ছাদের আকাশে ঠিক সেই ভাবে ঘুরতে থাকে যে ভাবে ঘোরে আসল তারা, আসল সূর্য প্রভৃতি। কিন্তু এত নিখুঁত হিসেব-পত্তর এই নিখুঁত যন্তরটার যে এই সব নকল তারা প্রভৃতির হালচাল একেবারে আসল তারা-টারার মতো। শুনেছি প্লানেটেরিয়মে বসে নকল আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে ঠিক মনে হয় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই মানুষ হাতের মুঠোয় পুরে ফেলে খুসিমতো গ্রহনক্ষত্রের ঘৌড়-দৌড় দেখছে!

তাই বলছিলুম, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই! মানুষ ইচ্ছে করলে কী-ই না করতে পারে!

গুণ নিশ্চয়ই করতে পারো। কিন্তু একটা কষে-দেওয়া গুণ-এর কয়েকটা সংখ্যা হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করতে পারো? চেষ্টা করে দেখো। নিচের কষে-দেওয়া গুণটায় মাঝে-মাঝে * চিহ্ন দেখবে, সেগুলোই হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা—খুঁজে বের করতে হবে।

```
  *১*
  ২*৫
 ----
 ১*৭*
২*০*
*৩*
-----
৮*৬*৫
```

ধাঁধার উত্তর

পাড়ির নম্বরগুলো যথাক্রমে: ২৩৪৫,৫৪৩২,৪৫২৩।

উত্তরদাতাদের নাম

যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), জানকীকান্ত পাল (২৪৫৩), দীপালি ঘোষ (২১৮৫), শচীন ভৌমিক (২৪৩৮), অলকা দত্ত (১৬৯৯), অমর ভঞ্জ (২৪৮৭), গোপাল ভট্টাচার্য (২৪০৭), অজিতকুমার মণ্ডল (২৪৭৯) সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার (২২২১), সুকুমার সাহা (২৪৯২). নির্মল গুহ খোকন সলিল গাঙ্গুলি (২০৯৪), দেবেন্দ্রনাথ দত্ত (২৫১৪), জগদীশচন্দ্র ইন্দ্র (২৪৬১), সৈয়দ নূরুল আলম (২০৬৬), দেবব্রত ও শোভনা মজুমদার (১৯১৫), অপূর্বকুমার সাহা (২৪৯৭), সুধীরকৃষ্ণ ও বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (২২৭৮), শৈলেন্দ্রকুমার সরকার (২২২৬), সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (২৪২১), সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় (২৪১৪), কালিদাস বিশ্বাস (২৪৯১), দেবপ্রসাদ ঘোষ (২২৭৫), রেণুকা বিশ্বাস (১৬৬২), রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী (২৫১৩)।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

[দশম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দিক

কয় দিক আছে? দশ দিক। তবু
জবাব হল না ঠিক।
এক দিক শুধু আছে, তার নাম
তোমার দেশের দিক।

দেশ

যখন যেটুকু করো
ছোট কাজ কিংবা বড়ো
দেখো কোথা শেষ,
বহু লোক বহু চায়,
দেখো যেন পঁহুছায়
যেথা তব দেশ।

লেখা

আকাশ লিখিছে লেখা রৌদ্রে পুড়ি আর জলে ভিজি
তুল্যমূল্য আমাদেরো এই সব তুচ্ছ হিজিবিজি।

সিংহ-শাবকের শিক্ষা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিরাট বিশাল অরণ্য-রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা দীর্ঘকেশর সিংহ। সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—বাঘ-ভালুক-হাতী—সকলেই রাজাকে মানে দেবতার মতো। শেয়াল মন্ত্রী …পশুরাজ তার দাম বোঝে—তাই শেয়াল-মন্ত্রীকে শসা-কাঁকুড় চুরি করবার জন্য লোকালয়ে ছিঁচ্‌কে-চোরের মতো ঘুরতে হয় না! রাজ্যে শান্তি আছে, কিন্তু সুখ নেই।

তার কারণ পশুরাজ সিংহের শাবক নেই। বংশ লোপ! পশুরাজ মারা গেলে তার সিংহাসনে বসে' এ বিশাল রাজ্য শাসন করবে কে?

সিংহিনী এক-মনে জপ-তপ করে, হিংসা ভুলে গেছে, নিরামিষ খায়—ব্রহ্মা ঠাকুরের পুজা করে। রাজ-পুরোহিত বলদের পরামর্শে যাগযজ্ঞ হয় নিত্য শাবকের কামনায়!

অবশেষে ব্রহ্মা-ঠাকুর কৃপা করলেন। সিংহের শাবক হলো…বেশ হৃষ্টপুষ্ট শাবক! অরণ্য-রাজ্য জুড়ে মহোৎসবের ব্যবস্থা হলো। হাতী-গণ্ডার থেকে সুরু করে' ছুঁচো-ইঁদুর-গোসাপ পর্য্যন্ত রাজপুরীতে এসে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সদ্ব্যবহার করে' গেল।

দিনে দিনে সিংহ-শাবক বাড়তে লাগলো বয়সে শশিকলার মতো। ক্রমে তার বয়স হলো এক-বছর। সিংহ-শাবক তো মানুষের সন্তান নয় যে এক-বছর বয়সে হামাগুড়ি দেবে…তার হাতে-খড়ির সম্বন্ধে মা-বাপের মনে কোনো চিন্তা থাকবে না! পশুরাজের মন অস্থির হলো শাবকের শিক্ষা-ভার দেওয়া যায় কার হাতে!

পশুরাজ সভা আহ্বান করলো,—মন্ত্রী এবং অমাত্য-বর্গের সঙ্গে পরামর্শ করবে বলে'। রাজার আহ্বানে অরণ্যের সব পশু এসে জমকে সভায় বসলো!

মহারাজ বললে—তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ পরামর্শ আছে। যুবরাজের বয়স হলো এক-বছর—তার শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার।

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—শাবককে আরো দুদিন হাসতে-খেলতে দিন, পশুরাজ…এরি মধ্যে কাঁধে জোয়াল দেবেন!

পশুরাজ বললে—না, না, তুমি বোঝোনা মন্ত্রী: নর-লোকের সঙ্গে পশুরাজের পরিচয় ভয়ানক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে! মানুষের সর্ব্বগ্রাসী লোভ দিনে-দিনে কি-রকম বাড়ছে, খবরের কাগজে সে-খবর পড়ছো তো! এত-বড় যুদ্ধ, তার উপর বাঙলা দেশে অমন দুর্ভিক্ষ—লাখে-লাখে মানুষ ম'লো! তবু লোকালয় একেবারে লোকের ভিড়ে গিস্‌গিস্ করছে! মানুষ চাল পায় না খেতে…কাপড় পায় না পরতে—এত বেশী তাদের সংখ্যা! তার উপর আভাস যা পাচ্ছি, যুদ্ধ থামলে মানুষ বন-জঙ্গল আর কোথাও রাখবে না…কেটে সহর বানাবে—তখন আমাদের জীবনে দারুণ সমস্যা দেখা দেবে! কাজেই যুবরাজের শিক্ষা-সম্বন্ধে আমি একটি-দিন বিলম্ব করতে চাই না। যত-শীঘ্র সম্ভব শিক্ষা সেরে যুবরাজের বুদ্ধি পাকানো দরকার। মানুষের সঙ্গে আমাদের দারুণ বিরোধ বাধবে—দু'দিন পরে। অরণ্য-রাজ্য আর পশু-জীবন—ও দুটিকে রক্ষা করবার মতো যুবরাজের শিক্ষা চাই। পলিটিক্স… দেশাত্মবোধ…বুঝলে মন্ত্রী!

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—বেশ, কিন্তু বয়স আর-একটু বাড়লে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন যদি?

পশুরাজ বললো—তোমার আপত্তির কারণ?

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—যুবরাজ এখনো তরল-মতি কি না। জানেন না পশুরাজ, রাজ্য চিন্তার গুরুত্ব আপনার কেশরে—নরলোকের একটা খপর হয়তো রাখেন না!

—কি খপর?

—সেখানে তরল-মতি বালক-বালিকাদের মস্তিষ্ক খাবার জন্য একদল বয়স্ক ধূর্ত্ত মানুষ ছোটদের মাসিক-পত্রিকার ফাঁদ ফেঁদে তাদের নাম ছাপিয়ে দেবার লোভে ন্যাকা বানিয়ে তুলছে: আমার ভয় হয় বর্ণ-পরিচয় হবা মাত্র এখানে ঐ ছুঁচো-মশায় যে-রকম গূঢ়-কৌশলজ্ঞ, উনি যদি তেমনি ছোটদের মাসিক-পত্রিকার আবরণে…

বাধা দিয়ে পশুরাজ বললো—তোমার কথা স্পষ্ট করে বলো মন্ত্রী…আমি হেঁয়ালি বুঝি না!

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—আজ্ঞে, ছোটদের মাসিক-পত্রিকা খুবই সাধু-প্রচেষ্টা, মানি। তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না, থাকবার কথা নয়! জানেন তো, ধূর্ত্তের দল প্রকাণ্ড গহ্বর রচনা করে' তার উপর গাছের ডালপালা চাপিয়ে গহ্বর বুজিয়ে রাখে। ডালপালা ভালো জিনিষ, কিন্তু সে ডালপালা যদি গহ্বরের উপর ফাঁদের কাজ করে, তাহলে তা বর্জ্জনীয়! তেমনি ছোটদের মাসিক পত্রিকা ভালো জিনিষ—কিন্তু তার তলায় যদি মামা, জ্যাঠা, খুড়ো, পিশে-মেশো বা মাসি দিদি-পিশি রূপী গহ্বর থাকে, তাহলে ঐ মাসিক-পত্রিকার ডালপালায় বসলে গহ্বরের মধ্যে পড়ে তরল-মতি ছেলেমেয়ের মস্তিষ্ক-নাশ সুনিশ্চিত!

—তার মানে?

সকল পশুর চোখ ঔৎসুক্যে ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো!

শেয়াল-মন্ত্রী বললো—এই সব মাসিক পত্রিকার একটি কোণে পাঠক-পাঠিকাদের আত্তিশো করে' 'বাবা' 'বাছা' বলে' ডাকা হয়—"আমাকে চিঠি লিখো—নাম ছাপিয়ে দেবো!" নামের মোহ বড় সহজ মোহ নয় পশুরাজ… নামের মোহে লোকালয়ে দেখি, দেনার দায়ে কত লাখপতির ধনদৌলত উবে যাচ্ছে, কত বুদ্ধিমান বেকুব বনছে—তরল-মতি বালক-বালিকারা নামের মোহে ঐ সব পাতানো মেসো-পিসে খুড়ী-জেঠিকে চিঠি লিখে পাঠায় "মেসো গো তোমার মতো মানুষ আর নেই!" "খুড়ী গো তোমার জন্য ভালো আমসত্ত্ব পাঠাচ্ছি!" "দিদিমণি গো, তুমি বড় লক্ষ্মী" ব্যস্, পাতানো খুড়ো পিসে দিদি মাসির দল সেই সব নাম-ছাপাচ্ছে। এতে করে' ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হচ্ছে এই যে মানুষের মতো কাজ করলে সত্যকার কায়েমিভাবে যে নাম উজ্জ্বল শুধু মাসিক-পত্রের পাতায় নয়, দেশের বুকে ছাপা হতে পারে, এমন কাজ করবার মতো বুদ্ধি হচ্ছে বিলুপ্ত …তাই আমার মনে হয়, যুবরাজের বুদ্ধি তরল থাকতে যদি তাঁর শিক্ষা সুরু করে দেন, তাহলে মাসিক পত্রের ঐ সব পাতানো মাসিপিসির ফাঁদে লোটুকে তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হবে না, বুদ্ধি ছরকুটে যাবে।

শেয়াল-মন্ত্রীর কথাটা পশুরাজ কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর বললে—ভেবো না মন্ত্রী, কালই আমি অর্ডিনান্স জারি করে' কাগজ কনট্রোল অর্ডার বার করবো—যত দিন না শিক্ষায় যুবরাজ তার তরল বুদ্ধিকে 'সলিড' করে গড়ে তুলতে পারে, ততদিন অরণ্যে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ভয়ানক রকম কম থাকবে—আর ন্যাকামির লেখা কেউ ছাপাত পাবে না—মাসিকের সব লেখা সেন্সর-বোর্ডের কাছ থেকে মঞ্জুর করানো চাই ছাপাবার আগে…অতএব ভয় নেই…যাক্, বাজে কথায় সভার অনেকখানি সময় নষ্ট হলো।

শেয়াল-মন্ত্রী বললো—মনে খট্‌কা লেগেছিল, পশুরাজ …মন্ত্রিত্ব বজায় রেখে কিছু বলা চাই—এ ভেবে আমি বলিনি!

পশুরাজ বললো—বুঝেছি: রাজ্যের কল্যাণার্থে তুমি বলেছো। যাক্, এখন পরামর্শ দাও, শাবকের শিক্ষা-ভার কার হাতে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করা যায়?

গণ্ডার বললো—মন্ত্রীমশায়ের সবার চেয়ে বুদ্ধিমান বলে' শুধু পশু-সমাজে নয়, পশুরাজ, নর-সমাজেও প্রসিদ্ধি আছে যখন…

পশুরাজ ভুরু কুঁচকে বললো—হুঁ…শেয়াল খুবই তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন—কিন্তু ভারী মিথ্যাবাদী। পশুরাজের সমানে যে একদিন বসবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়?

—ছুঁচো…অমন সাবধান সতর্ক, চাল-চলনে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা…

পশুরাজ বললো—না। ওর কাণ খুব তীক্ষ্ণ—কিন্তু দৃষ্টি···দূরদৃষ্টি নেই মোটে। তাছাড়া নোংরায় রুচি!

—ব্যাঘ্র?

—শক্তিমান, স্বীকার করি—কিন্তু কূটনীতি বা পলিটিক্স জানে না। শক্তিধর···কূটনীতিতে ওর যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকতো, তাহলে কি মানুষের হাতে অপমৃত্যু ঘটতে পারে কখনো?

—চিতা?

—গোঁয়ার-গোবিন্দ···

—হাতী?

—আকারের মতো বুদ্ধি হতো যদি, তাহলে এ ভার দেওয়া চলতো। কিন্তু···

—বানর?

—বুদ্ধিহীন···অতি চঞ্চল···

—কুকুর?

—না, বড্ড পা চাটা!

অর্থাৎ পশুরাজ কাকেও যোগ্য মনে করলো না।

সভায় পশুর দল নীরব···কারো কণ্ঠে শব্দ নেই! এত-বড় সমস্যা—মন্ত্রী শেয়াল থেকে সুরু করে' ছুঁচো-টিক্‌টিকি-গিরগিটিটা পর্য্যন্ত সমাধানের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না—আশু্র্লা ফরফরানি ভুলে গেছে। পশুকুলের দুর্ভাবনা দেখে গভীর্ অরণ্য ক্রমে নিথর নিষ্পন্দ হলো!

আকাশে ওদিকে পক্ষীরাজ ঈগল চলেছে উড়ে—এক-ঝাঁক পাখী-পারিষদ সঙ্গে। নীচে অরণ্যে দৃষ্টি পড়লো··· দেখে ঈগল ভাবলো, ব্যাপার কি? কোনো মুনির শাপে অরণ্য আর অরণ্যের পশুরা পাথর হয়ে গেল নাকি? রাজায়-রাজায় বন্ধুত্ব ছিল। কাজেই পক্ষীরাজ নামলো অরণ্যে পশুরাজের খবর নিতে।

ঈগল এসে বললো—ব্যাপার কি বন্ধু? কিসের মন্ত্রণা? অভিযান? না, অরণ্যে মহামারী এলো?

নিশ্বাস ফেলে পশুরাজ সমস্যার কথা জানালো।

শুনে ঈগল বললে—এই কথা! আচ্ছা, আমি নেবো তোমার শাবকের শিক্ষার ভার। তাকে আমি সুশিক্ষা দেবো।

—তুমি! আঃ!

পশুরাজের কেশর দুলে উঠলো আনন্দের আবেগে। নিশ্বাস ফেলে পশুরাজ বললো,—রাজার কাছে রাজার শাবকের শিক্ষা···এই তো চাই! নাহলে মর্য্যাদা-সম্ভ্রম শিখবে কার কাছে?

ঈগল-রাজ বললে—তোমার শাবককে তাহলে আমার কাছে থাকতে হবে···আমার রাজ্যে···দুটি বছর।

সিংহরাজ বললো—নিশ্চয়।

ঈগল-রাজ বললো—এ দু' বছরের মধ্যে 'হলি-ডে এন্‌জয়' করতে শাবকের এই মাটীর অরণ্য-রাজ্যে আসা চলবে না। পারবে তুমি আর বন্ধুনী-সিংহিনী শাবকের বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করতে?

নিশ্বাস ফেলে সিংহ-রাজ বললো—শাবকের কল্যাণ ভেবে মা-বাপকে এ বিচ্ছেদ-ব্যথা সহ্য করতেই হয়!

—হুঁ···বেশ!

এবং তাই হলো। সিংহ-শাবককে ঈগল-রাজ নিয়ে গেল নিজের পুরীতে। পরের দিন থেকেই শাবকের শিক্ষা সুরু হলো ঈগল-রাজের ব্যবস্থা-মতো।

দিনের পর দিন যায়। একমাস, দু'মাস, তিনমাস কাটলো—পায়রা-দূত এলো অরণ্যে শাবকের সংবাদ নিয়ে। বললো—শিক্ষায় দিনে-দিনে শাবকের বুদ্ধি যা খুলছে সেখানে, পশুরাজ···চমৎকার!

চার মাস, পাঁচ মাস কাটলো—ছ'মাসে পায়রা-দূত আবার এসে জানালো—এমন মেধা পক্ষিরাজ্যে কেউ দ্যাখেনি, পশুরাজ···তাঁর মতির দ্রুত-গতি দেখে পাখীরা অবাক!

ক্রমে এক বছর কাটলো। দূতের মুখে সংবাদ এলো, —শাবক একগাদা মেডেল পেয়েছে···পালকের মেডেল··· পরীক্ষায় সবার উপরে সে! দু'বছর পরে পক্ষি-গেজেট এলো—তাতে ছাপা ফাইনাল-এগজামিনের রেজাল্ট—

ফাইনালে সিংহ-শাবক একেবারে ফার্ষ্ট-ক্লাশ ফার্ষ্ট! টোটাল ১০০০ নম্বরের মধ্যে শাবক পেয়েছে ৯৯৯ নম্বর। এক-নম্বর যে কাটা গেছে সে শুধু পক্ষী-এগজামিনারের জেদে—পক্ষীরাজ্যে এসে পশু-শাবক ফুল-মার্ক নিয়ে যাবে, —বিশেষ, ওর ডানা নেই—শুধু সেই রিষের জন্য! নম্বর দিতে পাখী-এগজামিনারের ঠোঁট চচ্চড় করেছিল।

এবারে গুরুগৃহ-ত্যাগ করে সিংহ-শাবক করবে অরণ্যে প্রত্যাগমন।

প্যাঁচা আর বাদুড় এলো খবর নিয়ে শাবক ষ্টার্ট করেছেন···পৌঁছবেন সন্ধ্যার পর।

এমনিতেই তো অরণ্যের অতুল-শোভা···তার উপর পশুরা তাকে আরো মনোহর করে' সাজিয়ে তুলেছে। যত গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় রঙীন ফুলের মঞ্জরী··· রাজ্যের যেখানে যত জোনাকি ছিল, ধরে এনে সারা অরণ্যে তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সবুজ পাতায়-লতায় তারা জ্বলছে সোনালি-চুমকির মতো! ঝিঁঝিঁর দল সানাইয়ে সুর দিয়েছে···গর্দ্দভরা থেকে-থেকে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে···সকলে উদগ্রীব···শাবকের পথ চেয়ে আছে···।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো···শাবকের চতুর্দ্দোলা এসে থামলো রাজপুরীর ফটকে।

পুরীর প্রাঙ্গণে বিরাট সভা। এ্যাম্ফি-থিয়েটারী ছাঁদে সভা গড়া হয়েছে। উঁচু প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্মের উপর সিংহাসনে বসে সিংহ-রাজ···আশে-পাশে নিম্নাসনে মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, অমাত্য। তারপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গড়া গ্যালারি ···গ্যালারিতে অরণ্যের যত পশু এসে ভিড় করে বসেছে! এত ভিড় যে একটা পিঁপড়ে দেরী করে এসে কোথাও এতটুকু জায়গা পাচ্ছে না যে দাঁড়াবে, ছোট একটা টিক্‌টিকির বাচ্ছা গোঁয়ার্তুমি করে গ্যালারির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে ভিড়ের চাপে যাকে বলে চিঁড়ে-চ্যাপটা!

শাবক এলো সভায়—কপালে রক্ত-চন্দনের টিপ, গলায় হাঁসের ডিমের মালা। শাবক বসলো পশুরাজের পাশে।

পশুরাজ বললো—তোমার খুবই পরিশ্রম হয়েছে বৎস, জানি,—কিন্তু এখানে পাত্রমিত্র-অমাত্য আর বনের যত পশু যে আজ জড়ো হয়েছে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য, তাদের মনে দারুণ কৌতূহল: পাখীর রাজ্য থেকে তুমি কি শিক্ষালাভ করে এসেছো, তা জানবার জন্য। সকলের কৌতূহল তৃপ্ত করে' তারপর তুমি বিশ্রাম করতে যাবে। আমিও জানতে চাই—সে-শিক্ষার গুণে তুমি রাজার সম্ভ্রম রক্ষা করে' রাজার দরাজ ছাতি নিয়ে অরণ্য-রাজ্য পালন করতে পারবে কিনা। আমার বয়স হয়েছে—মৃত্যুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। শিক্ষার গুণে তুমি আমাদের অরণ্য-মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো।

সিংহ-শাবক উঠে দাঁড়ালো এবং মাইকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—যে-শিক্ষা আমি পেয়ে এসেছি পশুরাজ, তার তুলনা নেই। সে-শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে, এখানে শিক্ষিত পশু কেউ নেই! তুমিও বিদ্যার ধার ধারো না বাবা। ঈগল-রাজ থেকে সুরু করে টুনটুনি, মায় গঙ্গা-ফড়িং পর্য্যন্ত···সকলের নাড়ীর খবর, হাঁড়ির খবর আমার নখদর্পণে! তাদের মধ্যে কে কি খায়, কখন খায়, কি করে' খায়; কে কি করে', কখন কি অবস্থায় থাকে, সব আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পাখীদের মধ্যে কোন্ পাখী কত ডিম পাড়ে, কার ডিমে কত ছানা হয়, নাম করুন, আমি নির্ভুল বলে দেবো। ফড়িং আর প্রজাপতির জন্ম-রহস্য—আপনার সভায় সবচেয়ে বড় পণ্ডিত যে বলীবর্দ্দ, তিনিও জানেন না—আমি জানি। তাছাড়া কি চমৎকার তাদের আচার-ব্যবহার, কি ভালো তাদের খাবার—আর থাকবার জন্য গাছের ডালে যে বাসা তৈরী করে কি তার কারিগরি! আমাদের মতো তারা মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করে না। আমরা গর্ত্তে বাস করি বলে' পাখীরা আমাদের জানোয়ার বলে' ঠাট্টা করে। তাই আমি স্থির করেছি, আপনি মারা গেলে আমি যেদিন রাজা হবো,

সেইদিনই আমার প্রথম অর্ডিনান্স জারি হবে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব গর্ত্ত বুজিয়ে পশুর দল গাছের ডালে উঠে বাসা বেঁধে সেই বাসায় গিয়ে বাস করবে—সে-আদেশ যে অমান্য করবে, তার হবে প্রাণদণ্ড। জীব-হিংসা করে দেবো বন্ধ। সব পশুকে ফলমূল খেতে হবে আর অসভ্যের মতো চার পায়ে কেউ চলতে পাবে না—সব উড়তে হবে! দুনিয়াকে ভালো করে দেখতে হলে মাটীর উপর চার পায়ে হামাগুড়ি দিলে চলবে না—উড়তে হবে ···ওড়া চাই!

শাবকের কথা শুনে পশুরাজের কেশর রাগে ফেঁপে ফুলে উঠলো: সভার সব পশু লজ্জায় একেবারে অধোবদন —পাখীদের চোখে তারা নেহাৎ তুচ্ছ! জানোয়ার বলে' পাখীরা অবজ্ঞা করে পশুদের!

পশুরাজ একটি নিশ্বাস ফেললো, নিশ্বাস ফেলে বললো —ওরে হতভাগা, তু' দুটো বছর খেটে শুধু পাখী-জাতের নকলনবীশ হলি! পশুবংশের তেজ, পশুর সাহস, শৌর্য্য —এ-সব তোর চোখে পড়লো না! পশুরা আজো সতেজে অরণ্য-রাজ্য রক্ষা করছে মানুষের গ্রাস থেকে,—পশুর বীর্য্য, স্বাধীনতা-সংগ্রাম—এ-সবের কোনো দাম বুঝলি না, মূর্খ! বিজাতীয় পাখীর বুলি শিখে সেই বুলি কপচাতে পারিস বলে' গর্ব্ব বোধ করছিস্! নিজের অরণ্য-মাতৃভূমির অপযশ গাইছিস্! এতকাল ধরে' শুধু ধ্বংসের মন্ত্র শিখলি, পশুকুলের কলঙ্ক তুই!

শেয়াল-মন্ত্রী চুপিচুপি বললো হাতীর কাণে—বিদেশীর হাতে শিক্ষার ভার দিলে এমনিই হয়! বিদেশী-শিক্ষায় মানুষ তার মাতৃভূমিকে ভুলে যায়, স্ব-জাতিকে ভুলে যায় —এ দেখেও পশুরাজ যখন সতর্ক হননি, তখন এর ফলভোগ তাঁকে করতেই হবে।

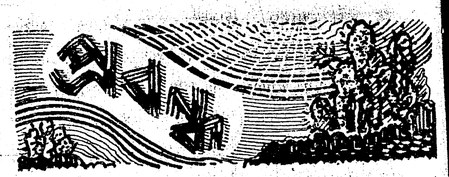

এ্যাটম-বম

সুধীর গুপ্ত

হালে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এক অদ্ভুত বোমা আবিষ্কার করে। সে বোমার নাম "এ্যাটম-বম"। এমন সাংঘাতিক তার প্রলয় শক্তি যে একটি বোমাই একটা পুরো সহরকে ধ্বংশ করে ফেলতে পারে। জাপানের দুটো সহরের উপর এই রকম দুটি বোমা ইতিমধ্যে ছাড়া হয়েছে, তাতেই সমস্ত জাপান ত্রাহি-ত্রাহি করে উঠেছে। এই "এ্যাটম-বম" ব্যাপারটা যে কী তা নিয়ে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অবশ্য তাঁরা মোটামুটি জানেন ব্যাপারটা কী তবে ঠিক কী ভাবে এ বোমা তৈরী করা হয় তা শুধু মার্কিন বৈজ্ঞানিকরাই বলতে পারেন।

এ্যাটম কাকে বলে জান? বাংলায় যাকে বলে পরমাণু। কিন্তু পরমাণুই বা কী? পণ্ডিতেরা বলেন পরমাণু হল একটা জিনিসের সবচেয়ে ছোট অংশ। ধরো এক টুকরো লোহা ভেঙে দু-টুকরো করলে। আবার ভাঙলে সেই ছোটোছোটো টুকরোর একটাকে। তার থেকে যে আরও ছোটো টুকরো হল তাকে আবার ভাঙলে। এই ভাবে ভাঙতে-ভাঙতে এমন এক লোহার ধুলো পাবে যাকে আর ভাঙবার কথা কখনোও বলতে পারা যাবে না। সেই অতি ছোটো লোহার গুঁড়োটাকে বলা হয় লোহার এ্যাটম। এ্যাটম এত ছোটো যে তাকে চোখে দেখা যায় না।

অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল ভাঙার ব্যাপার এই এ্যাটমেই শেষ। মানে এ্যাটম-কে আর

ভাঙা যায় না। কিন্তু হালের বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে এ্যাটমকেও ভাঙা যায় যদিও ভেঙে ফেললে পাওয়া যায় অন্য রকম জাত-আলাদা কয়েকটা জিনিস। সেই সব অতি সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর মস্ত মস্ত নাম বাৎলেছেন বৈজ্ঞানিকেরা: ইলেকট্রন, পসিট্রন, নিউট্রন, প্রোটন। এদের গুনাবলি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল বিজ্ঞান জগতে এরা একেবারে টাটকা তাজা খবর। এর কেউ-কেউ এ্যাটমের মাঝখানে চুপ করে বসে থাকে, আবার কেউ-কেউ তাদের পাক দিচ্ছে বন বন করে। সূর্যের চারপাশে যেমন পৃথিবী ঘুরপাক খায় তেমনি এ্যাটমের মধ্যে প্রোটোনের চারপাশে ঘুরপাক খায় ইলেকট্রন। এবং প্রচণ্ড বেগেই ঘুরপাক খায়।

বৈজ্ঞানিকরা আরও আবিষ্কার করলেন যে একটা পদার্থের সঙ্গে আর একটা পদার্থের আসল তফাৎ এ্যাটমের এই অতিক্ষুদ্র অংশগুলোরই দরুন। যেমন ধরো সোনার সঙ্গে লোহার আসল তফাৎ এই যে সোনার এ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা লোহার এ্যাটমের ইলেকট্রনের চেয়ে ঢের বেশী। তা হলে, লোহার এ্যাটমের মধ্যে হিসেব করে কিছু বাড়তি ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সেটা হয়ে যাবে সোনার এ্যাটম। বৈজ্ঞানিক মহলে সেই চেষ্টা কিছুদিন ধরে চলেছে এবং তাঁরা কিছুটা সফলও হয়েছেন। কিন্তু, এ চেষ্টা করতে গিয়ে আর একটা ভারি মজার ব্যাপার জানতে পারা গেল। একটা এ্যাটমের মধ্যে নতুন ইলেকট্রন ঢোকাতে গেলে বা তার থেকে কিছু ইলেকট্রন বের করে ফেলে দিতে গেলে সে এ্যাটমটাকে ভাঙতে হয়। এবং এ্যাটম ভাঙতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে এ্যাটম ভাঙবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিরাট শক্তি ভগ্ন এ্যাটম থেকে বেরিয়ে পড়ে। শক্তিটা যেন বাঁধা ছিল এ্যাটমের মধ্যে, তাই এ্যাটম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি পেল—যেন অসম্ভব শক্তিশালী বিরাট এক দৈত্য শিকল ছিঁড়ে এলো বেরিয়ে। এই ব্যাপার নিয়ে যাঁরা প্রথম সব চেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন তাঁদের মধ্যে রাদারফোর্ড এবং মাদাম কুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুনিয়ার সবচেয়ে ভারি এ্যাটম হল "ইউরেনিয়ম" বলে এক রকম ধাতুর এ্যাটম। সবচেয়ে হালকা এ্যাটম হল "হিলিয়াম" নামে এক রকম জিনিসের এ্যাটম। রাদারফোর্ড এই ইউরেনিয়ম এ্যাটমের গায়ে হিলিয়ম এ্যাটম ছুঁড়ে মারলেন এবং দেখালেন এই ভাবে ইউরেনিয়ম এ্যাটমকে ভাঙা সম্ভব। তারপর মাদাম কুরি আরও এক পা এগুলেন: ইউরেনিয়ম এ্যাটমকে ভাঙবার জন্যে হিলিয়ম এ্যাটম না ছুঁড়ে একেবারে নিউট্রন ছুঁড়তে সুরু করলেন। দেখা গেল নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ম এ্যাটম একেবারে দু ভাগে ভেঙে যায় এবং তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট একটা শক্তি।

এই বিরাট শক্তিটা কেমন করে ধ্বংশের কাজে লাগান যায়? এই চিন্তা ঢুকল কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মাথায় এবং যে এ্যাটম-বম নিয়ে আজ দুনিয়াময় এত হৈ-চৈ তা ওই চিন্তারই পরিণাম। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অনেক বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে অনেকদিন থেকে মাথা ঘামাচ্ছেন তবে কৃতকার্য প্রথম হলেন কয়েকজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক। তাঁদের নাম ওপেন হেইমার, লরেন্স ও টলম্যান। ভাঙা এ্যাটম থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট শক্তিকে সত্যিই এঁরা ধ্বংশের কাজে ঠিকমত লাগাতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে লরেন্স কিছুদিন আগেই সাইক্লোট্রোন নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন; এই যন্ত্র দিয়ে এ্যাটম ভাঙা অনেকটা সহজ (কলকাতার সায়েন্স কলেজে হালে একটা এই যন্ত্র কেনা হয়েছে)। কিন্তু সাইক্লোট্রোন দিয়ে এ্যাটম ভাঙা গেলেও এ্যাটমের বোমা তৈরি করা যায় না। তার জন্যে আরও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। আসলে ব্যাপারটা তোমাদের যেমন সহজ করে বললুম অমন সহজ নয়। শুধু ইউরেনিয়ম জোগাড় করতেই হাঁপিয়ে যেতে হয়। সমস্ত পৃথিবীতে খুব সামান্য ইউরেনিয়ম আছে। তারপর নিউট্রন তৈরি করাও চারটিখানি কথা নয়। তারপর নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়মের এ্যাটম ভেঙে কী

করে মুক্ত শক্তিকে ধ্বংশের কাজে লাগাতে হবে তা' ত' এক রহস্যময় ব্যাপার। মাত্র কয়েকজন মার্কিন পণ্ডিতের এই রহস্য আজ জানা আছে।

কিন্তু হাঙ্গামা যতই হোক, এ্যাটম-বম একবার তৈরি করতে পারলে আর পায় কে? একটা এ্যাটম বোমার শক্তি ২০ হাজার একটনি বোমার সমান; মানে একটা এ্যাটম বোমা ছাড়াও যা আর একটা ৫৪০ হাজার মন ভারি বোমা ছাড়াও তাই। ৫৪০ হাজার মন! ভাবতে পারো? সূর্যের ভিতরটা কী রকম গরম তা ধারণা আছে? শুনতে পাচ্ছি এ্যাটম বোমা যেখানে ফাটে সেখানটা সূর্যের ভিতরের মতোই তেতে ওঠে! জাপানিরা ভাগ্যিস্ বোমা ফেলতে এসে কলকাতায় একটি এ্যাটম্-বম্ ফেলে যায়নি। ফেলে গেলে তোমাদের "রংমশাল" আপিসেরও চিহ্ন থাকত না আর আজ আমাকেও এই প্রবন্ধ লিখতে হত না!

শ্বেত-চক্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২৭৭ নম্বর বাড়ি

জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র কত টাকা যে আছে কেউ সঠিক জানে না: দশ লাখও হতে পারে, বিশ লাখও হতে পারে, এমন কি কোটি খানেক হওয়াও বিচিত্র নয়। নানা লোক এই ধরণের গুজব রটায়। জয়কৃষ্ণের চেহারায় একটা রুক্ষ ভাব, মুখের উপর গভীর ক্ষতের মতো নানা রেখা, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে চোখের জ্যোতি কমে এলেও দৃষ্টিতে একটা ধূর্ত চতুর ছায়া অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

বর্তমানে জয়কৃষ্ণের তিনটি মিল আছে। কাপড়, গেঞ্জি, মোজা জাতীয় হরেক রকম জিনিস তৈরি হয় আর বাজারে সে-সব মাল যে-রকম চালু তাতে ব্যবসায় ক্রমশই সে যে উন্নতি করে চলেছে ও চলবে তাতে সন্দেহ নেই।

বয়েস তার ষাটের কাছাকাছি। সংসারেও বিশেষ কেউ নেই। কেউ-কেউ বলে বিয়ে সে করেছিলো কিন্তু অনেককাল বৌ মরে গেছে। কেউ-কেউ বলে বিয়ে সে মোটেই করেনি। মোটকথা জয়কৃষ্ণের প্রথম জীবনের কথা ভালো করে কেউই জানে না। লোকটার বন্ধুও নেই আত্মীয়ও নেই যার কাছে কোনো খবর পাওয়া যেতে পারে।

বড়লোক হলেই প্রত্যহ ডাকে রাশিরাশি চিঠিপত্র আসে। জয়কৃষ্ণরও চিঠিপত্র আসার কামাই নেই। রোজ সকালে ব্যবসার কাজে বেরুবার আগে আধঘণ্টা ধরে সে চিঠিগুলো পড়ে আর নিজের প্রতিষ্ঠা দেখে মনেমনে খুসি না হয়ে পারে না। সভাসমিতির নিমন্ত্রণ, বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ, চাঁদা দেবার অনুরোধ ইত্যাদি কত ধরণের চিঠিই না আসে! সত্যিই আজ আর সে যেমুন-তেমন একটা লোক নয়! টাকার মতো জিনিস আর কিছু আছে নাকি? টাকাই সব: মানুষকে সম্মান দেয়, প্রতিষ্ঠা দেয়, অসাধারণ করে তোলে!

আজ সকালেও একরাশ চিঠি এসেছে। স্নানাহার সেরে জামাকাপড় বদলে ইজিচেয়ারে পান চিবোতে-চিবোতে জয়কৃষ্ণ একটার পর একটা খাম ছিঁড়ছিলো আর নিতান্ত অলসভাবে পড়া শেষ করে পাশের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলছিলো চিঠিগুলো। অধিকাংশ চিঠির সুরই জানা। সবগুলোর উত্তর দেবার মতো অবসর তার নেই। ব্যবসা-সংক্রান্ত নিতান্ত জরুরি চিঠি না এলে সে বড় একটা উত্তর দেয় না।

সতেরটা চিঠি শেষ করে আঠার'রটা সে টেনে নিলো। বালি রঙের কাগজের খাম, টাইপ করে নাম ঠিকানা লেখা। নিতান্ত তাচ্ছিল্য করেই খামটা সে ছিঁড়লো তারপর ভিতরের নিতান্ত সাধারণ কাগজে টাইপকরা চিঠিটা পড়তে-

পড়তে তার মুখচোখের চেহারা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেলো।

চিঠিটা বাঙলায় তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়:

"প্রিয়বরেষু, হালে ২৭৭ নম্বর শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের বাড়িটা আমি কিনেছি। যতদূর মনে পড়ে বছর পনেরো আগে এই বাড়িটা আপনি ব্যবহার করতেন এবং সেখানে অনেক 'লাভজনক' জিনিস কেনাবেচা করেছেন। বাড়িটা কেনার পর কিছু অদল-বদল করার সময় একতলার পশ্চিম দিকের ঘরের তলায় ছোট্ট একটি ঘর চোখে পড়েছে। এতোদিন সে-ঘরটা কেউ ব্যবহার করেনি, নানা বাবিশে ভরা ছিলো। পরিষ্কার করার সময় আমি এমন কতকগুলি জিনিস আবিষ্কার করেছি যেগুলি দেখলে আপনার কৌতূহলের সীমা থাকবে না। খুব সম্ভব এই আবিষ্কারের কথা পুলিশকে আমি জানাবো। কিন্তু তাদের জানানোর আগে আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে একবার কথা বলা ভালো বলে মনে হোলো। তাই লিখি সোমবার দুপুর ঠিক দুটোর সময় ওই বাড়িতে আপনি যেন একবার আসেন। মজুররা তখন বিশ্রাম নিতে যায়। তখনই আমার আবিষ্কারের কথা আপনাকে জানাবো। যদি না আসেন তা হলে বুঝবো এ-বিষয়ে আপনার কোনো উৎসাহ নেই এবং আমার আবিষ্কারের কথা স্বচ্ছন্দে পুলিশকে জানাতে পারি।

ইতি আনন্দমোহন।"

চিঠিটা পড়তে-পড়তে উত্তেজনায় খড়ির মতো শাদা হয়ে গেলো জয়কৃষ্ণের মুখচোখ। পনেরো বছর আগে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের ২৭৭ নম্বর বাড়ি? কী সর্বনাশ। সেখানে যে অনেক চোরাই মাল সে কেনাবেচা করেছে! কেউ জানে না সে-সব কথা, অন্তত এতোদিন সেকথাই ভেবে এসেছে জয়কৃষ্ণ। আজ অকস্মাৎ এ-কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। আর পুলিশ সে খবর পেলে তাকে কি একদিনও সুস্থিরে থাকতে দেবে? পনেরো বছর আগে ওই বাড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে সে উঠে এসেছে। আসবার সময় সব রকম কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করতে সে কসুর করেনি। তা হলে এই আনন্দমোহন লোকটা কী আবিষ্কার করতে পারে? আর লোকটাই বা কে? জানলোই বা কী করে পনেরো বছর আগে ওই চোরা কুঠরিতে সে অনেক 'লাভজনক' জিনিস কেনাবেচা করেছে? যাদের কাছ থেকে চোরাই হীরে-জহরৎ সে কিনতো তাদের মধ্যে কেউ নাকি? কিন্তু তারা তো এ ধরণের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করার মতো লোক নয়—তার সাহায্যেই তো তারা নিজেদের চোরাই গয়না-পত্তর পাচার করতে পারে। তাকে ধরিয়া দিলে নিজেদের পায়েই তো কুড়ুল মারা হয়!

ইজিচেয়ার ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে জয়কৃষ্ণ পায়চারি করতে লাগলো। কে এই আনন্দমোহন? অনেক লোকের ছবি তার মনে একে-একে উঠলো ভেসে। কিন্তু তাদের ভিতর এমন কেউ নেই যার নাম আনন্দমোহন। লোকটা ছদ্মনামে লিখেছে নাকি? কিন্তু বাড়িটা যদি সে কিনেই থাকে তা হলে ছদ্মনামে লেখার কোনো মানে হয় হয় না, সহজেই তার আসল নাম-টাম জানা যেতে পারে।

কোনো কুলকিনারা পেলো না জয়কৃষ্ণ। অনেক সে ভাবলো। শেষে যাওয়াই ঠিক করলো। দেখা যাক ঠিক কী জিনিস সে আবিষ্কার করেছে। সেটার বিনিময়ে নিশ্চয়ই আনন্দমোহন টাকা চাইবে। কত টাকা চাইবে কে জানে! টাকার অঙ্কটা সে মনে মনে আঁচ করতে লাগলো। দু-পাঁচ হাজারে কি লোকটা খুসি হবে? নাকি এই রকম ভয় দেখিয়ে ক্রমাগতই সে টাকা আদায় করে চলবে? ভাবতে-ভাবতে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখচোখের চেহারা। জয়কৃষ্ণও একটা যে-সে লোক নয়। নানা শ্রেণীর গুণ্ডার সঙ্গে তার জানাশুনো আছে। লোকটা বেশি বাড়াবাড়ি করলে চিরকালের মতো তাকে ঠাণ্ডা করার উপায় সে বার করবে।

সোমবার দু'টো? মানে আজকেই। আজ আর ব্যবসার কাজে বেরুনো হবে না। না হোক, এ-ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দেরাজ খুলে নিজের ছোট্ট

অটোমেটিকটা সে একবার পরীক্ষা করে নিলো। বয়েস যাটের কাছাকাছি হলেও এমন শক্তি তার দেহে এখনো আছে যাতে সহজেই দু-চারজনকে কাবু সে করতে পারে। আর আনন্দমোহন তো একা! প্রথমে আনন্দমোহনের কাছে জিনিসটা সে দেখতে চাইবে—জিনিসটা নিশ্চয়ই আর কিছু নয় কয়েকটা কাগজপত্র মাত্র। হয়তো কোনো অসাবধান মুহূর্তে তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিলো কিংবা ভুলে এসেছিলো ফেলে। সেটা চক্ষের নিমেষে নষ্ট করা শক্ত হবে না। আর তারপর, নষ্ট করে ফেলার পর, আনন্দমোহনকে সে বলবে জাহান্নামে যেতে, তারপর আসবে ফিরে।

খিদিরপুরে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিট। দু'টো বাজতে মিনিট দশেক আগে ট্যাক্সি থেকে জয়কৃষ্ণ নামলো সেই রাস্তার মোড়ে তারপর ভিড় ঠেলে চললো এগিয়ে। নানা ধরণের দোকান, রেস্তরাঁ, গুদম, ইত্যাদির ভিড় এই পথে। সমস্ত দিন ধরে একটা হৈ-হৈ ভাব থাকে। অনেক ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। নানা ধরণের ব্যবসা এখানে চলে। নানা ধরণের মানুষ : জাহাজের খালাসি, ডকের কুলি, চাল-গুদামের মালিক, পাটের কারবারী—এরা তো সব আছেই। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাজার। শাক-শব্জী, মাছ-মাংস, আচার-মশলা ইত্যাদি সেখানে কেনাবেচা চলে সমস্তদিন ধরে। সেই বাজার ছাড়িয়ে সস্তার একটি সিনেমা হাউস, নাম 'চাঁদনি টকি'। তারপরের গোটা কয়েক বাড়ি ছাড়ালেই ২৭৭ নম্বর। অনেক দিন পরে এ-পাড়াতে এলেও চিনতে তার কোনো অসুবিধে হোলো না। রাস্তাটার আর উন্নতি হয়নি, পরিবর্তনও বিশেষ চোখে পড়ে না : সেই বিবর্ণ গ্যাস পোস্টগুলো, সেই পনেরো বছর আগেকার ডাস্টবিনগুলো আবর্জনা ভরা। কতকগুলো দোকানের সাইনবোর্ড যা বদল হয়েছে—আর কোনো বদল চোখে পড়ে না। সাইনবোর্ডগুলো দেখতে-দেখতে সে চললো : দার্জিলিঙ টি হাউস, বোস ব্রাদার্স, মনসুন কাফে, কবিরাজ ধনঞ্জয় শর্মা—এই কবিরাজের নামটাই যেন নতুন ঠেকলো। সে যখন থাকতো তখন কোনো কবিরাজ এ পাড়ায় ছিলো বলে মনে পড়ে না। কবিরাজের দোকানটা বন্ধ। বন্ধ দরজার উপর কায়েকটা শুকনো গাছ-গাছড়ার শিকড়-বাকড় ঝোলানো। আরো খানিক পরে 'চাঁদনি-টকি' পেরিয়ে ২৭৭ নম্বর বাড়ির সামনে জয়কৃষ্ণ সামন্ত এসে দাঁড়ালো।

বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা সারানো হচ্ছে। চুণ-সুরকি-ইট সামনে স্তূপাকার। বাইরের কয়েকটা জানালা-দরজায় খাপছাড়া সবুজ রঙ-করা। সদর দরজাটা বন্ধ। আনন্দমোহন কি ইতিমধ্যে পৌঁছেছে? ভিতরে অপেক্ষা করছে নাকি? জয়কৃষ্ণ'র বুকটা অকারণেই ধ্বক-ধ্বক করে উঠলো, কিন্তু মুহূর্তে উত্তেজনা চেপে সদর দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দিলো।

কোনো উত্তর এলো না। দরজা বন্ধ।

কী করবে ভাবছে এমন সময় পিছন থেকে ছোট ছেলের ডাকে চমকে সে চাইলো।

ছেলেটির বয়েস আট-দশ বছরের বেশি নয়। সে প্রশ্ন করলো, "আপনার নাম কি জয়কেষ্টোবাবু?"

"হুঁ, কেন?"

"বাবা এই চাবিটা দিলেন! আনন্দমোহনবাবু টেলি-ফোনে বাবাকে একটু আগে বলেছেন আপনি এলে চাবিটা যেন দেওয়া হয়। আপনি নাকি বাড়ির মধ্যে কী সব পরীক্ষা করবেন।"

হেসে জয়কৃষ্ণ বললো, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমারই নাম জয়কৃষ্ণ বটে। চাবিটা দাও। কিন্তু তোমার বাবার কাছে চাবিটা গেলো কী করে?"

"আমরা যে সামনের বাড়িতে থাকি। আনন্দমোহনবাবু মিস্ত্রিদের বলে গেছেন তাদের কাজ শেষ হলে চাবিটা যেন বাবার কাছে রেখে যায়। তারা খেতে গেছে। যাবার সময় চাবিটা দিয়ে গেলো। আবার ফিরে এসে চাবিটা নেবে। আপনার কাজ হয়ে গেলে আবার চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।"

ছেলেটি চলে যাবার পর জয়কৃষ্ণ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু আনন্দমোহন লোকটা কী শয়তান! বাড়ির ভিতরে জয়কৃষ্ণ যাতে তার কোনো ক্ষতি করে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে কেমন সহজ উপায় ঠিক করেছে! ছেলেটা তো দেখলোই বাড়ির ভিতরে সে ঢুকেছে, ছেলেটার বাবাও সে-কথা এখনি জানবে। ফলে তার অটোমেটিকটা কাজে লাগাবার কোনো সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বুদ্ধির খেলায় তাকে হারাতে হবে। বুদ্ধির খেলায় তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক খুব বেশি আছে বলে জয়কৃষ্ণ জানে না।

ভিতরে এসেই জয়কৃষ্ণর মনে হোলো একবার সেই চোরা কুঠরিটা ঘুরে এলে কেমন হয়। সেখান থেকে কী ধরণের জিনিস আনন্দমোহন পেয়েছে, আরো কোনো জিনিস পড়ে আছে কিনা হয়তো জানা যেতে পারে। কিন্তু আনন্দমোহন আচমকা যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে! জয়কৃষ্ণ তাই ভিতর থেকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলো। তারপর খানিকটা সুস্থির হয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে চললো এগিয়ে। সত্যিই বাড়িটা সারানো হচ্ছে। দেয়ালে নানা নতুন পলেস্তরার চাপ, নতুন ছিটকি-কড়া ঝকঝক করছে, ইলেক্ট্রিকের তারগুলোও নতুন, কিন্তু এখনো বাল্ব্ লাগানো হয়নি।

চারিদিক বন্ধ থাকায় ভিতরটা আলো-অন্ধকারে ভরা। স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ে না। দেশলাই জ্বালতে-জ্বালতে জয়কৃষ্ণ চললো এগিয়ে। সরু বারান্দাটা পেরিয়েই সেই মাটির তলার চোরকুঠরির ঘরটা। ঘরের সামনের দরজাটা ছোটো। দরজাটা খুললেই কাঠের একটা সিঁড়ি পড়ে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেই চোরাকুঠরির মেঝেয় পৌঁছনো যায়। অনেক বছর পরে এলেও জয়কৃষ্ণ'র স্পষ্ট সব কথা মনে আছে।

সেখানে পৌঁছে আর একবার চারিদিক ভালো করে দেখে নিলো জয়কৃষ্ণ তারপর ঠেলা দিয়ে খুললো সেই দরজাটা। দরজাটা স্প্রিঙের, ছেড়ে দিলে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন ব্যবহার না হওয়ায় স্প্রিঙটায় নিশ্চয়ই মরচে পড়েছে। খুলতেই দরজাটা একটা কিচকিচ শব্দ করে উঠলো।

নতুন একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে ভিতরে ঢুকলো জয়কৃষ্ণ। স্প্রিঙের দরজা আপনা থেকেই হোলো বন্ধ। তারপর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নামলো নিচে। এখানেও ইলেক্ট্রিক্ মিস্ত্রিরা কাজ করেছে—তারগুলো নতুন, সুইচটাও পালটানো হয়েছে। ছাতের দিকে চেয়ে জয়কৃষ্ণ দেখলো : আরে একটা নতুন বাল্ব্ও লাগানো রয়েছে যে! দেশলাই-এর কাঠিটা পুড়তে-পুড়তে তার আঙুলের কাছে আগুনটা প্রায় পৌঁচেছে। সেটা ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের গায়ের সুইচটা সে ছুঁলো তারপর খুট করে জ্বাললো আলো।

কিন্তু আলো জ্বললো না। দুম করে হোলো একটি শব্দ আর মাথার উপরকার বাল্ব্টা থেকে এক মুহূর্তের জন্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠে সমস্ত ঘরটা আবার গেলো অন্ধকারে ঢেকে।

দারুণ ভয় পেয়ে এক লাফে জয়কৃষ্ণ দেয়ালের কাছে সরে এলো। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কেউ কি তাকে টিপ করে রিভলভার ছুঁড়লো? পর মুহূর্তেই মনে হোলো রিভলভারের শব্দ এটা নয়, তার চেয়ে ঢের মৃদু এই আওয়াজ। তবু উত্তেজনা তার কমেনি। হাত দুটো কাঁপছে। পকেট থেকে দেশলাই বার করে তিন চারটে কাঠি নষ্ট করে সে আগুন জ্বাললো। সেই আলোয় উপরে চেয়ে দেখলো বাল্ব্টা ফেটে গেছে আর ভিতর দিয়ে কী রকম সাদা-সাদা ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর একবার চাইলো সে সুইচটার দিকে। কিন্তু সেখানে গোল একটা কী জিনিস সুতো দিয়ে ঝোলানো রয়েছে? অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে কাছে গিয়ে ভালো করে সে দেখলো : শাদা পিজ্-বোর্ডের গোল একটি চাকৃতি। তার উপর লাল কালিতে শুধু লেখা রয়েছে 'এক'।

জয়কৃষ্ণ সেটা হাতে নিয়ে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কিছুই বুঝতে পারলো না। কেউ তার সঙ্গে রসিকতা করলো নাকি? হাতের কাঠিটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আবার ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেলো। বাইরের পথ দিয়ে বড় একটা লরি গেলো চলে। কিন্তু নিশ্বেস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে কেন? ওটা কিসের তীব্র গন্ধ? মাথাটা ঘুরছে যে! আরে, মুহূর্তের মধ্যে মনে হোলো যেন ঘর থেকে সব বাতাস টেনে নেওয়া হয়েছে! জয়কৃষ্ণ অন্ধকারে আন্দাজে কাঠের সিঁড়ির দিকে যেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলো তার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর নিশ্বেস নেওয়া সম্ভব নয়। সে কি অজ্ঞান হয়ে যাবে? সে কি আর দাঁড়াতে পারবে না?

কোনো রকমে আরো দু'য়েক পা সে এগুলো তারপর তার দীর্ঘ শরীরটা হঠাৎ যেন গেলো ভেঙে। হুড়মুড় করে মেঝের উপর বিরাট একটি স্তূপ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। চোরা কুঠরির ভিতরকার নিস্তব্ধতা আবার এলো ফিরে। [ক্রমশ]

মশাল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রংমশাল যারা পড়ো,

অসুখ, হাঙ্গামা, দাঁতের শত্রুতা এই সব অনেক কিছু আমায় সাময়িকভাবে কাবু করেছে। 'মশাল' লিখে উঠতে পারছি না। এ জন্য তোমাদের কাছে বিরাগহীন প্রশ্রয় কামনা করছি কিছুদিনের জন্য। সুস্থ হলেই 'মশাল' লেখবার চেষ্টা করব।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.৮.৪৫

দু'টি নিষ্ঠুর কবিতা*

পরিমল রায়

১

রাগের চোটে নৌকো থেকে বৌ-কে দিল ফেলে,
এক নিমেষে স্রোতের টানে কোথায় নিল ঠেলে।
এখন শুধু কপাল ঠোকে,
বলে, "মশাই, মরছি শোকে,
গয়নাগুলো সঙ্গে গেল, কাজ হ'তো আজ পেলে।"

২

ছুঁড়ে বন্দুকের গুলি
ওড়ালো মা'র মাথার খুলি।
বাপ বল্লেন, এক গুলি-তেই পেরেছিস্ যে ভাগ্যি,
নইলে মজা দেখিয়ে দিতুম,—গুলি আজকাল যা মাগ্‌গি!

একটি সোশ্যালিষ্টিক ছড়া

অনেকগুলি পোষ্য,
কিন্তু নাহি চর্ব্ব্য কিম্বা চোষ্য।
তাই তো মাথায় খুন চেপেছে,
অন্য দিনের চাইতে হাজার গুণ ক্ষেপেছে।
এখন যদি, ধরুন মশায়,
ছেলে পিলের মুণ্ডু খসায়,
দোষটা হবে কস্য?
নয় কি সমাজস্য—
গাঁ ভরে যা'র ছাঁ রয়েছে, ক্ষেত ভরে নেই শস্য?

* আমরা কিন্তু মা ও স্ত্রীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। রং সং

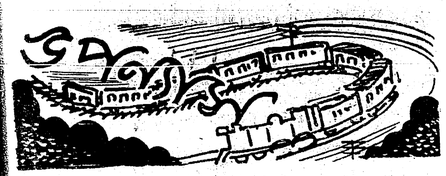

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাদুস-নুদুস ভূলো ভোলানাথের মতো চেহারা, ভবতোষ নামটার সঙ্গে খুব খাপ খায়। হন্তদন্ত ভাবে হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে বাগান পেরিয়ে তরতর করে উঠে এলেন। অশোক আর কুনুকে একেবারে দালানে দেখতে পেয়ে মহা খুসি—"যাক, তোমরা বাড়িতেই আছ! বাঁচলুম। একটা ভয়ানক জরুরী কাজ পড়েছে। হঠাৎ তাই আমায় ফিরতে হল"—এক নিঃশ্বেসে বল্লেন এতগুলো কথা তারপর ধপাস করে একটা চেয়ারে পড়লেন বসে।

অশোকের দিদি এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে বল্লেন —"ওরা ত' তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অশোক বলছিলো খানিকক্ষণের মধ্যেই তুমি ফিরবে।"

ভবতোষবাবু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন—"কী আশ্চর্য্য! আমি ফিরব জানলো কেমন করে! আমার ত' ফেরবার কথা দিন কতক পরে!"

অশোক হাসতে হাসতে বলল—"অবাক হবেন না। এরা মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধির কসরৎ নেই। উদয়-ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের যদি মাথা খারাপ হয় তা হলে তা নিয়ে আপনারই ত' সবচেয়ে মাথা ব্যথা হবার কথা। তিনি যে আপনার একজন প্রধান মক্কেল সে কথা ত' আগে থাকতেই জানতুম।"

ভবতোষবাবুর চোখ এবার সত্যিই কপালে উঠল—"কী আশ্চর্য্য! প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপের খবরটা তোমরাও জেনে গেছ!"

এবার অবাক হবার পালা অশোকের, বল্‌ল—"খবরের কাগজেই যখন খবরটা বেরিয়ে গেছে তখন আর আমাদের পক্ষে জানাটা এমন কি বিস্ময়ের?"

একেবারে চমকে উঠলেন ভবতোষবাবু। স্ত্রীর হাত থেকে চা নিতে যাচ্ছিলেন, পেয়ালা থেকে চা উপচে পড়ল পিরিচে। বললেন—"খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে!" ভবতোষবাবু বুঝি নিজেই ভূত দেখলেন। তারপর হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—"যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল!"

অশোকের দিদি প্রশ্ন করলেন—"কেন, মাটি কী হল?"

"মাটি নয়?"—ভবতোষবাবু একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন—"পাছে বেশী লোক জানাজানি হয় সেই ভয়েই ত' টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।"

অশোকের কপালে একটু কুঁচকে উঠল—"কেন? বেশী লোক জানাজানি হলে মুস্কিলটা কী?"

এতক্ষণ পরে কুনু কথা বলল—"ভারি গোয়েন্দা হয়েছিস! মুস্কিলটা কি তাও বুঝিয়ে দিতে হবে? তুই যদি আজ পাগল হয়ে যাস আর সবাই যদি তা জেনে ফেলে তা হলে তোর দুর্নাম হবে না? মক্কেলের দুর্নামটা মুস্কিলের নয়?"—খুব মাতব্বরী চালে বলল কুনু এবং অশোককে বুদ্ধিতে পরাস্ত করার বীরদর্পে একবার দিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

"না হে না!" ভবতোষবাবু যেন এককথায় কুনুর সমস্ত উৎসাহ দুমড়ে দিলেন—"ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসল কথা হল আইনের একটা হাঙ্গামা: প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে একথা সর্ব্বত্র প্রমাণিত হলে ওই বিরাট সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। কেননা, সম্পত্তিটা তাঁর কাকা উদয়চন্দ্র তাঁকে উইল করে দিয়ে গেছেন এবং উইলে এই একটিমাত্র সর্ত্ত।"

"এ আবার কোন ধরণের উইল?" দিদি বললেন।

জয়কৃষ্ণ সেটা হাতে নিয়ে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কিছুই বুঝতে পারলো না। কেউ তার সঙ্গে রসিকতা করলো নাকি? হাতের কাঠিটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আবার ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেলো। বাইরের পথ দিয়ে বড় একটা লরি গেলো চলে। কিন্তু নিশ্বেস-নিতে তার কষ্ট হচ্ছে কেন? ওটা কিসের তীব্র গন্ধ? মাথাটা ঘুরছে যে! আরে, মুহূর্তের মধ্যে মনে হোলো যেন ঘর থেকে সব বাতাস টেনে নেওয়া হয়েছে! জয়কৃষ্ণ অন্ধকারে আন্দাজে কাঠের সিঁড়ির দিকে যেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলো তার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর নিশ্বেস নেওয়া সম্ভব নয়। সে কি অজ্ঞান হয়ে যাবে? সে কি আর দাঁড়াতে পারবে না?

কোনো রকমে আরো দু'য়েক পা সে এগুলো তারপর তার দীর্ঘ শরীরটা হঠাৎ যেন গেলো ভেঙে। হুড়মুড় করে মেঝের উপর বিরাট একটি স্তূপ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। চোরা কুঠরির ভিতরকার নিস্তব্ধতা আবার এলো ফিরে।

[ক্রমশ]

মশাল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রংমশাল যারা পড়ো,

অসুখ, হাঙ্গামা, দাঁতের শক্রতা এই সব অনেক কিছু আমায় সাময়িকভাবে কাবু করেছে। 'মশাল' লিখে উঠতে পারছি না। এ জন্য তোমাদের কাছে বিরাগহীন প্রশ্রয় কামনা করছি কিছুদিনের জন্য। সুস্থ হলেই 'মশাল' লেখবার চেষ্টা করব।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.৮.৪৫

দু'টি নিষ্ঠুর কবিতা*

পরিমল রায়

১

রাগের চোটে নৌকো থেকে বৌ-কে দিল ফেলে,
এক নিমেষে স্রোতের টানে কোথায় নিল ঠেলে।
এখন শুধু কপাল ঠোকে,
বলে, "মশাই, মরছি শোকে,
গয়নাগুলো সঙ্গে গেল, কাজ হ'তো আজ পেলে।"

২

ছুঁড়ে বন্দুকের গুলি
ওড়ালো মা'র মাথার খুলি।
বাপ বল্লেন, এক গুলি-তেই পেরেছিস্ যে ভাগ্যি,
নইলে মজা দেখিয়ে দিতুম,—গুলি আজকাল যা মাগ্‌গি!

একটি সোশ্যালিষ্টিক ছড়া

অনেকগুলি পোষ্য,
কিন্তু নাহি চর্ব্ব্য কিম্বা চোষ্য।
তাই তো মাথায় খুন চেপেছে,
অন্য দিনের চাইতে হাজার গুণ ক্ষেপেছে।
এখন যদি, ধরুন মশায়,
ছেলে পিলের মুণ্ডু খসায়,
দোষটা হবে কস্য?
নয় কি সমাজস্য—
গাঁ ভরে যা'র ছাঁ রয়েছে, ক্ষেত ভরে নেই শস্য?

* আমরা কিন্তু মা ও স্ত্রীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। রং সং

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাদুস-নুদুস ভুলো ভোলানাথের মতো চেহারা, ভবতোষ নামটার সঙ্গে খুব খাপ খায়। হন্তদন্ত ভাবে হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে বাগান পেরিয়ে তরতর করে উঠে এলেন। অশোক আর কুন্থকে একেবারে দালানে দেখতে পেয়ে মহা খুসি—"যাক, তোমরা বাড়িতেই আছ! বাঁচলুম। একটা ভয়ানক জরুরী কাজ পড়েছে। হঠাৎ তাই আমায় ফিরতে হল"—এক নিঃশ্বেসে বল্লেন এতগুলো কথা তারপর ধপাস করে একটা চেয়ারে পড়লেন বসে।

অশোকের দিদি এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে বল্লেন —"ওরা ত' তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অশোক বলছিলো খানিকক্ষণের মধ্যেই তুমি ফিরবে।"

ভবতোষবাবু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন—"কী আশ্চর্য্য! আমি ফিরব জানলো কেমন করে! আমার ত' ফেরবার কথা দিন কতক পরে!"

অশোক হাসতে হাসতে বলল—"অবাক হবেন না। এরা মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধির কসরৎ নেই। উদয়-ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের যদি মাথা খারাপ হয় তা হলে তা নিয়ে আপনারই ত' সবচেয়ে মাথা ব্যথা হবার কথা। তিনি যে আপনার একজন প্রধান মক্কেল সে কথা ত' আগে থাকতেই জানতুম।"

ভবতোষবাবুর চোখ এবার সত্যিই কপালে উঠল—"কী আশ্চর্য্য! প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপের খবরটা তোমরাও জেনে গেছ!"

এবার অবাক হবার পালা অশোকের, বল্‌ল—"খবরের কাগজেই যখন খবরটা বেরিয়ে গেছে তখন আর আমাদের পক্ষে জানাটা এমন কি বিস্ময়ের?"

একেবারে চমকে উঠলেন ভবতোষবাবু। স্ত্রীর হাত থেকে চা নিতে যাচ্ছিলেন, পেয়ালা থেকে চা উপচে পড়ল পিরিচে। বললেন—"খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে!" ভবতোষবাবু বুঝি নিজেই ভূত দেখলেন। তারপর হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—"যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল!"

অশোকের দিদি প্রশ্ন করলেন—"কেন, মাটি কী হল?"

"মাটি নয়?"—ভবতোষবাবু একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন—"পাছে বেশী লোক জানাজানি হয় সেই ভয়েই ত' টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।"

অশোকের কপালে একটু কুঁচকে উঠল—"কেন? বেশী লোক জানাজানি হলে মুস্কিলটা কী?"

এতক্ষণ পরে কুন্থ কথা বলল—"ভারি গোয়েন্দা হয়েছিস! মুস্কিলটা কি তাও বুঝিয়ে দিতে হবে? তুই যদি আজ পাগল হয়ে যাস আর সবাই যদি তা জেনে ফেলে তা হলে তোর দুর্নাম হবে না? মক্কেলের দুর্নামটা মুস্কিলের নয়?"—খুব মাতব্বরী চালে বলল কুন্থ এবং অশোককে বুদ্ধিতে পরাস্ত করার বীরদর্পে একবার দিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

"না হে না!" ভবতোষবাবু যেন এককথায় কুন্থর সমস্ত উৎসাহ দুমড়ে দিলেন—"ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসল কথা হল আইনের একটা হাঙ্গামা: প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে একথা সর্ব্বত্র প্রমাণিত হলে ওই বিরাট সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। কেননা, সম্পত্তিটা তাঁর কাকা উদয়চন্দ্র তাঁকে উইল করে দিয়ে গেছেন এবং উইলে এই একটিমাত্র সর্ত্ত।"

"এ আবার কোন ধরণের উইল?" দিদি বললেন।

করে লোকটা বলতে সুরু করল, "মানে আপনার দিদিমার দিদিমার দিদিমা যে কামরূপ কামাক্ষায় যাদুমন্ত্র শিখেছিলেন তা ত' জানিই। শুনেছি সে সব মন্ত্রতন্ত্রর কিছু আপনাদের বংশে এখনো আছে। আমায় যদি হালকা হবার একটা ব্যবস্থা করে দেন! এই লাশ টেনে-টেনে আর ত পারি নে!" কারুর দিদিমার দিদিমার দিদিমা যে কামাক্ষার ডাইনী ছিলেন এ কথা শুনতে কার ভালো লাগে? বিশেষত, আমি সত্যি জানি আমার দিদিমার দিদিমার দিদিমা ডাইনী ছিলেন না; আসলে কোন সিদ্ধ সন্ন্যেসীর চেলা ছিলেন বলে একটা চলতি কথা আছে। এখনো বাড়ির কাঠের সিন্ধুকটায় পাকানো-পাকানো হলদে-হলদে কাগজ রয়েছে। স্বচক্ষে দেখেছি! অবশ্য মন্তর-টন্তর বিশ্বাস করিনে। তবে কিছু একটা আছে নিশ্চয়ই।

একটু ভাবলুম। মনে হ'ল লোকটার হাত থেকে নিস্তার পাবার একটা উপায় আছে। বল্লুম., "বাড়ি ফিরে দেখব সত্যি কিছু আছে কি না। কিন্তু যদি কিছু পাই তা হলে শুধু একটা সর্তে আপনাকে দিতে পারি। আপনি প্রতিজ্ঞা করবেন যে জীবনে আমার সঙ্গে আর ঘনিষ্ঠতা করবার চেষ্টা করবেন না?"

"মানে পালেপার্বণে একটু গল্পগুজব?" লোকটা ক্ষীণস্বরে বল্ল।

মনকে শক্ত করবার চেষ্টা করলুম, "একটা কথাও নয়। জীবনে নয়।"

"বেশ, তাই সই।" লোকটা অগত্যা বল্লে।

বাড়ি ফিরে পুরোনো কাঠের সিন্দুক খুললুম। হলদে কাগজে বাদামি লেখার কুণ্ডলি উটকে-পাটকে সত্যিই বের করা গেল—মন্তর নয়, ওষুধ। সেকালের যোগীরা নাকি এই ওষুধের জোরে শরীর একেবারে হালকা করে ফেলতে পারতেন। পারার গুলিটুলি দিয়ে কেমন করে যেন ওষুধটা তৈরি করতে হয়। যাই হোক, লোকটার হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় ওষুধের ফরমূলাটা টুকে ফেল্লাম এবং পরের দিন আপিসে নিয়ে গেলাম।

"এনেছেন?" একগাল হেসে লোকটা আপ্যায়িত করল।

"এনেছি। কিন্তু প্রতিজ্ঞা মনে আছে?"

"হেঃ হেঃ"—লোকটা বল্ল, "আর বাক্যালাপ নয়? এই ত'?"

"হুঁ।"

"খুব মনে আছ। খুব।"

বের করে দিলুম।

পরের দিন লোকটাকে আপিসে দেখলুম না। তার পরের দিনও না। হালকা হতে গিয়ে একেবারে স্বর্গে গেল না কি? একটু অস্বস্তি হতে লাগল।

পরের দিন আপিসে এলো, লোকটা নয়, তার সেই ক্ষুদে চাকরটা যে রোজ খাবার আনতো। হাউমাউ করে আমাকে অনেক কথা বল্লে: তার সারমর্ম—বাবু পাগল হয়ে গেছে। সারাদিন সারারাত নাকি ঘর বন্ধ করে রয়েছে, মাঝেমাঝে চীৎকার করে বলছে খাবার করে দোরের কাছে রেখে যেতে। চাকর অবশ্যই প্রভুভক্ত, প্রচুর খাবার সাজিয়ে রাখছে দোরের কাছে। কিন্তু বাবু দোর খুলছেও না, খাচ্ছেও না—শুধু ভেতর থেকে চীৎকার করছে! একবার গিয়ে দেখা করতে হবে।

অনিচ্ছে সত্ত্বেও চাকরের পেছু-পেছু গেলুম। চাকর ঘরটা দেখিয়ে দিল। দরজায় ধাক্কা দিলুম। ভেতর থেকে চীৎকার এলো, "কে?"

"আমি হরেন।"

"সঙ্গে কে?"

"আপনার চাকর।"

"ওকে বাইরে যেতে বলুন।"

চাকর নির্দেশ পেয়ে বাইরে চলে গেল। ভেতর থেকে আওয়াজ এল, "জোরে ধাক্কা দিন। হালকা ছিটকিনি, ভেঙে যাবে।"

"ভাঙার কী দরকার? খুলে দিন না।"

"খোলবার উপায় নেই, ভাঙতেই হবে।"

অগত্যা ধাক্কা মেরে ছিটকিনি ভাঙতে হল। তারপর সত্যিই আমার চক্ষু স্থির! ঘরে কেউ নেই! গা-টা কি রকম ছমছম করতে লাগল। এইমাত্র গলা শুনলুম আর ঘর ফাঁকা! তা হলে ওষুধ খেয়ে মরে ভুতটুত হয়েছে না কি? তবু সাহস সঞ্চয় করে বল্লুম, "কোথায় আপনি।"

"এই যে!" শব্দটা যেন ঠিক মাথার উপর থেকে এল। সেদিকে চাইলুম। অবাক কাণ্ড! লোকটা কড়িকাঠে মাথা ঠেকিয়ে আকাশে ঝুলছে!

"ব্যাপারটা বুঝছেন?" লোকটা মাথার উপর থেকে বল্ল। আস্তে-আস্তে অবশ্য বুঝছিলুম। নিশ্চয়ই দিদিমার ফরমূলা অনুসারে নকুলবাবুর শরীর হালকা হয়ে গ্যাসের বেলুনের মতো হয়ে গেছে!

"চাইলুম রোগা হবার ওষুধ, করে দিলেন হালকা বলুন! এখন একটা বিহিত করুন।" লোকটা আবার ল্ল।

গলার স্বর শুনে পিত্তি চটে গেল, যেন আমারই অপরাধ! বল্লুম, "বিহিত আবার কি মশাই? হালকা বার ওষুধ চেয়েছিলেন, দিয়েছি। রোগা হবার ওষুধ ত ননি। আর আপনার সঙ্গে না চুক্তি ছিল ওষুধ পেলে র আমায় ঘাঁটাবেন না? আপনার কথার দাম নেই। মি চল্লুম।"

বেরিয়ে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছি। এমন সময় থায় টপটপ করে গরম জল পড়তে লাগল—

চেয়ে দেখি লোকটা ভেউ-ভেউ করে কাঁদছে। "তিন ন কিছু খেতে পাইনি, এক আপনার ওই আষ্টেলা ধটা ছাড়া। আপনার শরীরে কি মায়াদয়া বলে কোনো নিস নেই।" ফোঁপাতে-ফোঁপাতে সে বলে চলল, "না ভারি হবার ওষুধ নাই বল্লেন, কিন্তু খাবার দাবার ত টা ব্যবস্থা করা উচিত!"

করুণা হল। একটু চিন্তাও করলুম। মাথায় হঠাৎ একটা বুদ্ধি এল। বল্লুম, "হাত দিয়ে কড়িকাঠ ধরে আস্তে আস্তে ওই টালীটার দিকে এগুন। ওখানে যে সব মোটা মোটা বস্তা আছে তাই একটা আঁকড়ে ধরুন—সেটার ভারে আপনিও নেবে আসবেন।"

আমার নির্দেশ অনুশরণ করে লোকটা নেমে এল। গোগ্রাসে গিলল পর্বত প্রমাণ খাবার, তার চাকর দোরের পাশে ডাঁই করে রেখেছিলো। যতক্ষণ খেলো ততক্ষণ আমি তাকে টিপে ধরে রইলুম, পাছে কড়িকাঠে আবার গিয়ে পৌছয়।

কিন্তু পাকা বন্দোবস্ত ত একটা হওয়া দরকার। অনেক ভাবলুম। লোকটাও প্যানপ্যান করে অনেক কান্নাকাটি করলে। শেষকালে আবার আমার মাথায় একটা বুদ্ধির ঝলক খেলে গেল। বল্লুম, "দেখুন আপনাকে আমি বরাবরের মতো বাঁচিয়ে দিতে পারি। কিন্তু এবার আর প্রতিজ্ঞা ভাঙবেন না?"

"আপনার গোলাম হয়ে থাকব," লোকটা মিউ-মিউ করে বল্লে।

"আমার গোলামের দরকার নেই; তবে আর কখনো আলাপ জমাবার চেষ্টা করবেন না বলুন।"

"কক্ষনো না। নাকে খৎ।"

"বেশ।"

করলুম একটা ব্যবস্থা। দর্জির কাছ থেকে বিরাট একটা ওভারকোট বানালুম—সমস্ত কোটটার মধ্যে পুরু শিষের পাত দিয়ে লাইনিং দেওয়া হল।

এখন কী গ্রীষ্ম কী শীত—নকুলবাবুর গায়ে রাতদিন সেই কোটটা। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলেন, "অসুখ।" অসুখটা যে কি তা আমিই জানি।

তবে লোকটা কথা রেখেছে। আমার সঙ্গে আর কথা বলে না। চোখাচোখি হলে শুধু কটমট করে চায়!

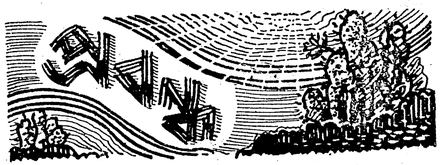

বুদ্ধির মাপ

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আগে ছিলো গায়ের জোরের যুগ ; জোর যার মুল্লুক তার। এখন হয়েছে বুদ্ধির যুগ ; বুদ্ধিঃ যস্য বলং তস্য। তাই আজ লড়াই করতে গিয়ে ভীমের মতো গোব্দা গদা আর ঘুরোতে হয় না, আকাশ থেকে টুকুশ করে ছোট্ট সুইচ টিপে একটি লাগসই বোমা ছাড়লেই কেল্লা ফতে। কিন্তু কথা হল বুদ্ধি জিনিসটাই বা-কী রকম আর কার বুদ্ধি বেশী কার বুদ্ধি কম তাই বা ঠিক করব কেমন করে ? সত্যিই, বুদ্ধি ত' আর মুদির দোকানের ময়দা নয় যে দাঁড়িপাল্লায় চাপিয়ে ওজোন করলেই বোঝা যাবে কতখানি ! মাপব কেমন করে ? চোখে দেখা যায় না, না যায় কানে শোনা, না যায় নাকে শোঁকা, হাত বাড়ালে যায় না ছোঁয়া ! তাহলে ? বুদ্ধি জিনিসটা ঠিক কী রকম ? এ রকম প্রশ্ন করলেই অতিবড় বুদ্ধিমান লোক ঘাবড়ে যায় ; মেপে দেখা ত' দূরের কথা।

পণ্ডিতেরা কিন্তু নাছোড়বান্দা লোক। বুদ্ধি খাটিয়ে ধরে ফেলেছেন বুদ্ধি জিনিসটা আসলে কি ! ও কিছু নয়, মানুষের একটা গুণ—পণ্ডিতেরা বলেন—যেমন গুণ সত্যবাদীতা কিম্বা ফুটবল মাঠে ড্রিব্‌লিং করতে পারা। কিন্তু গুণ বললেই ত' চলে না, বলতে হবে ঠিক কী রকম গুণ ! পণ্ডিতরা পিছ-পা নন, বুঝিয়ে দিয়েছেন "বুদ্ধি" নামের গুণটা ঠিক কী ধরনের।

ধরো, পাড়ার গয়লানী ফোন্তের মা'র রামছাগল। একেবারে নীরেট বোকা। আর ধরো তুমি—তুখোড় বুদ্ধিমান। তা হলে তোমার গুণ থেকে রামছাগলের গুণ বিয়োগ করলেই পড়ে থাকবে বুদ্ধি। সহজ হিসেব ন... কি ? করে ফেলো হিসেবটা। মানে, তোমার স... রামছাগলের তফাৎ কী একবার ভেবে দেখো।

ধরো, রামছাগলটা রোজই কর্তার সামনে খবরে... কাগজ খেতে স্বুরু করে, তারপর ধরা পড়ে, তারপর ম... খায়। পরের দিন কিন্তু আবার কর্তার সামনেই কাগজ... চিবোতে চায় ; আবার মার খায়। আর এদিকে একব... ভাঁড়ার ঘরে কাসুন্দি খেতে গিয়ে ধরা পড়ে পিসিমার কা... ধমক খেয়েছিলে বলে পরের দিন থেকে পা টিপে-টি... লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি কাসুন্দি চেখে আসো। কাগজ খে... ভালো লাগে রামছাগলের, কাসুন্দি খেতে ভালো লা... তোমার ; কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই তুমি ঠেকে শিখে... সামনে আর খাও না। আর রামছাগলটা এমন বোকা... ঠেকেও শেখে না, তাই রোজ কাগজ খেতে গিয়ে মার খ... তা হলে বুদ্ধির একটা লক্ষণ হল ঠেকে শিখতে পা... পণ্ডিতদের গুরুগম্ভীর ভাষায় যাকে বলে অ... অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো। নয় কি ?

তারপর ধরো, বাড়িতে বাবার অনেক বিজ্ঞ... বেড়াতে এসেছেন। তুমি কি তাদের সামনে গি... ছেলেমানুষি করবে না কি ? মোটেই নয়। বুদ্ধি... বলেই তোমার একটা স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞান আ... তাঁদের সামনে তুমিও নিশ্চয়ই বিজ্ঞের মতো মুখ করে... থাকবে ; মাঝে মাঝে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়বে পাছে... টের পেয়ে যায় যে তুমি নেহাৎ ছেলেমানুষ ! কিন্তু ছাগ... কি ছাই সে বুদ্ধি আছে ? বিজ্ঞ লোকের সভার মধ্যে... ছেড়ে দাও—ল্যাজ নাড়িয়ে ব্যা-ব্যা করে বোকামি... করবে। বুদ্ধির দ্বিতীয় লক্ষণ তা হলে স্থান-কাল... জ্ঞান, পণ্ডিতদের ভাষায় যাকে বলে পুরো অব... হৃদয়ঙ্গম করা।

তৃতীয় লক্ষণটাও হাঙ্গামার নয়। ধরো, খেলতে ... লাগে বলেই তুমি ত আর দিনরাত খেলতে চাও না। ... আছে বলে আগাগোড়া সব দিক ভেবেই তুমি কাজ ...

...নো ; তুমি জানো পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় ...লা, এ নইলে শেষ পর্যন্ত ফেল মারতে হয়। রামছাগলও ...দি সবদিক ভেবে, আগাগোড়া হিসেব করে কাজ করতে ...রত তা হলে আর ভাবনা ছিলো না ! অতএব বুদ্ধির ...তীয় লক্ষণ হল আগাগোড়া ভেবে কাজ করতে পারা। ... কি ?

... তা না হয় হল। এ সব লক্ষণ মিলিয়ে না হয় বোঝা ...ল কে বুদ্ধিমান আর কে বুদ্ধিমান নয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, ...র ঘটে ঠিক কতখানি বুদ্ধি তা মাপা যাবে কেমন করে ? ... বুদ্ধি খাটিয়ে পণ্ডিতেরা বুদ্ধি মাপবার একটা উপায়ও ...বিষ্কার করেছেন। উপায়টা শিখে ফেললে তুমিই হিসেব ...রে বলে দিতে পারবে ছোটদারই বা বুদ্ধি কতখানি, ...টি খুকুরই বা বুদ্ধি কতখানি। এ উপায় যিনি প্রথম ...ক মতো আবিষ্কার করেছিলেন তাঁর নাম হল বীনে— ...ল্‌ফ্রেড্ বীনে। ফরাসী ভদ্রলোক, তাই বানানটা ...INET হলেও উচ্চারণ বীনে। বেশীদিনকার লোক ..., যারা গেছেন ১৯১১ সালে—সেই যে বছর মোহনবাগান ...ল্ড পেয়েছিলো !

... ফরাসী সরকার থেকে বীনে-কে বলা হল ছোট ছেলে- ...য়েদের বুদ্ধি মেপে দিতে, তা হলে ইস্কুলে ভরতি করবার ...য় বোঝা যাবে কাকে ঠিক কোন ক্লাসে ভরতি করা ...চিত। অনেক ভেবেচিন্তে বীনে কতকগুলো পরীক্ষা ...ক করলেন। ধরো, বছর আষ্টেক বয়েসের একজন ...ধারণ ছেলের একটা পরীক্ষায় পাশ করা উচিত ; তা ...লে, সেই পরীক্ষায় একজন পাশ করলে বোঝা যাবে তার ...নের বয়স আট বছর। বীনে এই ভাবে দেখে শুনে হিসেব ...রে নানান রকম পরীক্ষার বন্দোবস্ত করলেন। এক ...কটা পরীক্ষায় পাশ করতে পারলে বোঝা যাবে যে ...শ করল তাঁর মনের বয়েস কত। মনের বয়েস কাকে ...লা বুঝছ ? তোমার আসল বয়েস কত ? ধরো চোদ্দ। ...ই বয়েসটাকে বলা যাক কুষ্ঠির বয়েস। কিন্তু বুদ্ধি মাপতে ...য়ে যদি দেখা যায় ১৬ বছর বয়েসের ছেলেদের জন্যে যে পরীক্ষা তা তুমি অনায়াসেই পাশ করে বসলে, তা হলে কী বলব ? তখন ত' মানতেই হবে কুষ্ঠির বয়েস ১৪ হলেও তোমার মনটা ১৬ বছরের ছেলেদের মত। অর্থাৎ তোমার মনের বয়েস ১৬, যদিও কুষ্ঠির বয়েস ১৪। এদিকে কিন্তু "সৎপাত্র" কবিতার গঙ্গারাম, যে উনিশটিবার ম্যাট্রিক দিয়ে তবে ঘায়েল হ'য়েছে, তার বুদ্ধি মাপতে যাও, দেখবে বয়েসে ধাড়ি হলেও চোদ্দ বছর-এর পরীক্ষাও পাশ করতে পারছে না ; তার মানে তার কুষ্ঠির বয়েস চৌত্রিশ-এর কাছ-বরাবর হলেও মনের বয়েস চোদ্দরও কম।

তা হলে আসল বয়েস আর মনের বয়েস সমান হতেও পারে, না হতেও পারে। কিন্তু বুদ্ধি মাপব কেমন করে ? বীনে বললেন মনের বয়েসকে কুষ্ঠির বয়েস দিয়ে ভাগ দাও, বুদ্ধি কতখানি বেরিয়ে যাবে। যে ভাগফল পাওয়া যাবে তার নাম হল "বুদ্ধির ভাগফল," ইংরেজীতে বলে Intelligence Quotient ; কাজের সুবিধের জন্যে ছোট করে বলা হয় IQ.। তা হলে তোমার IQ কত ? মনের বয়েস যদি ১৬ হয় আর আসল বয়েস বা কুষ্ঠির বয়েস যদি ১৪ হয়, তা হলে $\frac{১৬}{১৪}$, অর্থাৎ ১$\frac{২}{১৪}$ বা ১$\frac{১}{৭}$। খুব ভালো বলতে হবে, কেন না সাধারণ বুদ্ধিমান ছেলের IQ. হল ১। গঙ্গারামের কত ? মনের বয়েস যদি ১৩ হয় আর কুষ্ঠির বয়েস যদি হয় ৩৫ তা হলে $\frac{১৩}{৩৫}$; ১-এর চেয়ে ঢের কম, অর্থাৎ যাকে বলে গবেট।

বীনে যে সব পরীক্ষা করে মনের বয়েস ঠিক করতেন তার কতকগুলো নমুনা দেওয়া যাক : আগে মনের বয়েস তারপর তার জন্যে পরীক্ষাটা দেওয়া হল।

৩ মাস : এলোমেলো হাত না নাড়িয়ে হাতটা সোজা মুখের মধ্যে পুরতে পারা।

১ বছর : ঝুমঝুমি পেয়ে বড়রা যেমন নাড়িয়ে শব্দ করে তেমনি শব্দ করা।

২ বছর : চকোলেট-টা মোড়ক শুদ্ধ মুখে না পুরে মোড়ক ছাড়িয়ে মুখে পোরা।

৬ বছর : বাচ্চাকে চারটে মানুষের মুখের ছবি

দেখানো হল, তার মধ্যে কোনোটার নাক নেই কোনোটার চোখ নেই, এই রকম। অন্তত তিনটে ছবির সম্বন্ধে বলতে হবে কোনটার কী নেই।

৮ বছর : বলতে হবে কাঠ আর কয়লার মিল কোন দিক থেকে? বা ওই রকম কটা প্রশ্নের অন্তত দুটোর সঠিক জবাব দিতে হবে।

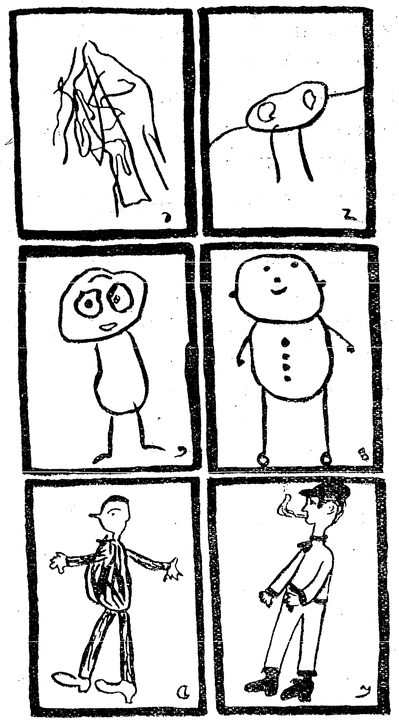

১২ বছর : ১০০টা প্রচলিত শব্দের মধ্যে অন্তত ৪০টার মোটামুটি মানে বলতে হবে।

১৪ বছর : "প্রেসিডেণ্ট-এর সঙ্গে রাজার তফাৎ কি?" —এই রকম প্রশ্নের জবাবে ঠিক ঠিক অন্তত তিনটে পয়েণ্ট বলতে হবে।

মনের বয়েস বের করবার জন্যে এই ত গেল একরকম পরীক্ষা। এগুলো বীনের আবিষ্কার। কিন্তু বীনে ছাড়াও অন্যান্য পণ্ডিতরা আরও নানান রকম পরীক্ষা ঠিক করেছেন। সেগুলোর মধ্যে নামকরা একরকম পরীক্ষাকে বলে Performance Test। যেমন ধরো একটা কাঠের বোর্ডের উপর নানান রকম, নানান মাপের গর্ত। ঠিক সেই সেই মাপের সেই-সেই রকম কতকগুলো কুঁচো কাঠের টুকরো দিয়ে বলা হল প্রত্যেকটা টুকরোকে তার নিজের গর্তে পুরে দিতে। পুরতে কতটুকু সময় যায় দেখে বোঝা যাবে মনের বয়েস কত। হালে দেখা গেছে Performance Test-এর মধ্যে ছবি আঁকার পরীক্ষাটা খুব কাজের। পাশে যে ছবিগুলো দেখছো সেগুলোর থেকে বোঝা যায়: (১) প্রথম ছবিটির শিল্পীর মনের বয়েস তিন বছরেরও কম, (২) দ্বিতীয়টির শিল্পীর মনের বয়েস ৪ বছর, (৩) তৃতীয়টির ৫ বছর, (৪) চতুর্থটির সাড়ে ছ' বছর, (৫) পঞ্চমটির সাড়ে ন বছর, এবং (৬) ষষ্ঠটির ১৬র কম নয়।

এই সব পরীক্ষা করে মনের বয়েস ঠিক করা কঠিন নয় এবং মনের বয়েস পেলে বুদ্ধি কতখানি তা বের করতে মুস্কিল হবে না কেন না মনের বয়েসকে আসল বয়েস দিয়ে ভাগ করলেই বুদ্ধি (IQ) কতটা তা বেরিয়ে যাবে। তবে সাবধান, গুরুজনদের বুদ্ধি ও ভাবে মাপতে যেও না! স্বয়ং বীনে বলেছেন এ ভাবে বড়দের বুদ্ধি মাপা যায় না। বছর ১৬র ছেলেমেয়েদের পর্য্যন্ত চলে মাত্র।

জর্মান যুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে, তাদের নেতারা কেউ কেউ ধরা পড়েছেন, কেউ কেউ নিরুদ্দেশ। এমন কি শত্রুভাব এতটা কমে গেছে যে মিত্রপক্ষকে জর্মানদের সঙ্গে মেলামেশা করবার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

মুসোলিনির জামাই কাউণ্ট চিয়ানো'র মুসোলিনির জন্য দু'বৎসর আগে প্রাণদণ্ড হয়েছিল। কারাগারে লেখা তাঁর স্মৃতিকথা এখন প্রকাশিত হচ্ছে এবং কিছু কিছু ধারাবাহিক ভাবে অমৃতবাজারে বেরোচ্ছে। ইতালী ও জর্মানির গোপন কথা অনেক তাতে লেখা আছে, তবে এটুকু সন্দেহ হয় যে মুসোলিনির দল ওটাকে বিনষ্ট করেনি কেন? ওটা কি প্রকৃত ডায়েরি নয়?

জাপানকে অহরহ বোমাবর্ষণ করে বিধ্বস্ত করা হচ্ছে, শোনা যাচ্ছে যে-কোনও দিন নাকি মার্কিন বাহিনী টোকিও বন্দরে হানা দিয়ে ডাঙায় নামতে পারে। কেবল সকল ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে।

বর্মা থেকে জাপানীরা বিতাড়িত হয়েও কিছুতেই যাচ্ছে না, প্রোমের কাছে সিট্যাং নদীর বাঁকে তারা মহা হাঙ্গামা সুরু করে দিয়েছে। তাদের নাকি ৭০০০ সৈনিক সেখানে একরকম ঘেরাও হয়ে আছে, তারাই এই উপদ্রব করছে।

চীনের প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সুং মস্কো গিয়ে স্টালিন সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে এসেছেন, আবার নাকি চুক্তি সই করাতে যাবেন। অনেকের এই আশা যে ঐ চুক্তি সই হলেই রুসও জাপানের বিরুদ্ধে যোগদান করবে।

—লীলা মজুমদার

এ-মাসের সবচেয়ে বড় খবর আমাদের দেশের নেতাদের মুক্তি। দীর্ঘ কারাবাসের পর মৌলনা আবুল কালাম আজাদ, জওয়াহরলাল নেহেরু, রাজেন্দ্রপ্রাসাদ, ইত্যাদি দেশের প্রধান দেশনায়করা আজ মুক্তি পেয়েছেন। সমস্ত ভারতবর্ষের এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমাদের আনন্দও মিশলো।

সরকারি জেল থেকে বেরিয়েই সরকারের সত্যিকারের নিমন্ত্রণে সিমলাতে সমস্ত নেতাদের যাওয়াও কম আশ্চর্য বড় খবর নয়। সমস্ত দেশবাসী খুব আশা করেছিলো যে বড় লাটসাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার পর সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নেতারা এমন একটি ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ করবেন যাতে ভারতবর্ষে আজকের দিনের নানা অসুবিধে মিলিয়ে যাবে। যে কারণেই হোক সিমলার সভা সফল হোলো না। এটা অত্যন্তই দুঃখের কথা, সন্দেহ নেই।

* * * *

ইয়োরোপের যুদ্ধে হারজিৎ যা হবার তা হয়ে গেছে। তাই এতদিন পরে উভয় পক্ষের অতি গোপন সব কথা-বার্তাও প্রকাশ করা হচ্ছে। ইংরেজরা নাকি ঠিক করে রেখেছিলো যে শত্রুপক্ষ যদি তাদের ঘরের দ্বীপ চড়াও করতে চায় তাহলে আত্মরক্ষার জন্যে জ্বালতে হবে আগুনের বেড়াজাল। আগুনের তিন থাক বেড়া দিয়ে দেশ বাঁচাবার বন্দোবস্ত ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত ছিল: প্রথম থাকের আগুন পুড়িয়ে দিত সমুদ্রের উপর শত্রুর সমস্ত জাহাজ-টাহাজ; দ্বিতীয় থাকের আগুন জ্বালানো হত সমস্ত উপকূলে এবং তৃতীয় দফায় আগুনের স্রোত ঢেলে দেবার বন্দোবস্ত ছিল পাহাড়-টাহাড়ের চুড়োর উপর থেকে। জার্মানরা নিশ্চই এমন কঠিন অগ্নিপরীক্ষা উত্তীর্ণ হতে হিমশিম খেত।

* * * *

লড়াই-এ আগুন নিয়ে নাৎসিরা যে খেলার বন্দোবস্ত করেছিলো তা কিন্তু আরও সাংঘাতিক। খবর পাওয়া গিয়েছে যে জার্মানির ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিকেরা মিলে

একটা অতি সাংঘাতিক গোপন অস্ত্র তৈরি করবার তালে ছিলো: পৃথিবী থেকে হাজার পাঁচেক মাইল উপর এক অদ্ভুত মাচা তৈরি করে, সেই মাচার উপর থেকে বড় বড় আয়না (লম্বায় দু মাইল চওড়ায় দু'মাইল) বাগিয়ে ধরে সূর্যরশ্মিকে যদি টিপ করে ফেলা যায় কোনো দেশের উপর তাহলে সে দেশের আর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না, মুহূর্তে পুড়ে শেষ হয়ে যাবে। নাৎসিদের মৎলব ছিল ঠিক তাই!

*　　*　　*　　*

নাৎসিরা ও ধরণের দাবানল জ্বালিয়ে দেশ-কে দেশ সব নিশ্চিহ্ন করতে না পারলেও অন্যান্য দেশের ক্ষতি করেছে অসামান্য। শোনা যায় স্টালিন ঠিক করেছেন এই সব ক্ষতিপূরণের জন্য জার্মানির কাছ থেকে মিত্রশক্তি ৫,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড আদায় করবে।

টাকার ওই অঙ্কটা দেখে নিশ্চয়ই অনেকে চোখ গোল করে ফেলছো। কিন্তু লড়াই-এর যা লম্বা-চওড়া খরচের ফর্দ তার তুলনায় এ ত কিছুই নয়। টোকিওর ওপর শুধু একবার গিয়ে বোমা ফেলে আসতে মার্কিনরা ১১০,০০০,০০০০ টাকা খরচ করছে। বানানো কথা নয়, দস্তুর মতো খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে।

*　　*　　*　　*

অবশ্য টাকার আর আজকাল দাম কী বলো? সেদিন কাগজে দেখলুম একজন সাঁওতালি কুলি মেয়ে রাঁচির একটা দোকান থেকে মাত্র একটা শাড়ি কিনেছে ৪৫০৲ টাকা দিয়া। সাঁওতালি যদি সাড়ে চারশোয় একটা শাড়ি কিনতে পারে তাহলে মার্কিন কেন একশো দশ কোটি খরচা করে একবার বোমা ফেলবে না? তবে তোমরা অবশ্য বলতে পারো যে রাঁচিতে যা ঘটে তা ত' আর সুস্থ বুদ্ধির লক্ষণ নয়!

*　　*　　*　　*

তবে রাঁচির কাছেই, পাটনায়, এক ভদ্দরলোক সুস্থ ছেড়ে তুখোড় বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। ধুতি-কাপড়-এর কী অসম্ভব দুরবস্থা তাত জানোই। পাটনাতেও কালো-বাজারওয়ালারা ভয়ানক দাম হাঁকছে ধুতির, যেমন আর সর্বত্রই হাঁকছে। অথচ রুমাল পাওয়া যাচ্ছিল একটু সস্তাতেই। ভদ্দরলোকের স্ত্রী চল্লিশটা রুমাল জোড়া দিয়ে একখানা ধুতি বানিয়ে ফেল্লেন; শুনেছি তাঁর সেই রুমালের বংশধর ধুতি কালোবাজারের ধুতির চেয়ে দুটাকা সস্তা পড়ছে।

*　　*　　*　　*

অবশ্য রুমাল দিয়ে ধুতি বানালেও কাপড় যা লাগবার তাই লেগেছে। না লেগেই বা আর উপায় কি? ধুতির ত' আর ট্যাবলেট্ করা যায় না যে একগাদা খাবার হাউমাউ না করে গিলে একটা বড়ি টপ করে গিলে ফেল্লেই কাজ চলবে! এই বড়ি দিয়ে জলযোগের ব্যবস্থায় একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সক্কলকে প্রায় হার মানাতে বসেছেন। সারাদিনের খাওয়া—ফলপাকুড় ভিটামিন প্রভৃতির পুরো ভুরিভোজ—তিনি বলছেন চারটে ছোট বড়ি দিয়েই সেরে নেওয়া যাবে! মন্দ কি? আজকাল খাবার-দাবারের যা হাঙ্গাম!

*　　*　　*　　*

শুধু খাওয়ার ব্যাপারই যে মানুষ সংক্ষেপে সারতে চাইছে তা নয়; সময় নিয়ে কার্পণ্য করতেও কম যাচ্ছে না। বিলেত থেকে এদেশে আসতে বড্ড সময় লাগত। হালে, একজন আকাশের পলটন একখানা উড়োজাহাজ নিয়ে বারো ঘণ্টায় এই সাড়ে চার হাজার মাইল চলে এসেছেন। মাঝে নাকি আবার কাইরোয় মিনিট চল্লিশ দাঁড়িয়ে ভদ্দরলোক পাঁচজনের সঙ্গে গপ্পগাছা করে নিয়েছেন।

*　　*　　*　　*

তবে বিলেত-ফিলেত যাওয়া-আসায় আজকাল আর তেমন বাহাদুরি নেই। লোকে লম্বাচওড়া কথা বেশি বলছে। সেদিন এক ভদ্দরলোক লণ্ডনের একটা টিকিট আপিসে ঢুকে চাঁদে যাবার জন্যে একটা টিকিট কিনতে চাইলেন। আপিসের লোকরা পরস্পরের সঙ্গে আলোচনা

করে ঠিক করল ভদ্দরলোকের জন্যে একটা জায়গা রিজার্ভ রাখার। শোনা যায় ভদ্দরলোকের অবস্থা খুব ভালো এবং এর আগে নানান দেশ তিনি ঘুরেছেন। এ হেন লোককেও চাঁদে পেল?

*　　*　　*　　*

চাঁদে যেতে হলে বেলুনে চেপে যেতে হবে না রকেটে চেপে যেতে হবে ঠিক জানি না। তবে জাপানীরা শুনছি বেলুনে চেপে আরও এক পা বেশী যেতে চাইছে—একেবারে স্বর্গে। শুধু যেতে নয় আরও পাঁচজনকে তারা নিয়ে যেতে চায়। খবর পাওয়া গেছে যে জাপানীরা একরকম বেলুন বের করছে যাতে চেপে জাপান থেকে সমুদ্দুর পেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে আরোহী বেলুনের মধ্যেকার বোমাগুলো ফাটাবে আমেরিকার ঘাড়ে। তাতে অবশ্যই মার্কিনদের মুস্কিল। কিন্তু আরোহী জাপানীও পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হবে। তবে জাপানীরা শুনেছি সখ করেও আত্মহত্যা করতে পারে; নিজের পেটে নিজে ছুরি মারা ত ওদের মধ্যে হামেসাই লেগে আছে!

*　　*　　*　　*

এ সব দেখে ত' বিজ্ঞান জিনিসটার উপরেই ঘেন্না ধরে যাবার কথা। চারদিকেই শুনতে পাই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ মারবার ষড়যন্ত্র চলেছে। কিন্তু বিজ্ঞান জিনিসটার আর দোষ কি বলো? মানুষ তাকে যে ভাবে ব্যবহার করবে সে ব্যবহৃত হবে সেই ভাবেই। এবং মানুষের মঙ্গলের জন্যেও যে বিজ্ঞান কতখানি সাহায্য করতে পারে তার একটা উদাহরণ পাওয়া যায় রাশিয়ায়। শত্রু যদি গায়ে পড়ে আক্রমণ করে তাহলে অবশ্য রাশিয়ানরা বিজ্ঞানের সাহায্যে শত্রুবধ করতে কুণ্ঠিত নয়। কিন্তু বিজ্ঞানের আসল কাজ, রাশিয়ানরা বুঝেছে, জনগনের কল্যাণ। এবং ওদের দেশে বিজ্ঞানচর্চার আসল উদ্দেশ্য সেইটেই। তাই পৃথিবীর যে বৈজ্ঞানিকই মানুষের মঙ্গল চায় তাঁর সঙ্গে রুষ বৈজ্ঞানিক-এর বন্ধুত্ব। কথাটার একটা প্রমাণ ত' পাওয়া গেল হালে মস্কো সহরে। সেদিন ওদের বিজ্ঞান-শিক্ষা-কেন্দ্রের জন্মতিথি গেল এবং সেই উপলক্ষ্যে দুনিয়ার যত সব দিকপাল বৈজ্ঞানিক মস্কো গিয়ে বিজ্ঞানের যেন হাট বসালেন। আমাদের দেশ থেকেও ডক্টর মেঘনাদ সাহা গিয়েছিলেন। ফিরে এসে তিনি ত' রুষ-এর কথায় পঞ্চমুখ। আবার এদিকে, রুষ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের প্রশংসা কম নয়: স্যর সি. ভি. রমণ এবং তাঁর গবেষণা নিয়ে রুষ বিজ্ঞান শিক্ষাকেন্দ্রের সহকারী সম্পাদক দীর্ঘ স্তুতি করেছেন।

*　　*　　*　　*

রাশিয়ার কথা যখন উঠল তখন বলি: সেখানে নাকি ৩০,০০০ বুড়ো আছে যাদের প্রত্যেকের বয়েস ১০০ বছরের বেশি। তাই রাশিয়াকে "বুড়োর দেশ" হয়ত বলতে পারা যেত, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে সেখানে খোকাখুকুর আধিপত্যও কম নয়। তাই এ দেশকে খোকার দেশও বলা চলে। কিন্তু খোকাখুকুর আধিপত্য সম্বন্ধে কথা বলতে হলে আলাদা প্রবন্ধ লিখতে হয়।

তিনটি কবিতা

দিলীপ দে চৌধুরী (১৯৫১)

ষষ্ঠী

ওপাড়ার ষষ্ঠী
নিয়ে এক যষ্টি
কেরামতি করাতে
দুর্ভোগ বরাতে—
তেড়ে এলো মোষটি ॥

আলমারি

এক যে ছিলো আলমারি
বাবুর হোলো চাল-ভারি।
বন্ধ হলে খোলেন না
হাত লাগালে দোলেন যা !
দিলাম তাহার হাল ছাড়ি ॥

কাব্য

লম্বা দেখে লিখেছি এক কাব্য
এরোপ্লেনের মতন তাতে চাপবো !
পড়লে তাহার শ্লোক
ভিরমি যাবে লোক,
কাগজ পেলে ভাবছি সেটা ছাপবো ॥

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

গত সংখ্যায় মঙ্গলগ্রহে যাবার কথা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে চাঁদে যাওয়া নিয়ে বড্ড হৈ-হল্লা পড়ে গেছে। সেদিন কাগজে দেখলুম ইংলণ্ডের একটা টিকিট আপিসে এক ভদ্দর লোক ঢুকে চাঁদে যাবার জন্যে টিকিট চেয়ে বসলেন। খবরটা এবারের চলন্তিকায় পাবে। সেদিন কাগজে খবরটা পড়ে আকাশ পাতাল সব ভাবছি এমন সময় পাড়ার নরহরি সমাদ্দার মশাই এসে উপস্থিত। একটু সেকেলে লোক, গলাবন্ধ কোট পরেন, হাতে বেঁটে মোটা লাঠি থাকে। সেই লাঠি দিয়ে মেঝেয় তাল ঠুকে ঠুকে কথা বলেন। ঘরে ঢুকেই বল্লেন, "দেখেছ ত ভায়া, খবরের কাগজ দেখেছ ? চাঁদে যাবার টিকিট বিক্রী হচ্ছে !"

সবিনয়ে জানালুম খবরটা চোখে পড়েছে। সমাদ্দার মশাই বল্লেন, "সাহেব সুবোদের কথাই আলাদা। ওদের চাঁদে পেয়েছে।" চাঁদে পাওয়াটার ইংরেজী মানে জানো ? পাগল হয়ে যাওয়া ! ইংরেজীতে পাগল (lunatic) কথাটা যে চাঁদ (Luner) থেকেই এসেছে।

"ওহে সত্যিই ওদের চাঁদে পেয়েছে। তা নইলে চাঁদে গিয়ে চাঁদ দেখবার শখ হয় ? ওদের চেয়ে ত বাপু আমার সেজ বৌমার ন' ছেলেটি ঢের বুদ্ধিমান ! মাত্রই বছর দেড়েক বয়েস, চাঁদ দেখবার শখ অবশ্যই আছে কিন্তু তাই বলে চাঁদে বেড়াতে যেতে বায়না ধরে না। কোলে চেপে বলে দাদু চাঁদটা পেড়ে দাও, চাঁদ দেখব !"

সমাদ্দার মশাই-এর নবতম নাতিটির কথা উঠলে রক্ষে থাকে না। গড়গড় করে ঘন্টাখানেক তার বুদ্ধি, তার বিবেচনা শক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনতে হয়। হলও তাই। সমদ্দারমশাই বকবক্ করে নাতির কথা বলে চল্লেন, চাঁদের কথা উচ্ছন্নয় গেল !

আমি কিন্তু বসে বসে অন্য কথা ভাবতে লাগলুম। সত্যি, চাঁদে না গিয়ে চাঁদকে পেড়ে আনা ত' মন্দ কথা নয় ! তোমরা হয়ত শুনেই হেসে উঠবে ; ভাববে যেমন ক্যাব্‌লা সমাদ্দার, তেমনি ক্যাব্‌লা তার নাতি আর তার চেয়ে ক্যাব্‌লা হল তোমাদের সম্পাদক ! কিন্তু সত্যি বলছি, হাসির কথা নয় ! চাঁদ ত ছোট কথা, আকাশশুদ্ধ গ্রহ-নক্ষত্রকে ঘরের মধ্যে পেড়ে এনে দেখা যায় বইকি ! রকেটে চেপে বোঁ-বোঁ করে ঘোরার চেয়ে চেয়ারে বসে

হাতের গোড়ায় এদের ধরে দেখাটা নিশ্চয়ই মন্দ কথা নয় !

কিন্তু দেখব কী করে ? পেড়ে আনা অমনি মুখের কথা কি না !—তোমরা নিশ্চয়ই অধৈর্যভাবে বলে বসবে। সহজ থকা সত্যিই নয়। তবে চেষ্টার অসাধ্য কী বল ? এবারের সম্পাদকীয়তে সেই কথাই আলোচনা করা যাক : কেমন করে আকাশের একঝাঁক তারা, গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র সব কটাকে মানুষ একটা ঘরে পুরে আরাম করে দেখতে পারে !

ব্যাপারটা খুলেই বলি। আকাশের পুরো রহস্য মানুষকে কী ভাবে চোখে দেখানো যায় এ নিয়ে পণ্ডিতদের মাথাব্যথার শেষ নেই। মনে রেখো, চোখে দেখানোর কথা বলছি—ছবি এঁকে বা বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর কথা নয়। কেন না, স্বচক্ষে যদি দেখা যায় ঠিক কী ভাবে সূর্য, চাঁদ, নক্ষত্র, প্রভৃতি তীব্র উজ্জ্বল জিনিষগুলো অন্ধকার মহাশূন্যে দৌড়োদৌড়ি করছে, তা হলে এদের সম্বন্ধে ধারণাটা যে রকম স্পষ্ট হবে সে রকম হাজার ছবি এঁকে হাজার বক্তৃতা দিয়েও স্পষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। বড় বড় টেলিস্কোপ চোখে এঁটেও আকাশের পুরো ব্যাপারটা এক সঙ্গে কেউ দেখতে পায় না। কেন না প্রথমত যেন সূর্যের সঙ্গে আকাশে অন্য তারাটারাদের যেন লুকোচুরি খেলা লেগেই আছে। তাই একজনকে দেখা গেলে অন্যদের আর দেখতে পাওয়া যায় না ; দ্বিতীয়ত, টেলিস্কোপ চোখে দিয়ে যদি একটা তারার দৌড় সত্যি দেখতে চাও তা হলে দিনের পর দিন চুপচাপ বসে থাকলে হয়ত দেখবে তারাটা একটুখানি মাত্র নড়েছে ; এ ভাবে গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির গতির আসল ধারণা করা কঠিন।

তা হলে উপায় ? পণ্ডিতরা প্রথম যে উপায়টা বের করলেন তা একটা কিম্ভূতকিমাকার। একটা মস্ত বড় ঘরের দেওয়ালে মেপে মেপে কতকগুলো ইলেক্‌ট্রিক বাল্‌ব লাগানো হল : একটাকে সূর্যের মতো, একটাকে চাঁদের মতো ইত্যাদি করে। তারপর, একটা খাঁচার মধ্যে একটা লোককে বসিয়ে খাঁচাটা ঘরের মধ্যে এমনভাবে ঘোরানো হতে লাগল যাতে আকাশে সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির ভিড় ঠেলে পৃথিবী ঠিক যেমন পথে এগোয় খাঁচাটাও যেন ইলেক্‌ট্রিক-বালবের সূর্য চন্দ্র প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে ঠিক সেই ভাবে এগুতে থাকে। এ ব্যবস্থায়, পৃথিবীর গতিপথ সম্বন্ধে ধারণা করা অনেক সহজ হলেও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতির গতিপথ সম্বন্ধে মানুষের ধারণা হওয়া কঠিন। তা ছাড়া, ঝামেলাও বড় বেশি। পণ্ডিতেরা তাই আবার টাক চুলকোতে বসলেন : এর চেয়ে ভালো বন্দোবস্ত কী ভাবে সম্ভব ?

যাই বলো, পণ্ডিতদের টাকের তলায় সাধারণত বুদ্ধি গজগজ করে। উপায় একটা বের করতে তাই দেরি হল না। একেবারে হাতের মুঠোয় শুধু চাঁদ কেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে যেন পেড়ে আনবার একটা ব্যবস্থা তাঁরা বের করে ফেলেছেন। এই ব্যবস্থাটার নাম দেওয়া হয়েছে : 'প্ল্যানেটেরিয়ম'। জার্মানিতেই প্রথম এ ব্যবস্থা কাজে খাটানো গেছে ; তারপর অবশ্য আমেরিকাতেও অনেকগুলো প্ল্যানেটেরিয়ম তৈরি হয়েছে।

যেন ভুতুড়ে কাণ্ড ! বড় একটা হল ঘর, তার ছাদটা একটা বাটির ভেতর দিকের মতো গোল। ঘর ভরতি চেয়ার, কেবল হলের একেবারে মাঝখানটায় একটা কিম্ভূতকিমাকার দেখতে জটিল যন্ত্র। ঘরে লোকজন জমা হল ; দরজা-টরজা বন্ধ করে ঘরটা অন্ধকার করে ফেলা হল। তারপর মাঝখানের যন্ত্রটা হল চালিয়ে দেওয়া। অমনি বাটির ভেতর দিকের মতো ঘরের গোল ছাদটার অন্ধকারে ফুটে উঠল এক আকাশ তারা, সূর্য চাঁদ প্রভৃতি আকাশের প্রায় প্রত্যেকে। যেন ভোজবাজি ! শুধু তাই নয়—সেই তারা সূর্য চাঁদ প্রভৃতি সুরু করল যে যার পথে ছুটতে আর ঘরের লোক বসে বসে দেখতে লাগল চাঁদ ঘুরপাক খাচ্ছে পৃথিবীর চারপাশে, পৃথিবী আবার তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে ঘুরছে সূর্যের চারপাশে ; মঙ্গলগ্রহ শনিগ্রহ তাদের উপগ্রহ নিয়ে চলেছে যে-যার পথে ; অনেক দূরে কোথায় কোন তারা আর একটা তারাকে যেন তাড়া করেছে—ইত্যাদি আকাশের প্রায় সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে

চলেছে চোখের সামনে ঘরের মধ্যেকার নকল আকাশে! সাংঘাতিক ব্যাপার!

ম্যাজিক নাকি? ভোজবাজি ঠিক নয়, তবে ব্যাপারটা অনেকটা ম্যাজিকলণ্ঠনের মতোই। মাঝখানে যে জটিল যন্ত্রটার কথা বলছিলুম সেটা ভয়ানক রকম জটিল হলেও মোটামুটি ম্যাজিকলণ্ঠনের মতোই একটা জিনিষ! তার মধ্যে আলো জ্বলছে, তার গায়ে নানান রকম ফুটো, নানান রকম ইলেক্‌ট্রিক বালব-টালব লাগানো। অনেক অনেক হিসেব করে এইসব ফুটোটুটো করা হয়েছে, এই বালব-টালব লাগানো হয়েছে। যন্ত্রের মধ্যে আলো-টালো জ্বালিয়ে দেবার পর, তার উপরের ফুটোটুটো দিয়ে আলো গিয়ে পড়ে অন্ধকার গোল ছাদের গায়ে, তখন সেগুলোকে মনে হয় অন্ধকার আকাশে যেন গ্রহ-তারা-রবি! আর সেই যন্তরের ওপরের খোলোসটা এমন জটিল ভাবে ঘুরতে থাকে যে তার ফুটো দিয়ে বেরুনো গ্রহ-তারা-রবি ছাদের আকাশে ঠিক সেই ভাবে ঘুরতে থাকে যে ভাবে ঘোরে আসল তারা, আসল সূর্য প্রভৃতি। কিন্তু এত নিখুঁত হিসেব-পত্তর এই নিখুঁত যন্তরটার যে এই সব নকল তারা প্রভৃতির হালচাল একেবারে আসল তারা-টারার মতো। শুনেছি প্লানেটেরিয়মে বসে নকল আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে ঠিক মনে হয় সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকেই মানুষ হাতের মুঠোয় পুরে ফেলে খুসিমতো গ্রহনক্ষত্রের ঘোড়-দৌড় দেখছে!

তাই বলছিলুম, চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই! মানুষ ইচ্ছে করলে কী-ই না করতে পারে!

গুণ নিশ্চয়ই করতে পারো। কিন্তু একটা কষে-দেওয়া গুণ-এর কয়েকটা সংখ্যা হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করতে পারো? চেষ্টা করে দেখো। নিচের কষে-দেওয়া গুণটায় মাঝে-মাঝে * চিহ্ন দেখবে, সেগুলোই হারিয়ে যাওয়া সংখ্যা—খুঁজে বের করতে হবে।

```
 ৩*১*
  ২*৫
-----
 ১*৭*
২*০*
*৩*
-----
৮*৬*৫
```

ধাঁধার উত্তর

গাড়ির নম্বরগুলো যথাক্রমে: ২৩৪৫, ৫৪৩২, ৪৫২৩।

উত্তরদাতাদের নাম

যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), জানকীকান্ত পাল (২৪৫৩), দীপালি ঘোষ (২১৮৫), শচীন ভৌমিক (২৪৩৮), অলকা দত্ত (১৬৯৯), অমর ভঞ্জ (২৪৮৭), গোপাল ভট্টাচার্য (২৪০৭), অজিতকুমার মণ্ডল (২৪৭৯) সব্যসাচী ঘোষদস্তিদার (২২২১), সুকুমার সাহা (২৪৯২). নির্মল গুহ খোকন সলিল গাঙ্গুলি (২০৯৪), দেবেন্দ্রনাথ দত্ত (২৫১৪), জগদীশচন্দ্র ইন্দ্র (২৪৬১), সৈয়দ নূরুল আলম (২০৬৬), দেবব্রত ও শোভনা মজুমদার (১৯১৫), অপূর্বকুমার সাহা (২৪৯৭), সুধীরকৃষ্ণ ও বিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় (২২৭৮), শৈলেন্দ্রকুমার সরকার (২২২৬), সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (২৪২১), সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), কৃষ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় (২৪১৪), কালিদাস বিশ্বাস (২৪৯১), দেবপ্রসাদ ঘোষ (২২৭৫), রেণুকা বিশ্বাস (১৬৬২), রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী (২৫১৩)।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

[দশম বর্ষ, পঞ্চম সংখ্যা : ভাদ্র, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

দিক

কয় দিক আছে? দশ দিক। তবু
জবাব হল না ঠিক।
এক দিক শুধু আছে, তার নাম
তোমার দেশের দিক।

দেশ

যখন যেটুকু করো
ছোট কাজ কিংবা বড়ো
দেখো কোথা শেষ,
বহু লোক বহু চায়,
দেখো যেন পঁহুছায়
যেথা তব দেশ।

লেখা

আকাশ লিখিছে লেখা রৌদ্রে পুড়ি আর জলে ভিজি
তুল্যমূল্য আমাদেরো এই সব তুচ্ছ হিজিবিজি।

সিংহ-শাবকের শিক্ষা

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বিরাট বিশাল অরণ্য-রাজ্য। এ রাজ্যের রাজা দীর্ঘকেশর সিংহ। সিংহের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—বাঘ-ভালুক-হাতী—সকলেই রাজাকে মানে দেবতার মতো। শেয়াল মন্ত্রী ...পশুরাজ তার দাম বোঝে—তাই শেয়াল-মন্ত্রীকে শসা-কাঁকুড় চুরি করবার জন্য লোকালয়ে ছিঁচ্‌কে-চোরের মতো ঘুরতে হয় না! রাজ্যে শান্তি আছে, কিন্তু সুখ নেই।

তার কারণ পশুরাজ সিংহের শাবক নেই। বংশ লোপ! পশুরাজ মারা গেলে তার সিংহাসনে বসে' এ বিশাল রাজ্য শাসন করবে কে?

সিংহিনী এক-মনে জপ-তপ করে, হিংসা ভুলে গেছে, নিরামিষ খায়—ব্রহ্মা ঠাকুরের পূজা করে। রাজ-পুরোহিত বলদের পরামর্শে যাগযজ্ঞ হয় নিত্য শাবকের কামনায়!

অবশেষে ব্রহ্মা-ঠাকুর কৃপা করলেন। সিংহের শাবক হলো...বেশ হৃষ্টপুষ্ট শাবক! অরণ্য-রাজ্য জুড়ে মহোৎসবের ব্যবস্থা হলো। হাতী-গণ্ডার থেকে সুরু করে' ছুঁচো-ইঁদুর-গোসাপ পর্য্যন্ত রাজপুরীতে এসে চর্ব্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়র সদ্ব্যবহার করে' গেল।

দিনে দিনে সিংহ-শাবক বাড়তে লাগলো বয়সে শশিকলার মতো। ক্রমে তার বয়স হলো এক-বছর। সিংহ-শাবক তো মানুষের সন্তান নয় যে এক-বছর বয়সে হামাগুড়ি দেবে...তার হাতে-খড়ির সম্বন্ধে মা-বাপের মনে কোনো চিন্তা থাকবে না! পশুরাজের মন অস্থির হলো শাবকের শিক্ষা-ভার দেওয়া যায় কার হাতে!

পশুরাজ সভা আহ্বান করলো,—মন্ত্রী এবং অমাত্য-বর্গের সঙ্গে পরামর্শ করবে বলে'। রাজার আহ্বানে অরণ্যের সব পশু এসে জম্‌কে সভায় বসলো!

মহারাজ বললে—তোমাদের সঙ্গে আজ আমার বিশেষ পরামর্শ আছে। যুবরাজের বয়স হলো এক-বছর—তার শিক্ষার ব্যবস্থা দরকার।

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—শাবককে আরো দুদিন হাসতে-খেলতে দিন, পশুরাজ...এরি মধ্যে কাঁধে জোয়াল দেবেন!

পশুরাজ বললে—না, না, তুমি বোঝোনা মন্ত্রী: নর-লোকের সঙ্গে পশুরাজের পরিচয় ভয়ানক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠছে! মানুষের সর্ব্বগ্রাসী লোভ দিনে-দিনে কি-রকম বাড়ছে, খবরের কাগজে সে-খবর পড়ছো তো! এত-বড় যুদ্ধ, তার উপর বাঙলা দেশে অমন দুর্ভিক্ষ—লাখে-লাখে মানুষ ম'লো! তবু লোকালয় একেবারে লোকের ভিড়ে গিস্‌গিস্ করছে! মানুষ চাল পায় না খেতে...কাপড় পায় না পরতে—এত বেশী তাদের সংখ্যা! তার উপর আভাস যা পাচ্ছি, যুদ্ধ থামলে মানুষ বন-জঙ্গল আর কোথাও রাখবে না...কেটে সহর বানাবে—তখন আমাদের জীবনে দারুণ সমস্যা দেখা দেবে! কাজেই যুবরাজের শিক্ষা-সম্বন্ধে আমি একটি-দিন বিলম্ব করতে চাই না। যত-শীঘ্র সম্ভব শিক্ষা সেরে যুবরাজের বুদ্ধি পাকানো দরকার। মানুষের সঙ্গে আমাদের দারুণ বিরোধ বাধবে—দু'দিন পরে। অরণ্য-রাজ্য আর পশু-জীবন—ও দুটিকে রক্ষা করবার মতো যুবরাজের শিক্ষা চাই। পলিটিক্স...দেশাত্মবোধ...বুঝলে মন্ত্রী!

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—বেশ, কিন্তু বয়স আর-একটু বাড়লে শিক্ষার ব্যবস্থা করেন যদি?

পশুরাজ বললো—তোমার আপত্তির কারণ?

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—যুবরাজ এখনো তরল-মতি কি না। জানেন না পশুরাজ, রাজ্য চিন্তার গুরুত্ব আপনার কেশরে—নরলোকের একটা খপর হয়তো রাখেন না!

—কি খপর?

—সেখানে তরল-মতি বালক-বালিকাদের মস্তিষ্ক খাবার জন্য একদল বয়স্ক ধূর্ত্ত মানুষ ছোটদের মাসিক-পত্রিকার ফাঁদ ফেঁদে তাদের নাম ছাপিয়ে দেবার লোভে ন্যাকা বানিয়ে তুলছে: আমার ভয় হয় বর্ণ-পরিচয় হবা মাত্র এখানে ঐ ছুঁচো-মশায় যে-রকম গূঢ়-কৌশলজ্ঞ, উনি যদি তেমনি ছোটদের মাসিক-পত্রিকার আবরণে...

বাধা দিয়ে পশুরাজ বললো—তোমার কথা স্পষ্ট করে বলো মন্ত্রী...আমি হেঁয়ালি বুঝি না!

শেয়াল-মন্ত্রী বললে—আজ্ঞে, ছোটদের মাসিক-পত্রিকা খুবই সাধু-প্রচেষ্টা, মানি। তাতে সন্দেহ থাকতে পারে না, থাকবার কথা নয়! জানেন তো, ধূর্ত্তের দল প্রকাণ্ড গহ্বর রচনা করে' তার উপর গাছের ডালপালা চাপিয়ে গহ্বর বুজিয়ে রাখে। ডালপালা ভালো জিনিষ, কিন্তু সে ডালপালা যদি গহ্বরের উপর ফাঁদের কাজ করে, তাহলে তা বর্জ্জনীয়! তেমনি ছোটদের মাসিক পত্রিকা ভালো জিনিষ—কিন্তু তার তলায় যদি মামা, জ্যাঠা, খুড়ো, পিশে-মেশো বা মাসি দিদি-পিশি রূপী গহ্বর থাকে, তাহলে ঐ মাসিক-পত্রিকার ডালপালায় বসলে গহ্বরের মধ্যে পড়ে তরল-মতি ছেলেমেয়ের মস্তিষ্ক-নাশ সুনিশ্চিত!

—তার মানে?

সকল পশুর চোখ ঔৎসুক্যে ঝক্‌ঝক্ করে উঠলো!

শেয়াল-মন্ত্রী বললো—এই সব মাসিক পত্রিকার একটি কোণে পাঠক-পাঠিকাদের আত্তিশো করে' 'বাবা' 'বাছা' বলে' ডাকা হয়—"আমাকে চিঠি লিখো—নাম ছাপিয়ে দেবো!" নামের মোহ বড় সহজ মোহ নয় পশুরাজ...নামের মোহে লোকালয়ে দেখি, দেনার দায়ে কত লাখপতির ধনদৌলত উবে যাচ্ছে, কত বুদ্ধিমান বেকুব বন্‌ছে—তরল-মতি বালক-বালিকারা নামের মোহে ঐ সব পাতানো মেসো-পিসে খুড়ী-জেঠিকে চিঠি লিখে পাঠায় "মেসো গো তোমার মতো মানুষ আর নেই!" "খুড়ী গো তোমার জন্য ভালো আমসত্ব পাঠাচ্ছি!" "দিদিমণি গো, তুমি বড় লক্ষ্মী" ব্যস্, পাতানো খুড়ো পিসে দিদি মাসির দল সেই সব নাম ছাপাচ্ছে। এতে করে' ছেলেমেয়েদের ক্ষতি হচ্ছে এই যে মানুষের মতো কাজ করলে সত্যকার কায়েমিভাবে যে নাম উজ্জ্বল শুধু মাসিক-পত্রের পাতায় নয়, দেশের বুকে ছাপা হতে পারে, এমন কাজ করবার মতো বুদ্ধি হচ্ছে বিলুপ্ত ...তাই আমার মনে হয়, যুবরাজের বুদ্ধি তরল থাকতে যদি তাঁর শিক্ষা সুরু করে দেন্, তাহলে মাসিক পত্রের ঐ সব পাতানো মাসিপিসির ফাঁদে লোট্‌কে তাঁর সুবুদ্ধির উদয় হবে না, বুদ্ধি ছরকুটে যাবে।

শেয়াল-মন্ত্রীর কথাটা পশুরাজ কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর বললে—ভেবো না মন্ত্রী, কালই আমি অর্ডিনান্স জারি করে' কাগজ কনট্রোল অর্ডার বার করবো—যত দিন না শিক্ষায় যুবরাজ তার তরল বুদ্ধিকে 'সলিড' করে গড়ে তুলতে পারে, ততদিন অরণ্যে মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা-সংখ্যা ভয়ানক রকম কম থাকবে—আর ন্যাকামির লেখা কেউ ছাপাত পাবে না—মাসিকের সব লেখা সেন্সর-বোর্ডের কাছ থেকে মঞ্জুর করানো চাই ছাপাবার আগে...অতএব ভয় নেই...যাক্, বাজে কথায় সভার অনেকখানি সময় নষ্ট হলো।

শেয়াল-মন্ত্রী বললো—মনে খট্‌কা লেগেছিল, পশুরাজ ...মন্ত্রিত্ব বজায় রেখে কিছু বলা চাই—এ ভেবে আমি বলিনি!

পশুরাজ বললো—বুঝেছি: রাজ্যের কল্যাণার্থে তুমি বলেছো। যাক্, এখন পরামর্শ দাও, শাবকের শিক্ষা-ভার কার হাতে নিশ্চিন্তমনে অর্পণ করা যায়?

গণ্ডার বললো—মন্ত্রীমশায়ের সবার চেয়ে বুদ্ধিমান বলে' শুধু পশু-সমাজে নয়, পশুরাজ, নর-সমাজেও প্রসিদ্ধি আছে যখন...

পশুরাজ ভুরু কুঁচকে বললো—হুঁ...শেয়াল খুবই তীক্ষ্ণধী-সম্পন্ন—কিন্তু ভারী মিথ্যাবাদী। পশুরাজের সমানে যে একদিন বসবে, সে যদি মিথ্যাবাদী হয়?

—ছুঁচো...অমন সাবধান সতর্ক, চাল-চলনে অসাধারণ ক্ষিপ্রতা...

পশুরাজ বললো—না। ওর কাণ খুব তীক্ষ্ণ—কিন্তু দৃষ্টি···দূরদৃষ্টি নেই মোটে। তাছাড়া নোংরায় রুচি!

—ব্যাঘ্র?

—শক্তিমান, স্বীকার করি—কিন্তু কূটনীতি বা পলিটিক্স জানে না। শক্তিধর···কূটনীতিতে ওর যদি কিছুমাত্র জ্ঞান থাকতো, তাহলে কি মানুষের হাতে অপমৃত্যু ঘটতে পারে কখনো?

—চিতা?

—গোঁয়ার-গোবিন্দ···

—হাতী?

—আকারের মতো বুদ্ধি হতো যদি, তাহলে এ ভার দেওয়া চলতো। কিন্তু···

—বানর?

—বুদ্ধিহীন···অতি চঞ্চল···

—কুকুর?

—না, বড্ড পা চাটা!

অর্থাৎ পশুরাজ কাকেও যোগ্য মনে করলো না।

সভায় পশুর দল নীরব···কারো কণ্ঠে শব্দ নেই! এত-বড় সমস্যা—মন্ত্রী শেয়াল থেকে সুরু করে' ছুঁচো-টিক্‌টিকি-গিরগিটিটা পর্য্যন্ত সমাধানের উপায় খুঁজে পাচ্ছে না—আশুর্লা ফরফরানি ভুলে গেছে। পশুকুলের দুর্ভাবনা দেখে গভীর্ অরণ্য ক্রমে নিথর নিস্পন্দ হলো!

আকাশে ওদিকে পক্ষীরাজ ঈগল চলেছে উড়ে—এক-ঝাঁক পাখী-পারিষদ সঙ্গে। নীচে অরণ্যে দৃষ্টি পড়লো··· দেখে ঈগল ভাবলো, ব্যাপার কি? কোনো মুনির শাপে অরণ্য আর অরণ্যের পশুরা পাথর হয়ে গেল নাকি? রাজায়-রাজায় বন্ধুত্ব ছিল। কাজেই পক্ষীরাজ নামলো অরণ্যে পশুরাজের খবর নিতে।

ঈগল এসে বললো—ব্যাপার কি বন্ধু? কিসের মন্ত্রণা? অভিযান? না, অরণ্যে মহামারী এলো?

নিশ্বাস ফেলে পশুরাজ সমস্যার কথা জানালো।

শুনে ঈগল বললে—এই কথা! আচ্ছা, আমি নেবো তোমার শাবকের শিক্ষার ভার। তাকে আমি সুশিক্ষা দেবো।

—তুমি! আঃ!

পশুরাজের কেশর দুলে উঠলো আনন্দের আবেগে। নিশ্বাস ফেলে পশুরাজ বললো;—রাজার কাছে রাজার শাবকের শিক্ষা···এই তো চাই! নাহলে মর্য্যাদা-সম্ভ্রম শিখবে কার কাছে?

ঈগল-রাজ বললে—তোমার শাবককে তাহলে আমার কাছে থাকতে হবে···আমার রাজ্যে···দুটি বছর।

সিংহরাজ বললো—নিশ্চয়।

ঈগল-রাজ বললো—এ দু' বছরের মধ্যে 'হলি-ডে এন্‌জয়' করতে শাবকের এই মাটীর অরণ্য-রাজ্যে আসা চলবে না। পারবে তুমি আর বন্ধুনী-সিংহিনী শাবকের বিচ্ছেদ-বেদনা সহ্য করতে?

নিশ্বাস ফেলে সিংহ-রাজ বললো—শাবকের কল্যাণ ভেবে মা-বাপকে এ বিচ্ছেদ-ব্যথা সহ্য করতেই হয়!

—হুঁ···বেশ!

এবং তাই হলো। সিংহ-শাবককে ঈগল-রাজ নিয়ে গেল নিজের পুরীতে। পরের দিন থেকেই শাবকের শিক্ষা সুরু হলো ঈগল-রাজের ব্যবস্থা-মতো।

দিনের পর দিন যায়। একমাস, দু'মাস, তিনমাস কাটলো—পায়রা-দূত এলো অরণ্যে শাবকের সংবাদ নিয়ে। বললো—শিক্ষায় দিনে-দিনে শাবকের বুদ্ধি যা খুলছে সেখানে, পশুরাজ···চমৎকার!

চার মাস, পাঁচ মাস কাটলো—ছ'মাসে পায়রা-দূত আবার এসে জানালো—এমন মেধা পক্ষিরাজ্যে কেউ ত্যাখেনি, পশুরাজ···তাঁর মতির দ্রুত-গতি দেখে পাখীরা অবাক!

ক্রমে এক বছর কাটলো। দূতের মুখে সংবাদ এলো, —শাবক একগাদা মেডেল পেয়েছে···পালকের মেডেল··· পরীক্ষায় সবার উপরে সে! দু'বছর পরে পক্ষি-গেজেট এলো—তাতে ছাপা ফাইনাল-এগজামিনের রেজাল্ট—

ফাইনালে সিংহ-শাবক একেবারে ফার্ষ্ট-ক্লাশ ফার্ষ্ট! টোটাল ১০০০ নম্বরের মধ্যে শাবক পেয়েছে ৯৯৯ নম্বর। এক-নম্বর যে কাটা গেছে সে শুধু পক্ষী-এগজামিনারের জেদে—পক্ষীরাজ্যে এসে পশু-শাবক ফুল-মার্ক নিয়ে যাবে, —বিশেষ, ওর ডানা নেই—শুধু সেই রিষের জন্য! নম্বর দিতে পাখী-এগজামিনারের ঠোঁট চচ্চড় করেছিল।

এবারে গুরুগৃহ-ত্যাগ করে সিংহ-শাবক করবে অরণ্যে প্রত্যাগমন।

পঁ্যাচা আর বাদুড় এলো খবর নিয়ে শাবক ষ্টার্ট করেছেন···পৌঁছবেন সন্ধ্যার পর।

এমনিতেই তো অরণ্যের অতুল-শোভা···তার উপর পশুরা তাকে আরো মনোহর করে' সাজিয়ে তুলেছে। যত গাছের ডালে-ডালে পাতায়-পাতায় রঙীন ফুলের মঞ্জরী··· রাজ্যের যেখানে যত জোনাকি ছিল, ধরে এনে সারা অরণ্যে তাদের ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সবুজ পাতায়-লতায় তারা জলছে সোনালি-চুমকির মতো! ঝিঁঝিঁর দল সানাইয়ে সুর দিয়েছে···গর্দ্দভরা থেকে-থেকে ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে···সকলে উদ্‌গ্রীব···শাবকের পথ চেয়ে আছে···।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলো···শাবকের চতুর্দ্দোলা এসে থামলো রাজপুরীর ফটকে।

পুরীর প্রাঙ্গণে বিরাট সভা। এ্যাম্ফি-থিয়েটারী ছাঁদে সভা গড়া হয়েছে। উঁচু প্ল্যাটফর্ম, সেই প্ল্যাটফর্মের উপর সিংহাসনে বসে সিংহ-রাজ···আশে-পাশে নিম্নাসনে মন্ত্রী, পাত্র, মিত্র, অমাত্য। তারপর অর্দ্ধচন্দ্রাকারে গড়া গ্যালারি ···গ্যালারিতে অরণ্যের যত পশু এসে ভিড় করে বসেছে! এত ভিড় যে একটা পিঁপড়ে দেরী করে এসে কোথাও এতটুকু জায়গা পাচ্ছে না যে দাঁড়াবে, ছোট একটা টিক্‌টিকির বাচ্ছা গোঁয়াতুর্মি করে গ্যালারির মধ্যে ঢুকতে গিয়ে ভিড়ের চাপে যাকে বলে চিঁড়ে-চ্যাপটা!

শাবক এলো সভায়—কপালে রক্ত-চন্দনের টিপ, গলায় হাঁসের ডিমের মালা। শাবক বসলো পশুরাজের পাশে।

পশুরাজ বললো—তোমার খুবই পরিশ্রম হয়েছে বৎস, জানি,—কিন্তু এখানে পাত্রমিত্র-অমাত্য আর বনের যত পশু যে আজ জড়ো হয়েছে তোমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য, তাদের মনে দারুণ কৌতূহল: পাখীর রাজ্য থেকে তুমি কি শিক্ষালাভ করে এসেছো, তা জানবার জন্য। সকলের কৌতূহল তৃপ্ত করে' তারপর তুমি বিশ্রাম করতে যাবে। আমিও জানতে চাই—সে-শিক্ষার গুণে তুমি রাজার সম্ভ্রম রক্ষা করে' রাজার দরাজ ছাতি নিয়ে অরণ্য-রাজ্য পালন করতে পারবে কিনা। আমার বয়স হয়েছে—মৃত্যুর পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই। শিক্ষার গুণে তুমি আমাদের অরণ্য-মাতৃভূমির মর্য্যাদা রক্ষা করতে পারবে জানলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারবো।

সিংহ-শাবক উঠে দাঁড়ালো এবং মাইকের সাম্‌নে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—যে-শিক্ষা আমি পেয়ে এসেছি পশুরাজ, তার তুলনা নেই। সে-শিক্ষার সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হবে, এখানে শিক্ষিত পশু কেউ নেই! তুমিও বিদ্যার ধার ধারো না বাবা। ঈগল-রাজ থেকে সুরু করে টুনটুনি, মায় গঙ্গা-ফড়িং পর্য্যন্ত···সকলের নাড়ীর খবর, হাঁড়ির খবর আমার নখদর্পণে! তাদের মধ্যে কে কি খায়, কখন খায়, কি করে' খায়; কে কি করে', কখন কি অবস্থায় থাকে, সব আমি চোখ বুজে বলে দিতে পারি। পাখীদের মধ্যে কোন্ পাখী কত ডিম পাড়ে, কার ডিমে কত ছানা হয়, নাম করুন, আমি নির্ভুল বলে দেবো। ফড়িং আর প্রজাপতির জন্ম-রহস্য—আপনার সভায় সবচেয়ে বড় পণ্ডিত যে বলীবর্দ্দ, তিনিও জানেন না—আমি জানি। তাছাড়া কি চমৎকার তাদের আচার-ব্যবহার, কি ভালো তাদের খাবার—আর থাকবার জন্য গাছের ডালে যে বাসা তৈরী করে কি তার কারিগরি! আমাদের মতো তারা মাটীতে গর্ত্ত খুঁড়ে সেই গর্ত্তের মধ্যে বাস করে না। আমরা গর্ত্তে বাস করি বলে' পাখীরা আমাদের জানোয়ার বলে' ঠাট্টা করে। তাই আমি স্থির করেছি, আপনি মারা গেলে আমি যেদিন রাজা হবো,

সেইদিনই আমার প্রথম অর্ডিনান্স জারি হবে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সব গর্ত্ত বুজিয়ে পশুর দল গাছের ডালে উঠে বাসা বেঁধে সেই বাসায় গিয়ে বাস করবে—সে-আদেশ যে অমান্য করবে, তার হবে প্রাণদণ্ড। জীব-হিংসা করে দেবো বন্ধ। সব পশুকে ফলমূল খেতে হবে আর অসভ্যের মতো চার পায়ে কেউ চলতে পাবে না—সব উড়তে হবে! দুনিয়াকে ভালো করে দেখতে হলে মাটীর উপর চার পায়ে হামাগুড়ি দিলে চলবে না—উড়তে হবে …ওড়া চাই!

শাবকের কথা শুনে পশুরাজের কেশর রাগে ফেঁপে ফুলে উঠলো: সভার সব পশু লজ্জায় একেবারে অধোবদন —পাখীদের চোখে তারা নেহাৎ তুচ্ছ! জানোয়ার বলে' পাখীরা অবজ্ঞা করে পশুদের!

পশুরাজ একটি নিশ্বাস ফেললো, নিশ্বাস ফেলে বললো —ওরে হতভাগা, দু' দুটো বছর খেটে শুধু পাখী-জাতের নকলনবীশ হলি! পশুবংশের তেজ, পশুর সাহস, শৌর্য্য —এ-সব তোর চোখে পড়লো না! পশুরা আজো সতেজে অরণ্য-রাজ্য রক্ষা করছে মানুষের গ্রাস থেকে,—পশুর বীর্য্য, স্বাধীনতা-সংগ্রাম—এ-সবের কোনো দাম বুঝলি না, মূর্খ! বিজাতীয় পাখীর বুলি শিখে সেই বুলি কপচাতে পারিস বলে' গর্ব্ব বোধ করছিস্! নিজের অরণ্য-মাতৃভূমির অপযশ গাইছিস্! এতকাল ধরে' শুধু ধ্বংসের মন্ত্র শিখলি, পশুকুলের কলঙ্ক তুই!

শেয়াল-মন্ত্রী চুপিচুপি বললো হাতীর কাণে—বিদেশীর হাতে শিক্ষার ভার দিলে এমনিই হয়! বিদেশী-শিক্ষায় মানুষ তার মাতৃভূমিকে ভুলে যায়, স্ব-জাতিকে ভুলে যায় —এ দেখেও পশুরাজ যখন সতর্ক হননি, তখন এর ফলভোগ তাঁকে করতেই হবে।

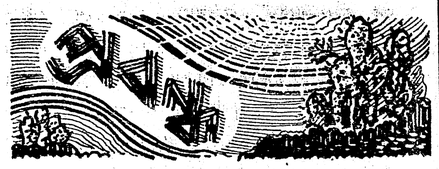

এ্যাটম-বম

স্থধীর গুপ্ত

হালে মার্কিন বৈজ্ঞানিকেরা সমস্ত দুনিয়াকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এক অদ্ভুত বোমা আবিষ্কার করে। সে বোমার নাম "এ্যাটম-বম"। এমন সাংঘাতিক তার প্রলয় শক্তি যে একটি বোমাই একটা পুরো সহরকে ধ্বংশ করে ফেলতে পারে। জাপানের দুটো সহরের উপর এই রকম দুটি বোমা ইতিমধ্যে ছাড়া হয়েছে, তাতেই সমস্ত জাপান ত্রাহি-ত্রাহি করে উঠেছে। এই "এ্যাটম-বম" ব্যাপারটা যে কী তা নিয়ে দেশ-বিদেশের বৈজ্ঞানিকেরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অবশ্য তাঁরা মোটামুটি জানেন ব্যাপারটা কী তবে ঠিক কী ভাবে এ বোমা তৈরী করা হয় তা শুধু মার্কিন বৈজ্ঞানিকরাই বলতে পারেন।

এ্যাটম কাকে বলে জান? বাংলায় যাকে বলে পরমাণু। কিন্তু পরমাণুই বা কী? পণ্ডিতেরা বলেন পরমাণু হল একটা জিনিসের সবচেয়ে ছোট অংশ। ধরো এক টুকরো লোহা ভেঙে দু-টুকরো করলে। আবার ভাঙলে সেই ছোটোছোটো টুকরোর একটাকে। তার থেকে যে আরও ছোটো টুকরো হল তাকে আবার ভাঙলে। এই ভাবে ভাঙতে-ভাঙতে এমন এক লোহার ধূলো পাবে যাকে আর ভাঙবার কথা কখনোও বলতে পারা যাবে না। সেই অতি ছোটো লোহার গুঁড়োটাকে বলা হয় লোহার এ্যাটম। এ্যাটম এত ছোটো যে তাকে চোখে দেখা যায় না।

অনেকদিন পর্যন্ত বৈজ্ঞানিকদের ধারণা ছিল ভাঙার ব্যাপার এই এ্যাটমেই শেষ। মানে এ্যাটম-কে আর ভাঙা যায় না। কিন্তু হালের বৈজ্ঞানিকেরা দেখেছেন যে এ্যাটমকেও ভাঙা যায় যদিও ভেঙে ফেললে পাওয়া যায় অন্য রকম জাত-আলাদা কয়েকটা জিনিস। সেই সব অতি সূক্ষ্ম জিনিসগুলোর মস্ত মস্ত নাম বাৎলেছেন বৈজ্ঞানিকেরা: ইলেকট্রন, পসিট্রন, নিউট্রন, প্রোটন। এদের গুনাবলি আলোচনা করতে গিয়ে দেখা গেল বিজ্ঞান জগতে এরা একেবারে টাটকা তাজা খবর। এর কেউ-কেউ এ্যাটমের মাঝখানে চুপ করে বসে থাকে, আবার কেউ-কেউ তাদের পাক দিচ্ছে বন বন করে। সূর্যের চারপাশে যেমন পৃথিবী ঘুরপাক খায় তেমনি এ্যাটমের মধ্যে প্রোটোনের চারপাশে ঘুরপাক খায় ইলেকট্রন। এবং প্রচণ্ড বেগেই ঘুরপাক খায়।

বৈজ্ঞানিকরা আরও আবিষ্কার করলেন যে একটা পদার্থের সঙ্গে আর একটা পদার্থের আসল তফাৎ এ্যাটমের এই অতিক্ষুদ্র অংশগুলোরই দরুন। যেমন ধরো সোনার সঙ্গে লোহার আসল তফাৎ এই যে সোনার এ্যাটমের মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা লোহার এ্যাটমের ইলেকট্রনের চেয়ে ঢের বেশী। তা হলে, লোহার এ্যাটমের মধ্যে হিসেব করে কিছু বাড়তি ইলেকট্রন ঢুকিয়ে দিতে পারলেই সেটা হয়ে যাবে সোনার এ্যাটম। বৈজ্ঞানিক মহলে সেই চেষ্টা কিছুদিন ধরে চলেছে এবং তাঁরা কিছুটা সফলও হয়েছেন। কিন্তু, এ চেষ্টা করতে গিয়ে আর একটা ভারি মজার ব্যাপার জানতে পারা গেল। একটা এ্যাটমের মধ্যে নতুন ইলেকট্রন ঢোকাতে গেলে বা তার থেকে কিছু ইলেকট্রন বের করে ফেলে দিতে গেলে সে এ্যাটমটাকে ভাঙতে হয়। এবং এ্যাটম ভাঙতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা দেখলেন যে এ্যাটম ভাঙবার সঙ্গে-সঙ্গে একটা বিরাট শক্তি ভগ্ন এ্যাটম থেকে বেরিয়ে পড়ে। শক্তিটা যেন বাঁধা ছিল এ্যাটমের মধ্যে, তাই এ্যাটম ভাঙার সঙ্গে-সঙ্গে মুক্তি পেল—যেন অসম্ভব শক্তিশালী বিরাট এক দৈত্য শিকল ছিঁড়ে এলো বেরিয়ে। এই ব্যাপার নিয়ে যাঁরা প্রথম সব চেয়ে আশ্চর্য আবিষ্কার করেছেন তাঁদের মধ্যে রাদারফোর্ড এবং মাদাম কুরির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দুনিয়ার সবচেয়ে ভারি এ্যাটম হল "ইউরেনিয়ম" বলে এক রকম ধাতুর এ্যাটম। সবচেয়ে হালকা এ্যাটম হল "হিলিয়াম" নামে এক রকম জিনিসের এ্যাটম। রাদারফোর্ড এই ইউরেনিয়ম এ্যাটমের গায়ে হিলিয়ম এ্যাটম ছুঁড়ে মারলেন এবং দেখালেন এই ভাবে ইউরেনিয়ম এ্যাটমকে ভাঙা সম্ভব। তারপর মাদাম কুরি আরও এক পা এগুলেন: ইউরেনিয়ম এ্যাটমকে ভাঙবার জন্যে হিলিয়ম এ্যাটম না ছুঁড়ে একেবারে নিউট্রন ছুঁড়তে স্থরু করলেন। দেখা গেল নিউট্রনের আঘাতে ইউরেনিয়ম এ্যাটম একেবারে দু ভাগে ভেঙে যায় এবং তার মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসে বিরাট একটা শক্তি।

এই বিরাট শক্তিটা কেমন করে ধ্বংশের কাজে লাগান যায়? এই চিন্তা ঢুকল কয়েকজন বৈজ্ঞানিকের মাথায় এবং যে এ্যাটম-বম নিয়ে আজ দুনিয়াময় এত হৈ-চৈ তা ওই চিন্তারই পরিণায়। পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অনেক বৈজ্ঞানিক এই নিয়ে অনেকদিন থেকে মাথা ঘামাচ্ছেন তবে কৃতকার্য প্রথম হলেন কয়েকজন মার্কিন বৈজ্ঞানিক। তাঁদের নাম ওপেন হেইসার, লরেন্স ও টলম্যান। ভাঙা এ্যাটম থেকে বেরিয়ে আসা বিরাট শক্তিকে সত্যিই এঁরা ধ্বংশের কাজে ঠিকমত লাগাতে পেরেছেন। এঁদের মধ্যে লরেন্স কিছুদিন আগেই সাইক্লোট্রোন নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন; এই যন্ত্র দিয়ে এ্যাটম ভাঙা অনেকটা সহজ (কলকাতার সায়েন্স কলেজে হালে একটা এই যন্ত্র কেনা হয়েছে)। কিন্তু সাইক্লোট্রোন দিয়ে এ্যাটম ভাঙা গেলেও এ্যাটমের বোমা তৈরি করা যায় না। তার জন্যে আরও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। আসলে ব্যাপারটা তোমাদের যেমন সহজ করে বললুম অমন সহজ নয়। শুধু ইউরেনিয়ম জোগাড় করতেই হাঁপিয়ে যেতে হয়। সমস্ত পৃথিবীতে খুব সামান্য ইউরেনিয়ম আছে। তারপর নিউট্রন তৈরি করাও চারটিখানি কথা নয়। তারপর নিউট্রন দিয়ে ইউরেনিয়মের এ্যাটম ভেঙে কী

করে মুক্ত শক্তিকে ধ্বংশের কাজে লাগাতে হবে তা' ত' এক রহস্যময় ব্যাপার। মাত্র কয়েকজন মার্কিন পণ্ডিতের এই রহস্য আজ জানা আছে।

কিন্তু হাঙ্গামা যতই হোক, এ্যাটম-বম একবার তৈরি করতে পারলে আর পায় কে? একটা এ্যাটম বোমার শক্তি ২০ হাজার একটনি বোমার সমান; মানে একটা এ্যাটম বোমা ছাড়াও যা আর একটা ৫৪০ হাজার মন ভারি বোমা ছাড়াও তাই। ৫৪০ হাজার মন! ভাবতে পারো? সূর্যের ভিতরটা কী রকম গরম তা ধারণা আছে? শুনতে পাচ্ছি এ্যাটম বোমা যেখানে ফাটে সেখানটা সূর্যের ভিতরের মতোই তেতে ওঠে! জাপানিরা ভাগ্যিস বোমা ফেলতে এসে কলকাতায় একটি এ্যাটম্-বম্ ফেলে যায়নি। ফেলে গেলে তোমাদের "রংমশাল" আপিসেরও চিহ্ন থাকত না আর আজ আমাকেও এই প্রবন্ধ লিখতে হত না!

শ্বেত-চক্র

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

২৭৭ নম্বর বাড়ি

জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র কত টাকা যে আছে কেউ সঠিক জানে না: দশ লাখও হতে পারে, বিশ লাখও হতে পারে, এমন কি কোটি খানেক হওয়াও বিচিত্র নয়। নানা লোক এই ধরণের গুজব রটায়। জয়কৃষ্ণের চেহারায় একটা রুক্ষ ভাব, মুখের উপর গভীর ক্ষতের মতো নানা রেখা, বয়েসের সঙ্গে-সঙ্গে চোখের জ্যোতি কমে এলেও দৃষ্টিতে একটা ধূর্ত চতুর ছায়া অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে।

বর্তমানে জয়কৃষ্ণের তিনটি মিল আছে। কাপড়, গেঞ্জি, মোজা জাতীয় হরেক রকম জিনিস তৈরি হয় আর বাজারে সে-সব মাল যে-রকম চালু তাতে ব্যবসায় ক্রমশই সে যে উন্নতি করে চলেছে ও চলবে তাতে সন্দেহ নেই।

বয়েস তার ষাটের কাছাকাছি। সংসারেও বিশেষ কেউ নেই। কেউ-কেউ বলে বিয়ে সে করেছিলো কিন্তু অনেককাল বৌ মরে গেছে। কেউ-কেউ বলে বিয়ে সে মোটেই করেনি। মোটকথা জয়কৃষ্ণের প্রথম জীবনের কথা ভালো করে কেউই জানে না। লোকটার বন্ধুও নেই আত্মীয়ও নেই যার কাছে কোনো খবর পাওয়া যেতে পারে।

বড়লোক হলেই প্রত্যহ ডাকে রাশিরাশি চিঠিপত্র আসে। জয়কৃষ্ণরও চিঠিপত্র আসার কামাই নেই। রোজ সকালে ব্যবসার কাজে বেরুবার আগে আধঘণ্টা ধরে সে চিঠিগুলো পড়ে আর নিজের প্রতিষ্ঠা দেখে মনেমনে খুসি না হয়ে পারে না। সভাসমিতির নিমন্ত্রণ, বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ, চাঁদা দেবার অনুরোধ ইত্যাদি কত ধরণের চিঠিই না আসে! সত্যিই আজ আর সে যেমন-তেমন একটা লোক নয়! টাকার মতো জিনিস আর কিছু আছে নাকি? টাকাই সব: মানুষকে সম্মান দেয়, প্রতিষ্ঠা দেয়, অসাধারণ করে তোলে!

আজ সকালেও একরাশ চিঠি এসেছে। স্নানাহার সেরে জামাকাপড় বদলে ইজিচেয়ারে পান চিবোতে-চিবোতে জয়কৃষ্ণ একটার পর একটা খাম ছিঁড়ছিলো আর নিতান্ত অলসভাবে পড়া শেষ করে পাশের ছেঁড়া কাগজের ঝুড়িতে ফেলছিলো চিঠিগুলো। অধিকাংশ চিঠির সুরই জানা। সবগুলোর উত্তর দেবার মতো অবসর তার নেই। ব্যবসা-সংক্রান্ত নিতান্ত জরুরি চিঠি না এলে সে বড় একটা উত্তর দেয় না।

সতেরটা চিঠি শেষ করে আঠার'রটা সে টেনে নিলো। বালি রঙের কাগজের খাম, টাইপ করে নাম ঠিকানা লেখা। নিতান্ত তাচ্ছিল্য করেই খামটা সে ছিঁড়লো তারপর ভিতরের নিতান্ত সাধারণ কাগজে টাইপকরা চিঠিটা পড়তে

পড়তে তার মুখচোখের চেহারা একেবারে অন্য রকম হয়ে গেলো।

চিঠিটা বাঙলায় তর্জমা করলে এই রকম দাঁড়ায়:

"প্রিয়বরেষু, হালে ২৭৭ নম্বর শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের বাড়িটা আমি কিনেছি। যতদূর মনে পড়ে বছর পনেরো আগে এই বাড়িটা আপনি ব্যবহার করতেন এবং সেখানে অনেক 'লাভজনক' জিনিস কেনাবেচা করেছেন। বাড়িটা কেনার পর কিছু অদল-বদল করার সময় একতলার পশ্চিম দিকের ঘরের তলায় ছোট্ট একটি ঘর চোখে পড়েছে। এতোদিন সে-ঘরটা কেউ ব্যবহার করেনি, নানা রাবিশে ভরা ছিলো। পরিষ্কার করার সময় আমি এমন কতকগুলি জিনিস আবিষ্কার করেছি যেগুলি দেখলে আপনার কৌতূহলের সীমা থাকবে না। খুব সম্ভব এই আবিষ্কারের কথা পুলিশকে আমি জানাবো। কিন্তু তাদের জানানোর আগে আপনার সঙ্গে এ-বিষয়ে একবার কথা বলা ভালো বলে মনে হোলো। তাই লিখি সোমবার দুপুর ঠিক দুটোর সময় ওই বাড়িতে আপনি যেন একবার আসেন। মজুররা তখন বিশ্রাম নিতে যায়। তখনই আমার আবিষ্কারের কথা আপনাকে জানাবো। যদি না আসেন তা হলে বুঝবো এ-বিষয়ে আপনার কোনো উৎসাহ নেই এবং আমার আবিষ্কারের কথা স্বচ্ছন্দে পুলিশকে জানাতে পারি।

ইতি আনন্দমোহন।"

চিঠিটা পড়তে-পড়তে উত্তেজনায় খড়ির মতো শাদা হয়ে গেলো জয়কৃষ্ণের মুখচোখ। পনেরো বছর আগে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের ২৭৭ নম্বর বাড়ি? কী সর্বনাশ। সেখানে যে অনেক চোরাই মাল সে কেনাবেচা করেছে! কেউ জানে না সে-সব কথা, অন্তত এতোদিন সেকথাই ভেবে এসেছে জয়কৃষ্ণ। আজ অকস্মাৎ এ-কথা রাষ্ট্র হয়ে পড়লে কেলেঙ্কারির শেষ থাকবে না। আর পুলিশ সে খবর পেলে তাকে কি একদিনও সুস্থিরে থাকতে দেবে? পনেরো বছর আগে ওই বাড়ি ছেড়ে টালিগঞ্জের নতুন বাড়িতে সে উঠে এসেছে। আসবার সময় সব রকম কাগজপত্র পুড়িয়ে নষ্ট করতে সে কসুর করেনি। তা হলে এই আনন্দমোহন লোকটা কী আবিষ্কার করতে পারে? আর লোকটাই বা কে? জানলোই বা কী করে পনেরো বছর আগে ওই চোরা কুঠরিতে সে অনেক 'লাভজনক' জিনিস কেনাবেচা করেছে? যাদের কাছ থেকে চোরাই হীরে-জহরৎ সে কিনতো তাদের মধ্যে কেউ নাকি? কিন্তু তারা তো এ ধরণের ভয় দেখিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করার মতো লোক নয়—তার সাহায্যেই তো তারা নিজেদের চোরাই গয়না-পত্তর পাচার করতে পারে। তাকে ধরিয়া দিলে নিজেদের পায়েই তো কুড়ুল মারা হয়!

ইজিচেয়ার ছেড়ে উত্তেজিত হয়ে জয়কৃষ্ণ পায়চারি করতে লাগলো। কে এই আনন্দমোহন? অনেক লোকের ছবি তার মনে একে-একে উঠলো ভেসে। কিন্তু তাদের ভিতর এমন কেউ নেই যার নাম আনন্দমোহন। লোকটা ছদ্মনামে লিখেছে নাকি? কিন্তু বাড়িটা যদি সে কিনেই থাকে তা হলে ছদ্মনামে লেখার কোনো মানে হয় হয় না, সহজেই তার আসল নাম-টাম জানা যেতে পারে।

কোনো কুলকিনারা পেলো না জয়কৃষ্ণ। অনেক সে ভাবলো। শেষে যাওয়াই ঠিক করলো। দেখা যাক ঠিক কী জিনিস সে আবিষ্কার করেছে। সেটার বিনিময়ে নিশ্চয়ই আনন্দমোহন টাকা চাইবে। কত টাকা চাইবে কে জানে! টাকার অঙ্কটা সে মনে মনে আঁচ করতে লাগলো। দু-পাঁচ হাজারে কি লোকটা খুসি হবে? নাকি এই রকম ভয় দেখিয়ে ক্রমাগতই সে টাকা আদায় করে চলবে? ভাবতে ভাবতে কঠিন হয়ে উঠলো তার মুখচোখের চেহারা। জয়কৃষ্ণও একটা যে-সে লোক নয়। নানা শ্রেণীর গুণ্ডার সঙ্গে তার জানাশুনো আছে। লোকটা বেশি বাড়াবাড়ি করলে চিরকালের মতো তাকে ঠাণ্ডা করার উপায় সে বার করবে।

সোমবার দু'টো? মানে আজকেই। আজ আর ব্যবসার কাজে বেরুনো হবে না। না হোক, এ-ব্যাপারটার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়া দরকার। দেরাজ খুলে নিজের ছোট্ট

অটোমেটিকটা সে একবার পরীক্ষা করে নিলো। বয়েস ষাটের কাছাকাছি হলেও এমন শক্তি তার দেহে এখনো আছে যাতে সহজেই দু-চারজনকে কাবু সে করতে পারে। আর আনন্দমোহন তো একা! প্রথমে আনন্দমোহনের কাছে জিনিসটা সে দেখতে চাইবে—জিনিসটা নিশ্চয়ই আর কিছু নয় কয়েকটা কাগজপত্র মাত্র। হয়তো কোনো অসাবধান মুহূর্তে তার পকেট থেকে পড়ে গিয়েছিলো কিংবা ভুলে এসেছিলো ফেলে। সেটা চক্ষের নিমেষে নষ্ট করা শক্ত হবে না। আর তারপর, নষ্ট করে ফেলার পর, আনন্দমোহনকে সে বলবে জাহান্নামে যেতে, তারপর আসবে ফিরে।

খিদিরপুরে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিট। দু'টো বাজতে মিনিট দশেক আগে ট্যাক্সি থেকে জয়কৃষ্ণ নামলো সেই রাস্তার মোড়ে তারপর ভিড় ঠেলে চললো এগিয়ে। নানা ধরণের দোকান, রেস্তরাঁ, গুদম, ইত্যাদির ভিড় এই পথে। সমস্ত দিন ধরে একটা হৈ-হৈ ভাব থাকে। অনেক ব্যস্ত মানুষের আনাগোনা। নানা ধরণের ব্যবসা এখানে চলে। নানা ধরণের মানুষ: জাহাজের খালাসি, ডকের কুলি, চাল-গুদামের মালিক, পাটের কারবারী—এরা তো সব আছেই। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় একটা বাজার। শাক-শব্জী, মাছ-মাংস, আচার-মশলা ইত্যাদি সেখানে কেনাবেচা চলে সমস্তদিন ধরে। সেই বাজার ছাড়িয়ে সস্তার একটি সিনেমা হাউস, নাম 'চাঁদনি টকি'। তারপরের গোটা কয়েক বাড়ি ছাড়ালেই ২৭৭ নম্বর। অনেক দিন পরে এ-পাড়াতে এলেও চিনতে তার কোনো অসুবিধে হোলো না। রাস্তাটার আর উন্নতি হয়নি, পরিবর্তনও বিশেষ চোখে পড়ে না: সেই বিবর্ণ গ্যাস পোস্টগুলো, সেই পনেরো বছর আগেকার ডাস্টবিনগুলো আবর্জনা ভরা। কতকগুলো দোকানের সাইনবোর্ড যা বদল হয়েছে—আর কোনো বদল চোখে পড়ে না। সাইনবোর্ডগুলো দেখতে-দেখতে সে চললো: দার্জিলিঙ টি হাউস, বোস ব্রাদার্স, মনসুন কাফে, কবিরাজ ধনঞ্জয় শর্মা—এই কবিরাজের নামটাই যেন নতুন ঠেকলো। সে যখন থাকতো তখন কোনো কবিরাজ এ পাড়ায় ছিলো বলে মনে পড়ে না। কবিরাজের দোকানটা বন্ধ। বন্ধ দরজার উপর কায়েকটা শুকনো গাছ-গাছড়ার শিকড়-বাকড় ঝোলানো। আরো খানিক পরে 'চাঁদনি-টকি' পেরিয়ে ২৭৭ নম্বর বাড়ির সামনে জয়কৃষ্ণ সামন্ত এসে দাঁড়ালো।

বাইরে থেকে দেখলেই বোঝা যায় বাড়িটা সারানো হচ্ছে। চুণ-সুরকি-ইট সামনে স্তূপাকার। বাইরের কয়েকটা জানালা-দরজায় খাপছাড়া সবুজ রঙ-করা। সদর দরজাটা বন্ধ। আনন্দমোহন কি ইতিমধ্যে পৌঁছেছে? ভিতরে অপেক্ষা করছে নাকি? জয়কৃষ্ণ'র বুকটা অকারণেই ধ্বক-ধ্বক করে উঠলো, কিন্তু মুহূর্তে উত্তেজনা চেপে সদর দরজায় জোরে-জোরে ধাক্কা দিলো।

কোনো উত্তর এলো না। দরজা বন্ধ।

কী করবে ভাবছে এমন সময় পিছন থেকে ছোট্ট ছেলের ডাকে চমকে সে চাইলো।

ছেলেটির বয়েস আট-দশ বছরের বেশি নয়। সে প্রশ্ন করলো, "আপনার নাম কি জয়কেষ্টোবাবু?"

"হুঁ, কেন?"

"বাবা এই চাবিটা দিলেন! আনন্দমোহনবাবু টেলি-ফোনে বাবাকে একটু আগে বলেছেন আপনি এলে চাবিটা যেন দেওয়া হয়। আপনি নাকি বাড়ির মধ্যে কী সব পরীক্ষা করবেন।"

হেসে জয়কৃষ্ণ বললো, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমারই নাম জয়কৃষ্ণ বটে। চাবিটা দাও। কিন্তু তোমার বাবার কাছে চাবিটা গেলো কী করে?"

"আমরা যে সামনের বাড়িতে থাকি। আনন্দমোহনবাবু মিস্ত্রিদের বলে গেছেন তাদের কাজ শেষ হলে চাবিটা যেন বাবার কাছে রেখে যায়। তারা খেতে গেছে। যাবার সময় চাবিটা দিয়ে গেলো। আবার ফিরে এসে চাবিটা নেবে। আপনার কাজ হয়ে গেলে আবার চাবিটা ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন।"

ছেলেটি চলে যাবার পর জয়কৃষ্ণ দরজা খুলে ভিতরে ঢুকলো। কিন্তু আনন্দমোহন লোকটা কী শয়তান! বাড়ির ভিতরে জয়কৃষ্ণ যাতে তার কোনো ক্ষতি করে নিঃশব্দে বেরিয়ে যেতে না পারে তার জন্যে কেমন সহজ উপায় ঠিক করেছে! ছেলেটা তো দেখলোই বাড়ির ভিতরে সে ঢুকেছে, ছেলেটার বাবাও সে-কথা এখনি জানবে। ফলে তার অটোমেটিকটা কাজে লাগাবার কোনো সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। বুদ্ধির খেলায় তাকে হারাতে হবে। বুদ্ধির খেলায় তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন লোক খুব বেশি আছে বলে জয়কৃষ্ণ জানে না।

ভিতরে এসেই জয়কৃষ্ণর মনে হোলো একবার সেই চোরা কুঠরিটা ঘুরে এলে কেমন হয়। সেখান থেকে কী ধরণের জিনিস আনন্দমোহন পেয়েছে, আরো কোনো জিনিস পড়ে আছে কিনা হয়তো জানা যেতে পারে। কিন্তু আনন্দমোহন আচমকা যেন ভিতরে ঢুকতে না পারে! জয়কৃষ্ণ তাই ভিতর থেকে দরজাটা ভালো করে বন্ধ করে দিলো। তারপর খানিকটা সুস্থির হয়ে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফেলতে-ফেলতে চললো এগিয়ে। সত্যিই বাড়িটা সারানো হচ্ছে। দেয়ালে নানা নতুন পলেস্তরার ছাপ, নতুন ছিটকি-কড়া ঝকঝক করছে, ইলেক্ট্রিকের তারগুলোও নতুন, কিন্তু এখনো বাল্ব্ লাগানো হয়নি।

চারিদিক বন্ধ থাকায় ভিতরটা আলো-অন্ধকারে ভরা। স্পষ্ট কিছুই চোখে পড়ে না। দেশলাই জ্বালতে-জ্বালতে জয়কৃষ্ণ চললো এগিয়ে। সরু বারান্দাটা পেরিয়েই সেই মাটির তলার চোরকুঠরির ঘরটা। ঘরের সামনের দরজাটা ছোটো। দরজাটা খুললেই কাঠের একটা সিঁড়ি পড়ে। সেই সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলেই চোরাকুঠরির মেঝেয় পৌঁছনো যায়। অনেক বছর পরে এলেও জয়কৃষ্ণ'র স্পষ্ট সব কথা মনে আছে।

সেখানে পৌঁছে আর একবার চারিদিক ভালো করে দেখে নিলো জয়কৃষ্ণ তারপর ঠেলা দিয়ে খুললো সেই দরজাটা। দরজাটা স্প্রিঙের, ছেড়ে দিলে আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে যায়। অনেকদিন ব্যবহার না হওয়ায় স্প্রিঙটায় নিশ্চয়ই মরচে পড়েছে। খুলতেই দরজাটা একটা কিচকিচ শব্দ করে উঠলো।

নতুন একটা দেশলাই-এর কাঠি জ্বালিয়ে ভিতরে ঢুকলো জয়কৃষ্ণ। স্প্রিঙের দরজা আপনা থেকেই হোলো বন্ধ। তারপর কাঠের সিঁড়ি দিয়ে সাবধানে নামলো নিচে। এখানেও ইলেক্ট্রিক মিস্ত্রিরা কাজ করেছে—তারগুলো নতুন, সুইচটাও পালটানো হয়েছে। ছাতের দিকে চেয়ে জয়কৃষ্ণ দেখলো: আরে একটা নতুন বাল্ব্ও লাগানো রয়েছে যে! দেশলাই-এর কাঠিটা পুড়তে-পুড়তে তার আঙুলের কাছে আগুনটা প্রায় পৌঁচেছে। সেটা ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে হাত বাড়িয়ে দেয়ালের গায়ের সুইচটা সে ছুঁলো তারপর খুট করে জ্বাললো আলো।

কিন্তু আলো জ্বললো না। দুম করে হোলো একটি শব্দ আর মাথার উপরকার বাল্ব্টা থেকে এক মুহূর্তের জন্যে যেন বিদ্যুৎ চমকে উঠে সমস্ত ঘরটা আবার গেলো অন্ধকারে ঢেকে।

দারুণ ভয় পেয়ে এক লাফে জয়কৃষ্ণ দেয়ালের কাছে সরে এলো। ঘরের মধ্যে লুকিয়ে থেকে কেউ কি তাকে টিপ করে রিভলভার ছুঁড়লো? পর মুহূর্তেই মনে হোলো রিভলভারের শব্দ এটা নয়, তার চেয়ে ঢের মৃদু এই আওয়াজ। তবু উত্তেজনা তার কমেনি। হাত দুটো কাঁপছে। পকেট থেকে দেশলাই বার করে তিন চারটে কাঠি নষ্ট করে সে আগুন জ্বাললো। সেই আলোয় উপরে চেয়ে দেখলো বাল্ব্টা ফেটে গেছে আর ভিতর দিয়ে কী রকম সাদা-সাদা ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আর একবার চাইলো সে সুইচটার দিকে। কিন্তু সেখানে গোল একটা কী জিনিস সুতো দিয়ে ঝোলানো রয়েছে? অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে কাছে গিয়ে ভালো করে সে দেখলো: শাদা পিজ্-বোর্ডের গোল একটি চাকৃতি। তার উপর লাল কালিতে শুধু লেখা রয়েছে 'এক'।

জয়কৃষ্ণ সেটা হাতে নিয়ে বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলো। কিছুই বুঝতে পারলো না। কেউ তার সঙ্গে রসিকতা করলো নাকি? হাতের কাঠিটা শেষ হয়ে যাওয়ায় আবার ঘরটা অন্ধকারে ঢেকে গেলো। বাইরের পথ দিয়ে বড় একটা লরি গেলো চলে। কিন্তু নিশ্বেস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে কেন? ওটা কিসের তীব্র গন্ধ? মাথাটা ঘুরছে যে! আরে, মুহূর্তের মধ্যে মনে হোলো যেন ঘর থেকে সব বাতাস টেনে নেওয়া হয়েছে! জয়কৃষ্ণ অন্ধকারে আন্দাজে কাঠের সিঁড়ির দিকে যেতে চেষ্টা করলো। কিন্তু স্পষ্ট বুঝলো তার শরীর থেকে সমস্ত শক্তি যেন দ্রুত ক্ষয়ে যাচ্ছে। আর নিশ্বেস নেওয়া সম্ভব নয়। সে কি অজ্ঞান হয়ে যাবে? সে কি আর দাঁড়াতে পারবে না?

কোনো রকমে আরো দু'য়েক পা সে এগুলো তারপর তার দীর্ঘ শরীরটা হঠাৎ যেন গেলো ভেঙে। হুড়মুড় করে মেঝের উপর বিরাট একটি স্তূপ হয়ে সে লুটিয়ে পড়লো। চোরা কুঠরির ভিতরকার নিস্তব্ধতা আবার এলো ফিরে। [ক্রমশ]

মশাল

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

রংমশাল যারা পড়ো,

অসুখ, হাঙ্গামা, দাঁতের শক্রতা এই সব অনেক কিছু আমায় সাময়িকভাবে কাবু করেছে। 'মশাল' লিখে উঠতে পারছি না। এ জন্য তোমাদের কাছে বিরাগহীন প্রশ্রয় কামনা করছি কিছুদিনের জন্য। সুস্থ হলেই 'মশাল' লেখবার চেষ্টা করব।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় ৪.৮.৪৫

কবিতা

দু'টি নিষ্ঠুর কবিতা*

পরিমল রায়

১

রাগের চোটে নৌকো থেকে বৌ-কে দিল ফেলে,
এক নিমেষে স্রোতের টানে কোথায় নিল ঠেলে।
এখন শুধু কপাল ঠোকে,
বলে, "মশাই, মরছি শোকে,
গয়নাগুলো সঙ্গে গেল, কাজ হ'তো আজ পেলে।"

২

ছুঁড়ে বন্দুকের গুলি
ওড়ালো মা'র মাথার খুলি।
বাপ বল্লেন, এক গুলি-তেই পেরেছিস্ যে ভাগ্যি,
নইলে মজা দেখিয়ে দিতুম,—গুলি আজকাল যা মাগ্‌গি!

একটি সোশ্যালিষ্টিক ছড়া

অনেকগুলি পোষ্য,
কিন্তু নাহি চর্ব্ব্য কিম্বা চোষ্য।
তাই তো মাথায় খুন চেপেছে,
অন্য দিনের চাইতে হাজার গুণ ক্ষেপেছে।
এখন যদি, ধরুন মশায়,
ছেলে পিলের মুণ্ডু খসায়,
দোষটা হবে কস্য?
নয় কি সমাজস্য—
গাঁ ভরে যা'র ছাঁ রয়েছে, ক্ষেত ভরে নেই শস্য?

* আমরা কিন্তু মা ও স্ত্রীর প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহারের সম্পূর্ণ বিরোধী। রং সং

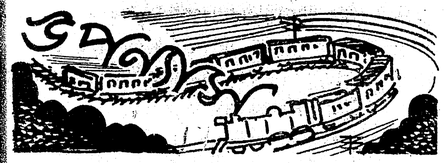

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

নাদুস-নুদুস ভুলো ভোলানাথের মতো চেহারা, ভবতোষ নামটার সঙ্গে খুব খাপ খায়। হন্তদন্ত ভাবে হাতে হালকা ব্যাগ নিয়ে বাগান পেরিয়ে তরতর করে উঠে এলেন। অশোক আর কুনুকে একেবারে দালানে দেখতে পেয়ে মহা খুসি—"যাক, তোমরা বাড়িতেই আছ! বাঁচলুম। একটা ভয়ানক জরুরী কাজ পড়েছে। হঠাৎ তাই আমায় ফিরতে হল"—এক নিঃশেসে বল্লেন এতগুলো কথা তারপর ধপাস করে একটা চেয়ারে পড়লেন বসে।

অশোকের দিদি এক পেয়ালা চা ঢালতে ঢালতে বল্লেন —"ওরা ত' তোমার জন্যেই অপেক্ষা করছিলো। অশোক বলছিলো খানিকক্ষণের মধ্যেই তুমি ফিরবে।"

ভবতোষবাবু একেবারে অবাক হয়ে গেলেন—"কী আশ্চর্য্য! আমি ফিরব জানলো কেমন করে! আমার ত' ফেরবার কথা দিন কতক পরে!"

অশোক হাসতে হাসতে বলল—"অবাক হবেন না। এরা মধ্যে এমন কিছু বুদ্ধির কসরৎ নেই। উদয়-ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের যদি মাথা খারাপ হয় তা হলে তা নিয়ে আপনারই ত' সবচেয়ে মাথা ব্যথা হবার কথা। তিনি যে আপনার একজন প্রধান মক্কেল সে কথা ত' আগে থাকতেই জানতুম।"

ভবতোষবাবুর চোখ এবার সত্যিই কপালে উঠল—"কী আশ্চর্য্য! প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপের খবরটা তোমরাও জেনে গেছ!"

এবার অবাক হবার পালা অশোকের, বল্‌ল—"খবরের কাগজেই যখন খবরটা বেরিয়ে গেছে তখন আর আমাদের পক্ষে জানাটা এমন কি বিস্ময়ের?"

একেবারে চমকে উঠলেন ভবতোষবাবু। স্ত্রীর হাত থেকে চা নিতে যাচ্ছিলেন, পেয়ালা থেকে চা উপচে পড়ল পিরিচে। বললেন—"খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে!" ভবতোষবাবু বুঝি নিজেই ভূত দেখলেন। তারপর হতাশ ভাবে চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন—"যাঃ, সব মাটি হয়ে গেল!"

অশোকের দিদি প্রশ্ন করলেন—"কেন, মাটি কী হল?"

"মাটি নয়?"—ভবতোষবাবু একটু উত্তেজিতভাবেই বললেন—"পাছে বেশী লোক জানাজানি হয় সেই ভয়েই ত' টেলিগ্রাম পেয়েই আমি ছুটে এসেছি।"

অশোকের কপালে একটু কুঁচকে উঠল—"কেন? বেশী লোক জানাজানি হলে মুস্কিলটা কী?"

এতক্ষণ পরে কুনু কথা বলল—"ভারি গোয়েন্দা হয়েছিস! মুস্কিলটা কি তাও বুঝিয়ে দিতে হবে? তুই যদি আজ পাগল হয়ে যাস আর সবাই যদি তা জেনে ফেলে তা হলে তোর দুর্নাম হবে না? মক্কেলের দুর্নামটা মুস্কিলের নয়?"—খুব মাতব্বরী চালে বলল কুনু এবং অশোককে বুদ্ধিতে পরাস্ত করার বীরদর্পে একবার দিদির মুখের দিকে চেয়ে দেখল।

"না হে না!" ভবতোষবাবু যেন এককথায় কুনুর সমস্ত উৎসাহ দুমড়ে দিলেন—"ব্যাপারটা অত সোজা নয়। আসল কথা হল আইনের একটা হাঙ্গামা: প্রতাপচন্দ্রের মাথা খারাপ হয়ে গেছে একথা সর্ব্বত্র প্রমাণিত হলে ওই বিরাট সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। কেননা, সম্পত্তিটা তাঁর কাকা উদয়চন্দ্র তাঁকে উইল করে দিয়ে গেছেন এবং উইলে এই একটিমাত্র সর্ত্ত।"

"এ আবার কোন ধরণের উইল?" দিদি বললেন।

"ভাইপোর যে মাথা খারাপ হতে পারে তাই বা কাকা অত আগে আঁচ করলেন কেমন করে ?"

"সে একটা ভারি হাঙ্গামার ব্যাপার—" ভবতোষবাবু বললেন—"ওঁদের বংশ সম্বন্ধে বরাবর একটা প্রবাদ আছে যে ওঁদের রক্তে রয়েছে পাগলের বিষ, যে কেউ যে কোনদিন পাগল হয়ে যেতে পারে।"

অশোকের মুখ গাম্ভীর্য্যে থমথম করছে, অত্যন্ত শান্ত গলায় সে প্রশ্ন করল—"কিন্তু এর আগে সত্যি-সত্যি কি কেউ পাগল হয়েছেন বলে জানা আছে ?"

ভবতোষবাবু বললেন—"না। আমি খোঁজ করেছিলুম। কিন্তু সে রকম কারুর কথা শুনিনি। প্রবাদটা কেন যে আছে তা বলতে পারিনে'; তবে আছে যে এ কথাটা ঠিক। মরুক গে যাক প্রবাদ। কিন্তু কথা হল খবরের কাগজ-ওয়ালারা ব্যাপারটা এমনভাবে টের পেলো কী করে !"

অশোক বললো—"হুঁ। সেটা সত্যিই ভালো করে ভেবে দেখতে হবে।" তারপর একটু হেসে—"হয়ত বোম্বাইএর কাগজওয়ালারা খুব বেশী করিৎকর্ম্মা লোক। সে যাই হোক, আপনি এখন চা-টা খেয়ে হাতমুখ ধুয়ে আসুন। তারপর সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কাছ থেকে আগাগোড়া শোনা যাবে।"

ভবতোষবাবু অত্যন্ত ব্যগ্র গলায় বললেন—"কিন্তু ভাই অশোক আর কুনু, এসব ব্যাপারের মধ্যে সত্যিই একটা কিছু গোলমাল আছে। আমার কপাল অত্যন্ত ভালো যে ঠিক এই সময়েই তোমরা এখানে এসে পড়েছো। ব্যাপারটার সমস্ত দায়িত্ব তোমাদের নিতেই হবে।"

কুনু হতাশভাবে দীর্ঘ নিশ্বেস ফেলে বললো—"ওকে আর অনুরোধ করছেন কি ! ক্যাঙলা ভাত খাবি না পাত পাব কোথায় ?—ওর অবস্থা হয়েছে তাই। কিন্তু"—দিদির দিকে চেয়ে—"মনে হচ্ছে মঘা যোগে চেপেছিলুম ট্রেনে, ছুটিটা শেষ পর্য্যন্ত ছুটোছুটিই হয়ে দাঁড়াবে। যাই হোক ভবতোষদা, আপনি হাতমুখ ধুয়ে আসুন। শোনা যাক সব কথা। আমি যাব বঙ্গে আমার কপাল যাবে সঙ্গে।"

হাতমুখ ধুয়ে ভবতোষবাবু এসে বসলেন। অশোক বলল—"সমস্ত ব্যাপারটা বেশ খুঁটিয়ে আগাগোড়া বলে যান—" বলে চোখ বন্ধ করে একটা ডেকচেয়ারে নিজেকে ঢেলে দিল। ভবতোষবাবু বলে চললেন—

"প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে গোড়ায় দু'চারটে কথা বলেনি। ক্রোড়পতি উদয়চন্দ্র বাটলিওয়ালার ভাইপো, উদয়চন্দ্রের ছেলেমেয়ে না থাকায় প্রতাপচন্দ্রই এখন সে সমস্তর মালিক। উইলে কেবল একটা সর্ত্ত আছে, সে কথা ত' আগেই বলেছি। প্রতাপচন্দ্র বহুদিন বিদেশে থেকে লেখা-পড়া করেছেন; বিদ্বান লোক, শুধু বিদ্বান বললে কমিয়ে বলা হয় কেন না লাইব্রেরিটা ছাড়া তাঁর জীবনে যেন আর কোন আকর্ষণ নেই। শান্ত স্থির বুদ্ধি, আর তেমনি মিষ্টি স্বভাব। যদিও তাঁদের বংশে পাগল হওয়া সম্বন্ধে একটা অস্পষ্ট প্রবাদ চলতি আছে তবুও প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধে আমার এ দুর্ভাবনা কোনোদিন ছিলো না। কিন্তু হালে সেই দুর্ভাবনাই আমার সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে কেননা সত্যিই আমি নিজের চোখে দেখছি প্রতাপচন্দ্রের মাথাটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। ভারি আশ্চর্য্য ব্যাপার ! এমনিতে তাঁর সঙ্গে কথা বলো, কিছু টেরই পাবে না। যে কোনো বিষয় নিয়ে কথা বোলো, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর পাণ্ডিত্য উজোড় করেও তিনি ক্লান্ত হবেন না। কিন্তু ঠেকে যাবে একটা বিষয়ের কথা উঠলে: প্রেতলোকের কথা। দেখবে তিনি কী রকম গম্ভীর হয়ে যান এবং অত্যন্ত শান্ত গম্ভীর ভাবেই তিনি এলোমেলো যা তা বকতে সুরু করবেন। এমন সব আজগুবি কথা যে শুনলে হাসি পায়, কিন্তু হাসা যায় না; কেন না তখন তাঁর সমস্ত চোখেমুখে ফুটে ওঠে একটা দুর্ব্বল অসহায় আতঙ্ক। তখন মায়া হয়, দুঃখু হয়।"

"কী ধরণের কথা ?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"সে সব ভারি আজগুবি কথা, একেবারে আষাঢ়ে গল্প। প্রেতলোক সম্বন্ধে নানান তথ্য বলে যাবেন, এমন কি বলতে সুরু করবেন গভীর রাতে তিনি নিজে প্রেতলোকের দর্শন

পেয়েছেন। তিনি নিজে নাকি দেখেছেন একটা কাটা মুণ্ডু অন্ধকার ঘরে ভাসছে, উল্টো হয়ে ভাসছে এবং নরকের নীলচে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে সেই মুণ্ডু থেকে। কিম্বা, তিনি নাকি স্বচক্ষে দেখেছেন নরকের বিদ্‌ঘুটে পাখি মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে এবং তার গা থেকেও নাকি ঠিকরে বেরুচ্ছে প্রেতলোকের অদ্ভুত আলো !"

অশোক শান্তভাবে বলল—"কিন্তু এতে হাসি পাবার কী আছে ? ভদ্রলোক ত' সত্যি সত্যি এসব দেখে থাকতেও পারেন !"

"কী রকম !"—উত্তেজিতভাবে সোজা হয়ে বসল কুনু, —"সত্যি দেখেছেন মানে ? তোর বংশেও মাঝেমাঝে উন্মাদের উদয় হয় নাকি ?"

"ঠিক জানি না," অশোক বলল, "সে রকম কোনো প্রবাদ থাকলেও অন্তত আমি কখনো শুনিনি। কিন্তু আসলে যা শুনলুম তাতে পাগলামির কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অবশ্য মাথা খারাপ হলেও এসব জিনিষ মানুষ দেখতে পারে; কিন্তু প্রতাপচন্দ্র দেখেছেন বলেই যে তাঁর মাথা খারাপ হয়েছে তা প্রমাণ হয় না।"

"প্রমাণ হয় না মানে ? সুস্থ মাথায় মানুষ এসব দেখবে কেমন করে ?"—কুনুর যেন রণং দেহি ভাব।

"ও সব জিনিষ চোখে পড়লেই দেখতে পাবে।"—অশোকের গলা নির্লিপ্ত, সহজ। "ধর, বাড়িটায় সত্যিই ভূত আছে।"

"তা যদি থাকে তা হলে ত বেঁচে যাই। একবার বাড়িটায় গিয়ে ভূতের সঙ্গে কোলাকুলি করে আসি"—বলে হোহো করে হেসে উঠল কুনু।

কিন্তু কুনুর হাসি ডুবে গেল অশোকের হাসিতে। —"ঠিক হয়েছে"—অশোক বলল—"মানে ভূত আছে কি না একবার গিয়ে দেখতে তোর আপত্তি নেই। বরং উৎসাহই আছে। এই কথাটাই তোর মুখ দিয়ে বার করতে চাইছিলুম। কুনু, ঘুমুতে ঘুমুতে হাই তোলা সত্যি তোর কপালে নেই, মেজাজেও নেই। ছুটি মানে একদম ছুটি আর হল না !"

কুনু বেচারা একেবারে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল। ওর দুর্ভোগ দেখে দিদিও আর না হেসে থাকতে পারলেন না। কুনু আমতা-আমতা করে বলল—"কিন্তু সত্যিই কি তুই বলতে চাস বাড়িটায় ভূত থাকতে পারে !"

"তা এক্ষুনি কেমন করে বলি, বল। ওখানে গিয়ে ভাল করে সব খোঁজ খবর করতে হবে, তাছাড়া, ভবতোষদার কাছ থেকে এখনো ত' সমস্ত কথাটাই শোনা হয়নি। যাই হোক, তুই যখন আমার সঙ্গে স্বেচ্ছায় একাজে নামতে রাজি হয়েছিস তখন আর ভাবনা নেই।"—তারপর ভবতোষবাবুর দিকে চেয়ে বললো—"বলুন এবার প্রতাপচন্দ্রের আগাগোড়া ইতিহাস।" [ক্রমশ]

ভ্রম-সংশোধন

শ্রাবণ-সংখ্যার 'আদিগঙ্গা' কবিতাটির লেখক বিমলচন্দ্র ঘোষ, বিমল ঘোষ নন। রং সং

একটি সন্ধ্যা

অমল চট্টোপাধ্যায়

উত্তরে ঘন মেহেদীর বেড়া
দক্ষিণে জ্বলে জোনাকী,
ঝাউ শাল আর ঘাসেদের মুখে
তারাদের এত আলো কী !
মাথার ওপরে আকাশ করুণ
কাতর কৃষ্ণচূড়াটি।

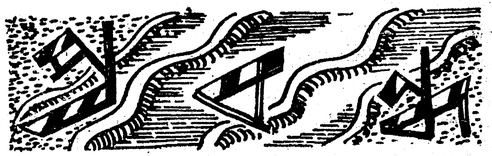

"রংমশাল"

পরিতোষকুমার চন্দ্র

এটা "রংমশাল" মাসিকপত্র নয়,—এটা হলো রঙিন্ মশাল,—অর্থাৎ রঙিন্ আলো। এবারে বুঝতে পেরেছো তো যে আমি কোন রংমশালের কথা বলছি? রংমশাল যখন জলে তখন দেখতে তো আনন্দ হয়ই, তার ওপরে তা যদি নিজের হাতে তৈরী করা হয় তবে তো কথাই নেই।

কিন্তু ভাবনা,—কেমন ক'রে তৈরী করবে। দুঃখু করোনা, শিখিয়ে দিচ্ছি। শেখবার আগে একটা কথা সব সময়ের জন্য মনে রাখবে যে এই রংমশাল তৈরী যেমন সোজা, আবার বিপদও হতে পারে তেমনি। এগুলো তৈরী করতে যা সব মাল-মশলা লাগে তার মধ্যে তিনটি জিনিষ,—গন্ধক, সোরা ও পটাশ্ ক্লোরেট—নিয়েই যা কিছু ভাবনা। এগুলোর নিজস্বভাবে, অর্থাৎ আলাদা আলাদা ভাবে কোনো কিছু বিপদ ঘটাবার সম্ভাবনা নেই। এগুলোর যে কোনো দুটো তিনটি এক সঙ্গে মেশাবার পরই বিস্ফোরণ হবার সম্ভাবনা হয়—এক সঙ্গে গুঁড়ো করতে গেলে বা গুঁড়ো করবার পর জোরে চাপ দিয়ে মেশাতে গেলে। এগুলো আলাদা আলাদা ভাবে মিহি ক'রে গুঁড়ো করবার পর, যথামাত্রায় ওজন ক'রে একটা বড় কাগজে বা পিজবোর্ডের ওপর রেখে, একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে আস্তে আস্তে নেড়ে মেশালে কখনও বিস্ফোরণ হবে না একথা জোর ক'রে বলতে পারি। আশাকরি নিজের বুদ্ধি খাটাতে না গিয়ে তোমরাও ঠিক এই ভাবেই করবে। এইটুকু মাত্র সাবধান হলেই যখন কাজ হয় তখন অসাবধান হয়ে যদি বিপদ ঘটিয়ে বসো তাহলে বুঝতে হবে যে তুমি একটি আস্ত গবেট্। কি,—রাগ হলো নাকি? আরে সবাইকে তো আর গবেট্ বলছি না,—যে ভুল করবে সেই হবে গবেট্। তা তুমি, সত্যিই 'গবেট্' কিনা সেটা প্রমাণ হবার আগেই যদি নিজেকে 'গবেট্' বলে মনে ক'রে রাগ করো তবে,—তবে তুমি ডবল গবেট্।

যাক্,—এইবার কাজের কথা হোক্, কেমন? নীচে চার রকম রঙের রংমশাল করবার ভাগ দিলাম। বর্ত্তমান সময়ে এই মাল-মশলার সবগুলো যোগাড় করতে পারবে কিনা জানিনা। পারো যদি তো ভালোই, সামনেই দুর্গাপুজো আসছে, নিজের হাতের তৈরী রংমশাল জেলে বন্ধুবান্ধবকে একেবারে তাক্ লাগিয়ে দিতে পারবে। আর যোগাড় করতে যদি নেহাতই না পারো, তবে শিখে তো রাখো, যখন পাবে তখন করবে, তাতেও এর নতুনত্ব নষ্ট হবে না।

(১) নীল রংমশাল :

কপার অক্সাইড (Copper Oxide)—	২ আউন্স
গন্ধক (Sulphur)	— ৪ „
পটাশ্ ক্লোরেট্ (Potass. Chlorate)—	৬ „
সোরা (Potass Nitrate)	— ৮ „

(২) লাল রংমশাল :

কাঠ কয়লা	— ১ আউন্স
গন্ধক	— ২ „
পটাশ্ ক্লোরেট্	— ২ „
ষ্ট্রন্সিয়াম্ নাইট্রেট্ (Strontium Nitrate)—	২ থেকে ৮ „

(৩) সবুজ রংমশাল :

ব্ল্যাক্ সাল্ফাইড্ অব্ এন্টিমোনি (Black sulphide of antimony)	— ১ আউন্স
গন্ধক	— ২ „
পটাশ্ ক্লোরেট্	— ২½ „
বেরিয়াম নাইট্রেট্ (Barium Nitrate)—	২ থেকে ৫ „

(৪) বেগুনী রংমশাল :

কাঠ কয়লা	— ১ আউন্স
গন্ধক	— ২ „
খড়ি (Chalk precipitated)	— ২ „
পটাশ্ ক্লোরেট্	— ২½ „
সোরা	— ৩ „

মশলাগুলো গুঁড়ো ক'রে মেশাবার আগেই প্রয়োজন তো কাগজের কয়েকটা চোঙ্গা বা নল তৈরী ক'রে নেবে। গুলো করা খুবই সহজ। এর জন্য কয়েক 'তা' পাৎলা াগজ চাই, যত পাৎলা হবে ততই ভাল,—যেমন ধরো ড়ির কাগজ। যে রঙের রংমশাল সেই রঙের কাগজ হলে া সোনায় সোহাগা। আর চাই কিছু শুক্নো মিহি ালি, একটু গঁদের আঠা বা ময়দার লেই ও একটা ছুরি। থমে কাগজগুলো লম্বায় ৮/১০ ইঞ্চি ও চওড়ায় ২½/৩ ইঞ্চি রে কেটে নেবে। ভাঁজ ক'রে ছুরি দিয়ে কাটাই ভালো, তে একসঙ্গে অনেক 'তা' কাগজ কাটা যায়। এইবার কটা গোল মোটা পেন্সিল বা ঐ রকম গোল কোনো াঠিতে লম্বালম্বিভাবে এক একটা ক'রে কাগজ জড়িয়ে াঠা দিয়ে জুড়ে দাও। তারপর ঐ কাঠির একদিক দিয়ে নলের আধ ইঞ্চিটাক টেনে বার ক'রে সেই দিকটা ড়ে জুড়ে দাও। কাঠি থেকে নলটা একেবারে টেনে ার ক'রে মুখ বন্ধ করতে গেলে ভালো ভাবে তা করতে াবে না। তাছাড়া নলটাও তাতে চেপ্টে দুম্ড়ে যেতে ারে। সবগুলো নল এইভাবে তৈরী হয়ে গেলে বেশ রে রদ্দুরে শুকিয়ে নাও। তারপর খোলা মুখের দিক য়ে প্রত্যেকটি নলের অর্দ্ধেকটা ক'রে শুক্নো বালি ভরে ও। এইবার, আগে যেমন ক'রে বলেছি সেইভাবে, শলাগুলো আলাদা ভাবে গুঁড়ো ক'রে একটা পিজ্বোর্ড রে একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে আস্তে আস্তে নেড়ে বেশ রে একসঙ্গে মিশিয়ে নাও ও নলগুলোর বাকি খালি ংশে ভরে দাও। একেবারে মুখ পর্য্যন্ত না ভ'রে ইঞ্চি নেক ক'রে খালি রাখবে ও পাক দিয়ে পেঁচিয়ে সেই মুখগুলো বন্ধ করে দেবে। দু-মুখ দু-রকম ভাবে বন্ধ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে, মনে রাখা যে নলের কোনদিকে বালি আর কোন দিকে মশলা। ভাঁজ ক'রে বন্ধ করার দিকে বালি (জ্বালাবার সময় সেইদিকটা ধরতে হয়) আর পেঁচিয়ে বন্ধ করার দিকে মশলা। এইভাবে পেঁচিয়ে বন্ধ করার আর একটা উদ্দেশ্য এই যে কাগজের খানিকটা অংশ পল্তের মতো বেরিয়ে থাকাতে রংমশাল জ্বালাবার সুবিধে হয়।

তারপর আর কি, রঙে রঙে একেবারে রামধনুর খেলা লাগিয়ে দাও। হ্যাঁ, একটা কথা,—যদি ভালো ভাবে তৈরী করতে পারো তবে সব রঙেরই কয়েকটা ক'রে রংমশাল "রংমশালের" সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দিও, আমরাও জেলে তোমাদের সঙ্গে আনন্দ করবো। কি,—পাঠিয়ে দেবে তো,—না কলা?

খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো

আন্তন চেহভ

রাত। যে দোলনায় ছোট ছেলেটা শুয়ে সেটা টানছে ভার্কা: বছর তেরো বয়েসের ঝি, আর একটানা গুনগুন করে গেয়ে চলেছে—"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো…"

একটা ছোট সবুজ আলো জলছে। ঘরের এ কোন থেকে ও কোন পর্য্যন্ত দড়ি খাটানো, বাচ্চার জামা-কাপড় ঝুলছে আর ঝুলছে একজোড়া লম্বা কালো পেন্টুলুন। কড়িকাঠে, আলোটার ঠিক উপরে, সবুজ রঙের ছোপ, আর জামাগুলোর দীর্ঘ ছায়া দোলনায়,

দেয়ালে, ভার্কার গায়ে। আলোর শিষ একটুখানি কেঁপে উঠলেই ছায়ার দল দুলতে থাকে, যেন দমকা হাওয়ায় ঠেলা দিয়ে গেল। গুমোট ঘর। জুতোর দোকানের চাপা গন্ধ।

ছেলেটা কাঁদছে। অনেকক্ষণ থেকে কাঁদছে। কাঁদতে কাঁদতে গলা কর্কশ হয়ে গেছে। এখনো কাঁদছে। থামবে কখন বলা যায় না। আর ঘুম পেয়েছে ভার্কার। চোখের পাতা দুটোয় যেন আঠা মাখানো, আটকে আসে। মাথাটা ঝুঁকে পড়ে সামনের দিকে। ঘাড় টনটন করে। চোখের পাতা নড়াতে পারে না, নড়াতে পারে না ঠোঁট। মনে হয় মুখটা তো শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গিয়েছে আর মাথাটা ছোট্ট হয়ে এসেছে, আলাদিনের মাথার মতো।

"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো"···গুনগুন করে ও গেয়ে চলে।

ঘরের কোনায় উনুনের উপর একটা ফড়িং ফটফট করে। পাশের কর্তা নাক ডাকাচ্ছেন। মুড়মুড় করে দোলনাটা। আর গুনগুন করে ভার্কা। সব মিলে গভীর রাতের অস্পষ্ট সঙ্গীতে পরিণত হয়। কিন্তু সে সঙ্গীত বিছানায় শুয়ে শুয়ে শুনতেই মিষ্টি লাগে। কিন্তু ভার্কাকে এ সঙ্গীত শুধু যন্ত্রণা দেয়, তার মেজাজ বিগড়ে যায়। কেন না, এ গান ওকে যেন ঠেলে দেয় ঘুমের দিকে, কিন্তু ঘুম অসম্ভব। ঘুম! কোনোমতে ও যদি ঘুমিয়ে পড়ে তাহলে কর্তা আর গিন্নি পিঠের চামড়া আস্ত রাখবে না।

আলোর শিষ কেঁপে ওঠে, দুলে ওঠে কড়িকাঠের সবুজ ছোপ, দেয়ালের ছায়া। ভার্কার আধবোজা স্থির চোখের উপর, আধঘুমন্ত মগজের ভিতর নানান আজগুবি দৃশ্য ঢেলে দেয়। ও যেন দেখতে পায় আকাশে দুটো প্রকাণ্ড কালো মেঘ একটা আর একটাকে তাড়া করেছে আর চীৎকার করছে দোলনার ছেলেটার মতো। তারপর হাওয়া দেয়, মেঘগুলো যেন উড়ে যায় আর ভার্কা দেখে চওড়া উঁচু পথ, কাদায় ভরতি। সেই পথে সারিসারি মালগাড়ি আর মানুষের সারি চলেছে, তাদের পিঠে বোঁচকা, তাদের ছায়া দুলছে। দুদিকে তীক্ষ্ণ তীব্র কুয়াশার মধ্যে দেখা যায় সবুজ বন। হঠাৎ যেন লোকগুলো কাঁধের বোঁচকা আর এলোমেলো ছায়া নিয়ে কাদায় পড়ে যায়। "ব্যাপার কি?"—ভার্কা প্রশ্ন করে। "ঘুম, একটু ঘুমিয়ে নেবার জন্যে।"—তারা বলে। আর তারা এলিয়ে পড়ে ঘুমে, গাঢ় শান্ত ঘুমে। কেবল মাথার উপর টেলিগ্রাফের তার থেকে দাঁড়কাক আর হাড়িচাঁচার দল তীব্র চীৎকার করে ওদের ঘুম ভাঙ্গাতে চায়। ঠিক যেন দোলনার ছেলেটার মতো গলা!

"খোকা ঘুমুলে পাড়া জুড়ুলো—" ভার্কা চমকে উঠে গুনগুন করে গায়। আর এবার তার চোখের সামনে নেমে আসে একটা ছোট্ট গুমোট কুঁড়ে ঘরের ছবি। মেঝেয় শুয়ে যেন তার বাবা ইয়াফিম্ স্টেফানভ কাৎরাচ্ছে। ভার্কা তাকে দেখতে পায় না তবে তার কাৎরানির শব্দ কানে আসে। এত যন্ত্রণা যে তার পক্ষে কথা বলা সম্ভব নয়, দম বন্ধ করে দাঁতে দাঁত ঘসছে, কড়কড় শব্দ করে। ভার্কার মা পেলাগেয়া দৌড়ে গেছে মনিববাড়িতে ইয়াফিমের শেষ হয়ে এলো এই খবরটা নিয়ে। গেছে ত' অনেকক্ষণ, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফেরা উচিত ছিল। ভার্কার কানে শুধু বাবার গোঙ্গানী। তারপর কুঁড়ে ঘরে কে যেন এল—ডাক্তার। সহর থেকে এখানের কোন বড়লোকের বাড়ী এসেছিলো, মনিবরা তাকেই পাঠিয়ে দিয়েছে। তার চেহারা অন্ধকারে চোখে পড়ে না, শুধু শোনা যায় তার কাসির শব্দ।

"আলো জ্বালাও"—সে বলে। ইয়াফিম্ শুধু কাৎরায়—"আঁ আঁ আঁ···" পেলাগেয়া হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢোকে। অন্ধকারে দেশলাই হাৎড়ে বেড়ায়। ডাক্তার নিজের পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বালে।

"আনাচ্ছি বাবু এখুনি আনাচ্ছি"—বলতে বলতে পেলাগেয়া ঘর থেকে ছুটে বেরোয় আর একটু পরেই এক টুকরো ভাঙা মোমবাতি হাতে নিয়ে হাজির হয়।

ইয়াফিমের মুখটা টকটকে লাল, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তার চোখের চাউনি কী অসম্ভব তীব্র! যেন ডাক্তারকে ভেদ করে, কুঁড়ে ঘরটা ভেদ করে বাইরে দেখছে!

"ব্যাপার কী? কী ভাবছো?"—ডাক্তার ঝুঁকে পড়ে ওর উপর,—"কতদিন থেকে এরকম সুরু হয়েছে?"

"আমার সময় শেষ হয়েছে বাবু। আর আমি বাঁচব না বাবু—"ইয়াফিম্ গোঙাতে-গোঙাতে বলে।

"বাজে কথা! দেখ না, তোমায় চাঙ্গা করে দেব।"

ডাক্তার মিনিট পনেরো পরীক্ষা করে দেখে, তারপর উঠে দাঁড়ায়। বলে—"আমার সাধ্যের বাইরে! ওকে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। সেখানে তারা একটা অপারেশন করবে। একটু দেরি হয়ে গেছে, তারা বোধ হয় শুয়ে পড়েছে। তা হোক। আমি একটা চিঠি দিয়ে দিচ্ছি।"

"কিন্তু নিয়ে যাব কেমন করে?"—পেলাগেয়া প্রায় কাদকাদ গলায় বলে।

"ভেবো না, তোমার মনিবকে বলে একটা গাড়ীর বন্দোবস্ত করে দেব।" তারপর ডাক্তার চলে যায়। মোমবাতি নিভে যায়। আবার অন্ধকার আর ইয়াফিমের কাৎরানি। তারপরে, খানিক পরে, গাড়ি আসে, ইয়াফিমকে যেন হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ভার্কা দেখে সকাল হয়েছে, সুন্দর উজ্জ্বল সকাল। ওর মা বাড়ি নেই, হাসপাতালে বাবার খবর আনতে গেছে। চমৎকার সকাল। কেবল কোথায় যেন একটা কচি ছেলে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে আর কে যেন ঠিক তার নিজের মতো গলায় গাইছে—"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো···"

মা বাড়ি ফেরে। ভার্কা শোনে বাবার শেষ হয়ে গেছে হাসপাতালেই। হাসপাতালের ওরা বলছিলো বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছিল, আর একটু তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতে পারলে হয়ত···

ভার্কা যেন আর ঘরের মধ্যে থাকতে পারে না, বেরিয়ে পড়ে পথে আর কাঁদে। কিন্তু মাথাটা হঠাৎ কে যেন সজোরে ঠুকে দেয় একটা গাছের গুঁড়িতে। চমকে চোখ তুলে চায় ভার্কা, সামনে দেখে তার মনিব, জুতোর দোকানের মালিক।

"পাজি নচ্ছার কোথাকার! ছেলেটা কেঁদেকেঁদে সারা হয়ে গেল আর বসে বসে ঘুম দেওয়া হচ্ছে!" বলে লোকটা আবার সজোরে এক চড় কষিয়ে দেয়! মাথাটা একটু ঝাঁকিয়ে নেয় ভার্কা, আর টানতে সুরু করে দোলনা, আবার সুরু করে সেই গুণগুণ গান। কিন্তু কড়িকাঠের সবুজ আলোর ছোপ আর ঘরের লম্বা-লম্বা ছায়াগুলো থামতে চায় না। তারা দোলে আর দুলতে-দুলতে তাকে হাতছানি দেয় যেন। ক্রমশ ভার্কার মস্তিষ্কের মধ্যে তারা আবার আড্ডা গেড়ে বসে। আবার ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই রাস্তা, কাদা ভরা রাস্তা আর পিঠে বোঁচকা নিয়ে অনেক মানুষ দিব্বি আরামে গড়াচ্ছে, অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদের দিকে চেয়ে দেখতে-দেখতে ভার্কারও ভারি ইচ্ছে করে অমনি করে শুয়ে পড়ে অমনিভাবে অঘোরে ঘুমোতে। কিন্তু উপায় নেই। মা-র হাত ধরে সে যেন চলেছে সহরে চাকরি বাকরি খোঁজ করতে। পথের লোকদের কাছে ওর মা যেন করুণভাবে ভিক্ষে করছে—"একটি পয়সা দাও বাবা, ভগবান ভালো করবেন।"

"ছেলেটাকে এখানে দিয়ে যা," উত্তরে ভার্কা যেন কার চেনা গলা শুনতে পেল—"ছেলেটাকে এখানে দিয়ে যা বলছি—" এবার সে গলা রীতিমতো উত্তপ্ত—"পা ছড়িয়ে বসে ঘুম দেওয়া হচ্ছে! পাজি, নচ্ছার, ছুঁচো মেয়ে কোথাকার!"

ভার্কা লাফিয়ে ওঠে। চারদিক চেয়ে ব্যাপারটা বুঝতে পারে। পথ নেই, মা নেই, ভিক্ষে চাইবার লোক নেই। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বাড়ির গিন্নি। ভার্কা ভয়ে কাঠের মতো চুপ করে থাকে। আর বাইরে, জানলার বাইরে, বাতাসের রঙ হয়ে আসে নীলচে, ঘরের ছায়া আর

কড়িকাঠের সবুজ ছোপ ফিকে হয়ে আসে। সকাল হতে আর দেরি নেই।

"কোলে তুলে নে"—গিন্নি রুদ্ধ গলায় বলেন—"কেঁদে-কেঁদে বাছার দম ফুরিয়ে গেল। কেউ নিশ্চয়ই তুক করেছে।"

ভার্কা কোলে তোলে ছেলেটাকে। গুণগুণ করে আবার গান গায়—"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো…"। আলোর সবুজ ছোপ আর দেয়ালের দীর্ঘ ছায়া কোথায় মিলিয়ে যায়। আর ভয় নেই। এখন আর ছায়ার দল দুল্‌বে না চোখের সামনে, গলিয়ে দেবে না মাথা। তবু চোখে ঘুম নেমে আসে, অসম্ভব ঘুম! চোখের পাতা দুটোয় যেন আঠা মাখানো, মাথাটা বড্ড ভারি লাগে। দোলনার কোনে মাথা দিয়েই ভার্কা এলিয়ে দেয় নিজেকে।

"উনুনটা ধরিয়ে ফেলগে যা"—কর্তার কড়া গলা দরজার ওপার থেকে।

তাহলে সকাল। কাজের সময়! তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে ভার্কা। দৌড়ে যায় আস্তাবল থেকে টুকরো কাঠ কুড়িয়ে আনতে। যাক; তবু দৌড়-ঝাঁপের মধ্যে থেকে অমন অদ্ভুত ঘুম পায় না। বসে থাকলেই বিপদ। ও কাঠের কুঁচো কুড়িয়ে আনে, উনুন ধরায় আর বেশ বুঝতে পারে মাথার মধ্যেটা আস্তে-আস্তে পরিষ্কার হয়ে আসছে।

"ভার্কা চায়ের জলটা চাপিয়ে দে—" গিন্নির কর্কশ গলা শুনতে পাওয়া যায়। বেচারা যত পারে তাড়াহুড়ো করে। কিন্তু জল চাপাবার আগেই নতুন হুকুম কানে আসে—"ভার্কা, বাবুর বড় জুতোটা সাফ্ করে রাখ।"

জুতোটা পরিষ্কার করতে-করতে ভার্কা একবার থমকে থামে, জুতোটার দিকে চেয়ে একবার ভাবে—আঃ, প্রকাণ্ড বড় জুতো যদি একটা থাকত আর তার বিরাট গর্তে মাথা গলিয়ে যদি একঘুম দিয়ে নেওয়া যেত! আর ভাবতে-ভাবতেই দেখে জুতোটা যেন ফুলতে-ফুলতে প্রকাণ্ড হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত ঘরটার মতো বিরাট! ভার্কার হাত থেকে ব্রাশটা খসে পড়ে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই সামলে নেয় নিজেকে। মাথাটা জোরে ঝাঁকুনি দেয়, চোখের পাতা যতটা পারে ফাঁক করে—আর যাতে কোনো জিনিস ফেঁপে উঠছে এ ভ্রম না হয়।

"ভার্কা বাইরের সিঁড়িটা ধুয়ে ফেল, খদ্দের এসে এই ছিরি দেখলেই কেলেঙ্কারি!"

সিঁড়ি ধোয় ভার্কা। ঘর ঝাঁট দেয়। আরও একটা উনুন ধরায়। তারপর পড়িমরি করে ছোটে বাজারের দিকে। অনেক কাজ। এক মিনিটও নষ্ট করা সম্ভব নয়।

কিন্তু রান্নাঘরে এক জায়গায় ঠায় দাঁড়িয়ে আলুর খোসা ছাড়ানোর মতো দুর্ভোগ আর যেন নেই। মাথাটা ঝুঁকে পড়তে চায় টেবিলের উপর। আলুগুলো চোখের সামনে নাচতে সুরু করে, হাত থেকে ছুরিটা ছিটকে পড়ে যেতে চায়। আর সর্বক্ষণ মোটা গিন্নী পাশে দাঁড়িয়ে কান ঝালাপালা করে চীৎকার করে। আর কর্তাদের খাবার সময় চুপ করে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করাও কম কষ্টকর নয়। মাঝেমাঝে মরীয়ার মতো মনে হয়, মনে হয় যা থাকে কপালে, মাটিতে সবার সামনেই শুয়ে পড়া ভালো। যা হবার হোক।

দিন শেষ হয়ে আসে। জানলার বাইরেটা কালো হয়ে আসছে দেখে ভার্কা নিজের রগ দুটো একবার টিপে ধরে। কাঠের মতো শক্ত হয়ে এসেছে রগ। আর তারপর আপন মনেই একবার হাসে। কেন, বোঝা যায় না। সন্ধের অন্ধকার ওর চোখের উপর নরম হাত বুলিয়ে যেন আদর করে, গাঢ় ঘুমের আশ্বাস সে আদরে।

সন্ধেয় কর্তার কাছে কজন বেড়াতে আসে। "ভার্কা চায়ের জলটা চাপিয়ে দে।"—গিন্নীর রূঢ় গলা শোনা যায়। …চা তৈরি করে দেবার পর ভার্কাকে ঘণ্টাখানেক ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কে জানে কখন কী ফরমাস হয়।

"ভার্কা, দৌড়ে যা। আনা দুয়েকের পান কিনে আন।"—ভার্কা প্রাণপণে দৌড়োয়, এতে যদি নিষ্কৃতি মেলে ঘুমের হাত থেকে।

ভার্কা এটা আন, ওটা আন। এটা কর, ওটা কর। ফাই-ফরমাস ত লেগেই থাকে।

শেষ পর্য্যন্ত বন্ধুরা বিদেয় হন। বাড়ির বাতিগুলো একে একে নিভে যায়; শুয়ে পড়েন কর্তা-গিন্নি। "ছেলেটাকে দোলা দে ভার্কা—" ওর কানে আসে শেষ আদেশ।

ঘরের কোনে উনুনের পাশে ফড়িংটা ফটফট করে। আর কড়িকাঠের সবুজ আলোর ছোপ, দেয়ালের দীর্ঘ ছায়া আবার দুলতে সুরু করে; ওকে হাতছানি দেয় যেন, যেন আচ্ছন্ন করে ওর সমস্ত চেতনা।

"খোকা ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো—" গুণগুণ করে ভার্কা।

ছেলেটা কাঁদে। কাঁদতে-কাঁদতে যেন নিজেকে একেবারে শেষ করে দেবে। ভার্কার চোখের সামনে আবার সেই সব ছবি ভেসে উঠতে সুরু করে: সেই কাদায় ভরা উঁচু পথ, বোঁচকাওয়ালা লোক, মা, বাবা। হাতছানি দিয়ে ডাকছে যেন। ভার্কা বেশ বুঝতে পারে। পরিষ্কার চিনতে পারে সবাইকে। কিন্তু আধঘুমের মধ্যে ঠিক বুঝতে পারে না কে তাকে কোন শক্তি দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবে বেঁধে রেখেছে; হাত পা বেঁধেছে কঠিনভাবে; সমস্ত শরীরের উপর চাপিয়েছে প্রবল ভার। তাইত সে পারে না এসব ছেড়ে বেরিয়ে পড়তে। কে বেঁধেছে? কোন শক্তি? এদিক ওদিক চেয়ে দেখে ভার্কা: কোন শক্তি? কার শক্তি? খুঁজে পায় না কিছু! মরীয়ার মতো খুঁজতে চায় ভার্কা। শেষকালে ক্লান্তিতে প্রায় মৃত অবস্থায়, ও চেয়ে দেখে সবুজ আলোর ছোপটার দিকে আর কানে আসে ছেলেটার কান্না, রুগ্ন আর কর্কশ। ভার্কা যেন সন্ধান পায় শত্রুর, যে শত্রু তাকে বাঁচতে দেবে না, ঘুমোতে দেবে না, বেঁধে রাখবে…

ছেলেটা! ওই পুঁটকে ছেলেটা!

ভার্কা হেসে ওঠে। এই সহজ ব্যাপারটা বুঝতে এত সময় গেল ভাবতেই অবাক লাগে! কড়িকাঠে সবুজ আলোর ছোপ, দেয়ালের ছায়া আর উনুনের পাশের ফড়িংও যেন অবাক হয়ে যায়, যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে!

ভার্কার মাথার মধ্যে এরা জটপাকাতে থাকে, ওর চেতনা প্রায় হারিয়ে যায়। টুল ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ভার্কা, তার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি, তার চোখ দুটো বড়বড়, চোখের পাতা পড়ছে না, সে পায়চারি করে ঘোরে ঘরময়। খুশী হয়, হাসিও পায়। একথা ভাবলেই মন হাসিতে আর খুশীতে ভরে ওঠে যে একটু পরেই ছেলেটার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে।

ছেলেটাকে শেষ করে ফেলো—আর তারপর ঘুম আর ঘুম আর ঘুম।

সবুজ আলোর ছোপটার দিকে ভার্কা একবার ভালো করে চেয়ে দেখে, তারপর ফুটে ওঠে তার মুখে হাসি, ইশারায় যেন কথা বলে সেই আলোর ছোপের সঙ্গে। তারপর এগিয়ে যায় দোলনার দিকে।

ওর হাতের মুঠোয় ছেলেটার রুগ্ন গলা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল আর আপন মনে হাসতে হাসতে ভার্কা মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল। তারপর ঘুম, গভীর ঘুম।

এক টুকরো

বিমলচন্দ্র ঘোষ

(১)

মেঘভাঙা রোদ্দুরে যদ্দুরে চাই
দেখ্‌তে যা পাই:
সবুজ দীঘির গায়
ঢেউগুলি চল্‌কায়
কাঁপে রোদ পাখিদের সোনালি পাখায়
আচম্‌কা মাছগুলো
জলে মারে ঘাই।

(২)

কুয়াশার কারাগার ভাঙো ভাঙো হে উদার
সূর্য,
আলোকের পরপারে ডুবে যাক এ তামসী
রাত্রি ;
অস্ফুট কুসুমের কাঁপে প্রাণ-প্রস্থনের
পাপড়ী,
মধুপায়ী ভ্রমরের গুন্‌গুন্ গুঞ্জন
ছন্দে।

গত মাসের কাগজ-পত্তর ছাপাখানায় পাঠাবার পর থেকেই দেখছি দুনিয়া একেবারে গরম হয়ে উঠেছে। চারদিকে সব জোর খবর, জব্বর খবর! কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরি? প্রথম যখন দেখলুম ইংলণ্ডে ভোট-এর ফলে চার্চিলের দল গো-হারাণ হেরে গেছে তখন মনে হল এটাই এ মাসের সবচেয়ে সেরা খবর হবে। কিন্তু ওমা! তারপরেই দেখি আবার তার চেয়ে এক জোর খবর বেরিয়েছে—এক সাংঘাতিক বোমা বের করেছে মার্কিনরা : এ্যাটম বোমা। এ বোমা দিয়ে সমস্ত পৃথিবীতে প্রলয় আনতে বেশী সময় লাগবার কথা নয়। ভাবলুম এইটেই হবে এবারের খবর-চূড়ামণি। কিন্তু ঠকে গেলুম। পরের দিন দেখি রাশিয়া লড়াই জারী করেছে জাপানের বিরুদ্ধে। এর চেয়ে গরম খবর আর কিছু হতে পারে? কিন্তু তাও হয়ত পারে! যেরকম ভাবগতিক দেখছি তাতে মনে হয় দু'চারদিনের মধ্যেই, অর্থাৎ এই সংখ্যা রংমশাল ছেপে বেরুতে না বেরুতেই হয়তো শুনবো জাপান একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। পৃথিবীতে আর কোথাও লড়াই নেই! যাই হোক, এইসব তিমিমার্কা খবরের পাশে আর অন্য সব চুনোপুঁটিমার্কা খবর দিতে চাই না—বড় খবরগুলোই একটু পরিষ্কার করে বলা যাক।

* * * *

চার্চিল সদলবলে ভোটে হেরেছেন! চার্চিল কে তা নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না—ইংরেজদের গত কয়েক বছর ধরে যিনি প্রধানমন্ত্রী তাঁর নাম তোমাদের কাছে নিশ্চয়ই নতুন নয়। মুখে সব সময় মোটা চুরোট, ছবি দেখে মনে হয় মেজাজটা একটু বদরাগী ধরণের আর শোনা যায় অদ্ভুত গোঁ ছিল তাঁর। অদ্ভুত গোঁ বইকি! নইলে এই লড়াই-এর সুরুর দিকে জার্মানীর দুর্দ্ধর্ষ বোমার ভয়ে প্রায় সমস্ত দুনিয়া যখন ঘাবড়ে পড়েছে—আর ইংরেজদের ত' কথাই নেই, প্রায় ছাতু হতে চল্ল বলে—এমন সময় বুড়ো বয়েসে সাহসে বুক বেঁধে দাঁড়ানো, সমস্ত দেশের লোককে মরীয়া করে তোলা—এ কি যে-সে লোকের কাজ! এ লড়াই জেৎবার জন্যে সমস্ত ইংরেজ জাত চার্চিলের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু অত হলেই বা কি হয়? সাহস ছিল, বীরত্ব ছিল, তেজ ছিল—সব ছিল, ছিল না কেবল সুবুদ্ধি। তাই দেশের লোক তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে সরিয়ে দিল ; কেন না যুদ্ধের পর দেশকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্যে প্রথম দরকার সুবুদ্ধি। সুবুদ্ধি ছিল না কেন? সুবুদ্ধি যে চার্চিলের ছিল না তার প্রমাণ কি? প্রমাণ পেয়েছে প্রত্যেক ইংরেজ পদে-পদে। প্রমাণ পেয়েছি আমরা, ভারতবাসীরা, হাড়ে-হাড়ে। কেন? সেকথা খুঁটিয়ে তোমাদের বোঝানো মুশকিল, কিন্তু মোটামুটি এটুকু বলা যায় যে সুবুদ্ধির একটা আসল লক্ষণ হল দেশকালপাত্র-জ্ঞান।

এই জ্ঞানটুকুই চার্চিলের কম ছিল। দুনিয়া অনেকখানি বদলেছে, এই লড়াই-এর ফলে হুড়হুড় করে বদলেছে। তাই পুরোনো শাসননীতি দিয়ে আজকের দুনিয়া শাসন করা আর চলবে না। দেশকালপাত্র অনুযায়ী নতুন শাসননীতির ব্যবস্থা করতে হবে। এইটুকুই বোঝেননি চার্চিল। তিনি পুরোনো নীতি আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। দেশের লোক তাই তাঁকে সরিয়ে দিল।

জিৎ হল এ্যাটিলি বলে আর একজনের দলের। এ দলটির নাম লেবার পার্টি। এ্যাটিলি এখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী। ভোট হবার আগে এ্যাটিলি দেশের লোকের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে মন্ত্রী হলে তিনি অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করবেন ; নতুন দুনিয়া চালাবার জন্যে করবেন নতুন ব্যবস্থা—উন্নত আর উদার ব্যবস্থা। এমন কি ভারতবর্ষকে এতদিন যেভাবে শাসন করে আসা হয়েছে সেটা ঠিক নয়। এবার থেকে ভালো ব্যবস্থা করা হবে যাতে ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচার করা হয়। তাই তাঁর বিজয়ে আমাদের দেশের অনেক নেতা খুব খুশী হয়েছেন।

অবশ্য বলবার মতো সুব্যবস্থা এখনো যে কিছু হয়েছে তা নয়। এই ত' সেদিন তাঁর জিৎ হল। গুছিয়ে বসতে একটু সময় যাবে বই কি। অবশ্য অনেকেই বলছেন বিশেষ করে ভারতবর্ষের ব্যাপারে খুব যে একটা কল্যাণকর ব্যাপার কিছু হবে তা মনে হয় না। ইতিমধ্যে সে রকম কোনো আভাসও ত' চোখে পড়েনি। তবে, আবার কেউ-কেউ বলছেন : "হবে, হবে, নিশ্চয়ই একটা ভালো বন্দোবস্ত হবে।" আমরা বলি : দেখা যাক। ভালো হলেই ভালো।

কিন্তু গাড়োয়ান কি আর এত সব হিসেব করতে পারে, না তার সবুর করবার অবসর আছে? খবর পেলাম লাহোরের এক গাড়োয়ান এ্যাটিলির বিজয়বার্তা শুনেই আনন্দে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল। ভাবল : আর কি? শ্রমিকদলের জিৎ যখন হয়ে গেছে তখন আর একদম ভাবনা নেই! এই ভেবে সে পথের এক পুলিশকে চাবুক কষিয়ে দিয়ে বল্ল, "শোনোনি? বন্ধু এ্যাটিলির জিৎ হয়েছে। এবার থেকে ঠিক মতো ব্যবহার করতে শেখো!" অবশ্যই একটু মাথা ঠাণ্ডা করবার জন্যে টাঙ্গাওয়ালাকে হাজতে বিশ্রাম করতে বলা হয়েছে!

* * * *

অবশ্য আজকের দুনিয়ায় দিনের পর দিন এমন সব অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে সুরু হয়েছে যে মাথা ঠাণ্ডা রাখাও কঠিন! যদি কদিন আগে বলতুম একটা ধূলোর গুঁড়োয় যে শক্তি আছে তাই দিয়ে সমস্ত সহর উড়িয়ে দেওয়া যায় তা হলে তোমরা নিশ্চয়ই আমার জন্যে মাথা ঠাণ্ডা করবার তেল উপহার পাঠাতে। অথচ, সেদিন সকালে কাগজ খুলে দেখি ঠিক সেই কথা! শুধু যে মুখের কথা তাই নয়, মার্কিন বৈজ্ঞানিকরা বাস্তবিকই এক আজগুবি বোমা বের করেছে : এ্যাটম-বম। আর এই বোমা এ্যাটম ভেঙ্গে শক্তি বের করে সহরকে সহর চুরমার করে দিতে পারে। দিচ্ছেও নাকি তাই। বিজ্ঞান ব্যাপারটা অবশ্য আমার মাথায় তেমন ঢোকে না, তাই একজন বৈজ্ঞানিক বন্ধুকে সে সম্বন্ধে তোমাদের একটা প্রবন্ধ লিখে দিতে বলেছিলুম। আশাকরি প্রবন্ধটা পড়ে তোমরা আঁচ করতে পারবে এ্যাটম-বম্ ব্যাপার কি!

* * * *

এই এ্যাটম বোমার ঠেলাতেই জাপান প্রায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তার উপর হঠাৎ রাশিয়া বলে বসল, "রণং দেহি।" সেই রাশিয়া যে এই সেদিন জার্মানিকে হারিয়ে হাত পাকিয়েছে। ফলে জাপানের আজ-যায় কাল-যায় অবস্থা। মনে হচ্ছে রংমশাল তোমাদের হাতে পৌছবার আগেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার খবর পৌছবে।

* * * *

গত ১২ই অগস্ট সকাল সাড়ে এগারটায় স্যর নৃপেন্দ্রনাথ সরকরের মৃত্যুতে সমস্ত দেশ শোকাচ্ছন্ন হয়েছে। মৃত্যু-কালে তাঁর বয়স ৬৯ বছর হয়েছিলো।

১৮৯৭ সালে রিপন কলেজ থেকে ল' পরীক্ষা পাস করে ভাগলপুরে ওকালতি সুরু করেন। ১৯০২ সালে ওকালতি ছেড়ে তিনি মুন্সিফের চাকরি গ্রহণ করেন কিন্তু ১৯০৫ সালে ঐ চাকরি ছেড়ে তিনি বিলেতে ব্যারিস্টরি পড়তে যান। বিলেত থেকে ফেরার অল্প সময়ের মধ্যেই ব্যারিস্টর হিসেবে হু-হু করে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৯ সালে তিনি বাংলার এ্যাডভোকেট জেনারেল নিযুক্ত হন। ১৯৩৪ সালে ভারত-সরকার তাঁকে 'ল' মেম্বর করে। সে-সময় তাঁর মাসিক আয় ছিলো চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা! তৃতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে ডেলিগেট হয়ে তিনি বিলেত যান এবং সে-সময়কার তাঁর একাধিক বক্তৃতা স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

স্যর নৃপেন্দ্রনাথ শুধুই একজন বড় ব্যারিস্টর ছিলেন না। খেলাধূলোর ব্যাপারেও তাঁর অত্যন্ত উৎসাহ ছিলে এবং তাঁরই চেষ্টায় বাংলাদেশের ফুটবল-জগতে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়রা সমান অধিকার পেয়েছেন।

এ-বছরের মতো ফুটবল খেলা শেষ হোলো। নানা কারণে এ-বছরের ফুটবল খেলা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। প্রধাণত স্মরণীয় হয়ে থাকবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের চমকপ্রদ সাফল্যের জন্যে। কলকাতার ফুটবল লিগ এবং আই. এফ্. এ. শিল্ড—এই দুটি পুরস্কারই লাভ করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ইতিপূর্বে একমাত্র মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবই দুবার একই বছরে লিগ ও শিল্ড পেয়েছে—১৯৩৬ এবং ১৯৪১ সালে। কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা বোধ হয় এইটাই যে ইতিপূর্বে কোনো টিম শিল্ড পাবার আটচল্লিশ ঘণ্টার ভিতর লিগ পায়নি! প্রতিবারেই লিগের খেলা শেষ হবার পর আই. এফ্. এ. শিল্ডের ফাইনাল খেলা হয়। এ-বছরেই শুধু তার ব্যতিক্রম দেখা গেলো।

প্রথমে লিগের খেলা ধরা যাক। লিগ আরম্ভ হবার প্রথম দিকে ভবানীপুরের খেলা দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন এ-বছর লিগ পাবার সম্মান তারাই বুঝি লাভ করবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের খেলা পড়ে গেলো, যে-ভাগ্যদেবী একাধিকবার আশ্চর্যভাবে তাদের জিতিয়ে দিচ্ছিলেন শেষের দিকে তিনিও যেন অপ্রসন্ন হয়ে উঠলেন। ভবানীপুর নামতে লাগলো, মোহনবাগান লাগলো উঠতে এবং মোহনবাগানের হাতেই ভবানীপুরকে প্রথম হার স্বীকার করতে হোলো। সবাই তখন স্পষ্ট বুঝতে পারলো এ-বছরের লিগ হয় মোহনবাগান না হয় ইস্টবেঙ্গলের তাঁবুতে যাবে। লিগের শেষের দিকে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের রি-প্লে রবীন্দ্র মেমোরিয়াল ফাণ্ডের জন্যে চ্যারিটি খেলা হয়। এ-ধরণের চ্যারিটি ম্যাচও কলকাতার ফুটবল মাঠে এই নতুন। খেলা আরম্ভ হবার আগে দু মিনিট দর্শক ও খেলোয়াড়রা চুপ করে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখান। ঐ চ্যারিটির ফলে রবীন্দ্রস্মৃতি ভাণ্ডারে ত্রিশ হাজার টাকার উপর দেওয়া হয়েছে। মোহনবাগানের ঐটিই ছিলো লিগের শেষ খেলা এবং তখনো তারা ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে এক পয়েন্ট ছিলো এগিয়ে। ওদারে ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে ভবানীপুরের শেষ খেলা তখনো বাকী। ফলে অবস্থা এই রকম দাঁড়িয়েছিলো যে সেদিন যদি মোহনবাগান জিৎতো তা হলে লিগ হোতো তাদের, যদি ইস্টবেঙ্গল জিৎতো তা হলে লিগ হোতো ইস্টবেঙ্গলের। অসংখ্য জনসমাগম হয়েছিলো গড়ের মাঠে। কিন্তু যারা খেলা দেখেছিলো কিংবা দেখতে পায়নি সবাইকেই ফিরতে হোলো নিরাশ

হয়ে: প্রথমত সেদিন কোনো দলই খেলতে পারেনি, দ্বিতীয়ত সেদিনকার খেলায় হারজিৎ কিছুই হোলো না, হোলো ড্র। ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মোহনবাগানের চেয়ে এক পয়েন্ট রইলো পিছিয়ে এবং হাতে রইলো একটি খেলা: ভবানীপুরের সঙ্গে। সবাই ভাবছে বুঝি আজ হয় কাল হয় সেই খেলা। কিন্তু নানা বিচিত্র কারণে সে-খেলার দিন ক্রমাগতই লাগলো পিছতে। 'বিচিত্র কারণ' বললুম, কিন্তু কারণটা ঠিকমতো কখনই জানা গেলো না—এই অকারণটাই তাই বিচিত্র বলে বোধ হয়। কারণ ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের খেলার ফলের উপর সবটাই তখন নির্ভর করছে—যদি ভবানীপুর জেতে তা হলে শিল্ড পাবে মোহনবাগান, যদি ড্র হয় তা হলে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের পয়েন্ট হবে সমান এবং আবার এই দু দলের মধ্যে আর একটি জোর খেলা হবে এবং সেই খেলায় যে যাকে হারাতে পারবে সেই পাবে লিগ, আর যদি ইস্টবেঙ্গল ভবানীপুরকে হারায় তা হলে লিগ পাবে তারা। ইস্টবেঙ্গল ও ভবানীপুরের খেলাটিও নানা কারণে দারুণ প্রতিযোগিতামূলক হবার সম্ভাবনা ছিলো, কারণ প্রথম ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলকে হার স্বীকার করতে হয়েছিলো ভবানীপুরের কাছে। কিন্তু যে-কারণেই হোক সেই খেলার দিন ক্রমাগতই লাগলো পিছিয়ে যেতে, এদিকে আই. এফ্.-এর শিল্ড খেলা হোলো আরম্ভ।

ক্রমশ শিল্ডের খেলায় সমস্ত কলকাতা মেতে উঠলো। একদিকে মোহনবাগান একটির পর একটি দলকে হারিয়ে উঠলো ফাইনালে অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলও উঠলো ফাইনালে —তবে মোহনবাগানের চেয়ে কম কষ্ট করে তাদের উঠতে হয়েছিলো। যেদিন মোহনবাগান ক্যালকাটাকে এক গোলে হারিয়ে (এই প্রথম শিল্ড খেলায় ক্যালকাটা মোহনবাগানের কাছে হারলো) ফাইনালে উঠলো সেদিন সন্ধে থেকেই কলকাতার উত্তেজনা একটা দেখবার জিনিস হয়েছিলো। পথে হাঁটো, পানের দোকানে দাঁড়াও, বাসে-ট্রামে ঝুলতে-ঝুলতে চলো—সর্বত্রই সেই এক আলোচনা: মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল। ইতিপূর্বে মোহনবাগান তিনবার উঠেছে ফাইনালে—১৯১১, ১৯২৩ এবং ১৯৪০এ, ইস্টবেঙ্গলও এর আগে তিনবার উঠেছে ফাইনালে, এবং উঠেছে গত তিন বছরেই। ইতিপূর্বে মোহনবাগানও একবার পেয়েছে শিল্ড, ইস্টবেঙ্গলও পেয়েছে একবার শিল্ড। এই সব নানা ধরণের আলোচনায় সমস্ত কলকাতা যেন বনবন করে ঘুরপাক খেতে লাগলো।

গত ৯ই অগস্ট বৃহস্পতিবার হোলো ফাইনাল খেলা। মাঠের অবস্থা দেখবার মতো। সকাল ৬টায় এক উৎসাহী ভদ্রলোক শ্যামবাজার থেকে প্রথম এসে মাঠে পৌছন। তিনি আর মাঠ ছেড়ে যাননি, খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত ছিলেন। সাড়ে আটটা থেকে রীতিমতো কিউ আরম্ভ হয়ে যায়। বারটার সময় যাঁরা মাঠে এসে পৌছলেন তাঁদের কিউ-এর শেষ কোথায় খুঁজতেই আধ ঘণ্টা কেটেছিলো। এতো দীর্ঘ মানুষের সারি ইতিপূর্বে কখনো দেখিনি। প্রায় মাইলখানেক লম্বা, আর নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে এঁকেবেঁকে—কখনো পূবে কখনো পশ্চিমে, কখনো উত্তরে কখনো দক্ষিণে মোড় নিয়ে সেই মানুষের জনতা ছিলো ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে। ক্রমশ এতো ভিড় বাড়তে লাগলো যে মনে হচ্ছিলো ক্যালকাটা ক্লাবের সবুজ কাঠের পাঁচিল বুঝি মানুষের চাপে চুরমার হয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। সেদিন যত লোক মাঠে ঢুকতে পেরেছিলো অন্তত তার দশগুণ লোক ছিলো বাইরে দাঁড়িয়ে। এই সব দেখেও কলকাতায় স্টেডিয়াম যে কেন হয় না ভাবলে বিস্ময় লাগে। ইতিপূর্বে বহুবারই স্টেডিয়ামের প্রয়োজন লোকে অনুভব করছে কিন্তু সেদিন ফাইনাল খেলা দেখতে যাঁরা গিয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই অনুভব করেছেন এর পরেও কর্তৃপক্ষ যদি স্টেডিয়ামের অভাব না মেটান তা হলে নিশ্চয়ই তাঁদের মধ্যে সুস্থবুদ্ধি ও বিচারশক্তি সম্পন্ন পুরুষের একান্ত অভাব আছে।

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের চেয়ে সবদিক দিয়ে ভালো খেলে এক গোলে জিতে এই দ্বিতীয়বার আই. এফ্. এ

শিল্ড পেলো। মোহনবাগানের সেদিনকার খেলা যাঁরাই দেখেছেন তাঁরাই আশ্চর্য হয়েছেন নেবুবাগানের খেলা দেখছেন কিনা ভেবে এবং সেদিন মোহনবাগান কেন যে চার গোলে হারেনি এটা আমাদের কাছে একটা হেঁয়ালি হয়ে আছে। মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের দেখে সেদিন মনে হয়েছিলো তারা যেন মাঠে একবার দাঁড়াতে হয় বলেই দাঁড়িয়েছে, বল নিয়ে ছোটা কিংবা বিপক্ষকে বাধা দিতে যাবার মতো কোনো রকম চেষ্টাই তাদের মধ্যে ছিলো না।

বৃহস্পতিবার শিল্ডের খেলায় জিতে ইস্টবেঙ্গল শনিবার দিন ভবানীপুরের সঙ্গে লিগের শেষ খেলায় দু গোলে জিৎলো। ফলে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে তারা কলকাতার মাঠের সবচেয়ে বড় দুটি পুরস্কার আনলো নিজেদের তাঁবুতে। কলকাতার মাঠে এ-ধরণের ঘটনা অভূতপূর্ব।

এলিফেণ্টার পথে

শ্রীলা ঠাকুর (২৩২৯)

বাড়িতে ইলেক্‌ট্রিক আলোর তার লাগনো হয়েছে কিন্তু এখনো আলো জ্বালানো যায় না। তাই ভোর রাতের অন্ধকারে লণ্ঠনই একমাত্র সম্বল। দুর্ভোগের শেষ নেই; এটা খুঁজে পাই ত' ওটা খুঁজে পাই না, ছোট্ট হ্যারিকেন নিয়ে একবাড়ি অন্ধকারের সঙ্গে লড়াই করা চারটিখানি কথা নয়। তবু, সব গোছগাছ করে এই রাত থাকতেই বেরুতে হবে, এ বাড়ী ও বাড়ী ঘুরে দলের অন্যান্য সবাইকে ডেকে তুলতে হবে তারপর আসল রওনা হওয়া।

এই হাঙ্গামার পর দলবল জুটিয়ে যখন দাদার ইষ্টিশানে গিয়ে পৌছুলুম তখন নিজেকে রীতিমতো বীরপুরুষ মনে হলেও ঠাণ্ডায় হাড়ের ভেতর পর্য্যন্ত হী-হী করে কাঁপছে। এমন ঠাণ্ডা নাকি বোম্বাইতে এর আগে কখনো পড়েনি, সকলেই বলাবলি করছে।

এখানে এমনিতেই ভোর বেলাটা বেজায় কুঁড়ে, আকাশে আলো ছুটোতে ঘড়ির আটটা পেরিয়ে যায়। তায় অমন শীত। ফলে, দাদার ইষ্টিশানকে মানুষের তৈরি আলো এবং আমাদের দলবল যতটুকু আলোকিত করতে পেরেছে তাছাড়া বাকি সবটাই অন্ধকার। তার মধ্যে হুড়মুড় করে এসে পড়ে ইলেকট্রিকের ট্রেন, দশ-পনেরো মিনিট অন্তর-অন্তর ট্রাম-বাসের মতো এই ট্রেন আসে যায়। দাঁড়ায় কম, তাই হুড়মুড় করে উঠে পড়তে হয়।

ভারি ত' মাইল পাঁচ-সাতের পথ, তার মধ্যে এতগুলো গালভরা নামওয়ালা ইষ্টিশান। সে সব ইষ্টিশানে থামতে থামতে ট্রেন আমাদের উপস্থিত করল মশ্‌জিদ্ ইষ্টিশানে আর আমরাও সদলবলে চটপট নেমে পড়লুম। তারপর ভিক্টোরিয়া গাড়ীতে বোঁচকা-বুঁচকি তুলে রওনা হলুম ডকের দিকে, সেখান থেকে ষ্টিমার ছাড়বে। গিয়ে দেখি লোকের ভীষণ ভীড়; কোনো রকমে মরিবাঁচি করে টিকিট কেটে ষ্টিমারে চড়লুম। ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী! ষ্টিমার ছাড়ল: কত রকমের লোক, কেউ তাস খেলছে, কেউ গাইছে, এমনি কত কি। এমন মজার লাগছিলো! আকাশে আলো দেখা দিয়েছে, সমুদ্রের এদিক-ওদিক ছড়ানো ছোটখাট পাহাড় আর দ্বীপ, দূরে ফেলে আসছি বোম্বাই সহর। মাথার উপর সাদা বকের সার উড়ে গেল, যেন বেলফুলের মালা। হঠাৎ দূরে চোখ পড়ল—একদিকে আকাশ আর জল একেবারে মিশে গেছে।

ষ্টিমার এসে দাঁড়ালো ছোট্ট দ্বীপের কাছে কিন্তু একটু তফাতে। ষ্টিমার থেকে নামতে হল নৌকোয়, নৌকো নামিয়ে দিল ডাঙ্গায়। তারপর যে যার পোঁটলা-পুটলি সামলে পাহাড় বেয়ে চলতে সুরু করলুম। হাঁটতে হয় মাইল আড়াই পথ, তাও পাহাড়ী পথ। তাই এলিফেণ্টা গুহার কাছে যখন পৌছলুম তখন রীতিমত হাড়মাস ভাজাভাজা লাগছে। তা লাগুক। কিন্তু কী আশ্চর্য্য এই গুহা। কত বছর আগে জানি না, কোন যে শিল্পী তার নামও কেউ বলতে পারে না এই পাথরের স্তূপে কী অদ্ভুত সব শিল্পসম্ভার রেখে গেছে! কোথাও বা বিরাট মূর্ত্তি কোথাও বা দেয়ালের গায়ে কারুকার্য্য কোথাও বা গুহার ঘরটাই এমন সুন্দর যে সত্যি শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। আমরা ত' সবাই হৈ হৈ করে ঘুরে দেখতে সুরু করলুম। কিন্তু ঘুরে দেখবারও একটা শেষ আছে, কেন না সুন্দর জিনিষ দেখলে মন ভরে, পেট ত আর ভরে না! তাই পেট ভরাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বাগানের একটা নির্জন জায়গা বেছে বের করা হল আর খোলা হল পোঁটলা-পুঁটলি। কিন্তু ও-হরি খাবার-দাবার যে বড্ড কম আনা হয়েছে। কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমার এক দিদি ভার নিলেন ভাগ করবার। কী রকম ভাগ একবার শোনো—দুটো ডিমকে আঠারো টুকরো করে আঠারো জনের মুখে দেবার বন্দোবস্ত! অবশ্য এ ছাড়াও লুচিমাংস ফলটলও ছিল। নইলে সারাদিনের পর বিকেল বেলায় অতখানি পথ হেঁটে আবার নৌকো, নৌকোর পর ষ্টিমার, ষ্টিমারের পর ভিক্টোরিয়া, ভিক্টোরীয়ার পর ট্রেন—এই দুর্গম পথ পেরিয়ে ফিরতুম কেমন করে?

রংমশালের ছোট্ট বন্ধুরা,

আজ ২২শে শ্রাবণ। দেখতে দেখতে তিনটে বছর কেটে গেল। বাস্তবিক, সময় কী অসম্ভব তাড়াতাড়ি বয়ে চলে। তিন বছর আগেকার সেই ২২শে শ্রাবণের ছবি আজও যেন স্পষ্ট দেখতে পাই। ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছিল সেদিন। পথে তবু জনারণ্য। এত মানুষ কেন? কই বৃষ্টিতে ত' বাড়ি ছুটছে না কেউ! কোন দিকে ছুটেছে? জনতা কিন্তু অমন স্তব্ধ কেন? বাইরে থেকে কেউ এলে সহরের চেহারা দেখে চমকে উঠতো! কী হল? সহর শুদ্ধ লোকের আজ এ কী হল? রেডিওয় তখনো তাঁর জোরালো গলা শোনা যাচ্ছে, কিন্তু মানুষের মনে শান্তি যে নেই। শেষবারের মতো তাঁকে একবার দেখবার জন্যে সবাই ছুটেছে। বেশ মনে আছে পথে যেতে-যেতে দেখলুম পাশ দিয়ে চলেছেন এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক। বলছেন—"বাংলা দেশে আজ এই প্রথম এসে পৌছলুম। রবীন্দ্রনাথের বই পড়েছি শুধু তর্জমায়, রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি শুধু ছবিতে।···স্টেশনে খবর শুনে সোজা ছুটে এলুম, তাঁর নিজের ভাষার বই

পড়বার সৌভাগ্য হবে কি না জানি না, তবে একবার যদি তাঁকে দেখতে পাই…।" রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলার নন! অসম্ভব ভীড়। মাড়োয়াড়ীরা জনতার উপর হাতপাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে। শিখ ড্রাইভাররা গাড়ি থামিয়ে মাথা নোয়াচ্ছে। কচি চীনে ছেলের দল চলেছে সাদা ফুলের মালা নিয়ে।…এই রকম কত টুকরো ছবি। আর কী স্পষ্ট! এখনো দেখতে পাই! সেই ২২শে শ্রাবণ। তিন বছর আগেকার কথা।

আজ ২২শে শ্রাবণ। কী করব? কী ভাবে তাঁর স্মৃতি পালন করব? টেবিলে কয়েকটা চিঠি জমেছে দেখছি—নানান জায়গায় সভা-সমিতি হবে তারই ডাক। সভায় যাব? তাঁর সেই কবিতা মনে পড়ে:

"—সেদিন যেন কবির তরে
ভিড় না জমে সভার ঘরে,
না হয় যেন উচ্চস্বরে
শোকের সমারোহ—"

কী হবে? সভা সমিতি করে কী হবে? জাঁক করে বক্তৃতা দেওয়া! তাতে আসে যায় কতটুকু? জাঁক না হয় নাই হল; না হয় নম্র গম্ভীরই হল সভার সুর, কিন্তু? সেই ত গঙ্গাজলেই গঙ্গাপূজো! যে ভাষায় সভাসমিতিতে কথা বলা হবে, সে ভাষা যে তাঁরই শেখানো ভাষা। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে এতখানি গভীর যে আমাদেব ভাষা, আমাদের ভাব সবই যেন তাঁর কাছ থেকে ধার করা। আর লাভই বা কি? সভাসমিতির নিমন্ত্রণপত্রগুলো সরিয়ে রাখি টেবিল থেকে। বড্ড খেলো মনে হয় সভাসমিতির আয়োজন।

২২শে শ্রাবণ আজ। তিন বছর আগেকার শুধু টুকরো ছেঁড়াখোঁড়া কয়েকটা ছবি চোখের সামনে ভাসে। আর কেবল মনে হয়: আজ ২২শে শ্রাবণ।

হঠাৎ চোখ পড়ে বইএর আলমারির দিকে। সারি সারি তাঁর বই। তিন বছরের ধূলোয় কি ম্লান হয়েছে? মোটেই নয়। তাঁর দীপ্ত জ্যোতির স্বাক্ষর সেই বইতে। যুগের পর যুগ মুঠো মুঠো ধূলো ছড়িয়ে যেতে পারে। কিন্তু ম্লান করতে পারে না। কেন না, ধূলোর রাজ্যের জিনিস এ যে নয়, এ যে মর-অমরের সন্ধিস্থল!

অদ্ভুত লাগে। তীব্র বিস্ময় আর গভীর তৃপ্তি। বই-এর পাতায় ডুবে যেতে-যেতে মনে হয় তিন বছর আগেকার ছেঁড়াখোঁড়া ছবিগুলো অবছা হতে-হতে মিলিয়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তাঁর গ্রন্থে আজও উদ্দাম প্রাণের স্পন্দন। মৃত্যুর ধূসর ছবি সেখানে ঠাঁই পায় না।

সভায় সমিতিতে জোর বক্তৃতা চলুক, সেখানের আবহাওয়া হয়ে উঠুক ফাঁকা উচ্ছ্বাসে বিষাক্ত। আমার এই ছোট্ট ঘরের কোণায় তাঁর গ্রন্থ আমায় দিক তাঁর গভীর স্পর্শ। এইটেই কি ২২শে শ্রাবণ পালন করবার একমাত্র পথ নয়? তাঁর বই, তাঁর গান, তাঁর ছবি। আমাদের মনে মনে আজ নতুন ভাব জেগে উঠুক, আমাদের আলো দিক, প্রেরণা দিক, পথের নির্দেশ দিক। ২২শে শ্রাবণ আজ। আজ আর সভাসমিতির গুমোট আবহাওয়া নয়। কচি মনের উন্মুখ প্রান্তরে আজ বুকভরে নিশ্বেস নেওয়া যাক। ভুলে যাওয়া যাক জীবনের সব গ্লানি, সব সংকীর্ণতা।

অবাক লাগে। পুরোনো লেখা নতুন করে দেখছি, নতুন করে চিনতে চাইছি। উপমা দিয়ে বোঝাবো? একমাত্র হিমালয় পাহাড়ের কথা মনে পড়ে। তার একেবারে কোলে দাঁড়িয়ে ধারণাই করা যায় না কী বিরাট, কত ঐশ্বর্য! দূর থেকে সরে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়, নইলে শুধু একটুখানি চোখ পড়ে, তাতেই চোখ আড়াল হয়ে যায়! যতদিন যাবে, যত দূর থেকে সমগ্রভাবে দেখতে পাব ততই তাঁর বিরাট ঐশ্বর্য ধরতে পারব আমরা। তবুও, কথাটা হয়ত ঠিক হল না। হিমালয়কে দূর থেকে সমগ্রভাবে দেখলে বিরাটত্বের আসল আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তবু সেইটুকুই সব নয়। ছুটতে হয় তার চূড়ো থেকে চূড়োয়, আকণ্ঠ পান করতে হয় তার স্বচ্ছ নির্ঝরিণীর জল, থমকে মুগ্ধ হয়ে দেখতে হয় তার অজস্র ফুলের অকৃপণ সৌন্দর্য। দূর থেকে শুধু মাথা নোয়ালেই হবে না: রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গান-ছবি-গল্প—তার মধ্যে ডুবে যেতে হবে সম্পূর্ণভাবে।

বছরের পর বছর কেটে যাবে। ইতিহাস আমাদের ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইবে তাঁর কাছ থেকে। তাতেও লাভ আছে। তাঁর পূরো ব্যক্তিত্বের আভাস পাওয়া যাবে, সমগ্রভাবে দেখতে পাব তাঁকে। আর প্রতি বছর ২২শে শ্রাবণ মনে মনে ঠিক করব তাঁর গ্রন্থ, তাঁর গান, তাঁর ছবি আমাদের আরও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠুক। সভাঘরের গুমোট আবহাওয়ায় গিয়ে লাভ কি?

সুন্দর ঝকঝকে বই কিনে আনলুম আর পরপর রাখলুম সাজিয়ে। তিন খণ্ডের বই শক্ত মলাট দিয়ে বাঁধানো। প্রত্যেক বইএর প্রত্যেক মলাট ১/৪ ইঞ্চি পুরু এবং প্রত্যেক বইএর পাতা সবশুদ্ধ এক ইঞ্চি পুরু। দিন তিনেক পরে দেখি একটা কোথাকার নচ্ছার পোকা প্রথম খণ্ডের প্রথম পাতা থেকে শেষ খণ্ডের শেষ পাতা পর্যন্ত কেটে-কেটে একটা সরু নালা বানিয়েছে। বইগুলো ত' নষ্ট হলই এমন কি পোকার তৈরি নালাটা মোট ক' ইঞ্চি লম্বা হওয়া উচিত তা হিসেব করতে গিয়েও মাথা গুলিয়ে গেল। তোমরা হিসেবটা করে তাড়াতাড়ি পাঠাতে পারো? খুব তাড়াতাড়ি পাঠিও, কেন না আশ্বিন সংখ্যার মালমশলা ছাপাখানায় পাঠাবার আগে উত্তর-দাতাদের নামের ফর্দটা আমায় তৈরি করে ফেলতে হবে।

ধাঁধাঁর উত্তর

```
   ৩১৫
   ২৭৫
  ----
  ১৫৭৫
 ২২০৫
 ৬৩০
 -----
৮৬৬২৫
```

উত্তরদাতাদের নাম

রঞ্জন শান্তা ও সুব্রত রায়চৌধুরী (২০০৫), সাধনা দাস (২১৯৪), রাধিকারঞ্জন চক্রবর্তী (২৫১৩), অলকা দত্ত (১৬৯৯), অশোক রায় (২০৯৩), দীপালি ঘোষ (২১৮৫), মীরা সুভাষচন্দ্র ও কার্তিকচন্দ্র বসু, বিনয়ভূষণ দত্ত (২৪৬০), কালিদাস বিশ্বাস (২৪৯১), মা ছোটদি বাব্‌লু অরুণ রাঙ্গাদি সত্যব্রত ও দেবব্রত ঘোষ (২৪২২), সৈয়দ নূরুল আলাম (২০৬৬), যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), দীপকমোহন রায় (২৫১৫), তরুণ ঘোষ (২৪৮৫), বেবী সতী ও গীতিন্দ্র মৈত্র (৯৯০), শৈলেন্দ্রকুমার সরকার (২২২৬), অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (২১০৩), কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (৯০), বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় (৪২), কল্যাণ ও সোমেন

সেনগুপ্ত (১৮৬৫), দেবেন্দ্রনাথ দত্ত (২৫১৪), শ্রীপুর এম্. ই. স্কুলের ছাত্রগণ (২১৭৩), অনিতা দাশগুপ্তা (১৩০৯), অমিয়াংশু চৌধুরী (?), বিজয়া গঙ্গোপাধ্যায় (২৩৫৯), অমিতাভ চট্টোপাধ্যায় (২১৫৫), শোভনা ও দেবব্রত মজুমদার (১৯১৫), জিয়াগঞ্জ গার্লস্ এম্. ই. স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ (২৪২৩), বিজয়া গঙ্গোপাধ্যায় কুট্টিকাকা ও শুক্লা (২৩৫৯), সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), সমীর ও সন্ধ্যা গোস্বামী (৭৮), মহম্মদ আমীর হোসেন (২৫২৩), অজিতকুমার মণ্ডল (২৪৭৯), সমরেন্দ্রনাথ দেব (২১৯৩), অলকা অর্পণা ও পশুপতি দাসগুপ্ত (২৪৩১), শচীন ভৌমিক (২৪৩৮), বিমলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩৬০), মা বাবা দাদা দিদি মঞ্জুশ্রী ও সুমিত্রা (১৬৫৪), জয়ন্তলাল নিয়োগী (২০৮৬), সুকুমার সাহা (২৪৯২), বেনুগোপাল ও বিজয়গোপাল চট্টোপাধ্যায় (২৩৮৫), পীযূষকান্তি ঘোষ ক্ষীরোদ তুষার ইত্যাদি (২১৬০), সুখেন্দু মণ্ডল (২২৬০), ভোলা, ও থোকন (১৯১৮), জানকীকান্ত পাল (২৪৫৩), মীরা ঘোষ (২৪৭২), জগদীশচন্দ্র ইন্দ্র (২৪৬১)।

আষাঢ়ের উত্তর যারা দেরি করে পাঠিয়েছ খুকু চাঁদা মাধব ও কেশব (২৩৫৭)।

রংমশালের পাঠক-পাঠিকাদের জন্য

তোমরা শুনে সুখী হবে যে আশ্বিন মাস থেকে রংমশালের চেহারা যুদ্ধের আগের মতোই প্রায় মোটা হবে। এ-কারণে আশ্বিন ও কার্তিক মাসের পত্রিকা বেরুতে কিছু দেরী হতে পারে। অগ্রহায়ণ থেকে যাতে মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের কাছে পত্রিকা পৌঁছে দিতে পারি তার জন্যে বিশেষ চেষ্টা চলছে।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

[দশম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা : আশ্বিন, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

পরিমল রায়

মজার দেশ

এক যে আছে মজার দেশ,
সব রকমে খাসা,
ইংরেজীতে কেতাব পড়ে'
ভুলছে লোকে ভাষা।

জন্মে সেথায় ছেলেরা সব
বল্‌ছে 'ফাদার' 'মাদার',
কালো কালো মানুষগুলোর
ভয় ঘোচে না সাদা-র।

সেই দেশেতে মানুষ পালায়
লাল পাগড়ী দেখে'
ছেলেরা সব চাকরী খোঁজে
স্বাধীন ব্যবসা রেখে।

দোকান-ভরা খাবার তবু
মানুষ মরে পথে,
দেশের লোকেই দেশটাকে ভাই
করে' দিচ্ছে ফতে।

রোগে ভুগে ছেলে বুড়ো
মর্‌ছে লাখে লাখে,
বল্‌ছে সবাই, মারলে কৃষ্ণ
কে-ই বা তা'রে রাখে!

গুণী এবং জ্ঞানী যা'রা
উপোস করে' মরে,
মূর্খ যত গুঁচা যত
গাড়ী ঘোড়া চড়ে।

যুগ কেটে যায়, হুঁস্ জাগে না,
হুজুগ আছে লেগে,
আউড়ে যত মিথ্যে বুলি
ভিক্ষে বেড়ায় মেগে।

মজার দেশের মজার কথা
বলবো কত আর,
অধঃপাতের লম্বা সড়ক
হচ্চে পরিষ্কার!

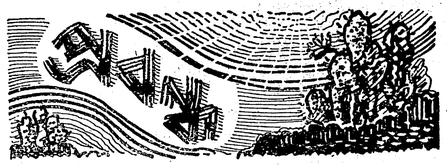

বড়দের ছোটোবেলা

[দেশের জ্ঞানী এবং গুণীদের ছোটোবেলার কথা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে। এই বিভাগে মাঝে মাঝে আমরা সে ধরণের লেখা ছাপবার ব্যবস্থা করেছি।— রং সং]

প্রথম চিঠি

অন্নদাশঙ্কর রায়

ছেলেবেলায় যাদুঘর দেখিনি। আমার চোখে ডাকঘরই ছিল যাদুঘর। বিকেলে যখন আর সবাই যেত ফুটবল খেলতে আমি ও আমর বন্ধুরা দিতুম ডাকঘরে হাজিরা। তিন তিনটে রানার পশ্চিম মুখো ছুটে আসত গান গাইতে গাইতে, তাদের পিঠে কাঁঠালের মতো ফলে থাকত ইয়া বড় বড় চিঠির বস্তা, আর পুলকিত হয়ে আমরা ভাবতুম, শুধু কি চিঠি! পার্সেল! তাদের হাতে থাকত চাকার মতো গোল গোল লোহার বাল্‌/ কি কড়া। দূর থেকে শুনতে পেতুম ঝম ঝম করে বাজছে। ডাকঘরের ভিতরে ঢুকে তারা কাঁঠাল নামিয়ে দিত আর আমরা ভন ভন করতুম মাছির মতো। যারা একটু দুঃসাহসী তারা ডাকঘরের নিয়ম না মেনে অনধিকার প্রবেশ করত! যদি কোনো বেওয়ারিশ ক্যাটালগ কি মাসিকপত্র এসে থাকে তো আগে থাকতে দখল করত। পোস্ট মাস্টার মশাইরা ছিলেন সাধারণত ভালোমানুষ। কিছু মনে করতেন না। প্রায়ই আমরা যা হোক একটা কিছু হাতে করে ফিরতুম। হয়তো ওষুধের বিজ্ঞাপন। হয়তো নীলামী ইস্তাহার।

বাবার নামে, মা'র নামে চিঠিপত্র থাকলে মাস্টার মশাই আমার দিকে বাড়িয়ে দিতেন। আমার লোভ ছিল খবরের কাগজখানার উপরে। মোড়ক খুলে একটি বার পড়তুম, তার পরে মোড়কের ভিতর পুরে বাড়ী নিয়ে যেতুম। আমার এ দুর্ব্বলতার কথা সকলে জানত। যা কেউ জানত না, যা কেউ জানলেও বিশ্বাস করত না, সে কথা আজ তোমাদের বলছি। আমি যে ফুটবল খেলা ফেলে ডাকঘরে হাজিরা দিতুম তা কেবল ক্যাটালগের বা খবরের কাগজের লোভে নয়। আমার আশা ছিল আমার নামেও একদিন চিঠি আসবে। কে যে লিখবে, কোনখান থেকে যে লিখবে, অত ভাবতে পারতুম না। কিন্তু লিখবে নিশ্চয়, খরচ করে টিকিট এঁটে খামে বন্ধ করে নাম ঠিকানা লিখে পাঠাবে নিশ্চয়। এই আশা আমাকে রোজ টেনে নিয়ে যেত যাদুঘরে। আমার জীবনে ওটা একটা যাদু। ঐ যে চিঠিখানা, যেটা আমার নামে আসবে।

এক দিন আমার স্বপ্ন সত্য হলো। এলো আমার নামে চিঠি। লম্বা একখানা খাম। তরা বাঁ দিকে একখানা ছবি। ছাপা ছবি। ডান দিকে আমার নাম ঠিকানা। আমাকে অবাক করে দিয়ে মাস্টার মশাই বললেন, "এই নাও, খোকন। তোমার নামে চিঠি।"

আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ খেলে গেল। আমার নামে চিঠি! আমার কত সাধের, কত আশার চিঠি! আমার, শ্রেষ্ঠ চিঠি আমার, সাত রাজার ধন মাণিক চিঠি! আমি হাত পেতে চিঠিখানি নিতে যাব এমন সময় ওখানি খপ করে কেড়ে নিলে আমার বন্ধু—থাক, তার নাম করব না। ভেবেছিলুম একটি বার দেখে ফেরৎ দেবে। পরের চিঠি পড়া যে পাপ। কিন্তু সেই যে নিলে আর দেবার নামটি নেই। "আরে, দে!, আরে, দে!" বলে যত তারে সাধি সে তত শয়তানি করে। তত দূরে পালায়। তার পিছন পিছন তার বাড়ী যাই। দেয় না। তার বা

মাকে বলি, ফল হয় না। কোথায় যে গেল সে চিঠি, আর আমার চোখে পড়ল না। দুঃখ পেলুম।

পরে জেনেছিলুম চিঠিখানার প্রধান আকর্ষণ ছিল তার উপরকার সেই ছবিখানা। ছবিখানাকে কেটে নিয়ে বাকীটা আমাকে দিলে পারত, কিন্তু যে কাগজে চিঠি লেখা হয়েছিল সেই কাগজটাই ভাঁজ করে খাম তৈরি করা হয়েছিল। খাম ও চিঠি অভিন্ন। কাজেই ছবি কাটা গেলে চিঠিও কাটা যায়। এ ছাড়া হয়তো আরো এর কারণ ছিল। সেটা ছেলেমানুষী হিংসে। ওর নামে চিঠি এলো না, আমার নামে এলো। এ কি কখনো সত্য হয়! ওর ধারণা চিঠিখানা ওরই পাওনা, যদিও নাম ঠিকানা ওর নয়, আমার। বোধ হয় ঠাওরেছিল ওটাও একটা বিজ্ঞাপন কি ইস্তাহার। নইলে ছবি থাকবে কেন!

কে যে আমাকে চিঠি লিখেছিল, কী যে লিখেছিল, আজো আমার অজানা। এ নিয়ে কত জল্পনা কল্পনা করেছি। কত রং ফলিয়েছি। মনে মনে কত গল্প ফেঁদেছি। চিঠিখানা যদি হাতে এসে ফস্কে না যেত খুলে পড়তুম নেহাৎ একটা মামুলি চিঠি। পড়িনি বলেই ও চিঠি আজো আমার মনে রয়েছে কী যেন এক রহস্য হয়ে। যা হয়েছে ভালোই হয়েছে।

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেকটিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অদ্ভুত ছেলে এই অশোক! বাস্তবিকই অদ্ভুত! এখন তার চেহারা দেখে কে অনুমান করবে মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে বন্ধুকে বুদ্ধির খেলায় পরাস্ত করবার ছেলেমানুষি আনন্দে ও অমন উচ্ছল হয়ে উঠেছিল। ভবতোষবাবুর কথা শোনবার সময় ওর চোখমুখের ভাব অতি-প্রবীণ অতি-গম্ভীর মানুষের মতন; হালকা হাসির ধারকাছ দিয়েও যেন যেতে চায় না। বেতের টেব্‌লটার উপর দুটো কনুই রেখেছে; বাঁ হাতের চেটোটা বন্ধ দুচোখের উপর চাপা, ডান হাতের সরু সরু দুটো আঙুল দিয়ে মাথার একগোছা চুল টেনে টেনে ক্রমাগতই কপালের উপর নামাচ্ছে। শরীরে আর কোথাও বিন্দুমাত্র কোন রকম চাঞ্চল্যের লক্ষণ নেই।

প্রতাপচন্দ্রের ইতিহাস ভবতোষবাবু আগাগোড়া বলে চললেন:

"উদয়চন্দ্রের যখন মৃত্যু হয় তখন প্রতাপচন্দ্র বিদেশে। কি একটা দার্শনিক বিষয় নিয়ে ফ্রান্সে গবেষণা করছেন 'ডাক্তার' উপাধির জন্যে। তাঁর কাকার মৃত্যু সংবাদ আমিই তাঁকে কেব্‌ল্ করে জানাই এবং সেই সঙ্গে উদয়চন্দ্রের এ্যাটর্নী হিসেবে জানাই উইলের কথা। উদয়চন্দ্রের অগাধ বিষয় সম্পত্তি; নিজে এসে দেখাশুনো না করলে নানান হাঙ্গামা বাধতে পারে এই জন্যে প্রতাপ-চন্দ্রকে অনুরোধ করি সঙ্গে সঙ্গে দেশে ফিরতে। কিন্তু লোকটি যাকে বলে একেবারে বৈরাগী; সম্পত্তি সম্বন্ধে অমন উদাসীন ভাব তোমরা ভাবতেও পারো না। তাঁর লেখাপড়ার কাজ বিষয়-আশয়ের কাজের চেয়ে ঢের বেশী গুরুতর; ফলে তিনি অনুরোধ করলেন লক্ষ্ণৌতে তাঁর দূর সম্পর্কের ভাই ধীরবিক্রমকে আপাতত বিষয় টিষয় দেখতে বলতে! অনেক হাঙ্গামা করে ধীরবিক্রমকে আবিষ্কার করলুম বটে, কিন্তু এক বৈরাগীর পাল্লা থেকে আর এক বৈরাগীর পাল্লায় পড়া গেল। সম্পত্তি নিয়ে এমন সাধাসাধি করার কথা আমি গল্পেও পড়ি নি। ধীরবিক্রম লক্ষ্ণৌ-এ থেকে লেখাপড়া করত, অর্থাৎ খেলাধূলো করত। কেন না, সহরে ওর নাম ছিলো পয়লা নম্বর হকি খেলোয়াড় বলে এবং কলেজের খাতায়

ওর নাম ছিল নিছক খেলার খাতিরে। বাপের অবস্থা মন্দ নয়। বলে, আজীবন ধীর ভাবে বসে কাটালেও পৈত্রিক টাকার কিছু বাকি থাকবে, তাই দিয়ে ঘটা করে শ্রাদ্ধ-শান্তি করা চলবে! তা হলে আর সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করা কেন? তা ছাড়া, পরের টাকায় যখ্ হয়ে বসে পাহারা দেবার মতো বিড়ম্বনা আর নেই; কোথায় পান থেকে একটু চূন খসবে আর তার জবাবদিহির হাত থেকে ইহলোকে যদিই বা পরিত্রাণ পাওয়া যায় পরলোকে কোনমতেই পাওয়া যাবে না। মহা বিপদ। রাজি কিছুতেই করাতে পারি নে। লিখলুম প্রতাপচন্দ্রকে। তিনি আবার লিখলেন ধীরবিক্রমকে। আমি আবার দেখা করলুম ধীরবিক্রমের সঙ্গে। এই রকম ভাবে কাটল মাস কতক। মনে হল তুটি একেবারে খাস পাগলের পাল্লায় পড়া গিয়েছে!"

"তা হলে," কুন্থ হাসতে হাসতে বল্ল, "বংশে পাগলামির প্রবাদটা নেহাৎ বাজে কথা নয়।"

"হুঁ; পাগলামিই বই কি," ভবতোষবাবু বল্লেন, "এক ধরণের পাগলামি ছাড়া আর কি? তবে একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম, সম্পর্ক তুজনের মধ্যে যত দূরই হোক না কেন, মনের ঘনিষ্ঠতা একেবারে নিরেট।"

"তারপর কী হল?"—দিদি একটু অধৈর্য্যভাবেই প্রশ্ন করলেন।

"তারপর", ভবতোষবাবু আবার বলে চল্লেন, "সেই দূর সম্পর্কের ভাইটিকেই নিকটে আসতে হল। অর্থাৎ, ধীরবিক্রম শেষ পর্য্যন্ত অত্যন্ত অনিচ্ছাসত্বেও উদয়ভবনে কিছুদিনের জন্যে এসে থাকতে রাজি হল। সর্ত হল প্রতাপচন্দ্র বিদেশ থেকে ফিরলেই ধীরবিক্রম ছুটি পাবে।

"প্রথমটায় ধীরবিক্রম যেমন ভয় পেয়েছিলো এসে দেখলে সে রকম কিছু নয়। বোম্বাইতেও রীতিমত হকি খেলার আদর আছে এবং জাঁকালো খেলোয়াড়েরও অভাব নেই। উদয়ভবনের পথেই দিনকতকের মধ্যে দেখা গেল ধীরবিক্রম এক ডাকসাইটে হকি-টীম তৈরী করে নিয়েছে; সান্তা ক্রস্ অঞ্চলের যত ডানপিটে গোয়ানিস ছোকরা জুটেছে তার দলে আর ধীরবিক্রমের দক্ষতায় এক একটি তুখোড় খেলোয়াড় হয়ে উঠ্ছে। মাঝে মাঝে আমি বৈষয়িক ব্যাপার নিয়ে দেখা করতে যেতুম; কিন্তু এ সব কথা উঠলেই সে হাই তুলতে সুরু করত, হাত জোড় করে মিনতি করত ও-সব ব্যাপার থেকে রেহাই দিতে। তবু্ও, মনে মনে আমি খুব খুশীই ছিলুম; হাজার হোক, উদয়ভবনে তবু একজন ত' রয়েছে।"

অশোক এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করল, "কিন্তু একটা কথা বুঝতে পারছি না ভবতোষদা। প্রতাপচন্দ্রের আত্মীয় স্বজন বলতে কি তুনিয়ায় আর কেউ নেই যে ধীরবিক্রমকে ছাড়া আর আপনাদের চলছিলো না?"

ভবতোষবাবু বললেন, "ঠিক বলেছ! ধীরবিক্রমই যাকে বলে সবেধন নীলমণি।"

"ও! তারপর?"—অশোক আর কথা বাড়াতে চাইল না।

"তারপর কিছুদিন কাটল নির্ব্বিঘ্নে। প্রতাপচন্দ্র পড়াশুনো শেষ করে ফিরে এলেন এবং ধীরবিক্রম স্বস্তির নিশ্বেশ ফেলে পালাতে চাইল। প্রতাপচন্দ্র অনেক ভাবে আবেদন নিবেদন করতে লাগলেন। কিন্তু ধীরবিক্রম একেবারে অবুঝ। এই অগাধ টাকার মধ্যে বেশী দিন থাকা তার মতে মোটেই উচিত নয়, কেননা ছোঁয়াচ লাগতে পারে, নেশা ধরতে পারে,—টাকার নেশা।"

"যাকে বলে একেবারে বৈরাগী!"—দিদি বললেন।

"হুঁ; একেবারে পাকা বৈরাগী", ভবতোষবাবু বলে চললেন, "যাই হোক, ধীরবিক্রম দিনকতকের মধ্যেই বিদায় নিলেন এবং প্রতাপচন্দ্র ডুবলেন উদয়ভবনের বিরাট লাইব্রেরীর মধ্যে। মাসকতক বেশ নির্ব্বিঘ্নেই কাটল; আমিও যার সম্পত্তি তার হাতে তুলে দিতে পেরে এক রকম নিশ্চিন্তই ছিলুম। কিন্তু সুখ সইল না বেশী দিন। মাস কতক বাদেই দারুণ তুর্য্যোগ সুরু হল।"

"কী ধরণের তুর্য্যোগ?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"প্রথম লক্ষ্য করলুম প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন। এমনিতেই একটু ভাবুক ধরণের লোক, দিনরাত পুঁথিপত্তর নিয়ে পড়ে থাকেন। এই অল্প বয়েসেই প্রকাণ্ড পণ্ডিত হিসেবে নাম করেছেন। বিষয়কর্ম্মের কাজ নিয়ে তাঁর কাছে মাঝে মাঝে যেতেই হত এবং তাঁর লাইব্রেরীতেই বসে কথাবার্তা সব হত। নানান বিষয়ের তুর্ব্বোধ্য পুঁথির স্তূপে তিনি যেন সব সময় চাপা থাকতেন। বৈষয়িক কথা যত কমের মধ্যে হয় সেরে নিয়ে বিদায় নিতুম। কিন্তু, সেদিন গিয়ে দেখি তাঁর চেহারা একেবারে অন্য রকম—"

"কতদিন আগেকার কথা বলছেন?" অশোক প্রশ্ন করল।

"তা মাস আষ্টেক হবে বোধ হয়। দেখলুম তাঁর অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজিত। আমায় চটপট বিদায় দেবারও কোন উৎসাহ দেখলুম না। একটু বসতে বললেন, চাকরকে বললেন চা দিয়ে যেতে, নিজেই চা তৈরি করতে লাগলেন। কিন্তু চুপচাপ। কি যেন একটা কথা বলি বলি করেও বলতে পারছেন না। অত্যন্ত অস্বস্তিকর অবস্থা। আমি নিরুপায় ভাবে পাশের থেকে একটা বই তুলে নিলুম এবং চমকে উঠলুম। আজকাল বাজারে প্রেত লোক সম্বন্ধে যে রকম উদ্ভুট্টে গাঁজাখুরী বই ছড়ানো থাকে সেই জাতের একখানা বই। অতবড় গম্ভীর পণ্ডিত এ ধরণের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বই নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে পারেন তা যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। তারপর ভাবলুম, কোনমতে আর পাঁচটা বইএর সঙ্গে এ বইটা হয়ত দৈবাৎ ছিটকে এসেছে। সেটা রেখে দিয়ে আর একটা বই তুলে নিলুম। দেখলুম একই জাতের বই। তারপর আর একটা, তারপর আর একটা। দেশি বিলিতি যত সব আজগুবি বই-এ তাঁর পড়ার টেবল্ বোঝাই রয়েছে দেখলুম! বিস্ময়ে আমার দম প্রায় বন্ধ হয়ে যাবার জোগাড়! এত বড় পণ্ডিত কি না প্রেতলোক এবং পরলোক নিয়ে এই সব অপাঠ্য পুঁথিতে ঘর বোঝাই করেছেন এবং মনে হচ্ছে শুধু এই সব বই-ই আজকাল তিনি পড়ছেন। চমক ভাঙ্গল প্রতাপচন্দ্রের কথায়, চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিতে দিতে তিনি বলছেন—'চা নিন!' নিলুম চা। অবাক হয়ে চাইলুম তাঁর দিকে। দেখি এক অদ্ভুত ভীরু তুর্ব্বল হাসি তাঁর ফ্যাকাশে ঠোঁটের পাশে।—'আজকাল শুধু এই সব বইই পড়ছি'—প্রতাপচন্দ্র যেন জোর করে হাসবার চেষ্টা করলেন—'আপনার অবাক লাগছে! না?'

"'তা অবাক লাগবার ত কথাই', আমি বললুম,—'আপনার মত পণ্ডিত ব্যক্তিও যদি'—

"প্রতাপচন্দ্র বাধা দিলেন—'হুঁ। ব্যাপারটা একটু খাপছাড়া লাগবার কথা বই কি। কিন্তু কি জানেন! আমি শেষ পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখতে চাই। জীবনে যখনই যা জানতে চেয়েছি শেষ পর্য্যন্ত জানবার চেষ্টা করেছি। অনেক কিছুই জেনেছি, অনেক কিছুই পড়েছি। কেবল প্রেতলোকের ব্যাপারটাই এতদিন অগ্রাহ্য করে এসেছি'—"

"'কিন্তু অগ্রাহ্য করবার মতই নয় কি?'"

"'তাই ত মনে করতুম। এখন দেখছি প্রকাণ্ড ভুল করতুম।' প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন, চা দিয়ে গলা ভিজিয়ে নিলেন তারপর প্রায় খাপছাড়া ভাবেই বললেন—'আমাদের বংশে একটা পাগল হয়ে যাবার প্রবাদ আছে জানেন নিশ্চয়ই।'

"'হুঁ। শুনেছি বই কি। কিন্তু সে ত প্রবাদ মাত্র; তার বেশী কিছু নয়।'"

"'আমারও তাই ধারণা ছিল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা এতদিনে আবিষ্কার করেছি।' আমি অবাক হয়ে চেয়ে রইলুম। প্রতাপচন্দ্র বলে চললেন—'আসল ব্যাপারটা হল আমাদের বংশে এক বিষাক্ত অভিশাপ আছে। এক সূর্য্যপূজারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ! এই অভিশাপের দরুণ এক পুরুষ অন্তর আমাদের বংশে উন্মাদের উদয় হয়। আমার ঠাকুরদাদা অবশ্য অল্প বয়েসে মারা গিয়েছিলেন, উন্মাদের লক্ষণ দেখা দেয় ৩০ বছর বয়েসে। তাই ছাব্বিশ

বছর বয়সে মারা গিয়ে তিনি এ অভিশাপের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন।'

"'কিন্তু তাঁর ঠাকুর্দ্দা?'—আমি প্রশ্ন করলুম। প্রতাপচন্দ্র বললেন—'তাঁর ঠাকুর্দ্দা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু শুনিনি। কার কাছেই বা শুনব বলুন? জ্ঞান হবার পর দুজন আত্মীয়কে মাত্র দেখেছি, ধীরবিক্রম এ সব কিছু মানে না, জানতে চায়ও না আর কাকা এ সব কথা নিশ্চয়ই জানতেন কিন্তু এ নিয়ে আলোচনা করতে কখনো রাজি ছিলেন না। আপনি ত' জানেন কী অসম্ভব গম্ভীর ছিলেন তিনি।'

"'তা অবশ্য জানি। কিন্তু কথা হল হঠাৎ আপনি এতদিন পরে এ সব তথ্য আবিষ্কার করলেন কেমন করে?'

"প্রতাপচন্দ্র বললেন—'হঠাৎই! কিছুদিন আগে লাইব্রেরীর পুরোনো পুঁথি ঘাঁটতে ঘাঁটতে একটা খাতা আবিষ্কার করেছি। অতি পুরোনো ঝুরঝুরে খাতা। দেখলেই বোঝা যায় অন্তত দেড়শ বছর তার বয়েস। সেই খাতাটায় আমাদের বংশের অভিশাপ সম্বন্ধে পরিষ্কার বিবরণ লেখা আছে। লেখা আমার কোনো পূর্ব্বপুরুষের, কার যে তা ঠিক জানি না তবে অনেক পুরুষ আগেকার কেউ তা স্পষ্টই বুঝতে পারছি।'"

ভবতোষবাবু বলে চললেন, "তারপর প্রতাপচন্দ্র অত্যন্ত শান্ত স্থির গলায় এমন সব অসম্ভব আজগুবি কথাবার্তা বলে যেতে লাগলেন যে বিস্ময়ে আমার হাতের চায়ে চুমুক দিতে একদম ভুলে গেলুম; চা ঠাণ্ডা কনকনে হয়ে গেল। কথাগুলো বিশ্বাস করেছিলুম বলে অবাক হই নি; অবাক হলুম এমন সব অদ্ভুত কথায় তিনি বিশ্বাস করতে পারলেন কী করে! মনে হল ছাই পাঁশ কতকগুলো বই পড়ে পড়ে তাঁর মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছে। তবু যে খাতাটা এত হাঙ্গামার মূলে সেটা আসলে কি তা জানতে চাইলুম। তিনি সেটা বের করে দিলেন। সত্যিই বহুকালের পুরোনো খাতা এবং তাতে যে ঘটনার কথা লেখা রয়েছে তা পড়তে পড়তে সুস্থ মানুষের মাথাও গোলমাল হয়ে যায় বই কি।" [ক্রমশ]

চশমা-পরা লোকটা

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বম্বে মেল ছাড়বার পরেও বিক্রমের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় আর কেউ উঠলো না। আর কেউ উঠলে বিক্রম অবশ্য খুসিই হোতো। এই প্রথম নিজের কামরায় বেশি লোকের উপস্থিতি সে চাইলো। আন্তরিক ভাবেই চাইলো। তার কামরায় অবশ্য সে একা নয়—উল্টো দিকের বেঞ্চিতে আর একজন রোগা আর বেঁটে লোক বসে। ফর্সা রঙ। পাতলা ঠোঁট। মাথার সামনে টাক পড়তে সুরু করেছে। কিন্তু ওই লোকটিকে দেখে পর্যন্ত কেমন যেন অস্বস্তি হয়েছে তার। কেমন যেন ভালো লাগেনি। ভালো লাগা আর না লাগা অবশ্য এমনি এক জিনিস যার উপর কোনো যুক্তি-তর্ক খাটে না। এমনিতে তো তাকে বেশ শান্তই মনে হয়। শুধু হঠাৎ-হঠাৎ সে বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে মাথা ঘোরায়। এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফিরে যখন বসে এমন একটা আচমকা মোচড় দেয় সমস্ত শরীরে যেন ইলেক্‌ট্রিকের শক্ খেলো। তারপর আবার মিনিট পাঁচেক একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকে, একটা আঙুলও নাড়ায় না, একটা পা-ও নাচায় না। একেবারে স্থির হয়ে বসে থাকে। যেন যোগ অভ্যাস করছে। তাকে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে বসে থাকতে দেখে হয়তো মনে মনে তুমি খানিকটা সুস্থ হয়েছো, কিংবা না জানিয়ে তাকে বেশ ভালো করে দেখছো—কী রঙের স্যুট পরনে, সঙ্গের মালপত্রই বা কী, বুক

পকেটে অতটা উঁচু হয়ে কী-ই বা লুকিয়ে আছে—এই সব দেখছো আর ভাবছো এমন সময় অকস্মাৎ কথাবার্তা নেই যেন শক্ খেয়ে সে চড়াৎ করে ফিরে বসলো—বসলো ঠিক তোমার সামনা-সামনি—বসলো তোমার চোখে তার কালো চশমা-পরা চোখ রেখে! এমন অপ্রস্তুত তখন লাগে, এমন অস্বস্তি তখন যে লাগে! ঠিক যেন মনে হয় তুমি লুকিয়ে তার কোনো একটা জিনিস চুরি করতে যাচ্ছিলে এমন সময় কী করে যেন টের পেয়ে সে হঠাৎ তোমাকে ধরে ফেলেছে আর তারপর গম্ভীর হয়ে ঠিক করছে তোমার কী ধরণের শাস্তি হওয়া উচিত।

একবার নয়, দু'বার নয়, ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত অন্তত পাঁচ-ছ' বার ঐ ধরণের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবারেই লোকটা প্রায় পুরো একটা মিনিট চুপ করে বিক্রমের চোখে তার চশমা-পরা চোখ রেখে স্থির হয়ে বসেছিলো—এই বুঝি কিছু বলে, এই বুঝি কিছু বলে—এই ধরণের একটা ভাব। তারপর হঠাৎ যে-রকম অকস্মাৎ সে বিক্রমের দিকে ফিরেছিলো সেই রকমই কোনো নোটিশ না দিয়ে আবার চড়াৎ করে ফিরে জানলার বাইরে চেয়ে রইলো। একটি আঙুলও নড়ে না, একটি পা-ও নাচে না। শুধু ট্রেন যতটুকু নাচায় ততটুকু ছাড়া। এমন একটি যাত্রী শেষ পর্যন্ত সঙ্গে থাকলেই হয়েছে আর কি! কলকাতা থেকে বোম্বাই পাকা চল্লিশ ঘণ্টার উপরের পথ। এই এতোগুলো ঘণ্টা এ-ধরণের অস্বস্তি মনে পুষে রাখতে হলে পাগল হতে আর কত দেরী থাকে?

এই অস্বস্তিকর আবহাওয়া থেকে অন্যমনস্ক হবার জন্যে বিক্রম তার ছোটো স্যুটকেশটা খুলে ফেললো। ভিতরে ঠাসা গল্পের বই—তাদের অধিকাংশই ডিটেক্টিভ উপন্যাস। ঘণ্টায় একটা ডিটেক্টিভ উপন্যাস বিক্রম অনায়াসে শেষ করতে পারে।

একটা বই খুলে বসলো বিক্রম। সঙ্গে-সঙ্গে সেই রোগা আর বেঁটে লোকটিও তার কালো ফ্রেমের চশমা-পরা চোখ দুটো তুলে চেয়ে রইলো বিক্রমের দিকে। বাইরের আলোর আর দ্রুত পালিয়ে-যাওয়া গাছপালার ছায়া ক্রমাগত তার চশমার কাঁচে পড়ছে। ফলে মনে হয় চশমার ভিতর একটা অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা চলেছে। সেই আলো আর ছায়ার ফাঁকে চোখ দুটো বড়-একটা দেখাই যায় না। মাঝেমাঝে মুহূর্তের জন্যে হয়তো দেখা যায়। সে-চোখের দৃষ্টি ধূর্ত আর মর্মভেদি; আর কি রকম যেন ঠাণ্ডা। সেই ছাই-রঙা চোখের তারায় চোখ পড়াতেই বিক্রমের বুকের ভিতরটা কি রকম যেন ঠাণ্ডা হয়ে যেতে লাগলো।

বইটা চোখের সামনে ধরে আড়চোখে চুরি করে দেখাও তাকে ছাড়তে হোলো। লোকটা ক্রমাগত চেয়ে রয়েছে তার দিকে। আড়চোখে চাইলেও যেন ধরে ফেলছে। ফলে এবার থেকে সত্যিসত্যিই ডিটেক্টিভ উপন্যাসে সে মন দেবে ঠিক করলো। তাই পিছনে হেলান দিয়ে পায়ের উপর পা তুলে মুখের উপর এমন ভাবে বইটা তুলে ধরলো যাতে লোকটার ছাই-রঙা চোখের ঠাণ্ডা দৃষ্টি কোনো মতে তাকে ছুঁতে না পারে। কিন্তু মিনিট পাঁচেক যেতে না যেতেই তার সর্বাঙ্গে কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগলো। বইটা না নামিয়েও স্পষ্ট বুঝতে পারলো লোকটা তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। যেন কেউ তাকে তন্নতন্ন করে খানাতল্লাস করছে। প্রাণপণ শক্তিতে বইটা তার মুখের উপর ধরে রইলো বিক্রম। কিন্তু ক্রমশ তার শক্তিও এলো কমে। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলটা চুলকোতে সুরু করেছে, কানের ভিতরটা সড়সড় করছে, পিঠের শির-দাঁড়ায় কী যেন কামড়ালো,—তাছাড়া হাত ব্যথা তো করছেই, ঘাড়টাও টনটন করছে। বাঁ পা-টা যে-রকম আড়ষ্ট হয়ে গেছে তাতে নাড়াতে গেলে নিশ্চয়ই সে বুঝবে মারাত্মক ঝিঁঝিঁ ধরছে।

এই সব নানা ধরণের অসুবিধের সঙ্গে লড়াই করতে-

করতে এক সময় কখন যে সে বইটা নামিয়ে সেই লোকটার দিকে সোজা চেয়েছিলো নিজেই ঠিক জানে না! তার কথায় চমক ভাঙলো, "কী বিক্রমবাবু! বইটা ভালো লাগছে না—না?"

নিজের নামটা অপরিচিত তার মুখে উচ্চারিত হাত দেখে বিক্রম ভীষণ চমকে উঠলো। তাই দেখে সে বললো, "ঘাবড়াবেন না। কামরার বাইরে রিজার্ভেশন টিকিটে আপনার নামটা লেখা রয়েছে। তাই থেকেই জানতে পারলুম।"

"কিন্তু আপনার নাম—?"

"শশধর দে।"

"কতদূর যাবেন?"

"খড়গপুর।"

"আপনিও একটা বই ধরুন না," বলতে-বলতে বিক্রম নিচু হয়ে স্যুটকেশ থেকে একটা ডিটেক্টিভ উপন্যাস বার করে ভদ্রলোককে দিলো।

শশধর কিন্তু নিলো না। বললো, "অনেক ধন্যবাদ। কিন্তু ডিটেক্টিভ বই আমি পড়ি না। ভারি খাপছাড়া আর বাজে লাগে। আপনারও সে-কথা মনে হয় না?"

"সে-কথা ঠিক। এর মধ্যে জীবনের কোনো সূক্ষ্ম সুন্দর দিক বড় একটা থাকে না, সে-কথা ঠিক—তবে এরকম ট্রেন-জার্নির সময় নেহাৎ মন্দ নয়।".

"সে-রকম ভালো-মন্দ'র কথা আমি বলছি না। জীবনের সূক্ষ্ম সুন্দর দিক—ও-সমস্ত বড়বড় গালভরা বুলির জন্যে আমি থোড়াই কেয়ার করি। সে-কথা নয়। কথাটা এই—ডিটেক্টিভ উপন্যাসের খুনেরা এমন বাজে এমন বোকা যে পড়তে বসলে বিরক্তি ধরে যায়।"

"আমার তো মনে হয় বাস্তব জগতে যে-সব খুনেরা ঘুরে বেড়ায় ডিটেক্টিভ উপন্যাসে তাদের চেয়ে অনেক চালাক খুনেদের দেখতে পাই।"

কথাটা যে বিক্রম নেহাৎ বোকার মতো বলেছে তা তার মনে হোলো না। ভদ্রলোক কিন্তু হো-হো করে হেসে উঠে বললো, "বাস্তব জগতের খুনেদের চেয়ে চালাক? অবশ্য যে-সব খুনেরা ধরা পড়ে ফাঁসি যায় তাদের কথা বলছি না। কিন্তু বাস্তব জগতে এমন কত খুন প্রত্যহ হচ্ছে জানেন যে-গুলো সাধারণ মৃত্যু বলেই সবাই মনে করে? আসলে মানুষ-খুন-করার এক হাজার একটা সহজ উপায় আছে—অতি সহজ আর সাধারণ। যার জন্যে ডিটেক্টিভ উপন্যাসের খুনেদের মতো অত সব জটিলতার সৃষ্টি করতে হয় না!"

এতোক্ষণে বিক্রম অনেক সহজ হতে পারলো। ঠাট্টা করে বললো, "যদি অত সোজাই হয় তা হলে আপনি দুয়েকটা খুন করে দেখুন না!"

"আমি!" বলতে-বলতে ভদ্রলোকের গলার স্বর বদলে গেলো। বাইরের আলোছায়ায় চশমার কাঁচ দুটো একেবারে ছেয়ে যাওয়ায় মনে হয় বুঝি চশমার নিচে শশধরের কোনো চোখ নেই! "আমি! সে-কথা আলাদা। ইচ্ছে করলে আমাকে একবারের বেশি ভাবতে হবে না।"

সেই চোখহীন চশমা-পরা মুখ থেকে কথাগুলো অতি সহজে বেরিয়ে এলো। শশধর ঠিক যেন ঠাট্টা করলো না। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে অবশ্য ভালো করে কিছুই বোঝা যায় না। শুধু বুকের ভিতরটা কি রকম যেন সিরসির করে।

"একবারের বেশি ভাবতে হবে না?" ধীরে-ধীরে প্রশ্ন করলো বিক্রম। "কিন্তু কেন?"

"কেন? আমার একশোটার ওপর সহজ উপায় জানা আছে।"

"উপায় জানা থাকলেই তো হোলো না। কখনো চেষ্টা করেছেন?" বলতে-বলতে বিক্রম নিজেই অনুভব করলো সে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠছে!

"চেষ্টা করার কোনো কথাই ওঠে না। উপায়টা এতোই সহজ যে শুধু সেটুকু জানলেই যে-কেউ অতি সহজে একজনকে অন্য জগতে পাঠিয়ে দিতে পারে।"

"যান মশাই! কথাটা বলাই শুধু সহজ! কিন্তু আপনার সেই আশ্চর্য উপায়ের দুয়েকটা কি জানতে পারি?"

মাথা নেড়ে ভদ্রলোক বললেন, "নানা। আপনাকে বলা ঠিক হবে না। কে জানে কোন দুর্বল মুহূর্তে আপনি কাকে খুন করে বসেন!"

"আমি খুন করবো?" বিতৃষ্ণায় বিক্রমের প্রায় কণ্ঠরোধ হয়ে এলো, "আমি? কী করে ভাবতে পারলেন?"

ঠাণ্ডা গলায় শশধর বললেন, "শুধু আপনি কেন, যে-কোনো লোকই খুন করতে পারে যদি জানে সে-খুন কেউ কোনো দিন ধরতে পারবে না! কত অল্প কারণে লোকে খুন করতে পারে ভাবলে অবাক হতে হয়! ধরুণ আপনার কোনো বন্ধু ইন্সিওরেন্সের এজেন্সি নিয়ে ক্রমাগত আপনাকে জ্বালাতন করছে ইন্সিওর করা'র জন্যে। তাকে না-ও বলতে পারছেন না, অথচ ইন্সিওর করার ইচ্ছেও আপনার মোটে নেই। তখন কি মাঝেমাঝে ইচ্ছে করে না সেই বন্ধুর হঠাৎ মৃত্যু হলে আপনি বেঁচে যান? যদি জানেন দু আনার জিঙ্ক অক্সাইড পাড়ার দোকান থেকে কিনে আনতে পারলেই আপনার কাজ হাসিল হবে—?"

"কী অক্সাইড?"

"ওই দেখুন, ওষুধটার নাম জানবার জন্যে কী রকম আপনি ব্যস্ত হয়ে পড়ছেন! ওই ওষুধ আর তার সঙ্গে আর দু তিনটে নিতান্ত সাধারণ জিনিস মিশিয়ে চায়ের সঙ্গে খেতে দিলে দু'ঘণ্টার মধ্যে যে-কোনো লোক খুন হবে। অথচ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ডাক্তারও তাকে পরীক্ষা করে বলবেন ব্লাড-প্রেসারের দরুণ মৃত্যু ঘটেছে। ওষুধের কোনো চিহ্নই শরীরে থাকবে না। আর কে-ই বা ভাবতে পারে দু ঘণ্টা আগে মৃত লোকটি এক পেয়ালা চা খেয়েছিলো আর তার জন্যেই এই মৃত্যু ঘটেছে?"

শশধর তার চোখহীন চশমা-পরা মুখে হাসতে লাগলেন। হাসিটা ভালো লাগলো না বিক্রমের।

"নাগপুরের রাণার, কলকাতার জিতেন্দ্রপ্রতাপের, এলাহাবাদের সৌরীশচন্দ্রের মৃত্যুর কথা একবার ভেবে দেখুন! সবাই তো হালে ব্লাড-প্রেসারে মারা গেছেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত কেউ কি জানতে চেষ্টা করেছেন তাঁরা মরবার দু ঘণ্টা আগে এক পেয়ালা চা খেয়েছিলেন কিনা?—না-না মশাই, ওই ওষুধের ফরম্যুলা জানতে চাইবেন না!—আরে, খড়্গপুর এর মধ্যে এসে গেলো? চললুম মশাই! এখানে একটু কাজ আছে।"

শশধর উঠে দাঁড়িয়ে নেক-টাইটা ঠিক করলেন, ছড়ি আর ছোট্ট এ্যাটাচি-কেসটা নিলেন হাতে, কাঁধে ফেললেন বর্ষাতিটা তারপর ট্রেন থামতেই বিক্রমকে ছোট্ট নমস্কার করে চটপট নেমে প্ল্যাটফর্মের ভিড়ে কোথায় যেন মিলিয়ে গেলেন।

মানুষের মন ভারি বিচিত্র জিনিস। যে-সব লোকদের আমরা পছন্দ করি না চোখের আড়াল হলেই তাদের আমরা ভুলে যাই। বিক্রমও হয়তো শশধরকে সম্পূর্ণ ভুলে যেতো। কিন্তু বোম্বাই পৌঁছে খবরের কাগজে ছোট্ট একটি খবর দেখে চমকে উঠলো: গড়্গপুরে এক ধনী ভদ্রলোক হঠাৎ ব্লাড-প্রেসারে মারা গেছেন। ভদ্রলোকের ব্লাড-প্রেসার আছে বলে জানা ছিলো না। মৃত্যুর ঘণ্টা তিনেক আগেও তিনি স্থানীয় এক বন্ধুর বাড়ি চায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। —ভারি আশ্চর্য কাণ্ড তো! মনে-মনে ভাবলো বিক্রম। চা'য়ের নিমন্ত্রণের দু তিন ঘণ্টা পরেই ব্লাড-প্রেসারে মৃত্যু? ট্রেনের সেই লোকটাই এ-ধরণের কথা বলেছিলো না? কী নাম লোকটার?—শশধর? হ্যাঁ, শশধরই তো। আর সে-ও তো সেইদিন খড়্গপুরে নামলো! কী যেন কাজ আছে বলেছিলো! কী তার কাজ?

সত্যিই বিচিত্র মানুষের মন! এমনিতে রোজ তুমি খবরের কাগজ পড়, মাসিকপত্রিকার পাতা ওল্টাও কিংবা পথ দিয়ে হাঁটো—দাঁতের গোড়া বেদনার ওষুধের বিজ্ঞাপনগুলো কি তোমার চোখে পড়ে? দেখেও

তাদের তুমি দেখো না। অথচ একবার দাঁতের যন্ত্রণায় ভোগো, তারপর থেকে ক্রমাগত তোমার চোখের সামনে দাঁত-ব্যথার ওষুধের বিজ্ঞাপনগুলো নেচে-নেচে বেড়াবে! সকালে খবরের কাগজ খুলে প্রথমেই দেখবে দাঁতের ওষুধের বিজ্ঞাপন, পথে যেতে-যেতে দেয়ালের গায়ে আঁটা আছে দেখবে দাঁত-কনকনানি'র ওষুধের কথা, মাসিক-পত্রিকা খুললেই প্রথমে দেখবে দু' মিনিটের মধ্যে কী করে দাঁতের যন্ত্রণা কমানো যায়! দাঁতের ওষুধের বিজ্ঞাপন চিরকালই চতুর্দিকে ছড়িয়ে থাকে, কিন্তু তোমার মন সেদিকে গেলে তবেই তুমি লক্ষ্য কর। হয়তো এই কারণেই এর পর থেকে ক্রমাগত বিক্রমের চোখে পড়তে লাগলো ব্লাড-প্রেসারে নানা লোকের মৃত্যুসংবাদ। এমন একটি সপ্তাহও গেলো না যার মধ্যে বিক্রম অন্তত ঐ ধরণের একটি মৃত্যুসংবাদ না পড়েছে। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় ঘটতে লাগলো ঐ ধরণের ঘটনা। খবরের কাগজে কখনো ছোটো কখনো বড় হরফে তাদের কথা ছাপা হতে লাগলো। একাধিক ক্ষেত্রে নানারকম নিমন্ত্রণের খবরও কাগজে লাগলো উল্লিখিত হতে। একবার তো স্পষ্ট চা'য়ের কথাই ছিলো: এক ধনী বিধবা চা খাবার দু'ঘণ্টার মধ্যে মারা যান। ডাক্তার বললো ব্লাড-প্রেসারে মৃত্যু। পুলিশ কিন্তু সেই বিধবার একমাত্র উত্তরাধিকারীকে সন্দেহ করে প্রথমে ধরেছিলো: ছেলেটির বয়েস কুড়ি, তার সঙ্গে তার দিদিমার (মৃত বিধবা'র) বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না এবং সে-ই নাকি ঐ চা তৈরী করে দিয়েছিলো। কিন্তু প্রমাণের অভাবে ছোকরা ছাড়া পেলো।

কি রকম খুঁতখুঁত করতে লাগলো বিক্রমের মন। প্রাণপণে সে ওষুধটার নাম মনে করতে চেষ্টা করলো। কী অক্সাইড? কিন্তু কৃতকার্য হোলো না।

এই রকম উত্তেজিত যখন তার মানসিক অবস্থা তখন দাদর-এ, বোম্বাইয়ের কাছে বিক্রম যে-জায়গায় থাকে, অকস্মাৎ এক কোটিপতি ভদ্রলোকের মৃত্যু হোলো। বিক্রমের বাড়ির কাছেই ভদ্রলোক থাকতেন। বিকেলে এক টি-পার্টিতে ভদ্রলোক নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে বলেন শরীর ভালো লাগছে না। তারপরেই অজ্ঞান হয়ে যান ও আড়াই ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যু হয়।

খবরটা শুনে রীতিমতো চমকে উঠলো বিক্রম। রাত তখন ন'টা। তখুনি গায়ে একটা শার্ট গলিয়ে সে ছুটলো।

অনেক লোকের ভিড়। বড়লোকের মৃত্যু, সোজা কথা নাকি! বন্ধুরা এসেছে, আত্মীয়রা এসেছে, খবরের কাগজের লোকেরা এসেছে, পাড়ার লোকও আছে। আর সেই ভিড়ের মধ্যে চোখে কালো-চশমা আঁটা রোগা আর বেঁটে লোকটাও রয়েছে—এক কোণে দাঁড়িয়ে, দেয়ালে ঠেস দিয়ে, নিতান্ত শান্তভাবে চুরুট টানছে। —শশধর দে, সন্দেহ নেই!

বিক্রমের বুকের মধ্যে রক্ত চলাচল দ্রুততর হোলো। উত্তেজিত ভাবে তার কাছে গিয়ে পিঠে হাত রেখে বললো, "নমস্কার শশধরবাবু! আপনি যে?"

"কে?" বলে সেই রকম বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো ফিরে দাঁড়ালো শশধর। তারপর বিক্রমকে দেখে বললো, "ও, আপনি? সেই ট্রেনে আলাপ হয়েছিলো, না? কোথায় থাকেন?"

"কাছেই। কিন্তু আপনি এখানে যে?"

"কাজে আসতে হয়েছে! আমাদের নানা জায়গায় নানা কাজে হাজির থাকতে হয় মশাই!" বলে বিক্রমের দিকে চেয়ে হাসলো।

আরো খানিক দাঁড়িয়ে লোকের ভিড় দেখে বিরক্ত হয়ে বিক্রম ফিরলো। এমন সময় পিঠে যেন হাত পড়লো কার। চমকে ফিরে দেখলো শশধর।

"কোথায় চললেন? বাড়ি?" প্রশ্ন করলো শশধর। "চলুন, দেখে আসি কোথায় থাকেন! এতোদূর দেশে বাঙালীর সঙ্গে দেখা। গেলে নিশ্চয়ই এক পেয়ালা চা খাওয়াবেন!"

"নিশ্চয়ই!" নিতান্ত অভ্যাসবশে উত্তর দিলো বিক্রম তারপর নিজের গালেই ঠাস করে চড় মারতে ইচ্ছে

করলো। শশধরের এই চাল সে এবার ধরে ফেলেছে। পৃথিবীতে একমাত্র বিক্রমই জানে শশধরের আসল খবর। কী প্রকাণ্ড শয়তান, খুনে লোক! কী সহজে নিজের কাজ হাসিল করে বেড়াচ্ছে সবাইকার চোখে ধুলো দিয়ে। লোকটা যেমন চালাক তাতে বিক্রমের মনের কথাটা ঠিক ধরে ফেলেছে! বিক্রম যে কাল সকালে উঠেই পুলিশের কাছে গিয়ে শশধরের কীর্তিকলাপ জানিয়ে দেবে এ-ধরণের সন্দেহ শশধরের মতো ধূর্ত লোকের পক্ষে করা মোটেই শক্ত নয়। এখন শশধর কি চাইবে না তাকেও পৃথিবী থেকে সরিয়ে একেবারে নিষ্কণ্টক হতে?

বসার ঘরে ঢুকে ছাতা-টুপি কোণে রেখে সোফায় শশধর গা ঢেলে দিলো। তারপর পকেট থেকে সিগারেট বার করে দিলো বিক্রমকে। বিক্রম সভয়ে দু' পা পিছিয়ে গেলো তারপর আমতা-আমতা করে বললো, "সিগারেট আমি খাই না।"

"কবে থেকে ছাড়লেন? ট্রেনে তো হুসহুস করে টানছিলেন মশাই!"

"ট্রেনে চড়ার সময় মাঝেমাঝে খাই," বলে প্রসঙ্গ পরিবর্তনের জন্যে বললো, "বসুন, চায়ের ব্যবস্থা করে আসি।"

চা এলো। বিক্রম দু পেয়ালা চা বানালো। শশধর অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে পেয়ালায় চুমুক দিয়ে বললো, "আঃ! দুপুর থেকে চা খাওয়া হয়নি! চা না খেয়ে লোকে বাঁচে কী সুখে?—আরে, 'রিডার্স ডাইজেস্ট' আপনি রাখেন দেখছি! গত নভেম্বর মাসেরটা আছে কিনা দেখুন তো? চাঁদে যাওয়া নিয়ে একটা প্রবন্ধ বেরিয়েছে, একবার দেখতে চাই।"

বিক্রম উঠে বুক শেল্ফ থেকে নভেম্বরের 'রিডার্স ডাইজেস্ট'টা নিয়ে এলো। শশধর পাতা ওল্টাতে লাগলো। বিক্রম চায়ের পেয়ালাটা শেষ করলো। ঘড়িতে ঢং-ঢং করে বাজলো দশটা।

শশধর তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো, "দশটা সাতের ট্রেন ধরতে হবে মশাই! কী জ্বালা! এক মিনিট সুস্থিরে বসার জো নেই! অনেক ধন্যবাদ! ভায়ি খুসি হলুম! আবার কোনোদিন দেখা হবে কিনা কে জানে!" বলতে-বলতে ছাতা আর বর্ষাতি নিয়ে দৌড়েই শশধর বেরিয়ে গেলো। আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বিক্রমের সর্বাঙ্গে যেন বিদ্যুৎ লাগলো বইতে! কী বোকা, কী বোকা সে! এই সহজ চালটাও সে ধরতে পারেনি! এতো রাত্রে চা' খাবার মানে কি? কিন্তু চা তো সে নিজে হাতে তৈরি করেছে! তবে 'রিডার্স ডাইজেস্ট' আনবার সময় সে কি পিছনে ফিরে দাঁড়ায়নি? ছোটো একটি পুরিয়ার ওষুধ পেয়ালায় ঢেলে দিতে কতক্ষণ লাগে?

এতোক্ষণে তার মনে হোলো চা'য়ের স্বাদটা যেন কী রকম অন্য ধাঁচের। কী রকম যেন তেতো-তেতো। এতো তেতো চা তো জীবনে সে কখনো খায়নি। ছুটে বাথরুমে গিয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করার চেষ্টা করলো। কিন্তু বিকেল থেকে বিশেষ কিছুই খায়নি বলে বেশি বমি হোলো না। উত্তেজনায় তার হাত-পা কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, সমস্ত শরীরটা যেন ক্রমশ শিথিল হয়ে আসছে! কোনো রকমে টলতে-টলতে বিছানায় গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়লো। বাড়িতে একটা ঠিকে চাকর কাজ করে। সকালে দু ঘণ্টার জন্যে আসে। আর কেউ নেই। মাত্র দু'ঘণ্টা আর তার পরমায়ু। মৃত্যুর আগে আর কারুর সঙ্গে দেখা হোলো না!

সকালে চাকরের ডাকে ঘুম ভাঙতে বিক্রম দেখলো সে মরেনি! সমস্ত শরীরটা শুধু কি রকম যেন ম্যাজম্যাজ করছে। দারুণ ক্ষিদে পেয়েছে।

চাকর ট্রেতে সাজিয়া চা-ডিম-টোস্ট ও খবরের কাগজটা দিয়ে গেলো। আরে, প্রথম পাতাতেই কার ছবি বেরিয়েছে? চোখ মুছে আর একবার ভালো করে সে দেখলো।—না, ভুল তার হয়নি। ছবিটা শশধরের! গতকাল রাত্রি দশটা সাতের চলন্ত গাড়িতে উঠতে গিয়ে শশধর পা পিছলে পড়ে

কাটা গেছে। প্রায় সঙ্গেসঙ্গেই হয়েছে মৃত্যু। কাগজে লিখেছে শশধর কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিকের নিউজ-রিপোর্টার ছিলো। সাধারণ ঘটনাকে ফলাও করে লিখতে পারার দুর্লভ ক্ষমতা ছিলো তার। হালে সে বোম্বাইতে এসেছিলো কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির নানা খবর সংগ্রহ করতে।

কাগজটা তখনো বিক্রমের হাতে ছিলো! এমন সময় দরজা ঠেলে ঢুকলেন পাড়ার অধীরবাবু। তিনিও কাগজের রিপোর্টার। অত্যন্ত বিচলিত তাঁর ভাব। বিক্রমকে বললেন, "ভেরি স্যাড নিউজ, দেখেছেন? শশধর মারা গেলো! আমরা এক সঙ্গে কাজ সুরু করি। অনেক পার্টস্ ছিলো লোকটার। ভারি রসিক ছিলো প্রকৃতি। তার একটা বাঁধা ঠাট্টা ছিলো—ট্রেনে কারুর সঙ্গে নতুন আলাপ হলে জিঙ্ক অক্সাইড নিয়ে এমন একটা মজার গল্প ফাঁদতো! পরে বলবো—আপনি যাবেন নাকি শ্মশানে? বিদেশে বাঙালীর মৃত্যু—আমি যাচ্ছি।"

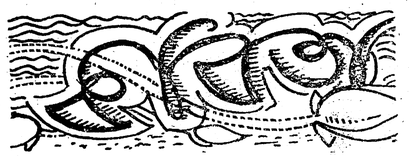

ঘুম-তাড়ানি গান

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

ঘুম আয়রে আয়। ঘুম আয়রে আয়। ঘুম আয় মেঘের
সুর- সাততলার। মেঘ, রূপকথার দূর পথ শুধাও।
মন ওঠ্‌রে ওঠ্। মন ছোট্‌রে ছোট্। চল্ এই দেশের
পার ক্ষেতখামার। পথ নেই থামার। আর মন উধাও।

ঘুম আয়রে আয়। ঘুম আয়রে আয়। ঘুম পথ-শেষের।

ঘুম আস্‌ছে না। ঘুম আস্‌ছে না। ঘুম- সাততলায়
মন উড়তে চায়। আর পথ না পায়। মাঠ···ঘাট···জাঙাল···
এই বাংলাদেশ। এর ছিন্নবেশ। এর প্রাণ জালায়
সব পঙ্গপাল। ভাই ধান সামাল্। ভাই মান সামাল্।

ঘুম আস্‌ছে না। ঘুম আস্‌ছে না। ঘুম তাই পালায়।

খাসিয়া বুড়ো

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তাঁবু পড়ল নদীর ঠিক পাশেই। শীতের রাত; একেবারে হাড়-কাঁপানি শীত। তাই বাইরে আগুন জ্বেলেছে কুলির দল শুকনো কাঠ আর শুকনো পাতা জড়ো করে। সে আগুনের লালচে আভা তাঁবুর দোর দিয়ে ঢুকে আমাদের চোখেমুখে মাখিয়েছে অদ্ভুত রঙ। কেমন যেন অবাস্তব বলে মনে হয়। বেমানান বড় বড় ছায়া তাঁবুর দেয়ালে,—আমাদেরই ছায়া, তবু মনে হয় আমাদেরই যেন দেখছে তা করে। জঙ্গলে শীতের হাওয়া দিলে ফিসফিস করে ওঠে গাছপালা, কেঁপে ওঠে বাইরে আলোর শিখা, চমকে ওঠে ছায়ার দল তাঁবুর দেয়ালে আর তারপর আমাদের কাণ্ডখানা দেখে যেন হেসে গড়িয়ে পড়ে।

কাণ্ডটা অদ্ভুত, সন্দেহ নেই। ঘন জঙ্গল ভেঙ্গে আমরা উঠেছি, আমরা চলেছি মাটি খুঁড়ে প্রাচীন সভ্যতার ভগ্নাবশেষ বের করবার আশায়। এই দুর্ভেদ্য অরণ্য, এখানে কি একদিন ছিল বিরাট সহর, ছিল রাজা আর তার রাজত্ব, ছিল জমজমাট হাটবাজার! হাজার মানুষের সুখদুঃখে একদিন মুখর ছিল এই দেশ? এ দেশে শিশুর কলহাসি ছিল, ছিল বৃদ্ধের জ্ঞানগর্ভ গম্ভীর চিন্তা। এখন শুধু হিংস্র জানোয়ার আর দুর্ভেদ্য অরণ্য! ভাবতে ভাবতে মাথার মধ্যেটা কেমন যেন ঝিমঝিম করে; যেন নেশা লাগে। মনে হয় মহাকাল কী অদ্ভুত অবলীলায় ইতিহাসকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। সেদিনের সেই সভ্যতার সমস্ত ইমারৎ তাসের বাড়ীর মত ফুঁ দিয়ে যেন ভেঙ্গে চুরে মিশমার করে দিয়েছে, তারপর চলে গেছে অন্যদেশের অন্য সভ্যতা নিয়ে এই রকমই ছিনিমিনি খেলতে। তার পদক্ষেপের পদধূলি সরিয়ে আমরা আজ বের করতে এসেছি সেই লুপ্ত সভ্যতার ভাঙ্গা টুকরো।

দলে আমরা আটজন; আজ প্রথম রাত্তিরটা যে চারজনে পাহারা দেবার কথা তার মধ্যে আমি পড়েছি। অদ্ভুত লাগে; অদ্ভুত লাগে কোমর পর্য্যন্ত পুরু কম্বল টেনে তীব্র টর্চ আর তীক্ষ্ণ রাইফেল পাশে প্রস্তুত রেখে আকাশ-পাতাল নানান কথা ভাবতে। বাকি তিনজনের মনেও বোধ হয় এই সব এলোমেলো চিন্তা জোট পাকাচ্ছিল। ওরাও ছিল চুপচাপ বসে। হয়ত অরণ্যের অতল স্তব্ধতা ওদের স্পর্শ করেছে আমারই মত, হয়ত আমার মত ওদের রক্তেও দোলা দিয়েছে মহাকালের নির্মম পদক্ষেপ।

নিঃশব্দে উঠে গেল অমিয়। বাইরের আগুনে কফি ফুটিয়ে এলো ফিরে। আমরা ট্রে থেকে এক একটা পেয়ালা তুলে নিলুম। কারুর মুখে কথা নেই, চুপচাপ যে যার পেয়ালায় চুমুক দিই। অরণ্যের অপরূপ নৈশ সঙ্গীত, নদীর শব্দ, কুলিদের ক্লান্ত অস্পষ্ট কথা আর মাঝেমাঝে খাপছাড়া বুনো জানোয়ারের ডাক।

কিন্তু যতই হোক, রায় বেশীক্ষণ একটানা চুপ করে থাকতে পারে না। কফির পেয়ালা ছোট টেব্‌ল্‌টার উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বলল—"ডাক্তার, বেশ জমজমাট একটা ভূতের গল্প বল দিকিনি। এ আবহাওয়ায় খাসা জমবে।"

"ভূত!"—ডাক্তার এমনিতে কথা কমই বলে, কিন্তু আমরা জানি যে ও যখন সুরু করে তখন বেশ জমিয়েই বলতে পারে। "বাস্তবিক, ভূতের গল্পের পক্ষে যেন আদর্শ আবহাওয়া!" ডাক্তার নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালো, আস্তে আস্তে পর্দ্দা ঠেলে গেল তাঁবুর বাইরে। আমরা দেখলুম আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ে ও একটা চুরুট ধরালো তারপর ধীরভাবে ফিরে এলো তাঁবুর ভিতর। বুঝলুম, এবার ও সুরু করবে, পায়ের তলায় কম্বলটা ভালো করে মুড়ে নিয়ে বেশ অনেক্ষণের মত নিজেকে প্রস্তুত করে নিলুম।

ডাক্তার চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিল, ওর ছোটছোট চোখদুটো চুরুটের আলোয় জ্বলজ্বল করে উঠল। "জানো", ডাক্তার খাপছাড়া ভাবে বলল,—"একদিন একজনের চিতার আগুন থেকে ঠিক এইভাবে চুরুট ধরিয়েছিলুম। সে ছিল আমার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু। সে মারা গিয়েছিলো ভূতের ভয়েই এবং আমি চুরুটটা ধরিয়েছিলাম তার সেই ভয় উদ্ধত ভাবে অগ্রাহ্য করবার জন্যেই। কিন্তু"—ডাক্তার হঠাৎ থামল। আবার একটা দীর্ঘ টান দিল তার চুরুটে, আবার জ্বলজ্বল করে উঠল তার ছোট ছোট চোখ দুটো। আমরা সবাই সাগ্রহে বলে উঠ্‌লুম—"কিন্তু?"

"কিন্তু তার পরের মুহূর্ত্তে যা ঘটল তাতে আমার সমস্ত ঔদ্ধত্য ভেঙে একেবারে গুঁড়ো হয়ে গেল। সেই ব্যাপারটাই আগাগোড়া বলি, শোনো। ভূত কিনা তার বিচার তোমরা পরে কোরো।" তারপর ডাক্তার বলে চলল—

ডাক্তারের কথা

রতনকে তোমরা নিশ্চয়ই কেউ চিনতে না। কেমন করেই বা চিনবে? আমরা ছিলুম মেডিকেল কলেজের সহপাঠী, —আমি, রতন আর অসীম। রতনকে রুগ্ন বললে যেন বাড়িয়ে বলা হয়, কেন না ও ছিল নেহাৎ ক্ষীণজীবি, রুগ্ন মানুষের পর্য্যায়ের চেয়েও কয়েক ধাপ নীচে। আর অসীমকে শুধু সুস্থ বা বলিষ্ঠ বললে কমিয়ে বলা হয়, কেন না ওর পেশীতে পেশীতে স্বাস্থ্য আর শক্তি উপচে পড়ত। আর সবচেয়ে মজা ছিল রতনের সঙ্গে অসীমের বন্ধুত্য, সে একটা দেখবার মত জিনিষ। শরীরে পোষায় না বলে রতন যখন কলেজ ছাড়তে বাধ্য হল তখনো কিন্তু অসীমকে ছাড়া ওর পক্ষে সম্ভব হল না। আমি একটু বেশী ব্যস্ত ছিলুম পড়াশুনো নিয়ে, তাই দুজনেরই বন্ধু হলেও ওদের সঙ্গে সবসময় সমান তালে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে পারতুম না।

তারপর আমাদের পড়াশুনোর পালা একদিন শেষ হল। অসীম চলে গেল আসামে চাকরী নিয়ে, আমি ঢুকলুম এই কাজে। আর রতন? রতনের খবর অসীমের চিঠির মতই দিনের পর দিন আমার কাছে দুর্লভ হয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎ একদিন খবর পেলুম। চিঠি নয়, টেলিগ্রাম আর খবরটাও যে রকম খাপছাড়া সেই রকমই খাপছাড়া টেলিগ্রামটা। অসীম করছে টেলিগ্রাম: 'রতন হঠাৎ মারা গিয়েছে। একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে আমার জীবনে। তোমার সাহায্য চাই। এখুনি এসো। যেমন করে পারো এসো।' যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি গেলুম শিলং। অসীমের বাড়ি খোঁজ করতে কষ্ট হল না। ভেবেছিলুম, একেবারে মনমরা হয়ে রয়েছে দেখব। আমায় পেয়ে ও যেন আনন্দে উপছে পড়ল। দেখলুম তেমনি পরিপূর্ণ রয়েছে ওর স্বাস্থ্য, কেবল মুখটা যেন একটু বেশী লালচে। প্রথমটায় মনে হয়েছিল অনেকদিন একটানা পাহাড়ে থাকবার ফল। কিন্তু তা নয়, একটু অস্বাভাবিক রকম টকটকে মনে হল মুখটা—"মুখে কিছু হয়েছে নাকি?" অসীম কথাটা শুনে হঠাৎ খুব চমকে উঠল তারপর তাড়াতাড়ি নিজেকে সামলে নেবার জন্যে একটু হাসল, কেমন যেন অপ্রস্তুত ঘাবড়ে-যাওয়া হাসি। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলুম, রতনের কথা কিছুতেই যেন তুলতে চাইছে না। জোর করে হাসছে, জোর করে চেষ্টা করছে আয়োজন পরিপূর্ণ করে তুলতে। অথচ লক্ষ্য করলুম প্রতি মুহূর্ত্তে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে, বুঝলুম কী এলোমেলো ওর মনের অবস্থা।

খাওয়াদাওয়ার পরে অসীম বলল—"চলো আমার আপিস ঘরে, একটা খুব জরুরী কথা আছে।" ছোট্ট ঘর, সমস্ত বাড়িটা থেকে যেন আলাদা। মেঝেয় পুরু কার্পেট পাতা, বড় সেক্রেটারিয়েট টেব্‌লটা অগোছালো, বোঝা যায় অনেক দিন ওতে কেউ হাত দেয় নি। কোণার প্রকাণ্ড জালনাটার পাশে দুটো চেয়ার নিয়ে আমরা মুখোমুখি বসলুম। জালনার পরে পাহাড়ী ফুল আর পাইনের বন আর তারপর গভীর খাদ। অসীম একটু চুপ করে রইল, তারপর যেন খাপছাড়া ভাবেই হঠাৎ

বলল: "রতন মারা গেছে।" এতক্ষণ পরে বলল কেন? তা ছাড়া কথাটা ত টেলিগ্রামেই জেনেছিলুম। অসীম নিশ্চয়ই আরও কিছু বলতে চায়। কী কথা বলতে চায়? চুপ করে রইলুম। যে কথা বলতে ওর অমন আটকে যাচ্ছে সে কথা বের করবার জন্যে তাড়া দেওয়া ঠিক হবে না।

একটু পরে অসীম আবার বলল—"রতন মারা গিয়েছে।" তারপর একটু থেমে,—"কিন্তু সে কথা ত টেলিগ্রামেই জেনেছো। এখন অন্য একটা কথা বলতে চাই"—তারপর অসীম একবার সন্তর্পণে এদিক ওদিক ভালো করে দেখল। অবাক হয়ে গেলুম—ওর চোখে কেমন যেন একটা অসহায় আতঙ্ক ফুটে উঠেছে! ভয়কে যে কখনো ভয় বলে চেনে নি, দুঃসাহস যার শিরায় শিরায় বয়ে চলেছে—সেই অসীমের চোখ আজ এত করুণ, এত দুর্ব্বল হয়ে উঠ্‌ল! ওর মুখটা আমার মুখের খুব কাছে এনে হঠাৎ বলল—"ভালো করে দেখো ত। যাকে বলে পরীক্ষা করে দেখা। কিছু লক্ষ্য করছ?" ভালো করে দেখলুম, বললুম—"বিশেষ কিছুই ত নয়, তবে খুব লালচে লাগছে। শরীর খারাপ না কি?" অসীম হাসল, কি রকম যেন ফ্যাকাশে এক হাসি। বলল—"সেই কথা নিয়ে আলোচনা করবার জন্যেই ত তোমায় ডেকেছি—" তারপর আবার ও ভীরু চোখে এদিক ওদিক চেয়ে দেখল। বললুম, —"কী আশ্চর্য্য! অমন ভয় পাচ্ছ কেন? কী হয়েছে, খুলেই বলো না।" এতক্ষণে অসীমকে একটু যেন উত্তেজিত হতে দেখলুম, বলল—"শুনে তুমি হয়ত হাসবে। কিন্তু ভয় পেয়েছি, সত্যিই ভয় পেয়েছি। আমার মাথা গোলমাল হয়ে গিয়েছে মনে করতে পারো, মনে করতে পারো হঠাৎ খাপছাড়া ছেলেমানুষি সুরু করেছি, কিন্তু ব্যাপারটা যে বড় বীভৎস, বড় ভয়ানক।" আমি যেন একটু ধমকই দিলুম—"অত ভয়ের কী আছে অসীম? বাস্তবিক তুমি ত' আর ছেলেমানুষ নও। খুলে বল সব কথা।" অসীম বলে চলল—"ভয়ের যে কি আছে সত্যি আমিও ভেবে পাই না। কিন্তু তবু, তবু মাঝরাতের নির্জন রাস্তায় একটা খাসিয়া বুড়োকে দেখে……ওঃ, সে যে কী বিশ্রী, কী অসম্ভব বিশ্রী তা তোমায় কিছুতে বুঝিয়ে উঠতে পারবো না। তুমি জানো, ভয়কে জীবনে আমি স্বীকার করি নি। এর আগে যখন চা বাগানের ডাক্তার ছিলুম তখন মাঝ-রাতের অন্ধকারে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরতে একদিনও বুক কাঁপে নি আমার। তবু, ঝকঝকে আলোয় ভরা এই শিলংএর রাস্তায় একটা বীভৎস খাসিয়া বুড়োকে দেখে আমার যে কী অবস্থা হয়েছিলো তা তোমায় কিছুতে বোঝাতে পারব না। সমস্ত রক্ত যেন শিরায় শিরায় থমকে দাঁড়ালো, মনে হল হাতের মধ্যে কে যেন বরফ ঘসছে! পরে নিজের ছেলেমানুষিতে নিজেই হেসেছি, ভেবেছি হয়ত সাধারণ ভিখিরি একটা, হয়ত বা পথ ভুল হয়ে গিয়েছে, এমনি কত কীই ত' হতে পারে। কিন্তু তবুও, কিছুতেই বোঝাতে পারবো না তোমায় তার মুখোমুখি দাঁড়ানোয় একটা কী অসম্ভব বীৎসতা আছে।

"গোড়ার থেকে বলছি শোনো। বছর তিনেক আগেকার কথা হবে। সবে তখন শিলংএ বদলি হয়ে এসেছি। একদিন রাতে হঠাৎ ডাক পড়ল লাবানের দিকে। তখন শীতের মাঝামাঝি। গায়ে ওভারকোট চাপিয়ে বেরিয়ে পড়লুম। ফিরতে প্রায় ভোর তিনটে হয়ে গেল। মৃত্যুর মত নিশ্চল পথ। শুধু পাইন গাছের অস্পষ্ট শব্দ। কেঞ্চেস্ ট্রেস্ ধরে হাঁটছি। বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছি। আর বোধহয় মাত্র ফার্লং খানেক বাকি। একটা অস্পষ্ট অবসাদে সমস্ত শরীর মন যেন ঝিমিয়ে পড়তে চায়। কদিন থেকে দেশে বাবার অসুখের খবর পেয়ে একটু দুশ্চিন্তাও জমে ছিল মনের মধ্যে।" অসীম একটু থামল, কী যেন ভাবল তারপর আবার বলে চলল—"ওভার-কোটের পকেটে হাতদুটো ডুবিয়ে দিলুম। পাহাড়ের বাঁকটা পেরুতেই কানে এলো ঝর্ণার মৃদু শব্দ। বাড়ি প্রায় পৌঁছে গেছি বলা যায়। বাঁকটার ঠিক উপরে তীব্র বিদ্যুতের আলো, ঘুমন্ত

পাহাড়টাকে ধাঁধিয়ে দিতে চায়। মনে হল বাঁকটার নীচে কে যেন দাঁড়িয়ে। ভালো করে চেয়ে দেখলুম। একটা বুড়ো। খাসিয়া বুড়ো একটা। অসম্ভব কদাকার তার মুখ। চেহারাটা লম্বায় ছ' ফুটের চেয়ে নিশ্চয়ই বেশ খানিকটা বড়, গায়ে অজস্র তালি দেওয়া নোংরা জামা, খাসিয়ারা যে ধরণের জামা পরে সেই ধরণের। চওড়া কাঁধদুটো ঠেলে হাড় বেরিয়ে আসতে চায়। মুখে একটাও দাঁত নেই। কষ বেয়ে পানের পিচ গড়াচ্ছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় রক্ত। কোঁচকানো, তোবড়ানো মুখের ওপর দুটো গোলগাল ছোট ছোট চোখ, একেবারে স্থির, স্তব্ধ! আর সবচেয়ে খাপছাড়া লাগল তার হাতে টকটকে লাল একটা গোলাপ ফুল! প্রথমটায় দেখলে মনে হয় কেউ বুঝি রসিকতা করতে চেয়েছে, বুঝি কবর থেকে একটা মড়া তুলে এনে তার হাতে একটা গোলাপ গুঁজে আসরে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে গিয়েছে। তবু ওই গোলাপটা এল কোথা থেকে? এ অঞ্চলে এতদিন আছি, কখনো অত বড় আর অমন তীব্র লাল গোলাপ কোনোদিন ত দেখি নি। গোলাপটার দিকে চোখ পড়বেই পড়বে, কে যেন জোর করে চোখকে টেনে নিয়ে যায় সেটার দিকে। আর গোলাপটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সমস্ত শরীরটা ঝিমঝিম করতে থাকে, একটা বোবা ভয়ে গলা পর্য্যন্ত বন্ধ হয়ে যায়, মনে হয় শিরায় শিরায় রক্তের স্রোত বুঝি থমকে থেমে গেল, যেন হাড়ের মধ্যে বরফ ঘষবার অনুভূতি।" অসীম আবার একটু থামলো তারপর স্বরু করল: "তারপর কী হয়েছিলো বলতে পারবো না। তবে আমি নিশ্চয়ই দৌড়েছিলুম, কেন দৌড়েছিলুম তা তখনো জানি না। বাড়ির সামনে পৌঁছে সদর দরজার হাতলটায় হাত দিয়ে হুঁস ফিরে এলো; তখন একবার কি রকম হল মনের মধ্যেটায়, অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে যেন ঘাড় ফেরালুম। আর তারপর, সে যে কী অসম্ভব, কী বীভৎস তোমায় বলতে পারি না, বুড়োটা আমার কাঁধের উপর দিয়ে গলা বের করে আমার মুখের দিকে ঝুঁকে পড়তে চায়, তার চোখে সেই মৃত্যুমাখানো স্তব্ধ দৃষ্টি। আমি নিশ্চয়ই চীৎকার করে উঠেছিলুম; চাকর দৌড়ে এসে দোর খুলে দিয়ে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। কোথাও কারুর চিহ্ন পর্য্যন্ত নেই। ক্লান্ত ভাবে এলিয়ে পড়লুম একটা চেয়ারে। চাকর এক গ্লাস জল এনে দিল আর দিল একটা টেলিগ্রাম: বাবা মারা গেছেন।"

"তারপর এই বছর তিনেকে বলবার মত কিছু ঘটে নি। বুড়োটার কথা প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম। আবার তার দেখা পেলুম এই দিন ছয়েক আগে। সেদিন বিকেলে গলফ্-গ্রাউণ্ডের দিকে একটু বেড়াতে গিয়েছিলুম। বুনো ঘাস, ছোট ছোট ঝর্ণা, পাহাড়ের অসমান এলোমেলো গা আর পাইনের ঘন জঙ্গল। প্রায়ই যাই, ঘুরতে ঘুরতে জঙ্গলের মধ্যে অনেক দূর চলে যাই। মোটর-রাস্তা ছাড়িয়ে পাহাড় ভেঙ্গে ভেঙ্গে সেদিন অনেক দূর এগিয়েছি, সন্ধের মরা আলো পাইনের মাথায়। হঠাৎ মনে হল পেছনে কার যেন পায়ের শব্দ, অত্যন্ত মৃদু কিন্তু অত্যন্ত স্পষ্ট! চমকে ফিরে দাঁড়ালাম। একটা বুড়ো, চিনতে একটুও কষ্ট হল না—সেই তিন বছর আগেকার খাসিয়া বুড়োটা! সেই বিশাল লম্বা দেহ, কাঁধের উপর থেকে ঘাড় দুটো তেমনি ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, গায়ে অনেক তালি দেওয়া সেই ময়লা জামা আর গাল বেয়ে ঠিক সেইরকমই পানের রস গড়িয়ে পড়ছে। সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগল টকটকে লাল গোলাপটা আজও তার হাতে। প্রথমটায় গা একটু ছমছম করে উঠেছিলো, কিন্তু বিশ্বাস করো, সেদিন সত্যি আমি ভয় পাই নি। বরং বিরক্তিতে সমস্ত মন তেতো হয়ে গেল, সোজা গেলুম তার মুখের কাছে। প্রশ্ন করলুম: "কী চাও তুমি, কেন ঘোরো আমার পেছু পেছু?" বুড়োটা উত্তর দিল না। চুপ করে ফাঁকা চোখে আমার দিকে চেয়ে রইল। দেখলুম ওর কোঁচকানো কুৎসিত মুখে কী রকম অদ্ভুত একটা ঠাণ্ডা হাসি ফুটে উঠেছে আর মুখটাকে করে তুলছে বীভৎস, অসম্ভব রকম বীভৎস!

রাগে আমার হাড় পর্য্যন্ত জ্বলে যেতে লাগল, চীৎকার করে উঠলুম—"কী চাই বলো?" বুড়োটা হঠাৎ হাসি থামালো তারপর হঠাৎ থুক করে এক মুখ থুতু ছিটিয়ে দিল আমার মুখের ওপর। ঘেন্নায় আমার নাড়িভুঁড়ি যেন মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল, রাগে কাঁপতে কাঁপতে সামনের দিকে হাত বাড়ালুম, লোকটার টুঁটি টিপে বুঝিয়ে দেব! কিন্তু আশ্চর্য্য! ইতিমধ্যেই বুড়োটা আলগোছে পেছু হটে গিয়েছে। উন্মত্তের মত লাফিয়ে পড়লুম সামনের দিকে। লোকটা কিন্তু আরও পেছিয়ে গিয়েছে। তারপর স্বরু করলুম ছুটতে; কিন্তু অসম্ভব, এই পাইনের ঘন জঙ্গলে লোকটা যেন একেবারে উধাও হয়ে গিয়েছে! তখন আমার অবস্থা অনেকটা মরীয়ার মত, ওকে খুঁজে বের করে টুঁটি ধরবার নেশায় আমার সমস্ত চেতনা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। ভুলে গেছি মুখটা ধোয়ার কথা। বিন্দুমাত্র শব্দ যেদিক থেকে পাই সেদিকেই দৌড়ুতে স্বরু করি। ক্রমে অন্ধকার হয়ে এলো। ক্লান্তভাবে বসে পড়লুম একটা পাথরের উপর। তারপর মনে হল ফেরবার কথা; বুড়োকে ধরা অসম্ভব, বাড়ি ফেরাই ভালো। কিন্তু পথ? পথ কই? নিজেকে হঠাৎ বড় অসহায় দুর্ব্বল মনে হল: আলো নেই, সঙ্গী নেই, পথ নেই। একটা অজানা ভয় উঁকি মারতে স্বরু করল আমার মনের মধ্যে। হঠাৎ মনে হল কাছে শুকনো ফল মাড়াতে মাড়াতে কে হেঁটে চলেছে। সেই লোকটা নাকি? খুব সম্ভব সেই। কিন্তু না, ওকে এখন আমি আর দেখতে চাই নে। যদি সত্যিই এখন সে একবার এসে দাঁড়ায় আমার সামনে, নিতান্ত নিঃসঙ্গ দুর্ব্বল আমি, আর যদি সে আবার হেসে ওঠে তার নিরব বিকট হাসি? এভাবে বসে থাকা অসম্ভব। ফিরতে হবে। খুঁজে বের করতে হবে পথ। উঠে পড়লুম, এলোমেলো ঘুরতে স্বরু করলুম। চারপাশের অন্ধকার কী অদ্ভুত সজীব হয়ে উঠলো; মনে হল পায়ের তলায় শুকনো পাইন পাতা আমার অবস্থা দেখে চাপা হাসি হাসছে, চাপা হাসি ভেসে আসছে দূরের ঝর্ণার অস্পষ্ট শব্দের মধ্যে।

"কেমন করে বাড়ি পৌছুলুম বলতে পারবো না। তবে সেদিনও আকাশ ভোরের আলোয় নীল হয়ে এসেছে, আর এসেছে একটা টেলিগ্রাম, রতন আর নেই।"

অসীম কথা শেষ করে ইজিচেয়ারটায় নেতিয়ে পড়ল। চুপ করে বসে রইলুম। মনে হয় দুদিন মৃতু সংবাদ পাবার আগে একটা কোথাকার বুড়োকে দেখতে পেয়েছে মাত্র। ব্যাপারটা এর বেশী কিছু নয়। কিন্তু বেচারা এখন রতনের মৃত্যুতে এতই আঘাত পেয়েছে যে ওর মনের মধ্যেটায় সব জট পাকিয়ে গোলমাল হয়ে গিয়েছে। সোজা জিনিষটা সহজ করে বুঝতে পারছে না। এভাবে ভয় পাওয়াটা মোটেই কাজের কথা নয়।

তাই ঠিক করলুম ওকে আস্তে আস্তে বোঝাতে হবে। কিন্তু ফল হল না। অসীম বলল: "আমিও মনে মনে এই সব কথা অনেকবার ভেবেছি, ভেবেছি এভাবে ভয় পাওয়াটা নেহাৎই ছেলেমানুষি। কিন্তু একটা ব্যাপার দেখছ না? আমার মুখের দিকে ভালো করে দেখ।"

বাস্তবিক, মুখটা একেবারে টকটকে লাল!

বললুম—"হুঁ। উত্তেজনার মাথায় ওটা ঠিক করো নি। মুখটা সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলা উচিত ছিল। একটা নোংরা লোকের থুতু নানান রকম বীজাণু, থাকতেই পারে! যতই হোক এখন রক্তটা পরীক্ষা করানো দরকার, তারপর রোগ নির্ণয় করে দুজনে মিলে ওষুধ পাতির বন্দোবস্ত করা যাবে।"

অসীম হাসল। ক্ষীণ দুর্ব্বল হাসি। বলল—"তুমি আসবার আগেই আমি হাসপাতালে নানান ভাবে রক্ত পরীক্ষা করিয়েছি, কিছুই পাওয়া যায় নি। এখানকার সব ডাক্তার ভালো করে দেখেছেন, রোগের কোনো কিনারা করতে পারেন নি। আসলে কি জানো, ব্যাপারটা যে ডাক্তারী শাস্ত্রেই পড়ে না—শয়তানের থুতু, শয়তানের কাছে হার হয়েছে। আমি বেশ বুঝছি আমার আর পায় নেই।"

চমকে উঠ্‌লুম। তা হলে অসীমের মানসিক অসুখ কি এতদূর গড়িয়েছে। শরীরে রোগ নেই, অথচ অসুস্থ মনের পীড়নে শরীর ভাঙ্গতে সুরু করেছে! ডাক্তারী করতে করতে এ রকম দু একটা কেস্‌-এর পরিচয় আগেই হয়েছে আর যেটা সবচেয়ে মারাত্মক কথা সে সব কেস আমি একটাও ভালো হতে দেখলুম না। তা হলে কি?

যতটা পারলুম জোর গলায় কথা বলতে সুরু করলুম, হেসে উড়িয়ে দিতে চাইলুম ওর মনের সংশয়, ধমক দিয়ে ভাঙ্গতে চাইলুম ভয়, বিজ্ঞানের কথা বলে মনকে সংযত করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু লাভ কিছুই হল না। দুদিনের চেষ্টাতেও কিছু হল না। অসীম শুধু একটা কথা বলে—বলে শয়তানের থুতু, শয়তানেব কাছে হার হয়েছে! "মৃত্যু আমার ঘনিয়ে আসছে বুঝতে পারছি। শুধু একটা অনুরোধ, আমাদের গাঁয়ে আমায় পৌছে দাও।"

ওকে পৌছে দিলুম ওর গাঁয়ে। তারপর ফিরে গেলুম নিজের কাজের জায়গায়। ওর মনের অবস্থা দেখলুম প্রতি দিনই খারাপের দিকে চলেছে।

তারপর হঠাৎ একদিন একটা টেলিগ্রাম পেলুম, দিন কুড়ি পরের কথা বলছি: অসীমের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, মৃত্যুর আগে আমায় একবার দেখতে চায়।

রওনা হলুম ওর গাঁয়ের দিকে। মনে মনে কিন্তু বেজায় রাগ ধরছিলো। একটা ছেলেমানুষি ভূতের ভয় পেয়ে কিনা অমন অবুঝের মত নিজের মৃত্যু নিজেই টেনে আনছে!

ঘণ্টা নয়েক ট্রেনে। তারপর গরুর গাড়ীতে আড়াই ক্রোশ! দেরি হয়ে গিয়েছিলো। ওদের বাড়ী পৌছে শুনলুম ঘণ্টা খানেক আগেই ওকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মাইল দুয়েক দূরে শ্মশান। অসীমের এক আত্মীয় তখন বেরুচ্ছিলেন সেদিকে। তাঁর সঙ্গ নিলুম। পথে যেতে যেতে শুনলুম এখানে এসে অসীমের মুখটা ক্রমশ টকটকে লাল হতে সুরু করে। নিজেও ত কোন ওষুধ খেতে রাজি হয়নি, ডাক্তারও ডাকতে দেয়নি।

জঙ্গল আর আধমরা একটা নদী।

চিতা জ্বলছে। আগুনের আলোয় লণ্ঠনের আলোগুলো কেমন নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছে।

মনে হল প্রকাণ্ড রসিকতা একটা। অমন পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, নিজে ডাক্তার আর সেই কিনা ছেলেমানুষের মত ভূতের ভয় পেল এবং এই ভয়কে অবাধ স্বাধীনতা দিয়ে ডেকে আনলো নিজের মৃত্যু!

রাগে দুঃখে মনটা টনটন করতে লাগল। অন্ধকারে চিতার দীর্ঘ শিখাগুলো দেখি আর মনে হয় তার মধ্যে কে যেন আমায় দেখে হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে! আমি মানি না, মরে গেলেও মানব না, অথচ আমার বন্ধুকে আমার চোখের সামনেই কেমন সহজে ছিনিয়ে নিল! আগুনের শিখাগুলো হেসে গড়াগড়ি যাচ্ছে আর নদীর জলে লুটোপুটি খাচ্ছে তাদের ছায়া।

ক্রমশ অসহ্য হয়ে এলো। এই ভাবে হেরে যাব এক অলীক শয়তানের কাছে? কিন্তু কীই বা করতে পারি? উঠলুম। পকেট থেকে একটা চুরুট বের করলুম, চিতার আগুনে ধরাবো চুরুট আর একমুখ ধোঁয়া ছাড়বো আকাশের দিকে। যদি শয়তান সত্যিই থাকে আকাশের মধ্যে কোথাও তা হলে সে বুঝুক আমি পরোয়া করি নে, আমি পরোয়া করি নে, আমি পরোয়া করি নে—

ঝুঁকে পড়ে চুরুটটা ধরালুম চিতার আগুন থেকেই। কিন্তু নাকে এল অসম্ভব তীব্র একটা গন্ধ। কিসের গন্ধ? একেবারে চমকে উঠলুম। মুখ তুললুম, আর তার পরের মুহূর্ত্তে আমি গেলুম হেরে; একেবারে হেরে গেলুম—

চিতার আলোয় স্পষ্ট চোখে পড়ল ঘাড়ের পাশ দিয়ে একটা বুড়ো ঝুঁকে দেখতে চাইছে আমার মুখের দিকে! একটা খাসিয়া বুড়ো! আর স্পষ্ট দেখলুম তার হাতে একটা টকটকে লাল বেখাপ্পা বড় গোলাপ!

তারপর কি হয়েছে জানি না। আমার চেতনা ছিলো না। ধরাধরি করে ওরা আমায় গাঁয়ে ফিরিয়ে এনেছিলো।

ডাক্তার চুপ করল। ওর হাতের চুরুটটা নিভে গিয়েছিল। নিঃশব্দে ও উঠে দাঁড়ালো, তারপর আস্তে আস্তে তাঁবুর পর্দ্দা ঠেলে বাইরে গেল, বাইরের আগুনের উপর ঝুঁকে পড়ে চুরুটটা আবার ধরালো, তারপর ফিরে এল নিজের চেয়ারে।

আমাদের কারুর মুখে কথা নেই।

নদীর একটানা শব্দ আর ঘন বনের অদ্ভুত গান। হাওয়া নেই, বাইরের আগুনটা নড়ছে না, থমকে থেমে গিয়েছে আমাদের ছায়া তাঁবুর দেয়ালে!

ডাক্তার চুরুটে একটা দীর্ঘ টান দিল, জ্বলজ্বল করে উঠল ওর ছোটছোট দুটো চোখ।

স্তব্ধতা ভাঙ্গল রায়। বলল—"চমৎকার বলেছো! যাকে বলে একেবারে জমিয়ে বলা। তবে কি জানো, এটা আসল ভূতের গল্প হল না। এ হল বইএর ভূত; গল্পটা আমি আগেই পড়েছি। একটা স্পানিস গল্প। কিন্তু দেশী ছাঁচে যে রকম ঢেলেছো একেবারে চেনবার জো নেই!"

ডাক্তার উত্তর দিল না। চুপচাপ চুরুট টেনে চলল।

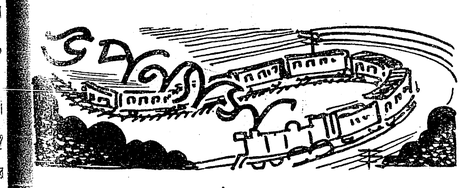

শ্বেত চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় খুন

শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের মনসুন কাফেতে প্রায়ই পাড়ার বেকার ছেলেদের আড্ডা জমে। সময় নেই অসময় নেই সেই চায়ের দোকানের নোংরা টেবিল আর রঙ-চটা টিনের চেয়ার অধিকার করে ঘাড়-ছাঁটা আর সামনের দিকে লম্বা চুল রাখা ছেলের দল হৈ-চৈ বাধিয়েই আছে। হয় ফুটবল নয় ফিল্ম—এই নিয়েই তাদের আলোচনা। আলোচনা থেকে বচসা, বচসা থেকে কয়েকবার হাতাহাতি হয়ে গেছে। কিন্তু খুন? না, খুন কখনো হয়নি। ২৭৭নং বাড়িতে এই প্রথম ঘটলো সে ঘটনা! তবে ব্যাপারটা ঠিক খুন কিংবা আত্মহত্যা এ নিয়ে এমন কি পুলিশ মহলও ঠিক করে উঠতে পারলো না।

মনসুন কাফের দুটো বাড়ি পরেই কবিরাজ ধনঞ্জয় শর্মার বাড়ি। বাইরের ঘরটায় নানা রকম শেকড়-বাকড়ে ভরা। আলমারি ভরা কাঁচের ও চিনে মাটির জারেও অনেক রকম ওষুধপত্র রয়েছে। বাইরের রাস্তা থেকে হঠাৎ ঢুকলে কি রকম যেন অন্ধকার-অন্ধকার মনে হয়। তারপর চোখ সায় এলে কবিরাজ মশাই-এর চেহারাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মাথার সাদা চুল ঘাড় পর্যন্ত গড়িয়ে নেমেছে, প্রশস্ত রেখাবহুল কপাল, এক মুখ দাড়ি। চোখের ভুরু দুটো ঘন আয় জোড়া। আর তার ভিতর থেকে উজ্জ্বল চোখ দুটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই বোঝা যায়। সে চোখের চাউনি কোমল আর গভীর। কোনো রকম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা নেই সেখানে! কেউ কথা বললে শেষ পর্যন্ত তিনি শোনেন আর সেই সুন্দর চোখ দুটি মেলে স্থির হয়ে চেয়ে থাকেন। যে কথা বলে তার কেমন যেন মনে হয় তিনি যেন তার মনের সমস্ত না-বলা কথাগুলোকেও স্পষ্ট দেখে নিচ্ছেন!

নানা ধরণের লোক কবিরাজের ঘরে দিনের প্রায় প্রত্যেক সময়েই যাতায়াত করে! ধনী দরিদ্রের বাছ-বিচার নেই তাঁর কাছে। লোকের আনাগোনা দেখে মনে হয় এ অঞ্চলে ধনঞ্জয় শর্মার যথেষ্ট সুনাম আছে। ইচ্ছে হলেই তুমি সে-ঘরে ঢুকতে পারো। ঢুকলেই দেখবে কবিরাজমশাই নিক্তি নিয়ে নানা শেকড়-বাকড় ওজন করছেন কিংবা খল নুড়ি দিয়ে কি সব ওষুধপত্র মেশাচ্ছেন। কিন্তু তুমি ঢুকলেই হাতের কাজ ফেলে

অত্যন্ত মিষ্টি হেসে তিনি এগিয়ে আসবেন। এমন ভাবে চাইবেন যে বলে দিতে হবে না তিনি জানতে চান তোমার প্রয়োজন কি। যে কোনো দুরারোগ্য অসুখের কথাই বল না কেন তিনি বিস্মিত হবেন না। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত শুনে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে নানা লক্ষণের কথা জেনে তিনি দু-চার পয়সা দামের অদ্ভুত দেখতে কোনো গাছের বিজ বা শুকনো শেকড় দেবেন এবং বলবেন সকালে চায়ের সঙ্গে কিংবা দুপুরে মিছরির সরবতের সঙ্গে মিশিয়ে সেগুলি খেলেই তোমার সব রকম অসুখ সেরে যাবে। আর মজার কথা এই—কবিরাজমশাই-এর উপর তোমার যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তা হলে সত্যিই হয়তো সে অসুখ সারবে।

ধনঞ্জয় শর্মার কাছে লোক কিন্তু শুধু ওষুধ নিতেই আসে না। পাড়ার সবচেয়ে প্রবীন আর বিচক্ষণ লোক হিসেবেও তাঁর খ্যাতির শেষ নেই। এবং সে-খ্যাতির কথা মুটে-মজুর থেকে সুরু করে অত্যন্ত অবস্থাপন্ন লোকের কাছেও পৌছেছে। ফলে নানা লোকে নানা রকম পরামর্শ নিতেও আসে তাঁর কাছে। সবাইকেই হাসিমুখে তিনি অভিনন্দিত করেন। কে ওষুধ চায় কে চায় পরামর্শ সে-কথা কেমন করে যেন তিনি বুঝতে পারেন। ওষুধের দরকার থাকলে বাইরের ঘরেই কাজ শেষ হয়। পরামর্শ নিতে যারা আসে তাদের তিনি নিয়ে যান পিছন দিকের ঘরে। সেখানে বসার জন্যে কতকগুলি চেয়ার ও কাঠের একটি তক্তা আছে। সেই ঘরে বসে নানা লোকের নানা রকম কাহিনী তিনি শোনেন—তারপর উপযুক্ত পরামর্শ দেন। দেখা গেছে এ পর্যন্ত তাঁর কথা শুনে কেউ ঠকেনি। সবাইকার ভালোই হয়েছে তাঁর কথা শুনে।

ধনঞ্জয় শর্মার বাড়ির ঠিক উল্টো দিকে থাকে মাধব চক্রবর্তী। মাধব চক্রবর্তী এখানকার অতি পুরোনো লোক; ধনঞ্জয় শর্মা আট বছর আগে যখন এই শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটে বাড়ি ভাড়া নিলেন মাধব চক্রবর্তীর সঙ্গেই তাঁর প্রথম আলাপ হোলো। মাধবের বাড়ির একতলাটা মনিহারি দোকান, দোতালায় সপরিবারে সে থাকে। অবশ্য পরিবার বলতে তার আর কেউ নেই—একমাত্র ছেলে সঞ্জীব ছাড়া। সেকালের লোক মাধব চক্রবর্তী। লেখাপড়ার বিশেষ ধার ধারে না। তার ইচ্ছে সঞ্জীব কলেজ ছেড়ে এখন থেকেই তার ব্যবসার কাজ দেখে। কিন্তু সঞ্জীব—ওই এক ধাঁচের ছেলে! লেখাপড়া নিয়ে পাগল! এইবার বি. এস্ সি দিয়েছে। আগের পরীক্ষাগুলোতেও ভালো হয়েছিলো এই পরীক্ষাটাও যে ভালো হবে সে-কথা সবাই জানে। এতে কিন্তু তার বাবা মোটেই খুসি নয়। কেবলি খুঁতখুঁত করে আর বলে বি-এ এম্-এ পাশ করে কী হয়—ত্রিশ টাকার কেরানীগিরি ছাড়া? তার চেয়ে এখন থেকে তার দোকানে বসলে, ব্যবসাটা ভালো করে শিখে নিলে ভবিষ্যতের আর ভাবনা থাকে না। তার দোকান বেশ ভালো চলে।

মাধব কথা বলতে একটু বেশি রকম ভালোবাসে আর ধনঞ্জয় ভালোবাসেন শুনতে। তাই তাদের দুজনের আলাপ গভীর থেকে গভীরতর হতে মোটেই দেরি হোলো না। আজ আট বছর ধরে নানা ভাবে সেই আলাপ একটি সুন্দর বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। নিজের এমন কোনো খবর নেই—এমন কি ব্যবসার খুঁটিনাটি পর্যন্ত যা মাধব ধনঞ্জয়কে না বলে। শুনতে-শুনতে ধনঞ্জয় কবিরাজের এমন হয়েছে যে নিজের ঘরে বসে চোখ বুজে তিনি বলে দিতে পারেন মাধবের দোকানের কোন্ আলমারিতে কী জিনিস আছে, দিনে ক' প্যাকেট সিগারেট আর ক' ভরি নস্যি বিক্রি হয় সে খবরও ধনঞ্জয়ের কাছে অজানা নয়!

নিজের ছেলের পড়াশুনোয় মতিগতি দেখে চিন্তিত হয়ে বহুবার সে ধনঞ্জয়ের কাছে পরামর্শ নিতে এসেছে। হেসে ধনঞ্জয় বরাবরই বলেছেন, "দেখো ভায়া! তোমার ছেলে সাধারণ নয়। সাধারণ ভাবে তাই সে পরীক্ষা পাশ করে চাকরির জন্যে ঘুরবে না। সে বিজ্ঞানের ছাত্র, রিসার্চ করার তার বিশেষ ইচ্ছে। এতে বাধা দেওয়া ঠিক হবে বলে মনে হয় না। একটা কিছু সে হবেই। আর কিছু

যদি না হতে পারে তখন তোমার ব্যবসা তো রইলোই। সেটারই দেখাশুনো করবে। বরঞ্চ এক কাজ কোরো: যাতে ব্যবসার ব্যাপারটা সে ভালো করে শিখতে পারে তার জন্যে তাকে দিনে অন্তত এক ঘণ্টা করে দোকানে তোমার সঙ্গে বসতে বলে দোবো, তা হলেই হবে!"

মাধব যেমন ধনঞ্জয়ের কাছে ছেলে সম্বন্ধে পরামর্শ নিতে আসতো সঞ্জীবও তেমনি লুকিয়ে ধনঞ্জয়ের কাছে আসতো যাতে তিনি মাধবকে বলে সঞ্জীবের পড়াশুনো চালু রাখার ব্যবস্থা করেন। ধনঞ্জয়ের মধ্যস্থতায় এই ব্যবস্থাই ঠিক হয়েছে: সঞ্জীব কলেজেও যায় আর দিনের মধ্যে ঘণ্টাখানেক দোকানেও বসে। উভয়পক্ষই এতে খুসি।

২৭৭ নং-এ ঐ ধরণের রহস্যজনক মৃত্যু ঘটবার পর চার দিন কেটে গেছে। পঞ্চম দিন সকাল থেকেই ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। আকাশ অন্ধকার। কখন যে সূর্য উঠলো আর কখন যে অস্ত গেলো বোঝা গেলো না। বিকেল থেকেই যেন সন্ধে হয়ে গেলো। আর একটু পর থেকেই হোলো রাত। কলকাতার উপর একটি ক্লান্ত কালো পাখী যেন সমস্ত দিন বৃষ্টিতে ভিজে ডানা মেলে নামলো।

দুপুর থেকেই মাধব ঘন-ঘন ধনঞ্জয়ের খোঁজ করেছে। সে অবশ্য জানতো সন্ধের আগে ধনঞ্জয় ফিরবেন না। মাসে বার তিনেক কলকাতার কাছাকাছি জায়গায় তিনি নানা লতাপাতা সংগ্রহ করতে যান। গতকাল রাত্রেই বলেছিলেন আজ যাবার কথা। তবু মাধব খোঁজ না করে পারেনি। বলবার মতো এতো সব কথা জমেছে! খবরের কাগজে তো জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র মৃত্যু-সংবাদই শুধু ছাপা হয়েছে আর তাই নিয়েই এ-পাড়ার লোকরা যেন ক্ষেপে উঠেছে! কিন্তু আজ সে ভিতরের অনেক ঘটনাই পেয়েছে জানতে। তার বাড়িতে আজ পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিত এসেছিলো। বয়স প্রায় পঁয়ত্রিশ। খুব চটপটে আর চালাক চেহারা। পুলিশের মধ্যে যে এমন অমায়িক আর রসিক পুরুষ আছে মাধবের সে-খবর জানা ছিলো না। বরাবরই পুলিশ সম্বন্ধে তার মনে একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত ভয় ছিলো। আজ কিন্তু রঞ্জিতের সঙ্গে পরিচয় হবার পর সেই ভয় অনেকটা কেটে গেছে। রঞ্জিতের উপর পড়েছে এই মৃত্যু-রহস্যের তদন্তের ভার। যদিও খবরের কাগজওয়ালারা এবং করোনারের তদন্ত এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলেই মনে করেছে তবু রঞ্জিত মনেমনে এখনো নিঃসন্দেহ হয়নি। এ-পাড়ার নানা প্রাচীন অধিবাসীর সঙ্গে সে দেখা করেছে এবং তাদের কাছে এ-বিষয়ে আরো নতুন খবর পাবার চেষ্টা করছে। মাধব এ-পাড়ার প্রাচীনতম অধিবাসীদের একজন। সেই সূত্রেই রঞ্জিত তার কাছে গিয়েছিলো। রঞ্জিত কিন্তু মাধবের কাছে কোনো নতুন খবর না পেলেও মাধব অনেক নতুন খবর রঞ্জিতের কাছে আদায় করে নিয়েছে। সেই সব কথাই মাধব ধনঞ্জয়-কে বলবার জন্যে সমস্তদিন ধরে ছটফট করছে। এই বাদলার দিনেও কি কিছু আগে ধনঞ্জয়-কে ফিরতে নেই? যত রাজ্যের ছাইপাঁশ গাছ-গাছড়ার খোঁজে নানা বে-জায়গায় ঘুরতে হয়? কেমন মানুষ এই ধনঞ্জয়?

সমস্ত দিনের টিপটিপে বৃষ্টি সন্ধের মুখে ঝমঝম করে নামলো। বাইরের দিকে চাইলে মনে হয় অনেক রাত হয়েছে। কিন্তু ঘড়িতে সবে তখন সাড়ে সাতটা। অন্তত আরো আধ ঘণ্টা দেরী আছে ধনঞ্জয়ের। এ সময়টুকু আর কাটতে চায় না।

এমন সময় মাধবের দোকানের ভেজানো দরজা ঠেলে বর্ষাতি আর ছাতি নিয়ে এলো রঞ্জিত।

মাধবকে দেখে হেসে বললো, "খুব অবাক হচ্ছেন, না?"

অবাক সে যে সত্যিই হয়েছিলো তাতে সন্দেহ কী? তাই উত্তর না দিয়ে ব্যস্ত হয়ে শুধু চেয়ারটা টেনে আনলো রঞ্জিতের জন্যে।

চেয়ারে বসে রঞ্জিত বললো, "এ-পথ দিয়ে যাচ্ছিলুম তাই ভাবলুম আর একবার দেখা করে যাই!"

বিশেষ আপ্যায়িত হয়ে মাধব বললো, "নিশ্চয়ই! বিলক্ষণ! এতো আপনাদেরই ঘরবাড়ি! তা একটু চা-টা—"

"মন্দ কি? যা বৃষ্টি নেমেছে, চা না খেলে ঠিক যেন জমছে না!"

সঞ্জীব এক পাশে বসে দোকানের হিসেব-পত্র দেখছিলো। পুলিশের লোককে ঘনঘন আসতে দেখে ব্যাপারটা সে যেন ঠিক পছন্দ করলো না। মুখ তুলে একবার রঞ্জিতকে ভালো করে দেখে আবার নিজের হিসেবে মন দিলো।

চায়ের পেয়ালা শেষ করে রঞ্জিত বললো, "ওই ২৭৭ নম্বরে খুনের ব্যাপারটা বলছিলুম মশাই! ব্যাপারটা এবার রীতিমতো ঘোরালো হয়ে উঠেছে। সেই ভাঙা বাল্‌ব্‌টা বিশেষজ্ঞদের দিয়ে আমরা পরীক্ষা করিয়েছি। তাঁরা ভালো করে পরীক্ষা করে বলছেন আসলে ওটা নাকি বাল্‌ব্‌ই নয়—এক ধরণের বিষাক্ত বোমা!—"

"বলেন কি? বোমা?—এ যে দেখছি বোমার যুগ এলো! একটা মানুষ মারতেও বোমা? কিন্তু এ কেমনধারা বোমা মশাই, ঠিক মানুষটি মরলো অথচ দেয়াল থেকে চূণবালি পর্যন্ত খসলো না?"

"এই বোমার ব্যাপারটাই তো মজার! এ-ভাবে কখনো আগে মানুষ খুন করা হয়েছে বলে শুনিনি! বাল্‌ব্‌টার ভেতরের ফিলামেণ্টটা সরিয়ে নাকি পাতলা একটা তারের সঙ্গে গান্‌-কটন্‌ জড়ানো ছিলো। সকেট্‌ আর্‌ ঐ গান্‌-কটন্‌-এর সঙ্গে ছুঁয়েছিলো সেলুলয়েডের চারদিক বন্ধকরা একটি পাত্র আর সেই পাত্রের মধ্যে ছিলো কী যেন এ্যাসিড—কী এ্যাসিড···ট্রুসিক, না—"

রঞ্জিতকে বাধা দিয়ে সঞ্জীব বললো, "ট্রুসিক না, সম্ভবত প্রুসিক এ্যাসিড। ব্যাপারটা বুঝতে পারলুম। ঐ বাল্‌ব্‌-এর মতো দেখতে বোমাটিকে ল্যাম্প-হোল্ডারে লাগিয়ে সুইচ টিপলেই বিদ্যুতের উত্তাপে পাতলা তারটা গরম হয়ে উঠবে, গরম তারটা গান্‌-কটন্‌কে জ্বালিয়ে দেবে, ফলে সেলুলয়েডের পাত্রটাও জ্বলে উঠবে—আর সেই আগুনের আঁচে প্রুসিক এ্যাসিডের বাষ্পে ভরে যাবে সমস্ত ঘর। সেই বাষ্প নাকে গেলে মৃত্যু হতে খুব বেশি দেরি হয় না।"

সঞ্জীবের কথা তারা দুজনে মন দিয়ে শুনছিলো। কথা শেষ হলে রঞ্জিত বললো, "আপনি বুঝি বিজ্ঞানের ছাত্র?"

জীবনে এই বোধহয় প্রথম মাধব গর্ব বোধ করলো তার ছেলের লেখাপড়ার সম্বন্ধে। সে-ই উত্তর দিলো, "হ্যাঁ মশাই, আর বলেন কেন! এই লেখাপড়াটাই ওর একমাত্র নেশা।"

"তাই নাকি?" উত্তরে বললো রঞ্জিত তারপর আড়চোখে একবার ভালো করে সঞ্জীবকে দেখে নিয়ে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলো। সঞ্জীবের কেন জানি না সেই স্বর আর ঐ আড়চোখের চাউনিটুকু মোটেই ভালো লাগলো না।

"আপনার বাড়ির সামনে কে থাকেন, মাধববাবু?"

"ধনঞ্জয় শর্মা, কবিরাজ।"

"শুনছিলুম শুধু কবিরাজিই তাঁর ব্যবসা নয়, তিনি নাকি হাত-টাত দেখেন, নানা লোককে নাকি নানা পরামর্শ দেন, এ-পাড়ায় নাকি তাঁর খুব নাম-ডাক?"

"হাত দেখার ব্যাপারটা জানি না মশাই! তবে তিনি অত্যন্ত বিচক্ষণ আর প্রাচীন লোক। সবাই তাই তাঁর কাছে যায়।"

"ভারি অদ্ভুত মজার লোক তো! তাঁর কাছে একবার আমাকে নিয়ে চলুন না। ভদ্রলোকের কাছে হয়তো দরকারী নানা খবর পাওয়া যাবে।"

উৎসাহিত হয়ে মাধব বললো, "আমিও তো তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছি! তিনি সেই কোন ভোরে বেরিয়েছেন কলকাতার কাছে কোথায় যেন গাছগাছড়ার সন্ধানে। এখনি ফিরলেন বলে।—খোকা, দেখ তো, ধনঞ্জয় শর্মার ঘরে আলোটা জ্বলছে কিনা।"

সঞ্জীব দরজা ফাঁক করে দেখে বললে, "হ্যাঁ, কবিরাজ-মশাই বোধ হয় এই এলেন। আলো জ্বলছে। জানলাটা তিনি খুলছেন দেখলুম। বৃষ্টিটা তো ধরে এলো বাবা, আমি একটু ঘুরে আসছি। এখনি আসবো।"

মাধব আর রঞ্জিত বেরিয়ে যেতে সঞ্জীবও বেরুলো।

এতোক্ষণে বৃষ্টির জোর কমে এসেছে। বাতাসের জোর বিশেষ নেই। তাই রাস্তা পেরিয়ে ধনঞ্জয় শর্মার বাড়ি পৌঁছতে তাদের অসুবিধে হোলো না।

ঘরে ঢুকে তারা দেখলো ধনঞ্জয় একটা বেশ বড়সড় গোছের ঝুলি থেকে নানা ভিজে গাছ-গাছড়া স্তূপাকার করে একপাশে রেখেছেন তারপর সযত্নে এক-এক জাতের লতাপাতাগুলো বেছে আলাদা করে রাখছেন।

মাধব বললো, "কবিরাজমশাই, ইনি রঞ্জিতবাবু, পুলিশ ইন্সপেক্টর। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন ২৭৭ নম্বরে জয়কৃষ্ণ সামন্তের মৃত্যু সম্পর্কে।"

স্মিতমুখে ধনঞ্জয় তাদের বসতে বললেন। "ভারি খুসি হলুম রঞ্জিতবাবু আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে। কী খবর জানতে চান বলুন। সব রকম সাহায্য করতেই আমি প্রস্তুত। তবে তার আগে একটু চা—"

"না-না," হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে রঞ্জিত উত্তর দিলো, "সাড়ে-আটটা বেজে গেছে। এতো রাতে আর চা নয়। তা ছাড়া একটু আগেই মাধববাবুর ওখানে খেয়ে এলুম।"

"বেশি চা না খাওয়াই ভালো," বলে ধনঞ্জয় একেবারে কাজের কথা পাড়লেন, "কিন্তু জয়কৃষ্ণ সম্বন্ধে তো কোনো কথা আমি জানি না। আট বছর আগে আমি প্রথম এ-পাড়য় আসি। তারো সাত বছর আগে ভদ্রলোক এ-পাড়া ছেড়ে গিয়েছিলেন।"

"জানবার অবশ্য কথা নয়। তবে আপনার কাছে নানা ধরণের লোকজন সব আসে তো! তাই ভাবছিলুম কারুর কাছে যদি এমন কোনো খবর পেয়ে থাকেন যাতে আমাদের পক্ষে তদন্তের কোনো রকম সুবিধে হয়—"

"আপনারা তা হলে এই মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে মনে করেন না?"

"কী করে করি বলুন! প্রথমত জয়কৃষ্ণের পকেটে আনন্দমোহন নামে যে-ভদ্রলোকের চিঠি পাওয়া গিয়েছিলো তাতে স্পষ্ট ইঙ্গিত ছিলো জয়কৃষ্ণ চোরাই জিনিস কেনাবেচার ব্যবসা করে। আমরা তার বাড়ি খানাতল্লাস করে অনেক সব চোরাই মাল পেয়েছি। যে-লোক আত্মহত্যা করতে চায় সে কি কখনো মরবার আগে নিজেকে চোর বলে প্রমাণ করে মরে?"

"কী জানি মশাই! মানুষের মন ভারি বিচিত্র জিনিস। আমার তো ঢের বয়েস হোলো—কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানুষের মন ঠিক চিনলুম না। খবরের কাগজের ও করোনার তদন্তের রিপোর্ট পড়ে আমার তো একরকম ধারণা জন্মে গিয়েছিলো যে জয়কৃষ্ণ সামন্ত কোনো কারণে আত্মহত্যা করতে বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন এবং সে-কারণেই একটা ঘোরালো উপায়ে বিষ খেয়ে মরেছেন! কিন্তু কাগজে তো চিঠির সবটা ছাপা হয়নি। তাই চোরাই মালের কথা জানতুম না।"

"এটা যে আত্মহত্যা নয় আরো অনেকগুলি প্রমাণ তার সাক্ষী দেয়। ও-বাড়িটা সত্যিই আনন্দমোহন কিনেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য বলাই বাহুল্য আনন্দমোহন বলছেন এই চিঠির বিষয়ে কিছুই তিনি জানেন না। টেলিফোনে চাবি কাউকে দেবার কথাও তিনি নাকি বলেননি। যাঁর বাড়িতে চাবি থাকতো তাঁর নাম পরিতোষবাবু। পরিতোষবাবু বলছেন আনন্দমোহন নাকি তার আগের দিনও টেলিফোন করেছিলেন এক শিখ ভদ্রলোককে চাবি দেবার জন্যে। সেই শিখ ভদ্রলোক নাকি বাড়িটার মেঝে পেটেণ্ট স্টোনের বানাবার কনট্র্যাক্ট নিয়েছেন। জয়কৃষ্ণবাবুর মৃত্যুর আগের দিন সেই শিখ ভদ্রলোক অল্প সময়ের জন্যে চাবি নিয়েছিলেন। অথচ আনন্দমোহনবাবু বলছেন সেই শিখ ভদ্রলোকের কথা তিনি কিছুই জানেন না।"

তারপর রঞ্জিত সেই বিষাক্ত-বোমার কথা জানালো এবং জানতে চাইলো এ-পাড়ায় এ-ধরণের কোনো শিখ থাকে কিনা যার উপর ধনঞ্জয়ের সন্দেহ হয়।

উত্তরে ধনঞ্জয় বললেন, "কিন্তু কী রকম দেখতে বললেন না তো!"

"ওইখানেই গোলমাল! পরিতোষবাবু বলছেন তাকে যে-কোনো সাধারণ শিখের মতোই দেখতে। শুধু দাড়ির রঙটা কটা আর কপালের উপর গভীর ক্ষতের দাগ—"

রঞ্জিতের কথা শেষ হবার আগেই সবাইকে চমকে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো সঞ্জীব। তার মুখ চোখ উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত।

"সঞ্জীববাবু! আপনার খোঁজেই এসেছি। সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। শিগগীর আমার সঙ্গে আসুন। 'চাঁদনি টকির' কয়েকটা বাড়ি পরে ছোটো একটা গলি আছে। সেখান দিয়ে যাবার সময় কার যেন গায়ে পা লাগলো। অন্ধকারে দেখতে পাইনি। দেশলাই জেলে দেখি এক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছেন। চিনতে কষ্ট হোলো না, তাঁর নাম রমেন মজুমদার। প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আপনারা শিগগীর আসুন। মনে হচ্ছে বেঁচে নেই। সমস্ত জায়গাটা জলে আর রক্তে একাকার। তার পিঠে একটা ছুরির ফলা বিঁধে রয়েছে।" [ক্রমশ]

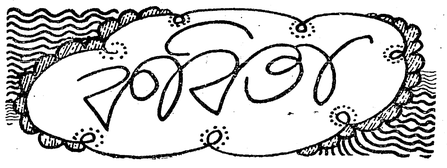

ঘুম-ছাড়ানো-ছড়া

প্রবোধচন্দ্র বসু

আয় ঘুম আয়।
দুধ না পেয়ে খোকা আমার চোখটি মেলে চায়।
আয়, ঘুম আয়॥
পরশু আছে 'রেশন ডে', কাল্‌কে খাবো কি?
'চোর-বাজারে' কয়লা, তেল, কিনতে দিয়েছি।
খোকার নেই জামা, তার মায়ের নাই শাড়ি,
ছেঁড়া-ধুতি-পরা বাবা বসেই থাকে বাড়ি।
'কণ্ট্রোলে' বা 'রেশন-কার্ডে' কাপড় পাওয়াই দায়।
আয় ঘুম আয়॥

বাজারে নেই কেরোসিন, তাই ঘরে নেইকো আলো,
চাঁদের বরণ খোকা আমার, তুমিই আলো জ্বালো।
'কিউ'য়ে গেল গতর, আর 'চোরবাজারে' টাকা,
জাতও গেল, পেট না ভরে,—সবই ঠেকে ফাঁকা।
সবই বিকোয় ত্রিগুণ দামে, তাও মিলেনা, হায়,
আয় ঘুম আয়॥
ঘুম আসে না, খোকা জাগে এ-অরাজক দেশে,
আয়ের চেয়ে ব্যয় যে বেশী, ট্যাক্স যোগাব কিসে?

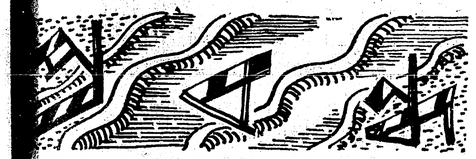

সত্যিকারের এ্যাডভেঞ্চার

বংশীবদন মুখোপাধ্যায়

গত মহাযুদ্ধের পরের ঘটনা। হলিউডে একটি ফিল্ম কোম্পানি ছবি তুলছে। সেদিন ছবি তোলার কথা চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে একটি লোক লাফিয়ে পড়বে। নীচে অবশ্য জাল পাতা আছে। সবাই প্রস্তুত, ক্যামেরায় সে ছবি তুলবে সে থেকে ছবির পরিচালক পর্যন্ত। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্যে বহু লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। পরিচালক অভিনেতাকে সংকেতে জানালো: এবার লাফ দাও। কিন্তু যার লাফ দেবার কথা সে কেমন যেন ঘাবড়ে গেলো। অত উঁচু থেকে নীচেকার ছোটো জাল দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো তার বুক। কয়েকবার ইতস্তত করলো। তারপর উপর থেকে চেঁচিয়ে বললো, "ক্ষমা করবেন, লাফ দিতে পারলুম না!"

জনতার ভিতর দাঁড়িয়ে দেখছিলো ডিক গ্রেস নামে লোকটি একটি লোক। গত মহাযুদ্ধে বৈমানিকের কাজ সে করেছে। সবাইকে অবাক করে মই বেয়ে উপরে উঠে সে জানালো লাফ দেবার জন্যে প্রস্তুত। বলেই কিন্তু তার মনে হোলো না এলেই হোতো! কাজটা যে কী রকম শক্ত এতো উঁচু থেকে নীচের দিকে চাইতেই মনে হোলো তার। কিন্তু তখন ফেরা আর যায় না! হাজার মানুষের চোখ তাকে বিঁধে ফেলেছে। নীচে থেকে পরিচালক আদেশ দিলো, "লাফাও"। আর সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেস-এর পা-টা যেন পিছলে গেলো। শূন্যে নানা রকম পাক খেয়ে পড়লো সে জালের উপর। পরিচালক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, "চমৎকার! এমন স্বাভাবিক ভাবে পড়া সহজে দেখা যায় না।" আর সেই দিন থেকেই ডিক গ্রেস হলিউডের "স্টাণ্ট ম্যান" হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেলো।

এ্যাডভেঞ্চারের ছবিতে আমরা কতবার দেখেছি মোটর গাড়ি উল্টে নায়ক ছিটকে পড়েছে, এআরোপ্লেন দাউ-দাউ করে জলতে-জলতে মাটিতে আছড়ে পড়ছে—ভিতরে চালক। দেখেছি বাড়ির ছাত থেকে লাফ দেওয়া, ঘোড়া থেকে পড়া, গায়ে-আগুন-লাগা লোকের ছুটোছুটি, আরো কত কী। দেখতে-দেখতে কতবার আমাদের নিশ্বেস বন্ধ হয়ে এসেছে, বুক ধ্বক-ধ্বক করে উঠেছে। সেই সব দৃশ্যকে বলা হয় "স্টাণ্ট" দৃশ্য এবং সেই সব ভূমিকায় আসল অভিনেতারা অভিনয় করে না। তাই সেই সব দৃশ্য তোলবার সময় এমন মানুষের দরকার যে সাহস করে ওই রকম বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে রাজী। ছবি তোলার কায়দায় দর্শকদের মনেই হয় না আসল অভিনেতার বদলে "স্টাণ্ট ম্যান" সবাইকে তাক লাগাচ্ছে।

ডিক গ্রেস বলতে গেলে হলিউডের শ্রেষ্ঠ "স্টাণ্ট ম্যান।" ছত্রিশবার এআরোপ্লেন সমেত মাটিতে আছড়ে পড়ার চিহ্ন তার দেহে খোদাই হয়ে আছে। তার গলার হাড় একবার ভেঙেছিলো, স্থানচ্যুত হয়েছিলো মেরুদণ্ড, ন'বার চুরমার হয়েছিলো পাঁজরাগুলো। তবু আশ্চর্যকাণ্ড, মানুষটা মারেনি!

কিন্তু ৪৫ বছর বয়সে গ্রেস এই স্টাণ্ট-এর কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে শুধু শিক্ষক—নানা লোকদের শেখায় কী করে স্টাণ্ট-এর কাজ করতে হয়।

তার জীবনের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এইবার বলি।

একবার এক পরিচালক গত মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একটি লড়াই-এর ছবি তুলছিলো। গ্রেস-কে সে বললো ঐ ছবির জন্যে অনেকগুলি বিমান দুর্ঘটনার দৃশ্য দরকার। গ্রেস-কে সে-ভার নিতে হবে। প্রথম বিমান দুর্ঘটনা

তারপর রঞ্জিত সেই বিষাক্ত-বোমার কথা জানালো এবং জানতে চাইলো এ-পাড়ায় এ-ধরণের কোনো শিখ থাকে কিনা যার উপর ধনঞ্জয়ের সন্দেহ হয়।

উত্তরে ধনঞ্জয় বললেন, "কিন্তু কী রকম দেখতে বললেন না তো!"

"ওইখানেই গোলমাল! পরিতোষবাবু বলছেন তাকে যে-কোনো সাধারণ শিখের মতোই দেখতে। শুধু দাড়ির রঙটা কটা আর কপালের উপর গভীর ক্ষতের দাগ—"

রঞ্জিতের কথা শেষ হবার আগেই সবাইকে চমকে হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলো সঞ্জীব। তার মুখ চোখ উত্তেজনায় উদ্‌ভ্রান্ত।

"সঞ্জীববাবু! আপনার খোঁজেই এসেছি। সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড। শিগগীর আমার সঙ্গে আসুন। 'চাঁদনি টকির' কয়েকটা বাড়ি পরে ছোটো একটা গলি আছে। সেখান দিয়ে যাবার সময় কার যেন গায়ে পা লাগলো। অন্ধকারে দেখতে পাইনি। দেশলাই জেলে দেখি এক ভদ্রলোক পড়ে রয়েছেন। চিনতে কষ্ট হোলো না, তাঁর নাম রমেন মজুমদার। প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসেন। আপনারা শিগগীর আসুন। মনে হচ্ছে বেঁচে নেই। সমস্ত জায়গাটা জলে আর রক্তে একাকার। তার পিঠে একটা ছুরির ফলা বিঁধে রয়েছে।"

[ক্রমশ]

কবিতা

ঘুম-ছাড়ানো-ছড়া

প্রবোধচন্দ্র বসু

আয় ঘুম আয়।
দুধ না পেয়ে খোকা আমার চোখটি মেলে চায়।
আয়, ঘুম আয়॥
পরশু আছে 'রেশন ডে', কাল্‌কে খাবো কি?
'চোর-বাজারে' কয়লা, তেল, কিনতে দিয়েছি।
খোকার নেই জামা, তার মায়ের নাই শাড়ি,
ছেঁড়া-ধুতি-পরা বাবা বসেই থাকে বাড়ি।
'কণ্ট্রোলে' বা 'রেশন-কার্ডে' কাপড় পাওয়াই দায়।
আয় ঘুম আয়॥
বাজারে নেই কেরোসিন, তাই ঘরে নেইকো আলো,
চাঁদের বরণ খোকা আমার, তুমিই আলো জালো।
'কিউ'য়ে গেল গতর, আর 'চোরবাজারে' টাকা,
জাতও গেল, পেট না ভরে,—সবই ঠেকে ফাঁকা।
সবই বিকোয় ত্রিগুণ দামে, তাও মিলেনা, হায়,
আয় ঘুম আয়॥
ঘুম আসে না, খোকা জাগে এ-অরাজক দেশে;
আয়ের চেয়ে ব্যয় যে বেশী, ট্যাক্স যোগাব কিসে?

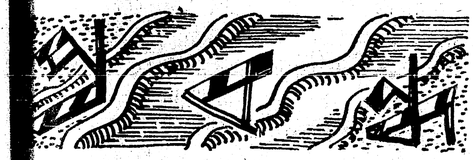

সত্যিকারের এ্যাডভেঞ্চার

বংশীবদন মুখোপাধ্যায়

গত মহাযুদ্ধের পরের ঘটনা। হলিউডে একটি ফিল্ম কোম্পানি ছবি তুলছে। সেদিন ছবি তোলার কথা চল্লিশ ফুট উঁচু থেকে একটি লোক লাফিয়ে পড়বে। নীচে অবশ্য জাল পাতা আছে। সবাই প্রস্তুত, ক্যামেরায় যে ছবি তুলবে সে থেকে ছবির পরিচালক পর্যন্ত। এই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখার জন্যে বহু লোক ভীড় করে দাঁড়িয়েছে। পরিচালক অভিনেতাকে সংকেতে জানালো: এবার লাফ দাও। কিন্তু যার লাফ দেবার কথা সে কেন যেন ঘাবড়ে গেলো। অত উঁচু থেকে নীচেকার ছোটো জাল দেখে ভয়ে কেঁপে উঠলো তার বুক। কয়েকবার ইতস্তত করলো। তারপর উপর থেকে চেঁচিয়ে বললো, "ক্ষমা করবেন, লাফ দিতে পারলুম না!"

জনতার ভিতর দাঁড়িয়ে দেখছিলো ডিক গ্রেস নামে লাজুক একটি লোক। গত মহাযুদ্ধে বৈমানিকের কাজ সে করেছে। সবাইকে অবাক করে মই বেয়ে উপরে উঠে সে জানালো লাফ দেবার জন্যে প্রস্তুত। বলেই কিন্তু তার মনে হোলো না এলেই হোতো! কাজটা যে কী রকম শক্ত এতো উঁচু থেকে নীচের দিকে চাইতেই মনে হোলো তার। কিন্তু তখন ফেরা আর যায় না! হাজার মানুষের চোখ তাকে বিঁধে ফেলেছে। নীচে থেকে পরিচালক আদেশ দিলো, "লাফাও"। আর সঙ্গে-সঙ্গে গ্রেস-এর পা-টা যেন পিছলে গেলো। শূন্যে নানা রকম পাক খেয়ে পড়লো সে জালের উপর। পরিচালক উচ্ছ্বসিত হয়ে বললো, "চমৎকার! এমন স্বাভাবিক ভাবে পড়া সহজে দেখা যায় না।" আর সেই দিন থেকেই ডিক গ্রেস হলিউডের "স্টান্ট ম্যান" হিসেবে বিখ্যাত হয়ে গেলো।

এ্যাডভেঞ্চারের ছবিতে আমরা কতবার দেখেছি মোটর গাড়ি উল্টে নায়ক ছিটকে পড়েছে, এআরোপ্লেন দাউ-দাউ করে জলতে-জলতে মাটিতে আছড়ে পড়ছে—ভিতরে চালক। দেখেছি বাড়ির ছাত থেকে লাফ দেওয়া, ঘোড়া থেকে পড়া, গায়ে-আগুন-লাগা লোকের ছুটোছুটি, আরো কত কী। দেখতে-দেখতে কতবার আমাদের নিশ্বেস বন্ধ হয়ে এসেছে, বুক ধ্বক-ধ্বক করে উঠেছে। সেই সব দৃশ্যকে বলা হয় "স্টান্ট" দৃশ্য এবং সেই সব ভূমিকায় আসল অভিনেতারা অভিনয় করে না। তাই সেই সব দৃশ্য তোলবার সময় এমন মানুষের দরকার যে সাহস করে ওই রকম বিপদের মধ্যে ঝাঁপ দিতে রাজী। ছবি তোলার কায়দায় দর্শকদের মনেই হয় না আসল অভিনেতার বদলে "স্টান্ট ম্যান" সবাইকে তাক লাগাচ্ছে।

ডিক গ্রেস বলতে গেলে হলিউডের শ্রেষ্ঠ "স্টান্ট ম্যান।" ছত্রিশবার এআরোপ্লেন সমেত মাটিতে আছড়ে পড়ার চিহ্ন তার দেহে খোদাই হয়ে আছে। তার গলার হাড় একবার ভেঙেছিলো, স্থানচ্যুত হয়েছিলো মেরুদণ্ড, ন'বার চুরমার হয়েছিলো পাঁজরাগুলো। তবু আশ্চর্যকাণ্ড, মানুষটা মারেনি!

কিন্তু ৪৫ বছর বয়সে গ্রেস এই স্টান্ট-এর কাজ ছেড়ে দিয়েছে। এখন সে শুধু শিক্ষক—নানা লোকদের শেখায় কী করে স্টান্ট-এর কাজ করতে হয়।

তার জীবনের কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা এইবার বলি।

একবার এক পরিচালক গত মহাযুদ্ধকে কেন্দ্র করে একটি লড়াই-এর ছবি তুলছিলো। গ্রেস-কে সে বললো ঐ ছবির জন্যে অনেকগুলি বিমান দুর্ঘটনার দৃশ্য দরকার। গ্রেস-কে সে-ভার নিতে হবে। প্রথম বিমান দুর্ঘটনা

হবে একটি প্লেন আকাশ থেকে সজোরে মাটিতে আছড়ে পড়ছে। যেখানে পড়ছে সে জায়গাটার চারদিকে কাঁটা-তারের বেড়া, জমির নানা জায়গায় বড়বড় গর্ত। ঐ কাঁটাতারগুলি এড়িয়ে, গর্তগুলি বাদ দিয়ে একটি বিশেষ জায়গায় প্লেন নিয়ে তাকে পড়তে হবে—সেখান থেকে ক্যামরার দূরত্ব পঞ্চাশ ফুট। তার চেয়ে দূরে পড়লে ছবি উঠবে না। সমস্ত ব্যাপারটা নিরর্থক হবে।

গ্রেস বেশি কথার মানুষ নয়। রাজী হোলো সে। ঘটনার দিন বহু দর্শক জমেছে। সবাই প্রস্তুত। দেখা গেলো আকাশ থেকে একটি মৃত পাখীর মতো গ্রেসের প্লেন পড়ছে। যেন উল্কার মতো তার গতি। মাটি থেকে কুড়ি ফুট উঁচু থেকে প্রথমে প্লেনের একটি পাখা মাটিতে বিঁধলো, তারপর প্লেনের দেহ, তারপর উল্টে গিয়ে অন্যদিকের পাখাটা আছড়ালো মাটিতে। চুরমার হোলো প্লেন। দুরুদুরু বুক নিয়ে সবাই মুহূর্তের পর মুহূর্ত গুনতে লাগলো। তারপর দেখা গেলো গ্রেস-কে। ধীরে-ধীরে হামাগুড়ি দিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে কাছের একটা গর্তের মধ্যে সে লুকোলো। গর্তে লুকোনোটা অভিনয়ের একটি অংশ। পরে প্লেনটিকে পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছিলো গ্রেস যেখানে বসেছিলো তার মাথার কাছ ঘেঁসে একটা কাঠের রড চলে গেছে। মাত্র কয়েক ইঞ্চির জন্যে বেঁচে গেছে তার মাথা!

আর একবার একটি প্লেন মাটিতে ধাক্কা লাগিয়ে গ্রেস মারাত্মক জখম হয়। সবাই তাকে হাসপাতালে যেতে বললো। কিন্তু হাসপাতালে তো সে গেলোই না এমন কি ডাক্তার পর্যন্ত ডাকলো না। কিন্তু দুদিন পরে তার মাথার যন্ত্রণা অসহ্য বোধ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ডাক্তার তাকে ডাকতে হোলো। পরীক্ষা করে ডাক্তারের চক্ষু তো চড়ক-গাছে! ডাক্তার বললো গ্রেস-এর ঘাড় মটকেছে, এমন কতকগুলি হাড় চুরমার হয়েছে যা জখম হলে কোনো মানুষ বাঁচতে পারে না।

আগুনেও গ্রেস-এর দারুণ ফাঁড়া কেটেছে। একটি কৃত্রিম পাঁচতলা জলন্ত বাড়ির ছাত থেকে গ্রেস-এর লাফ দেবার কথা। নীচে থাকবে দমকলের লোকেরা একটি জাল বিছিয়ে। সেই কৃত্রিম বাড়ির তলায় পুরোনো ফিল্ম, কাগজ ইত্যাদি জিনিস ঠাসা হোলো তারপর পেট্রোল ঢেলে হোলো আগুন জ্বালানো। পরিচালক ভেবেছিলো ধীরে-ধীরে বাড়িটায় আগুন ধরবে, কিন্তু সবাইকে চমকে দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে দপ করে সমস্ত বাড়িময় আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো। কাছে যায় কার সাধ্যি! উপরে শুধু গ্রেস-কে দেখা যায়। সর্বাঙ্গে তার আগুন লেগেছে। সে ছুটোছুটি করছে, অথচ লাফ দিতে পারছে না। কারণ যাদের জাল ধরার কথা তারা আগুনের আঁচে ঠিক জায়গাটিতে দাঁড়াতেই পারছে না। একটা দারুণ হুলুস্থুল কাণ্ড। শেষে বহু চেষ্টা করে নির্দিষ্ট জায়গার কিছু দূরে কোনোমতে লোকগুলো জাল নিয়ে দাঁড়ালো আর সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিলো গ্রেস তার জলন্ত দেহ নিয়ে। আর লাফ দেবার বয়েক মুহূর্তের মধ্যেই হুড়মুড় করে সমস্ত বাড়িটা ভেঙে পড়লো। সেবার খুব অল্পের জন্যে বেঁচে গিয়েছিলো গ্রেস।

এই ভাবে ক্রমাগত বিপদের মধ্যে পড়ে নিজের শরীরটা হাজারভাবে ভেঙেচুরে দুমড়ে-পুড়ে যাবার পর গ্রেস ঠিক করলো একটি শেষ স্টান্ট-এর কাজ করে সে অবসর নেবে। এই শেষ স্টান্টটি আর কিছুই নয়—সমুদ্রের উপর ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে একটি প্লেন নিয়ে আছাড় খাওয়া।

যেখানে ঐ ঘটন ঘটবার কথা তার কাছে একটি জাহাজ রইলো দাঁড়িয়ে, তাতে দুজন সার্জেন, অপারেশন করার একটি টেবিল এবং জলে-ডোবা লোককে তুলে আনার জন্য একটি বিচক্ষণ দল।

বেতারে গ্রেস খবর পেলো ক্যামেরা নিয়ে সবাই প্রস্তুত। খবর শুনে নিতান্ত স্বাভাবিকভাবেই সে উড়োজাহাজে চাপলো তারপর চললো সমুদ্রের দিকে। কিছু পরে তার চোখে পড়লো সমুদ্রের উপরকার জাহাজটা। তারপর

শুরু হোলো ঘণ্টায় নব্বই মাইল বেগে উড়োজাহাজ নিয়ে তার পড়া। দর্শকদের মনে হোলো এ-যাত্রায় তার বাঁচা অসম্ভব।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চারদিকে সমুদ্রের নোনা জল ছিটিয়ে প্লেনটা সমুদ্রের ভিতর ডুবলো। সঙ্গে-সঙ্গে এক দল লোক ছোটো একটি জাহাজ করে ছুটলো সেখানে। দেখতে-দেখতে উড়োজাহাজের নানা ভগ্নাংশ উপরে ভেসে উঠতে লাগলে, তারপর ভাসলো গ্রেস-এর সজ্ঞাহীন দেহ—না, সে মরেনি, শুধু অজ্ঞান হয়ে গেছে আর দেহের কয়েকটি জায়গা ছড়ে গিয়েছে মাত্র!

এর পর গ্রেস আর কখনো স্টান্টের কাজে নামেনি।

লড়াই সত্যিই থামল। কিন্তু এ খবর ত' তোমাদের কাছে একেবারে পুরোনো হয়ে গিয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে লড়াই থামার ফলে হল কি? লড়াইএর সময় কী যে হচ্ছিল তা ত আমরা জানি—দুনিয়াময় শুধু ধ্বংশ করবার ফন্দি চলেছিলো। সকলেই ভাবছিলো কী করে মানুষ যায় মারা, বাড়ী যায় ভাঙ্গা, সমস্ত সহরকে সহর যায় গুঁড়ো করে দেওয়া। সমস্যাটা কিন্তু এখন একেবারে বদলে গিয়েছে। এখন হল গড়বার সমস্যা: কী করে ভাঙ্গা বাড়ী আবার গড়ে তোলা যায়, আহতকে কেমন করে করা যায় আরোগ্য, যে সহর তছনছ হয়ে গিয়েছে সে সহরে কেমন করে আবার সহজ শান্ত জীবন ফিরিয়ে আনা যায়। এই হল যুদ্ধ আর শান্তির তফাৎ! যুদ্ধের সময় চকোলেটের ফ্যাক্টরীকে বদল করে হয়ত কামানের গোলা তৈরি করা হচ্ছিল, আজ সেই ফ্যাক্টরী আবার বদল করে দেশের ছেলেমেয়েদের জন্যে মিষ্টি চকোলেট বানাতে হবে। এই রকম নানান ব্যাপার। কিন্তু যুদ্ধ হল এমন এক দানব যে মরে গিয়েও হাত-পা ছোঁড়ে। তার বিপদও কম নয়। যেমন, একটা কথা মনে করে রেখো: যুদ্ধের সময় মানুষ মরীয়ার মতো মারাত্মক বহু অস্ত্র তৈরি করে গেছে। সমস্ত পৃথিবী প্রায় বোঝাই হয়ে গিয়েছিলো এই সব সাংঘাতিক জিনিষে, কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছিলো এই সব জিনিষের জন্যে। কিন্তু শান্তির চুক্তি সই হবার সঙ্গে সঙ্গে এই সব মারাত্মক গোলাগুলির ডাঁইগুলো একেবারে ধূলোর মতো মূল্যহীন হয়ে পড়ল। কী হবে এত গোলায়, এত বারুদে, এত বোমায়? এগুলো যে শুধু ধূলোর মতো মূল্যহীন হয়ে গিয়েছে তাই নয়, এখন এগুলোর হাত থেকে যে কেমন করে উদ্ধার পাওয়া যায় তাই নিয়ে মানুষের মাথা ব্যথার শেষ নেই। না যায় গেলা না যায় ফেলা। জমিয়ে রেখে লাভ নেই—আবার কবে যুদ্ধ হবে এবং যুদ্ধ একান্তই হবে কি না তার ঠিক নেই। যদিই বা হয় তা হলে এ সব গোলাগুলি কোনো কাজে নাও লাগতে পারে। তাছাড়া, দেশের মধ্যে এগুলো জমিয়ে রাখাও ত' ভয়ানক বিপদের কথা। যদি পান থেকে চূণ খসে তাহলেই যে সর্ব্বনাশ। তাই, একমাত্র উপায় হচ্ছে এগুলোকে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেওয়া। সেদিন কগেজে দেখলুম শুধু ভারতবর্ষেই লক্ষ লক্ষ টন বোমা-টোমা ডাঁই করা রয়েছে এবং এগুলোর হাত থেকে রেহাই পেয়ে নিশ্চিন্ত হতে বেশ বছর কতক যাবে।

তারপর, আর একটা কথাও ভাবো। যুদ্ধের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নানান রকম চাকরী দেওয়া হয়েছিলো গত কয়েক বছর ধরে। শুধু আমাদের দেশে নয়, সব দেশেই: যুদ্ধ শেষ হওয়া মানেই তাদের কাজ যাওয়া; হয়ত আজই নয় তবু কিছুদিনের মধ্যে ত' নিশ্চয়ই। কথা হল কাজ গেলে এরা করবে কি? পৃথিবীময় কি তা হলে সাংঘাতিক বেকার সমস্যা দেখা দেবে? সমস্ত দেশেরই ত' সেই ভয় আর সেই ভয়েই যত সব মাতব্বরদের আজ ঘুম নেই। এই সব লক্ষ লক্ষ লোকের জন্যে কেমন করে নতুন

নতুন কাজ ঠিক করা যায় সে চিন্তা ভয়ানক জটিল চিন্তা। আশা করা যায় সমস্ত দেশের মাতব্বররা এর একটা কিনারা করতে পারবেন।

অবশ্য যুদ্ধ শেষ হওয়া মানেই শুধু যে এই সব দুর্ভাবনা তা মোটেই নয়। আসলে আনন্দের দিকই প্রচুর। আকাশে চাঁদ উঠলে বোমারুর ভয়ে মানুষের বুক আর দুরদুর করবে না, পথ চলতে গেলে পলটনী লরীর ভয়ে আর পা কাঁপবে না, বাজারে পাওয়া যাবে জিনিষপত্তর, প্রেসের গণ্ডগোল কমবে, রংমশালের পাতা বাড়বে,—এই সব ভাবতেই আনন্দ হয়। যেটা সবচেয়ে বড় কথা সেটা হল বিজ্ঞানকে কিভাবে ধ্বংশের কাজ থেকে সরিয়ে গড়নের কাজে লাগানো যায় বৈজ্ঞানিকরা এবার সেই কথা ভাববেন।

মার্কিনদের মধ্যে ত' ইতিমধ্যেই খুব হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে লোক বলছে নতুন নতুন জিনিষ আবিষ্কার করেছি, পাছে আমার আবিষ্কার আর কেউ চুরি করে তাই চটপট পেটেণ্ট করে দিন। ইতিমধ্যেই দরখাস্ত পড়েছে ২৫০০০০০ জিনিষ পেটেণ্ট করে দেবার। তবে মার্কিনদের ত' কাণ্ড! নানান রকম আজগুবি জিনিষও তাদের মাথায় ঘোরে কয়েকটা নমুনা দিচ্ছি।

একজন বলছেন চেয়ারে বসে বসে বায়েস্কোপ দেখতে বড় কষ্ট। তাই এমন এক আবিষ্কার করেছি যাতে দিব্বি আরামে সিনেমা দেখা যাবে। সিনেমা ঘরের ছাদে থাকবে পর্দ্দাটাঙ্গানো, সামনের দেওয়ালে নয়। চেয়ারগুলো হবে চুলকাটার দোকানের চেয়ারের মতন, ইচ্ছে করলে একেবারে প্রায় খাটের মতন পেড়ে ফেলা যায়। মানুষ সেই চেয়ারে দিব্বি শুয়ে শুয়ে ছবি দেখবে—ঘরের মেঝেয় ফুটো করে তার তলা থেকে ছবি ফেলা হবে পর্দ্দায়। কিন্তু অত আরামে চোখ বুঁজে আসবে না?

আর একজন বলছেন রাতে ডাকাতের হাতে পড়া বড় ঝামেলা। তাই একরকম চ্যাপ্টা রিভলভার বের করেছি, সার্টের তলায় এঁটে দেবো। এমন বন্দবস্ত থাকবে যে হাঁটুতে হাঁটুতে ঠোকাঠুকি দিলেই ধড়াস করে গুলি বেরুবে, সামনের ডাকাতের হাতে বন্দুক থাকলেও সে চিৎপটাং হবে। মার্কিন ডাকাতরা নিশ্চয়ই এ খবর শুনে খুসি হয়নি।

এরোপ্লেনে এঞ্জিন বন্ধ হয়ে প্রায়ই বিপদ ঘটে। তাই একজন বলছেন ৪৪টা এঞ্জিনওয়ালা এক উড়োজাহাজ বের করেছি—একটার পর একটা এঞ্জিন খারাপ হলেও ৪৪টা ত' আর বিগড়োবে না। আর যদিই বা বিগড়োয় তা হলে বলব যাত্রীদের কপাল নেহাৎ খারাপ।

এই রকম সব কাণ্ডকারখানা। দেখা যাক, বাজারে কি কি আসে। কিন্তু এ সব বাদ দিলেও, এ্যাটমের শক্তি মানুষের উপকারে লাগাবার যে সব কথা বৈজ্ঞানিকেরা ভাবছেন তা যদি সফল করতে পারেন—সফল করবার আশাই খুব বেশী—তাহলে দুনিয়াময় সাংঘাতিক পরিবর্ত্তন দেখা দেবে। কিন্তু পরিবর্ত্তন যে ঠিক কিরকম হবে তা নিয়ে মাত্র কল্পনা করা যায়, নিখুঁত কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে এ কথা ঠিক যে আনবিক শক্তি মানুষের কল্যানে যখন কাজে লাগানো যাবে তখন এ্যাটম বোমায় যে নরহত্যা হয়েছে তার কলঙ্ক মানুষ ভুলতে পারবে। তবে যদি আবার যুদ্ধ সুরু হয়, আবার যদি এ্যাটম বোমা দিয়ে ধ্বংশের কাজ চালানো হয় তাহলে সভ্যতা কি করে টেঁকবে বলা কঠিন।

যুদ্ধই হোক আর শান্তিই হোক, এক একজন আছেন যাঁরা একেবারে আত্মভোলা লোক। সে রকম একজনের খবর সেদিন খবরের কাগজে পাওয়া গেল। একজন ইংরেজ, নাম পারসি উইল্‌কিন্‌স্ তিনি গত ১৩ বছর ধরে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠ ভাবে চাঁদের একটা মানচিত্র তৈরি করছিলেন। প্রত্যেক সপ্তাহে ঠিক ছদিন করে তিনি এই ম্যাপ আঁকার কাজ করে চলেছেন এবং এখন বলছেন কাজ শেষ হয়েছে। চাঁদের যে ম্যাপ তিনি এঁকেছেন সেটা ২৫ ফুট হয়েছে। বলছেন এই ১৩ বছর ধরে চাঁদকে দেখে দেখে মনে হচ্ছে সেখানে প্রাণী আছে তবে সে প্রাণী মানুষের মতো নয়।

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমরা শুনে নিশ্চয়ই খুসি হবে যে আগামী সংখ্যা থেকে রংমশালে আবার "চিঠির বাক্স" এই বিভাগটি খোলার ব্যবস্থা হয়েছে। চিঠি লেখা জিনিসটা নেহাৎ সোজা নয়। কাগজ পেন্সিল নিয়ে বসলেই চিঠি লেখা যায় না। চিঠি লিখতে শিখতে হয়। এই বিভাগের মধ্যে দিয়ে আশাকরি তোমরা ভালো চিঠি লিখতে শিখবে।

তোমাদের যে চিঠিপত্র আমরা পাবো তার মধ্যে ভালো ও বাছাই-করা চিঠির উত্তরই এই বিভাগে পাবে। চিঠি যদি সত্যিই খুব সুন্দর হয় তা হলে এই বিভাগে সেটি ছাপাও হবে। "আমি ভারি রাগ করেছি। আপনি কেমন আছেন? আপনি রাগ করেননি তো?" এই ধরণের চিঠি পেতে আমরা চাই না। চিঠির মধ্যে দিয়ে তোমাদের তরুণ জিজ্ঞাসু মনের পরিচয় পেতে চাই—যার মধ্যে কোনো রকম ন্যাকামি নেই, যার মধ্যে নেই শুধু ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখবার উদ্দেশ্য।

প্রতিদিন কত টুকরো-টুকরো ঘটনা আমাদের চারপাশে ঘটছে। সেগুলো গল্প নয়, কবিতাও নয়। অল্প সময়ের জন্যে আমাদের আনন্দ দিয়ে রঙীন বুদ্বুদের মতো সেগুলো মিলিয়ে যায়। একমাত্র চিঠির ভিতর দিয়েই সেগুলো টুকে রাখা সম্ভব। সে-ধরণের বিষয়গুলি তোমরা খুঁজে বার করতে চেষ্টা কোরো। নিশ্চয়ই খুঁজে পাবে।

আর একটি কথা: যথা সম্ভব ছোটো করে চিঠি লেখার অভ্যেস কোরো। অল্প কথা লিখে বেশি কথা বলতে পারাটাই আসল ক্ষমতার পরিচয়। ছোটো চিঠির কথা বলতে মনে পড়লো। ভিক্টোর হুগোর নাম আশাকরি অনেকেই তোমরা শুনেছো। একবার তাঁর একটি বই প্রকাশিত হবার পর তিনি জানতে বিশেষ উৎসুক হয়ে পড়েছিলেন কী রকম বিক্রি হচ্ছে সে বইটা। সমস্ত খবর জানবার জন্যে প্রকাশকের কাছে তিনি একটি চিঠি পাঠান। চিঠিতে কোনো কথা ছিলো না, শুধু লেখা ছিলো, "?"। প্রকাশক তার উত্তরে জানান, "!"—অর্থাৎ দারুণ বিক্রি হচ্ছে! পৃথিবীতে ঐটাই বোধ হয় সবচেয়ে ছোটো চিঠি।

ছোটো চিঠি বলতে মনে পড়লো আমার জানা সবচেয়ে ছোটো একটি গল্প। গল্পটি এই: ট্রেনের কামরায় দুজন ভদ্রলোক। একজন বললেন, "আমি ভূতে বিশ্বাস করি না।" অন্য জন উত্তরে বললেন, "তাই নাকি?" বলে বেমালুম তিনি বাতাসে মিলিয়ে গেলেন!

একটি বিলিতি পত্রিকায় দেখছিলুম পৃথিবীর সবচেয়ে ছোটো বই এয় কথা। লেখক যুগোশ্লাভাকিয়ার Radivoje Momirske নামে একজন সাংবাদিক। তাঁর বইটির নাম, "পৃথিবীকে শাসন করে কে?" এই বইটির চারটি সংস্করণ শেষ হয়ে গেছে। বইটির মলাট ছাড়া ভিতরে মাত্র চারটি পাতা এবং সেই পাতাগুলোর একটিতে মাত্র একটি কথা লেখা: "টাকা"। লেখক তাঁর এই ছোট্ট বইটির জন্যে দশ হাজার ফ্রাঁ (প্রায় ৭৫০ টাকা) পুরস্কার পেয়েছিলেন।

তোমাদের কাছ থেকে খুব ছোট্ট আর খুব সুন্দর চিঠি পাবার আশায় রইলুম।

তোমাদের
সম্পাদকমশাই

ছ'টি ছবি

দিলীপ দে চৌধুরী

(১)

সবুজ মাঠে একটি ঘাসের ফুল
হাওয়ায় জাগে বুকেতে তার ঢেউ !
ভাবছি ব'সে ক'রলে কে এই ভুল
হয় তো ওকে মাড়িয়ে যাবে কেউ।

(২)

ঝড় উঠেছে আকাশে আর ঝড় উঠেছে বনে,
দৈত্য মেঘের মাতামাতি ঈশান গগন কোণে ;
তার মাঝে এক সংগী ছাড়া চিল চলেছে উড়ে
ঝড়ের বেগে অবশ দেহে প'ড়ছে ঘুরে ঘুরে।

(৩)

অনেক দূরে অন্ধকারে
জ্বলছে আলো ওই ওপারে
দেখছে চেয়ে পলক হারা
ওই যেন এক সন্ধ্যাতারা।

(৪)

দীঘির জলে কাঁপছে পারের খেজুর গাছের ছায়া
এঁকে বেঁকে চ'লছে যেন সাপের চিকণ কায়া,
পাতালপুরীর পথ যেন ঠিক ওই যেন তার দ্বার
দীঘির জলে গাছের ছায়া সত্যি চমৎকার।

(৫)

সাদা মেঘ উড়ে উড়ে ঘুরে চলে কেন ?
ছোট খোকা দাগ কাটে শ্লেটে ব'সে যেন !
দরকারী কথা কিছু রাখে নাকি টুকে,
আকাশের মতো এই ছোট নোটবুকে !

(৬)

পথের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তরু
ফিরেও তাকে দেখেনা কেউ কভু
নিঃস্ব তরুর নেইকো মোটে পাতা
ও যেন ঠিক আমারি দেশমাতা।

ছোটদের সোভিএট : দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। ইণ্টারন্যাশনাল পাব্‌লিশিং হাউস। দাম ৩৷৷০

চমৎকার বই এই "ছোটদের সোভিএট"। যেমনি সুন্দর বাইরেটা দেখতে, তেমনি সুন্দর ভিতরের লেখাগুলো। সোভিএটের নানানদিক সম্বন্ধে বাংলাদেশের বিশেষজ্ঞরা প্রবন্ধ লিখেছেন এবং দু'একটি প্রবন্ধ ছোটদের পক্ষে একটু কঠিন হলেও মোটের উপর জোর করে বলা যায় এ বই পড়ে বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা সোভিএট সম্বন্ধে যেমন সর্বাঙ্গীন ধারণা পাবে তেমন আর কোনো বাংলা বইয়ের মারফৎ পাওয়া সম্ভবই নয়। বাংলাদেশের প্রায় প্রত্যেক নামকরা শিশুসাহিত্যিক সোভিএট সম্বন্ধে তাঁর মতামত জানিয়ে এ বইকে আরও মূল্যবান করে তুলেছেন।

আমাদের ছোট্ট, বন্ধুরা,

রংমশাল বেরুতে প্রতি মাসেই দেরি হয় আর আমার টেবিলে জমে ওঠে তোমাদের নানান রকম চিঠি : কেউ বা চিন্তিত, কেউ বা দুঃখিত, কারুর বা স্পষ্টই রাগ হয়েছে। এদিকে আমাদের অবস্থাটাও বেশ কাহিল ; ছাপাখানার যে রকম দুর্য্যোগ আজকাল চলেছে তাতে সময় মতো কাগজ বের করা যে কত কঠিন তাই বা তোমাদের বারবার বোঝাই কেমন করে ? ছাপাখানা নিয়ে যখন এতই হাঙ্গামা তখন ভাবছি ছাপাখানার কথা তোমাদের খুলেই বলি। তবে তার আগে একটা ভালো খবর দিয়ে রাখতে পারি ; অনেক কষ্টে এমন একটা বন্দোবস্ত করা গিয়েছে যে আশা করছি এর পর থেকে প্রতি মাসের প্রথম দিকেই রংমশাল তোমাদের হাতে পৌছবে। অবশ্য, শুধু লম্বা লম্বা আশ্বাস দিয়ে লাভ নেই। সবই ফলেন পরিচীয়তে। নিয়ম মতো কাগজ বের করে তোমাদের অবাক করে দেওয়াই অনেক ভালো।

আপাতত, ছাপার কথা বলি। পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম ছাপাখানা কোথায় হয়েছিলো জানো ? শুনে তোমরা নিশ্চয়ই খুশী হবে যে ছাপাখানার আবিষ্কার হয় ভারতবর্ষের পাশের বাড়ীতে চীনদেশে। কথাটা অবশ্য সেদিন পর্য্যন্ত বিশেষ কারুর জানা ছিলো না ; মাত্র বছর ৪৫ আগে চীন-এ কান্‌সু প্রদেশে একটা খুব পুরোনো পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পৃথিবীর পণ্ডিতমহল ঠিক করেছেন এটাই দুনিয়ার মধ্যে প্রাচীনতম ছাপা বই। সে বইতে লেখা আছে ১১ই মে ৮৬৮ সালে ওয়াং চীয়ে কর্ত্তৃক মুদ্রিত। কিন্তু হালে যে ভাবে আলাদা আলাদা সিসে'র অক্ষর পাশাপাশি সাজিয়ে বই ছাপানো হয় শ্রীযুক্ত ওয়াং চীয়ে-র বই সে ভাবে মোটেই ছাপানো নয়। আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে ছাপাবার আগে পৃথিবীতে যে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল তাকে বলা যায় ব্লক ছাপানো। তখন লোকে করত কি বইএর পাতার মতো বড় কাঠের একটা টুকরোয় সমস্ত লেখাটা কুঁদে নিত আর তারপর তার উপর কালি মাখিয়ে কাগজের উপর চাপ দিত। এভাবে ছাপা বইকে অনেক সময় বলা হয় ব্লক বই। অবশ্য আলাদা আলাদা অক্ষর সাজিয়ে ছাপার পদ্ধতিও প্রথম চীন দেশেই আবিষ্কৃত হয় এবং যিনি আবিষ্কার করেন তাঁর নাম শ্রীযুক্ত পী সেং। সে হল ১০৪১-১০৪৯ সালের কথা।

তারপর ইয়োরোপের কথা ধরা যায়। কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে পণ্ডিতেরা অনেক হিসেবপত্তর করেও আজ পর্য্যন্ত ঠিক করতে পারলেন না ঠিক কোন বছর ইয়োরোপে প্রথম বই ছাপা হয়েছে। তবে এটুকু বোঝা গিয়েছে যে ব্যাপারটা খুব সম্ভব ১৪৪০এর কাছাকাছিই হবে। ইয়োরোপের ব্যাপারে আর একটা মজাও আছে : টাইপ সাজিয়ে ছাপা এবং ব্লক-ছাপা দুইই অনেকদিন পর্য্যন্ত চলেছিলো পাশাপাশি। আরও একটা মুস্কিলের কথা আছে : ইয়োরোপ ত' আর এতটুকু জায়গা নয়, তার মধ্যে ঠিক কোথায় প্রথম ছাপার কাজ সুরু হয় ? এ বিষয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে নানান মতভেদ। কেউ বলেন জার্মানি, কেউ বলেন হল্যাণ্ড, কারুর মতে ফ্রান্স, কারুর মতে ইটালী। এ তর্কের সঠিক মীমাংসা না হলেও একটা কথা

নিশ্চয়ই জোর করে বলা যায়, ইয়োরোপে ছাপাখানা প্রচলন করার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অবদান যে ভদ্রলোকের তাঁর নাম জোহান্ গুটেন্‌স্‌বার্গ, এবং তিনি একজন জার্মান ভদ্রলোক। ১৪৫৬ সালে তিনি বাইবেলের একটা সংস্করণ ছেপেছিলেন এবং সেটাই বোধ হয় ইয়োরোপে প্রথম ছাপা বই। তারপর জার্মানি থেকেই সমস্ত ইয়োরোপে ছাপার পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়ে, ক্রমশ ব্লক প্রিন্টিংএর বদল অক্ষর সাজিয়ে ছাপার পদ্ধতি পাকা হয়ে যায়।

অক্ষর সাজিয়ে ছাপার পদ্ধতি যদিই বা এলো তবুও বহুদিন ধরে ঠিক ছাপাখানা বলে জিনিষ পৃথিবীতে ছিলো না। কেননা ছাপাখানা বলতে আমরা আজকাল লোহার যন্ত্রে ছাপার কথা বুঝি; অথচ ছাপার ব্যাপার আবিষ্কার হবার পরও বহুদিন পর্য্যন্ত হাতে চালানো কাঠের যন্ত্রই প্রচলিত ছিল। এ যন্ত্রটা নেহাতই সাদামাটা ব্যাপার: একটা কাঠের উপর কাগজ রেখে তার উপর বালিমাখানো অক্ষরগুলো উবুড় করে রেখে দু'পাশ থেকে খুব চাপ দেওয়া। এইভাবে প্রত্যেকটি পাতা ছাপতে হলে কী ভীষণ সময় যায় ভেবে দেখ! আসল ছাপার যন্ত্র পৃথিবীতে বেরোয় অনেকদিন পরে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় শেষাশেষি। আগাগোড়া লোহার তৈরি ছাপাখানা প্রথম বেরোয় ১৮০০ সালে। কিন্তু তখন আর ইলেক্‌ট্রিক দিয়ে চালানো হত না; লোহার প্রেস তৈরি হলেও তাকে চালাতে হত হাত দিয়েই।

তারপর আজ প্রায় দেড়শ বছর কেটে গেছে এবং এই দেড়শ বছরে বিজ্ঞানের বহুমুখী উন্নতি পৃথিবীর প্রায় পুরো চেহারাটাই একেবারে বদলে দিয়েছে। এখন আর হাত দিয়ে প্রেস চালাতে হয়না, এখন আর প্রত্যেকটি অক্ষর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেছে সাজাবার দরকারও নেই। নানানরকম ছাপার যন্ত্র বেরিয়েছে, বেরিয়েছে নানানরকম টাইপ সাজাবার নাননধরণের পদ্ধতি। ঘণ্টায় হাজার হাজার কপি ছাপা হচ্ছে, যন্ত্রগুলো দেখলে মাথার মধ্যেটা যেন ঝিমঝিম করে।

সেরকম একটা ছাপাখানা যদি আমাদের হাতে থাকত তাহলে অনায়াসে একদিনে রংমশালের এক বছরের সমস্ত সংখ্যাগুলো ছাপিয়ে ফেলে গ্যাঁট হয়ে বসতুম; ডাক বাক্স্ খুলে পেতুম তোমাদের চিঠি—শুধু খুসীতে ভরা।

মেশের এক-কামরায় থাকে যদু, মধু, সদু, আর হীরু। সেদিন্ বেলা ১০॥ টার সময় মেশের চাকর কামরায় ঢুকে দেখে, যদু খুন-হয়ে পড়ে আছে। মধু, সদু আর হীরু তখন মেশে ছিল না। পুলিশ এলো, ডাক্তার এলো। ডাক্তার লাশ দেখে বললেন, দু'ঘণ্টা আগে যদু খুন হয়েছে। পুলিশ সন্দেহ-বশে মধু, সদু হীরু তিনজনকেই করলো গ্রেফ্‌তার। মধু কিন্তু প্রমাণ দিলো, সে রেলে চাকরি করে—বেলা ৮-৫ মিনিটে যে ট্রেন ছেড়ে গেছে, সে-ট্রেনে সে গেছে গার্ড হয়ে; সদু বললো বেলা পৌণে আটটায় সে মেশ থেকে বেরিয়ে ট্রামে উঠেছে—স'আটটায় তার ডিউটি ছিল অফিসে—অফিসের খাতায় তার হাজরে পাওয়া গেল—বেলা আটটায় এবং অফিসে সে যে ছিল বেলা ৪টা অবধি বড় সাহেবও সাক্ষী দিয়ে প্রমাণ করলেন। তার উপর সে যখন মেশ থেকে বেরোয়, তখন মেশের ম্যানেজারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছিল—তার ঘড়ি দেখে ম্যানেজার অফিস কামরার ঘড়ি মিলিয়ে ঠিক করে' দিয়েছিল। মানেজারও এ কথা স্বীকার করলো। আর হীরু প্রমাণ দিলো সে খিদিরপুরের ডকে কাজ করে। সেখানে সে ডিউটি করেছে বেলা ছ'টা থেকে বেলা বারোটা পর্য্যন্ত! যে-কজনের নাম করা হলো, এদের মধ্য থেকেই একজনের বিরুদ্ধে খুনের প্রমাণ

পাওয়া গেল এবং বিচারে খুনীর হলো ফাঁশি।···বলো তো, কোন্ লোকটি খুনী?

এই ধাঁধাটি শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তোমাদের জন্যে পাঠিয়েছেন।

ধাঁধার উত্তর

তিনটে বই পাশাপাশি সোজা করে দাঁড় করাও, দেখবে প্রথম বইএর প্রথম পাতার পরই সে বইটার উপরের মলাট তারপর দ্বিতীয় বইটার পাতাগুলো তারপর দ্বিতীয় বইটার প্রথম মলাট তারপর তৃতীয় বইটার শেষ মলাট তারপর তৃতীয় বইটার শেষ পাতা। পোকা যদি প্রথম বইএর প্রথম পাতা থেকে তৃতীয় এইএর শেষ পাতা পর্য্যন্ত শুড়ঙ্গ করে তাহলে মোট চারটে মলাট আর একটা বইএর পুরো পাতা তাকে কাটতে হবে, অর্থাৎ মোট দু ইঞ্চি।

উত্তরদাতাদের নাম

শ্রাবণ মাসের উত্তর যারা দেরি করে পাঠিয়েছিলে:

প্রদ্যুম্নশেখর ভট্টাচার্য্য (১৮৪২), সৈয়দা হোসনে আরা, দোলন, ইভা (১৯৪৩), কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য্য (২৩০১), প্রতীপেন্দ্রনাথ ভোস্ (২৫৩৩), সহবতপুর মণিমেলা (২৪৯৭), "সিটি ক্লাব সভ্যবৃন্দ" দিল্লী (২০৫০), হিমু, শিশির, ঘন, ভক্তি (২৫২১), অবিনাশচন্দ্র সরকার (?), বাণী, বুবু ও মনু (১৫৭৪), রঞ্জিৎকুমার বিশ্বাস ও ভোলানাথ ভট্টাচার্য্য (২৪৯৯), নিবেদিতা দেবী (২৪৬৬), সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার (২২২১), পবিত্রময় ও জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার (১৯৪১)।

ভাদ্র মাসের উত্তরদাতাদের নাম:

জানকীকান্ত পাল (২৪৫৩), জয়ন্তলাল নিয়োগী (২০৮১)।

কাড়াকাড়ি ক'রো না যেন

ত্রিভংগ রায়ের "রূপকথা" দাম—২॥০

সব চেয়ে ভালো এ বইটা—কি মিষ্টি গল্প, কি সুন্দর সুন্দর ছবি! পূজোয় এটা তোমার চাইই।

—*—

অরূপের "জ্যান্ত ভূতের দল" দাম—১॥০

জ্যান্তে মরা মানুষের চেয়ে জ্যান্ত ভূত কতো ভাল দেখো পড়ে—তুমিও ঐ রকম হবে নাকি?

বিমান বাহিনী ও আকাশযুদ্ধ

আধুনিক যুদ্ধে আত্মরক্ষার ও আক্রমণে বিমানবলের কার্য্যকারিতা কতখানি—বিমান বাহিণীর বিভিন্ন ব্যবহার—বৃটেনের যুদ্ধ, ক্রীটের যুদ্ধ, জার্ম্মাণীর যুদ্ধ—রাশিয়ার প্যারাসুট বাহিণী—উড়ন্ত বোমা ও রকেট বোমা—আণবিক বোমার বিস্তৃত বিবরণ—বোমারু ও জঙ্গী সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় এতে আছে। পাতায় পাতায় ছবি—বালক বৃদ্ধ সকলেরই উপভোগ্য—বর্ত্তমান যুগে ছেলেমেয়েদের হাতে তুলিয়া দিবার উপযুক্ত বই।

মূল্য আড়াই টাকা মাত্র।

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং কোং লিঃ

৮সি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

ভিটামিন 'বি' সংগ্রহ করার সহজে উপায়

নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌ মিল্ক শুধু যে উপকারী পানীয় তাই নয় নিখুঁত টনিকের কাজও করে। তার প্রধান কারন ভিটামিন "বি"। এই প্রয়োজনীয় ভিটামিন শরীরে বেশিদিন জমা থাকে না। সে-কারণে প্রত্যহ এমন খাদ্যের প্রয়োজন যার ভিতর প্রচুর পরিমাণে এই ভিটামিন বর্তমান। নেস্‌ল্‌-এর মলটেড্‌ মিল্ক-এ অন্যান্য ভিটামিনের সঙ্গে প্রচুর ভিটামিন 'বি' আছে। ফলে এই পানীয় আপনার শরীর ও স্নায়ু সবল করে এবং জীবনীশক্তি বাড়ায়।

ছেলেমেয়েদের বাড়ের মুখে কিংবা পরিশ্রমী স্ত্রীপুরুষের জন্যে ভিটামিন 'বি'র অত্যন্ত প্রয়োজন। এর জন্যে নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌-মিল্ক ব্যবহার করার মতো সহজ উপায় আর নেই। চমৎকার এর গন্ধ আর অত্যন্ত সহজে হজম হয় বলে রোগী কিংবা শিশুদের জন্যে বিশেষভাবে উপযোগী।

ভিটামিন "বি" যুক্ত নেস্‌ল্‌-এর মল্‌টেড্‌ মিল্ক পান করুন

বঙ্গশ্রী

[দশম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা : কার্তিক, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

জল পড়ে পাতা নড়ে

প্রেমেন্দ্র মিত্র

জল পড়ে পাতা নড়ে
এই নিয়ে পদ্য,
লিখে ফেলে ভাবলাম
হ'ল অনবদ্য।

ছাত ছিল ফুটো যে
পারিনি তা জানতে।
বিছানাটা ভেসে গেছে
বসে আছি প্রান্তে।

চোখে আর ঘুম নেই,
শুধু শুনি ভন্‌ ভন্‌
মশা ওড়ে আর চলে
চিন্তার পল্টন্‌।

গাছে গাছে পাতা নড়ে
চালে তবু পাতা নেই।
কাঁকর মেশান চাল
মেলে শুধু রেশনেই।

ডিম্‌ ডিম্‌ ঢেঁড়া শুনি
আসে দুর্ভিক্ষ
এসে তবে বাকি কটা
করে দূর দিক গো।

জল পড়ে দুনিয়ার
জালা-করা চক্ষে।
পাতা নড়ে প্রলয়ের
ঝড়ে কি অলক্ষ্যে!

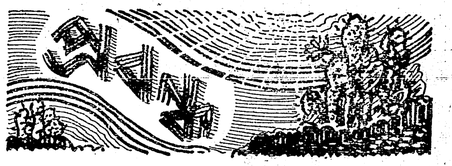

বড়দের ছোটোবেলা

আমার কান্না

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়

[দেশের জ্ঞানী এবং গুণীদের ছোটোবেলার কথা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে। এই বিভাগে মাঝে মাঝে আমরা সে ধরণের লেখা ছাপবার ব্যবস্থা করেছি।—রং সং]

বয়স তখন চার কিংবা পাঁচ চলেছে। ছোট ভাইটির বয়স আড়াই কি তিন। ডুমকায় থাকি। বাবা তখন সেখানে চাকরী করতেন। আমার জন্মও ডুমকাতেই।

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু অতি মাত্রায় দুরন্ত। হাঁটতে শিখেই প্রথমে মাছ কাটা মস্ত বঁটিতে নিজের পেটটা দু' ফাঁক করি—আজও সেলায়ের চিহ্ন আছে। এমনি আরও অনেক দুরন্তপনার চিহ্নই সর্ব্বাঙ্গে চিরস্থায়ী হয়ে আছে। শোনা যায়, আমার নাকি একটা উদ্ভট স্বভাব ছিল, দারুণ ব্যথা পেলেও কিছুতে কাঁদতাম না। সুর করে (কালোয়াতি নয়!) গান (আবোল তাবোল) ধরতাম, ব্যথা বাড়লে সুর চড়ত আর দু'চোখ দিয়ে জল পড়ত ধারা স্রোতে। মারে বাপরে বলে, হাউমাউ করে, শুধু চেঁচিয়ে, ভ্যাঁ করে প্রভৃতি যে নানা পদ্ধতি আছে-সাধারণ কান্নার তার একটাও নাকি আমি শিখিনি। এদিকে আবার যখন তখন আপন মনে নিজের খাপছাড়া সুরে যে কোন কথা বা শব্দ নিয়ে গানও আমি গাইতাম—সব সময় তাই বোঝা কঠিন ছিল আমি কাঁদছি না গাইছি!

একদিন দুপুরে মা ও বড়দি বারান্দায় খেতে বসে শুনছেন রান্না ঘরে আমি গান ধরেছি। খানিক পরে সুরটা কেমন কেমন ঠেকায় আর পোড়া মাংসের গন্ধ পাওয়ায় তাঁরা উঠে এসে ছাখেন উনানের সামনে বসে গান করছি মুখখানা বিকৃত করে, চোখের জলে মুখ বুক ভেসে যাচ্ছে। কি হয়েছে বুঝতে তাঁদের মিনিট খানেক সময় লেগেছিল। তারপর চোখ পড়ল, আমার বাঁ পায়ের গোড়ালির খানিক ওপরে মস্ত একখণ্ড জ্বলন্ত কয়লা পুড়ছে, বেশ খানিকটা গর্ত্ত হয়েছে! কাঠের উনান, চিমটে দিয়ে গনগনে কয়লা-গুলি নিয়ে খেলতে গিয়ে এই বিপদ!

'কি বোকা ছেলে তুই! ফেলে দিতে পারলি না আগুনটা?'

'ডাকতে পারলি না, হাবা কোথাকার?'

'কাঁদতে পারলি না গাধা ছেলে?'

প্রায় এক ইঞ্চি পোড়া দাগ এখনো আছে। পরে অনেকবার ভেবেছি, সত্যি, এমন বোকা কি করে হলাম সেদিন? বয়স বাড়লে বুঝেছি, ওরকম তীব্র যন্ত্রণা হতে থাকলে সব ছোট ছেলেই বোকা হাবা গাধা হয়ে যায়—সাময়িক ভাবে।

আরেকদিন মা রসগোল্লার কড়াই নামিয়ে অন্য কাজে মন দিয়েছেন, আমি সুযোগের প্রতীক্ষা করছি। আমার ভাগ্য ভাল যে রান্নাঘরেই অন্য কাজে মার বেশ খানিকটা সময় লেগেছিল, নয় তো রসগোল্লার কড়াই নামিয়েই কোন কাজে মা বাইরে গেলে হয় তো সারা জীবন আমাকে হাত পোড়া আর মুখ পোড়া হয়ে থাকতে হত! সুযোগ যখন পেলাম কড়ায়ের রসটা তখন আর ফোস্কা পড়াবার অবস্থায় নেই তবে মজা টের পাইয়ে দেবার মত গরম আছে। খাবলা দিয়ে কতকগুলি রসগোল্লা তুলেই মুখে পুরে দিয়ে সেটা টের পেলাম।

সেই মুহূর্ত্তে মা আর মেজদা ঘরে ঢুকলেন। মা উঠলেন চেঁচিয়ে, মেজদা তিনলাফে এগিয়ে এসে কড়ায়ে আঙ্গুল ডুবিয়ে দেখে নিলেন রসটা গরম কত।

তারপর বললেন, 'ঠিক সাজা হয়েছে রাক্ষসের। আর ...বি?'

...যন্ত্রণায় কান্না আসছিল। আমার কচি চামড়া, মেজদা ...ধ হয় সেটা হিসাব করেন নি যে তার গরম বোধের ...য়ে আমার গরম বোধটা কত বেশী, তা হলে হয় তো ...ন্না হত। হঠাৎ ওরা এসে হাজির না হলে মুখের ...গোল্লা ফেলে আমি নিশ্চয় একটু কাঁদতাম। কিন্তু ...র তো রসগোল্লা ফেলাও যায় না, কাঁদাও যায় না। ...তক্ষণে দিদিরাও এসে পড়েছে, মেজদার কথা শুনে ...দের মুখে কৌতুকের হাসি! চিবিয়ে চিবিয়ে রসগোল্লা ...লে ফেললাম।

'আর খাবি?'

সকলের মুখে ধীরে ধীরে চোখ বুলিয়ে নিলাম। কড়াই ...কে আরও কয়েকটা—আগের বারের চেয়ে সংখ্যায় কম ...খে পুরলাম। হাত মুখ আগেই জ্বলছিল, এবার যেন পুড়ে ...ল। কাঁদলাম না, রসগোল্লাও চিবোতে লাগলাম কিন্তু ...টা আটকে রইল আর চোখে জল এসে গেল। মা ...তক্ষণ কেমন এক দ্বিধাগ্রস্ত ভাব নিয়ে আমায় দেখছিলেন, ...বার এসে আমায় কোলে তুলে নিলেন। মেজদাকে ...ৎসনা করে বললেন, 'তুই কি রে সন্তোষ!'

মেজদাই আমার হাতে আর মুখে গাওয়া ঘি মাখিয়ে ...য়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এটা কোন দেশী ছেলে? আমি ...াবলাম, বেশী গরম লাগলে কাঁদবে, কাঁদছে না দেখে—'

বাড়ীর পিছনে বেশ বড় একটা বাগান ছিল, কপি, ...গুণ আর নানারকম তরকারীও হত বাগানে। জল ...বার জন্য বড় একটা কাঁচা কূয়ো ছিল বাগানে, পরিধি ...র বড় কিন্তু বেশী গভীর নয়। কূয়োর মুখটা বাঁধানো ...তো ছিলইনা, বাঁশ বা কাঠের কোন বেড়া পর্য্যন্ত ছিল না ...খের চারিপাশে। বর্ষাকালে বেশী বৃষ্টি হলে লাল ঘোলাটে ...লে কূয়ো ভরে উপচে পড়ত, শীতকালে সামান্য তলানি ...টুকু জল থাকত একবার বাগানে দিতেই তা ফুরিয়ে ...েত।

এই কূয়োটির একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল আমার কাছে। কূয়োর মধ্যে বড় বড় ব্যাঙ্ বাস করত অনেকগুলি। দুপুরবেলা সকলে বিশ্রাম নিয়ে ব্যস্ত থাকার সময় চুপি চুপি কোনদিন একা, কোনদিন ছোটভাইকে সঙ্গে নিয়ে কূয়োর ধারে গিয়ে উবু হয়ে ঝুঁকে ব্যাং দেখতাম ঢিল ছুঁড়ে চেষ্টা করতাম ব্যাং শিকারের। বাগান তখন একান্ত নির্জ্জন থাকত, ধারে কাছেও কেউ আসত না।

শরতকালে কূয়োটার জল তখন মাঝামাঝি নেমেছে। ভাইকে সঙ্গে করে একদিন ব্যাং দেখতে গিয়েছি। ভাইটি আমার বেশী ঝুঁকতে গিয়ে ঝুপ করে কূয়োর মধ্যে পড়ে গেল! আমি বাড়ীর দিকে ছুটলাম। ঘরের মধ্যে মেঝেতে পাটি বিছিয়ে বসে মা আর দিদিরা কথা বলছে পাড়ার একবাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে, পাশের ঘরে শুয়ে আছে বড় জামাইবাবু আর মেজদাদা। দরজার কাছে থমকে দাঁড়ালাম। কেমন একটা ভয় হল মনে। সবাই যদি ভাবে আমি ঠেলা দিয়ে ফেলে দিয়েছি ভাইকে কূয়োর মধ্যে, মেজদা যদি শাসন করে! বাড়ীর মধ্যে একমাত্র মেজদাকেই ভয় করতাম, তার শাসন ছিল বড় কড়া। এমন কি, আমাদের বেশী শাসন করার জন্য বাবা পর্য্যন্ত তাকে মাঝে মাঝে শাসন করে দিতেন।

ভয় হল কিন্তু ওদিকে ভাইটা কূয়োয় পড়ে গেছে। সবদিক বাঁচিয়ে তাই মার কাছে গিয়ে চুপি চুপি কাণে কাণে বললাম, 'মা, লালু কূয়োয় পড়ে গেছে।' মা ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন, 'কূয়োয় পড়ে গেছে! কোন কূয়ো?'

'বাগানে।'

মা চেঁচিয়ে সবাইকে ডাকতে ডাকতে ছুটলেন। তার পিছনে ছুটলেন বড়দি। অন্য সবাই ছুটল কয়েক হাত পিছনে।

লালুর জামাটা তখনো ভাসছিল, ভিজে জামায় বাতাস আটকে ভাসিয়ে না রাখলে ততক্ষনে সে তলিয়ে যেত।

মা দেখেই কূয়োর মধ্যে ঝাঁপ দিলেন। দিদিও দ্বিধা মাত্র না করে মাকে অনুসরণ করল।

তারপর দড়ি বালতি এল, বাঁশ এল, মই এল। লালু উঠল, দিদি উঠল, মা উঠলেন। আধঘণ্টার মধ্যেই লালু আবার খেলে বেড়াতে লাগল।

মাঝে মাঝে কঠোর সমালোচনা আর কড়া ভৎসনার দৃষ্টিতে তাকানো ছাড়া আমার দিকে এতক্ষণ কেউ বিশেষ মনোযোগ দেয়নি, এবার মেজদা গম্ভীর মুখে এসে আমার কাণ ধরে বললেন, 'চল্, তোকে চুবিয়ে আনি কূয়ো থেকে।, দড়ি বেঁধে তোকে দু'ঘণ্টা কূয়োর মধ্যে ফেলে রাখলে—'

জামাইবাবু কাছেই ছিলেন, বললেন, 'আরে, আরে! কি করছ?' মেজদাকে ঠেলে সরিয়ে আমাকে বুকে চেপে ধরে বললেন, 'ওকে কোথায় মাথায় তুলে আদর করবে, তার বদলে শাস্তি দিচ্ছ?' সকলে অবাক হয়ে চেয়ে রইল।

জামাইবাবু আবার বললেন, 'ওর জন্যেই তো লালু আজ বাঁচলো। এইটুকু ছেলে, ওর তো ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার কথা। চুপ করেও থাকতে পারত। ও যে সঙ্গে সঙ্গে এসে খবর দিয়েছে এজন্য ওকে পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমি ওকে আজ রসগোল্লা খাওয়াব যত খেতে পারে।'

আবহাওয়া বদলে গেল।

চাকরকে জামাইবাবু সঙ্গেসঙ্গে রসগোল্লা আনতে পাঠিয়ে দিলেন। চাকর ফিরলে বড় এক জাম বাটি ভরা রসগোল্লা আমার সামনে রাখা হল। চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে সকলে হাসিমুখে সস্নেহ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে রইল।

মেজদা কোমল স্বরে বললেন, 'খা, মাণিক, খা। নয় একদিন একটু অসুখ হবে। তাতে কি। বিকেলে তোকে সাইকেলে চাপিয়ে বেড়িয়ে আনব।'

চারিদিকে তাকিয়ে আমি—

আমি হুহু করে কেঁদে ফেললাম!

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেকটিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

অশোক বলল, "খাতাটা আপনার কাছে আছে না কি?"

"হুঁ আছে," ভবতোষবাবু বললেন, "যত্ন করে লোহার সিন্দুকে তুলে রেখেছি। কিন্তু সে ত গুজরাটি ভাষায় লেখা বহু পুরোনো ঝুরঝুরে একটা খাতা। সেটা দেখে কিছু বুঝতে পারা কঠিন। তবে আমি একজন গুজরাটি ভদ্র লোককে দিয়ে ইংরেজীতে হুবহু তর্জমা করিয়েছি; তর্জমাটা পড়ে মনে হয় শ দেড়েক বছর আগে উদয়চন্দ্রের কোনো পূর্বপুরুষ-এর লেখা।" অশোক বলল—"তা হলে খাতাটা পরে দেবেন, একটু দেখব। আপাততঃ মোটামুটি বলুন তাতে কি ঘটনার কথা লেখা আছে।"

"বলছি", ভবতোষবাবু বললেন, "কিন্তু তার আগে বাটলীওয়ালা বংশের আদি বাড়ি সম্বন্ধে দুএকটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কেননা, খাতায় যে কথা লেখা আছে তার ঘটনাস্থল হল সেই পুরোনো বাড়ি। সান্তা ক্রসে সমুদ্রের ধারে উদয়ভবন বলে একটা বাড়ি আছে দেখেছ বোধ হয়। সেটা কিন্তু ওঁদের আদি বাড়ি নয়। উদয়চন্দ্র সেটা তৈরি করেছেন। এই উদয়ভবন ডানদিকে রেখে সমুদ্রের পাড় ধরে সোজা এগিয়ে গেলে,—অনেক দূর এগিয়ে গেলে,—একেবারে ফাঁকা জায়গায় গি[illegible] পড়বে। সেখানে চোখে পড়বে একটা ভাঙ্গা বিরা[illegible] প্রাসাদ, সেটাই ছিল ওদের আদি বাড়ি। সমুদ্রের ঠি[illegible] কোলেই একটা ছোট পাহাড়মত, এবং তার উপর সে[illegible]

বিরাট পোড়ো বাড়িটা ওদের বংশের অতীত ঐশ্বর্যের প্রেতের মত আজও দাঁড়িয়ে আছে। ওই বাড়িটাতেই গত পঁচিশ বছর ওঁরা বংশ পরম্পরায় জীবন কাটিয়েছেন। মাত্র বছর পঁচিশ আগে উদয়ানন্দ সেটা ছেড়ে দিয়ে সান্তা ক্রস-এর লোকালয়ে তাঁর উদয়ভবন তৈরি করে উঠে এসেছেন।"

"সে বাড়িটা ছাড়লেন কেন কিছু জানেন?"—অশোক প্রশ্ন করল।

"হুঁ। শুনেছি সমুদ্রে জোয়ার এলে পাহাড়টার চারদিক জলে ভরে যায়, তখন নৌকোয় ছাড়া জমিতে আসবার আর কোনো উপায় থাকে না। তাই উদয়ানন্দ ওটা ছেড়ে এসেছেন!"

"ও!"—অশোক বলল—"যাই হোক, আপনি তা হলে এবার সেই খাতায় লেখা ঘটনার কথা বলুন।"

"বরং এক কাজ করি," ভবতোষবাবু বললেন—"খাতার তর্জমাটা নিয়ে এসে পড়ে শোনাচ্ছি। হাবিজাবি অনেক কথাই তাতে লেখা আছে, তবে তার মধ্যে যতটুকু দরকারি ততটুকু বলছি, তুমি না হয় পরে পুরো তর্জমাটা ভালো করে পোড়ো।"

ভবতোষবাবু উঠে গেলেন এবং ঘরের মধ্যে থেকে একটা একটা ঝুরঝুরে পুরোনো নোট বই আর কতকগুলো টাইপ করা কাগজ নিয়ে এলেন। "খাতাটা কার লেখা," চেয়ারে বসতে বসতে তিনি বললেন—"তা জানা নেই। তবে উদয়ানন্দের যে পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে লেখা তাঁর নাম কাওয়াসজি বাটলিওয়ালা।"—তারপর নোট বইটা অশোকের হাতে দিয়ে টাইপকরা কাগজগুলো পড়ে চললেন। সেই ইংরেজীর বাংলা করলে দাঁড়ায়:

"কাওয়াসজির শরীরে ছিলো পশুর মত শক্তি, তাঁর মন ছিল পশুর মত নির্মম আর ছিলো তাঁর অতুল ঐশ্বর্য! লোকে আড়ালে বলত জল ডাকাতির গুপ্ত দল আছে; কিন্তু সামনা সামনি কেউ একটা কথাও বলতে সাহস পেত না। আর তাঁর একটা নেশা ছিলো—ভারি অদ্ভুত নেশা—দাবা। পৃথিবী যদি ধ্বংশও হয়ে যায় তাহলেও কাওয়াসজি দাবার ছক ছেড়ে কিছুতে উঠবেন না। আর এই সর্বনাশী নেশার সঙ্গে তাঁর মিশেছিলো সীমাহীন দম্ভ: দাবায় কেউ তাঁকে হারিয়ে দেবে এ কথা তিনি কোনোমতেই বরদাস্ত করতে পারতেন না, তিনি বরদাস্ত করতে পারতেন না দুনিয়ায় এমন কেউ থাকবে যার নাম খেলোয়াড় হিসেবে তাঁর চেয়ে বড়। অদ্ভুত খেয়াল। কিন্তু সেকালের বড়লোকদের কথাই আলাদা! কাওয়াসজির মাইনে করা লোক দেশ বিদেশে ঘুরত নামজাদা খেলোয়াড় ডেকে আনবার জন্যে, আর সেই খেলোয়াড়কে পরাস্ত করার দম্ভে কাওয়াসজির বিরাট অট্টালিকা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠত অট্টহাসিতে।

"সেবার কাশী থেকে এল একজন নাম করা পণ্ডিত। শোনা গেল এমন খেলোয়াড় নাকি দুনিয়ায় নেই। কেউ বললে লোকটা তান্ত্রিক, কেউ বললে পিশাচ-সিদ্ধ, কেউ বা বললে মন্ত্রসিদ্ধ! শোনা গেল এঁর তিনটে চাল টেঁকতে পারে এমন লোক নাকি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত জন্মায়নি। টলমল করে উঠল কাওয়াসজির মন, ছক পেতে সন্ধের মুখে ডাকলেন পণ্ডিতজীকে। কিন্তু অত তাড়া কিসের? পণ্ডিতজী বললেন—আজ সন্ধেয় থাক কাল সকালে বসা যাবে। পরের দিন সূর্যোদয়ের আগে আবছা নরম আলোয় দেখা গেল সমুদ্রের ধারে পণ্ডিতজী স্নান করছেন। স্নান শেষ হল, সমুদ্রের ওপারে উঠল টকটকে সূর্য। পণ্ডিতজী পাড়ে দাঁড়িয়ে সূর্যের দিকে মুখ করে মন্ত্র আবৃত্তি করতে লাগলেন। প্রাসাদে যখন ফিরলেন তখন তাঁর মুখ যেন থমথম করছে! অত্যন্ত গম্ভীর গলায় বললেন: পাতো ছক। দাবা খেলতে বসে কাওয়াসজির কোনদিন ভয় হয় নি, খেলোয়াড় হিসেবে তিনিও কম যান না। কিন্তু এই সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সামনে বসে সেদিন তাঁর বুকটা কেমন যেন দুরদুর করে উঠল। সত্যিই কি মন্ত্রসিদ্ধ? হয়ত তাই। কাওয়াসজির মনে কি রকম সব এলোমেলো

হয়ে যেতে লাগল—তিন চাল যেতে না যেতেই তিনি দেখলেন কিস্তির মুখে পড়েছেন এবং সে কিস্তি থেকে বেরুবার সব পথ বন্ধ। সেদিন হাসবার পালা সূর্যপূজারীর—তাঁর অট্টহাসির প্রতিধ্বনি ঘুরতে লাগল বিরাট প্রাসাদটায়, কাওয়াসজির মনে হল প্রাসাদের প্রত্যেক ঘর থেকে বিদ্রূপ ভেসে আসছে। এ কি সত্যি মন্ত্রসিদ্ধ? লোকটা কি সত্যি যাদুকর? লজ্জায়, রাগে, অপমানে কাওয়াসজির সমস্ত শরীর মন ঝাঁঝাঁ করতে লাগলো। বললেন—বোস, আর এক বাজি খেলা যাক। কিন্তু দম্ভের দিক থেকেও ব্রাহ্মণ কাওয়াসজির চেয়ে একটুও কম নন; বললেন—তাড়া কি! দুপুরে ঘুমিয়ে নাও, মাথা ঠাণ্ডা হবে। বিকেলে আবার বসা যাবে। পারো ত' ইতিমধ্যে খানিক গাওয়া ঘি খেয়ে নাও, মাথাটা খুলতে পারে। কাওয়াসজিকে বোবা আক্রোস চেপেই রাখতে হল; তখনো তাঁর সামনে মাৎ হয়ে যাওয়া ছক!

"লোকটা সত্যিই কিন্তু যাদুকর। সত্যিই কিন্তু মন্ত্রসিদ্ধ! তা নইলে, বিকেলে আবার খেলতে বসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কাওয়াসজির সামনে সবকিছুই অমন এলোমেলো হয়ে গেল কেন? কিস্তি পড়ল, এবার বোড়ের কিস্তি, সবচেয়ে অপমানজনক কিস্তি! আরও অপমানজনক হল ব্রাহ্মণের হাবভাব—কিস্তি দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন, যেন তাঁর দেওয়া কিস্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া মানুষের সাধ্যের অতীত। বললেন: তুমি চাল ভাবো। সমুদ্রের ধারে ততক্ষণ হাওয়া খেয়ে আসি।

"তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, সমুদ্রের জল যেন রক্ত কস্তুরীর মত লাল। পণ্ডিতজী গিয়ে দাঁড়ালেন চকচকে বালির উপর, আর সূর্যের দিকে মুখ করে স্তব্ধ তন্ময় হয়ে রইলেন। তাঁর হুঁস ভাঙ্গল কাওয়াসজির উত্তেজিত ডাকে। কাওয়াসজির চেহারায় যেন ঝড় আসবার আগেকার স্তব্ধতা। বললেন—"খেলা ছেড়ে উঠে এলে যে!" পণ্ডিতজী অবাক হয়ে বললেন—"খেলা? খেলা ত শেষ হয়ে গিয়েছে।" "সে কি রকম? আমি চাল দিয়েছি। চলো।" পণ্ডিতজী হো হো করে হেসে উঠলেন—"অসম্ভব! আমার কিস্তির পরেও চাল? পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত কেউ তা পারেনি।" কাওয়াসজি যেন কথা বাড়াতে চান না, ছোট করে বললেন—"দেখবেই চলো না।" "বেশ"—পণ্ডিতজীও এগুলেন। কিন্তু ঘরে ফিরে দাবার দিকে একটু চেয়ে পণ্ডিতজী হঠাৎ চীৎকার করে উঠলেন—'জোচ্চর! ঘুঁটি নিশ্চই এদিক-ওদিক করেছো! ছক এ রকম ছিলো না।" "মুখ সামলে কথা বলো"—কাওয়াসজিও চীৎকার করে উঠলেন। সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল বাড়ীর সমস্ত লোকজন! দুজনের বচসা প্রায় চরমে পৌছলো। শেষ পর্যন্ত কাওয়াসজি বললেন—"বেশ। আবার সুরু কর গোড়া থেকে।" কিন্তু না। পণ্ডিতজী কিছুতে রাজি নন। সূর্য ডুবে গিয়েছে। আকাশে সূর্য নেই। পৃথিবীতে অন্ধকার। এ সময় দাবার ছকে তিনি কোনোমতে বসতে রাজি নন। তাঁর খেলার সাক্ষী সূর্যদেব! খেলার প্রেরণা সূর্যদেব!

"এবার হাসবার পালা কাওয়াসজির।—"যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই! বুজরুক! মস্ত বড় বুজরুক! খেলতে শিখে তুমি হারাও না, তুমি হারাও দৈবের কৃপায়, সূর্য-সিদ্ধির জোরে!"

"কিন্তু ব্যাপারটা শুধু হাসাহাসিতেই শেষ হল না। দম্ভের সীমা নেই পণ্ডিতজীর! দম্ভের শেষ নেই কাওয়াসজির। প্রকাশ্যে দুটো দম্ভের ঢেউ উলটো মুখে এসে যেন ধাক্কা খেল আর সেই ধাক্কায় সবই একেবারে রসাতল হয়ে গেল! ব্যাপারটা গড়ালো হাতাহাতিতে এবং তারপর আরও জঘন্য অবস্থায়—প্রায় খুনোখুনীতে! পণ্ডিতজীর কোমর থেকে বেরিয়ে এল চকচকে তীক্ষ্ণ ছোরা, কাওয়াসজির শরীরের প্রত্যেকটি পেশী ফুলে উঠল। বাড়িতে আর কোথাও টুঁ শব্দটি নেই; টুঁ শব্দ করবার সাহস নেই কারুর। কাওয়াসজির রাগ সবাই জানে, সবাই জানে কী ভয়াবহ এর পরিণাম। সেই

পরিণাম মেনে নিতে হল পণ্ডিতজীকে। বিরাট সবল একহাতে কাওয়াসজি ব্রাহ্মণের ছোরা-শুদ্ধ হাত চেপে ধরলেন আর একহাতে টিপে ধরলেন তাঁর টুঁটি। তার পর টানতে টানতে নিয়ে চললেন তাঁর দেহটা বাড়ির পেছুনের চোরা সিঁড়ি দিয়ে বাড়ির নীচের দিকে। চোরা সুড়ঙ্গটা শেষ হয়েছে একেবারে সমুদ্রের উপরে গিয়ে। রুক্ষ পাথুরে মেঝের উপর সমুদ্রের জল ছলাৎ ছলাৎ করছে। লোকে বলত এ পথটা জলপথে ডাকাতি করার জন্যে লুকিয়ে আনাগোনার পথ। মাথার উপর লোহার বিম বর্গা, তাতে আংঠা পরানো, দড়ি বাঁধা। জোয়ারের সময় জল যখন মেঝে ছাড়িয়ে ফেঁপে ওঠে তখন সেই আংঠায় নৌকো বাঁধা হয়।

"পণ্ডিতজীর হাত থেকে ছোরাটা ছিনিয়ে নিয়ে কাওয়াসজি টান মেরে সমুদ্রের দিকে ফেলে দিলেন। তারপর এক হাতে তাঁর ঘাড়টা টিপে ধরে আর এক হাতে কড়িকাঠ থেকে দড়ি খুললেন। পণ্ডিতজীর পা দুটো শক্ত করে বাঁধলেন সেই দড়িতে আর তারপর সেই দড়ি দিয়ে বাঁধা পা দুটো আটকে দিলেন কড়িকাঠের আংঠায়। হেঁটমুণ্ড অবস্থায় দুলতে লাগল পণ্ডিতজীর দেহটা। তারপর সুড়ঙ্গ ছেড়ে উঠে এলেন কাওয়াসজি। সেদিন ছিল অমাবস্যা।

"কাওয়াসজির চোখে ঘুম নেই, দালানে উত্তেজিত ভাবে পায়চারী করে চললেন। সুড়ঙ্গর ভেতর থেকে কাতর মিনতি আর গোঙ্গানি ভেসে আসতে লাগলো। তারপর সমুদ্রে জোয়ার এলো, নোনা জল কেঁপে উঠল আর সেই নোনা জলে ডুবে পণ্ডিতজীর গোঙ্গানি বন্ধ হয়ে গেল।

"সকাল বেলায় কাওয়াসজি সুড়ঙ্গ বেয়ে নামলেন। দেখলেন জোয়ারের নোনা জলে ডুবে থেকে পণ্ডিতজীর মৃত মুখটা একেবারে ফ্যাকাশে লালচে হয়ে গিয়েছে আর তাঁর মাথার উপর একটা বাদুড় ঘুরপাক খাচ্ছে। বীরদর্পে কাওয়াসজি একবার পণ্ডিতজীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলেন; তিনি হয়ত এক পৈশাচিক অট্টহাসি হেসে উঠতেন কিন্তু হাসতে পারলেন না। তাঁর বিরাট সবল শরীর শিউরে উঠল এক অদ্ভুত আতঙ্কে: তিনি দেখলেন, স্পষ্ট দেখতে পেলেন পণ্ডিতজীর ফ্যাকাশে মুখে ফুটে উঠছে একটা ক্ষীণ অস্পষ্ট হাসি—সে হাসি বরফের মত ঠাণ্ডা, বরফের মত মৃত। উল্টো করে ঝোলানো ফ্যাকাশে নীলচে মুখে স্পষ্ট প্রতিশোধের হাসি! চেয়ে থাকতে থাকতে কাওয়াসজির মাথার মধ্যেটা কী রকম ঝিমঝিম করতে লাগলো, আর সেই বাদুড়টা যেটা ঘুরপাক খাচ্ছিলো পণ্ডিতজীর মৃতদেহের উপর সেটা সরে এসে ঘুরপাক খেতে লাগল কাওয়াসজির মাথার উপর! কাওয়াসজি সেটার দিকে চাইলেন আর একেবারে চমকে উঠলেন: সমুদ্র থেকে ঠিকরে আসা সকালের কোমল আলোয় মনে হল বাদুড়টাও কী রকম যেন অবাস্তব, কী রকম নীলচে যেন তার মুখটাও,—আর যেটা সবচেয়ে বীভৎস—বাদুড়টার মুখেও অস্পষ্ট ঠাণ্ডা একটা হাসি!

"কাওয়াসজির পক্ষে আর দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব নয়—সুড়ঙ্গ দিয়ে দৌড়ে বেরিয়ে এলেন। তাঁর শরীরটা তখন থরথর করে কাঁপছে! একটা চাপা আতঙ্কের চীৎকার বেরিয়ে এলো তাঁর মুখ থেকে। বাদুড়টাও সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁর সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসেছে এবং মাথার উপর ঘুরপাক খাচ্ছে। দৌড়ে এল লোকজন, চাকরবাকর। কাওয়াসজি প্রায় উন্মাদের মত চীৎকার করতে লাগলেন—'আমার শনি আমার শয়তান! মেরে ফেলে ওটাকে!' কিন্তু আশ্চর্য: তখন আর বাদুড়টার কোনো চিহ্ন নেই!

"তারপর কিছুদিন কাটল একরকম নির্বিঘ্নেই। কাওয়াসজি অনেকটা যেন সামলে নিলেন। কিন্তু, ঠিক এক মাস পরে, আবার যেদিন অমাবস্যা ঘুরে এলো, সেদিন সুরু হল সেই বিপদ। রাতে, খাওয়া-দাওয়ার পর কাওয়াসজি শুয়ে শুয়ে তামাক টানছিলেন, হঠাৎ মনে হল ঘরের মধ্যে একটা অস্পষ্ট শব্দ। তিনি চমকে উঠে

বসলেন। সামনের দিকে চাইলেন—কিছু নেই। ঘাড় ফেরালেন—পেছুনেও কিছু নেই! অথচ শব্দ! কাওয়াসজি উপরের দিকে চাইলেন আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার করে উঠলেন। একটা বাদুড়—সেই বাদুড়টাই। কিন্তু মনে হল নরকের আগুন থেকে সবেমাত্র উঠে এসেছে, তার গায়ে নরকের নীলচে আভা। আর সবচেয়ে বীভৎস, সবচেয়ে সাংঘাতিক ব্যাপার হল তার ফ্যাকাশে মুখে একটা অদ্ভুত হাসি, পণ্ডিতজীর মৃত মুখের মত। এলো লোক-জন, এলো আলো। কিন্তু তখন আর বাদুড়টার সাক্ষাৎ নেই!

"তারপর আবার একমাস কাটল প্রায় শান্তভাবেই। আবার অমাবস্যার রাত এল আর এল প্রেতলোকের সেই প্রতিনিধি! সেদিনও রাতে খাওয়াদাওয়ার পর তিনি শুয়েছিলেন। হঠাৎ খেয়াল পাশের ছোট ড্রেসিং রুমটায় তিনি দামী হীরে বসানো রিষ্টওয়াচটা ফেলে এসেছেন।

"রিষ্টওয়াচটার কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাওয়াসজি বিছানা ছেড়ে উঠলেন, ড্রেসিং রুমে গেলেন। পাশের ঘরটায় একটা প্রকাণ্ড বড় ড্রেসিং টেবিল আর কাপড়ের আলনা ছাড়া কিছু ছিলো না। কাওয়াসজি ঘরে ঢুকেই কিন্তু একেবারে পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে গেলেন: ঠিক সামনে, ড্রেসিং টেবিলটার কাছে, হাওয়ায় ভাসছে একটা মানুষের মুখ, সোজা ভাবে নয় উলটো ভাবে! কার মুখ চিনতে দেরি হল না। কাওয়াসজির অচেতন শরীরটা মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

"তারপর একটা অদ্ভুত ভয় তাঁকে পেয়ে বসল। দিন নেই, রাত নেই,—একটা অস্পষ্ট আতঙ্কে তিনি শিউরে ওঠেন। বিড়বিড় করে শুধু বলেন: অভিশাপ, সেই সূর্যপূজারীর অভিশাপ। আমি বেশ বুঝছি আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আমি শুনতে পাচ্ছি প্রেতলোকের ডাক, আমায় যেতে হবে। সেখানে আমার বিচার হবে!

"অদ্ভুত ভয়। আর এই ভয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে অদ্ভুত উপায়! কাওয়াসজি আফিম ধরলেন। কিন্তু আফিমের পরিমাণ দিনকের দিন যতই বেড়ে চলুক অভিশাপের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই, মুক্তি নেই প্রেতের আহ্বান থেকে। প্রতি অমাবস্যার রাতে সেই প্রেত দেখা দিতে স্বরু করল আর মনে করিয়ে দিতে লাগল বিচারের দিন ঘনিয়ে আসছে। এইভাবে কাটল পুরো ন'মাস। তখন কাওয়াসজির অবস্থা একেবারে পাগলের মত! আফিমের মাত্রাও প্রায় সম্ভবের সীমা পেরিয়ে গিয়েছে!

"সেদিনও ছিলো অমাবস্যার রাত। কাওয়াসজি প্রেতের আহ্বানকে আর ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। স্বপ্ন-চালিতের মত নিঃশব্দে চললেন সেই সুড়ঙ্গের দিকে। আর পরদিন সকালে তাঁর মৃতদেহ আবিষ্কৃত হল সুড়ঙ্গের মধ্যে। পাশে পড়ে রয়েছে আফিমের আধখালি একটা বড় কৌটো। ভয়ে না আফিমের বিষে—কিসে মৃত্যু হয়েছে বোঝা গেল না।

"সূর্যপূজারীর অভিশাপ কিন্তু তাঁর মৃত্যুতেই শেষ হল না। তাঁর বংশে এ অভিশাপ ঘুরে ফিরে দেখা দিতে লাগল। কিন্তু দেখা দিতে লাগল এক ভারি আশ্চর্য ভাবে—ঠিক এক পুরুষ অন্তর। তাঁর ছেলের কোনো বিপদ ঘটেনি, কিন্তু সেই ছেলেয় আর ছেলে ছিলো না বলে তার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি যায় তার ভাইপোর হাতে। এবং এই অভিশপ্ত সম্পত্তি পাবার পর সে পায় প্রেতের আহ্বান। সে আহ্বান আসত অমাবস্যার রাতে এবং আটটা অমাবস্যা কাটাবার আগেই আফিমের নেশায় আর প্রেতের আতঙ্কে তার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে যায়। নবম অমাবস্যার পরদিন তারও মৃতদেহ পাওয়া যায় ওই সুড়ঙ্গের মধ্যে। এবারও বোঝা যায় নি, ভয়ে না আফিমের বিষে—কিসে হল তার মৃত্যু! এক পুরুষ অন্তর এই বংশে সূর্যপূজারী ব্রাহ্মণের অভিশাপ ঘুরে ফিরে দেখা দিচ্ছে। এর শেষ কোথায়?"

[ক্রমশ]

মেয়েরা নাকি ডিক্‌টেটর নয়!

শিবরাম চক্রবর্ত্তী

আজ্‌কের পৃথিবীতে সবচেয়ে নামী লোক হচ্ছে ডিক্‌টেটররা। সুনাম ও দুর্ণাম যেদিক দিয়েই হোক্, তাদের নামডাকই জবর। সেই সব নামী লোকদের সঙ্গে এক নিশ্বাসে আমার বোন্ শ্রীমতী বিনির বা তার বন্ধুদের যদি নাম করা যায় তাহলে বদ্‌নাম করা হবে কিনা জানিনে কিন্তু একটা খুব সত্যি কথা বলা হবে। আমার মতে মেয়েরা মাত্রই ডিক্‌টেটর—এমন কি বৌ না হলেও—এমন কি বোন হলেও—এমন কি বোনের বন্ধু বা বন্ধুর বোন হ'লেও তার কোন অন্যথা হয়না। ইংরেজি অভিধানে ডিক্‌টেটর এই শব্দের অর্থ যদি লেখা হয় হিটলার, মুসোলিনী and a woman তাহলে বোধহয় মানের কোনো অমর্য্যাদা হয়না। মেয়েদের নাম আলাদা আলাদা হলেও তাদের সবার ঐ এক ডাক নাম ডি ক্ টে ট র! তা' তাদের বিনিই বলো, আর রমলাই বলো, আর সেলিনাই বলো—গোলাপ যে নামে ডাকো গন্ধ বিতরে! স্বর আলাদা হ'লেও সুরভি এক।

এ ধারণাটা আমার একদিনে হয়নি, কিম্বা একদিনেই হয়েছে তাও বলা যায়। এবং এই ধারণাটা, কেবল আমার মাথায় নয়, মনে নয়, সংস্কারে নয়, একেবারে আমার হাড়ে হাড়ে গজিয়েছে—যেমন কার' হাড়ে 'দুব্বো গজায়'। এখন এবার আমার এই ধারণাটা হবার কারণ বলি।

এমন কিছু না ঘরোয়া বৈঠক। চায়ের আসরে বিনির কলেজের বন্ধুরা জমেছিল।

বিনি যখন তার বন্ধুদের চায়ের নেমন্তন্ন করে, তখন আমি নিরাপদ ব্যবধানে থাকার চেষ্টা করি নিজেকে সরিয়ে—হয় চিল্‌কোঠায় গিয়ে—নয় একেবারে বাড়ীর বাহিরে দূরীভূত ক'রে নিজেকে বাঁচাই। কিন্তু সেদিন কি করে' যে বাড়ীর মধ্যে এবং তাদের নজরের এলাকায় আট্‌কা পড়ে গেছ্‌লাম জানিনে।

আলোচনাটা মোড় নিল ডিক্‌টেটরদের দিকে।

রমলা বলছিল, "মুখে আমরা যতই ওদের অপছন্দ করিনা কেন, মনে মনে প্রত্যেকেই আমরা ডিকৃটেটর হতে চাই।"

আমি অবাক্ হয়ে রমলার দিকে তাকালাম। মেয়েরা মাঝে মাঝে সত্যি কথা বলে দেখছি! (আমাদের মতো এতটা মিথ্যেবাদী নয়, দেখা যাচ্ছে!)

সকলে রমলার মুখে তাকালো। একটু সবিস্ময়েই বুঝি। মেয়েলিপনা ছাড়াও, রমলার এমন শান্তশিষ্ট স্বভাব যে ওকে কিছুতেই ডিক্‌টেটর টাইপের বলা যায় না। বরং ওর চোখ মুখ দেখ্‌লে মনে হয় সব সময়ে ও যেন কিসের ভয়ে ভয়ে আছে। কোনো একটা দুর্ঘটনা আল্‌গোছে ঘট্‌বার তালে ওর আশেপাশেই হয়তো ওৎপেতে রয়েছে এম্‌নি ওর মুখের ভাব। কেউ যেন এই মুহূর্ত্তেই ওকে ধরে' গিলে ফেল্‌বে—যদি একবার ধর্‌তে পারে—সর্ব্বদা সচকিত ওকে দেখ্‌লে এইরকম ধারণা হয়। কিসের যে ওর এত ভয়—কিসের তা ওই জানে!

"অবশ্যি তার মানে এ নয় যে—" রমলা বিষয়টাকে আরো বিশদ করতে থাকে—"এ নয় যে আমি ইহুদীদের ধরে' ধরে' ঠ্যাঙাতে চাই, কিম্বা যত লোককে পাকড়াতে পারি জেলের মধ্যে নিয়ে গিয়ে পুরে থাকি—না, ওসব আমার ভালো লাগেনা। মারধোর ধরপাকড় ও সবের মধ্যে আমি নেই। তবে—কিন্তু—প্রশস্ত রাজপথ দিয়ে দুধারের উত্তেজিত জনতার জয়ধ্বনির মধ্যে দামী এক মোটরকারে ষ্টাইল্ করে' দাঁড়িয়ে একটা হাত উঁচু করে' যেতে নিশ্চয় খুব আরাম।"

রমলার লাল পড়ে কিনা দেখা যায় না, কিন্তু আমি একটা কথা বল্তে যাই—

"এক্টা হাত উঁচু করে' রাখার বিষয়ে যদি বল্তে হয় —" বল্তে যাই বটে, কিন্তু এণাক্ষী আমাকে বল্তে দেয়না। এক্টা হাত ঠায় তুলে রাখার সুবিধা অসুবিধার কথাটা তার কথায় চাপা পড়ে যায়।

এণাক্ষী বলে: "মোটরকারে চেপে দাঁড়িয়ে যাওয়া এমন কিছু আরামের বলে' আমার মনে হয় না। মোটরে চাপ্তে পেলে তাতে বসে যেতেই আমার ভালো লাগে। তবে হ্যাঁ, কাগজে কাগজে, দিনের পর দিন, নিজের ছবি দেখতে পাওয়াটা বোধ হয় মন্দ নয়। যেখানেই যাও, তোমার ফোটো, তোমার পোট্রেট্। সচিত্র হয়ে সকলের গৃহে গৃহে আমি বিরাজ করছি ভাবতে আমার বড্ড ভালো লাগে। তোমার আমার ফোটোর মত নয়—নিজের পয়সা খরচ করে' তোলালে—দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে খান দশ বারো কপি করিয়ে নিলে হয়তো—তারপর যে বন্ধুকেই তা উপহার দাও সেই মুখ বাঁকিয়ে ব'ল্বে ভারী বিচ্ছিরি তুলেছে তো! তোকে তো চেনাই যায় না। তারপর নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে উনুনের মধ্যে ছেড়ে দেবে—নয়তো জঞ্জালের মতো ফেলে রেখে দেবে এককোণে। এই তো পরিণাম!"

"ডিক্টেটরদের পরিণাম যদি বলো—" আমি আবার আরম্ভ করি, এবং আবার বাধা পাই। অন্যদিক্ থেকে আক্রমণ আসে এবার। ডিক্টেটরদের পরিণামের কথাটা, যেটা ঐ ফোটোদের চেয়ে কোনো অংশে হয়তো পৃথক্ নয়, —এই কথাই আমি বল্তে চেয়েছিলাম, কিন্তু আমার সে বক্তব্য অব্যক্ত থেকে যায়।

হেনা ওরফে হাস্নুহানা আরম্ভ করে: "ডিক্টেটরদের ওপর আমার কেন হিংসে হয় বলবো? ওদের লোক জড়ো কর্বার ক্ষমতায়। এক একটা সভায়, উঃ, কী লোকটাই না ওরা জোটাতে পারে! সিনেমার ছবিতে তো দেখেছি—বাপ্স্! অথচ আমার দাদার সাহিত্য সমিতিতে পাঁচজন শ্রোতাও এসে জমে না—কতো কচুরি সিঙাড়া বরাদ্দ থাকে তবুও। সিঙাড়া আর দাদার কবিতারা অবহেলায় পড়ে থাকে, ভুলেও কেউ তাদের চাখ্তে আসে না—"

আস্বে কি, সিঙাড়া দেখে এগোয়, তোমার দাদার শিং নাড়া দেখে পিছিয়ে যায়—এই কথাটা বল্বার আমার সাধ হচ্ছিলো, কিন্তু বল্ব কিঁ, বলার ফাঁক্ পেলেতো?

হাস্নুহানা তখনো হানা দিচ্ছে—"যত লোক আসে তার বিশগুণ সিঙাড়া অম্নি পড়ে থাকে—সবাই মিলে খেয়ে শেষ করতে পারি না। শেষে অম্বল হ'য়ে যায়। যদি এমন হোতো যে, আমার এক কথায় মুহূর্ত্তের মধ্যে এক লাখ লোক জোটাতে পারতুম, সিঙাড়ার লোভ টোড় না দেখিয়েই, তাহলে আর কিছু না হোক্, অন্ততঃ দাদার দুঃখটা দূর করা যেত।"

"ব্যক্তিগতভাবে—" আমি বল্তে চাই। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত কথাটাও কেউ কানে তোলার যোগ্য মনে করে না। সেলিনা মাঝখান থেকে বলে' ওঠে: "আমি কিন্তু মোটেই ঐ ডিক্টেটর হতে চাইনে। ডিক্টেটর হতে আমার ভয় করে। যদি আমার গালগলা ফুলে যায়? সেই একবার মাম্স্ হয়ে যা হয়েছিল—ভাবতে গেলেই আমার বুক কাঁপে। ডিক্টেটর তো তোমার আমার মতো না, তাদের সব সময়ে সবার চোখে চোখে থাকতে হয়। সবার সাম্নে বেরুতে হয় সর্ব্বদা। তোমার আমার গলা ফুল্ল, দু'চারদিন বিছানায় শুয়ে থাকলুম, কেটে গেল। গাল ফুলেছে কিনা কেউ জানতে পেলো না, খোঁজও নিল না কেউ। গাল ফুলিয়েও দিব্যি লোকের চোখের আড়ালে থাকতে পারি।...পাড়া-পড়্শীরা কি বন্ধুরা কেউ টেরও পাবে না। মাথাও ঘামাবে না কেউ। কিন্তু হিট্লার কি মুসোলিনীর মত কোনো ডিক্টেটরের গলা ফুল্লে কি হয়, একবার ভাবো দিকি? যদি ঐ অবস্থায় তারা বাইরে বেরয়, লোকচক্ষে পড়ে' যায় যদি, কাণ্ডখানা একবার ভাবো! তক্ষুনি দুনিয়াশুদ্ধু খবরকাগজে তাদের গালফোলা চেহারা ছাপা হতে থাক্বে। তার ফলে তাদের ডিক্টেটরী বজায় থাক্বে কিনা কে জানে! গালফুলো হিট্লারকে কেউ বরদাস্ত করতে চাইতো কি? মনে করো হিট্লার যদি একদা হঠাৎ মুসোলিনী হয়ে যেত? এবং গালফোলা মুসোলিনীর যদি আরো গাল ফুলত—সে যে কি সর্ব্বনাশ হোতো আমি ভাবতেই পারি না। যুদ্ধে হারবার ঢের আগেই, এমন কি, যুদ্ধ সুরুর আগেই তারা জেরবার হয়ে যেত তা ঠিক। মুসোলিনী গাল ফুলে গোবিন্দের মা হয়ে গেছে একথা ভাবতেই পারা যায় না।"

"গোবিন্দের মা নয়—গোবিন্দের বাবা।" আমি ব্যাকরণের ভুলটা শোধ্রাবার চেষ্টা করি—কিন্তু আমার ভ্রম সংশোধনের চেষ্টা বৃথাই! গোবিন্দর ব্যাকরণ-সম্মত আত্মীয় উহ্য হয়ে আমার উপকণ্ঠে থেকে যান। কণ্ঠলগ্ন হয়ে থেকে যান্ আমার, তাঁকে আর নামানো যায় না।

"আর ফোলা গালে কারো সাম্নে তারা যদি না বেরয়"—আমার বাধা এবং গোবিন্দর বাবার নেপথ্যস্থিতি অগ্রাহ্য করেই সেলিনা বলে' যায়: "না বেরিয়ে বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে থাকে যদি, তাহলে অম্নি বাইরে গুজব রট্বে যে তারা খুন হয়েছে কিম্বা আত্মহত্যা করেছে কিম্বা হয়তো আবার কার রাজ্য গ্রাস কর্বার গোপন ষড়যন্ত্র করছে। পৃথিবীশুদ্ধু সবাই উস্খুস্ গুজ্গুজ্ করবে।.....আমি যদি ডিক্টেটর হই, মাগো, ভয়ে আমি ভালো করে ঘুমতেই পার্বোনা। কি জানি, যদি সেবারের মত, সকালে উঠে গালগলা সব এক হয়ে গেছে আয়নায় দেখ্তে পাই!"

"আমি"—এই পর্য্যন্তই আমি এবার এগুতে পারি।

সেলিনার ফ্যাসিস্তবিরোধী মনোবৃত্তির—এবং একেবারে নিঃস্বার্থপর মনোবৃত্তির সাধুবাদ দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আমাকে বল্তে না দিয়েই কেয়া হঠাৎ সুরু করে দিল: "ডিক্টেটর হওয়া আমিও আদপে পছন্দ করিনা—" বল্তে লাগল কেয়া: "তার কারণ ডিক্টেটররা বড্ড বেশী কথা বলে। বড্ড বেশী ওদের বক্তে হয়। হামেসাই ওরা বক্তৃতা দিচ্ছে—সতারে, বেতারে আর সমানে। অত বকুনি আমার সহ্য হয়না বাপু! আমি এক আধ কথার মানুষ! বেশি কথা বল্তে হলেই আমি গেছি। বাইরের কোনো আড্ডা মজ্লিসের কথা দূরে থাক্, ঘরে আপনা আপনির মধ্যেও আলাপ কর্তে আমার ভালো লাগেনা। চুপচাপ্ থাকাই আমি শ্রেয়ঃ মনে করি। কথা বলে কী হয়? কী হয় কথা বলে? অমূল্য সময় বৃথা নষ্ট করা কেবল। পরমায়ুর অপব্যয় খালি। এই নীরব থাকাটা, কেবল আমার একার নয়, আমাদের বংশগত বদভ্যাস্। আমাদের উপাধি, যার অর্থ হচ্ছে কর্ম্মী, তোমরা জানো বোধহয়? কিন্তু সবাই আমাদের 'নীরব কর্ম্মী' বলেই জানে। এর মানে অবশ্য এ-নয় যে, আমাদের কোনো বক্তব্য নেই, বল্বার মত কোনো কথা নেই আমাদের; তা' নয়। তবে কিনা, কিছু বল্তে একদম্ আমাদের ইচ্ছে করে না। বংশ-পরম্পরায় আমরা মুখ বুজে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেছি।....."

কেয়া বলেই চলে, দম্ নেবার জন্যও থামেনা। আমার মনে হয়, ও একটুখানি থাম্লে আমি বোধহয় দম্ নিতে পারতাম।

"বাস্তবিক, আমাদের আগের পুরুষে, বাপদাদাদের আমলে,—আমরা কর্ম্কার বলেছি না?—তখন আমাদের হাপররা বকেছে, লোহালক্কড়দের বকুনি শোনা গেছে, কিন্তু আমাদের বাপঠাকুদ্দারা একটি কথাও বলেননি; কানও দেন্নি কারো কথায়। লোহালক্কড়দের কথাতেই কি, আর লক্কর লোকদের কথাতেই কি! কথায় বলে, চোরে কামারে কখনো দেখা হয়না। দেখা যেমন হয়নি তেমনি তাদের মধ্যে কোনো কথাও হয়নি, একথা আমি হলফ্ করে' বল্তে পারি। আমার পূর্ব্বপুরুষরা কথা বল্বার পাত্রই ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন কাজের মানুষ। কেবল নিজের কাজ করে' গেছেন। আমাদের এই চুপ্ করে থাকাটা অনেকে ভুল বোঝে। কতো বিরুদ্ধ মন্তব্য শুন্তে হয়। কেউ বা বলে গুমোর। আমি সব শুনে যাই,

নীরবে শুনি, যেমন সব নীরব কর্মীরা শুনে থাকে, যারা একটিও কথা না বলে' কেবল নিজেদের কাজ গুছোয় তাদের মত চুপ্ করে' শুনে যাই, একটিও কথা বলিনা। কি বলব? কথা বলা আমাদের ধাতে নেই, কর্‌ব কি? বল্‌বই বা কি? বল্‌বার আছেই বা কি? ডিক্‌টেটর হতে আমার আপত্তি ছিলনা, কিন্তু ডিক্‌টেটর হলে কেবল কথা বল্‌তে হবে ঐখানেই আমার আপত্তি! কথা বল্‌তে আমি নারাজ। বাজে বকুনি আমার ভালো লাগেনা। কিন্তু দেখেচ তো, এক একটা মেয়ে কি রকম কথা বলে! একটা কেন, প্রায় প্রত্যেক মেয়েই! একবার আরম্ভ কর্‌লে আর থাম্‌তে চায়না, থামানোই যায়না তাদের। অনেকটা ওস্তাদি গানের মতন। কতো আজে বাজে বকে যায়। দেখেচ তো! ওদের কথা বলার শক্তি, কথা বলার স্পৃহা, কথা বলার লালসা, দেখ্‌লে আমার লোভ হয়—এমন কি, হিংসেও হয় এক এক সময়ে। মনে হয়, আহা, আমিও যদি ওদের মত হতে পারতুম। দিনরাত বক্‌বক্ করতে পারতুম্ ওদের মত। কিন্তু সারাদিন ধরে' হদ্দমুদ্দ চেষ্টা করলেও দু'টো কথা একসঙ্গে আমি গুছিয়ে বল্‌তে পারিনা। একটা সম্পূর্ণ বাক্য দূরে থাক্—এক সিলেবলের দুটো শব্দ সহস্র অনুরোধ কর্‌লেও আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। এমন কি, সাত চড়েও একটা 'আহা' বেরুবে না আমার মুখ থেকে। আমার বাবা বলেন, কেয়ি—"

"কী বলেন বাবা?" চেঁচিয়েই বোধহয় কথাটা আমি বল্‌তে গেছ্‌লাম, কিন্তু কেয়াবনের আন্দোলনে আমার প্রশ্নপত্র না গজাতেই বৃন্তচ্যুত হয়ে ঝরে' পড়ে। 'কেয়ি' শুনে পৌরাণিক কৈকেয়ির কথা আমার মনে পড়ে যায়—মন্থরা ছিল যার বাহন। কি আশ্চর্য, আমাদের কেয়ির বাহন—তা'র কণ্ঠেও—কী মন্থরতা!

কেয়ি বল্‌তেই থাকে:

"—বাবা বলেন, কেয়ি, তুই দু'টো কথা বল্। তোর মিষ্টি গলার আওয়াজ না পেয়ে আমরা হাঁপিয়ে উঠ্‌ছি! মনে হচ্ছে বাড়ীতে যেন মানুষ নেই! আমি বলি, বাবা, তুমি বৃথাই বল্‌ছো! মরে গেলেও, এমনকি, মেরে ফেল্লেও একটা টুঁ শব্দ আমার মুখ দিয়ে বেরুবে না। বাবাকে এই কথাই আমি বলি। মনে মনেই বলি অবশ্যি!—"

"ওব্‌বাবা!" আমিও বলি। আমিও মনে মনে।

"—এই কারণে, আমি জানাতে চাই যে,—আমি ডিক্‌টেটরগিরির ঘোরতর বিরুদ্ধে। কোনোদিন আমি ডিক্‌টেটর হতে চাইনা। হতে পারলেও হবোনা। ও আমার পোষাবেনা। বক্তৃতা দেয়া আমার ধাতে নেই, কুষ্ঠিতেও লেখেনি। কথা বল্‌তে হলে আমার মাথা ধরে যায়। কথা শুন্‌তেই আমি ভালোবাসি। তোমরা বলো, আমি শুনি। অপরে বলুক্, যার খুসি যত খুসি! আমি শুধু শুনে যাব। এক কথার মানুষ পৃথিবীতে কেউ আছে কিনা জানিনা, তবে আমি হচ্ছি এক কথার মেয়েমানুষ। বেশি কথায় আমি নেই……"

বিনির বন্ধুরা যখন ক্লান্ত হয়ে হাই তুল্‌ছিল, সেই ফাঁকে ডিক্‌টেটরদের রাজ্য থেকে আমি সরে' পড়্‌লাম। একেবারে আমার স্নানঘরের সাম্রাজ্যে সরে' এলাম। বিকালের স্নান সেরে, বৈকালিক প্রাতরাশের আশা ছেড়ে দিয়ে, আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে চুল ফেরাতে ফেরাতে মনে হোলো, চুলের দিক্ দিয়ে হিট্‌লারের সঙ্গে আমার একটু মেলে! আর কোনো দিক্ দিয়ে নয়। কিন্তু তা' না হলেও, এই এক চুলের মিলেই অনেকখানি আরাম পেলাম।

এমনকি, হিট্‌লারের প্রতি একটুখানি ঈর্ষাও যে না হোলো তা' নয়। ডিক্‌টেটর হবার সুবিধা এক হিসেবে এই যে, এই পৃথিবীতে সেই হচ্ছে একমাত্র লোক যে তার বলবার কথাটা স্পষ্টাস্পষ্টি সবার মুখের ওপর বলে দিতে পারে। অবাধেই বল্‌তে পারে বুঝি। এমনকি, মেয়েদেরও মুখের ওপরেও—মেয়েরা পর্যন্ত যার কথায় কোনো বাধা দিতে পারেনা—কথার ওপর কথা কইতে পারেনা কখনো। এই সৌভাগ্য কেবল এক ডিক্‌টেটরদেরই আছে।

নিজের বোন, কি বোনের বন্ধু, কি বন্ধুর বোনের কাছে, কথার পাল্লায় হেরে গিয়ে যাকে উপকথায় পরিণত হতে হয়না—সেই হচ্ছে ডিক্‌টেটর। তাঁর নাম থাক্, বদ্‌নাম থাক্—তাঁকে আমার প্রণাম! নমস্য লোক তিনি। তিনি ছাড়া পৃথিবীতে আর যে সব পুরুষ আছে তারা কাপুরুষ, যত বড় নামীই হোন্ না কেন, আসলে তাঁরা বেনামী—মেয়েদের কাছে তাঁরা নামমাত্র—তাদের কথার তোড়ের কাছে তাঁরা কিছুনা!

পাঞ্জাবী গায়ে চাদরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে সদরে বেরিয়ে যাবার সময়ে তখনো শুনি, কেয়া বল্‌ছে।

তখনো চল্‌ছে কেয়া-বাং!

এবং কেয়া ডিক্‌টেটর হতে চায়না।

কবিতা

সাগর

ফল্গু কর

সাগরের মত সুন্দর কিছু নাই
চল আমরা সেখানে যাই।
জল থৈ থৈ অগাধ অতল একেবারে নীলে নীল
এত সুন্দর জীবনে দেখনি কোথা খুঁজে পাবে মিল।
মুক্ত বাতাস উদার আকাশ
কোনোখানে শেষ নাই
চল আমরা সেখানে যাই।
ঢেউয়ের চূড়ায় ফেনা ভেসে যায়
থোপা থোপা যেন ফুল,
সাগর-রাজার সাদা ঘোড়া ওরা
কখন বা হয় ভুল—
ডানা মেলে দেয় সিন্ধু-শকুন অনেক দূরের পথ
মীন-কন্যার সংবাদ বহে ওরা যেন পারাবত।

অতল জলের কল কল যদি
কানেতে শুনিতে পাই
বল তবে আর কিবা চাই।
যদি ওঠ ঝড় প্রলয়ংকর কোনো ভয় নেই তায়
ছুটিয়া চলিবে তরণী বাতাস লাগিলে পালের গায়,
যদি ডুবে যাই অগাধ অতলে
নীল পরীদের দেশ
এই জীবনের যাত্রাটি মোর
সেথায় করিব শেষ।

অগাধ আকাশ মুখর বাতাস
কোনোখানে বাধা নাই
চল আমরা সাগরে যাই।

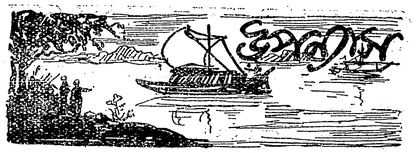

শ্বেত-চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

"দুই"

বাইরে বৃষ্টি থেমেছে। কিন্তু মেঘের কামাই নেই। ভিজে বাতাস হু-হু করে বইছে। সমস্ত শরীরটা সিরসির করে।

চাঁদনি টকির পর কয়েকটা বাড়ি ছাড়িয়ে সেই অন্ধকার গলি। যুদ্ধের আগে গ্যাসের আলো জ্বলতো। এখন জ্বলে না। রঞ্জিত পকেট থেকে ছোটো টর্চ বার করে জ্বাললো। সে পুলিশে কাজ করে। অনেক রকম খুন-খারাপী দেখতে অভ্যস্ত। তবু, আলো জ্বালাবার পর, সে-ও শিউরে উঠলো। কয়েক পা দূরেই পড়ে রয়েছে একটি দেহ। উপুড় করা। জলে আর কাদায় একাকার জায়গাটা। মৃত ব্যক্তির জামা-কাপড় জলে কাদায় মাখামাখি হয়ে গেছে। পিঠের উপর কী একটা জিনিস চকচক করছে।

ধনঞ্জয় উবু হয়ে বসে সেই চকচকে জিনিসটায় হাত দিতে গেলেন। তাঁর হাতটা ধরে ফেলে রঞ্জিত বললো, "ছোঁবেন না কবিরাজমশাই। আঙুলের ছাপ থাকতে পারে।"

টর্চের আলোয় ধনঞ্জয়ের চোখ দুটি একবার শুধু চকচক করে উঠলো। তারপর বললেন, "ক্ষমা করবেন। জানতুম না আপনাদের তদন্তের অসুবিধে করে ফেলেছিলুম আর একটু হলেই। কিন্তু আমি কবিরাজ, আমার কর্তব্য এখুনি পরীক্ষা করে দেখা প্রাণ আছে কিনা। নাড়ি দেখতে পারি কি ?"

রঞ্জিত উত্তর দিলো না। শুধু মাথা হেলিয়ে টর্চ জ্বালিয়ে রইলো। ধনঞ্জয় নাড়ি পরীক্ষা করলেন। বেশিক্ষণ লাগলো না পরীক্ষা করতে। অল্প পরেই উঠে দাঁড়িয়ে শুধু মাথা নাড়ালেন। দেহে যে প্রাণ নেই সে-কথা স্পষ্ট করে বলতে হোলো না।

"কতক্ষণ আগে মৃত্যু হয়েছে বলে মনে হয় ?" রঞ্জিত প্রশ্ন করলো।

"সঠিকভাবে বলা কঠিন।" ধনঞ্জয় উত্তর দিলেন। আধঘণ্টা থেকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে হয়েছে, মোটামুটি এই রকমই বলা যায়।"

রঞ্জিত তার হাতঘড়িটা দেখালো। সাড়ে আটটা বাজে। বললো, "তা হলে আটটা থেকে পৌনে আটটার মধ্যে হয়েছে। মাধববাবুর বাড়িতে আমি এসেছিলুম ঠিক সাড়ে সাতটায়। কবিরাজমশায়ের বাড়িতে যাই প্রায় আটটায়। এই সময়টুকুর মধ্যেই খুন হয়েছে।" বলে সবাইকার মুখের দিকে সে চাইলো। মাধব যে এতো কথা বলে, এই অপ্রকাশিত ঘটনায় সে-ও নির্বাক। ধনঞ্জয়ের দাড়ি-গোঁফভরা মুখে কোনো রকম অভিব্যক্তি নেই। শুধু সঞ্জীব যেন কী রকম উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে।

তার মুখের দিকে খানিক চেয়ে রঞ্জিত বললো, "আপনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন, না ?"

কী রকম যেন অদ্ভুত শোনালো রঞ্জিতের গলা !

সঞ্জীব বললো, "হ্যাঁ।"

"তখন কটা বাজে বলতে পারেন ?"

"না। তবে বাড়ি থেকে বেরিয়েই আমি এখানে আসি।"

"আমরা বেরুবার কতক্ষণ পরে আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন ?"

"প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।"

"আপনাদের বাড়ি থেকে এখানে আসতে মিনিট দুয়েক লাগে। আটটার কিছু আগে আমরা আপনাদের বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলুম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আপনিও বেরিয়েছিলেন। এখানে তা হলে মোটামুটি আটটার

মধ্যেই আপনি পৌঁছন !" বলে উত্তরের কোনো অপেক্ষা না রেখে পকেট থেকে নোটবই আর পেনসিল বার করে রঞ্জিত কি সব খসখস করে লিখে নিলো।

মাধবের মুখ উত্তেজনা ও ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। গলার কাছটা আঠা-আঠা। তবু কোনো রকমে সে বললো, "রঞ্জিতবাবু, রঞ্জিতবাবু……"

নোটবই বন্ধ করে পকেটে রাখতে রাখতে রঞ্জিত হেসে বললো, "কিছু ভাববেন না মশাই। আমাকে ভালো করে রিপোর্ট লিখতে হবে। সময়টা সঠিকভাবে জানানো দরকার। তাই এই সব প্রশ্ন করতে হোলো। সঞ্জীববাবু, আপনি চট করে গিয়ে মোড়ের পাহারাওলাকে ডেকে আনুন। এখনি সমস্ত ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে হবে।"

সঞ্জীব চলে গেলো।

রঞ্জিত উবু হয়ে বসে টর্চটা ধনঞ্জয়ের হাতে দিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে লাগলো। ছুরিটা অদ্ভুত ধাঁচের। কোনো হাতল নেই। যেখানটা বেরিয়ে রয়েছে সেটা সরু হলেও ছুঁচলো। ফলার সমস্তটাই প্রায় বিঁধে গেছে। এই ছুঁচলো দিকটা ধরে হত্যাকারী যদি বিঁধিয়ে থাকে তা হলে নিশ্চয়ই সেখানে তার আঙুলের ছাপ থাকবে। পকেট থেকে রুমাল বার করে সাবধানে ছুরিটা সে টেনে বার করলো। তারপর পার ভালো করে পরীক্ষা করার জন্যে রুমাল মুড়ে রেখে দিলো পকেটে।

ধনঞ্জয় বললেন, "খুব জোরেই ছুরিটা বসাতে হয়েছে। ওই ছুঁচলো হাতল ধরে অত জোরে বসানো সম্ভব কী করে সে-টা ভাববার বিষয়। রঞ্জিতবাবু, এই ব্যাপারটা লক্ষ্য করা দরকার বলে মনে করি।"

"নিশ্চয়ই।" উত্তর দিলো রঞ্জিত। তারপর ফিরে দেখলো পাহারাওলা এসেছে। পিছনে সঞ্জীব।

পাহারাওলাকে দাঁড় করিয়ে রঞ্জিত চটপট মৃতব্যক্তির পকেটগুলো পরীক্ষা করে নিলো। রুমাল, সিগারেট কেস, দেশলাই, মনিব্যাগ আর একটা খাম। খামটা টর্চের আলোয় তুলে ধরে সে দেখলো সাধারণ বালি কাগজের তৈরি। উপরে টাইপ করা রয়েছে: রমেন মজুমদার। তারপর তার শ্যামবাজারের ঠিকানা। খামটা সে খুলে ফেললো। ভিতরে কোনো চিঠি নেই। শুধু লাল কালিতে লেখা রয়েছে: "দুই"। [ক্রমশ]

সত্যিকথার ঝুড়ি

হয়ত বিশ্বাস করবে না, কিন্তু সবগুলোই নিছক সত্যি কথা। প্রত্যেকটি খবরের প্রমাণ পর্যন্ত পাওয়া যায়। আজগুবি মনে হলেই যে আজগুবি হবে তার কোনো মানে নেই। ইংরেজীতে প্রবাদ আছে সত্যি কথা অনেক সময় গল্পকথার চেয়ে আশ্চর্য্য !

(১) একজন মানুষের কত বড় নাম হতে পারে ? ভাবতে পারো, একজন সুলতানের নাম হচ্ছে: (ইংরেজী অক্ষরে লিখছি)—KAMENGKOEBOEWONO-SENOPAITINGALGONGADGURRACHM-ANSAY, DINPANOTAGOMODE, V—ইনি যে দেশের সুলতান সে দেশের নামটাও মজার—DJOC-JOCKARTE.

(২) কাসপার হাউসার বলে ইয়োরোপের এক ভদ্রলোক দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখতে পেতেন।

তিনি ছিলেন রাজার ছেলে, কিন্তু শিশু বয়েসেই রাজ্যচ্যুত হন এবং ১৮ বছর ধরে একটা অন্ধকার ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়।

(৩) এক যে আছে চাষা, তার নাম ফ্রেড্ প্যাট্‌জেল। তার গলা তিন মাইল দূর থেকে শুনতে পাওয়া যায়। অমন গলার জোর পৃথিবীতে নাকি আর কারুর নেই।

(৪) হাঙ্গেরীর এক ভদ্দরলোক, তাঁর নাম জানোস রোভেন্ একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন যার নাম সারা। দুজনে ১৪৭ বছর সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করেছিলেন। মারা যাবার সময় কর্ত্তার বয়েস হয়েছিল ১৭২ আর গিন্নীর ১৬৪।

(৫) চীন-এর এক ভদ্রলোক—নাম তাঁর আ-কিউই নিজের জীবদ্দশাতেই নিম্নতম দশ পুরুষের জন্ম দেখেছিলেন। তিনি যখন মারা যান তখন তিনি ১৩০ জন জীবিত ছেলেমেয়ের ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুর্দার-ঠাকুরদাদা!

(৬) কিছুদিন আগে লিভারপুল সহরে আর্থর পেপার বলে এক ধোপার একটি মেয়ে হয়েছে। আদর করে তার একটা ছোট্ট নাম রাখা হয়েছে। নামটা হল শ্রীমতী Anna Bertha Cecelia Diana Emily Fanny Gertrude Hypatia Inez Jane Kate Louise Maud Nova Ophelia Prudence Quince Rebecca Sarah Teresa Ulysis Venus Winifred Xenophon Yetty Zeno Pepper.

(৭) এক ভদ্রলোক ১৯২৬এ ডাকে একটি চিঠি ফেলেছিলেন। খামের উপর ঠিকানার জায়গায় লেখা ছিলো "ঈশ্বর"। হয়ত রসিকতা করার জন্যেই হবে, বোহেমিয়া থেকে চিঠিটা রোম-এ পাঠানো হল, কেননা রোম হচ্ছে খৃষ্টান পাদ্রীদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি। বিশেষ লাভ হল না। ফেরত এল, ডাকঘরের কর্ত্তারা জানালেন যাঁর নামে চিঠি তাঁর ঠিকানা পাওয়া যাচ্ছে না।

(৮) ইংলণ্ডের ফ্রানসিস পিট্ বলে একজনের একটা বেড়াল ছিলো। বেড়ালটা নাকি একটা ইঁদুরের বাচ্চাকে পুষ্যি নিয়েছিলো।

(৯) ফ্রাঙ্ক ব্রাউন বলে এক পলটনের কপালে গত লড়াইতে একটা গুলি লেগে ফুটো হয়ে গিয়েছিলো। সেই ফুটো দিয়ে এখন নাকি সে হুস হুস করে সিগারেট ফুঁকতে পারে।

ঘুম-পাড়ানী

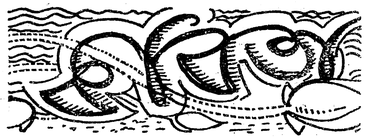

স্নীলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

ফুলেরা এখানে ঘুমিয়ে পড়েছে, কোথায় খোকার ঘুম—
ঘুম-পাড়ানীর মাসী তুমি এসো ;
আকাশের তারা ঘুমিয়ে পড়েছে, চারিদিক নিঝুম :
ঘুম পাড়ানীর মাসী পিসী এসো !
শিশির ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যে সবুজ ঘাসের বুকে,
গাছের পাতারা ঘুমে ঘুমে নিঃসাড়,
চাঁদের আলোও ছড়িয়ে পড়েছে সারা আকাশের মুখে
গন্ধ-বিভোল রজনীগন্ধা ঝাড় !
এইবারে এসো ঘুম-পাড়ানীর যত খোকাখুকু নিয়ে
পাল্কী রেখেছি ঘুম-পাহাড়ের দেশে,
জোয়ান জোয়ান দশ বেহারার পাল্কী রেখেছি গিয়ে
তেপান্তরের ছোট্ট মাঠের শেষে !
ঘড়ির কাঁটায় দুপুর রাত্রি কখন গেছে যে বেজে,—
ক্ষিধে পেয়ে যাবে কারো,
তোমাদের তরে বাটা-ভরা পান যত্নে রেখেছি সেজে,
গালপুরে খেও যত পারো, যত পারো।

শুধু একফোঁটা ঘুম দিয়ে যেও আমার খোকার চোখে,
রাত্রি ঘুমায়, আমার খোকার ঘুম ?—
এত রাত হলো ! কি করে যে ঘুম পাড়াই আজকে ওকে :
ওর চোখে আজ দুষ্টু খেলার ধূম।
ফুলেরা ঘুমায়, শিশির ঘুমায়, পাতারা ঘুমায় রাতে,—
ঘুম-পাড়ানীর মাসী তুমি এসো ;
আকাশের তারা ঘুমায়—পৃথিবী, আকাশ ঘুমায় সাথে :
ঘুম-পাড়ানীর মাসী পিসী এসো !

শাল, সমিয়া, সোয়লো

মহাশ্বেতা ঘটক

পাহাড়ের পাকদণ্ডী বেয়ে বেয়ে পথটা যেখানে সমান জমির কাছে এল, বৃষ্টির জল যেখানে ছোট রেখা এঁকে, মাটির নীচ দিয়ে চলে গিয়ে, একটু জায়গা নরম করে দিয়েছে, সেইখানে পাহাড়ী শালের একটি চারা বের হোল। তখন পাহাড়ে বর্ষা নেমেছে। জলের ঢল্ পাথরের গা বেয়ে নেমে আসে, আর চলে যায়। বড়ো বড়ো সাপ, যাদের গায়ে সবুজ শ্যাওলা রঙের বড় আঁশ, মাথার ওপর লালচক্র আঁকা, যাদের সোনালী-হল্‌দে রঙের ওপর কালো ডোরা কাটা, তারা গাছের গুঁড়ি জড়িয়ে পড়ে থাকে। জলের জোর কমলে ধীরে ধীরে রোদে উজ্জ্বল পিঠ মেলে চলে যায়, শাল তাদের দেখল। মেঘের আভাসে, বনের গহনতম অন্ধকারের সুন্দরী রাজকন্যা দাদা ময়ূরের পেখম-নাচ দেখ্‌ল। পাহাড়ে-বৃষ্টি আর রোদ নীচের আবছা সবুজ অন্ধকার কাটিয়ে তার মাথা উঁচুতে তুল্‌ল। আকাশের মধ্যে এক টুক্‌রো তারার মত স্থিরপক্ষ বাজপাখী, দক্ষিণে বনের সমুদ্র, আর উত্তরে ছোটবড় চূড়া মেলে পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে, এ সমস্ত তার চোখে পড়ল। "বেঁচে আছি এই পৃথিবীতে, তা-ই কত ভালো লাগে ভাব্‌তে।" সুখে আর আনন্দে তার ডাল-পালাগুলি ছড়িয়ে গেল সবুজ পাতায় পাতায়। সুন্দর আর সতেজ প্রকাশে।

পিঠে ছোটো ঝুলি বেঁধে কুড়োল কাঁধে কাঠুরেরা সেই বনে কাঠ কাটতে আসে। দলে দলে তারা আসে। হাসি, গল্পে, গানে, সারাদিন চঞ্চল গতিতে তারা কাজ করে। সন্ধ্যার আগে পিঠে কাঠ বোঝাই করে ফিরে যায়। সবচেয়ে পেছনে একজন মেয়ে আসে, একটি ছোটো মেয়েকে পিঠে করে। তার পা খোঁড়া, তাই তার দিদি তাকে এনে শালের গোড়াতে বসিয়ে দেয়। সারাদিন কাজ করে, আবার পিঠে নিয়ে ফিরে যায়। প্রথম প্রথম মেয়েটিকে দেখে শালের ভারী আশ্চর্য লেগেছিল। কিন্তু, পরে নীল চোখ, কালোচুলের নীচে তার বিষণ্ণ শুভ্র মুখ সে দেখল। সারাদিন সে শালের গায়ে হেলান দিয়ে বসে থাকৃত। ছোটো একটা টিনের পাখী নিয়ে খেলা করত। অনেক ছেলেমেয়ে আসত কাঠুরিয়াদের সঙ্গে, তারা ওর সঙ্গে কথা বল্‌তনা। আস্তে আস্তে শাল তার নাম জান্‌ল, তার দিদি তাকে ডাকত, "সমিয়া," বলে।

বর্ষা গেল। শরৎ এল। বন্যশেফালী আর বাসোন্ ফুল ফুটল, বনের নীচের অন্ধকার, যেখানে আগে শুধু পাহাড়ী সাপ আর শয়তান চিতার ভয় ছিল, এখন যেন গন্ধে সেখানকার বাতাস ভারী হয়ে হয়ে উঠল। রাত্রে অপূর্ব্ব হিম অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় কোহারুণী পাখী ডেকে ডেকে সারা হোল। ক্লান্ত হয়ে গাছের গর্তে তারা যখন ঘুমোতে গেল, তখন শীত এসেছে। সাপেরা ঘুমোতে গেল, পাখীরা ঘুমোতে গেল, পাথরের গর্তের ফাঁকে ভালুক, নেকড়ে আর হায়েনারা ঘুমিয়ে পড়ল। উত্তর থেকে বাতাস ছুটে এল, পাতা ঝরে ঝরে মাটি ঢেকে গেল। কাঠুরেরা এখন পাতাকুড়োনতে ব্যস্ত। সামিয়ার ছেঁড়াজামার

ফাঁকে হাত শীতে নীল হয়ে গেছে। 'আমার যদি অনেক পাতা থাকত, তবে ওকে ঢেকে দিতাম', শাল মনে মনে ভাবল।

যখন বরফ পড়া সুরু হবে, তখন এক সন্ধ্যায় পাহাড়ের শেষ পার থেকে সোয়ালো পাখীরা এল। সমস্ত শীতকাল সমতলে কাটিয়ে, বসন্তে তারা পাহাড়ে ফিরবে। সকালে তারা এগাছে ওগাছে বসল, সারাদিন বন তাদের কিচি-মিচিতে মুখর হয়ে রইল। একটি ছোট পাখী সমিয়ার সামনের জমিতে মাটি খুঁটে বেড়াচ্ছিল। 'কি আশ্চর্য সুন্দর পাখী,' সমিয়া তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। বল্‌ল, "সুন্দর পাখী, তুমি কোথায় যাবে?" "এখন আমরা যাচ্ছি নীলগাই আর সম্বর হরিণের দেশে। সেখান থেকে যাবো নদীর চরে। সারা শীতকাল থাকব সেখানে।" "আমার কেন পা নেই, তাহলে আমি তোমার সঙ্গে যেতাম।" সোয়ালো অবাক হয়ে তার নীল বিষণ্ণ চোখ দেখল। "শোনো, মানুষের মেয়ে, শীতের পরে আমরা আসব, এই পথ দিয়ে যাব। যে সব দেশ দেখব, আর যে সব জায়গায় যাব, সব গল্প শোনাব আমি তোমায়। তুমি এইখানে যদি থাকো তবে আবার যখন আসব তখন দেখা হবে।"

সমিয়ার সেই সর্বদা বিষণ্ণ চোখ একটু উজ্জ্বল দেখাল, আর সে ঝুঁকে সোয়ালোয় পাখায় তার ঠোঁট ঠেকাল।

সন্ধ্যার সময় সমিয়াকে তার দিদি নিয়ে গেল বাড়ীতে। ছোট্ট সোয়ালো, শাল গাছের গর্তে ঘুমিয়ে পড়ল। আর তীব্র শীতের হাওয়ায় কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শাল সেইসব দেশের স্বপ্ন দেখ্‌তে লাগল। যেখানে রৌদ্র তপ্ত বালুতে কুমীর রোদ পোহায়, মাছরাঙা মাছ ধরে, নানা পাখী নানা গাছে ভরা, নানা জানা অজানার সুন্দর সেই দেশের স্বপ্নে তার রাত কেটে চল্‌ল। যখন ভোর হোল তখন সমস্ত বনের মাথা সাদা করে বরফ পড়ছে। গুঁড়ো গুঁড়ো রূপালী কণা ঝরে পড়ছে, নিঃশব্দে গাছে গাছে সাদা কঠিন ফুলের স্তবক ফুটে উঠ্‌ছে। ফুল ফুট্‌ উঠ্‌ছে নানা রঙের। নদীর জলে রোদ পড়ে নানা রঙের আলো খেলে যাচ্ছে। সেই নদীর চরে সুখে আর আরামে শীত কেটে গেল সোয়ালোর। সারা শীতকাল তারা পোকা-মাকড় খেলো। বড়ো গাছের কোটরে ঘুমোল। বড়ো সবুজ প্রজাপতির সঙ্গে গল্প করল দিনে, আর রাতে তাদের দেশের গল্প করল, যেখানে যাবার দিন তাদের কাছে এসেছে।

একদিন সন্ধ্যায় খুব তুষার ঝড় হোল। কাঠুরেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। ঝড়, ঝড়, বরফে বনের জমি ঢেকে গেল একেবারে। শাল গাছের নীচে সমিয়া ঘুমিয়েছিল, তার দিদি তাকে কত খুঁজল ঝড়ের দিন, অনেক বরফের নীচ থেকে সামিয়া সে স্বর শুনতে পায়নি।

শাল সব জানল। আর শীত শেষ হয়ে যখন বসন্ত এল, বরফ গলার সাথে সাথে একটুখানি লালজামা বেরিয়ে পড়ল। কাঠুরেরা বরফের তলা থেকে সমিয়াকে বের করল।

তারা বল্‌ল, "আজ রাতটা এইখানে থাক, কাল করব দেব।" আর অনেক রাতে, সমস্ত বন মথিত করে পাখার শব্দ ছুটে এল। শীতে যে পাখীরা এসেছিল, তারা ফিরে চলেছে। সেই ছোট্ট সোয়ালো, সে এখন অনেক বড় হয়েছে, শাল গাছে এসে বসল। পাখী তাকে চিনেছে দেখে শালের খুব খুসী লাগল। সারা রাত পাখী তার শীতের দিনগুলির কথা বল্‌ল। পরে যখন রাত ফিকে হয়ে আসছে, তখন বল্‌ল, "আমরা এখন বাসা বাঁধ্‌তে চলেছি, আর দেরী করব না। সেই ছোট মেয়েটিকে আমার কথা বোল, বোল আমি তাকে ভুলিনি।"

সূর্যের প্রথম আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে সোয়ালো পাখীর দল বন ছেড়ে উঠল, আর উত্তর দিকে উড়ে চলল।

আরও যখন রোদ পরিষ্কার হোল, তখন কাঠুরিয়ারা এল। সমিয়ার বোন এল কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে। সমিয়ার চুলগুলি গুছিয়ে তাকে আদর করল কপালে। তারপর সেই শালগাছকে কাটল কাঠুরিয়ারা, তার ডাল ছেঁটে

দিয়ে দিয়ে সুন্দর একটা খাটিয়া বানাল তারা। সমিয়াকে তাতে তুলে, তারা নিয়ে গেল কিছুদূরে। সেইখানে একটা বড় পাথরের ছায়ায় তাকে গর্ত খুঁড়ে শোয়াল। সেইখান থেকে শাল ওপরে আকাশ দেখল। তারপর মাটির নীচে সে আকাশ বন্ধ হয়ে গেল। কালো ধোয়া অন্ধকারের নীচে যেখানে তারা শুয়ে আছে, সেই বন ছাড়িয়ে, তার উত্তরে পাহাড় ছাড়িয়ে, আরও দূরে, বসন্ত এসেছে সে দেশে, সে দেশে সোয়ালোরা তখন ঘর বাঁধ্‌তে সুরু করেছে। [বিদেশী গল্প]

মজার হিসেব

১×৯+২=১১
১২×৯+৩=১১১
১২৩×৯+৪=১১১১
১২৩৪×৯+৫=১১১১১
১২৩৪৫×৯+৬=১১১১১১
১২৩৪৫৬×৯+৭=১১১১ ১১
১২৩৪৫৬৭×৯+৮=১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮×৯+৯=১১১১১১১১১
১২৩৪৫৬৭৮৯×৯+১০=১১১১১১১১১১

আর একটা মজার হিসেব

১২৩৪৫৬৭৮৯×৮+৯=৯৮৭৬৫৪৩২১
১২৩৪৫৬৭৮×৮+৮=৯৮৭৬৫৪৩২
১২৩৪৫৬৭×৮+৭=৯৮৬৫৪৩
১২৩৪৫৬×৮+৬=৯৮৭৬৫৪
১২৩৪৫×৮+৫=৯৮৭৬৫
১২৩৪×৮+৪=৯৮৭৬
১২৩×৮+৩=৯৮৭
১২×৮+২=৯৮
১×৮+১=৯

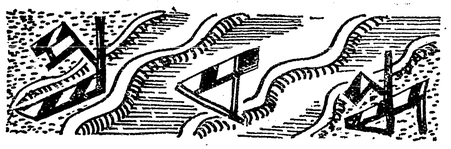

লিউএনহুক্

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

(ক্রইফ্‌-এর লেখা অবলম্বনে লিখিত)

সে অনেকদিন আগেকার কথা। প্রায় শ তিনেক বছর হতে চল্‌ল। তখনকার দুনিয়ার কথা ভাবলে আজকে আমাদের কেমন যেন আজগুবি মনে হয়। সমস্ত ইয়োরোপে তখন কুসংস্কার আর অন্ধবিশ্বাসের রাজত্ব; আর মানুষ এমন গোঁড়া ছিল যে নতুন কথা শুনতেই চাইতো না; নতুন জ্ঞান আসবার সমস্ত পথ প্রায় বন্ধ করে রাখতে চাইতো। তাদের সব অন্ধ কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কেউ কথা বলতে গেলে রাজা-উজির পাত্র-মিত্র সব ক্ষেপে উঠত, বলতো—'মারো, মারো। কোথাকার নাস্তিক এসেছে। দেশকে উচ্ছন্নে দেবে। একেবারে উচ্ছন্নে দেবে।' এ সব সত্ত্বেও কেউ যদি সাহস করে নতুন কথা বলতে পারতো তা হলে তার ভবিষ্যৎ ভয়াবহ হয়ে উঠত। গ্যালিলিও বলে একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ছিলেন; তিনি লোককে বোঝাতে যান যে পৃথিবীটা ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। আর যায় কোথায়? লোকজন একেবারে ক্ষেপে উঠল, বলল—নাস্তিক, ঘোরতর নাস্তিক, ধর্মের পুঁথিতে যে কথা আছে তা না বলে নতুন কথা বলতে যাওয়া? জেলে দাও, বন্দী করো। আর সত্যিই, জেল হল, আজীবনের মত জেল, যদিও তিনি ছিলেন পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী—আর তাঁর অপরাধ, অন্ধ কুসংস্কারকে না মেনে তিনি শুধু জ্ঞানের কথা মানুষের মধ্যে প্রচার করতে চেয়েছিলেন। তোমাদের বোধ হয় আজ বিশ্বাসই

হবে না—তবু শ তিনেক বছর আগে পৃথিবীর অবস্থা বাস্তবিকই এই রকম ছিলো। আর একজন পণ্ডিতের কথা ধরো : তাঁর নাম সার্ভেণ্টাস, শরীর বিদ্যা শেখবার জন্যে তিনি একটা মৃতদেহ কেটে দেখেছিলেন, আজকাল ডাক্তারী পড়বার ছাত্ররা যে-রকম হামেসাই দেখছে। কিন্তু দেশের লোক বললে সর্বনাশ, এ যে দেখছি নাস্তিক-চূড়ামণি, এর অসাধ্য কিছু নেই, এ যে মানুষ খুন করতে পারে! পুড়িয়ে মারো, পুড়িয়ে মারো একে! আর সত্যিই পুড়িয়ে মারা হল তাঁকে!

আজকের দিনে কলকাতার সহরে দাঁড়িয়ে তোমাদের পক্ষে এ সব কথা বিশ্বাস করা কঠিন হবে, জানি। কেননা, অন্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে দীর্ঘ লড়াই চলেছিলো সে লড়াইতে বিজ্ঞানেরই জিৎ হয়েছে, মানুষ আজ বিজ্ঞানকে মানতে মোটামুটি রাজি হয়েছে। তোমরা দেখেছ বিজ্ঞানের জিৎ—তোমাদের অসুখ করলে বাবা মা আজ ডাক্তার ডাকেন, মাদুলী-কবচের আশায় সিদ্ধবাবার কাছে ছোটেন না। কিন্তু, এই সেদিনও অবস্থা ছিলো অন্য রকম, বিজ্ঞানকে মানুষ সহজে মানতে চায় না।

যাই হোক, শ তিনেক বছর আগেকার কথা বলছিলুম, ইয়োরোপের কথা। তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে অন্ধ কুসংস্কারের লড়াই সবে সুরু হয়েছে, কিন্তু মানুষের টান তখনো কুসংস্কারের দিকেই। তাই যাঁরা বিজ্ঞানের পক্ষপাতী তাঁরা ধরা পড়বার ভয়ে লুকিয়ে বিজ্ঞানের চর্চা করতেন। ইংলণ্ডে এই রকম কয়েকজন লোক একটা গোপন সভার বন্দোবস্ত করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন—'ইন্‌ভিসিব্‌ল্ কলেজ'—অদৃশ্য কলেজ। সভার কাজ চলতো একেবারে গোপনে, কেন না ভয় ছিলো লোক জানাজানি হলে লাঞ্ছনার শেষ থাকবে না। কিছুদিন পরে, বিজ্ঞানের জয় যখন অনেকটা পাকা হল, তখন সে সভার পণ্ডিতরা দেখলেন আর অদৃশ্য থাকবার দরকার নেই। লোকের সামনে আত্মপ্রকাশ করলে এখন আরে তেমন ভয় নেই। "ইনভিসিব্‌ল্ কলেজে"র নাম বদলে নতুন নাম হল "রয়েল সোসাইটি"। ইংলণ্ডে এই রয়েল সোসাইটি আজও সবচেয়ে বড় বৈজ্ঞানিকদের সভা : এখানে সভ্য হতে পারা একজন বৈজ্ঞানিকের জীবনে মস্ত বড় গৌরবের কথা।

এই রয়েল সোসাইটিতে হঠাৎ একদিন এক খবর এসে উপস্থিত। এ্যাণ্টনী লিউএন্‌হুক বলে এক ভদ্রলোক নাকি এক অদ্ভুত যন্ত্র বের করে তার মধ্যে দিয়ে অসম্ভব ক্ষুদে ক্ষুদে এক ধরণের জীব আবিষ্কার করেছেন, এতই ক্ষুদে যে শুধু চোখে দেখাই সম্ভব নয়। কেউ বিশ্বাস করল, কেউ করল না; কেউ বা মুখ গম্ভীর করে ভাবতে বসল, কেউ বা হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল। কিন্তু হেসে উড়িয়ে দেওয়া ত সত্যিই চলে না, ঠিক হল খবর নিয়ে দেখতে হবে কে এই লিউএন্‌হুক।

কে এই লিউএন্‌হুক? সে এক ভারি মজার লোক! নিবাস হল্যাণ্ড, ব্যবসা মুদির দোকান। সত্যিই একজন মুদি, এমনিতে লেখাপড়া খুব যে কিছু করেছেন তা মোটেই নয়। তবু অদ্ভুত ধরণের লোক। খামখেয়ালী বলতে চাও বলতে পারো তাঁকে। কিন্তু তাঁর খামখেয়াল দুনিয়ার সমস্ত ধারণা যেন বদলে দিতে চায়; অতি ক্ষুদে এক ধরণের জিনিষ আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু এ আবিষ্কার আমেরিকার মত মহাদেশ আবিষ্কার করবার চেয়ে কম নয়।

একটু অশিক্ষিত ধরণের লোক। কেন না, তখনকার দিনে শিক্ষিত সমাজে যে ভাষা প্রচলিত ছিলো—ল্যাটিন ভাষা—তা তাঁর জানা ছিলো না। পুঁথি বোধ হয় মাত্র একখানা পড়েছিলেন—শুধু ডাচ্ ভাষায় লেখা বাইবেল-এর তর্জমা!

কিন্তু কেমন করে আবিষ্কার করলেন বলচি শোনো। তিনি শুনেছিলেন ঝকঝকে পরিষ্কার কাঁচ খুব সাবধানে ঘষে তার থেকে ছোট্ট 'লেন্স' তৈরি করলে সেই লেন্স-এর মধ্যে দিয়ে ছোট জিনিষকে খুব বড় করে দেখতে পাওয়া সম্ভব। শুধু চোখে যে জিনিষ যত বড় দেখায় এই লেন্সের মধ্যে দিয়ে সে জিনিষকে অনেক বড়ো করে দেখতে পাওয়া

যায়। তা হলে একটা লেন্স কিনে ফেলা মন্দ কথা নয়। কিন্তু, উঁহু। লিউএন্‌হুক তাতে মোটেই রাজি নন। মনে মনে তিনি সব কিছুকে সন্দেহ করতেন, সন্দেহ করতেন সমস্ত লোককে। ভাবলেন, কেনা লেন্স ভালো নাও হতে পারে। তাই লেন্স যদি দরকারই হয় তা হলে নিজে হাতে তৈরি করাই সবচেয়ে ভালো। চশমার দোকানে ঘুরে কাঁচ কি করে ঘষতে হয় শিখে ফেললেন, স্যাকরার দোকানে গিয়ে শিখলেন কেমন করে সোনা রূপো ইত্যাদির কাজ করতে হয়। তারপর, নিজের তৈরি লেন্স দিয়ে নিজে হাতে বানালেন তাঁর অনুবীক্ষণ! আজকের দিনে বাজারে কিছু নগদ টাকা নিয়ে বেরুলেই একটা অনুবীক্ষণ কিনে বাড়ি ফেরা যায়; কিন্তু পৃথিবীতে প্রথম যিনি মাইক্রোস্কোপ তৈরি করলেন তাঁর কথা ভেবে দেখো একবার! দিন নেই, রাত নেই, শুধু নিজের মাথা খাটিয়ে একটা অনুবীক্ষণ তৈরি করা—বড় সহজ কথা নয়। পাড়ার লোক অবশ্যই হাসাহাসি সুরু করল, ভাবল এ লোকটার মাথায় নিশ্চয়ই একটু ছিট আছে তা না হলে রাত দিন অমন করে কি? কিন্তু পাড়ার এ সব খোসগল্পে কান দেবার মত সময় লিউএন্‌হুকের সত্যি ছিলো না; তিনি করে চললেন নিজের কাজ—আত্মীয়ের কথা বন্ধুর কথা, কারুর কথাই তাঁর মনে রইল না।

তারপর একদিন হল্যাণ্ডের সেই মুদির মুখে হাসি ফুটে উঠল, তৃপ্তির হাসি। অত চেষ্টা সফল হয়েছে; শেষ হয়েছে অনুবীক্ষণ গড়া! তারপর সেই নিজে হাতে তৈরি অনুবীক্ষণ নিয়ে তিনি একেবারে ছেলেমানুষের মত যা পান তাই দেখতে সুরু করলেন। তিমি মাছের মাংস-পেশী, নিজের গায়ের চামড়া, কসাইখানা থেকে জোগাড় করা মরা ষাঁড়ের চোখ, ভেড়ার গায়ের লোম, মাছির মগজ, বোলতার হুল, উকুনের ঠ্যাং—এই রকম নানান ধরনের জিনিষ। আর যত দেখেন তত অবাক হন,—শুধু চোখে জিনিষগুলোকে যা মনে হত আসলে সেগুলো তা মোটেই নয়!

এই সব নানান রকম আজগুবি জিনিষ দেখতে দেখতে ভদ্রলোক যেন ক্ষেপে গেলেন। মাথা খারাপ ছাড়া আর কি বলবে বলো? নইলে পরিষ্কার জলের মধ্যে কি আছে তা দেখবারও সখ হয় মানুষের? কিন্তু সত্যিই সে সখ দেখা গেল লিউএন্‌হুকের! লিউএন্‌হুকের মেয়ের নাম ছিলো মারিয়া, তখন তার বয়েস মাত্র উনিশ। লোকে যে যাই বলুক, তার আধপাগলা বাবাকে বড় ভালবাসত মারিয়া। আর দিনরাত বাবাকে প্রাণপণে যত্ন করতো। তা নইলে অমন আধপাগলা ভদ্রলোকের চলবে কেমন করে? একদিন মারিয়া দেখল বাবার অদ্ভুত নতুন সখ হয়েছে : কাঁচের একটা নল আগুনে গরম করে গনগনে লাল করেছে আর তারপর সেটাকে টেনে টেনে সরু করে চলেছে। নলটা শেষ পর্য্যন্ত চুলের মত সরু হয়ে গেল। তারপর মারিয়া দেখল বাবা সেই সরু কাঁচের নলটাকে ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙ্গে ফেলল আর সেই ছোট টুকরোগুলো নিয়ে গেল বাগানে। বাগানে একটা মাটির গামলা ছিলো, তাতে বৃষ্টির জল জমে ছিলো। মারিয়া দেখল বাবা সেই গামলার উপর ঝুঁকে পড়ে নলগুলোয় মুখ দিয়ে টেনে টেনে বৃষ্টির জল ভরে নিল তারপর ফিরে এল নিজের অনুবীক্ষনটার কাছে। মারিয়া ত অবাক! বাবা বেচারার হল কি? সত্যি কি মাথা খারাপ হয়ে গেল? মারিয়া দেখল বাবা সেই সরু সরু নলগুলো অনুবীক্ষণে আটকে পরম মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করছে। কী আশ্চর্য্য! জলের মধ্যে আবার দেখবার কি আছে? জলে ত' শুধু জল আছে? আর কি থাকতে পারে? তারপর হঠাৎ মারিয়া শুনতে পেলো বাবা উত্তেজনায় চীৎকার করছে—'দৌড়ে আয়! দেখবি আয়! এই বৃষ্টির জলে ক্ষুদে ক্ষুদে জীব রয়েছে! তারা সাঁতার দিচ্ছে; তারা খেলা করছে! কী অসম্ভব রকম ক্ষুদে ক্ষুদে এই জীবগুলো! শুধু চোখে যে পোকা দেখতে পাওয়া যায় তার চেয়ে হাজার গুণ ছোট!' হল্যাণ্ডের অশিক্ষিত মুদি, মারিয়ার আধপাগলা বেচারা বাবা—সে কিনা আবিষ্কার

করল পৃথিবীর এক অতি আশ্চর্য্য রাজত্ব—ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব!

এই সব ক্ষুদে ক্ষুদে জানোয়ার, লিউএন্‌হুক দেখলেন, সর্ব্বত্রই যেন ছড়ানো রয়েছে। হয়ত তিনি একটু ক্ষ্যাপা ছিলেন বলেই অসম্ভব সব জায়গাতেও এদের সন্ধান করে চললেন। যেমন ধরো, তাঁর নিজের দাঁত। তিনি প্রত্যেক সকালে ভাল করে নুন দিয়ে দাঁত মাজতেন, তারপর কাপড়ের টুকরো দিয়ে দাঁত ঘসে আরও পরিষ্কার করতেন। তবুও আয়নায় নিজের দাঁত ভালো করে পরীক্ষা করে আবিষ্কার করলেন ফাঁকে ফাঁকে এক রকম সাদা সাদা জিনিষ রয়েছে। কি জিনিষ এটা? অমনি লিউএন্‌হুকের মন চনমন করে উঠল; দাঁত খুঁচিয়ে একটু সাদাটে জিনিষ বের করলেন, খুব পরিষ্কার জলে সেটা মেশালেন আর তারপর দোর বন্ধ করে অনুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে বসে পড়লেন। তিনি দেখলেন, স্পষ্ট দেখলেন জলের মধ্যে একটা অতি ক্ষুদে জীব মাছের মত সাঁতার কাটছে, তারপর তাঁর চোখে পড়ল আর একটা তারপর আবার একটা—ক্রমশঃ অনুবীক্ষণে চোখ দিয়ে বসে থাকতে থাকতে তাঁর চোখ টনটন করতে লাগল। কিন্তু তবু এমন অপূর্ব্ব দৃশ্য ছেড়ে উঠতেও তাঁর মন একেবারে সরছিলো না; কেননা, একের পর এক ক্রমশঃ একেবারে একঝাঁক জীবকে তিনি আবিষ্কার করলেন সেই জলের মধ্যে। কী আশ্চর্য্য? এগুলো সবই ত' তা হলে এসেছে দাঁতের ফাঁক থেকে। তাহলে, অত ভালো করে দাঁত মাজলেও দুটো দাঁতের ফাঁকে এক অদৃশ্য চিড়িয়াখানা দিব্বি লুকিয়ে থাকে! তাজ্জব ব্যাপার নয় কি?

কিন্তু লিউএন্‌হুকের একটা ভারি মজার বাতিক ছিলো। অল্পে সন্তুষ্ট হতে তিনি কিছুতেই রাজি ছিলেন না। একবার নিজের দাঁতে ক্ষুদে ক্ষুদে জীব আবিষ্কার করেছেন বলেই সে সর্ব্বত্র সকলের দাঁতের ফাঁকে এ ধরণের জীব আছে তা মানতে তিনি কিছুতেই রাজি নন। পরীক্ষা করে দেখতে হবে, নানান লোকের দাঁতের মধ্যে থেকে খুঁচিয়ে সাদা জিনিষ বের করে অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

"নিজের দাঁতের মধ্যে থেকে ক্ষুদে জীব বের করে পরীক্ষা করতে করতে একদিন তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। ভাবলেন একটু বেড়িয়ে আসা যাক। গেলেন নদীর ধারে বেড়াতে—রূপোলী নদীর উপর গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়ছে। চমৎকার লাগে। একটু বসে জিরিয়ে নেবেন ভাবলেন। কিন্তু ও রকম আধপাগলার কপালে বিশ্রাম যে লেখা নেই। তিনি নদীর ধারে বসেছেন আর কপালগুনে এক বুড়ো সেখানে উপস্থিত। উৎসাহে লিউএন্‌হুক একেবারে লাফিয়ে উঠলেন। যেমন মানুষ তিনি চান এ বুড়ো একেবারে ঠিক সেই রকমের মানুষ। জীবনে একদিনও দাঁত মাজে নি, তাই দাঁতের উপর জমে রয়েছে পুরু ছাৎলা। ওঃ, কত অসংখ্য জীব খেলা করছে এই বুড়োর দাঁতের পুরু ছাৎলার মধ্যে! ভাবতেই লিউএন্‌হুকের প্রায় রোমাঞ্চ হল, বুড়োকে আদর করে টেনে নিয়ে চললেন নিজের বাড়ি। দাঁতের ছাৎলার জন্যে মানুষের এত খাতির হতে পারে বুড়ো তা কল্পনাই করতে পারে নি। বিশ্রামের কথা চুলোয় গেল, বাড়ী ফিরে লিউএন্‌হুক সুরু করলেন বুড়োর দাঁত থেকে ছাতা তুলে পরীক্ষা—বুড়ো নিশ্চয়ই ছাতাপড়া দাঁত বের করে অবাক হয়ে বসে রইল। অবশ্যই আবিষ্কৃত হল ক্ষুদে জীব; কিন্তু যে ব্যাপারটা লিউএন্‌হুকের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য ঠেকল তা হচ্ছে এ বুড়োর দাঁতে যে প্রকাণ্ড চিড়িয়াখানা তার জানোয়ারদের চেহারা তাঁর নিজের দাঁতের জানোয়ারদের চেয়ে ভিন্ন!

হল্যাণ্ডের এই পাগলা মুদির গল্প আরও অনেক বলা যায়। তিনি প্রায় শ খানেক অনুবীক্ষণ বানিয়েছিলেন, দিনরাত সেই সব অনুবীক্ষণের সাহায্যে খোঁজ করতেন ক্ষুদে শয়তানদের, আর অজস্র রকম ক্ষুদে শয়তান আবিষ্কার করেছিলেন। তখনকার ইয়োরোপের পণ্ডিতমহল একেবারে হাঁ হয়ে গিয়েছিলো লিউএন্‌হুকের আবিষ্কারের কথা শুনে। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত সকলের কাছেই এই ক্ষুদে জীব শুধু একটা কৌতূহলের জিনিষ হয়েছিলো। ভারি নতুন! ভারি মজার! কিন্তু ওই পর্য্যন্তই! তারপর, দিনের পর দিন এই সব ক্ষুদে প্রাণী নিয়ে পৃথিবীর মহা মহা পণ্ডিত আরও কতরকম কথা আবিষ্কার করে চলেছেন। জীবাণু নিয়ে এত সব মোটা মোটা বই লেখা হয়েছে যে ঘরের পর ঘর বোঝাই করলেও শেষ করা কঠিন!*

* দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের "ক্ষুদে শয়তানের রাজত্ব" শীঘ্রই প্রকাশিত হবে। রংমশালে যতটুকু বেরিয়েছিলো তার চেয়ে ঢের বেশী কথা বইতে পাবে আর পাবে নানান ছবি!

ছেলেবেলার স্বপ্ন

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বর্ষাকাল। আমি ঝাউ গাছের তলা দিয়ে যাচ্ছি। পাশে এক নদী। তাতে খুব জল। ওপারের দিকে দেখে মনে হলো বোধ হয় বৃষ্টি পড়েছে। কাজেই আমি আর বেশি দেরী করলাম না। ভাবলাম ভিজে গেলে বোধ হয় মা আমাকে বকবেন। তখন এদিকেও প্রায় বৃষ্টি নেমে এলো। পাশেই দেখি বাবা আসছেন। কিন্তু বাবা আমাকে দেখতে পেলেন না। কারণ তিনি বৃষ্টির ভয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি যাচ্ছেন। আমি পিছন থেকে বাবা! বাবা! বলে ডাকলাম। বাবা পিছন ফিরে বল্‌লেন, "আরে খোকা যে! শীগ্‌গির চল, বৃষ্টি যে নেমে এলো।" তখন খুব হাওয়া দিচ্ছিল। পাশে কয়েকটা বাঁশ ঝাড়ে মড়মড় আওয়াজ হচ্ছিল। বাবা বল্‌লেন, "এখনও অনেক দূর আছে খোকা, হাঁটতে পারবে তো? না নৌকোতে চড়ে যাবে?" আমি বল্‌লাম, "নৌকোতেই যাই, আমি কোনো দিনও নৌকোতে চড়িনি।" বাবা একজন মাঝিকে ডেকে বল্‌লেন, "ওহে, আমাদের একটু দক্ষিণ পাড়ায় পৌঁছে দিতে পারবে?" "যদি যান তবে, শীগ্‌গির উঠুন, এখুনি বৃষ্টি নাম্‌বে।" যেতে যেতেই গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নাম্‌লো। তখন প্রায় বাড়ির কাছে এসে গেছি। তারপর যখন পৌঁছলাম তখন মাঝি নৌকো থামিয়ে নৌকটা গাছে বেঁধে সেও বাড়ি গেল। আমরাও বাড়ি পৌঁছবার জন্যে তাড়াতাড়ি হাঁটতে সুরু করলাম।

* * * *

বাড়ি যেতেই মা জিজ্ঞেস করলেন: এত দেরি হোলো কেন? আমি বল্‌লাম বৃষ্টি পড়ছিল কিনা। তারপর নৌকো করে এসেছি। মাঝিও জোরে চালাতে পারছিল না। কারণ, আবছা আবছা দেখা যাচ্ছিল। তারপর ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি নামল। তারপর আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

* * * *

তারপর দিন দেখি আমরা যেখানে খেলি সেখানে জল জমে আছে। আমার উঠে খুব ভালো লাগল কারণ সূর্য উঠে গেছে। কদমগাছের ফুলগুলো ঝরে পড়ে রয়েছে। তারপরেই পড়তে বসলাম কারণ ইস্কুলে যেতে হ'বে। কিছু পরে ইস্কুলে গেলাম। ছুটি হোলে পর বাবা আমাকে

ইস্কুল থেকে নিয়ে গেলেন। তখন খুব মেঘ করেছে। রোজ রাত্তিরে আমি দাদুর কাছে গল্প শুন্‌তাম আর ঘুমিয়ে পড়তাম। এমনি করে দিন বেশ আরামে কাটে। যেদিনই বৃষ্টি হোতো সেদিন দাদুর কাছ শুন্‌তাম :

"বিষ্টিপড়ে টাপুরটুপুর নদেয় এলো বান,
শিবঠাকুরের বিয়ে হোলো তিন কন্যা দান।"

* * * *

এত দিন একা একা দিন কাটাতে হোতো। একদিন আমার একটি সঙ্গী জুটল। সে আমারই সঙ্গে পড়ে, তার নাম ছিল প্রিয়। বন্ধুটি খুবই ভালো। একদিন দাদুর কাছে গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়লাম। ভোর বেলায় দেখি মেঘ করে আছে। বেশ শীত করতে লাগল। আগের থেকেই জেনে রাখলাম যে আজ "বিষ্টি পড়ে টাপুরটুপুর" শুনবো। আমাদের টিনের চালের উপর বৃষ্টি পড়লেই টুপটাপ আওয়াজ হয়। আর বাঁশ মড়মড় করে। সেদিন ছিল রবিবার। দেখি বাবা আমার জন্যে খুব রঙচঙে একটা বই এনে দিলেন। আমি বাবার হাত থেকে নিয়েই পড়তে সুরু করে দিলাম। বইটা পড়তে পড়তে নামলো দারুণ ঝড়। হঠাৎ মড়মড় করে আমাদের বাড়ির চালের ওপর পড়ল এক ডাল। সে কি আওয়াজ! সেদিন দাদুর কাছে যে ছড়া শুনবো বলে আশা করেছিলাম তার বদলে শুনলাম :

"দিনের আলো নিবে এলো
সূয্যি ডোবে ডোবে।"

ওমনি দিনে ঐ সব কবিতাই আমার ভালো লাগতো।

তারপর দিন আমি আর প্রিয় এক সঙ্গে ইস্কুলে গেলাম। প্রতি রবিবার আমি আর প্রিয় ঝাউগাছটার তলায় বসে গল্প করতাম। সেদিন দেখি কদম গাছটা ফুলে ভর্তি হয়ে গেছে। ঝাউগাছটার পাতা ডালটাল বেশি নেই। সেই নদীটা কানায় কানায় ভর্তি। পরদিন ঠিক ইস্কুলে যাওয়ার সময় নামলো বৃষ্টি কাজেই আর ইস্কুলে যাওয়া হোলো না। সন্ধ্যার পর খেয়ে দেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। মনে হোলো ভোর হয়ে গিয়েছে। কোথায় নতুন দেশে এসেছি। ফুলের বনে সুন্দর ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। তার মধ্যে প্রিয়কেও দেখ্‌তে পেলাম। আমিও তাদের সঙ্গে খেলা সুরু করে দিলাম। একটা গাছে উঠেছি ফুল পাড়তে, হঠাৎ মনে হোলো ডালটা নুয়ে পড়ল ; ভয় হোলো পাছে ভেঙে যায়। শক্ত করে ডালটা জড়িয়ে ধরতেই মা বলে উঠলেন, "কি রে?" দেখি মায়ের কোলে শুয়ে আছি, আর ভয়ে ভয়ে মাকেই জড়িয়ে ধরেছি।

এক যে আছেন যোদ্ধা, দুনিয়ার একজন পয়লা নম্বরের যোদ্ধা। বয়েস তাঁর ৭৮ বছর হল, দাঁত পড়ে গিয়েছে। ক্ষীণ দুর্বল শরীর, কণ্ঠার হাড়গুলো গোনা যায়। ঢাল নেই তরোয়াল নেই,—বন্দুক কামান এ্যাটমবম্ অনেক দূরের কথা। বুট জুতো নেই, পা খালি। গায়ে খাকি কোর্তা নেই, গা খালি। আর যেটা সবচেয়ে মজার ব্যাপার, শত্রুর সামনে তাঁর নির্ভিক দুর্বল শরীর নিয়ে যখন তিনি দাঁড়ান তখন তাঁর মুখে না থাকে রাগ, না থাকে হিংসে, না থাকে ঘৃণা! নির্মল হাসি, শিশুর মত নির্মল—সেই হাসিভরা মুখ নিয়ে বিপক্ষকে আহ্বান করেন—হাতাহাতি করতে নয়, হাতাহাতি করায় তিনি যে বিশ্বাসই করেন না। তাঁর যে বিপক্ষদল তারা বড় কম নয়। তাদের আছে লক্ষ ফৌজ, আছে অসংখ্য কামান, আছে অজস্র ট্যাঙ্ক আর এয়ারোপ্লেন, জাহাজ আর জাহাজ বোঝাই বোমা। তবুও সন্ত্রস্ত। এত বিরাট ফৌজ নিয়ে, এত সরঞ্জাম নিয়ে তবুও এক ক্ষীণ দুর্বল বৃদ্ধ যোদ্ধা সম্বন্ধে একেবারে সন্ত্রস্ত। কে এই যোদ্ধা? গান্ধীজী। কিসের জন্যে তাঁর যুদ্ধ? রাজ্য?

অর্থ? সুখ? কোনটাই নয়। দেশ। নিজের দেশ, নিজের দেশের মানুষ,—লুণ্ঠিত, বঞ্চিত, অসহায় কোটি কোটি ভারতবাসী। তাদের জন্যে চাই অন্ন, চাই বস্ত্র, চাই মুক্ত আকাশ। সে আকাশে তারা বুক ভরে নিশ্বেস নিতে পারবে। ২রা অক্টোবর গান্ধীজীর ৭৭ বছর বয়েস হল। আর কতদিন তিনি এই যুদ্ধ চালাতে পারবেন? কিন্তু তাঁর নিজের একবিন্দু শান্তি নেই, নেই মুহূর্তের দ্বিধা ভয়। শিশুর মত সরল হাসিতে মুখ ভরে বলেন ১২৫ বছর তিনি বাঁচবেন এবং যুদ্ধে না জিতে—ভারতকে স্বাধীন না দেখে—পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে রাজি নন। তাঁর জীবন আরও দীর্ঘ হোক, তাঁর প্রেরণা আমাদের আরও গভীর ভাবে স্পর্শ করুক, আমাদের সাহস দিক, শক্তি দিক, বিবেক দিক,—আমাদের নিয়ে চলুক মুক্তির পথে, স্বাধীনতার পথে, মানবতার পথে—এর বেশী আর আজকের দিনে কী বলতে পারি?

আমাদেরই মতো নির্জাতিত, লুণ্ঠিত ও বঞ্চিত আমাদের এক প্রতিবেশী আছে। তাদের দেশ সুমাত্রা জাভা ইত্যাদি দ্বীপ, তাদের নাম ইণ্ডোনেসিয়ান। বহুদিন থেকে তাদের উপর রাজত্ব করেছে আমাদের প্রভুর প্রতিবেশীই—হল্যাণ্ড। এতদিন পরে, এত নির্যাতন সহ্য করার পর, আজ তারা রুখে দাঁড়িয়েছে,—স্বাধীনতা চাই, স্বাধীনতার জন্যে যতদূর চরম স্বার্থত্যাগ প্রয়োজন তা তারা করবে, কিন্তু বিদেশী বণিকের প্রভূত্ব আর নয়। তাদের নেতার নাম সোকার্নো। এই লড়াই-এর মধ্যে জাভা দ্বীপ ডাচ্-দের হাত থেকে জাপানীদের হাতে গিয়ে পড়েছিলো। তারপর জাপানীরাও হেরে গেলো। সোকার্নো বুঝলেন এমন সুযোগ আর হয়ত পাওয়া যাবে না—চোখের উপর যুদ্ধ হতে দেখে দেশের লোক হাতিয়ার ধরতে শিখেছে,—এক শত্রুর সঙ্গে লড়াই করবার জন্যে যখন আর এক শত্রু এলো তখন তাদের রোখবার জন্যে দেশের লোক সত্যিই হাতিয়ার ধরল তারপর এই দ্বিতীয় শত্রুও নিজেও হেরে গিয়েছে—এই সুযোগে দেশের লোক যদি মুক্তি অর্জন করতে পারে! কিন্তু পুরোনো প্রভুর দলই বা ছাড়বে কেন? এতদিন যারা নির্বিঘ্নে রাজত্ব করেছে, লুণ্ঠন করেছে, তারা হঠাৎ এক কথায় কি সরে যেতে রাজি হয়? ফলে পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ থামবার পর জাভায় আবার যুদ্ধ সুরু হল, স্বাধীনতাকাঙ্খী দেশবাসী আর রাজ্যলোলুপ ডাচ্-দের মধ্যে। অবশ্যই, অন্যান্য দেশের যারা রাজার জাত তারা ডাচ্‌দের দিকই নিয়েছে এবং যারা পরাধীন তারা সোকার্নোর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা হল রাজার জাতিদের মধ্যে চক্রান্তের ফলে আজ ভারতীয় সৈন্য পাঠানো হয়েছে সোকার্নো-দমনের জন্যে। আমরা কোথায় আমাদের নির্যাতিত প্রতিবেশীদের সাহায্য করব, আর তা নয় আমাদের দেশের সৈনিক দিয়ে তাদের সর্বনাশ করানোর বন্দোবস্ত! আমাদের দেশের যাঁরা সত্যিকারের নেতা তাঁরা তাই এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বিদেশীদের মধ্যে যাঁরা সত্যিকারের মানুষ—যাঁদের হৃদয় বলে পদার্থ আছে, বিবেক বলে পদার্থ আছে, তাঁরাও এ ব্যবস্থার তীব্র নিন্দে করেছেন।

অবশ্য একটা কথা ঠিক : দুনিয়া বদলায় এবং দুনিয়া আজ বদলাচ্ছে দ্রুত বেগেই। তাই পুরোনো ব্যবস্থা, পুরোনো অনাচার—এ সবকে টেঁকিয়ে রাখা দুষ্কর হবে। দিনের পর দিন সমস্ত দুনিয়াময় এমন আলোড়ন দেখা দিচ্ছে যে আশা হয় মাত্র মুষ্টিমেয় স্বার্থলোলুপ মানুষ বাকি লক্ষ লক্ষ দুঃখী দরিদ্র ও অসহায় লোককে আর আগেকার মতন দাবিয়ে রাখতে পারবে না। দিকে দিকে নতুন পৃথিবীর ইঙ্গিত। পুরোনো পৃথিবী টেঁকবে কেমন করে?

দুনিয়া যে হুড় হুড় করে বদলাচ্ছে তার একটা প্রমাণ দেখতে পাবে বিজ্ঞানের নবতম আবিষ্কারের দিকে চাইলে। এ্যাটম্ বোমা আর পেনিসিলিন—এই দুটো আবিষ্কারের কথাই ধরো। এমনিতে অবশ্য মনে হতে পারে এ দুটো আবিষ্কার মানুষের পক্ষে সম্পূর্ণ দুরকমে। একটার উদ্দেশ্য মানুষ মারা আর একটার উদ্দেশ্য মানুষকে

বাঁচানো। এ্যাটম-বম্ দিয়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে একটা পুরো সহরের মানুষকে একেবারে নিঃশেষ করে দেওয়া যায় আর পেনিসিলিন দিয়ে এত মানুষের এত রকম রোগ নিশ্চিহ্ন করা যায় আগেকার ডাক্তাররা তা প্রায় কল্পনাই করতে পারতো না। কিন্তু সত্যিই কি তাই? বিজ্ঞানের এই দুটো আবিষ্কার-এর উদ্দেশ্য কি তা হলে সত্যিই এই রকম উলটো? জীবন আর মরণ? একটু ভেবে দেখলেই বোঝা যায় যে আসলে তা নয়; অন্তত শেষ পর্যন্ত তা হতে পারবে না। এ্যাটম্-বম্-এর আবিষ্কার শুধু যম রাজার খাদ্য জোগাতে বাধ্য হবে না। একটা কথা ভেবে দেখ। রাশিয়া সেদিন বলেছে 'এ্যাটম্ বম্ আমরা অনেকদিন আগেই তৈরি করতে শিখেছি, আর শুধু তাই নয়, অনেক সস্তায় তা করতে পারি। কিন্তু আমরা জানি এ বোমার কি শোচনীয় পরিণাম। আমরা অতিবড় শত্রুর উপরও এ বোমা ফেলতে রাজি নই, তাই যুদ্ধের সময় এ নিয়ে আস্ফালন করিনি।' তাছাড়া, পৃথিবীর আরও নানান দেশের নানান বৈজ্ঞানিক এ নিয়ে গবেষণা করছেন এবং অনেকেই আশা করছেন অল্প দিনের মধ্যে তাঁরাও এ্যাটম-বম্ তৈরি করতে শিখবেন। তাই যদি হয় তা হলে কি এর পর পৃথিবীতে মহাযুদ্ধ আবার আসা সম্ভব এবং যদিই বা আসে তখন কি কোনোদেশ এ্যাটম-বম্ ব্যবহার করতে সাহস পাবে? সে ত জানবে — যার উপর এ বোমা ফেলতে যাচ্ছি তার ঘরেও এ বোমা তৈরি, ফলে আজ আমার হাতে এ বোমা খেলেও কাল সে আমার ঘরেই এ বোমা ফেলে যাবে। তখন? বাস্তবিক, ভেবে দেখো একবার যদি দুনিয়াশুদ্ধ সবাই এ ওর ঘাড়ে এ্যাটম্ বোমা ফেলতে সুরু করে তা হলে দুনিয়ার যে দুদিন পরে আর চিহ্ন বলে কিছুই থাকবে না! এ্যাটম্-বোমা মারাত্মক মরণাস্ত্র, সন্দেহ নেই। কিন্তু এত বেশী মারাত্মক যে এর ব্যবহার প্রায় অসম্ভব।

কিন্তু এ্যাটম্-কে ভেঙে বৈজ্ঞানিকেরা এই যে বিরাট শক্তি আবিষ্কার করেছেন সে শক্তিকে যদি ধ্বংশের কাজে না লাগিয়ে অন্য কাজে লাগনো যায়? ও, ভাবতেই পারা যায় না তা হলে কি হবে! দুনিয়ার চেহারা দুদিনেই একেবারে বদলে যাবে হয়ত। এই শক্তি যদি মানুষকে ধ্বংশ করবার কাজে না লাগিয়ে মানুষের কল্যাণকর কাজে লাগানো যায় তা হলে পৃথিবীতে যে সব কাণ্ড সুরু হবে তা অনেকটা আষাঢ়ে গল্পের মতই যেন অসম্ভব ঠেকতে পারে: হয়ত এক মুঠো কয়লা দিয়ে বিরাট জাহাজ সমুদ্র পার হবে, হয়ত আকাশে এয়ারোপ্লেন তোলবার সময় আর পেট্রলের কথা ভাবতে হবে না, হয়ত একটা বিরাট কারখানা চালাতে পারবে একজনমাত্র মজুর! এ্যাটমের ভেতরকার শক্তি যেন রূপকথার দৈত্য—সে দৈত্যকে বশ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ নিমেষে নিশ্চিহ্ন করা যায় আবার লক্ষ লক্ষ মানুষের অভাবনীয় কল্যাণ করা যায় নিমেষে। একজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক তাই বলছেন এই আবিষ্কারের ফলে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ঘুরে আসা খুবই সম্ভব কথা; তিনি বলছেন মানুষের আওতায় যখন বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোটি কোটি মাইল জমি এসে পড়বে তখন এই সামান্য পৃথিবীর তুচ্ছ জমি নিয়ে যুদ্ধ করবার উৎসাহ তাদের থাকবে না। হয়ত তখন লড়াই হবে মঙ্গল গ্রহের অধিবাসীদের সঙ্গে। এ সব কথা নিশ্চয়ই একটু বেশী কল্পনার কথা। তবে, এ্যাটম্ বোমার আবিষ্কার যে আজকের দিনে একেবারে যুগান্তকারী আবিষ্কার সে কথায় কারুর সন্দেহ নেই। যিনি এই আবিষ্কার করেছেন তাঁকে এ বছর বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়েছে আরও তিনজন বৈজ্ঞানিককে। তাঁদের নাম ফ্লেমিং চেইম আর ফ্লোরে। এঁরা আবিষ্কার করেছেন আশ্চর্য ওষুধ পেনিসিলিন, ডাক্তারি বিদ্যায় এত বড় বিস্ময় হালে আর কেউ জাগাতে পারেনি। বড় অদ্ভুত ওষধ এই পেনিসিলিন, এ দেন যমরাজের সঙ্গে নির্ভয়ে মুখোমুখি লড়তে পারে, পদে পদে যমরাজকে হারিয়ে দেয়। পৃথিবীর নানান রকম সাংঘাতিক অসুখ, যে সব অসুখ হয়েছে শুনলে ডাকসাইটে ডাক্তারেরও

মুখ একেবারে শুকিয়ে যেত,—পেনিসিলিন আবিষ্কার হবার পর তা এখন যেন তাঁদের কাছে ছেলেখেলা হয়ে পড়েছে। ডিকসন রাইট বলে বিলেতের একজন মস্ত বড় অস্ত্রপোচারক রসিকতা করে বলেছেন এই পেনিসিলিন এবার সব ডাক্তারের ভাত মারবে। অতি-সাংঘাতিক রোগও যদি অতি-সহজে সারিয়ে ফেলা যায় তা হলে ডাক্তাররা করবে কি? এটা অবশ্য একটু যেন রসিকতা হল; কিন্তু সত্যিই পেনিসিলিন বের করে আজকের বৈজ্ঞানিক যমরাজকে বিলক্ষণ দুশ্চিন্তায় ফেলেছেন।

এ্যাটম্-বম্ আর পেনিসিলিন—বিজ্ঞানের শুধু এই দুটো আবিষ্কারই যেন পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনতে চাইছে, চাইছে সমস্ত দুনিয়ার চেহারা একেবারে বদলে দিতে। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল আর আনন্দময়। কিন্তু নিজের দেশের দিকে ভালোকরে চাইলে সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে নিভে যায়। আমাদের দেশ এখনো কতো পেছনে পড়ে রইল! এখনো তুচ্ছ কারণে আমাদের দেশের মানুষ ভাই ভাই-এর উপর লাঠি চালায়, দাঙ্গা সুরু করে। বোম্বাইতে এই সেদিনও কী রকম দাঙ্গা হয়ে গেল! এর কি শেষ নেই! আমাদের দেশের মানুষ ভাই-ভাই হয়ে হাত মিলিয়ে কবে হাঁটতে শিখবে স্বাধীনতার দিকে, মুক্তির দিকে, উন্নত আনন্দময় জীবনের দিকে?

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমাদের অনেকের কাছ থেকে বিজয়ার শুভেচ্ছা-ভালোবাসা জানানো চিঠি পেয়েছি। প্রত্যেককে আলাদা করে উত্তর দিতে পারিনি। রঙমশালের ভিতর দিয়ে আজ তোমাদের সবাইকে বিজয়ার ভালোবাসা জানালুম।

অনেকেই জানিয়েছো পুজোর ছুটিতে বাইরে যাচ্ছো বলে এক মাসের জন্য ঠিকানা বদলের কথা। তোমাদের উপর কী হিংসে যে হচ্ছে! বছরের এ সময়টাতেই—যখন রোদের রঙ বদলাচ্ছে, সবে শিশির পড়তে সুরু করেছে, মাঝে মাঝে সকালের দিকে শরীরটা সিরসিরিয়ে ওঠে—বাইরে যেতে এতো ইচ্ছে করে! বাইরে তোমরা খুব হৈচৈ কোরো, চড়ুইভাতি কোরো, বেড়িয়ো, গান গেয়ো—আর একটি কথা মনে রেখো যখন ফিরবে তখন আবার ঠিকানা বদলের কথা সময়মতো যেন জানানো হয়।

রঙমশালে ছাপাবার জন্য অনেকেই তোমরা লেখা পাঠাও কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি বড় ত্রুটি চোখে পড়ে: লেখাগুলি অত্যন্ত ময়লা-কাগজের দু'পিঠে অনেক কাটাকুটি করে অস্পষ্টভাবে লেখা। লেখা পাঠাবার সময় প্রথম লক্ষ্য রাখা দরকার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে। পাতার বাঁদিকে খানিকটা জায়গা মার্জিন হিসেবে বাদ দিতে ভুল যেন না হয়। হাতের লেখার দিকে অনেক বেশি যত্ন নেওয়া দরকার। ছোটো বয়েস থেকে যত্ন না নিলে খারাপ হাতের লেখা বড় বেলাতেও খারাপ হয়েই থাকবে। ভবিষ্যৎ জীবনে সেটা একটা মস্ত পিছিয়ে থাকা। এখন থেকেই হাতের লেখার দিকে বিশেষ যত্ন নিয়ো। অনেকেরই লেখা ভালো নয়, রাতারাতি তাদের হাতের লেখা ভালো হতে পারে না। তবে লেখবার সময় যদি প্রত্যেকটি অক্ষর স্পষ্ট করে লেখার দিকে মন দাও তা হলে দেখবে অল্পদিনের মধ্যেই হাতের লেখার অনেকটা উন্নতি হয়েছে।

তোমাদের চিঠিপত্রের এইবার জবাব দিতে সুরু করি:

আশিস দত্ত (১৫৬৯)—তোমার কবিতা লেখার হাত আছে। ছন্দের দিকে নজর দিয়ো, প্রায়ই ছন্দপতন হয়। 'ব্ল্যাক মার্কেটিং করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে' সত্যিই খুব ভালো। ছোটো-ছোটো মজার পদ্য লিখে পাঠিও। পুরো কবিতাগুলি ছাপাতে পারলুম না। একটু ভাবলেই কারণটা বুঝতে পারবে। **কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়** (৯০)

—ধাঁধার জবাব ঠিক হয়নি। কেন ভুল হয়েছে আশ্বিনের রঙমশাল পড়লেই বুঝবে। মাত্র দুটি গ্রাহক ঠিক উত্তর দিতে পেরেছে। তোমার পাঠানো ধাঁধাগুলি বেশ মজার। এখানে কয়েকটি ছাপছি—"কোন পাখী মাথায় পড়লেই গেছো? (বাজ)। কোন দেশ গাছের তলা? (শিমূলতলা)। কোন জিনিস সবাই ধরে অথচ সত্যিসত্যি কেউ ধরে না? (ধামা)।" **সুমিত্রা তালুকদার** (২৩৪৮)—তোমার হাতের লেখা ভারি সুন্দর তো! আরো ভালো লেখার বাঁধুনি! এখানে খানিকটা অংশ ছাপলুম—"আশা-করি ভবিষ্যতে আপনার কখনো জ্বর হবে না! একথা আমি রোগশয্যা এবং অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, জানবেন। কী যে বিরক্তি লাগছে···সবাই এখন ৯৯°-এর সুযোগ নিয়ে খুব খানিকটা মাতব্বরি করে নিচ্ছে। আচ্ছা, আপনিই বলুন, যে দুগ্ধপোষ্য নয় তাকে দিনে চারবেলা—দুধটা খেয়ে নাও তো, লক্ষ্মী!—বললে তার মনের অবস্থাটা কী রকম হয়?···গ্রাহিকা হিসেবে আমি আশা করছি যে আপনি ইনফ্লুয়েঞ্জামুক্ত হয়ে আমাদের মতো জ্বর-কবলিত সব গ্রাহক-গ্রাহিকাদের জন্য অবাধে রঙমশাল সরবরাহ করতে থাকুন!" **চিনু চৌধুরী** (১৯৭৭)—তোমার পাঠানো 'মুক্তি' কবিতাটি ভালো লাগলো। মাঝের দুটি স্ট্যাঞ্জা বাদ দিয়ে পরে ছাপা হবে। যুক্ত অক্ষরগুলিকে অনর্থক ভেঙে লেখো কেন? **বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** (৬৯)—তোমার কবিতা পেয়েছি। এটি কিন্তু আগেরবারের মতো ভালো হয়নি। এই কবিতাটিকে অন্যভাবে লিখতে চেষ্টা করতে পারো?—আরো সহজভাবে, অন্য ছন্দে? **শরৎচন্দ্র দত্ত** (২৫৫২)—তোমার 'কাহিনী' কবিতাটি পরে ছাপা হবে। অন্যটি ছাপা হাবে না। কোন সংখ্যায় যাবে এখন থেকে বলা কঠিন। **কাশীনাথ পালিত** (২৫৫০)—আশ্বিনের ধাঁধার উত্তর ভুল করেছো। তোমার পাঠানো ধাঁধা এখানে ছাপলুম: "চারটি ৭-কে কেমন করে সাজালে ৫০ হয়?—উত্তর, (৭×৭)+(৭÷৭)=৪৯+১=৫০।"

সৈয়দ নুরল আলম (২০৬৬)—সব চিঠিপত্রের মধ্যে তোমার লেখা চিঠিটিই সবচেয়ে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন, হাতের লেখাটিও সুন্দর। বারবার দেখতে ইচ্ছে করে। "খেলার জন্ম" প্রবন্ধটি ছাপছি। কবিতার চেয়ে গদ্য তুমি ভালো লেখো। কবিতা এখন লিখে যাও, কয়েক বছর পরে ছাপাবার দিকে মন দিও। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের অমনোনীত লেখাগুলির সমালোচনা ছাপা মুস্কিল, কারণ সেই লেখাগুলিও তা হলে ছাপতে হয়, নইলে সবাই সমালোচনা বুঝতে পারবে না। **জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার** (১৯৪১)—আশ্বিনের ধাঁধার জবাব ভুল হয়েছে। কবিতা দুটি ছাপা গেলো না। ছোটো কবিতা হলে ভালো হয়।

তোমাদের
সম্পাদকমশাই

যুদ্ধ থামার দুঃখ

পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (২৪১)

নিউজ পেপার খুলি ভোরে চা পান করি'—
ওমা, একি, যুদ্ধ থামায় জাপান অরি!
মুহূর্ত না সবুর করি'
এক নিশাসে খবর পড়ি—
এটম বোমের ফাটন দেখে জাপান থামায় যুদ্ধ,
তাইতে আবার যোগ দেছিল স্ট্যালিন দাদা শুদ্ধ!

খবর শুনে মদন দাদা লাফান ভারি,
বলেন মামা দু'হাত দিয়ে পাকান দাড়ি।

বলেন হেসে—থামুক আহা,
দাম ছিল যা, কমুক তাহা,
আমি আপন মনে ভাবি—কাগজ হউক সস্তা,
আমার মত কবিদেরও বাড়বে যা হোক যশটা।

কেবল দেখি নলিন খুড়ো মলিন হেসে
বলেন—এহে, ক'রল কী এ স্ট্যালিন শেষে!
কাঁদন-হাসি মুখের মাঝে,
কাঁপন জাগে বুকের মাঝে—
এবার বুঝি কাবার হোলো টেম্পরারী চাকরী,
আবার বুঝি থাকতে হ'বে ক্ষেত খামারই আঁকড়ি'!

খেলার জন্ম

(সংগ্রহ)

সৈয়দ নুরল আলম ২০৬৬)

খেলা কেনা ভালোবাসে? তোমাদের কেউ লুকোচুরি, কেউ হাডু-ডু কেউ বা ব্যাটবল, ফুটবল প্রভৃতি খেলা ভালোবাস। এ-সব খেলার জন্ম কোথায়, কেমন করেই বা তা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে—সে কথা জানতে ইচ্ছে হয় না কি?

প্রাচীন গ্রীক আর রোমকগণ আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা, তাদের ফুটবল খেলার জন্মদাতা বল্‌লেও বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না, রোমকগণ যখন ইংলণ্ড অধিকার করে সে সময়ে এ খেলাও তাদের সংগে সেখানে যায়। প্রথমে এ খেলা ছিল খুবই বিপজ্জনক, খেলোয়াড়ের সংখ্যা তখন নির্দিষ্ট থাকত না। সময়েরও কোন স্থিরতা ছিল না। এক গ্রামের সংগে যখন আর এক গ্রামের খেলা হোত, তখন যোগ দিত গ্রামবাসী প্রায় সবই সে খেলায়। আর যতক্ষণ না সকলে শুয়ে পড়তো ততক্ষণই খেলা চলতো। উদ্দেশ্য ছিল শুধু যেমন তেমন করে বল গোলে প্রবেশ করানো। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকে এর ভদ্র সংস্করণ আরম্ভ হচ্ছে। আস্তে আস্তে আধুনিক নিয়ম সব লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমাদের দেশে এ খেলার প্রবর্তন করে। খেলাটা আমাদের কেমন প্রিয় হয়ে উঠেছে তা অনায়াসেই টের পাও ফুটবলের মরসুম এলে।

বহুপূর্ব থেকেই আমাদের দেশে যে ফুটবলের মত একরকম খেলা প্রচলিত ছিল তার আভাষ পাওয়া গেছে, ভীম অর্জুন নাকি অত বড় যোদ্ধা হতে পেরেছিলেন শুধু ঐ সব খেলা ভালো ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন বলেই। শুধু আমাদের জাতির মধ্যেই নয়—ফিলিপাইনবাসী, পলিনোমিয়, এস্কিমো প্রভৃতি জাতির মাঝেও যে এ ধরণের খেলার প্রচলন ছিল তারও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

একমাত্র ক্রিকেট খেলাকেই বোধ হয় ইংরেজরা তাদের একেবারে নিজস্ব বলে দাবী করতে পারে, ক্রিকেট শব্দটি এসেছে "ক্রিক" নামে প্রাচীন শব্দ থেকে। মানে হচ্ছে বাঁকা-লাঠি। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে প্রথম এডওয়ার্ডের রাজত্বকালে এ খেলার প্রথম প্রচলনের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সময়ে খেলোয়াড়ের সংখ্যা ছিল মাত্র দু'জন। হাতে লেখা একটা প্রাচীন পুঁথিতে ছবি দেখা গেছে যে দুটি লোক বল আর ব্যাট দিয়ে ক্রিকেট খেলছে। একজন ব্যাট ধরে আছে আর একজন বল দিচ্ছে। আধুনিক নিয়ম কানুন সব ইংলণ্ডেই গঠিত হয়, জাতীয় খেলা হলেও ইংরেজদের বংশধর আমেরিকানরা কিন্তু এ খেলা পছন্দ করে না। বর্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট ক্লাব হচ্ছে ইংলণ্ডের "মেলবোন ক্রিকেট ক্লাব।" কয়েক বৎসর আগে এই M. C. C. টিমই ভারতে এসে খেলে গেছে।

এশিয়া ও ইউরোপের প্রায় সমস্ত জাতি—বিশেষ ভাবে প্রাচীন রোমকগণ হকি খেলতেন, প্রাচীন গ্রীসের ছবিতেও হকি খেলার মত একটি খেলার আভাষ পাওয়া যায়। স্কটল্যাণ্ডে ও আয়রলণ্ডে শীতকালে বরফের ওপর এই খেলা হত। প্রথমে এই খেলাও খুব বিপজ্জনক ছিল। হকির সভ্য সাজ দিয়েছেন ইংরেজরা। ভারতীয় খেলোয়াড়রা এ খেলায় জগতের সব দেশের খেলোয়াড়দের হারিয়ে

দিয়েছে, অনেকের মতে ধ্যানচাঁদের মত ভালো খেলোয়াড় পূর্বে হয়নি। তাঁকে হকির "যাদুকর" বলা হয়।

তোমরা অনেকে নিশ্চই ব্যাডমিণ্টন খেল। শীত কালের উপযোগী এ সুন্দর খেলাটিতে প্রচুর আমোদ পাওয়া যায়। টেনিস ব্যাডমিণ্টনেরই মত আর একটা খেলা। টেনিসের কথা জানলে ব্যাডমিণ্টনেরও অনেকটা জানা হবে। টেনিস খুব পুরনো খেলা, ফরাসী "টেনেকস" শব্দ থেকে ঐ খেলার নামকরণ হয়েছে। আধুনিক নিয়মাদি হওয়ার অনেক পূর্বে থেকেই এ খেলা ইংলণ্ড ও ফরাসী দেশে ছিল, পৃথিবীর সর্বত্রই ওর অবাধগতি। আমাদের দেশে কিন্তু ওটা "বড় লোকের খেলা" হয়েই আছে।

গল্‌ফ প্রথমে হল্যাণ্ডে আরম্ভ হয়। সেখান থেকে যায় ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে। তখন এখেলা হত বরফের ওপর। একটা লাঠি পুঁতে বল মারাই ছিল ওর প্রথম রূপ। কথিত আছে যে ওই খেলা ইংলণ্ডে এতদূর সমাদর লাভ করে যে তাতে অনেক তীরন্দাজ তীর-ধনু ছেড়ে ধরলেন এই খেলা! রাজা দেখলেন রাজ্য যায়, তখন আইন করে খেলা বন্ধ করা হয়। শেষে অবশ্যি রাজার মত বদলে যায় আর তিনিই এ খেলার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হন। ফলে খেলাটার অধুনিক উন্নত অবস্থায় পৌছনর পথ অনেকটা সুগম হয়। ইংলণ্ডে এখন ওই খেলার আদর অন্য কোন খেলা থেকে কম নয়।

পোলোই বোধ হয় প্রাচীনতম খেলা, ভালো অশ্বারোহী সৈন্য গঠনের জন্য এখেলা প্রথমে পারস্যে আরম্ভ হয়। অধিকাংশ খেলার মত এ খেলারও প্রথমে কোন নিয়ম ছিল না; খেলোয়াড় সংখ্যা ছিল দু'জন, বল নিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে আগে পৌছনোই ছিল এ খেলার উদ্দেশ্য। এ খেলার অন্যান্য নিয়মাদি হয়েছে অনেক পরে—খেলোয়াড়ের সংখ্যাও পরিবর্তিত হয়েছে। আকবরই এ খেলা প্রথমে ভারতবর্ষে প্রচলন করেন। তাঁরও লক্ষ্য ছিল ভালো সৈন্য গঠনের দিকে।

পোলো যেমন সবচেয়ে 'বুড়ো' বাস্কেটবল তেমনি সবচেয়ে 'ছোট' খেলা। কিন্তু 'ছোট' হলে কি হয়, জোর করে অনেক 'বুড়ো' খেলাকে তাদের স্থান থেকে প্রায় তাড়িয়েছে, যেখানে তা পারেনি সেখানেও জায়গা একটু করেছে নিশ্চয়ই। এ খেলার উদ্ভাবকের নাম ডাঃ নেস্‌মিথ্। আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ প্রদেশস্থ স্প্রিংফিল্ড ইণ্টার ন্যাশনাল ওয়াই, এম, সি, এ কলেজে এই খেলার জন্ম হয়। উদ্দেশ্য ছিল শীতকালে উন্মুক্ত প্রান্তরে যখন অন্য খেলা হয় না তখন ব্যায়ামাগারের মধ্যে এই খেলা হবে। এখন কিন্তু বাইরেই খেলা হয়ে থাকে বেশী।

ভলিবলের জন্মকথাও অনেকটা বাস্কেট্‌বলের মত। জাএণ্ট-ভলিবলে প্রথম শিক্ষার্থীরাও বেশ আমোদ পেতে পারে।

আমেরিকা ও জাপানের প্রধান খেলা বোধ হয় বেসবল। তারই অনুরূপ হচ্ছে 'প্লে-গ্রাউণ্ডবল'। ইংলণ্ডের আদিম রাউণ্ডার খেলা থেকে আমেরিকানরা এই সুন্দর খেলা বের করেছে। দেড় ঘণ্টা ধরে ঐ খেলা হয়। ওতে যে রকম কৌশল প্রয়োগ করতে হয় ও আমোদ পাওয়া যায় তা অন্য খেলার চেয়ে কম নয়।

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

একটা কথা কি কোনদিন ভেবে দেখেছ? ভেবে দেখেছ, যদি আমাদের চোখ না থাকতো তা হলে অবস্থাটা কী রকম হত? কানামাছি খেলবার সময় ব্যাপারটা খানিক আঁচ করেছ আশাকরি। তুমি হয়ত হাৎড়ে হাৎড়ে ঘুরছো এদিক-ওদিক-সেদিক আর সবাই চারপাশে দেদার হৈ চৈ করছে। তুমি প্রাণপণে এলোমেলো হাত চালাচ্ছো, কোনোমতে কাউকে ধরতে পারলেই নিস্তার পাবে। কিন্তু, দেখতে না পারলে ধরতে পারা কি অমনি সোজা কথা? মাঝের থেকে, কেউ বা কাপড়ের খুঁটে আলপিন দিয়ে কাগজের ল্যাজ এঁটে দিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা মনের সুখে পেটে দিচ্ছে খোঁচা! চাঁটি খেতে খেতে মাথায় ত' টাক পড়বার জোগাড়! কপালগুণে কাউকে যদি আন্দাজে ধরতে পারলে তা হলেই রক্ষে। তখন ওরা চোখের কাপড় খুলে দেবে, তখন যেন এক নিমেষে পৃথিবীর চেহারা একেবারে বদলে যাবে, তখন—আঃ, কি আরাম তখন! চোখ না থাকলে, দেখতে না পেলে, সারা জীবনই ওই ভাবে কাটাতে হত। ভাবতেও যেন ভয়ের চোটে হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁদিয়ে যেতে চায়!

কিন্তু দুনিয়ায় একদল লোক আছে যাদের বলা যায় বেজায় বেয়াড়া আর বেজায় গোঁয়ার। তারা যেন জন্মেইছে অসাধ্য সাধন করতে; যত বাধা, যত বিপদ ততই যেন তাদের ফুর্তি। যা আছে তাই নিয়ে সন্তুষ্ট নয়; যা নেই তা সম্বন্ধে হাল ছেড়ে বসে থাকতে তারা নারাজ। তাদের বলে বৈজ্ঞানিক। তারা অনেক মাথা খাটিয়ে, অনেক দেখে, অনেক শুনে, নানান রকম পরীক্ষা করে, পৃথিবীতে নতুন পৃথিবী আনতে চায়। মানুষকে নতুন মানুষ করে তুলতে চায়!

অদ্ভুত সব লোক! তাদের মধ্যে একদল লোক বললে, কুছ্ পরোয়া নেই! চোখ না থাকলেই যে মানুষ "দেখতে" পাবে না এর কোনো মানে হয় না। চোখ না থেকেও যাতে "দেখতে" পাওয়া যায় তার বন্দোবস্ত করতে হবে! কিন্তু, কেমন করে তা সম্ভব? এ যে একেবারে আষাড়ে গল্পের মতো আজগুবি! কিন্তু আজগুবি মোটেই নয়, বৈজ্ঞানিকেরা বললেন। বাদুড়ের কাণ্ডটা দেখলেই বুঝতে পারবে চোখ না থাকলেই যে দেখবার কাজ বন্ধ থাকে তা নয়।

বাদুড়ের চোখ এমনিতেই আমাদের চোখের চেয়ে ঢের দুর্বল। আর অন্ধকারে ত' সেই দুর্বল চোখও ব্যবহার করতে পারে না; একেবারে অন্ধের সামিল। কিন্তু পরীক্ষা করে একটা ভারি মজার ব্যাপার দেখতে পাওয়া গেল। দেখা গেল, অন্ধকার ঘরে যদি সুতোর মতো সরু সরু অনেক তার ঝুলিয়ে রেখে তার মধ্যে একটা বাদুড় ছেড়ে দেওয়া যায় তা হলে কিন্তু বাদুড়টা ঘরময় বোঁ বোঁ করে উড়ে বেড়াবে অথচ একটা তারের সঙ্গেও তার ধাক্কা লাগবে না। চোখ থাকলেও অমন করে উড়ে বেড়ানো কঠিন, আর অন্ধকার ঘরে বাদুড়ের চোখ থাকা আর না থাকা যে প্রায় সমান কথা! তা হলে? বৈজ্ঞানিকদের মাথার টনক নড়ে গেল! বাদুড় অমন ভাবে ঘোরে কেমন

করে ? চোখ ছাড়া অন্য কিছু দিয়ে কি বাদুড় অন্ধকারে "দেখতে" পায় ? কিন্তু তাও কি সম্ভব ?

বাস্তবিকই তাই। বৈজ্ঞানিকের দল শেষ পর্য্যন্ত তাই আবিষ্কার করে বসলেন। আসল ব্যাপারটা হল এই যে অন্ধকারে অজস্র তার ঝোলানো ঘরে উড়ে বেড়াবার সময় বাদুড়টা তীব্র চীৎকার করতে থাকে। এই চীৎকার করার সময় তার মুখ থেকে বেরুনো শব্দের ঢেউ ঘরের তারগুলোয় লাগে, আর তারপর প্রায় পাঁচিলে লাগা ফুটবলের মতোই ঠিকরে ফিরে আসে তারগুলোর গা থেকে! এই ফিরে আসা শব্দের ঢেউ থেকেই বাদুড়টা আঁচ করে নেয় কোথায় তার রয়েছে। তাই তারের উপর হোঁচট না খেয়ে তারগুলোর পাশ কাটিয়ে সে ঘরের মধ্যে দিব্বি উড়ে বেড়ায়। তা হলে বুঝতেই পারছো, চোখ না থাকলেও "দেখতে" পাওয়া যায় বই কি, অবশ্য চোখ দিয়ে দেখা নয় অন্য ভাবে দেখা।

তুমি হয়ত হেসেই অস্থির হচ্ছ; ভাবছ তোমাদের নিরীহ ভালমানুষ পেয়ে আমি দেদার ধাপ্পা মেরে যাচ্ছি। কই, বাদুড় যখন অন্ধকার ঘরে ঘুরপাক খায় সে ত' তীব্র চীৎকার দূরে থাক চিঁ চিঁ শব্দটি পর্য্যন্ত করে না। চীৎকার করলে আমরা শুনতে পেতুম না নাকি ?

কিন্তু সত্যি বলছি, বাদুড় চীৎকার করে, ভয়ানক জোরে চীৎকার করে, এতো জোরে চীৎকার করে যে আমরা সত্যিই শুনতে পাই না। একটা কথা এইখানে জেনে রাখো। মানুষের কান এমনভাবে তৈরি যে শুধু মাঝারি ধরণের শব্দই সে শুনতে পায়, খুব আস্তে বা ভয়ানক বেশী জোরে শব্দ হলে মানুষের কান গ্রহণ করতে পারে না। বাদুড়গুলো ঘরের মধ্যে ঘোরবার সময় এমন তীব্র ডাক ছাড়ে যে আমাদের দুর্বল কান দিয়ে তা শুনতে পাওয়া একেবারে অসম্ভব। তাহলে, তারা যে ডাক ছাড়ে তার প্রমান কি ? প্রমান আছে। বৈজ্ঞানিকরা একরকম যন্ত্র বের করেছেন, সেই যন্ত্র দিয়ে অতি তীব্র শব্দকে ভেঙ্গে নিয়ে মানুষের শ্রবণগম্য করে তোলা যায়। এই রকম যন্ত্র দিয়েই ত' ধরতে পারা গিয়েছে বাদুড়ের চীৎকার। তাহলে, বুঝতেই ত' পারছো বাদুড় চোখ বাদ দিয়েও কান দিয়ে "দেখবার" কাজ একরকম চালিয়ে নিতে পারে।

কিন্তু বাদুড় যদি পারে, মানুষ পারবে না কেন ? বৈজ্ঞানিকরা গোঁয়ারের মত বলে বসলেন। মুস্কিল শুধু এই যে বাদুড়ের শোনার শক্তি যত জোরালো আমাদের তত নয়। অতি তীব্র শব্দের প্রতিধ্বনি সে শুনতে পায়, আমরা পাই নে। তা হলেও, আমাদেরও ত' কান বলে দুটো জিনিষ আছে, খানিকটা শব্দ ত' আমরা শুনতে পাই। সেটুকুকে ভালো করে ঝালিয়ে নিলে চোখ বাদ দিয়েও কাজ চালানো কি যায় না ?

নিশ্চয়ই যায়। হালে ডাক্তার লেভাইন বলে একজন পলটনদের ডাক্তার অনেক কষ্টে তা প্রমান করেছেন। লড়াই করতে গিয়ে যে সব পলটন অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাদের নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে তিনি এই ব্যাপারটাই দেখিয়ে দিয়েছেন।

সামনে খানিকটা পর্দা খাটিয়ে দেওয়া হল আর তারপর একজন অন্ধ পলটনকে সেই দিকে মুখ করে দাঁড় করিয়ে সোজা হাঁটতে বলা হল। তার জুতোর মধ্যে এমন একটা কায়দা করা হয়েছে যে হাঁটতে গেলেই একরকম শব্দ হয়। একটু এগিয়েই অন্ধ পলটন থমকে দাঁড়ালো, বলল—"আমার সামনে একটা পর্দা বুঝতে পারছি—প্রায় গজ পাঁচেক দূরে!" মেপে দেখা গেল ঠিক পাঁচগজ! তা হলে চোখ বাদ দিয়ে এও কি একরকম দেখতে পাওয়াই নয় ? কেমন করে দেখতে পেল ? তার পায়ের থেকে শব্দ বেরিয়ে সামনের পর্দায় লাগে তারপর ঠিকরে ফিরে আসে তার মুখের উপর। এই শব্দ অনুশরণ করেই সে "দেখতে" পেল পর্দাটা! অবশ্যই, একদিনে এমনটা হয় না। দিনের পর দিন অভ্যেস করতে হয়; কিন্তু অনেক কষ্টের পর অভ্যেসটা একবার হয়ে গেলে আর ভাবনা থাকে না। প্রাণপাত কষ্ট করে ডাক্তার লিভাইন তাঁর রোগীদের চোখ বাদ দিয়েও এই "দেখতে পাবার" উপায় অনেকখানি

শিখিয়ে ফেলেছেন। মাঠে চলতে চলতে তারা অনায়াসে বলে দিতে পারে ঠিক পঁয়ত্রিশ ফিট দূরে একটা ছোট বাড়ি রয়েছে, বলতে পারে ঠিক সামনে খানা ডোবা আছে কি না। ঘরের মধ্যে আর হাৎড়ে হাৎড়ে ঘুরতে হয় না, কথায় কথায় হোঁচট খেতে হয় না। প্রায়-সাধারণ মানুষের মতই বুঝতে পারে কোথায় খাট, কোথায় টেবিল, কোথায় চেয়ার।

'ক', 'খ' আর 'গ' তিনটি সংখ্যা। 'কখ'-কে 'কখ' দিয়ে গুণ করলে হয় 'গগখ'। তা হলে 'ক', 'খ' আর 'গ' কী কী সংখ্যা ? কত ধরণের উত্তর হতে পারে ?

ধাঁধার উত্তর

মেসের ম্যানেজার খুন করেছিলেন। কারণ তিনিই মেসে ছিলেন। অন্য তিনজন—মধু, সতু আর হীরু—তখন মেসে ছিলো না।

আশ্বিনমাসের উত্তরদাতাদের নাম :

হিমু, ঘন, ভক্তি, শিশির, হারু (২৫২১) [ধাঁধাটি শক্ত হওয়ায় মাত্র একজন গ্রাহকের কাছ থেকেই সঠিক উত্তর পাওয়া গেছে]

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

মুক্তিস্নান

মুক্তিস্নান করে মোক্ষ লাভের লোভ মনে জাগে না কার? কিন্তু মুক্তিস্নানের যোগ ও তীর্থস্থানে পৌঁছবার সুযোগ বছরে কবার আসে? তবে স্নানের পবিত্রতাবোধ বলতে যা বোঝায় তার যোগাযোগ ঘটানো কিন্তু প্রতিদিনই সম্ভব। চাই—একখানা ভালো সাবান আর পরিষ্কার জল—তা কলেরই হোক বা কুয়োর, নদীরই হোক বা পুকুরের। আর ভালো সাবান বলতেই মনে পড়া উচিত 'রেণু'—কারণ এমন সুলভে এত ভালো সাবান বাজারে বড় বেশি নেই। অল্প মাখলেই 'রেণু'-র প্রচুর সুগন্ধি ফেনরাশি দেহ সম্পূর্ণ পরিষ্কার করে মনে রেখে যায় একটি স্নিগ্ধ পবিত্রতার অনুভূতি। তাতে মোক্ষলাভ না হোক তৃপ্তিলাভ যে অনিবার্য সন্দেহ নেই।

সোল সেলিং এজেন্টস : হিন্দুস্থান মার্কেন্টাইল কর্পোরেশন লিঃ, ৭৮, ক্লাইভ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

SRK 4

ENGINEERING PRACTICE

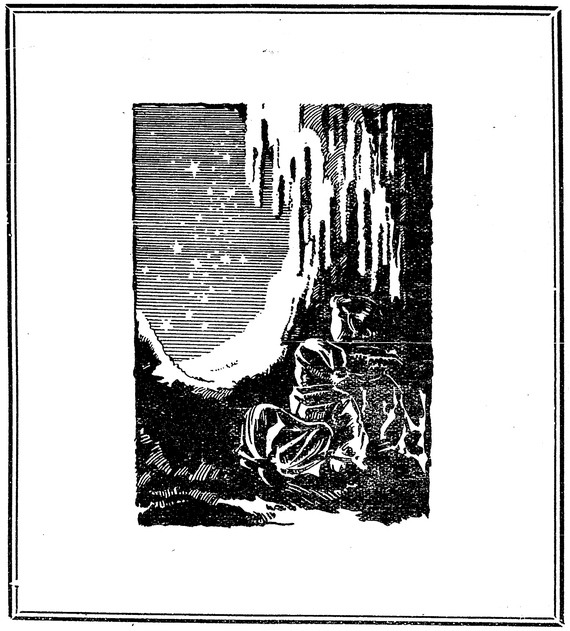

তুষার রাত
শিল্পী : সূর্য রায়

রংমশাল

[দশম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা : অগ্রহায়ণ, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

বিকেলের গান

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

এসো বিকেল
চোখ-ধাঁধানো পালিশ-করা নিকেল।
এক নিমেষেই শেষ
পলক ফেলে চাইতে গিয়েই দেখি নিরুদ্দেশ।

টুকরো কথা গান
আজ বাজারে বিকোয় না সে
না পায় সম্মান।

এক পাশে ওই বটের ঝুরি
অন্য পাশে নদী
ঝিরঝিরিয়ে চলছে বয়ে
ভাবছি কেবল, 'যদি
এ-পার থেকে ও-পার গিয়ে
ফুরিয়ে যেতে পারি,
কেউ পাবে না ছুঁতে আমায়!
ঘুমের অপ্সরি
রেশমি-আঁচল ঢেকে কোথায়
উড়িয়ে নিয়ে যাবে :
এক নিমেষে তেপান্তরে
এক নিমেষেই পাবে—'

কী যে পাবে জানি না তা! বিকেলটা যায় বয়ে
কাটলো খানিক সময় তবু আজগুবি গান গেয়ে!

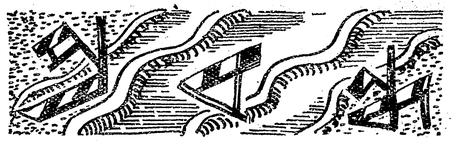

বড়দের ছোটোবেলা

একটি বালক ও কয়েকটি বই

বুদ্ধদেব বসু

[দেশের জ্ঞানী এবং গুণীদের ছোটোবেলার কথা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে। এই বিভাগে মাঝেমাঝে আমরা সে-ধরণের লেখা ছাপবার ব্যবস্থা করেছি। রঃ সঃ]

সমবয়সি অন্যান্য ছেলেদের চাইতে মাথায় এক থেকে তিন ইঞ্চি ছোটো, কালো, রোগা, দুর্বল, তার উপর তোৎলা—এ-রকম একটি ছেলে হ'তে তোমাদের কারু কি ইচ্ছা করে? আর আমি ঠিক ঐ রকম ছিলাম, এ-কথা শুনে আমার ছেলেবেলার প্রতি তোমাদের কি করুণা হয়? কিন্তু সেটা হবে ভুল, কারণ রোগা, দুর্বল এবং তোৎলা হওয়া সত্ত্বেও আমার ছেলেবেলা অত্যন্ত সুখের ছিলো—আমার খুবই সন্দেহ হয় যে মোড়ে-মোড়ে আইসক্রীমের দোকান, পাড়ায়-পাড়ায় সিনেমা আর মাসে-মাসে রংচঙে নতুন বই সত্ত্বেও তোমরা কেউই সে-সুখ পাচ্ছো কিনা, যে-সুখ আমি আমার ছেলেবেলায় পেয়েছি। এই সুখের প্রধান কারণ এই যে ছেলেবেলায় আমাকে ইশকুলে পড়তে হয়নি। দ্বিতীয় কারণ এই যে বাড়িতে আমার ছিলো অপরিমিত প্রশ্রয়। এই দুটিকেই আমার জীবনের পরম সৌভাগ্য ব'লে মনে করি: পাঁচ বছর বয়স থেকে ইশকুলে এবং বাড়িতে গুরু এবং গুরুতরদের কঠিন শাসন-যন্ত্রে পিষ্ট হ'তে থাকলে আমার জীবনটা কেমন হ'তো কে জানে—খুব সম্ভব ভালো হ'তো না। এ-কথা নিশ্চিত যে 'মহাস্থবির জাতকে' বর্ণিত বিদ্যালয়ের যমদূতস্বরূপ কোনো শিক্ষকের সঙ্গে একবার যদি আমার মুখোমুখিমাত্র হ'তো, তাহ'লে সেই যে চম্পট দিতুম, পাশ-টাশ করা জীবনে আমার তো হ'তোই না, হয়তো পড়াশুনোর উপরেই ঘেন্না ধ'রে যেতো। ভাগ্যিশ সে-রকম কিছু হয়নি! ভাগ্যিশ স্বাধীনতা পেয়েছিলুম! কেননা, অন্য অনেক লেখকদের মতোই, অতি শিশুকাল থেকেই পড়াশুনোর প্রতি ছিলো আমার দুর্বার আকর্ষণ। বাল্যজীবনে অনেক দুঃখও ছিলো আমার—রোগভোগের দুঃখ, জিহ্বার আড়ষ্টতার দুঃখ, সমবয়সির তুলনায় নিজেকে খর্বকায় ও হীনবল মনে করার দুঃখ—তবু ইচ্ছেমতো পড়তে পেয়েছি আর ইচ্ছেমতো লিখতে পেরেছি ব'লে ও-সব কোনো দুঃখই আমাকে পীড়ন করতে পারেনি। ইশকুলে যেতুম না, বাড়িতেও আমি একলাই শিশু, অথচ আমার নিঃসঙ্গ লাগতো না কখনো, ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকতো না, ভালো লাগতো, খুবই ভালো লাগতো। বই খাতা কাগজ পেনসিল জড়িয়ে যে-একটা আশ্চর্য জগৎ, তার অপরিমিত বৈচিত্র্যে আমি ছিলাম চিরমুগ্ধ। গণিতশাস্ত্রে আমার মাথা খেলে না একেবারেই—এখনো একটা সামান্য হিশেব করতে হ'লে বার-বার ভুল করি—ছেলেবেলায় একটু বেশি বয়সেই আমাকে অঙ্ক ধরানো হয়েছিলো, প্রথম অবস্থার অশ্রুগলিত বিভীষিকা অতিক্রম ক'রে যেই ব্যাপারটা বোধগম্য হ'তে আরম্ভ

হ'লো অমনি হু-হু ক'রে শেষ হ'য়ে গেলো পাটিগণিত বীজগণিত। মনে আছে কত গ্রীষ্মের স্তব্ধ তপ্ত দুপুরবেলা একলা ব'সে অ্যালজেব্রার অঙ্ক ক'ষে-ক'ষেই কাটিয়ে দিয়েছি। কথাটা বিশেষভাবে মনে আছে এইজন্য যে অঙ্ক আমি স্বভাবত ভালোবাসি না, অথচ প্রাণপণ চেষ্টার দ্বারা তখনকার মতো ওটাকেও আমার সঙ্গী ক'রে নিতে পেরেছিলাম, এমনকি, আমার আনন্দের উপকরণ।

পড়াশুনোয় আমার কৃতিত্ব যে অসামান্য, আমি যে স্বাধীন রচনাশক্তিরও অধিকারী, এ-কথা সেই ছোট্ট পাড়াগেঁয়ে শহরে অত্যন্ত বেশি রাষ্ট্র হ'য়ে পড়ায় আমার দৈহিক ত্রুটিগুলো কখনো আমার লাঞ্ছনার কারণ হ'তে পারেনি। খুব ছোটো বয়সে উপেন্দ্রকিশোরের ছোট্ট রামায়ণের অনুপ্রেরণায় তীর-ধনুক ছিলো আমার প্রিয় খেলা, তারপর একটু বড়ো হ'য়ে খেলার মাঠে আমি ছিলাম সচেষ্ট কিন্তু নিষ্প্রভ, জীবনে কখনো ঘুড়ি ওড়াতে শিখলুম না, লাট্টু ঘোরাতেও না, একটিমাত্র খেলায় আমার কিছুটা দক্ষতা ছিলো—তোমরা শুনে হাসবে, সেটা মার্বেলখেলা। কিন্তু তাতে কী। সমবয়সিরা আমাকে রীতিমতো শ্রদ্ধা করতো, আমার বন্ধু হতেন অনেক সময় আমার চেয়ে আট-দশ বছরের বড়ো যুবকরা, এমনকি যাঁরা সত্যি-সত্যি বড়ো এমনও অনেকে আমার সঙ্গে সমানে-সমানে কথা কইতেন। কী আত্মীয়মহলে, কী শহরের পাঁচজনের কাছে আমার সম্মান ছিলো একটু বিশেষরকম। এইভাবে ছেলেবেলা থেকেই আমার মনে ধারণা জন্মেছিলো যে আমি অন্য সকলের মতো নই, আমি স্বতন্ত্র, আমি অসাধারণ। এতে আমাকে হয়তো একটু অহংকারী করেছিলো, সামাজিক জীবনে একটু অপ্রীতিকর—কিন্তু এই ধারণা আমার অনেক ভালোও করেছে, অনেক অমঙ্গল থেকে বাঁচিয়েছে আমাকে, এ-কথা আমি বলবোই।

এখন ভেবে দেখছি ছেলেবেলায় আমি নিতান্তই সুশীল ও সুবোধ বালক ছিলাম: বাধ্য, শান্ত, ভীরু, একটু হাবাগোবা, গুরুজনের অননুমোদিত কোনো কাজ ক'রে তিরস্কৃত হয়েছি, এমন ঘটনা জীবনে তিন-চার বারের বেশি মনে করতে পারি না। 'চালাক' ছেলেদের ঠাট্টা-মশকরা কিছুই বুঝতুম না, আমাকে বোকা বানানো যে-কোনো বোকার পক্ষে সহজ ছিলো। বর্ষীয়সী মহলে বুড়োমির জন্য কুখ্যাত ছিলুম—নিয়মিত সময় ছাড়া খাওয়া নেই, আকস্মিকরকম অন্যায় বায়না নেই, চ্যাঁচামেচি ছুটোছুটি নেই—এ-রকম ছেলে কি বুড়োদের ভালো লাগে! আমার স্বভাবটা বুড়োটেমতোই ছিলো বোধ করি: ছেলেমানুষির সাধারণ লক্ষণগুলি খুব বেশি প্রকাশ পেতো না—এককোণে চুপচাপ ব'সে-ব'সে বই পড়তে যত ভালো লাগতো, তার চেয়েও ভালো লাগত এককোণে একমনে ব'সে-ব'সে লিখতে—আর তার চেয়ে ভালো আর-কিছুই লাগতো না। সেইজন্যই, আমার ছেলেবেলাকার কথা যখন ভাবি, তখন পর-পর কতগুলো বইয়ের কথাই আমার মনে পড়ে—বাল্যজীবনের এক-একটা অধ্যায় যেন বিশেষ কতকগুলি বইয়ের স্বাদে সৌরভে চিহ্নিত হ'য়ে আছে। সকলের আগে মনে পড়ে উপেন্দ্রকিশোরের পদ্য ছোট্ট রামায়ণ আর গদ্য ছেলেদের মহাভারত—হায়রে, দুটি বই-ই এখন লুপ্ত, আর কি ফিরে আসবে না!—এ-দুটি বই আমাকে আবিষ্ট ক'রে রেখেছিলো দিনের পর দিন, মাসের পর মাস। তখনও রবীন্দ্রনাথকে পাইনি—ছোট্ট রামায়ণেই প্রথম অনুভব করেছিলাম কবিতার অলৌকিক রমণীয়তা—যোগীন্দ্রনাথ সরকারও খুব ভালো লাগতো, কিন্তু তাঁর রচনায় ঠিক এই কবিত্বের আবেশটুকু ছিলো না। এর পরে, কয়েক বছর বাদ দিয়ে, আমার জীবনে এলো 'সন্দেশে'র যুগ — মাসে-মাসে আবোল-তাবোলের কবিতা, চালিয়াৎগুলোর জব্দ হওয়ার গল্প—তার উপর সুখলতার, কুলদারঞ্জনের বই। রবিন হুড প'ড়ে এতই রোমাঞ্চিত হলুম যে লম্বা-চওড়া কবিতা লিখে না-ফেলে পারলুমই না। 'মৌচাক' যখন বেরলো তখন আমি অনেকটা বড়ো হ'য়ে উঠেছি, রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা হাতে পড়েছে। চয়নিকা হাতে পাওয়া মানেই নতুন একটা পৃথিবী পাওয়া, আর তারই সঙ্গে পেলুম ইংরেজি গল্পের

স্বাদ। জুল ভার্নের বইগুলো একের পর এক শেষ হ'তে লাগলো—এক-একখানা শেষ হবে ভাবতে কান্না পেতো—শার্লক হোমস-এর গল্প প'ড়ে অবাক হলুম, লা মিজরেবল প'ড়ে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদলুম, সুইস ফ্যামিলি রবিনসন আমাকে নিয়ে গেলো এক আশ্চর্য স্বপ্নময় দ্বীপে, যেখানে দুঃখকষ্ট বাধাবিপত্তি সমস্তই সুখের। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে আরো বৃহৎ, আরও আশ্চর্য এক জগৎ আমার কাছে খুলে গেলো: আমার হৃদয়কে আনন্দে, ক্রন্দনে উল্লাসে, সংগীতে, সৌন্দর্যে অশান্ত বিচূর্ণ মন্থিত করলেন ডিকেন্স, ব্রন্টি-বোনেরা, দুমা, টলস্টয়, কবিদের মধ্যে শেক্সপিয়র, শেলি—এদিকে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। দেখতে-দেখতে জীবনে এলেন গলসওর্দি, অস্কার ওআইল্ড, টুর্গেনিভ···কিন্তু আর না, আর তো আমি ছোটো নই, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছি, রীতিমতো যুবক হবার চেষ্টা করছি। আজকের দিনে এ-কথা ভাবতে আমার ভালো লাগে যে আমার বাল্যজীবনে আমি যেন ঠিক সময়ে ঠিক বইটি হাতের কাছে পেয়েছিলাম: দশ বছরে জুল ভার্ন, চোদ্দতে ডিকেন্স, ষোলোতে টুর্গেনিভ। এ যে কত বড়ো ভাগ্যের কথা, আর সে-ভাগ্য যে আমারই হয়েছিলো এখন সে-কথা ভাবতে অবাকই লাগে। আমার ছেলেবেলায় সিনেমা ছিলো না, এত রকমের এত বাংলা বই ছিলো না, চকোলেট চোখে দেখিনি, আইসক্রীমের নাম শুনিনি—তবু তোমাদের কারু সঙ্গেই আমার ছেলেবেলার বদল করতে আমি রাজি নই।

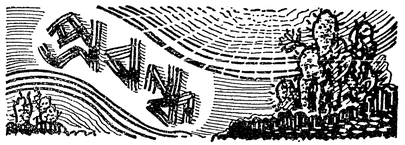

রবার্ট কোচ্ আর ক্ষুদে শয়তান

(ক্রুইফের লেখা অবলম্বনে)

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিকেলে ক্ষুদে শয়তান নিয়ে ক্ষুদে সভা আবার জমে উঠেছে। সেই কুৎকুতে মত ভদ্দরলোক বলে চলেছেন:

"রবার্ট কোচ ছিলেন ডাক্তার, জার্মানীর এক অতি নগণ্য গ্রামের ডাক্তার। এ পর্য্যন্ত যাঁরা জীবাণু আবিষ্কারের চেষ্টায় নাম কিনেছেন তাঁদের মধ্যে ডাক্তার কেউ ছিলেন না। লিউএন্হুক বৈজ্ঞানিকই ছিলেন না, মানে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অতবড় দান থাকা সত্ত্বেও তাঁর পেশা ছিলো মুদির পেশা। স্পালান্সানী আর পাস্তুর অবশ্য বৈজ্ঞানিক ছিলেন কিন্তু কেউ ডাক্তার নন। অবশ্য ডাক্তার হলেও নগণ্য ছোট্ট গাঁয়ে আর কত বড় ডাক্তার হওয়া যায়? চাষার নাড়ী টিপে, চাষার বৌএর সর্দির ওষুধ দিয়ে, চাষার ছেলেমেয়েদের দাঁত তুলে কোচ্এর দিন কাটত। আর মনে মনে তিনি নিজেও ভয়নক বিরক্ত ছিলেন নিজের পেশা সম্বন্ধে। তার কারণ এ নয় যে অজ-পাড়াগাঁয়ে বসে তাঁকে ডাক্তারী করতে হচ্ছে। সহরের হৈ হল্লার প্রতি আসলে তাঁর কোনো আকর্ষণই ছিলো না। তা হলে বিরক্তি কিসের? তিনি বিরক্ত ছিলেন, কেন না মনে মনে তিনি জানতেন ডাক্তারীর নাম দিয়ে যা করছেন সেটা

স্রেফ্ ধাপ্পাবাজী। ধাপ্পাবাজী, কেননা রোগ যে সত্যি কেন হয় এ সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ধারণা নেই, রোগী এলে কেবল অন্দাজে গোটা কতক ঢিল মারা!"

"আমাদের পাড়ার পাঁচু ডাক্তারের মত!" ঘোঁতন সোৎসাহে বলল।

"তা জানি নে। তোমাদের পাঁচু ডাক্তারকে আমি চিনি না।" ভদ্দরলোক বললেন।

"আমাদের পাঁচু ডাক্তার ঠিক আপনার রবার্ট কোচের মতন। ডাক্তারীর ড জানে না। একটি একেবারে পাকা হাতুড়ে। জানেন সে এমন ডাক্তার যে আমাদের বুড়ী ঝির একবার তেড়ে জ্বর এসেছিলো। সেজ কাকা বললে ডাকো পেঁচো ডাক্তারকে। বুড়ি কান্নাকাটি সুরু করল, বলল মারতে চাও এমনি গলটিপে মারো। কিন্তু পেঁচোর হাতে মেরো না, তার হাতে মরলে নরকেও ঠাঁই হবে না।"

ভদ্দরলোক হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন "না না, কোচ্ মোটেই সে ধরনের ডাক্তার ছিলেন না। গাঁয়ের লোক তাঁকে ভক্তিই করত, ভালই বাসত। ভাবত কোচের বড়ি ধন্বন্তরী। কেবল কোচ নিজে বিশ্বাস করতেন না নিজের বড়িকে।"

"তার মানে", ঘোঁতন বলল, "একেবারে যাকে বলে চুচু। নিজেই জানতেন নিজের বিদ্যের দৌড় কতটুকু।"

"হুঁ, প্রায় তাই", ভদ্দরলোক বললেন, "কেবল একটা কথা আছে। তিনি যে শুধু জানতেন ডাক্তারী ব্যাপারে নিজের বিদ্যে নেই তা নয়; আসলে তখন পর্য্যন্ত পৃথিবীতে ডাক্তারী বিদ্যেটাই ছিল ওই রকম। রোগ কেন হয়, কেমন করে আসলে রোগ বন্ধ করা যায়, এ সম্বন্ধে পৃথিবীতে কারুরই খাঁটি ধারণা ছিলো না। সবাই আন্দাজে ঢিল ছুঁড়তো, কোচ তা বুঝতেন, আর বুঝতেন সকলের সঙ্গে তিনিও আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছেন।"

"ওমা কী আশ্চর্য্য", পান্না অবাক হয়ে গেল, "কতদিন আগেকার কথা বলছেন?"

"কতদিন আর? এই ত' সেদিনের কথা, বছর সত্তর আসি হবে বড় জোর!" ভদ্দরলোক বললেন।

"কী কাণ্ড!" পান্না বলল।

"কী কাণ্ড!" জগু বলল।

"ভাগ্যিস," ঘোঁতন বলল, "অনেকদিন পরে জন্মেছি। বছর সত্তর আসি আগে জন্মালে ডাক্তারদের এলোপাতাড়ি ঢিল খেয়ে খেয়ে মরতে হত!"

"তা ঠিকই বলেছ। পৃথিবীতে কত লোক যে সে ভাবে মরেছে তার ইয়ত্তা নেই। আর আজকের দিনে যে ডাক্তাররা সত্যিকারের ডাক্তারী শিখেছেন তার জন্যে প্রধাণত দায়ী কোচ্ আর পাস্তুর। পাস্তুরের কথা পরে বলব, আপাতত কোচের কথা বলি।

"কোচের সময় ডাক্তারী শাস্ত্রের আসল কোনো উন্নতি হোক আর নাই হোক, একটা জিনিষের রীতিমতো উন্নতি হয়েছিলো, সেটা হল অনুবীক্ষণ যন্ত্র। লিউএনহুকের মত আর নিজে হাতে অনুবীক্ষণ তৈরি করতে হত না। বাজারে গিয়ে কিছু টাকা ছাড়লেই কিনতে পাওয়া যেত চমৎকার অনুবীক্ষণ! আর প্রধাণত পাস্তুরের জন্যেই ক্ষুদে শয়তানের কথা ইয়োরোপে খুব বেশী প্রচার হয়েছিলো। আসল বিদ্যে যার পেটে যতই থাকুক অনুবীক্ষণ কিনে ক্ষুদে জীবের সন্ধান অনেকেই করত।

"একদিন কোচ-এর জন্মতিথি ছিলো। কোচ-গিন্নী ভাবলেন একটা অনুবীক্ষণ কিনে দিলে কোচ্ নিশ্চয়ই খুশী হবেন; হাজার হোক গাঁয়ের একঘেঁয়ে চাষা দেখতে দেখতে বেছারা নিশ্চয়ই হাঁপিয়ে উঠেছে। দুদিন ক্ষুদে জীব দেখে একটু চোখ বদলাবে। ওদের অবস্থা তেমন ভালো ছিলো না; তবু যাহোক করে কোচ-গিন্নী একটা অনুবীক্ষণ কিনে কোচ-কর্ত্তাকে জন্মদিনের উপহার দিলেন। অনুবীক্ষণ পেয়ে ডাঃ কোচ আহ্লাদে আটখানা। রাত দিন, যখনই সময় পান সেই অনুবীক্ষণ নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, নানান রকম জিনিষ হাজার গুণ বড় করে অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখেন আর অবাক হয়ে যান!

"তখন সমস্ত ইয়োরোপএর চাষী একটা রোগের ভয়ে একেবারে সন্ত্রস্ত ছিলো ; রোগটার নাম এ্যানথ্রাক্স্। এ রোগ দেখা দিত গরু ছাগলের শরীরে, আর দেখতে দেখতে সমস্ত গরু ছাগল পট পট করে মরে যেত। সাংঘাতিক রোগ। একবার হলে আর যেন রক্ষে নেই। অনেক সময় গাঁকে গাঁ একেবারে উজোড় হয়ে যেত। চাষীরা এ রোগে মারা যেত বটে, কিন্তু গরু ছাগলই তাদের প্রধান সম্বল, সেগুলো শেষ হয়ে গেলে তাদের আর থাকে কি বলো? রোগটা কেন হয় তা অবশ্য কোচ্ জানতেন না, পৃথিবীর কেউই জানতো না। গাঁয়ে এ্যান্থ্রাক্স্ সুরু হলে বলতো শয়তানের দৃষ্টি পড়েছে, অপদেবতার অভিশাপ লেগেছে, তাই শেষ হয়ে যাচ্ছে আমাদের গরু ছাগল। হা কপাল! ইত্যাদি এ ধরণের বিলাপ শুনতে শুনতে কোচ্এর কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু একেবারেই নিরুপায়। কিছুই যে জানা নেই রোগ সম্বন্ধে।

"অনুবীক্ষণ পেয়ে কোচ্ প্রথম প্রথম প্রায় লিউএন-হুকের মতোই অতি যত্নে যা পান তাই এলোপাতাড়ি পরীক্ষা করে চললেন। তারপর, কিছুদিন পরে, তাঁর খেয়াল হয় এই এ্যানথ্রাক্স্ রোগ সম্বন্ধে ভালো করে অনুসন্ধান করার কথা। পাস্তরের কথা নিশ্চয়ই তিনি শুনেছিলেন, নিশ্চয়ই তাঁরও মনে মনে বিশ্বাস হয়েছিলো যে অধিকাংশ রোগের মূলে রয়েছে ক্ষুদে জীবের শয়তানী। কিন্তু তখন পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে কারুর কাছেই কোনো প্রমাণ ছিলো না। কোচ্ ঠিক করলেন এ্যানথ্রাক্স্ রোগটা নিয়ে ভালো করে পরীক্ষা করতে হবে। কিন্তু বেচারা!—ভালো করে পরীক্ষা করবার মত সময় কই? গরীব মানুষ; গাঁয়ের রোগীদের তাই বিদেয় করতে পারেন না। তা হলে সংসার চলবে কেমন করে? তাই অনুবীক্ষণ ছেড়ে প্রায়ই ছুটতে হয় কোথায় কার ছেলে সাইকেল চাপা পড়ল, কোথায় কোন চাষা-গিন্নী দাঁতের যন্ত্রণায় ছটপট করছে, কোথায় কোন চাষা হাঁচতে হাঁচতে আর নাক ঝাড়তে ঝাড়তে একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছে। তবু অজ্ঞ লোক এই কোচ্! এত হাঙ্গামার মধ্যেও মাথায় সেই এক কথাই ঘুরছে: এ্যানথ্রাক্স্-এর জীবাণু বের করতে হবে। তাই, একটু ফাঁক পেলেই তিনি অনুবীক্ষণ বাগিয়ে বসে পড়েন।

"এ্যানথ্রাক্স্ হলে জীবজন্তুর গায়ে একরকম মারাত্মক ফোড়া বেরোয় এবং তারপর, মারা যাবার পর, গায়ের সমস্ত রক্ত কুচকুচে কালো হয়ে যায়। সেই কালো রক্তের ফোঁটা জোগাড় করে অনুবীক্ষণে চাপিয়ে কোচ্ বসে বসে দেখতে লাগলেন। দেখতে দেখতে একটা জিনিষ তিনি বের করলেন। এই কালো রক্তের মধ্যে সরু সরু সুতোর টুকরোর মত কী একটা যেন ঘুরছে। দেখতে দেখতে কোচ প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন, স্থান কাল পাত্র সবই ভুলে গেলেন! পাশের ঘরে অপেক্ষা করতে করতে চাষা-গিন্নী হয়ত দাঁতের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে উঠছে আর মনে মনে গাল দিচ্ছে কোচ্কে। কিন্তু কোচের সে খেয়াল নেই। সেই সুতোর টুকরোর মত জিনিষ নিয়ে তিনি একেবারে মশগুল। জীবাণু নাকি? ওগুলোই কি তা হলে এ্যানথ্রাক্স্-এর কারণ? কিন্তু কোচ্ সহজে কোন কিছু বিশ্বাস করবার পাত্র ছিলেন না। এই সব মরা জন্তুর রক্ত অনেক দিন ধরে পরীক্ষা করবার পর তিনি ছুটলেন কষাইখানায়, তাজা রক্ত চেয়ে আনলেন আর চড়ালেন অনুবীক্ষণে। কর্ত্তার কাণ্ডকারখানা দেখে কোচ্-গিন্নীর ত' চক্ষুস্থির! ভাবলেন কী ছেলেখেলাই সুরু করেছে, হয়ত মনে করলেন কী কুক্ষণেই উপহার দিয়েছিলুম অনুবীক্ষণটা। ওই অনুবীক্ষণ নিয়ে কর্ত্তা এমন মেতে উঠেছেন যে গাঁয়ে পসার না মাটি হয়ে যায়! কোচ্-গিন্নী চোখে যেন অন্ধকার দেখলেন। কিন্তু কোচ্ দেখলেন সুস্থ ছাগলের রক্ত একেবারে পরিষ্কার রক্ত। সেই সুতোর টুকরোর মত কোনো কিছুর পাত্তাই নেই! তাহলে কি ওগুলোই জীবাণু! এ্যান্থ্রাক্স্-এর জীবাণু? কিন্তু প্রমাণ করতে হবে যে! জীবাণু যদি সত্যিই হয়, কোচ্ ভাবলেন, তা হলে প্রথমত ওগুলোকে জীবন্ত হতে

হবে। ওগুলো কি বাস্তবিক জীবন্ত? কেমন করে বোঝা যাবে জীবন্ত কি না?

"একটা অবশ্য সহজ উপায় ছিলো। সুস্থ গরু ভেড়ার রক্তে ওই সুতোরে মত জিনিষ কিছুটা ঢেলে দেওয়া। তারপর যদি দেখা যায় যে এই সুস্থ গরু ভেড়াও এ্যানথ্রাক্স্-এ মারা যাচ্ছে, এবং মারা যাবার পর তাদের রক্ত পরীক্ষা করে যদি ওই সুতোর মত জিনিষ দেদার আবিষ্কার করা যায়, তা হলেই ব্যাপারটা প্রমাণ হয় না কি? কিন্তু গরীব মানুষ, অত গরু-ভেড়া কিনে পরীক্ষা করবার পয়সা কোথায়? কোচ্ তাই একটা নতুন বুদ্ধি বের করলেন। ভাবলেন: যদি সত্যি জীবাণুই হয় তা হলে শুধু গরু-ভেড়ার রক্তে বাড়বে কেন? ইঁদুরের রক্তেও ত একই ভাবে বাড়তে থাকবে। কোচ্-গিন্নী একেবারে গালে হাত দিয়ে বসে পড়লেন, দেখলেন— কর্ত্তা'র ডাক্তারী চুলোয় যাচ্ছে, এক খাঁচা ইঁদুর পুষতে সুরু করেছেন!

"কিন্তু কোচ্-এর কি সে খেয়াল আছে? ইনজেকসন দেবার একটা ভালো সিরিঞ্জও বোধ হয় বেচারার ছিলো না। তাই তিনি একটা শক্ত কাঠের টুকরো খুব ছুঁচলো করে কাটলেন, তার ডগাটা ভালো করে আগুনে গরম করে নিলেন—নইলে হয়ত অন্য জীবাণু সেখানে লেগে থাকবে। তারপর সযত্নে সেই ডগাটা এনথ্রাক্স্-এর কালো রক্তে ডুবিয়ে বিঁধিয়ে দিলেন একটা ইঁদুরের গায়ে।

"পরের দিন, কোচ্ যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। দেখলেন ইঁদুরটা একেবারে চীৎপটাং! তাড়াতাড়ি মরা ইঁদুরটার একটু রক্ত অনুবীক্ষণ দিয়ে পরীক্ষা করে কোচ্ দেখলেন সেই সুতোর টুকরোর মত জিনিষ গিজগিজ করছে! তাহলে এগুলো নিশ্চয়ই জীবাণু, নিশ্চয়ই প্রাণ আছে এগুলোর। কাঠের ডগার রক্তে মাত্র শ'কতক ছিলো, তার থেকে মরা ইঁদুরের শরীরে একেবারে লক্ষ লক্ষ হয়ে গেল কেমন করে? নিশ্চয়ই এগুলো জীবাণুই। এই জীবাণুগুলোই এ্যানথ্রাক্স্-এর কারণ।

"কিন্তু একটা অত বড় কথা অমন সহজে কি আর প্রমাণ হয়? চাষীর দল এসে বললে—ডাক্তারবাবু, আপনার ওই ক্ষুদে ক্ষুদে সুতোর মত জীবগুলো আমাদের গরুছাগল শেষ করছে, এ কথা না হয় মানলুমই। কিন্তু আমরা ত আর আপনার মত ওই কঠিন যন্তর চোখে লাগিয়ে দেখি নে, শুধু চোখে যা দেখতে পাই তাই জানি। আমরা দেখি যে কতকগুলো মাঠ আছে যেখানে চরাতে নিয়ে গেলেই গরু-ছাগলগুলোর এই মারাত্মক রোগ ধরে। দিব্বি সবুজ মাঠ, ঘন ঘাস রোদে জলজল করছে। সে সব মাঠ ত' আর আপনার ক্ষুদে শয়তানে ভরতি নয়। সেখানে চরতে গেলেই আমাদের গরু-ছাগলগুলোর এমন দশা হয় কেন? কেন, তা কি আর কোচ্ ভেবে দেখেন নি। তিনিও জানতেন এ সমস্ত কথা। কিন্তু কোন হদিস ভেবে পাচ্ছিলেন না। ব্যাপারটা হল এই: এ্যানথ্রাক্স্-এর জীবাণুগুলোকে খোলা হাওয়ায় ফেলে রাখলে দুদিন পরেই মনে হয় মরে গিয়েছে। নড়েও না, চড়েও না, কেমন নির্জিব হয়ে পড়ে থাকে। তার মানে দিনের পর দিন খোলা মাঠের শীতগ্রীষ্ম সহ্য করবার শক্তি সেগুলোর নিশ্চয়ই নেই। অথচ, খোলামাঠেয় ঘাস খেয়েই যখন জীবজন্তু-গুলোর এ রোগ হয় তখন নিশ্চয়ই মানতে হবে দিনের পর দিন সেই ঘাসের মধ্যেই এই জীবাণুগুলো ওৎ পেতে বসে থাকে! কেমন করে তা সম্ভব? বাড়ীতে যথেষ্ট আদর যত্নের মধ্যেও যে বেশীদিন টিকতে পারে না মাঠের শীত-গ্রীষ্ম সহ্য করে সে কেমন ভাবে বাঁচতে পারে দিনের পর দিন,—বছরের পর বছর?

"কোচ্ কোনমতেই এ প্রশ্নের জবাব পাচ্ছিলেন না। কিন্তু আগেই বলেছি হেরে যাবার পাত্র তিনি মোটেই নন। পরীক্ষা করে চললেন অক্লান্ত ভাবে—নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা! শেষকালে একদিন এত খাটুনির ফল ফলল, কোচ্ আবিষ্কার করলেন আসল কারণটা। ক্ষুদে ক্ষুদে জীবগুলো বাস্তবিকই শয়তান, একেবারে পাকা শয়তান। তারা করে কি, আবহাওয়া একটু খারাপ হয়েছে

দেখলে নিজেরাই নিজেদের জন্যে একরকম খোলোসের মত তৈরি করে, আর তারপর গুগলির মত সেঁদিয়ে যায় সেই খোলসের মধ্যে। একবার সেই খোলসের মধ্যে সেঁদিয়ে যেতে পারলে সহজে আর মরতে চায় না। কী শীত, কী গ্রীষ্ম,—দিব্বি আরামে ঘাপটি মেরে পড়ে থাকে। কিন্তু গরু-ছাগল ত' আর এত সব জানে না, মাঠে চরতে গিয়ে ঘাসের সঙ্গে পেটে পোরে খোলস শুদ্ধু জীবাণু-গুলোকে। জীবাণুর দল গরু-ছাগলের পেটের ভেতর গিয়ে মহানন্দে খোলস থেকে বেরিয়ে আসে আর সাবাড় করে দেয় গরু-ছাগলগুলোকে। মহাভারতের সেই বাতাবী বলে রাক্ষসের কথা মনে আছে ত? অনেকটা সেই রকমই।

"এতদিনে কোচ-এর মন থেকে সমস্ত সংশয় ঘুচলো। এ্যানথ্রাক্স্-এর কারণ যে ক্ষুদে শয়তান সেকথার প্রমাণ হয়েছে, একেবারে নিখুঁত প্রমাণ। পৃথিবীকে এখন কথাটা শোনানো যায়, নির্ভয়ে শোনানো যায়। গ্রামের ডাক্তার কোচ্ চললেন সহরে, সঙ্গে নিলেন তাঁর সাধের অনুবীক্ষণ, কয়েকটা কাঁচের পাত্রে কিছু এ্যানথ্রাক্স্-এর জীবাণু আর একটা খাঁচায় এক খাঁচা ইঁদুর। সহরের বড় বড় পণ্ডিত কোচ্-এর কাণ্ডকারখানা দেখে একেবারে অবাক, চারদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল। ঠিক হল, কোচ্ এখন থেকে সহরেই থাকবেন—জীবাণু নিয়ে গবেষণা করবেন আর সহরের রুগী দেখবেন। কিন্তু, তাজ্জব ব্যাপার! অত হৈ চৈ পড়ল বটে, কিন্তু ডাক্তার হিসেবে কেউ আর কোচ্-কে ডাকতে আসে না। সংসার চলা ভার। ফলে কোচ্-কে আবার গ্রামেই ফিরতে হল। কোচ্ ভাবলেন সহরের হুজুগে লোকজনদের চেয়ে গাঁয়ের সাদাসিধে চাষারাই ভালো।

"কিন্তু, অত বড় পণ্ডিতকে টাকার অভাবে গাঁয়ে পড়ে থাকতে হবে কেন? বছর কতকের মধ্যেই সরকার থেকে ঠিক হল বড় চাকরী দিয়ে তাঁকে সহরেই নিয়ে আসা উচিত। কোচ্ এলেন বার্লিনে—প্রকাণ্ড ল্যাবরেটরী এল তাঁর হাতে। মনের সাধ মিটিয়ে তিনি লেগে পড়লেন ক্ষুদে শয়তানদের সম্বন্ধে আরও খবর জোগাড় করতে।

"গোড়া থেকেই কোচ্-এর মাথায় ঢুকেছিলো যে এক এক রকম জীবাণুর দরুণ এক এক রকম অসুখ হয়: পাঁচরকমের জীবাণু পাঁচরকমের অসুখের কারণ। কিন্তু মুস্কিল এই যে নানান জাতের জীবাণু প্রায় সব সময়েই একসঙ্গে জোট পাকিয়ে থাকে—আর জীবাণুগুলো এত ছোট ছোট যে এক জাতের জীবাণুগুলোকে অন্য জাতের জীবাণুগুলো থেকে ছাড়িয়ে আলাদা করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু, আলাদা করতেই হবে, নইলে পরীক্ষা করা কঠিন। আর শুধু আলাদা করা নয়, আরও একটা হাঙ্গামা আছে। জীবাণুগুলোকে চাষ দিয়ে কী করে বাড়ানো যায়? জীবাণুর চাষ শুনে তোমরা হয়ত অবাক হবে; কিন্তু চাষ দেওয়া ছাড়া আর কী বলা যায় বলো? চাষ করা কাকে বলে? মাঠে এক মুঠো ধান চাষ করে মানুষ এক মন ধান তৈরি করে। তেমনি, যে উপায়ে সামান্য কতকগুলো জীবাণু থেকে বহু জীবাণু করা যায় তাকে কি জীবাণুর চাষ দেওয়াই বলব না? অবশ্য এই চাষ দেবার উপায় সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা আগেই পাওয়া গিয়েছিলো: জীবাণুগুলোকে খাবার দাবারের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বেশ গরম একটা জায়গায় রেখে দিয়ে তারা হুহু করে সংখ্যায় বেড়ে বলে। গরম জায়গায় রাখবার কলও অনেকদিন আগে আবিষ্কার হয়েছিলো। তার নাম ইন্কিউবিটার—অনেকটা রেফরিজারেটারের মতই দেখতে, তফাৎ শুধু এই যে রেফরিজারেটারের মধ্যে জিনিষ কনকনে ঠাণ্ডা থাকে আর ইনকিউবিটারের মধ্যে থাকে গরম।

"বার্লিনে জীবাণু নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ একদিন কোচ-এর কপাল খুলে গেল। কপাল বলছি, কেন না ঘটনাটা ঘটল দৈবাৎ। তার আগে মরীয়ার মত তিনি চেষ্টা করছিলেন ক্ষুদে শয়তানদের এক একটা জাতকে আলাদা করে তারপর চাষ দিতে। কিন্তু কোনা মতেই তা পারছিলেন না। অথচ সেদিন তাঁর বার্লিনের

লেবরেটারিতে হঠাৎ একটা ঘটনা ঘটল যার থেকে উপায়টা গেলো বেরিয়ে। ভারি সহজ উপায়। আজকের দিনে কথাটা ভাবলে আমাদের অবাক লাগে অমন সোজা উপায়টা অত বড় পণ্ডিতের মাথায় আগে আসে নি!

"সেদিন কোচ্-এর টেবিলে পড়েছিলো একটা পেট-কাটা আলু সেদ্ধ। কোচ অবাক হয়ে দেখলেন সেই আলু সেদ্ধর গায়ে বীজগুড়ি বীজগুড়ি কিসের যেন দাগ! কিসের দাগ? কোচ তাঁর অনুবীক্ষণ নিয়ে ভালো করে দেখতে সুরু করলেন। একটা সরু তার দিয়ে আলুর গা থেকে সেই দাগী অংশর সামান্য একটু তুলে অনুবীক্ষণে চড়ালেন আর দেখলেন একেবারে অবাক কাণ্ড! শুধু একই জাতের জীবাণু তার মধ্যে কিলবিল করছে। ব্যাপারটা বুঝতে কোচের দেরি হল না। হাওয়ায় উড়ে এসে কয়েকটা জীবাণু নিশ্চয়ই এই আলু সেদ্ধয় আটক পড়েছে। আর সেখানে দিব্বি আরামে পেট পুরে খেয়েছে আর সংখ্যায় বেড়ে গিয়েছে। বাড়তে বাড়তে এত বেশী হয়ে পড়েছে যে দলে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হয়ে পড়েছে। এক একটাকে আলাদা করে নিলে অবশ্য জীবাণুগুলো বেজায় ছোট; কিন্তু কোটি কোটি জীবাণুর দঙ্গলকে এক সঙ্গে দেখবার জন্যে আর অনুবীক্ষণের দরকার পড়ে না, শুধু চোখেই দেখা যায়, শুধু চোখে দেখলে মনে হয় আলুর গায়ে কয়েকটা বীজগুড়ি বীজগুড়ি দাগ। কিন্তু, প্রত্যেকটা দাগই আলাদা আলাদা জাতের জীবাণুর দঙ্গল! এটাই কোচ্-এর কাছে সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগল। পাঁচ মেশালী জীবাণুর ভীড় নয়, এক এক জায়গায় এক এক জাতের জীবাণু! এমনটা হল কী করে? তিনি প্রাণপাত করেও যা করতে পারেন নি, সেদ্ধ আলুর টুকরোয় তা আপনি আপনি হয়েছে? কারণটা বের করতে কিন্তু কোচ্-এর বেশী সময় লাগলো না। আলুর গাটা যে চ্যাট্চ্যাটে। সেখানে যে জীবাণু এসে একবার আটক পড়েছে তারপরে আর অন্য জায়গায় সরে যাবার উপায় নেই। তরল কিছু হলে নিশ্চয়ই জীবাণুগুলো এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে এক জাতের সঙ্গে আর এক জাত একেবারে মিশিয়ে যেতো। আলুসেদ্ধ ভাগ্যিস তরল নয়, তা হলে বিজ্ঞানের অত বড় আবিষ্কার হয়ত অনেকদিন পেছিয়ে যেতো।

"যাই হোক, সেই সামান্য সেদ্ধ আলুর টুকরো থেকে কোচ এক বিরাট শিক্ষা পেলেন; জীবাণু চাষ করতে হবে চ্যাটচ্যাটে এক রকম খাবারের মধ্যে। তারপর চটপট তিনি বানিয়ে ফেললেন জীবাণুর জন্যে খুব মুখ-রোচক এক খাবার। ক্ষুদে শয়তানদের ক্ষুদে কপাল ভালোই বলতে হবে, নিরিমিষ আলুসেদ্ধ খেয়ে তাদের আর বেশী-দ্দিন থাকতে হল না। মাংসটাংস জাল দিয়ে এক চমৎকার চটচটে আর জীবাণুদের জন্যে দিব্বি মুখরোচক খাবার রান্না করা হল। কোচ্-এর ল্যাবরেটারীটার চেহারা তখন প্রায় বিরাট একটা রান্নাঘরের মতই!

"কোচ্ সেই খাবারের মধ্যে জীবাণুদের আলাদা আলাদা ভাবে চাষ দিতে সুরু করলেন। আর চালালেন তাঁর পরীক্ষা, নানান রকমের পরীক্ষা! আর অনুবীক্ষনের উপর ঝুঁকে পড়ে তন্ময় হয়ে দেখতে লাগলেন।

"কোচ্এর কাজ যত এগুতে লাগলো তত বোঝা গেল জীবাণুগুলো কী অসম্ভব রকম শয়তান! শুধু এ্যানথ্রাকস্ নয়; কোচ্ আবিষ্কার করলেন যক্ষ্মা রোগের কারণও এক জাতের জীবাণু। শুধু যক্ষ্মা নয়, কলেরার কারণ এক জাতের ক্ষুদে শয়তান। এমনি কত কি। ভেবে দেখো একবার এই সব সাংঘাতিক সাংঘাতিক রোগ যে কেন হয় কয়েক বছর আগেও পৃথিবীতে সে কথা কেউ জানতো না। আর একটা মজার খবর জানো? কোচ্ একবার কলকাতায় এসেছিলেন। এমনি বেড়িয়ে যাবার জন্যে নিশ্চয়ই নয়; তিনি এসেছিলেন কলেরার জীবাণু সন্ধান করবার জন্যে। আমাদের দেশে যত লোকের কলেরা হয় তত ত' আর ওদের দেশে হয় না, আর কলেরার রোগী যথেষ্ট না পেলে কলেরার কারণ কেমন করে আবিষ্কার করা যাবে?

চাক্ষুষ

পরিমল রায়

যাঁর শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন, পাইনে যে তাঁর সাড়া ?
—আজ্ঞে, তিনি ক'দিন হ'লো হঠাৎ গেছেন মারা।
মারা গেছেন ? বল কী হে ? মৃত্যু হলো কিসে ?
—আজ্ঞে, হ'লো সর্পাঘাতে, গেল মাসের ত্রিশে।
সর্পাঘাতে ? বল্‌ছো কী হে ? ছুব্‌লে ছিলো কোথা ?
—আজ্ঞে, দিলো নাকের ডগায়, নাকটা হ'লো ভোঁতা।
নাকের ডগায় ? আঃ বাঁচালে। ভোঁতা সে হয় হোক্ গে,
চক্ষুরত্ন পরম ধন বাঁচলো যে তাই রক্ষে !

ছোট বড়ো

পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী

বাড়ির কত্তামশা'য়ের ভীষণ অসুখ। খুব বাড়াবাড়ি অবস্থা ; এতো গম্ভীর এবং রাগী মানুষটা একেবারে নির্জীব হ'য়ে পড়েছেন। বাড়ি বোঝাই আত্মীয়-স্বজন, রুগীর ঘরে বসে মাথায় হাত দিয়ে ভাবছে কখন কী হয়। এমন একটা থমথমে ভাব যে ঘরে ঢুকলেই বোঝা যায় সাংঘাতিক একটা কিছু হ'য়েছে। মেয়েরা ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা বলছে মাঝে মাঝে, দু'জন লোক ব'সে হাওয়া করছে, বাড়ির ছোট ছেলেমেয়েরা একটু ক'রে উঁকি মেরেই পালাচ্ছে, আর মাঝেমাঝে সকলকে চমকে দিয়ে রুগী একবার উঃ-আঃ ক'রে উঠছে। ঘরের বাইরে বারন্দায় একজন, প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সের লোক পাইচারি করছিলেন গম্ভীর মুখে, ইনি কত্তামশায়ের বড়ো ছেলে, খুব মেজাজী লোক ;

বাড়ির ছোটরা এঁর সামনে দিয়ে চলাফেরা করেনা, বড়োরা কথা কম বলে, আত্মীয়রা দেখা হ'লে শুধু নমস্কার করে পালায়, কিন্তু ইনি খুব সাংঘাতিক কিছু করেননা কখনো। আসলে ইনি কত্তামশায়ের বর্তমানেই বাড়ির কর্তা।

বারন্দা থেকে ইনি ঘরে ঢুকলেন ; সকলে একটু নড়ে চড়ে বসলো। রুগীর দিকে একবার তাকিয়ে বসে পড়লেন তিনি একটা চেয়ারে, গালে হাত দিয়ে। একজন বৃদ্ধা জিগগেশ করলেন, 'বড়ো ডাক্তার কখন আসবে ?'

লোকটি কোন জবাব না দিয়ে জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রইলেন।

বৃদ্ধাটি এঁর জ্যাঠাইমা হন। আবার জিগগেস করলেন তিনি, 'ও নরেন, বড়ো ডাক্তার আজ আসছে তো ?'

লোকটির নাম নরেন, তবু চুপ ক'রে থাকেন তিনি।

জবাব না পাওয়াটা লজ্জার, তাই জ্যাঠাইমা এবার নিজেকে শুনিয়ে বললেন, 'কী জানি বাপু, কখন যে আসবে।'

নরেনবাবু একটু নড়ে চড়ে ভালো হ'য়ে বসে চোখ বুজলেন। যেন চোখ বুজলেই তিনি আর কারো কথা শুনতে পাবেন না।

একটু পরে একজন পনের বছরের ছেলে ঘরে ঢুকলো, তারপর কিছুক্ষণ চারিদিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে নরেন-বাবুর চেয়ারের কাছে গিয়ে ডাকলো, 'বড়োকাকা।'

উত্তর নেই। চোখ বুজে চুপ করে রইলেন তিনি।

ছেলেটি আবার জিগগেস করলো, 'বড়োকাকা, আমি কি আজ ইস্কুলে যাবো ?'

একটু দাঁড়িয়ে থেকে ছেলেটি ভাবছে চলে যাবে না থাকবে, এমন সময় আস্তে আস্তে চোখ খুলে তাকালেন বড়োকাকা, তারপর অত্যন্ত চাপা অথচ জোর গলায় ধমকে উঠলেন, 'বেরোও এখান থেকে। কেন এঘরে ঢুকেছো ?'

এতোগুলো লোকের সামনে ধমক খেয়ে লজ্জায় দুঃখে অল্প হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল ছেলেটি।

এমন সময় একজন বারন্দা থেকে বলে উঠলো, 'ডাক্তারবাবু এসেছেন।'

অত্যন্ত তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে এলেন এক ডাক্তার হাতে একটা ছোট ব্যাগ নিয়ে। ইনি ছোট ডাক্তার, আট টাকা ফি, প্রতিদিন দু'তিন বার ক'রে এসে দেখে যাচ্ছেন। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই নরেনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়লেন, অন্যান্য অনেকে চলে গেল ঘর থেকে। অত্যন্ত ব্যস্ত হ'য়ে ডাক্তার বাবু রুগীর বিছানার কাছে এসে পরীক্ষা করলেন রুগীকে তারপর উঠে দাঁড়িয়ে নরেনবাবুকে বললেন, 'সঞ্জয়বাবুকে কল দে'য়া হ'য়েছে, ঠিক বারোটায় আসবেন তিনি, কিছুতেই পাওয়া যেতোনা আজ, অনেক ক'রে ব'লে ক'য়ে, সিরিয়াস অবস্থা জানিয়ে রাজি করানো হ'য়েছে। এ'দিকে বালিগঞ্জে একবার আসবেন, তা'র মধ্যে মিনিট পাঁচেকের জন্যে দেখে যাবেন এ'খানে।……ভূপেনবাবুকেও খবর দেওয়া হ'য়েছে তো ?'

খুব মনোযোগ দিয়ে বিনীতভাবে শুনছিলেন নরেনবাবু, ডাক্তারবাবু যেন ওঁর বড়োকাকা, বললেন, 'কী জানি তাঁকে খবর দেয়া হ'য়েছে কিনা তা' তো'… ।'

প্রায় ধমকে উঠলেন ডাক্তারবাবু, 'কী আশ্চর্য, তবে এক্ষুণি তাঁকে ডাকবার ব্যবস্থা করুন, তিনি না থাকলে কী হবে ?'

ঘরের একজন, নরেনবাবুর ছোট ভাই, বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তিনি আসবেন বলেছেন সাড়ে এগারোটায়।'

নরেনবাবু কাঁচুমাচু হ'য়ে বললেন, 'আমার আর মনটন ঠিক নেই ডাক্তারবাবু, তাই…'

রেগে উঠলেন ডাক্তার, 'দেখুন এগুলো কিন্তু আমার পছন্দ হয়না আপনি বাড়ির মাথা হ'য়ে এ'রকম যদি…ছিঃ অন্যায়।…দেখুন জলটল সব ঠিক আছে কিনা, তখন যেন কোথায় সাবান, কোথায় কি না' ক'রে বেড়াতে হয়।…এই দেখুন বলেছিলুম যে আলমারিটাকে ঢেকে দেবেন একটা ভালো ফর্সা চাদর টাদর দিয়ে…একটু অপরিষ্কার কিছু

দেখলে সঞ্জয়বাবু একেবারে···যাক আমি আসছি এক্ষুণি একবার।' বলে বেরিয়ে গেলেন।

নরেনবাবু নীরবে সব শুনে তাঁর পেছন পেছন বাইরে পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে আবার আগের মতো গম্ভীর মুখে ঘরে ঢুকেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আলমারিটা কেন ঢাকা হয়নি। একজনের রোগ হ'য়েছে তো বাড়ি শুদ্ধ সব ঘিরে বসেছে তা'কে, কারুর খেয়াল নেই, সব কি আমায় করতে হবে! লক্ষ্মীছাড়া সব।' বলে ফের বসে পড়লেন।

একজন তাড়াতাড়ি ঢেকে দিলো আলমারিটা।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আবার এলেন ছোট ডাক্তারবাবু, তাঁর নাম অমরনাথ। ঘরে ঢুকতেই নরেনবাবু দাঁড়িয়ে জিগগেস ক'রলেন, 'কী ব্যাপার! এসেছেন নাকি?'

'না, না ব্যাপার আবার কি। সময় মতো ঠিক আসবেন তিনি, অতো ব্যস্ত হবেন না।' বলে চেয়ারে বসে একটা বাঙলা পত্রিকা পড়তে লাগলেন।

নরেনবাবু এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'কী যে হবে!' ডাক্তারবাবু কোনো জবাব না গুন্‌গুন্ করতে করতে বইয়ের পাতা ওল্টাতে লাগলেন।

নরেনবাবু খুসি মুখে বললেন, 'একটু চা খান ডাক্তারবাবু।'

'আরে না না মশায়, এখন আর চা'টা খায় না, রুগীর এই অবস্থা।'

'না তা'তে আর কি, আপনি একটু চা খাবেন?'

ডাক্তারবাবু সংক্ষেপে বললেন, 'থাক।'

সকলে চুপচাপ; হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন ভূপেনবাবু। কলকাতার সবচেয়ে বড়ো অস্ত্রচিকিৎসক ইনি, বিরাট লম্বা চেহারা, মুখটা এমন যে দেখলেই বোঝা যায় ইনি একজন প্রতিভাবান। অল্প হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকলেন, 'কেমন আছেন এখন?'

নরেনবাবু ও অমরবাবু একসঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন, নরেনবাবু নিজের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বসুন'।

ভূপেনবাবু বসলেন। নরেনবাবু সরে গেলেন একপাশে, অমরবাবু নিজের চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আছেন একরকম, বেশী ভালো বলতে পারি না, পাল্‌স্‌টা খুব উইক, এমনিতেও নির্জীব, দেখুন না আপনি।'

'হ্যাঁ দেখছি, আপনি বসুন।'

অমরবাবু ব্যস্ত হ'য়ে বললেন, 'না না, ঠিক আছি, এতক্ষণ ব'সেই ছিলুম।'

রুগীর ক্ষতস্থানটা পরীক্ষা ক'রে এসে হাত ধোবার জন্যে বারন্দায় গেলেন ভূপেনবাবু, পেছনে অমরনাথ। নরেনবাবু জল দিলেন হাতে।

অমরবাবু খুব আগ্রহ ভরে জিগ্‌গেস করলেন, 'বা পাশটাতো পচতে আরম্ভ ক'রেছে, না?'

বেশ জোরে হাসতে হাসতে ভূপেনবাবু বললেন, 'না না, পচবে কেন, বেশ আছেন; সঞ্জয়বাবু আসবেন, দেখে যাবেন, সব ভালো হ'য়ে যাবে।'

ভূপেনবাবু অস্ত্রোপচার করেছেন কত্তামশায়ে'র দেহে। কলকাতার মধ্যে ইনিই সবচেয়ে ভালো পারেন কাটাকুটি করতে, কিন্তু কাটবার পর থেকে রুগীর জীবনীশক্তি কমে যাচ্ছে; তাই সঞ্জয়বাবু আসছেন। সঞ্জয়বাবু বাঙলার সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার। এঁর দেখা পেলেই রুগী ভালো হ'য়ে যায়, কিন্তু দেখা পাওয়াই শক্ত। রুগীর অবস্থা খারাপ তাই এখন তাঁর ওপোরেই সকলের ভরসা।

ভূপেনবাবু বললেন, 'কোথায় আপনার সেই মেয়েটি কোথায়, ভারি সুন্দর চা খাইয়েছিলো সেদিন, একটু চা করতে বলুন তা'কে নরেনবাবু।'

অমরবাবু যোগ দিলেন, 'হ্যাঁ ভারি ভালো চা করে কিন্তু মেয়েটি, কী নাম যেন···।'

নরেনবাবু ব্যস্ত হ'য়ে জিগগেস করলেন, 'আপনিও খাবেন তো অমরবাবু?'

'তা একটু খেতে পারি।'

নরেনবাবুর হাসি পেলো মনে মনে, ভূপেনবাবু 'বড়ো

ডাক্তার' হতে পারেন, কিন্তু ডাক্তার তো! অমরবাবু এমন করছেন ভূপেনবাবুকে দেখে।

চায়ের হুকুম করবার জন্যে ভেতরে ঢুকলেন নরেনবাবু। দরজার কাছে লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিলো সেই ছেলেটি, বকুনি খাবার পর থেকে। সে মনে মনে হাসছিলো আর দেখছিলো বড়কাকা কেমন জব্দ হ'য়ে গেছেন দু'জন ডাক্তারের কাছে। দৌড়ে পালালো সে বড়োকাকাকে দেখে।

ঠিক বারোটায় সঞ্জয়বাবু এলেন। আশ্চর্য সময়ের হিসেব তাঁর।

ভূপেনবাবু আর্দ্ধেক চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালেন, ঘরের অন্য সকলেও দাঁড়ালো। সঞ্জয়বাবু একা ঘরে এলেন কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তিনি একাই দশজনের মতো, ঘরটা কেমন জমাট আবহাওয়ায় নিস্তব্ধ হ'য়ে প'ড়লো। অমরবাবু নিজের চেয়ারটা তুলে এগিয়ে দিলেন সঞ্জয়বাবুকে। ভূপেনবাবু সসম্ভ্রমে রুগীর অবস্থাটা বুঝিয়ে দিতে লাগলেন তাঁকে। অসুখের বিবরণটা একটা কাগজে লেখা আছে, সেটা চাইলেন ভূপেনবাবু। তাড়াতাড়ি টেবিলের ওপোর থেকে নিয়ে গিয়ে সঞ্জয়বাবুর হাতে দিয়ে, লজ্জার হাসি হাসতে হাসতে অমরবাবু বললেন, 'নমস্কার সার, ভালো আছেন!' সঞ্জয়বাবু না হেসে জিগগেস করলেন, 'ও, তোমার নামই অমরনাথ?' সার বললেই তিনি বুঝতে পারেন এ' তাঁর ছাত্র।

'আজ্ঞে হ্যাঁ।' অমরবাবু জবাব দিলেন।

'কোন্ ইয়ারে পাশ ক'রেছো তুমি?'

'থারটি ফোরে।'

'এ লেখাগুলো তোমারই তো? এ'তো ঠিক হয়নি, আর একটু গুছিয়ে লেখা উচিত, রোগটাতো সুবিধের নয়।' অমরবাবু একটা কি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু সঞ্জয়বাবু কথা শেষ ক'রেই ভূপেনবাবুর সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন।

ভূপেনবাবুকে প্রশ্ন করেন সঞ্জয়বাবু আর অমরবাবু তা'র উত্তর দিতে যান প্রতিবার। দু'তিনবার দেখে গম্ভীর হ'য়ে সঞ্জয়বাবু বললেন, 'তুমি চুপ করো, ওঁকেই বলতে দাও।'

লজ্জায় বোকার মতো হাসতে লাগলেন অমরবাবু। নরেনবাবু এ'টা লক্ষ্য করলেন।

রুগীর ক্ষতস্থানটা দেখতে দেখতে সঞ্জয়বাবু ভূপেনবাবুকে যা' বলতে লাগলেন তা'তে বোঝা গেলো ভূপেনবাবু কী যেন ভুল ক'রেছেন। মৃদু মৃদু হাসছেন তিনি ভুল ধরা পড়ায়।

বিছানার চারিদিকে অনেকে দাঁড়িয়ে, একজন ভয়ে ভয়ে হাওয়া করছে, জানলাটা ভরে গেছে ছোট ছেলেমেয়েদের ভিড়ে, আর সেই ছেলেটি রুগীর বিছানার কাছে এসে অমরবাবুর গা ঘেঁসে ক্ষতস্থানটা দেখছে। তা'র কেমন মনে হচ্ছে বড়োকাকাকে ভয়ের কিছু যেন নেই, একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি, তাঁরও মুখে মৃদু হাসি। আর ছোট ডাক্তারবাবুকে এমনই ছোট মনে হ'চ্ছে যে তাঁর গা ছুঁয়ে দাঁড়াতে কিছুই ভয় হচ্ছে না তা'র। সকলে তাকিয়ে আছে সঞ্জয়বাবুর দিকে, তিনি যে ছবিটার দিকে তাকাচ্ছেন সকলে সেই সেইদিকেই দেখছে, তিনি অতি অল্প হাসলে সকলে শব্দ ক'রে হাসিতে যোগ দিচ্ছে, তাঁর সব কথাই যেন হাসির। তিনি কিন্তু তাকাচ্ছেন না কারো দিকে।

হঠাৎ সঞ্জয়বাবু বললেন, 'তোমার কি চাই খুকু, শিগগির পালাও।'

সকলে দেখলো, এই ফাঁকে একটি ছোট্ট মেয়ে কখন ঢুকে পড়েছে ঘরে। ছেলেটি তাড়াতাড়ি তা'কে অল্প ধাক্কা দিয়ে বললে, 'এই যা, পালা, যাও শিগগির।'

মেয়েটি ক্ষুণ্ণ হ'য়ে চলে গেলো।

সঞ্জয়বাবু বললেন, 'তুমিও যাও, এখানে ভীড় করে না।' ছেলেটি দেখলো বড়োকাকা তাকাচ্ছেন তার দিকে কটমট ক'রে। তাড়াতাড়ি পালালো সে, তারপর জানলার থেকে ঠেলে নাবালো অন্য ছেলে মেয়েদের। তা'রা সকলে ছোট এ'র থেকে।

চলে যাবার সময় ভূপেনবাবুকে আড়ালে ডেকে যা'

বললেন সঞ্জয়বাবু তা' বকুনিই বলা যায়। ভূপেনবাবু বুঝতে পেরে খুবই লজ্জিত। বাঙ্‌লার একজন বড়ো ডাক্তারের ভুল।

সঞ্জয়বাবু গাড়িতে উঠলেন। অমরবাবু তাঁর ব্যাগটা পৌঁছে দিয়ে বললেন, 'আচ্ছা নমস্কার সার।'

সঞ্জয়বাবু মাথাটা একবার নীচু করলেন শুধু।

তাঁর গাড়ি যখন তাঁর বাড়ির গেটের মধ্যে দিয়ে ঢুকলো, দরওয়ানটা বসে ছিলো, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম করলো। হল ঘরেব মধ্যে দিয়ে যখন ভেতরে গেলেন, যারা বসেছিলো, দু'একজন ডাক্তার আর রুগী, সকলে ওঠে দাঁড়ালো, আর তাকিয়ে রইলো তাঁ'র পেছনদিকে। একজন মহাপুরুষ চলেছেন যেন! বাড়ির ভেতরে প্রায় সকলে সজাগ হ'য়ে পড়লো।

সঞ্জয়বাবু নিজের ঘরে গিয়ে, পোষাক ছেড়ে, একটু শুয়ে পড়ে জিরিয়ে নিলেন, তারপর তোয়ালেটা কাঁধে ফেলে, বাথরুমের দিকে চললেন। দালানের মতো ঘরটাতে, তাঁর অতি বৃদ্ধা মা বসেছিলেন, তাঁকে দেখে জিগগেস করলেন, 'কেরে ক্যাবলা, নাইতে যাচ্ছিস নাকি?'

সঞ্জয়বাবুর ছেলেবেলার ডাকনাম ক্যাবলা ছিলো, তাঁর মা এখনো ওই নামেই ডাকেন তাঁকে।

সঞ্জয়বাবু বললেন, 'হ্যাঁ মা, ক্ষিদে পেয়ে গেছে খুব, খাবার দিতে বলো, আমি পাঁচ মিনিটেই সেরে নিচ্ছি আজ।'

'আজ আর চান করবি কি! তোর না সর্দি হয়েছে?'

সঞ্জয়বাবু হাসলেন, 'না সে একটু হয়েছিলো সেরে গেছে।'

'না না, আজ আর কাল চান ক'রে কাজ নেই। যাও।'

'আচ্ছা থাক', বলে ফিরে গেলেন সঞ্জয়বাবু, তারপর লুকিয়ে অন্য বাথরুমে চানটা চট করে সেরে এসে খেতে বসলেন মা'র সামনে।

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

ভবতোষবাবু কাগজগুলো গুছিয়ে টেব্‌ল্‌-এ রাখলেন।

চুপচাপ। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। অশোক সমুদ্রের দিকে অলস ভাবে চেয়ে কী যেন ভাবছে। কুঁচকে উঠেছে তার বাঁ কপালের শিরা, তার ডানহাত বেতের চেয়ারের হাতলে, বাঁ হাতের আঙ্গুল দিয়ে সম্পূর্ণ অর্থহীন ভাবে টেবিলের উপর টোক্কা দিচ্ছে।

সকলের চোখ অশোকের মুখের উপর; অশোকের চোখ সমুদ্রের উপর কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে!

স্তব্ধতা ভাঙ্গলেন দিদি। "কী ভাবছ অশোক?"

অশোকের মুখে খুব পাৎলা, খুব ঠাণ্ডা এক রকম হাসি ফুটে উঠল। বাঁ-দিকের কপালটা সহজ সরল হয়ে এলো। "ভাবছি," সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই অশোক বলল, "শাস্ত্রে আছে মুনি-ঋষিদেরও মাঝেমাঝে ভুলচুক হয়।"

"কিন্তু হঠাৎ এ কথার মানে?"

"মানে আর কিছুই নেই। এমনি বললাম।"

"উঁহু। এমনি বলবার ছেলে ত' তুমি নও।"

অশোকের মুখের ফিকে পাৎলা হাসি আস্তে আস্তে যেন জমাট বাঁধতে লাগলো। আপন মনেই বলল, "মুনি-ঋষিদেরই যখন ভুলচুক হয় তখন সামান্য প্রেতের ত' হতেই পারে। তবে এ প্রেত খুব সাধারণ প্রেত নয়, ধুরন্ধর প্রেত।"

"প্রেতের ভুলচুক?"

"হুঁ। তবে অনেকখানি নির্ভর করছে ভবতোষদা যে অনুবাদটা পড়লেন সেটা কতখানি খাঁটি অনুবাদ তার ওপর।"

"কিছুই বুঝছি না বাপু," ভবতোষবাবু বিব্রতভাবে বললেন, "হেঁয়ালী রেখে সোজা কথা বলো।"

"এখন কিছু বোঝবার দরকার নেই," অশোক বলল, "আপনি উঠে চান-খাওয়া করবেন যান। খাতাটা আর টাইপকরা কাগজগুলো আমায় দিয়ে যান। আমি ততক্ষণ কুনুকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে খানিকটা ঘুরে আসি।"

কুনু কী যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু অশোকের মুখের দিকে চেয়ে থেমে গেল। একটা কী রকম আদেশের ভঙ্গী অশোকের মুখে। কুনু বুঝল বেড়াতেই যাক আর বেড়াতে যাবার নাম করে নরকেই যাক, এখন তর্ক করবার উপায় নেই। মানতে হবে। আদেশের স্পষ্ট ছায়া অশোকের মুখে। ফলে, কোমর থেকে চাদরটা নামিয়ে কুনু উঠে পড়ল!

পুরোনো ঝুরঝুরে খাতা আর টাইপকরা কাগজগুলো গুছিয়ে নিতে নিতে অশোকও উঠে দাঁড়ালো। টেবিলের উপরকার চামড়ার ছোট বাক্‌সটার দিকে চেয়ে দিদিকে বলল, "ওটা খুব সাবধানে আমার ঘরে রেখে দিও। প্রেতের সঙ্গে লড়াই করতে হলে পদে পদে ওটার দরকার পড়তে পারে।"

তারপর অশোক আর কিছু বলল না। সোজা হাঁটতে সুরু করল ফটকের দিকে। কুনু বেচারা নিরুপায় ভিজে বেড়ালটির মত চলল তার পেছুপেছু।

ফটক পেরিয়েই অশোক বলল, "ত্রিবেদীকে চিনিস?"

কুনু অবাক হয়ে বলল, "কে ত্রিবেদী?"

"এখানের রামরুইয়া কলেজের অধ্যাপক। ভারি পণ্ডিত লোক।"

"কিন্তু আমি চিনব কেমন করে?"

"তাই ত বলছি। চ আমার সঙ্গে। আলাপ করে তৃপ্তি পাবি। এই গোটাকতক বাড়ির পরেই থাকেন। মারাঠি লোক; বিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু জানেন না হেন বিষয় নেই। বিশেষ করে এ অঞ্চলের ইতিহাস ও এদিকে প্রচলিত প্রত্যেকটি ভাষা সম্বন্ধে সত্যি অগাধ জ্ঞান। সমুদ্রের ধারে বেড়াতে বেড়াতে সেদিন আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। দুদণ্ড কথা বললেই বুঝবি কী অসাধারণ পাণ্ডিত্য!"

"দেখ অশোক," হাঁটতে হাঁটতে গোঁয়ার ঘোড়ার মত কুনু হঠাৎ থমকে দাঁড়ালো, "দেখ অশোক তুই ত জানিসই ছেলেবেলা থেকে কোনদিনই আমার পণ্ডিতদের সঙ্গে বনে না। ইস্কুলে হেড্‌-পণ্ডিত মশাই আমাকে কোনোদিন ক্লাসে বসতে দিতেন না, আমিও কোনোদিন তাঁকে নির্বিঘ্নে পড়াতে দিতুম না। পণ্ডিতেরা আমায় পছন্দ করেন না, আমিও কোনদিন—"

কুনুর বক্তৃতায় বাধা দিয়ে অশোক হঠাৎ বলে উঠল, "এই বাঁ দিকের বাড়িটাই। চ, তোকে মানুষ করে আনি!"

অধ্যাপক ত্রিবেদী অত্যন্ত সৌম্য প্রকৃতির ভদ্রলোক। কম কথা বলেন, কিন্তু যে কটি কথা বলেন তার প্রত্যেকটিই ওজন করা; শুনলেই বোঝা যায় অনেকখানি তলিয়ে হিসেব করে তবে বলছেন।

"আসুন মিঃ রায়।" ত্রিবেদী অশোককে দেখে আনন্দে যেন ভরে উঠলেন।

অশোক কুনুর সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিল।

"আপনিও কি আপনার বন্ধুর মত সমাজতত্ত্ব নিয়েই গবেষণা করেন?" ত্রিবেদী প্রশ্ন করল কুনুকে। কুনু ত'

অবাক! এই ত্রিবেদী বলে পণ্ডিতটি যদি পাগল না হয় তাহলে তার কথার একমাত্র মানে দাঁড়ায় এই যে অশোক সমাজতত্ব নিয়ে গবেষণা করে। অথচ, নেহাৎ পাগল ছাড়া এমন কথা আর কে বলতে পারে? গোয়েন্দাকে সমাজতত্বের গবেষক বলে মনে করা ত' সুস্থ মাথার লক্ষণ নয়। হতভম্ব হয়ে কুনু অশোকের দিকে চাইল; কিন্তু অশোকের মুখে সেই অদ্ভুত হাসি, যে হাসির মানে কুনু আজ পর্যন্ত আঁচ করতে পারলো না।

"কিন্তু মিঃ রায়," অধ্যাপক ত্রিবেদী বলে চললেন, "সেদিন আপনার সঙ্গে আলোচনা হবার পর ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি, নিজের সঙ্গে অনেক তর্ক করেছি। আপনার—"

অশোক বাধা দিয়ে বলে উঠল, "সে তর্ক আপনার সঙ্গে পরে হবে। আপাতত, একটা দায়ে পড়ে এসেছি। আপনি যদি একটু সাহায্য করেন—"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—"

"একটা খুব পুরোনো খাতা জোগাড় করেছি। সে সম্বন্ধে আপনার সঙ্গে কিছু আলোচনা করতে পারলে খুশী হতুম।"

"আমার সাধ্যে যতটুকু কুলোয় সানন্দে করব।"

"গুজরাটি ভাষায় লেখা খাতা। তা ছাড়া, এ অঞ্চলের পুরোনো ইতিহাসও কিছু পাওয়া যাচ্ছে। আমি না জানি এর ভাষা, না জানি এ অঞ্চলের কথা। তাই গোটাকতক জিনিষ আপনার কাছে যাচাই করিয়ে নিতে চাই। মনে হয়, খাতার লেখক শ'দেড়েক বছর আগে এ দিকে বাস করতেন। আপনাকে অনুরোধ করছি খাতাটা ভাষার দিক থেকে এবং ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে নির্ভুল কিনা বিচার করে দেখতে।"

খাতাটা হাতে নিয়ে ত্রিবেদী অতিমাত্রায় উৎসাহী হয়ে উঠলেন, "এটা যে একটা অতি প্রাচীন পুঁথি তা ত' চেহারা দেখলেই বোঝা যায়। কালিটা ফ্যাকাশে বাদামি হয়ে গিয়েছে, পাতাগুলো ঝুরঝুরে হলদে হয়ে গিয়েছে। নির্ভুল কি না প্রশ্ন করছেন কেন? এর মধ্যে থেকেই হয়ত এমন কয়েকটি দুর্মূল্য তথ্য পাওয়া যাবে যার ওপর নির্ভর করে প্রাচীন গুজরাটি ভাষা এবং এ অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে মতবাদগুলি যাচাই করে নেওয়া যাবে। খাতাটার যে বয়েস দেড়শ'র উপর তা ত' আপনি দেখেই বুঝতে পারছেন।"

"হুঁ। শুধু চোখে দেখে ত' তাই মনে হচ্ছে!"

ত্রিবেদী খাতাটার পাতা ওলটাতে ওলটাতে রীতিমতো উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তাঁর চোখদুটো চকচক করতে লাগলো। "মিঃ রায়," সোৎসাহে তিনি বললেন, "খাতাটা আমার কাছে রেখে যেতে পারেন? এর মধ্যে এমন সব কয়েকটা তথ্য পাচ্ছি যার ওপর নির্ভর করে প্রবন্ধ লিখলে প্রাচীন গুজরাটী সম্বন্ধে প্রচলিত থিয়োরীগুলো গুঁড়ো করে ভেঙ্গে ফেলতে পারব।"

"বেশ ত," অশোক বলল, "আজ দুপুর তিনটে নাগাদ এসে খাতাটা নিয়ে যাব। ততক্ষণ আপনি পড়ুন।"

"কিন্তু এ খাতা ফেরত নিয়ে আপনি করবেন কি? আপনি ত' এ ভাষা জানেন না। অথচ এ খাতাটা যদি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন তা হলে —"

"বেশ ত। সেটা আর এমন কি কথা হল! আজ দুপুর তিনটে থেকে শুধু পাঁচটা পর্যন্ত খাতাটা আমার চাই। তারপর আপনাকে দিয়ে দেব, আপনারা মহামূল্য প্রবন্ধ-ট্রবন্ধ লিখবেনখন্।"

ত্রিবেদী অবাক হয়ে অশোকের দিকে চেয়ে রইল।

কুনু অবাক হয়ে অশোকের দিকে চেয়ে রইল।

অশোক উঠে দাঁড়ালো।

"তা হলে আমি তিনটে নাগাদ এসে খাতাটা নিয়ে যাব; ইতিমধ্যে আপনি যদি একটু পড়ে রাখেন এবং আমায় যদি তখন জানান কোন কোন নতুন তথ্য আবিষ্কৃত হল, তাহলে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ বোধ করব।" তারপর কুনুর দিকে ফিরে "চল কুনু, আমাদের আবার এখুনি হর্নবি রোড্ যেতে হবে।"

"হর্নবি রোড্! সে আবার কি?

"সেখানেই ত' খবরের কাগজের বড় বড় আফিস।"

"কিন্তু", ত্রিবেদী ব্যগ্রভাবে বললেন, "আপনি খবরের কাগজে এখুনি খাতাটার খবর দেবেন না। তা হলে এখুনি এমন হৈ চৈ পড়িয়ে দেবে—। জানেনই ত' বোম্বাইএর কাগজওয়ালারা একটু ছুতো পেলেই লম্বাই-চওড়াই খবর ছাপিয়ে দেয়।"

"হুঁ, তাই ত দেখছি। এ খাতাটার কথা আমি কিছুই বলব না; তবে ওরা যে কেমন করে খবর জোগাড় করে সেটুকু জানবার আগ্রহ হয়েছে।"

অশোক উঠে দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করল, "তাহলে এখন উঠি। দুপুর তিনটে! কি বলেন?"

"হুঁ তিনটে!" খাতাটার প্রতি আত্মনিয়োগ করে ত্রিবেদী বললেন, "নমস্কার।"

পথে বেরিয়ে এল অশোক আর কুনু।

"তুই ঠিকই বলেছিলি, কুনু। পণ্ডিতেরা আসলে কোনো কাজেরই নয়!" অশোক পথে বেরিয়ে বলল— "জানতে চাইলুম খাতাটা ঠিক আছে কিনা আর ভদ্দরলোক ভাবতে বসলেন দেড়শ বছর আগেকার ইতিহাসটা ঠিক আছে কি না!" কুনু এসবের কিছুই মানে বুঝতে পারছিলো না। অবাক হয়ে অশোককে কি যেন জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো। কিন্তু অশোক তখন তীব্রভাবে মুখ দিয়ে "স্‌… স্‌…" করে শব্দ করছে। চীৎকার করে শিষ দেবার মতন অনেকটা! আরও অবাক হয়ে গেল কুনু যখন দেখল সেই শব্দের আহ্বানে পথের ধাবন্ত একটা ট্যাকসী বোঁ করে ঠিক ওদের সামনে এসে ব্রেক কসল।

"হর্নবি রোড্", গাড়ীতে উঠে অশোক ড্রাইভারকে বলল। তারপর পাশে কুনুর দিকে চেয়ে, "তুই ত' আর বোম্বাই সহর ঘুরে দেখলি নে। এখানে লোকজনকে ডাকতে হলে ওই রকম কুস্বর করতে হয়।"

ট্যাকসী ছুটে চলল। [ক্রমশঃ]

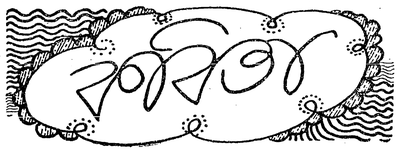

চাঁদটা

অমল চট্টোপাধ্যায়

কোডারমার কোনটা ঘুরে
মস্ত বড় পাহাড় ধারে
বলা কওয়া নেইকো হঠাৎ
দিল্লী মেল থামলো,
নীল আকাশে রূপোর চাঁদ
মুখ টিপে তার হাসলো।

কেউ বা গান গাইলো
কেউ বা শুধু কাসলো
এমন সময় হঠাৎ দেখি
দিল্লী মেল ছাড়লো—একি!
কাঁসি বাঁশির বালাই নেই
দিল্লী মেল চললো।
চাঁদটা কী যে ভাবলো!

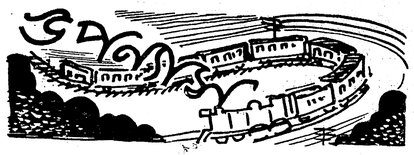

শ্বেত-চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

তিন নম্বরের চাক্তি

পরের দিন সকাল হতে-না-হতেই কলকাতার সমস্ত ছোটোবড় কাগজে বড় বড় হরফে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের হত্যাকাণ্ডের কথা ছাপা হয়ে গেলো। জয়কৃষ্ণ সামন্তর মৃত্যুর পর এতোটা হৈ-চৈ হয়নি। তার মৃত্যুকে 'রহস্যজনক' আখ্যা দিয়েই কাগজওলারা শান্ত ছিলো। কিন্তু রমেন মজুমদারের মৃত্যুর পর কোনো এক উৎসাহী সংবাদদাতা রাতারাতি অনেক সব তথ্য সংগ্রহ করে ফেলেছিলো। জয়কৃষ্ণ'র মৃত্যু যে রহস্যজনক আত্মহত্যা নয় এ-কথা সবাই জানলো রমেন মজুমদারের মৃত্যুতে। আর হত্যাকারী যে বিভিন্ন নয় সে-বিষয়েও কাগজওলারা নিঃসন্দেহ হয়েছে ওই শাদা চাক্তির ব্যাপারে।

সকালবেলায় আজ রোদ উঠেছে। গত কয়েকদিনকার ঝুপঝুপে বৃষ্টির ভুতুড়ে আবহাওয়ার চিহ্নমাত্র কোথাও লেগে নেই। রাতারাতি যেন অদ্ভুত একটা ম্যাজিক হয়ে গেছে! কালো-কালো মেঘগুলো একেবারে নিশ্চিহ্ন। কয়েকদিন ধরে ক্রমাগত বৃষ্টি পড়ার পর বাতাস থেকে ধূলোর কণা একেবারে ধুয়ে গেছে। আজ সকালের কলকাতার আকাশ হঠাৎ যেন নীল হেসে সবাইকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। বাংলাদেশে বর্ষাকালে এ-রকম আচমকা খাপছাড়া দিন মাঝেমাঝে দেখা দেয়। সকালের এই আকাশ আর সোনার মতো এই রোদ মন থেকে সব রকম কালো ছায়া নিয়ে যায় উড়িয়ে।

অনেক আগেই খবরের কাগজ পড়া শেষ করেছিলেন ধনঞ্জয়। তারপর মাধব সেটা অধিকার করেছে। উত্তেজিত মুখচোখ নিয়ে মাধব সমস্ত কাগজটা যেন গিলে খাচ্ছে। ধনঞ্জয় তার পড়ায় কোনো রকম বাধা না দিয়ে অতি ধীর ও শান্ত ভাবে ঘরের সমস্ত জানালা-দরজাগুলো একে একে খুলে দিলেন। বাইরের নীল আকাশ আর সোনালী রোদের ঔজ্জ্বল্যে সমস্ত ঘরটা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে হেসে উঠলো।

জানালা-দরজা খুলে ধনঞ্জয় আবার এসে নিজের জায়গায় বসলেন। ততক্ষণে খবরের কাগজের শেষ লাইনটাও মাধবের খুঁটিয়ে পড়া হয়ে গেছে। উত্তেজিত-ভাবে মুখ তুলে সে যেন কী বলতে গেলো।

তাকে বাধা দিয়ে উঠলেন ধনঞ্জয়। "বাইরে একবার চেয়ে দেখুন মাধববাবু! চমকে উঠবেন না, পুলিশের লোক আমাদের ধরতে আসেনি! আমি এই আশ্চর্য সকালবেলার কথা বলছিলুম। এই শান্ত নীল রঙের আকাশের দিকে চেয়ে কি মনে হয় মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগে আমাদেরই কাছাকাছি জায়গায় একটা বীভৎস হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে?"

"কী জানি কবিরাজমশাই! গত রাত্রের ব্যাপারটা এখনো ঠিকমতো বিশ্বাস করতেই পারছি না। দুঃস্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে। রাতে আমার তো ঘুম হয়নি, ছেলেটাও ঘুমোয়নি।"

"ঘুমোয়নি?" একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলেন ধনঞ্জয়।

"একেবারেই না। সমস্ত রাত ধরে সে পায়চারি করছে। রমেনকে সে চিনতো। শ্যামবাজারে তার একটা বই-এর দোকান ছিলো। সেখান থেকেই সে নিজের সমস্ত বই কিনতো। সবাইকে কিনতেও বলতো।"

"সঞ্জীবের মুখে তার কথা অনেকবার শুনে আমিও রমেনবাবুর দোকানে কয়েকবার গিয়েছি।" বলতে-বলতে ধনঞ্জয়ের প্রশান্ত মুখে বেদনার কালো ছায়া যেন নেমে এলো। "আমার সঙ্গেও অল্পবিস্তর আলাপ ছিলো রমেনবাবুর। চমৎকার ছোট্ট দোকান। যে-বই দোকানে থাকতো না—সমস্ত কলকাতা ঘুরে সে-বই তিনি জোগাড় করে এনে দিতেন। কী অদ্ভুত উৎসাহ তাঁর ছিলো! কে জানতো হঠাৎ এ ভাবে অপঘাতে তিনি মারা যাবেন!"

"কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয়?" মাধব অসহিষ্ণু হয়েই প্রশ্ন করলো।

"দেখুন মাধববাবু", গলার কাছটা পরিষ্কার করে ধনঞ্জয় বললেন, "সমস্ত ঘটনাটা এতোই আকস্মিক আর অদ্ভুত যে মনে অনেক কিছুই হয়। আমার তো মনে হয় খবরের কাগজগুলো যত আবোল-তাবোলই বকুক না কেন, একটা জিনিস তারা ঠিক ধরেছে। সেটা ওই শাদা চাক্তি এবং সেই চাক্তির ওপর লাল কালিতে লেখা 'এক' আর 'দুই' সংখ্যাগুলো। ওগুলোর বিষয় একটু মন দিয়ে ভাবুন। জয়কৃষ্ণ'র মৃতদেহ যখন পাওয়া গেলো তখন সেই ঘরেই আলোর সুইচে টাঙানো ছিলো একটা শাদা চাক্তি। তাতে লেখা ছিলো এক। তারপর মারা গেলেন রমেন মজুমদার। তাঁর পকেটও পাওয়া গেলো ওই শাদা চাক্তি। তাতে লেখা দুই। এর থেকে মনে হয় এই দুটি হত্যাকাণ্ডের পেছনে রয়েছে হয় কোনো বিশেষ একটি দল, নয় কোনো বিশেষ একটি মানুষ। যে-ই থাকুক সে যাকে মারতে চায় প্রথমে ডাকে তার কাছে পাঠায় ওই একটি শাদা চাক্তি। দেখে শুনে মনে হচ্ছে তার কাছে একটা লম্বা ফর্দ আছে। সেই ফর্দ মিলিয়ে এক-দুই করে সে লোকদের কাছে প্রথমে শাদা চাক্তি পাঠাচ্ছে। তারপর করছে তাদের হত্যা!"

উত্তেজিত হয়ে মাধব প্রশ্ন করলো, "আপনি কি মনে করেন সেই খুনে লোকটার ফর্দটা বেশ লম্বা? মানে এ-ভাবে আরো অনেক লোক সে মারবে?"

প্রশ্ন শুনে ধনঞ্জয় আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি যখন গম্ভীর হন তখন একটিও বেফাঁস বাজে কথা বলেন না। প্রত্যেকটি কথাই খুব ধীরে ধীরে, যেন ওজন করে বলেন। "আমার তো তাই মনে হয়। অনেকগুলি নাম ফর্দতে না থাকলে সেই হত্যাকারী কখনো মাত্র দুজনকে হত্যা করার জন্যে এই রকম শাদা চাক্তি আর তার ওপর লাল সংখ্যাগুলো লিখতো না।"

"কী ভয়ানক! কী সর্বনাশ—" বলতে বলতে মাধবের গলা যেন বুজে গেল।

ধনঞ্জয় বলে চললেন, "এই হত্যাকারী যেই হোক, সাধারণ মোটেই নয়—"

তিনি আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু খোলা দরজা দিয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিত ঘরে ঢোকায় থামলেন। রঞ্জিতকে দেখে মাধবের উত্তেজনা আরো বেড়ে গেলো। কিন্তু ধনঞ্জয়ের বিশেষ কোনো ভাব পরিবর্তন বোঝা গেলো না। একটু হেসেই তিনি বললেন, "আসুন, আসুন, রঞ্জিতবাবু। আপনাকেই আশা করছিলুম! একটু চা চড়িয়ে দি, কী বলেন?

সামান্য অপ্রস্তুত হেসে রঞ্জিত বললো, "আমার সৌভাগ্য! তবু কেউ আমাকে দেখে অভ্যর্থনা করেন! এমনি চাকরি করি যে মানুষের সঙ্গে দু'দণ্ড মন খুলে যে গল্প করবো কিংবা আলাপ-আলোচনা করবো তার উপায়

নেই। আমাকে দেখলেই লোক কেমন যেন তটস্থ হয়ে যায়। সবাই ভাবে বুঝি তাদের ধরবার জন্যেই সবসময় আমি ষড়যন্ত্র করছি!"

"সে দোষ আপনার নয়, আপনার ওই বেশভূষার। আপনি যদি ওই খাকি কোর্তা ছেড়ে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে আসতেন তা হলে আপনাকে আমাদেরই একজন বলে ভাবতে কষ্ট হোতো না।"

বলে ধনঞ্জয় পাশের ঘরের ইলেকট্রিক স্টোভে চায়ের জল চড়িয়ে এলেন।

"রমেন মজুমদারকে আপনি হয়তো চিনতেন, তাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু খবর নিতে এলুম।" রঞ্জিত বললো।

ধনঞ্জয় বললেন, "তাঁর সম্বন্ধে এমন কোনো বিশেষ খবর জানি না যা আপনাকে জানাতে পারি। তিনি বিশিষ্ট একটি ভদ্রলোক, শ্যামবাজারে বইএর দোকান আছে, সঞ্জীবের কাছে শুনেছি এ-পাড়ায় তাঁর বুড়ি দিদিমা থাকেন, প্রত্যেক শুক্রবার নিয়ম করে তাঁর খবর নিতে তিনি আসেন। কবিরাজি ওষুধ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আস্থা ছিলো না। আমাকে বারবার বলতেন কবিরাজি ছেড়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করতে এবং হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার একটি ভালো বই ছোটো করে লিখে দিতে—কারণ সে-বই-এর বাজার নাকি খুব ভালো। তাঁর সম্বন্ধে হয়তো কোনো দরকারী খবর মাধববাবুর ছেলে সঞ্জীবের কাছে পাবেন। সঞ্জীব তাঁকে অনেক দিন ধরে চিনতো।"

"সঞ্জীববাবু যে তাঁকে অনেক দিন ধরে চিনতেন সে-খবর আমি পেয়েছি।" গম্ভীর স্বরেই বললো রঞ্জিত।

তার কথা শুনে মাধবের মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশে ঠেকলো। কিন্তু ধনঞ্জয়ের কোনো ভাব পরিবর্তন হোলো না।

শান্ত গলায় তিনি আবার কথা বলতে স্থুরু করলেন, "আপনি আসার আগে মাধববাবুর সঙ্গে এই অদ্ভুত হত্যাকাণ্ড নিয়েই আলোচনা চলছিলো। আপনার কি মনে হয় না এই দুই হত্যাকাণ্ডের পিছনে রয়েছে একটি মানুষ কিংবা বিশেষ একটি দল?"

"মনে তো তাই হয়, কাগজেও তাই লিখছে দেখছি।"

"কাগজে কিন্তু এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু ভুল লিখেছে বলে মনে হয় না। আমার আরো মনে হচ্ছে হত্যাকারী যেই হোক নেহাৎ বাজে সাধারণ খুনে সে নয়। বিরাট একটা ষড়যন্ত্র সে করেছে। সেই ষড়যন্ত্রকে সফল করার জন্যেই একটির পর একটি হত্যাকাণ্ড সে চালাবে।"

"আরো চালাবে?"

"অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। এবং এমন নিখুঁতভাবে চালাবে যাকে বাধা দেওয়া খুব কঠিন। কারণ সে তো জানেই দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের পর তার শাদা শক্তির ব্যাপারটা পুলিসে নিশ্চয়ই ধরতে পারবে। আর আগের দুটি ঘটনা থেকে তো মনে হয় যাকে সে হত্যা করতে চায় তাকে আগে থেকেই সে পাঠায় একটি শাদা চাক্তি সংখ্যা বসিয়ে। তাই এ-কথা ভাবা খুব অন্যায় নয় ভবিষ্যতে যাকে সে হত্যা করতে চাইবে তাকেও সে পাঠাবে একটি শাদা চাক্তি। চাক্তির ওপর লেখা থাকবে 'তিন'। অন্তত সমস্ত ঘটনার কথা ভালো করে ভেবে দেখলে এই সম্ভাবনার কথাই মনে হচ্ছে। অবশ্য আপনারা পুলিশের লোক, এই নিয়েই আপনারা ভেবে থাকেন—আমার মতো সাধারণ মানুষের চেয়ে আপনারা যে অনেক ভালো বুঝবেন সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

রঞ্জিত গম্ভীর হয়ে বললো, "পুলিস যে সব সময় ঠিক-ঠিক ভাবে সে কথা আমি মনে করি না। তারা নিতান্তই ছক-কাটা রাস্তায় চলে। কিন্তু বহু মানুষ সম্বন্ধে আপনার অভিজ্ঞতার কথা সবাই জানে। আপনার এ-বিষয়ের ধারণা তাই অনেক বেশি আমাদের সাহায্য করবে। সত্যি কথা বলতে কি ওই চাক্তি নিয়ে আমরা অনেক ভেবেছি, কিন্তু তিন নম্বরের চাক্তি যে কেউ পেতে পারে এবং তাকে যে হত্যা করার চেষ্টা হতে পারে সে-কথা আমার একবারও মনে হয়নি! অবশ্য এ-ধরণের ব্যাপার যে ঘটবেই সে-কথা আমি কিন্তু জোর করে বলতে পারি না। তবে আপনার কথার এ-টুকু নিশ্চয়ই মেনে নোবো যে এ-ধরণের একটা সম্ভাবনা খুবই আছে।"

ধনঞ্জয় মন দিয়ে রঞ্জিতের কথা শুনেছিলেন, কথা শেষ হলে নিঃশব্দে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে তিন পেয়ালা চা তৈরি করে আনলেন।

মাধব চায়ের পেয়ালায় এক চুমুক দিয়ে খানিকটা যেন বল পেলো। গলা ঝেড়ে সে বললো, "কবিরাজমশাই-এর ওই তিন নম্বর চাকতির কথাটা যদি ঠিকই হয় তা হলে মানতেই হবে হত্যাকারী দারুণ একটা বেপরোয়া লোক। কাউকেই সে মানে না। পুলিশকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কারণ সে তো নিশ্চয়ই জানে তিন নম্বরের চাক্তি কেউ পেলেই সোজা পুলিশের কাছে গিয়ে সে হাজির হবে আর পুলিশও তাকে বাঁচাবার কোনো রকম চেষ্টার ত্রুটি করবে না।"

"আর সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে এতোই নিশ্চিত যে পুলিশও তাকে বাধা দিতে পারবে বলে সে মনে করে না!" ধীরে ধীরে ধনঞ্জয় বললেন। "অবশ্য এর সমস্তটাই আমাদের কল্পনা ছাড়া কিছুই নয়! —কিন্তু একটা ব্যাপার ঠিক বুঝতে পারছি না। মানলুম জয়কৃষ্ণে'র কোনো শত্রু থাকতে পারে, চোরাই মাল কেনাবেচা নিয়ে তার সঙ্গে কারুর ঝগড়া হতে পারে এবং তার ফলে তাকে তার শত্রু হত্যা করেছে। কিন্তু রমেন মজুমদারের শত্রু কে? তাঁর মৃত্যুতে কার কি লাভ? যে-লোক জয়কৃষ্ণকে মারলো সে-ই কেনো মারলো রমেন মজুমদারকে? জয়কৃষ্ণের সঙ্গে রমেনের কোনোরকম যোগাযোগ যে থাকতে পারে এ-কথা সহজে বিশ্বাস হয় না।"

"ঠিক তাই।" চায়ের পেয়ালা নামিয়ে রঞ্জিত বললো, "কথাটা কাল রাত থেকেই আমার মাথায় ঘুরছে। অথচ এই সময়ের মধ্যে যতই খবর নিচ্ছি ততই দেখছি জয়কৃষ্ণের সঙ্গে রমেনের কোনো রকম যোগাযোগই নেই। এমন কি তারা যে পরস্পরকে চিনতো এমন কথাও কেউ বলতে পারছে না।"

এমন সময় মাধবের দোকানের এক কর্মচারী সকালের ডাকে-আসা মাধবের চিঠিগুলো পৌঁছে দিয়ে গেলো: দুটো পোস্টকার্ড, একটি খাম। খামটা বালির কাগজে তৈরি, ঠিকানাটা টাইপ করা। সেটা ছিঁড়ে ফেলেই মড়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেলো মাধবের মুখ। ভিতরে কোনো চিঠি নেই। শুধু শাদা একটা গোল চাক্তি। এবং তার উপর লাল কালিতে শুধু একটি সংখ্যা লেখা: "তিন"।

ঘরের ভিতর মুহূর্তের মধ্যে যেন বজ্রপাত হোলো। তার প্রচণ্ড শব্দে আর চোখ-ধাঁধনো আলোয় সবাই যেন অবশ হয়ে গেছে। কারুরই যেন আর একটি আঙুল নাড়াবারও শক্তি নেই।

[ক্রমশ]

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল

লড়াই যে শেষ হয়েছে এ কথা যেন বিশ্বাস হতে চায় না। এখনো চারদিকে ছোটো-বড় নানা রকমের সংঘর্ষ চলেছে। বাজারে জামা কাপড় নেই, খাবার-দাবার নেই, ওষুধপত্র নেই। ব্ল্যাক-আউট উঠে গেলেও রাস্তায় ভালো রকম আলো এখনো চোখে পড়ে না। মিলিটারি লরির প্রচণ্ড শব্দে এখনো চমকাতে হয়। খাকি কোর্তার মিছিল এখনো দৃষ্টিকে পীড়িত করে। মোট কথা এমন অবস্থায় আছি যে বিশ্বাস করাই কঠিন সত্যিকারের লড়াই থেমেছে।

কিন্তু একটি ব্যাপারে এই প্রথম অনুভব করা গেলো লড়াই থেমেছে। সে-কথা সবাই তোমরা জানো : এ-বছর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের ভারতবর্ষে আসা এবং ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের ক্রিকেট খেলা।

অস্ট্রেলিয়া সম্বন্ধে ছুটি খবর সবাই আমরা জানি। সে-দেশ ক্যাঙারুর দেশ আর ক্রিকেটের দেশ। বিশেষ করে ক্রিকেটের। ক্রিকেট বলতেই ব্র্যাডম্যানকে বোঝায় এবং ব্র্যাডম্যান বলতেই বোঝায় অস্ট্রেলিয়াকে। আমাদের বহুদিনের আশা ছিলো কোনো না কোনো দিন ভারতবর্ষের মাটিতে ব্র্যাডম্যানকে দেখবো। কিন্তু যারাই খেলাধূলোর খবর রাখো তারাই জানো ব্র্যাডম্যান আর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট ম্যাচে নামবেন না।

যে-ক্রিকেট দল এবার ভারতবর্ষে আসছে তারা অস্ট্রেলিয়ার প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট দল নয়। তবু তারা যে নেহাত বাজে দল এমন কথা ভাববারও কোনো কারণ নেই। বিশেষ করে ভারতবর্ষে আসার আগে ইংলণ্ডের সঙ্গে লড়াই থামার টেস্ট খেলায় তারা যে রকম কৃতিত্ব দেখিয়েছে সত্যিই তা প্রশংসার যোগ্য।

১৯৩৫ সালে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল প্রথম আসে ভারতবর্ষের সঙ্গে ক্রিকেট খেলতে। সে-দলের অধিনায়ক ছিলেন জ্যাক রাইডার, এবং চার্লস্ ম্যার্কার্টনি ছিলেন অন্যতম বিখ্যাত খেলোয়াড়। প্রায় দশ বছর হতে চললো অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট খেলা আমরা শেষবার দেখেছি। সে-বার সত্যিকারের টেস্ট খেলা হয়নি, এবারও সত্যিকারের টেস্ট খেলা হবে না। আশাকরা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দলের সত্যিকারের টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হবে। কারণ আজকের দিনে ভারতবর্ষের ক্রিকেট দল পৃথিবীর কোনো ক্রিকেট দলের চেয়ে পিছিয়ে নেই।

দশ বছর পরে আজ অস্ট্রেলিয়ার যে ক্রিকেট দল এসেছে তার অধিনায়কও হচ্ছেন বিখ্যাত খেলোয়াড় হ্যাসেট। এই দলের কয়েকজন খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে কিছু খবর নীচে জানানো হোলো।

লিণ্ড্সে হ্যাসেট : জন্ম তারিখ ২৮শে অগস্ট, ১৯১৩।

ইনি সাউথ মেলবোর্ন এবং ভিক্টোরিয়া ক্লাবের খেলোয়াড়। এঁর শখ হচ্ছে বই পড়া আর বাগান বানানোর। বর্তমান দলের ক্যাপটেন। বর্তমান দলের মধ্যে ইনিই একমাত্র খেলোয়াড় ইতিপূর্বে যিনি আসল টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন। অত্যন্ত মাথা ঠাণ্ডা খেলোয়াড়। বাহাদুরি নেবার জন্যে কখনো বল পেটান না। নিজের দলকে ঠিক মতো পরিচালনা করার দুর্লভ ক্ষমতা তঁরে আছে। ক্রিকেট ছাড়াও ফুটবল টেনিস এবং গল্ফ খেলায় ইনি অত্যন্ত পারদর্শী।

সি. জি. পেপার : জন্ম তারিখ ১৫ই সেপ্টেম্বর, ১৯১৭। ইনি নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এর খেলোয়াড়। এঁর শখ হচ্ছে গল্ফ এবং টেনিস খেলার এবং বাগান বানানোর। চমৎকার "অল-রাউণ্ডার"। জোরালো ব্যাটস্‌ম্যান এবং মিডিয়াম-স্লো বোলার। গুগলি এবং লেগ ব্রেক বল দিতে ইনি সমান ওস্তাদ এবং তিন মনের কাছাকাছি ওজন হলেও মাঠে যখন দৌড়ঝাঁপ করেন তখন তাঁকে সাধারণ হালকা মানুষ বলেই মনে হয়। ব্যাট চালানোর স্টাইল এঁর চমৎকার : পিটিয়ে কিংবা ডিফেন্সিভ খেলতে সমান ওস্তাদ। একবার কুড়ি মিনিটে তিনি একটি সেঞ্চুরি করেছিলেন।

এস্. জি. সিস্‌নে : জন্ম তারিখ ১৫ই জুলাই, ১৯১৬। ইনি ওয়েস্টার্ন সাবার্বস্ এবং নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এর খেলোয়াড়। এঁর শখ হচ্ছে মানুষের পিছনে লেগে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা! চমৎকার উইকেট-কিপার। বিখ্যাত উইকেট-কিপার ওল্ডফিল্ডের কথা মনে পড়ে তাঁর খেলা দেখে : ব্যাটস্‌ম্যান হিসেবেও অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য। ১৯৩৯-৪০-এ অস্ট্রেলিয়ার ইণ্টার-টেস্ট ম্যাচের দু ইনিংসে একটিও বাই রান তাঁর হাত ফস্কে হয়নি।

আর. এম্. স্ট্যানফোর্ড : জন্ম তারিখ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৭। ইনি সাউথ অস্ট্রেলিয়ায় খেলোয়াড়। শখ বাগান-বানানোর। অসম্ভব বেশি রান ইনি করেছেন। ১৪ বছর বয়সে নিজের ইস্কুলের হয়ে খেলতে গিয়ে ইনি ৪১৬ রান করে নট-আউট ছিলেন।

ডি, কে, কার্মোডি : জন্ম ১৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯। ইনি মোসমান সিডনি এবং নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এর খেলোয়াড়। শখ ফটো তোলার। ভালো ব্যাটস্‌ম্যান। প্রায়ই প্রথমে ব্যাট করতে আসেন।

এ. ডাবলিউ. রোপার : জন্ম ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭। ইনি নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এর খেলোয়াড়। শখ সাঁতার কাটা, বেসবল খেলা এবং ঘোড়দৌড়ের।

ডি. আর. ক্রিস্টোফানি : জন্ম ১৪ই নভেম্বর, ১৯২০। সেণ্ট জর্জ নিউ সাউথ ওয়েল্স্-এর খেলোয়াড়। শখ গান-বাজনার। বর্তমান দলের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে ছোটো বলে এঁকে "বেবি অফ দি টিম" বলা হয়। দলের মধ্যে তিনিই সবচেয়ে ভালো বোলার। বিখ্যাত বোলার ও'রিলি'র কাছে তিনি শিক্ষা পেয়েছেন।

কে. আর. মিলার : জন্ম ২৮শে নভেম্বর, ১৯১৯। ইনি সাউথ মেলবোর্ন এবং ভিক্টোরিয়ার খেলোয়াড়। শখ হচ্ছে ঘোড়দৌড় এবং গান-বাজনার। দলের মধ্যে তিনি হচ্ছেন ভাইস-ক্যাপ্টেন। অত্যন্ত ভালো ফাস্ট বোলার এবং অত্যন্ত ভালো ব্যাটস্‌ম্যান। এঁর খেলা দেখে সমঝদার মহলে দারুণ হৈ-চৈ পড়ে গেছে। এঁর মতো পিটিয়ে খেলতে ওস্তাদ আর দ্বিতীয় নেই। চমৎকার ফিল্ড করেন।

এঁরা ছাড়া প্রাইস, পেটিফোর্ড, এলিস, রোপার, ব্রেম্‌নার, ওয়ার্কম্যান, উইলিয়ামস্, হুইটিংটন এবং মোরান এই দলে আছেন।

অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে প্রথম ভারতীয় দল, নর্থ জোন, খেলে লাহোরে। তিন দিনের ম্যাচ ছিলো। নর্থ জোন প্রথম ব্যাট করতে নেমে ৪১০ রান করে। তার মধ্যে আব্দুল হাফিজের ১৭৩ এবং ইম্‌তিয়াজের নট আউট ১৩৮ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম খেলাতেই দু'জন ভারতীয়ের সেঞ্চুরি করা অত্যন্তই গর্বের কথা সন্দেহ নেই। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া দল করে ৩৫১ রান। তার মধ্যে পেপার ৭৭ এবং হ্যাসেট ৭৩ রান করেন। এই ম্যাচে হাফিজ শুধু ভালো রানই করেন নি, বোলিং-ও করেছিলেন

চমৎকার। ১১৫ রানে পাঁচটা উইকেট তিনি পান। খেলাটি ড্র হয়।

দ্বিতীয় ম্যাচ হয় দিল্লিতে, প্রিন্সেস ইলেভেনের সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ৮ উইকেটে ৪২৪ রান করে। তার মধ্যে হ্যাসেট করেন ১৮৭ এবং উইলিয়ামস্ করেন নট আউট ১০০ রান। প্রত্যুত্তরে প্রিন্সেস' ইলেভেন করে ৪০১ এবং তার মধ্যে মুস্তক আলির ১০৮ এবং অমর নাথের ১৬৩ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় খেলাও ড্র হয়।

তৃতীয় ম্যাচ হোলো বোম্বাই-এর ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে, ওয়েস্ট জোনের সঙ্গে। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে করে ৩৬২ রান, তার মধ্যে মিলার করেছিলেন ১০৬। প্রত্যুত্তরে ৯ উইকোটে ওয়েস্ট জোন করে ৫০০ রান। এর ভিতর মোদির ১৬৮ এবং মার্চেন্টের ৭৭ রান বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। খেলার ফলাফল হয় ড্র।

তারপরেই হয় চারদিন ধরে প্রথম টেস্ট খেলা বোম্বাই-এর ব্রেবোর্ন স্টেডিয়ামে। উপরি-উপরি তিনটি খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের সাফল্য দেখে আমরা সবাই আশাকরে বসে আছি এবারেও বুঝি দারুণ কাণ্ড একটা হয়। কিন্তু ক্রিকেটের মজাই হচ্ছে glorious uncertainties। অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে করলো ৫৩১ রান; তার মধ্যে কামোডির ১১৩, পোটিফোর্ডের ১২৪, পেপারের ৯৫ এবং ওয়ার্কম্যানের ৭৬ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর উত্তরে ভারতীয় দল করলো মাত্র ৩৩৯। এর ভিতর অমরনাথ ৬৪ এবং হাজারি ৭৫ করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়া দল ১৯২ রান এগিয়ে থাকায় ভারতীয় দলকে "ফলো-অন" হতে হোলো। দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল করলো ৩০৪ রান (মার্চেন্ট ৬৯ এবং অমরনাথ ৫০)। প্রায় হারতে হারতে ভারতীয় দল সৌভাগ্যক্রমে ড্র করতে পারলো। আর আধ ঘণ্টা খেলা হলে হয়তো দারুণ হার হারতে হোতো ভারতীয় দলকে।

প্রথম টেস্ট ম্যাচে মুস্তক আলির মতো খেলোয়াড় যে কেন খেলেননি বোঝা গেলো না। দ্বিতীয় টেস্টেও তাঁর নাম নেই দেখে সবাই অত্যন্ত হতাশ হয়েছে।

প্রথম টেস্টের পরেই পুণায় ইণ্ডিয়ান য়ুনিভার্সিটি টিমের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের দু দিন ধরে একটি ম্যাচ হয়। তাতে বিশ্ববিদ্যালয় দল অত্যন্ত ভালো খেলেছিলো। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ৩০০ রান করে। প্রত্যুত্তরে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় দল ১ উইকেটে ৩৮৫ করে ডিক্লেয়ার করে। এর মধ্যে রেজি করেন ২০০ এবং হাফিজ করেন ১৬১। দু জনেই নট আউট থাকেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে রেজিই প্রথম ডবল্ সেঞ্চুরি করলেন। দ্বিতীয় ইংনিসে ৩ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দল ৮৫ রান করেছিলো। খেলাটি শেষ পর্যন্ত ড্র হয়।

ভারতবর্ষে এসে অস্ট্রেলিয়া দল পাঁচটি খেলেছে এবং পাঁচটিই হয়েছে ড্র। এর পরের খেলা কলকাতার ইডেন গার্ডেনে। কলকাতার মাঠে বড় একটা ড্র হয় না। দেখা যাক এবার কী হয়!

তোমরা সবাই জানো দিল্লির লাল কেল্লায় আই. এন্. এ. ফৌজের বিচার আরম্ভ হয়েছে। এই ব্যাপারে সমস্ত ভারতবাসী জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে আপত্তি জানিয়েছে। আমরা কামনা করি তাঁরা মুক্তি পাবেন এবং তাঁদের জীবন সমস্ত ভারতবর্ষের কল্যাণে নিয়োজিত হবে।

* * *

গত ১৫ই নভেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর ৫৬ বছর বয়স পূর্ণ হোলো। আমাদের দেশের অসংখ্য জায়গায় তাঁর জন্মদিন-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত তিন বছর এই দিনে তিনি বন্দী ছিলেন। ১৯২০ সাল থেকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সম্পূর্ণ আত্মোৎসর্গ করে তাঁর অধিকাংশ সময়ই কেটেছে কারাগারে—যে-টুকু সময় তিনি বাইরে থাকেন তার প্রতি মুহূর্ত কাটে ঝড়ো হাওয়ার মতো। বিশ্রাম তিনি জানেন না। বন্দী অবস্থাতেও তিনি চুপ করে বসে থাকেন নি, ক্রমাগত লিখে যান এবং দেখা গেছে প্রতিবারেই জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁর লেখা এক-একটি অসাধারণ বই আত্ম-প্রকাশ করেছে। পণ্ডিত নেহেরু শুধু ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা নন, একজন অসাধারণ শিল্পীও। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পর তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার অন্য আর এক দিকের পরিচয় সমস্ত পৃথিবী পাবে। খবর পাওয়া গেছে গতবার জেলে বসে তিনি নতুন একটি দীর্ঘ বই লিখেছেন। শীঘ্রই সে-বইটি বাজারে বেরুবে। তার বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হবার কথাও শোনা যাচ্ছে। এই বইটির নাম Discovery of India.

* * *

আমেরিকার ভূতপূর্ব সেক্রেটারি অফ স্টেট শ্রীযুক্ত কর্ডেল হালকে ১৯৪৫ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টায় জন্যে। ১৯৪৪ সালে এই পুরস্কার পেয়েছিলো জেনেভা'র "ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিটি অফ রেড ক্রস্"!

১৯৪৪ সালের রসায়নবিদ্যার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে একজন জার্মন বৈজ্ঞানিককে। তাঁর নাম অটো হ্যান্। ১৯৪৫-এ এই পুরস্কার পেয়েছেন ফিন্‌ল্যাণ্ডবাসী প্রফেসর আর্তুরি উইরটানেন।

১৮৪৫ সালের পদার্থ বিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন সুইৎজারল্যাণ্ডের প্রফেসর ডাঃ উল্‌ফগ্যাঙ্গ পাউলি।

* * *

বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিক ও নাট্যকার জর্জ বার্ণাড শ' সবে নব্বই বছরে পড়েছেন! তিনি মনে করেন প্রত্যেক মানুষের জীবন অন্তত ৩০০ বছর পর্যন্ত হওয়া দরকার। তিনি আরো মনে করেন অল্প বয়সে মানুষের যে মৃত্যু হয় তার প্রধান কারণ মানুষ বাঁচতে জানে না। আসলে মৃত্যু নাকি স্বাভাবিক ঘটনা নয় এবং স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের মৃত্যু যে হবেই এ-কথা ভাববারও কোনো কারণ আজকের দিনে নেই!

* * *

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পারস্যবাসী নাদীর শা দিল্লি লুঠ করার সময় একটি বিখ্যাত মুক্ত আবিষ্কার করেছিলেন। ভবিষ্যতে সেই মুক্তটি "পার্ল অফ এশিয়া" এই নামে বিখ্যাত

হয়। নাদির শা'র কাছ থেকে উপহারস্বরূপ মুক্তটি এর রাজার কাছে গিয়েছিলো। ত্রিশ বছর আগে একজন ফরাসী পুরোহিত এই মুক্তটি চীন-এর এক রাজকর্মচারীর কাছ থেকে পেয়েছিলেন। ঐ ফরাসী পুরোহিতই মুক্তটিকে য়ুরোপে নিয়ে আসেন।

হিটলারের ভূতপূর্ব অনুচর গোয়েরিং মুক্তটির জন্যে যোল লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। গত বছর মুক্তটি চুরি যায়। ফন্ কোলে এবং আরও কয়েকজন এই চুরির বিরাট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন এই অভিযোগে ধরা পড়েছেন। শীঘ্রই তাঁদের বিচার স্থরু হবে।

* * *

অ্যাটম বোমার আবিষ্কার শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে যে দাঁড়াবে কেউ জানে না। মার্কিনরা এই বোমা বানাবার আসল রহস্য বাইরে জানাতে অনিচ্ছুক। ফলে নানা দেশে, বিশেষ করে রাশিয়ায়, জোর গবেষণা চলেছে। কে যে কতদূর সফল হয়েছে জানা যাচ্ছে না। তবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে যে সন্দেহ করছে এবং একটা অসম্ভব আতঙ্কে আছে চারদিকের খবর পড়লে সহজেই সে-কথা বোঝা যায়। এ-দিকে এ্যাটম-বোমার ফলাফল যে কী মারাত্মক ক্রমশ সে-কথা জানা যাচ্ছে। যেখানে প্রথম এ্যাটম বোমার পরীক্ষা চলে সেখানকার মাটি নাকি কাঁচ হয়ে গেছে। এই বোমা ফাটার ফলে এক ধরণের তীব্র আলো বিচ্ছুরিত হয়। সেই আলোর স্পর্শ যারা পেয়েছে তাদের আর রক্ষে নেই। তিল-তিল করে মৃত্যুর কাছে তারা এগিয়ে আসবে। হালে খবর পাওয়া গেছে এই বোমা তৈরির সময় অদ্ভুত একটি বিষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই বিষ উপর থেকে ছড়িয়ে দিলে হাজার-হাজার মাইলের মধ্যে সমস্ত জীব-জন্তু পোকা-মাকড় গাছ-পালা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যাবে। ইংলণ্ডের বিখ্যাত মনীষী এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বহুকাল আগে একবার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন পৃথিবীতে মানুষ-জাত একদিন সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হবে বলে। বর্তমান সময়ে এইসব মারাত্মক আবিষ্কারের কথা শুনলে এক-এক সময় কেমন যেন সন্দেহ হয়, মনে হয় বুঝি সেই শেষ দিন আসতে আর দেরি নেই। কিন্তু পৃথিবীতে এখনো শিশুর হাসি আছে, শরতের রোদ আছে, শিশিরের ঔজ্জ্বল্য আছে—এখনো সংগীত আছে, কবিতা আছে, রঙ আছে। সে-দিকে চাইলে এখনো তাই মানুষের উপর বিশ্বাস ফিরে আসে।

* * *

বাংলাদেশের নতুন লাটসায়েব নিযুক্ত হয়েছেন শ্রীযুক্ত এফ্. জে. বারোজ। ইনি আগে রেলের পোর্টার ছিলেন। এঁর স্ত্রী জীবনে কোনোদিন চাকর রাখেননি, ঘর-সংসারের সমস্ত কাজ নিজেই করে এসেছেন। আমরা কেবল ভাবছি কলকাতার বিরাট লাটপ্রাসাদে অসংখ্য তকমা-পরা চাকর-বাকরদের মাঝখানে পড়ে ব্যাপারটা তাঁর কী রকম লাগবে!

* * *

পলড্রিন নামে কুইনাইনের চেয়ে দশগুন জোরালো ম্যালেরিয়ার এক ওষুধ লিভারপুলের ইম্পিরিয়াল কেমিক্যাল ইণ্ডাস্ট্রিজ আবিষ্কার করেছে বলে জানা গেছে। এই ওষুধ নাকি যুগান্তর আনবে।

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমাদের অসংখ্য চিঠিতে আমার টেবিল ভরে গেছে। কত জায়গা থেকে তোমরা যে লিখেছো এক-একবার ভাবতে বসলে অবাক লাগে। সুদূর কোয়েটা, করাচি, বোম্বাই একদিকে—আবার অন্যদিকে মাদ্রাজ, রামেশ্বর, ত্রিচিনপল্লি! কোথাও এরই মধ্যে বেশ শীত পড়েছে, কোথাও বা নেমেছে বর্ষা, কোথও বা চমৎকার ফুরফুরে বাতাস বইছে। তোমাদের চিঠির দিকে যতবার চাইছি ততবার যেন ভালো করে অনুভব করছি সমস্ত ভারতবর্ষকে—আমাদের দেশকে। কী বিরাট, কী বিচিত্র এই দেশ। সমুদ্র'র নীল আর শাদা ঢেউ দিয়ে ঘেরা, পাহাড়ের নীল আর শাদা মিনার দিয়ে সাজানো—কোথাও দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ, কোথাও বা রুক্ষ মরুভূমি—কোনোখানে বাঁশঝাড়ের কোল ঘেঁষে ছোট্ট খড়ের চালের পাঠশালায় ভারতবর্ষের একটি ছেলে শ্লেটে লিখতে শিখছে, বাইরে ঘুঘু ডাকছে, বাঁশের পাতা শব্দ করে নড়ছে, কুলকুল করে গ্রামের ছোট্ট নদী যাচ্ছে বয়ে—কোথাও আবার লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর সামনে আমাদের দেশের নেতারা বক্তৃতা দিচ্ছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন পথের, আশা দিচ্ছেন নতুন দিনের, স্বাধীন জীবনের। তোমাদের অসংখ্য চিঠির দিকে যতবার চাইছি ততবার যেন নতুন করে রোমাঞ্চিত হচ্ছি। সমস্ত ভারতবর্ষ যেন কত কাছে সরে এসেছে। সেই ভারতবর্ষে তোমাদের অসংখ্য মুখ—স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল, প্রাণে উচ্ছল, উৎসাহে জ্বলন্ত। রোমাঞ্চিত হচ্ছি ভেবে আগামী দিনের ভারতবর্ষ বলতে তোমাদেরই বোঝায়। সে ভারতবর্ষে ধনীর উৎপাত নেই, বণিকের নির্লজ্জতা নেই, পরাধীনতার গ্লানি নেই—সে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমান-ক্রিশ্চান-পারসি-শিখ কারুর সঙ্গে কারুর বিদ্বেষ নেই। প্রত্যেকের মিলিত চেষ্টায় সেই ভারতবর্ষ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তার পায়ের কাছে ভাঙা শিকল—মর্চে ধরা।

তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে এবার স্থরু করি:
রমলা সরকার (২০৮৯)—তোমার জীবনের নতুন পথ আনন্দে উজ্জল হোক, শান্তি ও পরিপূর্ণতায় হোক রমণীয়। তুমি লিখেছো: "দাঁড়িয়ে ছিলাম বাইরের বারান্দায়। একটি শীর্ণ মলিন লোক সামনে এসে দাঁড়ালো। তার হাতে একটা ময়না। পাখীটা কেনবার ইচ্ছে ছিলো না তবু নিলাম এই ভেবে যে তাকে সাহায্য করা হবে। সপ্তমীর দিন শানাই-এর স্বরে ঘুম ভাঙলো। জানলা দিয়ে দেখি সবাই চলেছে হাসিমুখে। আজকের দিনে সবাই যখন মুক্ত তখন সে-ই বা কেন ঘেরাটোপ দেওয়া খাঁচার মধ্যে বসে থাকবে! খাঁচাশুদ্ধ তাকে ছাতে এনে দরজা খুলে দিলুম। সে বাইরে এসে খানিক ওড়বার চেষ্টা করলে তারপর আমাকে আশ্চর্য করে দিয়ে আবার ঢুকলো খাঁচায়। আচ্ছা সম্পাদকমশাই, আমাদের জাতীয় জীবনে কি এই দিন আসেনি? অদূর ভবিষ্যতে যখন আমাদের স্বাধীন হবার দিন আসবে তখন কী করে তাকে জানতে যাবো? কী করে জানবো মুক্তি কী?" তোমার পাখী অরণ্যের স্বাদ ভুলতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষ কি এই পরাধীনতার মধ্যে তার আগেকার দিনগুলিকে ভুলেছে—যখন সে স্বাধীন ছিলো, শিক্ষায় সভ্যতায় শক্তিতে ছিলো পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ? তুমি কি ভারতবর্ষের নেতাদের কখনো দেখেছো জেল থেকে বেরিয়ে তাঁরা পোষ মেনে গেছেন, তারপর আবার ফিরেছেন

জেলে দেশকে ও জাতিকে ভুলে গিয়ে? স্বাধীন হয়ে বেঁচে থাকার অধিকার আর কিছুই নয় জীবনের অধিকার পাওয়া—প্রতিদিনের ছোটোবড় লাঞ্ছনার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া। সোনা ফলিয়ে অন্যের হাতে তুলে দেওয়া নয় —সেই সোনা নিজেদের ভোগ করার অধিকার পাওয়া। অধিকার পাওয়া নিজের দেশের নিজ-হাতে-ফলানো ফসল নিজের ভাইবোনদের সঙ্গে ভাগ করে নেবার। তুমি ভুলে যেয়ো না আমাদের দেশ শুধু পোষমানা ময়না-বুলবুলির দেশ নয়—আমাদের দেশে বাঘ-সিংহও আছে। কোনো আফিং-ই তাদের ঝিম ধরাতে পারে না। **দেবব্রত ঘোষ** (২৪২২)—তোমার চিঠিতে বিজয়া দশমীর দিনকার ছবিটি বেশ লাগলো। **রেণুকা বিশ্বাস** (১৬৬২)—তুমি লিখেছো চিঠির বাক্সের মধ্যে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে একটা সম্পর্ক স্থাপন করতে। কিন্তু হঠাৎ 'দাদা', 'খুড়ো', 'জ্যেঠা' বনে যেতে কেমন যেন লাগছে। দাদা-খুড়ো-জ্যাঠা হলেই তো সত্যিকারের সম্পর্ক হয় না, অনেক জায়গায় মনে হয় যেন ভাঁড়ামো করছি কিংবা যাত্রা করতে নামছি। এটা নিয়ে ভাবছি। দেখি কী হয়। আপাতত যেমন চলছে তেমনি চলুক। **পূর্ণেন্দু মল্লিক** (২৪১)—তোমার কবিতায় চিঠি মন্দ হয়নি। কিন্তু বারবার 'লেগেছে ভালো' কথাটি না থাকলেই ভালো হোতো। ছন্দেরও কিছু গোলমাল হয়েছে। **জানকীকান্ত পাল** (২৪৫৩)—তুমি লিখেছো ট্রেনে করে যাবার বর্ণনা। ট্রেনে যেতে যেতে প্রতিমুহূর্তেই পটপরিবর্তন হয়, সত্যিই সিনেমায় দেখা ছবির চেয়ে অনেক সময়েই এই ট্রেনে-দেখা ছবি অনেক বেশি রোমাঞ্চকর। তবে সবাইকার দেখবার চোখ থাকে না। তা ছাড়া শুধু চোখ দিয়েই তো দেখে না, মন দিয়েও দেখে। সাধারণের মধ্যে যা অসাধারণ অনেক সময়েই সবাই তাদের ঠিকমতো ধরতে পারে না। তুমি যে খানিকটা পেরেছো সে-কথা তোমার চিঠিতে পড়ে ভালো লাগলো। **আশিস দত্ত** (১৫৬৯)—পোস্টকার্ডের উপর শাদা কাগজ চিটিয়ে তুমি চিঠি দিয়েছো। এ-রকম দিয়ো না, এর জন্যে বেশি ডাকটিকিট লাগে। ধাঁধার উত্তর ঠিক হয়নি। **ভাদুড়ি ভাইরা** (৭৪০)—এবারে পূজোর ছুটিতে গ্রামে গিয়ে সেখানকার দারিদ্র্য-দুঃখ-কষ্ট তোমাদের পীড়া দিয়েছে বলে জানিয়েছো। ওই দারিদ্র্য-দুঃখ-কষ্ট একটি বিশেষ গ্রামের নয়, সমস্ত ভারতবর্ষের। আমাদের দেশের আসল চেহারা দেখতে হলে গ্রামের দিকেই চোখ ফেরানো দরকার। **কামাখ্যাচরণ মুন্সী** (২৫৬৩)—তোমার প্রথম লেখা কবিতাটি পড়লুম। আমার মনে হয় প্রথমে তোমার আরো অনেক কবিতা পড়া দরকার, বিভিন্ন কবির রচনা। তা হলে বুঝতে পারবে ভালো কবিতা লেখা কত কঠিন। **রাধিকারঞ্জন চক্রবর্ত্তী** (২৫১৩)—তুমি কি জানো না রংমশাল বাংলা মাসের শেষ সপ্তাহে ছাপা হয়? নিয়মাবলী দেখো। অনর্থক পোস্টকার্ড খরচ করে লাভ কী? **শ্রীমতী বি, পি, দাস** (২৫৬০) —তোমার পুরো নাম কী? আমাদের ছবি ছাপানো সম্ভব নয় বলে দুঃখিত। 'চলন্তিকা' আমরাই লিখি। যে ভদ্রমহিলা সম্বন্ধে জানতে চেয়েছো তিনি নিজে একজন নামকরা লেখিকা, সে-ই তাঁর আসল পরিচয়। উপন্যাসের ভাগ তো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্টিফটরের উপন্যাস দুর্বোধ্য কেন বলেছো জানি না। আর একবার পড়ে দেখো। অত্যন্ত সহজ সুন্দর বই। 'রংমশাল বৈঠক' তো ছোটোদেরই আসর। তোমার 'ভরা বাদরে' কবিতাটি ছোটোদের উপযুক্ত নয়। 'খেতে চাও?' কবিতাটিতে সুকুমার রায়ের অত্যন্ত বেশি প্রভাব—এইজন্যেই ছাপা গেলো না। গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পাঠানো প্রত্যেকটি রচনাই ছাপার যোগ্য হয় না। লেখা যে-কোনো সময়ই পাঠানো যায়। **চিনু চৌধুরী** (১৯৭৭)—তোমার গল্পটি ছাপা সম্ভব হোলো না।

তোমাদের
সম্পাদকমশাই

মুক্তি

চিনু চৌধুরী (১৯৭৭)

ঘুম হতে উঠে আমি কাছে যে দেখি—
ছোট্ট খাঁচাতে মোর ঝিমোয় পাখী,
জল-ভরা চোখ তুলে ছোটো-ছোটো পাখা মেলে,
বেদনায় দেহ তার ওঠে যে কাঁপি!

শুধালাম, "বল্ তোর কোথায় ব্যথা?
তোর লাগি প্রীতি মোর হৃদয় পাতা।
সবটুকু ঢেলে দেব, বেদনার ভার নেব!"
—ভাষা বোঝে নাই তাই নোয়ায় মাথা!

"ছোটো পাখী, ছোটো পাখী, মুক্তি নেবে?
সবুজ ছায়ার দেশে তীব্র বেগে?
হোক মোর যত দুখ, ভরুক তোমার বুক,
পাখা মেলিবার স্বাদ এখনি পাবে।

"খাঁচা যে দিয়েছি খুলে, ও ছোটো পাখী!
উড়ে যাও নীলাকাশে মধুর ডাকি।
বন্ধ এখনো যারা, তোর ডাকে পাবে ছাড়া,
একেলা আমিই শুধু বসে যে থাকি!"

আকাশ ভেঙে পড়ছে

নারায়ণকুমার দত্ত

ছোট্ট মোরগ ছানাটা সেদিন সকালে বনে-বাদাড়ে ডেকে ডেকে চলছিল, হঠাৎ তার মাথায় পড়লো টুপ করে একটা পাকা ফল!

"কোঁকর কোঁ," আর্তস্বরে চীৎকার করে সে জানিয়ে দিতে থাকে: আকাশ ভেঙে পড়ছে। আকাশ ভাঙ্‌ছে! সেই থেকেই ভাববার অন্ত নেই তার!

পৃথিবীর ছাদটা ভাঙছে, তাদের পৃথিবীর কি বিপদ। সে আর একবার ডেকে উঠলো ভয়ে! মুরগী-মা ঐ পথেই চলছিলেন। চাষারা সব ধান কেটে নিয়ে গেছে, বাদবাকী কুড়িয়ে জমিয়ে রাখা মন্দ নয়! হঠাৎ এ ডাক শুনে তড়বড় করে ছানার কাছে গিয়ে সে হাজির হোলো। "কী হয়েছে বাছা?"

চিনচিন করে বাচ্ছা বলে, "পৃথিবী ভাঙছে, আকাশ পড়ছে। মা, যেয়োনা ওদিকে।"

"তাই নাকি?" মা-মুরগী পাখা ঝটপটিয়ে চীৎকার করে ওঠে, "ও বাবা, তাহলে তো সব্বোনাশ।"

ওদিকে হাঁসগিন্নী, সকালে গলা ডুবিয়ে মাত্তর দুচারটে শামুক পেটে ঢুকিয়েছে, মা-মুরগীর চীৎকার শুনে প্যাঁক প্যাঁক করে হাজির। "কিগো, মায়ে-পোয়ে কিসের সলা-পরামর্শ হচ্ছে?"

"সব্বনাশ গো সব্বনাশ," মুরগী-মা একেবারে ডুকরে উঠে বলে, "আকাশ ভেঙে পড়ছে, শুনছো? অবাক কাণ্ড!

"তাই নাকি?" প্যাঁক প্যাঁক করে ওঠে হাঁসগিন্নী। "চলো তাহলে। একবার রাজামশায়ের কাছে জানিয়ে আসি।"

"বাঁচালে বাছা।" মুরগী-মা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে হাঁস-গিন্নীর কথা শুনে। "তাহলে চলো।" দেরী না করেই তারা যাত্রা সুরু করে।

রাজহাঁসটা সকালের মিষ্টি রোদে পাখা দুটো শুকিয়ে নিচ্ছেলো। মুরুব্বির গলায় বললো, "কিগো, দল বেঁধে সব যাওয়া হচ্ছে কোথা?"

"আর বলো কেনো আপদের কথা।" হাঁসগিন্নী ঝোঁকরে ওঠে, "আকাশ ভেঙে পড়ছে, কালে কালে কতোই দেখবো।"

"তাই নাকি?" রাজহাঁসের রোদপোহানো আর হলো না। পাখা ঝেড়ে উঠে বললো, "তা, যাচ্ছো কোথা?"

"রাজার কাছে শুনিয়ে আসি ব্যাপারটা।" রাজহাঁসটাও সঙ্গী হয়ে পড়ে। অনেকটা এগিয়ে এসেছে তারা, এমনি সময় পথ দিয়ে যাচ্ছিলো শেয়াল পণ্ডিত!

"কিগো দিদি-মামীরা, দল বেঁধে সব যাচ্ছো কোথা?" শেয়াল হাসে আর বলে।

"আর বলো কেন বাছা, যাচ্ছি রাজামশায়ের কাছে। আকাশটা ভেঙে পড়তে সুরু হয়েছে ওদিকে। জানিয়ে আসি রাজাকে।"

"তাই নাকি," শেয়ালের বুদ্ধিদীপ্ত জোড়া চোখ মাংসের গন্ধে চকচক করে ওঠে। হেসে বলে, "তা যাচ্ছোতো কিন্তু এতো ঘুরে কেনো, পথ চেনোনা বুঝি?"

"কী করে জানবো বলো! রাজরাজড়ার কাছে যাওয়া তো অভ্যেস নেই আমাদের," একটু তপ্ত হয়েই হাঁসমামী বলে।

"তা যদি বলো," শেয়াল ঢোক গেলে, "আমার সঙ্গে না হয় চলো, পথটা আমার জানাই আছে।"

"চেনো তো নিয়ে চলো না বাছা," রাজহাঁস গঁক্ গঁক্ করে বলে।

তারপর……

শেয়ালের গর্তয় সব্বাই। "এ কোথায় নিয়ে এলে?" সব্বাইকার স্বর আর্তনাদের মতো শোনায়।

"আকাশ ভেঙে যাতে তোমাদের মাথায় না পড়ে!" শেয়াল আর তার সঙ্গীরা সোজাসুজি এদের মাথায় সজোরে থাবা চাপিয়ে দেয়।

"নাঃ, আকাশটা সত্যিই ভেঙে পড়লো," তাদের ধারণা বদ্ধমূল হয়। এই ধারণা নিয়েই তারা চোখ বোজে! এমনকি ছোট্ট ছানাটা পর্যন্ত।

তবে খবরটা রাজাকে দেওয়া হোলনা এই যা দুঃখ!!

[বিদেশী গল্পের অনুবাদ]

আলুর বিলাপ

যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯)

পচিতে চাহিনা আমি গুদামের ঘরে,
মানবের পেটে আমি সেঁধুবারে চাই।
এই অট্টালিকা মাঝে বড়লোক করে
পেটে যাইবার তরে যেন স্থান পাই॥

ধরায় প্রাণের স্থিতি অতি অনিশ্চিত,
তার তরে চিন্তা করা অনুচিত হয়।
মানবের পেটে গিয়া সদা করি হিত,
যেন গো রচিতে পারি অমর আলয়॥
তা যদি না পারি তবে বাঁচি যতকাল,
ঘুরিয়া বেড়াইতে চাই নব নব ঠাঁই।
মোরে নিয়ে দোকানীরা সকাল বিকাল,
মুক্তস্থানে রাখে যেন এই আমি চাই॥
কেহ মোরে কিনিল না যাইব কোথায়,
একদিন ঠিক তবে পচে যাব হায়! *

রংমশালের ছোট্ট বন্ধুরা,

সেদিন জে. বি. এস্. হলডেন্ বলে এক ভদ্দরলোকের লেখা একটা বই পড়তে পড়তে ভারি মজার একটা খবর পেলুম—আর সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল তোমাদের কথা। ভাবলুম, খবরটা তোমরাও যদি শোনো তা হলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হবে। কিন্তু খবরটা বলার আগে বলে রাখছি এই হলডেন্ লোকটি হেলাফেলার লোক নন! আধুনিক ইংলণ্ডের তিনি একজন ধুরন্ধর বৈজ্ঞানিক। কিন্তু বৈজ্ঞানিক ত অনেকেই আছেন। হলডেনের কিন্তু আরও একটা গুণ আছে, এবং এ গুণটার দিক থেকে আজকের দিনে ইংল্লণ্ডে তাঁর জুড়িদার আর কেউই তাঁর মতো নেই : বিজ্ঞানের কথা অমন সরল করে—দেশের দিনমজুররা পর্য্যন্ত যাতে বুঝতে পারে এমন সরল করে আর কেউই তাঁর মতো বই লিখতে পারেন না। তোমাদের মধ্যে যাদের ইংরেজী বই পড়বার

* রবীন্দ্রনাথের "মরিতে চাহিনা আমি" (প্রাণ) অবলম্বনে

একটু-আধটু অভ্যেস হয়েছে তারা হলডেনের বই পেলেই পড়বার চেষ্টা কোরো। দেখবে, কী রকম মজা করে লেখা আর সেই সঙ্গে কত রকম মজার মজার খবর।

আমি যে বইটা পড়ছিলুম তার নাম হল "বিজ্ঞান আর দৈনিক জীবন।" নানান রকমের কথাবার্ত্তা সেই বইটায় আছে। পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে হঠাৎ এক জায়গায় চোখ পড়ল, লেখা আছে—"মহাদেশ কি ঘুরে বেড়ায়?" মহাদেশ আবার ঘুরবে কেমন করে? এ যেন স্রেফ ধাপ্পাবাজি! কিন্তু হলডেনকে আর যাই ভাবা যাক না, ধাপ্পাবাজ কোনোমতেই ভাবা সম্ভব নয়। যা তিনি লিখছেন তা নিশ্চয়ই খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্য। ফলে, বইএর সে পাতাটা দেখে চোখ আর সরাতে পারলুম না। পড়ে চল্লুম।

বাস্তবিকই অবাক কাণ্ড! একদল বৈজ্ঞানিকের মতে বাস্তবিকই মহাদেশগুলো পৃথিবীর বুকে স্থির হয়ে আটকে নেই। এশিয়া, আমেরিকা, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া এক একটা যেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জাহাজ। পৃথিবীর বুকের উপর আস্তে আস্তে নড়ছে—এত আস্তে যে এমনিতে বোঝাই যায় না। কিন্তু হাজার হাজার বছর পরে ধরতে পারা যায় বেশ খানিকটা নড়েছে। অর্থাৎ বহুদিন আগে অস্ট্রেলিয়া ইয়োরোপ থেকে যতদূর ছিল আজ তা নেই। আবার আজকে এ দুটো দেশের মধ্যে যতটা দূরত্ব বহুদিন পরে তা থাকবে না! এ কি তাজ্জব কথা নয়?

অবশ্য হলডেন্ গোড়াতেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে এই মতবাদ নিয়ে বৈজ্ঞানিক মহলে চরম হিসেব-নিকেশ আজও হয়নি। এখন পর্য্যন্ত এ কথা একদম সত্যি কথা কি না তার প্রমাণ হয়নি। তবে, পৃথিবীর অনেক ডাকসাইটে বৈজ্ঞানিক এই কথাটা মানেন এবং এ কথার সপক্ষে নানান রকম যুক্তিতর্ক এবং সত্য ঘটনার উল্লেখ করেন। কথাটা অবশ্য প্রথম দুজন মার্কিন বৈজ্ঞানিকের মাথায় এসেছিলো, তাঁদের নাম টেলর আর বেকার। সে হল ১৯১০।১১র কথা। তারপর, ১৯৩০এ ওজেনার বলে আজ একজন মস্ত বড় বৈজ্ঞানিক এ কথার সপক্ষে আরও নানান রকম ঘটনা সংগ্রহ করেন। কিন্তু বেচারা ওজেনার গ্রীনল্যাণ্ডের মেরু অভিজানে মারা যান। আজকের দিনে অনেক সম্ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকই কথাটা মানেন।

কথাটা যদি সত্যি হয় তা হলে স্বীকার করতে হবে যে এককালে—বহুদিন আগে—কয়েকটা মহাদেশ একসঙ্গে গায়ে গা ঘেঁসিয়ে ছিলো। তখন ছিলো যেন বিরাট এক চাওড়া জমি। তারপর চিড় খেয়ে তার মধ্যে থেকে খানিকটা দূরে সরে গেল, মাঝখানে জেগে উঠলো সমুদ্র। বৈজ্ঞানিকেরা মনে করছেন আজকের দিনেও আফ্রিকার মধ্যে দুএকটা জায়গা এই রকম চিড় খেয়ে ফেটে যাচ্ছে এবং দুটো অংশ পরস্পরের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে। আজকের পৃথিবীর মানচিত্র খুললে আফ্রিকার যে চেহারা দেখতে পাবে লক্ষ্য বছর পরে তোমাদের বংশধরেরা দেখবে এই আফ্রিকারই অন্য চেহারা: টুকরো টুকরো হয়ে—যেন সমুদ্রের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে! বৈজ্ঞানিকেরা হিসেব করে দেখেছেন যে প্রতি বছর গ্রীনল্যাণ্ড ইয়োরোপ থেকে প্রায় বিশ তিরিশ গজ দূরে সরে যাচ্ছে!

কিন্তু কথা হল—এই সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহাদেশগুলো সরে যাচ্ছে কেমন করে? পণ্ডিতেরা সে কথার জবাবও খুঁজে পেয়েছেন। আসলে মাটির অনেক তলায়—পৃথিবীর বুকের ভেতরটায় আজও তরল তপ্ত ধাতুর বন্যা। মহাদেশগুলো তার উপরই ভাসছে,—যেমন করে ভাসে বিরাট জাহাজ সমুদ্রের বুকের উপর। আর, পৃথিবীর বুকের মধ্যে তরল ধাতুর বন্যার আলোড়নের ফলেই মহাদেশগুলো সরে যায় এদিক থেকে ওদিক, সমুদ্রে জোয়ার এলে যেমন সরে যায় জাহাজ! যে সব জায়গায় এখন সমুদ্র রয়েছে তার তলায় তরল ধাতুর বন্যা খানিকটা নিস্তেজ হয়ে এসেছে। সেখানে আলোড়ন নেই। মহাদেশগুলো সরতে সরতে সেইদিকে এগোয়, শান্তিতে কিছুদিন এক জায়গায় ঘর বাঁধবার আশায়! হোমস্ বলে একজন বৈজ্ঞানিক নাকি এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এইবার একটা কথা ভেবে দেখো দিকিনি! সেকালের

মানুষের মাথায় যে সব ধারণা ছিলো আজকের দিনের বিজ্ঞান সেসব ধারণাকে ভেঙ্গে চুরে কী রকম ভাবে তছনছ করে দিচ্ছে! আগেকার মানুষ ভাবতো—শ্রীভগবান সাতদিনে দুনিয়া তৈরি করে ফেলেছেন, তারপর সেই দুনিয়ায় শান্তি আর অচল স্থিরতা। কিন্তু আজকের দিনের বিজ্ঞান এ সব ধারণাকে ভেঙ্গে চুরে একেবারে মিশমার করে দিচ্ছে। দুনিয়া সাত দিনে সৃষ্টি হওয়া ত' দূরের কথা, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছরেও সৃষ্টিটা মোটেই পাকা হচ্ছে না। দিনের পর দিন দুনিয়ার চেহারা বদলে যাচ্ছে—এ বদলের শেষ যে কোথায় তা কেউ বলতে পারে না। পরিবর্ত্তনই প্রকৃতির চরম নিয়ম।

সন্ধ্যা, সমীর, বীরেণ এবং অজয় একটি গল্প প্রতিযোগিতায় গল্প পাঠিয়েছিলো। তাদের মামা প্রশ্ন করলেন, "তোরা কেউ পুরস্কার পেয়েছিলি?"

সন্ধ্যা বললো, "বীরেণ প্রথম হয়েছে, সমীর হয়েছে দ্বিতীয়।"

সমীর বললো, "না। বীরেণ হয়েছে দ্বিতীয় এবং অজয় হয়েছে তৃতীয়।"

বীরেণ বললো, "অজয় হয়েছে সবচেয়ে নীচে। সন্ধ্যা হয়েছে দ্বিতীয়।"

তারা প্রতেকে যা বললো তার মধ্যে একটি করে কথা সত্যি। তা হলে বলতে পারো প্রথম হয়ে পুরস্কার পেলো কে?

ধাঁধার উত্তর

ক, খ এবং গ হয় ২, ১ এবং ৪ (২১ × ২১ = ৪৪১)
কিংবা ১, ৫ এবং ২ (১৫ × ১৫ = ২২৫)

উত্তরদাতাদের নাম :

'জাপ' (২৪৬৯), বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬৯), হিমু সখা ঘন শিশির হারু (২৫২১), প্রতীপেন্দ্রনাথ ভোস (২৫৩৩), গৌরাঙ্গ ও শান্তি (২৫৭৩), অলকা দত্ত (১৬৯৯), গৌরাঙ্গ কুণ্ডু (২৫৭৩), বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (৬৯), বিজয়া গঙ্গোপাধ্যায় (২৩৫৯), পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক (২৪১), গৌরাঙ্গ চক্রবর্তী (২৫৫৪), চিহু চৌধুরী (১৯৭৭), জিয়াগঞ্জ গার্লস্ এম্. ই. স্কুলের ছাত্রীবৃন্দ (?), সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় (২১০৩), কালীপদ সুব্রতরঞ্জন শান্তা (২০০৫), সুধাংশুকুমার চৌধুরী (২২৯৭), অজয় ও মঞ্জুশ্রী সোম (২৪২৫)।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

তুষার বৃষ্টি

শিল্পী : সূর্য রায়

[দশম বর্ষ, নবম সংখ্যা : পৌষ, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

প্রাণ

ফল্গু কর

যেখানে অনেক দূরে, বিচিত্র ধ্বনির সুরে, কেঁপে ওঠে অলস দুপুর
রমণীরা যেইখানে, চিড়া কোটে, ধান ভানে, কথা কয় কমল মধুর,
বসি যেথা রূপকার, গড়িছে রূপার হার, যন্ত্রের রব শোনা যায়
রঙিন সুতারে গাঁথি, বসন বুনিছে তাঁতি, অপরূপ রঙ উছলায়।
ঘোরে কুমোরের চাক, নরম মটির থাক, দুধের বলক ওঠে কেঁপে
ফসল বোনার ধ্বনি, জীবনের আগমনী, ছড়ায়ে পড়িল মাঠ ব্যেপে।
মাচা বাঁধে কাটে বাঁশ, খাটে যারা বারোমাস, ঝড় জল কিছুরে না মানে
অল্প পাওয়ার সুখে, পুলক যাদের মুখে, প্রাণ আছে সেই দূর গ্রামে।

কখনো দেখেছি আমি, বিস্ময়ে থমকি থামি, নরম কোমল শুধু নয়
এদের জীবনপুটে, জীবন ঝলসি ওঠে, দুরন্ত প্রাণের ধারা বয়।
ছোটে উল্কার মত, ধীবর শিকারে রত, ফণা-তোলা ঢেউয়ের উপরে
কী প্রচণ্ড উল্লাসে, নাচে সব রায়বেশে, গম্ভীরা গানে প্রাণ ভরে।
ভয়াল লাঠির ঘায়, পাথর ঠিকরি যায়, বর্শা ফলক ওঠে জ্বলি
ভরাট গলার স্বর, ঋজু দেহে লাগে ডর, মহিষেরে খড়্গো দেয় বলি।
সড়্কি চালায় যারা, বিপদেতে ভয়হারা, বিষ-ভরা তীর লহে হাতে
গভীর অরণ্যছায়, শিকার ছুটিয়া যায়, ওরা ছোটে তারি পশ্চাতে।
সবল পেশীর বলে, বিশাল হাতুড়ি চলে, আগুণের ফুলঝুরি ছোটে,
বলিষ্ঠ উজ্জ্বল প্রাণ, যদিও তা হতমান, ইহাদের মাঝখানে ফোটে।

বড়দের ছোটবেলা

ছোটবেলা

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

[দেশের জ্ঞানী এবং গুণীদের ছোটোবেলার কথা জানতে তোমাদের নিশ্চয়ই ইচ্ছে করে। এই বিভাগে মাঝেমাঝে আমরা সে-ধরণের লেখা ছাপবার ব্যবস্থা করেছি। রঃ সঃ]

নারকেল গাছের বাইল আমাদের ব্যাট, পেয়ারা-গাছের ডাল আমাদের স্ট্যাম্প আর চাল-ভরা ন্যাকড়ার পুঁটলি আমাদের বল। চলত ক্রিকেট খেলা। আর 'টেকি'-পাতা ছিঁড়ে-ছিঁড়ে স্কোর গোনা হত। দু রকম বাউণ্ডারি আছে, আণ্ডার আর -ওভার। আমাদের খেলায় আরো একটা বাউণ্ডারি ছিল, সেটা হচ্ছে লস্ট বল। বল যদি খুঁজে না পাওয়া যেত, তবে একসঙ্গে দশ নম্বর। মাঠ ছোট, চারদিকে ঝোপ-ঝাড়, বন-বাদাড়। তেমন লাগসই হাঁকড়াতে পারলেই লস্ট বল। কোনো ক্রমে যদি খুঁজে পাওয়া যেত, তবেই মারের মাহাত্ম্য যেত কমে, দশ নম্বরের বদলে জুটত ছয় নম্বর, নিচু দিয়ে গিয়েছে প্রমাণ হলে চার। বল জঙ্গলে গিয়ে পড়লে বিপক্ষ দলের চেষ্টা থাকত যে-করে-হোক বলটা খুঁজে বের করা আর স্বপক্ষ দলের চেষ্টা থাকত বলটাকে গুম করা, মানে সত্যি-সত্যি লস্ট করে দেয়া। কতক্ষণ খোঁজাখুঁজি করতে হবে তার কোনো সময় নির্দেশ ছিলনা বলে দু'দলে বড়ই অবনিবনা হত। শেষকালে ক্রিকেট না খেলে সুরু হত বল-খোঁজাখুঁজি খেলা।

প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে এত বেশি লস্ট বল হতে লাগল যে জমলনা ক্রিকেট। মাতলাম ফুটবল নিয়ে। ক্রিকেটে অনেক সরঞ্জাম লাগে, ফুটবলের পক্ষে লাথাবার মত একটা জিনিষ পেলেই চলে যায়। তা নারকেলের ছোবড়াই হোক, বা কারু পরিত্যক্ত চটিজুতোই হোক। ক্রিকেটের চেয়ে ফুটবলে আরো সুবিধে, সব সময়ে মাঠ লাগে না। ঘরে ও বারান্দাতেও, অনায়াসে না হোক, অল্পায়াসে ফুটবল খেলা যেতে পারে। আরো সুবিধে, দুটি মাত্র লোক হলেই চলে যায়। যদিও প্রায়ই সেটা ফুটবল ছেড়ে ঘুসোঘুসিতে পর্যবসিত হয়। ফুটবলের পরে বক্সিংটাই বা মন্দ কি।

পদাঘাতযোগ্য কোনো জিনিস মাটির উপর পড়ে আছে অথচ সেটা কিক্ করছি না বা পাশ করছি না বা গোলে শট নিচ্ছিনা এ কল্পনা করাও দুঃসাধ্য। রাস্তা দিয়ে চলতে-চলতেও ঢিল-পাটকেল ড্রিবল করেছি, ডজ করেছি অনেক পথচারীকে। দুর্ঘটনাও ঘটেনি এমন নয়। রাস্তায় ফুটবল খেলতে গিয়ে ইটে স্যুট করতে গিয়ে পায়ের হাড্ডি ফুড়ক ফাঁই।

তখন আমাদের অনেক উন্নতি হয়েছে। বারান্দা ছেড়ে উঠোন ও উঠোন ছেড়ে মাঠে নেমেছি। নারকেলের ছোবড়া ছেড়ে ধরেছি বাতাবি নেবু। গাছে গাছে দড়ি বেঁধে বানিয়েছি গোলপোস্ট। গর্ব আর আর ধরে না। এবার সত্যিকারের বল হয়েছে। গোল বল।

কিন্তু সেটাও যে সত্যি হীন দশা বুঝতে পারলাম একদিন। আমাদের মাঠের লাগ-দক্ষিণেই রাস্তা, শাদা মাটির রাস্তা, গিয়েছে বঙ্কিম পশ্চিমে, শ্মশান পেরিয়ে শ্যামলতর গ্রামান্তের দিকে। একদিন দেখলাম সে-রাস্তা দিয়ে জেলার কলেক্টর সাহেব ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন। আজকালকার কলেক্টর সাহেবরা মোটরে চড়ে বেড়ান বলে তাঁদের মহিমা আর তত চোখে পড়ে না। কিন্তু সেদিনের সেই দৃপ্ততা এখনো চোখে ভাসছে।

দেখলাম আমাদের খেলা দেখে তিনি ঘোড়া থামিয়েছেন। ভয় না পেয়ে কৌতূহলী হলাম। তিনি আমাদের কাছে ডাকলেন। তবু আমরা ভয় পেলাম না। ভদ্র-অভদ্র যারা ছিল আশে-পাশে, তারা চাণক্যকেও টেক্কা মেরে শত হস্ত ছেড়ে সহস্র হস্ত দূরে দাঁড়িয়ে সেলাম ঠুকতে লাগল, আর আমরা নির্ভয়ে এগিয়ে গেলাম। সেটা সেদিন কম বাহাদুরি ছিলনা। ভাঙা বাঙলায় তিনি জিগগেস করলেন আমাদের এই দুর্দশা কেন, কেন বলের অভাবে ফল পিটছি। সংক্ষেপে বললাম, আমাদের পয়সা কোথায়! কালে-ভদ্রে দু'-এক পয়সা যা পাই তা দিয়ে হিন্দু-রুটি কিনি, কিনি ঝাল-বাদাম। তিনি বললেন তিনি আমাদের বল কিনে দেবেন। যেতে বললেন কুঠিতে।

ইংরিজিতে একটা দরখাস্ত লেখাতে হয়। ক্ষিতীশদা (নামটা বদলে দিলাম) আমাদের খুব ভালোবাসেন, তাঁরই শরণাপন্ন হলাম। ভাবলাম এই সুযোগে আমরা একটা ক্লাব ফেঁদে ফেলব। বেরুব চাঁদার খাতা নিয়ে। সাহেব টাকা দিয়েছে দেখলে অনেক মোসাহেবই টাকার থলে খুলে ধরবে, আমাদেরকে অপদার্থ ভেবে হেনস্তা করবে না! চাই কি, ফুটবলের সঙ্গে-সঙ্গে ক্রিকেট আর ব্যাডমিণ্টনও আমাদের হয়ে যাবে। এমন কি ইউনিফর্ম পর্যন্ত। সুখস্বপ্ন দেখতে লাগালাম।

ক্ষিতীশদা যে-তিনবার ম্যাট্রিকুলেশানে ফেল করেছেন, তিনবারই অঙ্কে করেছেন। ইংরিজিতে তাঁর চোস্ত হাত, একটি কমা ফুলস্টপ পর্যন্ত এদিক-ওদিক হয় না। মুখে যা বলেন, যেন খই ফুটছে। তিনি বললেন, আমি লিখে দেব তোদের পিটিশন।

ক্ষিতীশদার নাম-ডাক খুব, এমন করিয়ে-কম্মিয়ে ছেলে দেখা যায় না। তিনি কোনো কাজে হাত দিলে সে-কাজ অসম্পূর্ণ থাকে এ আমরা ভাবতেই পারতাম না। তবু কেন যে তিনি বারে-বারে অঙ্কে ফেল করতেন ভাবলে আমাদের কষ্ট হত। তিনি বলতেন, দুঃখ করিসনে, এবার এমন কায়দায় টুকব কিছুতেই আর ধরা পড়ব না।

ফলাও করে ইংরিজিতে পিটিশন লিখে দিলেন ক্ষিতীশদা। দল বেঁধে গেলাম সাহেবের কুঠিতে। দেখলাম সেদিনের সেই বন্ধুতার ওপারে বন্ধ গেটের বাধা পড়েছে। দারোয়ান ঢুকতে দিচ্ছে না। বললাম, এই খাতাখানা শুধু নিয়ে যাও সাহেবের কাছে। অনেক কাকুতি-মিনতি করে রাজি করালাম দারোয়ানকে। যাকে বলে পত্রপাঠ উত্তর, তেমনি ঝটিতি দারোয়ান ফিরে এল। দেখলাম, পিটিশনের পৃষ্ঠায় লম্বা করে কোনাকুনি ভাবে একটা লাল পেন্সিলের ক্রুদ্ধ দাগ টানা হয়েছে। সেই দাগটা তীরের মত বুকে এসে বিঁধল। জিগগেস করলাম, ব্যাপার কি। হতভম্ব দারোয়ান বললে, আমি তার কি জানি।

রহস্য সমাধান করতে দেরি হল না। শুনলাম সেই দরখাস্তে দশটা বানান ভুল আর বারোটা ব্যাকরণের অশুদ্ধি।

জীবনে বিতৃষ্ণা এসে গেল। বলং বলং বাহুবলং,

ঠিক করলাম দিশি মতে কুস্তি লড়ব। দরকার নেই ওসব বিদেশী খেলায়, বিনে পয়সায় বালি-স্থগ্রীবের যুদ্ধই ভালো। কিন্তু কুস্তির জন্যে আখড়ার দরকার, আর আখড়া হওয়া চাই নিরিবিলি জায়গাতে। জায়গা কোথায় ?

পুকুর-পারে আমাদের মস্ত বাগান। অনেক রকম গাছ, ঢ্যাঙা আর বেঁটে, মোটা আর লিকলিকে, তার মধ্যে নারকেল-শুপারিই বেশি। ঘুরে-ঘুরে সার্ভে করে উত্তর পারে একটা জায়গা বাছা হল, বেশ গাছে-ঘেরা ছায়া-করা জায়গাটি। কিন্তু এখানে আখড়া পাততে হলে কয়েকটা শুপুরি চারা কেটে ফেলতে হয়। উপায় নেই, দা দিয়ে নির্মম হাতে কচি শিশু-গাছগুলি একে-একে নির্মূল করে ফেললাম।

সে দিন যে কী ভীষণ মার খেয়েছিলাম তা বলে বোঝাতে পারব না। যিনি মেরেছিলেন তাঁকেও বোঝাতে পারিনি শুপুরি গাছের চেয়েও কত বড় সম্ভাবনা আমাদের মধ্যে ছিল হয়তো লুকিয়ে। গাছের থেকেই ফলের আকাঙ্ক্ষা না করে আমাদের থেকেও যে করা যেত সে কথা বলি কাকে। কেঁদেই কূল পাচ্ছিনে। তবু, বাগানের মালী একে-একে যখন চল্লিশটা কাটা শুপুরি-চারা এনে উঠোনে হাজির করল, মনে হল ওদের কান্না আমার কান্নাকেও হার মানিয়েছে।

খেলাধূলা ছেড়ে দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। এমন সময় একদিন ক্ষিতীশদা এসে বললেন, ভাবিসনে, তোদের জন্যে কলকাতা থেকে ব্যাডমিণ্টনের ব্যাট-নেট-ফেদার সব আনিয়ে দিচ্ছি। ক্ষিতীশদাকে অবিশ্বাস করতে পারি এমন আমাদের সাধ্য নেই। তা ছাড়া এবার তিনি অঙ্কেও পাশ করে ম্যাট্রিকুলেশান ডিঙিয়ে গিয়েছেন। তাঁর অবস্থা ভালো, এবং তারি জন্যেই পরীক্ষার গার্ডকে এবার ভারী হাতে খাইয়েছেন বলে গুজব উঠেছে। তাই তাঁর প্রস্তাবে আমরা নেচে উঠলাম। তিনি এক পয়সা দিয়ে একখানা পোস্টকার্ড কিনে এনে কলকাতার খেলার দোকানে লিখে পাঠালেন চারটে ব্যাট একটা নেট আর এক ডজন ফেদার পাঠিয়ে দিতে। ভরসা দিয়ে বললেন, ইংরিজি ভুল হলেও ভয় নেই, ব্যবসাদাররা বানান দেখে না।

ভরসা পেলাম, সন্দেহ নেই। মহা উৎসাহে কোর্ট বানিয়ে ফেললাম, ক্ষিতীশদা নিজে কোদাল ধরলেন। রোজ পোস্টাপিসে যাই, শুনি আসেনি। তবু দমিনা। ক্ষিতীশদা স্বহস্তে চিঠি ফেলেছেন ডাকবাক্সে, না এসেই পারে না। মনে হত, রোদে-বৃষ্টিতে রোজ যে দু মাইল পথ হাঁটি, ও আগ্রহেই জিনিসগুলি ঠিক এসে পড়বে। কলকাতা থেকে না পাঠালেও এসে পড়বে আমাদেরই প্রতীক্ষার তীক্ষ্ণতায়।

বিশ্বাস করবে কি, সত্যি-সত্যিই একদিন তারা এল —ব্যাট, নেট, ফেদার; মস্ত একটা চটের মোড়কে প্যাক্ হয়ে। আমরা তো লুফে নেবার জন্যে পাগল। কিন্তু পিওন বললে, টাকা দিয়ে ছাড়িয়ে নিতে হবে। একী অসম্ভব কথা! জিনিস এসে গেছে, এখন আবার টাকার লেন-দেন কি! বুঝবে না তোমরা, ভি-পি এসেছে, বললে পিওন। অনেক টাকার ভি-পি। কে দেবে তোমাদের মধ্যে? বয়েজ ইউনাইটেড ক্লাবের সেক্রেটারি কে?

পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করতে লাগলাম। আমাদের ক্লাবের তো পাকাপাকি কোনো নাম নেই। মুখ-চলতি একটা বাঙলা নাম ছিল, পশ্চিম পাড়া। সেটা ইংরিজিতে বানান করি এমন আমাদের সাধ্য নেই। আমাদের আবার সেক্রেটারি কে?

বুঝলাম ক্ষিতীশদাই নতুন ক্লাবের পত্তন করেছেন, আর ইংরিজিতে বিশেষ তিনি রপ্ত বলে ক্লাবেরও নাম দিয়েছেন ইংরিজি। সন্দেহ কি, তিনিই আমাদের সেক্রেটারি।

'থাকে কোথায়?'

'ফকিরতলা। দিঘির পার।'

সেদিকে পিওন যাবে সকলের শেষে, আর-আর পাড়া ঘুরে, কালীতারা নাগপাড়া তালতলা চক্কর দিয়ে। বললাম, 'আমাদেরটা আগে সেরে দাওনা দয়া করে। আমরা তবে দুপুর থেকেই খেলা সুরু করে দি।'

আমাদের কথা শুনবে পিওন এমন হেঁজিপেঁজি নয়, তার মাথায় পাগড়ি, গায়ে লম্বা কোট, কোমরে কোমরবন্ধ। আর আমরা ছেঁড়া জামা গায়ে খালি পায়ে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছি। উপায় নেই, ঘুরছি পিওনের পায়ে-পায়ে, দরজা থেকে দরজায়। মাঝে-মাঝে ব্যাটের প্যাকেটটা যে আমাদেরকে পিওন বইতে দিচ্ছে তাতেই আমরা ইহ-জন্মের মত কৃতার্থ বোধ করছি। আঙুল দিয়ে-দিয়ে অনুভব করছি, কখানা ব্যাট, নেটটা কি-ভাবে গুটিয়ে রয়েছে, ফেদারগুলি না-জানি কোথায়! হাতগুলি শিহরিত হচ্ছে। চোখে আনকোরা স্বপ্ন, কতক্ষণে সে সোনার বিকেল এসে দেখা দেবে।

হা-ক্লান্ত হয়ে পৌঁছোলুম ফকিরতলা। এই ক্ষিতীশদা-দের বাড়ি। ঐ ক্ষিতীশদার ঘর। মাটির মেঝে, বাঁশের বেড়া, টিনের চাল। বড় বেশি যেন চুপচাপ দেখাচ্ছে। তবে কি ক্ষিতীশদা বাড়ি নেই? না, আছে, ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে লেপমুড়ি দিয়ে। দেখলাম ভিতর থেকে দরজায় খিল দেয়া। একবার ক্ষিতীশদার ঘুম ভাঙিয়ে দিতে পারলে হয়! বিস্ময়ের ঘোর কাটতে-না-কাটতেই চোখে লাগবে তাঁর নতুন চমকের ঝলকানি।

কিন্তু, ক্ষিতীশদা, ক্ষিতীশদা, গলা ফাটিয়ে হাঁকাহাঁকি করছি, ক্ষিতীশদার সাড়া-শব্দ নেই। চারপাশের লোক এসে জড় হচ্ছে অথচ ক্ষিতীশদার ঘুম ভাঙছেনা। দমাদ্দম ঢিল পড়ছে টিনের চালে, বেড়ার গায়ে, তবু অব্যাহত সেই স্তব্ধতা।

পিওন বললে, হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সত্যি, সন্দেহ করবার কারণ ঘটেছে রীতিমত। বেড়ার ফাঁক দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে আগাপাস্তলা লেপ মুড়ি দিয়ে ক্ষিতীশদা শুয়ে আছেন, অথচ এতক্ষণে একবারও পাশ ফেরেননি, নড়েননি একচুল। এত শব্দেও তাঁর এতটুকু স্পন্দন নেই। সবাই বলাবলি করতে লাগল, ছেলেটা নিশ্চয়ই মরে রয়েছে। হয় খুন, নয় আত্মহত্যা, নয়তো ঘুমের মধ্যে হার্ট-ফেল।

আর দ্বিধা নেই, দা নিয়ে এসে ছোট-ছোট বেতের বাঁধন কেটে দিয়ে বেড়ার একদিকটা ফাঁক করে ফেললাম। ঢুকলাম সবাই হুড়মুড় করে। এক হেঁচকা টানে তুলে ফেললাম লেপটা। হা হতোস্মি! ক্ষিতীশদা কোথায়! একটা তাকিয়া ও একটা পাশ-বালিশ লেপের তলায় এমনি ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে যে মনে হচ্ছে ঘুমন্ত একটা গোটা মানুষ। সেই বেঁটে খেঁটে গুরগুটে ক্ষিতীশদা।

কিন্তু ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে ক্ষিতীশদা পালাল কি করে? সন্ধান পেতে দেরি হল না। কয়েকদিন আগে ক্ষিতীশদার ঘরে চোরে সিঁধ কেটেছিল, সেই সিঁধ আর বোজানো হয়নি। সেই সিঁধ দিয়েই ক্ষিতীশদা সরে পড়েছেন।

বাইরে এসে দেখি পিওনও নেই। সেও হাওয়া হয়ে গিয়েছে।

সেই থেকে খেলা আর জোটেনি অদৃষ্টে। জুটেছে তার উলটোটা। লেখা। শুধু লিখছি আর লিখছি। জবানবন্দী আর রায়, গল্প আর উপন্যাস, আরো কত-কি।

হিজিবিজি

দিলীপ দে চৌধুরী

(১)

শুয়ে শুয়ে কাঁপি জ্বরে,
স্যাঁতসেঁতে এঁদো ঘরে।
কল্পনা চাপে এসে,
কতো ছবি ওঠে ভেসে!
সব তবু দূরে আছে—
নিজেকে পেয়েছি কাছে!
ময়লা বিছানা পরে—
আমি শুয়ে কাঁপি জ্বরে।

(২)

সর্পিল পথ মিলায় দিগন্তরে—
পেরিয়ে সীমানা মাঠের সোনালী ধান;
মনে হয় যেন নিভে গেছে দীপ ঝড়ে,—
চমকে হঠাৎ থেমে গেছে কোন গান!

(৩)

দুরন্ত ঝড়ে কাঁপছে গাছ—
জানালার যত ভাংগছে কাঁচ—
ধূলোয় আকাশ অন্ধকার—
এ কোন রুদ্র ছন্দ কার?

(৪)

স্তব্ধ রজনী থম্‌থম্‌ করে নিবিড় অন্ধকারে
নিদ্রালু ঘন বরষা নেমেছে হৃদয়ের চারিধারে।
হঠাৎ কখন বাঁধ ভেঙে আসে নীল-সমুদ্র ঢেউ,
প্রভাতী আলোর নতুন জোয়ার জানিনা আমরা কেউ!

(৫)

শ্যামল মেয়ে, শ্যামলী নাম বুঝি!
হঠাৎ তারে পেলাম আমি খুঁজি—
হাতে চুড়ি; পায়ে রূপার মল—
মল নাকি ওর ভারতমাতার পায়েরই শৃংখল?

(৬)

কেন এ চিন্তা হিজিবিজি?
কেন এ ভাবনা মিছিমিছি?
কার কতটুকু আসে বা যায়
বলতো বন্ধু মোর লেখায়?
তবুও তো লিখি, লিখি বসে
কলমের নিব চলি ঘষে।
খাপছাড়া যতো কল্পনা—
কেন এ স্বপ্ন আল্‌পনা?

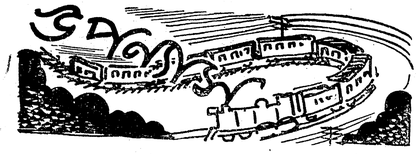

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

কুন্থ অবাক হয়ে গেল। ইতিমধ্যেই বোম্বাই সহর অশোকের যেন নখদর্পণে এসে গিয়েছে। কুন্থর এখনো দীর্ঘ ট্রেন-জার্নির ব্যাথা গা থেকে মরেনি, হাই তুলতে তুলতে আর আলসেমি করতে করতে ও ভাবছিলো বিশ্রাম এখনো সম্পূর্ণ হয়নি। আর এরই মধ্যে কোন কোন ফাঁকে বেরিয়ে আর বেড়িয়ে অশোক রীতিমতো সহর আর সহরতলী চষে ফেলেছে। এবং, শুধু তাই নয়, খুঁটিনাটি পথঘাট পর্যন্ত যেন মুখস্থ করে ফেলেছে! ট্যাকসির দ্রুত বেগের সঙ্গে সমানে তাল রেখে অশোক গড়গড় করে কুন্থকে বুঝিয়ে চলল—"এই হল দাদার। এদিকেই বোম্বাইএর আসল বাঙালী মহল। একটু এগিয়েই বাঙালী ছেলেমেয়েদের ইস্কুল।···প্যারেল। প্যারেলের ময়দান।···গিরনি কামগড় ইউনিয়ন। ভারতবর্ষে মজুরদের এত বড় ইউনিয়ন আর কোথাও নেই।··· সিনেমার স্টুডিও বাঁ দিকে এগুলে। কত স্টুডিও আছে বোম্বাইতে? ওঃ অনেক।···ছাপা সাড়ীর দোকান।··· আর একটু ওপাশে এগুলে কোলাপুরি চটির আড়ৎ পাওয়া যাবে।······"

অবশেষে হর্নবি রোড। খবরের কাগজের অফিস খুঁজে বের করতে একটুও কষ্ট হল না কিন্তু কষ্ট হল কর্তাদের কাছে আসল কথাটা পাড়তে। অশোক বলতে চায় যে প্রতাপচন্দ্রের মস্তিষ্ক বকৃতির খবর খবরের কাগজ-ওয়ালাদের পক্ষে অত তাড়াতাড়ি, প্রায় রাতারাতি, পাওয়া একেবারে তাজ্জব ব্যাপার বলেই মনে হয়। কেন না, এ কোন সভাসমিতির খবর নয়, মিছিল মজলিসের খবর নয়, খেলাধুলোর খবর নয়, সিনেমা থিয়েটারের খবর নয়, যে কাগজওয়ালারা আগে থাকতেই আঁচ করে ওৎ পেতে বসে থাকবে। প্রতাপচন্দ্রও এমন চাপা প্রকৃতির লোক বলে শোনা গেল যে তিনি স্বেচ্ছায় সবাইকে ডেকে এ খবর বলে বেড়াবেন তাও ত মনে হয় না। তাহলে খবরটা বেরুলো কেমন করে? আর শুধু যে বেরুলো তাই নয় একেবারে খবরের কাগজে ছাপা হয়ে গেল!

কুন্থ অবশ্য অশোকের আসল উদ্দেশ্যটা প্রথম প্রথম ঠাহর করতে পারে না। না হয় মানাই গেল যে খবরটা বেরুবার কথা নয় তবুও বেরিয়ে পড়েছে, এমন কি ছাপা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে ভুত ধরবার যোগাযোগ কোথায়? ট্যাকসিতে আসতে আসতে এ নিয়েও দুজনের মধ্যে কিছু কথাবর্তা হয়েছিলো। অশোক সোজা জবাব দিতে চায়নি। হেঁয়ালী করেই বলেছিলো, "খবরটা স্বয়ং ভূত খবরের কাগজের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন কি না তা আবিষ্কার করা দরকার।"

কিন্তু কে যে খবরটা পৌঁছেছে তা আবিষ্কার করা অমন সোজা নয়। কাগজওয়ালা শুধু জাঁক করে বলে, "আমাদের কাগজ কি অমন যা তা কাগজ! দুনিয়ার কোথায় কি হচ্ছে তা সবই আমাদের নখদর্পণে!" অশোক নানান ভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে কথাটা পাড়তে চায়, নানান,

ছলে বের করতে চেষ্টা করে খবরটা কেমন করে তারা পেল! কিন্তু বুদ্ধির লড়াই করা যায় শুধু তার সঙ্গেই যার বুদ্ধি আছে; আর যে বোকার মতো কেবল দম্ভ করে বুদ্ধির লড়াই চলে? কাগজের বড়কর্তা, মেজকর্তা, সব কর্তাই শুধু বুক ফুলিয়ে বলেন, "দুনিয়ার সকলের হাঁড়ির খবর আমরা জানি মশাই, একেবারে হাঁড়ির খবর জানি। ওই ত আমাদের ব্যবসা!" অশোক একটু বিরক্ত হয়ে বলে, "সে খবরটুকু ত আমিও জানি যে দুনিয়ার সব খবর আপনারা জানেন। কেবল দয়া করে বলে ফেলুন এই খবরটা কেমন করে জানলেন?" কর্তারা হাসেন, "কেমন করে জানলুম? আসলে সেটুকুই ত আমাদের ট্রেড্ সিক্রেট, ব্যবসার গোপন রহস্য। সেটা বুঝলে ত আপনিও হর্নবি রোডে খবরের কাগজের দপ্তর ফাঁদতে পারতেন!"

"ধুত্তোর ট্রেড্ সিকরেট," পথে বেরিয়ে অশোক অত্যন্ত বিরক্তভাবে কুন্তুকে বলে। "এক একটি একেবারে দম্ভের ফানুস, অহংকারের আকাশে হুসহুস করে উড়ছে!"

কুন্তু বলে, "তোরই বা এ খেয়ালের কি মানে হয় বুঝলুম না। ভূত ধরতে বেরিয়ে ভূতের খবর কে প্রথম জানালো তাই নিয়ে মাথা ব্যথা কেন?"

"দেখি", অশোক বলল, "ভূতটা যদি ধরতে পারি তখন নিজেই বুঝতে পারবি।" "আর তখন," কন্তু অশোককে একটু উৎসাহ দেবার আশায় বলল, "এই সব-পেটমোটা কাগজওয়ালারাই ভীড় করে আসবে, অনুনয় করে বলবে কেমন করে ভূতটা ধরা পড়ল; আর তখন আমি এই ফানুসগুলোর পেটে খোঁচা মেরে ভুষভুষ করে সমস্ত দম্ভের ধোঁয়া বের করে দেব।"

অশোক হাসতে হাসতে বলল, "কিন্তু তার আগে ভুতটাকে ধরা দরকার।"

"তা ত নিশ্চয়ই।"

"চ তা হলে সেই চেষ্টা করা যাক।"

"কোথায় যাবি?"

"প্রথম, অধ্যাপক ত্রিবেদীর বাড়ী যাওয়াই উচিত। ভদ্দরলোক যেমন ছিটগ্রস্থ মানুষ, মনে হয় তাঁর কাছ থেকেও যে-সব খবর পাব আশা করেছিলুম তাও পাব না। তাই খবর বের করবার অন্য বন্দোবস্ত করতে হবে। প্রথম একটা ওষুধের দোকানে যাওয়া যাক।"

"ওষুধ? সেখানে কী খবর পাবি?"

"খবর পাব না, তবে খবর বের করবার চাবি পাব।"

"ওষুধের দোকানে চাবি?"

"হুঁ। চ না।"

প্রকাণ্ড ওষুধের দোকান। অশোক কতকগুলো এ্যাসিড্ প্রভৃতির নাম বলতে দোকানদার কপাল কুঁচকে একটু চেয়ে রইল। তারপর সন্দেহের গলায় বললে: "ডাক্তারের প্রেসকিপসন আছে?"

অশোক অম্লান বদনে বলল, "হুঁ।" বলে, পকেট থেকে একটা নোটবুক বের করে তার একটা পাতা ছিঁড়ে ঘসঘস করে ঠিক প্রেসকিপসন লেখার মতো লিখে ফেলল। এবং তলায় একটা নাম সই করে দিল। কুন্তু চোখ গোল-গোল করে বন্ধুর কাণ্ডটা দেখতে লাগলো: অশোক যে কস্মিনকালেও ডাক্তার নয় এ কথা কুন্তু যত ভালো করে জানে তত ভালো করে আর কেউ নিশ্চয় জানে না! অথচ, কুন্তুর ভারি মজা লাগল, অশোক পাকা ডাক্তারের মতো প্রেসকিপসন লিখতে পারে এবং বেমালুম মিছে একটা বাজে সই করে দিতে পারে! কুন্তু আরও অবাক হয়ে দেখল অশোক নিজের সই-এর পাশে দিব্বি নির্লিপ্তভাবে একটা কী যেন উপাধি বসিয়ে দিল।

দোকানদার কপাল কুঁচকেই কাগজটা নিল এবং তারপর মুহূর্তে তার চোখমুখের চেহারা বদলে গেল। অপ্রস্তুত ভাবে প্রশ্ন করল, "আপনিই কলকাতার সেই বিখ্যাত ডাক্তার এইচ ঘোষ এম্ ডি?"

অশোক একটু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গি করে বলল, "হুঁ।"

দোকানদার প্রায় গদগদ ভাবে বলল, "কাগজে দেখছিলুম আপনি একটা বিশেষ কেস নিয়ে বোম্বাই আসছেন।"

অশোক বলল, "জানেনই ত কাগজওয়ালারা সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখে।"

"কিন্তু", দোকানদার বলল, "আপনি যে স্বয়ং আমার দোকানে পদধুলি দেবেন এমন কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।"

"দেখুন", অশোক ভারিক্কি চালে বলল, "আমি রোগীকে যখন যে ওষুধ দিতে চাই তা শুধু প্রেসকিপসনে লিখেই দিই না। বরাবর ওষুধের দোকানে দাঁড়িয়ে নিজে তদারক করে ওষুধ তৈরি করাই। সব কম্পাউণ্ডারেরই ত হাত সমান হয় না।"

"এরকম সাবধানী না হলে কি আর অতবড় ডাক্তার হওয়া যায়?" শ্রদ্ধায়, ভক্তিতে দোকানদার প্রায় নুয়ে পড়ল—বলল, "চলুন, আপনি ওষুধ তৈরি নিজে দেখবেন চলুন।"

"না, আমিই বাড়িতে মিশিয়ে ঠিকমত ওষুধ তৈরি করে নেব। এ কেসটা বড় কঠিন কেস, নানান রকম পরিমান দিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে। আপনি অমায় এই ওষুধগুলো খাঁটি দিন। দেখবেন, পুরোনো স্টক না হয়।"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই", বলতে বলতে দোকানদার নিজের কোটের সামনের বোতামগুলো ভালো করে এঁটে হন্তদন্ত হয়ে ভেতরের দিকে গেল।

ওষুধের বোতল-টোতলগুলো ভালো করে গুছিয়ে ট্যাকসিতে বসে স্বস্তির নিশ্বেস ফেলে অশোক বলল, ভাগ্গিস খবরের কাগজওয়ালারা সবাইকার হাঁড়ির খবর রাখে! তা নইলে আমিই কি ছাই জানতে পারতুম কলকাতার বিখ্যাত ডাক্তার এইচ ঘোষ এম্ ডি আজ এখানে এসে পৌছোবেন!"

"কিন্তু থেকে থেকে তাঁর সই জাল করতে গেলি কেন?"

"নইলে ভাই অনেক হাঙ্গামা হোত। ডাক্তারের সই ছাড়া ওষুধগুলো পাওয়া কঠিন; আর দেখছিসই ত বোম্বাই সহরের ছব্বা—কোনো ডাক্তারকে যদি বলতুম সই করে দিতে তা হলে জেরা করে করে একেবারে ফ্যাচাখেকো করে তুলতো!"

"কিন্তু ডাক্তার ঘোষের ত বয়েস হয়েছে। দোকানদার যদি ধরে ফেলত!"

"ঠিক বলেছিস", অশোক বলল "তবে দোকানদার-এর চেহারা দেখে মনে মনে ঠিক বুঝে ফেলেছিলুম যে তার বুদ্ধি তোর চেয়েও মোটা!

কুন্তু রীতিমতো রাগ করে ট্যাকসির জানলার বাইরে চেয়ে রইল। বুদ্ধি নিয়ে অশোক যখন খোঁটা দেয় তখন সত্যিই ওর আত্মসম্মানে লাগে। কেন না, ও জানে অশোককে কোনদিন বুদ্ধির যুদ্ধে পরাস্ত করে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে না।

অধ্যাপক ত্রিবেদী প্রায় হাঁ হাঁ করে উঠলেন, "সেকি? খাতাখানা আপনি ফেরত নিয়ে যাবেন? ও খাতাটায় আপনার কী লাভ হবে বলুন? অথচ, প্রাচীন উর্দ্ সম্বন্ধে কত অদ্ভুত তথ্য আমি ওর মধ্যে খুঁজে পেয়েছি!

"অদ্ভুত মানে নতুন, কী বলুন?"

"নিশ্চয়ই নতুন। অনেক প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক মতবাদ এ খাতার সাক্ষীর সামনে একেবারে ভেঙে পড়বে।"

"তার মানে, আপনি মেনে নিচ্ছেন খাতাটা খাঁটি?"

"তার মানে?"

"তার মানে, এমন, ত হতেই পারে যে খাতাটা আসলে জাল। তা হলে, প্রাচীন গুজরাট সম্বন্ধে মতবাদকে শুধরে নেবার কথাই যে ওঠে না।"

"জাল? এ কথা যে ভাবাই যায় না! খাতাটার চেহারা একবার ভালো করে দেখুন—হলদে ঝুরঝুরে খাতা। এ খাতা কখনো জাল হতে পারে?

"ইংরেজীতে একটা কথা আছে—যা কিছু চকচক করে তাই সোনা নয়।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

"খাতাটা যে জাল", অশোক বলে চলল, "এ সন্দেহ আপনার কথা শুনে আমার মনে আরও বদ্ধমূল হল। আপনার কথার সারমর্ম এই যে প্রাচীন গুজরাটের ইতিহাসের সঙ্গে এতে যে-সব বর্ণনা আছে সে সবগুলো ঠিক খাপ খায় না। এই ত?"

"হুঁ।"

"সেটুকুই আমি জানতে চেয়েছিলুম।"

"কিন্তু তার কারণ ত এও হতে পারে যে খাতাটা ভুল নয়, আসলে প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের মতবাদ-গুলোই ভুল।" "হতে পারে বই কি। নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের ফলে অনেক সময়ই ত মানুষের মতবাদ বদলায়।"

"তা হলে এ ক্ষেত্রে যে তা হবে না তার প্রমাণ কি?"

"প্রমাণের দাওয়াই কিনে এনেছি। বাইরের গাড়ীতে আছে।"

"দাওয়াই?"

"হুঁ। দাওয়াই। বড় কড়া কড়া দাওয়াই। খাতাখানা তা হজম করতে পারলে বুঝব ইতিহাসকে সংশোধন করবার ক্ষমতা তার আছে। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, বেছারা অত কড়া দাওয়াই হজম করতে পারবে না।"

অধ্যাপক ত্রিবেদী হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। কুহু বোকার মতো অশোকের পিছুপিছু ট্যাকসিতে উঠল। অশোকের হাতে ঝুরঝুরে পুরোনো খাতাটা! [ক্রমশ]

কাহিনী

শরৎচন্দ্র দত্ত

ঝলমলে নীলাকাশে উড়ে যায় পাখী,
থেকে-থেকে ভেসে আসে ক্ষীণ ডাকাডাকি।
কাজল পলাশ বনে
বাজে বাঁশী অকারণে,
শিউলি ঝরানো পথে শিশির মাখি,
থমকি দাঁড়ায় ওকে স্নিগ্ধ আঁখি!
নীল পাহাড়ের কোলে শালের শিরে,
উন্মনা বায়ু নাচে প্রভাতে ঘিরে।
দিগন্তে কল হেসে
না জানি কোথায় মেশে,
হয়ত বা স্বপনের কথার তীরে,
ক্ষীণ রেখা টেনে পথ খুঁজিছে কি-রে?

দেবার মালিক ভগবান

(রাশিয়ান রূপকথা)

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

টাকার পাহাড় জমিয়েছে! টাকা ছাড়া দুনিয়ায় আর কোনো-কিছুর পানে তাকায় না! লোকে নাম দেছে টাকু। টাকুর বাড়ী-গাড়ী টাকা-মোহর এত যে টাকু বলে, ফেলে-ছড়িয়ে দিলেও আমার টাকা উড়বে না, পুড়বে না!

আশে-পাশে বন্ধুর দল। তারা বলে, ভগবানের দয়া!

টাকু হুঙ্কার তোলে, বলে—ভগবান? আমি ভগবান মানি না! নিজের বুদ্ধিতে টাকা করেছি!···যাদের টাকা নেই, তারা মানে ভগবানকে! আমি কি-দুঃখে ভগবানকে মানবো?

বন্ধুরা শিউরে ওঠে, বলে—ও-কথা বলতে নেই হে! টাকা তুমি করেছো ভগবানের দয়ায়: তিনি যদি মনে করেন, তাহলে নিমেষে ও-টাকা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

টাকু বলে জোর-গলায়—কক্‌খনো না! টাকা আমি যেমন রোজগার করেছি, তেমনি কি করে' টাকা রাখতে হয়, তাও আমার ভালো-রকম জানা আছে। তোমরা বলছো, ভগবান! বেশ, বাজি···দেখি, তোমাদের ভগবান আমার টাকা, জায়গা-জমি, বাড়ী-গাড়ী, কি করে' হরণ করেন!

বন্ধুরা বলে—দর্প করো না টাকু! ভগবান কারো দর্প সহ্য করেন না!

টাকু বলে—যার শক্তি আছে, দর্প কেন সে করবে না? খুব করে' দর্প করবে সে!

ভগবান বুঝি এ-কথা শুনতে পেয়েছিলেন। সন্ধ্যার সময় হঠাৎ কোথাও কিছু নেই, ঈশান-কোণে একটু মেঘ দেখা দিলো।···দেখতে দেখতে সে-মেঘ মস্ত কালো পাখা মেলে পৃথিবীর মাথার উপর এসে বসলো, এবং পাখার ঝাপ্‌টায় এমন ঝড় বইয়ে দিলো···সঙ্গে সঙ্গে দারুণ ভূমিকম্প; পাহাড়ের চূড়া ধ্বসে নেমে গেল কোন্ পাতালের গর্ভে, পৃথিবী মাথা উঁচু করে' সাগরের জলরাশিকে বিপুল বন্যায় মাটীর বুকে ঠেলে দিলো। সে-বন্যায় টাকুর বাড়ী-গাড়ী কোথায় তলিয়ে গেল—টাকা-কড়ি-মোহরে-ঠাশা তোষাখানা ছার-খার হয়ে গেল! কোনোমতে দুটো মোহরের থলি আঁকড়ে টাকু পড়ে রইলো সেই দুই থলির উপর সারা রাত। তাকে ঘিরে চললো ঝড়-জল বন্যা-ভূমিকম্পের প্রচণ্ড মাতন! টাকুর গায়ে এসে লাগে ঠাণ্ডা কন্‌কনে হাওয়া···জলের ছাট···বাড়ীর দেওয়াল থেকে খশা চূণবালি, টাকুর সেদিকে খেয়াল নেই!

শেষ-রাত্রে ঝড়ের বেগ একটু যেন কমলো। টাকু মোহরের থলি ঘাড়ে করে উঠলো পথে। পথে জল জমে আছে, হাঁটু-ভোর জল ভেঙ্গে।

হাঁটতে হাঁটতে টাকু এলো নদীর কূলে। নদীর কাণায়-কাণায় ভরা অথৈ-অতল জল—সে জলে কি স্রোত! কূলে

মস্ত একটা উইলো-গাছ শুধু মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে··· সারা রাত ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করে' গাছ তার ডাল-পাতার অস্ত্র নিঃশেষ করেছে ; এখন দাঁড়িয়ে আছে নিষ্পত্র শুক্‌নো কাঠের মতো দেহ নিয়ে ! টাকু গাছে উঠলো···গাছের ডগায় কোনোমতে মোহরের থলি দুটো বাঁধলো···বেঁধে নেমে এলো। নেমে এসে চারিদিকে তাকালো···আকাশের মেঘের পর্দা কেটে পূবদিকে সূর্য্যের রক্ত আভা···মাটীর বুক থেকে হু-হু স্রোতে বন্যার জল গড়িয়ে আবার ফিরে চলেছে নদীর বুকে !···

হঠাৎ মড়মড় করে শব্দ···উইলো গাছ বুঝি মাথায় থলির ভার সইতে পারলো না ! গোড়া-শুদ্ধ উপড়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়লো নদীর জলে ! টাকু দেখলো···নিরুপায় হতাশ দৃষ্টিতে···তার মোহরের থলি দুটোকে জলে বিসর্জন দিয়ে উইলোর দেহ ভেসে চললো নদীর খর-স্রোতে !

সর্ব্বস্ব গেল ! কাল সন্ধ্যার আগে টাকু ছিল টাকার পাহাড়ে বসে···আর আজ রাত পোহাবার সঙ্গে সঙ্গে কাদা-মাটীতে পড়ে থাকা ভিন্ন তার আর কোনো উপায় নেই ! স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে তার ধন-জন শক্তি-দর্প অহঙ্কার···সব !

প্রাণটা রয়ে গেল। প্রাণের মায়া এখন প্রবল। প্রাণ রক্ষা করতে টাকু এক সদাগরের কাছে নিলো চাকরি। সদাগরের চিঠি-পত্র বইবার কাজ—এই কাজ করেই টাকুর এখন দিন কাটে।

সেদিন সদাগরের এক জরুরি চিঠি নিয়ে টাকু চলেছিল অনেক-দূরের এক সহরে। যেতে যেতে পথে সন্ধ্যা হলো। রাত্রে আশ্রয়ের জন্য সে ঢুকলো পথের ধারে মস্ত এক বাড়ী দেখে' সেই বাড়ীতে।

ধনীর বাড়ী। ধনী মানুষটি ভালো। দয়া-ধর্ম্ম আছে। টাকুকে ধনী দিলো আশ্রয়।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া চুকলে টাকু বললো তার জীবনের কাহিনী। বললো, টাকার পাহাড় জমিয়েছিল সে—একটী রাতের ঝড়ে-জলে-ভূমিকম্পে তার সর্ব্বস্ব গেছে ! দুটী মোহর-ভরা থলি নিয়ে একটা বড় গাছের মাথায় সে থলি বেঁধে ভেবেছিল, ঐ মোহর দিয়ে আবার নতুন করে' সব গড়ে তুলবে ! কিন্তু তা আর হলো না ! ভোরের বেলায় গোড়া উপড়ে গাছ পড়লো নদীর-জলে—তার সে মোহরের থলিও গেল ভেসে !

গল্প শুনে ধনী চমকে উঠলো···চমকে তার বৌয়ের পানে তাকালো।

তারপর রাত্রে ধনী বললো তার বৌকে—সেদিন নদীর ঘাটে আমাদের বাগানের কোলে ঐ যে দু'থলি, মোহর পেয়েছি, সে-মোহর তাহলে এর ! এখন কি করে' ওকে এ-মোহর ফিরিয়ে দি ?

বৌ বললে —আমি উপায় করছি···

বৌ করলো কি,···মোটা-মোটা কতকগুলি চাপাটি তৈরী করলো···সেই চাপাটির মধ্যে কায়দা করে' দিলো থলির মোহর ভরে ; তারপর সকালে টাকু যখন আবার তার যাত্রা সুরু করবে, তখন তাকে চাপাটিগুলি দিয়ে ধনী আর ধনীর বৌ বললো, এখনো তোমাকে অনেকখানি পথ যেতে হবে···কোথায় খেতে পাবে কি-না-পাবে, পুঁটলিতে বেঁধে কখানা চাপাটি দিলুম, খেয়ো।

চাপাটির পুঁটলি বয়ে টাকু বেরুলো।

অনেকখানি পথ। পুঁটলি বেশ ভারী। টাকু ভাবলো, ওরা পাগল ! পথে খাবার জন্য চাপাটি দেছে, না, বিশ-মণ পাথর দেছে ! এর বদলে যদি কিছু পয়সা কড়ি দিতো, তাহলে বইতে কষ্ট হতোনা—সে-পয়সায় দরকারমতো খাবার কিনে খাওয়া চলতো।

বেলা দশটা-এগারোটা···মাথার উপর সূর্য্য বেশ তপ্ত হয়ে উঠেছে। পথের ধারে এক গাছতলায় বসলো টাকু··· ভাবলো, একটু জিরিয়ে চাপাটির টুকরো ভেঙ্গে খাবে !

বসে জিরুচ্ছে, এমন সময় সে-পথে এলো ক'জন লোক। একপাল গোরু কিনে তারা সহরে চলেছে !

টাকু তাদের চিনতে পারলো। এরা টাকুকে বিক্রী করেছে কত-না-জিনিষ ! টাকুকে দেখে ওরা বললো—আপনি এখানে ?

টাকু বললো—ঝড়ে-ভূমিকম্পে আর বন্যার জলে আমার সর্ব্বস্ব গেছে। আমি এখন চাকরি করছি। চলেছি দূর সহরে মনিবের চিঠি নিয়ে।

—খাওয়া হয়েছে ?

টাকু বললো—না। সঙ্গে পয়সা-কড়ি নেই ! তার উপর বিপদ ভাখো ; গাঁয়ে এক ধনীর ঘরে রাত্রে অতিথি হয়েছিলুম—তারা আমাকে দেছে দুমণ ওজনের চাপাটির বস্তা ! বস্তা বয়ে আমার ঘাড় টনটন করছে। এর চেয়ে যদি তারা দুচার আনা পয়সা দিত, উপকার হতো !

তারা বললো—আমাদের খুব খিদে পেয়েছে।

টাকু বললো—তোমরা এই চাপাটি-শুদ্ধ পুঁটলিটা কিনে নাও···আমিও বোঝা বইবার দায় থেকে বাঁচি !

তারা দাম দিয়ে চাপাটির পুঁটলি কিনলো। দাম পেয়ে টাকু আর এক মিনিট বসলো না—তখনি উঠে যাত্রা সুরু করলো।

চাপাটির পুঁটলি নিয়ে এরা বললো—এখন খাবো না। শ্রান্ত হয়েছি···খানিক আগে ঐ ধনীর বাড়ী···সেখানে গিয়ে জিরিয়ে স্নান করে' তারপর খাওয়া যাবে।

তাই হলো। তারা এলো সেই ধনীর বাড়ী। এসে বললো—অতিথি হবো। খাবার আমাদের সঙ্গে আছে—এই পুঁটলিতে বাঁধা চাপাটি।

চাপাটির পুঁটলি দেখে ধনী আর ধনীর বৌ অবাক ! জিজ্ঞাসা করলো—এ পুঁটলি পেলে কোথায় ?

তারা বললো—টাকুর সঙ্গে পথে দেখা। টাকু বললো পুঁটলি সে বইতে পারছে না—এর বদলে সামান্য পয়সা-কড়ি পেলে সে পুঁটলি বেচবে। তার কাছ থেকে এ পুঁটলি কিনেছি। এই পুঁটলি খুলে চাপাটি বার করে আমাদের দাও···আমরা স্নান করে এসে খাবো।

তারা গেলো স্নান করতে···ধনী আর ধনীর বৌ সেই ফাঁকে চাপাটির পুঁটলি রেখে অন্য চাপাটি সাজালো খাবার পাত্রে।

তারা স্নান করে ফিরে চাপাটি খেয়ে গোরু নিয়ে চলে গেল !

দুদিন পরে টাকু ফিরলো মনিবের চিঠির জবাব নিয়ে এই পথে। এসে আবার ধনীর বাড়ীতে নিলো আশ্রয় রাত্রির মতো।

টাকুর কাছে ছিল একটি খালি থলি···সেই থলির মধ্যে চাপাটির মোহরগুলি ভোরে' ধনী আর ধনীর বৌ থলি দিলো টাকুর হাতে। থলির মুখ বাঁধা। ভারী থলি। ধনী বললো—এর মধ্যে কিছু খাবার দিয়েছি—পথে খেয়ো।

থলি-ঘাড়ে টাকু পথে বেরুলো···যেতে যেতে এক জায়গায় ঝাঁকড়া আপেল-গাছ। থোলো থোলো আপেল ফলেছে। দেখে টাকুর হলো লোভ—থলে রেখে টাকু উঠলো আপেল-গাছে আপেল পাড়তে।

ওদিকে ধনী আর ধনীর বৌও পথে বেরিয়েছে থলি নিয়ে টাকু কি করে, আড়াল থেকে দেখবে বলে।···

তারা এসে ভাখে, আপেল-গাছের তলায় থলি পড়ে—আর টাকু গাছে উঠেছে আপেল পাড়তে।

একটি আপেল পেড়ে তাতে কামড় দিয়ে টাকু দেখে, ধনী আর ধনীর বৌ ! ভাবলো, এ গাছ বুঝি ওদেরই—চুরি করে আপেল পাড়ছে দেখলে কি-না কি করে—তাই সে গাছ থেকে ঝাঁপ খেয়ে পথে পড়েই দে ছুট !

মোহরের থলি কুড়িয়ে ধনী বললো—এক কাজ করি—বাড়ী যেতে হলে ওকে দূরের নদীর পুল পার হবে তো··· অন্য পথে গিয়ে পুলের উপরে আমি এই থলি রেখে আসি। পুলের উপরে উঠে নিজের থলি চিনতে পারবে, তখন না নিয়ে পারবে না।

এই কথা বলে' ধনী সে-থলি নিয়ে অন্য পথে পুলের উপরে এলো। পুলের ঠিক মাঝখানে মোহরের থলি রেখে দিয়ে দূরে একটা গাছের আড়ালে ধনী লুকিয়ে রইলো।

এখন পুলের কাছে এসে টাকুর কি যে খেয়াল হলো, সে ভাবলো, মানুষের কখন কি অবস্থা হয়, তার তো ঠিক-ঠিকানা নেই! আজ আমার দুটি চোখই আছে—দু'চোখে সব দেখছি। কালে যদি কাণা হয়ে যাই, তখন?

এ-কথা মনে হবার সঙ্গে সঙ্গে ভাবলো কাণা হলে···এই তো চেনা পথ···ঐ চেনা পুল···এ পুল তখন পার হতে পারবো কিনা দেখি!

এই ভেবে চোখ বুজে দু'হাত বাড়িয়ে টাকু কাণা-মাছি খেলার চোখ-বাঁধা কাণার মতো পুলে উঠলো···এবং হাতড়াতে-হাতড়াতে দু'চোখ বুজে পুল পার হলো।

পার হয়ে চোখ খুলে ভারী খুশী! ভাবলো, না, কাণা হলেও তাহলে ভাবনা থাকবে না···পুল সে পার হতে পারবে!

মনের আনন্দে টাকু চললো তার মনিব-সদাগরের বাড়ীতে।

ধনী বললো বৌকে—ভগবান বিরূপ দেখছি রে বৌ, না হলে তিন-তিনবার ওর মোহর ওকে দিতে গেলুম—তিন-বারই বুদ্ধির দোষে সে-মোহর হারালো!

ভূতুড়ে

গৌরীন্দ্রকুমার দে

বিদঘুটে কদাকার চেহারা
পাড়াময় নিঃঝুম রাত্রি,
ঘুম ভেঙে চেয়ে দেখি চম্‌কে
একা ঘরে একা যেন যাত্রী।
চামচিকে দিশেহারা উড়ছে
ঘরময় ভয় ভয় দৃষ্টি
ঝুপ ঝুপ চারদিকে বৃষ্টি।

নীল আলো টিম টিম টেবিলে
খোলা বই পাতাগুলি কাঁপছে,
থেকে থেকে বাদলার ঝাপটা
ধোপাদের গাধাগুলো ডাকছে।
আশেপাশে বিটকেল শব্দ
পেঁচাদের ডাক অনাসৃষ্টি
ঝুপ ঝুপ চারদিকে বৃষ্টি।

তাড়া ঘুমে আসে ফের তন্দ্রা
ঘড় ঘড় জানলায় শব্দ,
চমকিয়ে উঠে বসি লাফিয়ে
ক্ষণগুলি মনে হয় অব্দ।
কণ্ঠের তালু লাগে শুষ্ক
কেঁপে মরে আলোটার দীপ্তি
ঝুপ ঝুপ চারদিকে বৃষ্টি।

দেয়ালের কোণে কোণে কাহারা
ছায়াময় কায়া নিয়ে ঘুরছে,
দেখে ঠিক মনে হয় তাহারা
নানা বদ মতলবে চুঁড়ছে।
স্যাঁতসেঁতে বাদলের গন্ধ
ঘরময় যত অনাসৃষ্টি
ঝুপ ঝুপ চারদিকে বৃষ্টি।

দপ্‌ করে জলে ওঠে বাতিটা
ফট্‌ করে নিভে যায় সল্‌তে,
বাপ্‌রে কি আঁধারের চেহারা
জমে যায় জিভ্‌ কথা বলতে।
আকাশেতে গুড়গুড় শব্দে
ধড়ফড় করে ওঠে বুকটি
ঝুপ ঝুপ চারদিকে বৃষ্টি!

শরীরের চারিপাশে ঠাণ্ডা
অশরীরি ফেলে যেন নিশ্বাস,
কি জানি কি হয়ে যাবে বাপ্‌রে
নেই বাবা এ রাতেরে বিশ্বাস।
মুড়ি দিয়ে মুখ গুঁজে, দুর্গার
নাম জপি একশত আটটি,
ঝুপ্‌ ঝুপ্‌ চারদিকে বৃষ্টি।

শ্বেত-চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

শিখের পুনরাবির্ভাব

মনগুপ্ত কবিরাজের ঘরে মাধব যখন তিন নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেলো সঞ্জীব তখন মনসুন কাফেতে বসে চা খাচ্ছে। বড় একটা এখানে সে আসে না। বিশেষ করে আজ সকালে রেস্তরাঁতে আরাম করে বসে চা খাবার মতো মানসিক অবস্থা তার নয়। কারণ গতকাল রাত্রেই রামেন মজুমদারের মৃতদেহ সে আবিষ্কার করেছিলো আর রমেন ছিলেন তার অনেক দিনকার পরিচিত। বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রামেন ছিলেন তার বন্ধুর মতো। কত দিন

বই-এর খোঁজে রমেনের দোকানে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নানা আলোচনায় কেটে গেছে। কারণ রমেন কেবলমাত্র বই-এর দোকানের মালিক ছিলেন না—লেখাপড়ায় ছিলো তাঁর অদ্ভুত নেশা। নানা বিষয়ের নানা খোঁজ তিনি রাখতেন। তাই গতকালকের দুর্ঘটনার টাটকা স্মৃতি সঞ্জীবের মন থেকে তখনো মুছে যায়নি।

আজ সকাল হতে-না-হতেই রমেনের বাড়ি যাবার জন্যে সে বেরুচ্ছিলো। এমন সময় মনসুন কাফের মালিকের সঙ্গে মুখোমুখী দেখা। গতকালের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যেই পাড়ার সবাই অতিমাত্রায় বিচলিত। আর সেই মৃতদেহ যে প্রথম আবিষ্কার করেছে সঞ্জীব সে-খবরও সবাই জানে। তাই সঞ্জীবকে দেখে মনসুন কাফের মালিক কিছুতেই ছাড়লো না। অনেক খবরই যে কাগজে ছাপা হয়নি এ-ধারণা তার বদ্ধমূল এবং অনেক গোপণীয় খবর যে সঞ্জীব আর তার বাবা জানে এ-বিষয়েও তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কারণ পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিতকে একাধিকবার তাদের বাড়িতে যাতায়াত করতে দেখা গেছে।

তাই মনসুন কাফের মালিক, পাড়ার সবাইকার ফকিরদা, সঞ্জীবকে কিছুতেই ছাড়লো না। বললো, "চলো দাদা, গরিবের দোকানে পদধূলি দিয়ে এক পেয়ালা চা খেয়ে নিয়ে গলা ভিজিয়ে কাজে যেও। কোনো ওজর আপত্তিই শুনবো না।"

সঞ্জীব কিছুতেই এড়িয়ে যেতে না পেরে এখানে এক পেয়ালা চা খেতে এসেছিলো। অনেক আগেই কোনো রকমে গরম চা সে গিলে ফেলেছে। কিন্তু পাড়ার কৌতূহলী বেকার ছোকরার দল তাকে ছাড়েনি। তাকে নানা প্রশ্নবাণে বিদ্ধস্ত করে ফেলেছে এবং তার মুখ-থেকে-বেরুনো প্রত্যেকটি অক্ষরই যেন গিলে খাচ্ছে।

বিশেষ কোনো কথাই সঞ্জীব বলবে না ভেবেছিলো। কিন্তু একবার বলতে আরম্ভ করার পর বুঝলো সে যতটা জানে অন্তত ততটা না শোনালে এদের হাত থেকে নিস্তার নেই। তাই নিস্তার পাবার জন্যে একেবারে প্রথম খুন থেকে স্বরু করে গতকালকের ঘটনার কথা আবার সে বললো। কোনো কথাই বাদ দিলো না। এমন কি জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র মৃত্যুর আগের দিন যে এক অজ্ঞাত-কুলশীল শিখ পরিতোষবাবুর কাছ থেকে চাবি নিয়ে গিয়ে-গিয়েছিলো এবং সেই শিখকে যে তারপর আর কেউ আবিষ্কার করতে পারেনি — সে-খবরও সঞ্জীব বাদ দিলো না।

"আমার মনে হয় ঐ শিখের সঙ্গেই এই হত্যাকাণ্ডের রহস্য খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। তাকে যদি কোনো রকমে একবার আবিষ্কার করা যায় তা হ'লে অনেক কিছুই জানা যাবে বলে মনে করি।" বলে সঞ্জীব তার বক্তৃতা শেষ করলো। আর শেষ করেই মনে হোলো সত্যিই তো—ঐ শিখকে নিয়ে কেউ মাথা ঘামাচ্ছে না কেন? পরিতোষবাবু তো স্পষ্টই বলেছিলেন জয়কৃষ্ণের মৃত্যুর আগের দিন অল্প সময়ের জন্যে ঐ শিখ এসে তাঁর কাছ থেকে আনন্দমোহনের বাড়ির চাবিটা নিয়ে গিয়েছিলো। অথচ আনন্দমোহন তো বিস্মিত হয়ে বলেছেন কোনো শিখকে তিনি তাঁর বাড়ির মেঝেয় পেটেণ্ট স্টোন বসাবার কোনো রকম কণ্ট্র্যাক্ট দেননি। ফলে সেই শিখই যে অল্প সময়ের জন্যে চাবি নিয়ে চোরা-কুঠরির ইলেকট্রিক বাল্বের জায়গায় বিষাক্ত বোমা রেখে গিয়েছিলো এমন সন্দেহ করলে কিছুই অন্যায় সন্দেহ করা হয় না। তারপর জয়কৃষ্ণের মৃত্যুর দিন যে লোকটি পরিতোষকে বলেছিলো জয়কৃষ্ণ এলে চাবিটা দিয়ে দিতে সে-লোক যে আনন্দমোহন নয় সে-কথা আনন্দমোহন তো নিজেই বলেছেন। সে তবে কে? আগের দিনের সেই শিখ নয় তো?"

সঞ্জীবের কথা সবাই বাস্তবিক গিলছিলো। মনসুন কাফতে ইতিপূর্বে বহুবার বহু উত্তেজিত আলোচনা হয়ে গেছে। কিন্তু আজকের সকালের মতো সত্যিকারের রোমাঞ্চকর আলোচনা কখনই হয়নি। তাই সঞ্জীব চুপ করতে আর সবাই-ও কোনো কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে রইলো। পাড়ার ফকিরদা

শুধু ভাবতে লাগলো আর এক পেয়ালা গরম চা সঞ্জীবকে দিলে আরো অনেক গরম খবর বেরিয়ে আসবে কিনা!

এমন সময় মেধো গলা খাঁকারি দিয়ে অস্বাভাবিক জোরে বলে উঠলো, "সঞ্জীবদা আমি একটা শিখকে দেখেছি!"

মেধো ওই এক ক্যাবলাকান্ত ছেলে! সকাল বেলায় খেলা দেখতে বেরিয়ে কোনো দিনও বিকেলের মধ্যে মাঠে সে ঢুকতে পারেনি। হরদম তার পকেট কাটা যাচ্ছে, দরকারী কাগজপত্র হারাচ্ছে, ভুল ট্রামে উঠে উল্টো দিকে চলেছে, বাসে উঠে দেখেছে পয়সা আনতে গেছে ভুলে। যতই কেন সবাই তাকে ঠাট্টা-তামাসা করুক কিছুতেই সে দমে না। সব কথায় বোকার মতো কথা বলা তার প্রধান বদ অভ্যেস। এতোক্ষণ সে যে কী করে চুপ করে ছিলো সেটাই একটা হেঁয়ালী।

সঞ্জীব তাকে ভালো করেই চিনতো। তাই মৃদু হেসে উঠে দাঁড়িয়ে বললো, "ভারি আশ্চর্য তো! পাঁচটা নয় দশটা নয়—ঠিক একটা শিখকেই দেখেছিস!"

সবাই উঠলো হেসে। সঞ্জীব তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাস্তায় এলো তারপর দ্রুত পা চালিয়ে ট্রাম রাস্তায় এসে বাসের জন্যে লাগলো অপেক্ষা করতে।

বাস এসে পড়লো। চলন্ত গাড়িতে সঞ্জীব উঠতে যাবে এমন সময় জামার পিছনে টান পড়ায় ফিরে দেখলো মেধো। বাঁ হাতটা মুখের মধ্যে পুরে অপ্রস্তুত-অপ্রস্তুত মুখ করে সে হাসছে।

হাড়-পিত্তি জ্বলে গেলো সঞ্জীবের। রুক্ষ স্বরে বললো, "কী ইয়ারকি হচ্ছে?"

ঘাবড়ে গিয়ে মোধো বললো, "দোহাই সঞ্জীবদা, রাগ করো না! ও রকম করে চেয়ো না। কাল আমি সত্যিকারের একজন শিখকে দেখেছি। সত্যি বলছি—দশটা নয়, পাঁচটা নয়—একটা শিখ।"

সঞ্জীব ভালো করেই জানে এই বোকা-হাবা ছেলেটার উপর রাগ করে কোনো লাভ নেই। তা ছাড়া বাসটাও চলে গেছে। পরেরটা আসতে কিছু দেরী হবে। তাই আর ধমক না দিয়ে বললো, "সে কথা তো বলেইছিস। আবার বলতে এলি কেনো?"

"না, মানে কাল সন্ধেবেলাতেই দেখেছি কিনা!"

"কাল সন্ধেবেলায়? কোথায়?"

"ঐ ছবিঘরের তলায় দাঁড়িয়েছিলুম। ভাবছিলুম বিষ্টি ধরে গেলেই বাড়ি যাবো। তা ছাড়া ফাস্ট কেলাস গান হচ্ছিলো কিনা আর আমি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুগনি খাচ্ছিলুম কিনা—"

"কী খাচ্ছিলি?"

"মিথ্যে বলবো না সঞ্জীবদা! একটা ডিমেসেদ্ধো আর আর দু পয়সার ঘুগনি খাচ্ছিলুম।"

"ডিম আর ঘুগনি খাচ্ছিলি আর চাঁদনি টকির তলায় দাঁড়িয়ে গান শুনছিলি—এই তো? যা, বাড়ি যা। আমার বাস এসে গেছে। আমি চললুম।"

"কিন্তু শিখটার কথা তো শুনলে না? এমন সময় সেই লম্বা মতো শিখটা বেরিয়ে এলো। তার লাল দাড়ি, তার মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি, তার গালে মস্ত বড় কাটা একটা দাগ। দেখলেই ভয় করে।"

"কোথা থেকে বেরিয়ে এলো?"

"কেন, যে-গলি থেকে খুন হয়েছে সেই গলি থেকে!"

"তাই নাকি?" দ্বিতীয় বাসটাও সঞ্জীব ছেড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো। "তারপর? লোকটা কোথায় গেলো?"

"তা কী জানি! লোকটা বেরিয়ে জোরে হেঁটে কোথায় মিলিয়ে গেলো। খানিক পরে তুমি গলির মধ্যে ঢুকলে। ঢুকেই তো বেরিয়ে এলে, তারপর ভোঁ দৌড় দিলে বাড়ির দিকে! আমি কি তোমাকে দেখিনি মনে করছো? আমি সব দেখেছি!" বলে অত্যন্ত মুরুব্বির মতো হাসতে গিয়ে হঠাৎ সঞ্জীবের চোখে তার চোখ পড়লো। পরক্ষণেই দারুণ ঘাবড়ে বললো, "দোহাই সঞ্জীবদা! অমন চোখ করে তাকিও না।"

"না, তাকাবো না। কিন্তু কথাটা তুই পুলিশকে বলিসনি কেন?"

পুলিশের নামে মেধো প্রায় কেঁদে ফেললো। "আমার কী হবে গো সঞ্জীবদা! দোহাই তোমার। কিচ্ছুটি বোলো না। পুলিশকে বললেই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসি দেবে।"

হেসে সঞ্জীব বললো, "এখন বাড়ি যা। আমি কাউকে বলবো না। তুইও এখন কাউকে যেন বলতে যাসনি।"

মেধোর মুখে আবার হাসি ফিরে এলো। জিব কেটে বললো, "ছিছি! কী যে বলো! আমি কি অতই বোকা?"

রমেন মজুমদারের জন্যে কাঁদবার কেউ নেই, সেই বুড়ি দিদিমা ছাড়া। বুড়ির আবার ভিমরতি হয়েছে। সব কথা ভালো বোঝে না। নিজের মনেই বকবক করে, নিজের মনেই থাকে চুপ করে। এই বুড়িই রমেনকে মানুষ করেছিলো। কাজের জন্যে রমেনকে থাকতে হোতো শ্যামবাজারে, তার বই-এর দোকানের উপরের ঘরে। কিন্তু বুড়ি তার পৈতৃক ভিটে ছেড়ে নড়তে রাজী হয়নি। ফলে রমেন শ্যামবাজারে একলাই থাকতেন। মাঝেমাঝে সময় পেলেই আসতেন দিদিমার খবর নিতে। বিশেষ করে শুক্রবার সন্ধেতে আসা তিনি ভুলতেন না। ঐদিন সন্ধের দিকে এক বুড়ো ভদ্রলোক এসে দোকানে বসতেন। কেনাবেচা দেখতেন। হিসেব লিখতেন। রমেন নিতেন ছুটি। ছুটি নিয়ে দিদিমার খোঁজ খবর করে যেতেন।

সেই বুড়ো ভদ্রলোকের নাম তিনকড়ি। সঞ্জীব যখন দোকানে পৌছলো তিনকড়িবাবু মুখ শুকনো করে তখন দোকানে রয়েছেন। গতকাল অনেক রাত পর্যন্ত তিনি যে ঘুমোতে পারেননি মুখেচোখে তার স্পষ্ট চিহ্ন।

সঞ্জীবকে তিনি চিনতেন। তাকে দেখে খানিকটা যেন আশ্বস্ত হলেন।

"কী কাণ্ড সঞ্জীব! আমি তো এখনো বিশ্বাস করতেই পারছি না রমেন খুন হয়েছে!"

সঞ্জীব কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে একটা চেয়ার টেনে বসলো।

"কাল রাতে আপনার ঘুম হয়নি—দেখেই মনে হচ্ছে।" খানিক বাদে, কিছু একটা বলতে হয় বলেই যেন সঞ্জীব বললো।

"ঘুম কি আর হয়? তিরিশ বছনের চেনা লোক—হঠাৎ খুন হয়ে গেলো! রাত দশটাতেও যখন সে ফিরলো না তখনই কেমন যেন মনে হচ্ছিলো। কী মনে হচ্ছিলো জানি না, তবে একটা কিছু দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে কেমন অদ্ভুত একটা ভয়ে ভেতরে-ভেতরে কাঁপছিলুম। আর তারপরেই এলেন পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিতবাবু। রমেন সম্বন্ধে যা জানি খুঁটিয়ে-খুটিয়ে বললুম। সব কথা তিনি লিখে নিলেন। আবার হয়তো আসবেন। তাই সকাল থেকে বসে আছে। আর ভাবছি অমন মানুষটারো শত্রু থাকে যে তার বুকে বিনা দ্বিধায় বসাতে পারে ছোরা! এমন ঘটনাও দেখতে হোলো?" একটু চুপ করে থেকে মাথা নাড়িয়ে নিজের মনেই তিনকড়িবাবু আবার সুরু করলেন, "পুলিশে যাই মনে করুক, আমার কিন্তু বিশ্বাস এ কোনো শত্রু-টত্রুর কাজ নয়। কোনো গুণ্ডার কীর্তি। পকেটে তার প্রায় সত্তর টাকা ছিলো। তার লোভেই খুন করেছে।"

"কিন্তু জানলো কী করে?"

"টাকার কথা? জেনেছে কোনো রকমে। বই-এর দোকানের মালিক, ফেরবার সময় কিছু টাকা তো সঙ্গেই থাকে। সে-খবর জানা কিংবা অনুমান করা কি খুব শক্ত ব্যাপার?"

"মানলুম শক্ত নয়। কিন্তু টাকা কটা না নিয়ে গেলো কেনো?"

"সে-খবরও গতকাল রাতে রঞ্জিতবাবুর কাছে শুনেছি: রমেনের পকেটে নোটের তাড়া যেমন ছিলো ঠিক তেমনিই পাওয়া গেছে। কিন্তু এটার জবাবও সহজ। হয়তো কারুর পায়ের আওয়াজ পেয়ে, হয়তো তোমারই পায়ের শব্দ পেয়ে গুণ্ডাটা পালিয়েছে—তুমিই যে খুন হবার পরে গলিতে প্রথম ঢুকেছিলে সে-খবরও রঞ্জিতবাবুর কাছে পেয়েছি।"

"এটাও মানলুম। কিন্তু ওই শাদা চাক্তি আর তার ওপর লাল কালিতে 'ছুই' লেখা—এটার কারণ কী?"

তিনকড়িবাবু একটু নড়েচড়ে বসে বললেন, "ঠিক ওই খানটাতেই খটকা লাগছে। এর মানে কী?"

"আমারও কিন্তু এক ব্যাপারে খটকা লাগছে—এটা কোনো গুণ্ডার কীর্তি কিংবা শত্রুর কাণ্ড তা নিয়ে নয়—কারণ আমার দৃঢ় বিশ্বাস কোনো শত্রুরই এটা কাণ্ড। তবে আমার খটকা লাগছে রমেনবাবুর এমন শত্রু কে থাকতে পারে? এমন কোনো লোকের কোনো রকম আভাস ইঙ্গিত রমেনবাবুর কাছ থেকে আপনি আগে কখনো পেয়েছিলেন কি?"

মাথা নেড়ে তিনকড়িবাবু জানালেন না।

একটু চুপ করে থেকে সঞ্জীব প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা তিনকড়িবাবু! জয়কৃষ্ণ সামন্তর কথা কখনো রমেনবাবুর মুখে শুনেছিলেন?"

"কাল রাত থেকেই সে-কথা ভাবছি। রঞ্জিতবাবুও ঠিক ঐ প্রশ্ন করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই তো মনে করতে পারলুম না! তা ছাড়া জয়কৃষ্ণের সঙ্গে রমেনের কোনো রকম সম্পর্ক যে থাকতে পারে সে-কথাও একেবারে বিশ্বাস হতে চায় না।"

সঞ্জীব আরো খানিক চুপ করে রইলো তারপর প্রশ্ন করলো, "এমন কোনো লোকের কথা মনে হয় কি রমেনবাবু যার নাম করতেন, যার সঙ্গে জয়কৃষ্ণ সামন্তর পরিচয় থাকা সম্ভব?"

তিনকড়িবাবু অনেকক্ষণ ভাবলেন। কিন্তু কোনো হদিসই করতে পারলেন না। শেষে বললেন, "নাঃ সঞ্জীব, বয়েস হয়েছে। সব কথা ঠিক মনেও পড়ে না। কিন্তু একজন লোকের নাম করতে পারি যাঁর কাছে রমেনবাবু পড়েছেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক—প্রায় সত্তর বছর বয়েস হবে, শ্রীরামপুরে থাকেন। আশ্চর্য তাঁর স্মরণশক্তি। এই বয়েসেও পরিষ্কার তিনি বলে দিতে পারেন পঞ্চাশ বছর আগেকার অতি তুচ্ছ সব ঘটনার কথা। রমেনবাবুর কাছে তাঁর মাস্টারমশাই-এর অনেক গল্প শুনেছি। তাঁর কাছে গেলে হয়তো হদিস হতে পারে। অঘোরবাবু নাম।"

ঠিকানা সংগ্রহ করে শ্রীরামপুরে অঘোরবাবুর বাড়িতে যখন সঞ্জীব পৌছল বেলা তখন একটা। স্নান হয়নি। একটা মিষ্টির দোকানে দাঁড়িয়ে যৎসামান্য আহার করে নিলো। আর যতই ভাবতে লাগলো সমস্ত ঘটনার কথা ততই একটা চাপা অস্বস্তিতে সমস্ত শরীর যেন ব্যথা করতে লাগলো।

[ক্রমশ]

আমার বন্ধু ইঁদুর

রবার্ট ফন্‌টেন

একটি ইঁদুরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়েছে। এর আগে কোনো ইঁদুরকেই আমি চিনতুম না। এই নতুন বন্ধুত্ব থেকে ভালোবাসার আর একনিষ্ঠতার শিক্ষা আমি পেয়েছি।

মাঝেমাঝে আমি রুটির টুকরো বালিসের তলায় রেখে রূপকথার গল্প পড়ি। রুটি চিবোই আর পড়ি। এ রকম করা বারণ। তবু জানতুম মা যেন আশাই করেন এ রকম খেতে-খেতে আমি পড়বোই। তাই, একবার বারণ করা দরকার মনে করেই, তিনি বারণ করে থাকেন। আর আমিও বারণ মানি না। অল্প দিনের মধ্যেই আবিষ্কার করলুম আমি যখন ঘুমোই ইঁদুরটা এসে আমার রুটির টুকরোয় কামড় বসায়। একদিন সকালে হাতে-হাতে ধরে ফেললুম। কী ভাগ্যি তখনো মা আমাকে শেখাননি ইঁদুরকে ভয় করতে। আমার খুব ইচ্ছে হোলো কাছে রেখে তাকে পোষ মানিয়েনি। ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে ডাকতে লাগলুম আর বললুম ইঁদুরটাকে কেউ যেন দেখতে না পায় আর তাকে ধরবার জন্যে কেউ যেন কোনো কল না পাতে!

• এক রাতে কিন্তু বাবা আমার ঘরে ঢুকে ইঁদুরটাকে দেখে ফেললেন।

"আরে", একটি ধূসর রেখা ঘরের অন্য পাশে অদৃশ্য হতে দেখে বাবা বললেন, "ওটা কীরে?"

"কোনটা বাবা?" অত্যন্ত সরলভাবে আমি প্রশ্ন করলুম।

"ওই যে, এক্ষুনি যেটা দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেলো?"

"আমি তো কিছু দেখতে পাইনি! বাবা, তুমি কিন্তু বলেছিলে আমার স্কেট করার জুতোগুলো ঠিক করে দেবে।"

ভুরু কুঁচকে বাবা বিছানায় বসলেন। পরক্ষণেই কিন্তু হঠাৎ উঠলেন দাঁড়িয়ে। তাঁর চাউনিটা মোটেই ভালো লাগলো না। সেই মুহূর্তে আমি বুঝতে পারলুম তিনি আর সেই দয়ালু আর ভালোমানুষটি নন—যিনি সংগীতের কথাই শুধু ভাবেন। এই মুহূর্তে তিনি এক নির্দয় শিকারীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। ইঁদুরটার পালাবার পথ তিনি পেয়েছেন দেখতে। কোণের কাছের সেই ছোট্ট গর্তটা।

"ওঃ হো," রুক্ষ স্বরে তিনি প্রায় চীৎকার করে উঠলেন।

"কী হোলো বাবা?" আমি প্রশ্ন করলুম।

"আঃ হা", বাবা শুধু বললেন। তারপর নীচু হয়ে বসে ইঁদুরটার ঘরের ভিতর করতে লাগলেন পরীক্ষা।

ভগবানকে ডেকে আমি বলতে লাগলুম বাবা যেন কিছুতেই ইঁদুরটাকে মেরে ফেলতে না পারেন। ইতিমধ্যেই আমি অনেক দূর বাইবেল পড়ে ফেলেছি—যতগুলি শ্লোক মুখস্ত করার কথা তার দ্বিগুণ আমার মুখস্ত হয়েছে। বাবাকে আমি ভালোবাসি, ভক্তি করি। কিন্তু হে ভগবান, তুমিও জানো আমিও জানি, ইঁদুরটা আমার বন্ধু।

এই প্রথম ঈশ্বরকে আমি আদেশ দিলুম আর সম্ভবত খুব বিনীত আর নম্র ভাবে এই আদেশ আমি দিইনি।

বাবাকে কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখার জন্যে আমি প্রশ্ন

করলুম, "বাবা, বল তো ইস্কুলে আজ কী শিখেছি?" অত্যন্ত আগ্রহভাবেই করলুম প্রশ্ন।

আমার দিকে না চেয়েই বাবা উত্তর দিলেন, "খুবই কম যে শিখেছিস তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই সামান্য জ্ঞান ভালোর চেয়ে মন্দই করছে বেশি।"

আর কী বলা যায় ভাবতে আমি দারুণ চেষ্টা করছি অকস্মাৎ বাবা লাফিয়ে উঠলেন। নাকের উপর তাঁর হাত।

ইঁদুরটা নিশ্চয়ই বাবার নাক খামচে দিয়েছে। কষ্ট করেও কিন্তু হাসি চাপতে পারলুম না। "তোমার বাড়িতে নাক ঢোকাতে এল তুমিও কিন্তু রাগ করতে, বাবা!" আমি বললুম।

নাকে হাত বোলাতে-বোলাতে বাবা বিছানায় আবার ফিরে এলেন। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে যেন গোলমেলে মনে হোলো। আমার স্কেট করার বুট জোড়াটা তিনি সারাতে লাগলেন আর আমিও হাঁফ ছেড়ে খুসি হয়ে ভাবলুম, যাক—বাবা তাঁর শিকার-করা খেলাটা ছেড়েছেন।

বাবা হয়তো সত্যিই ছেড়েছিলেন, ইঁদুরটা কিন্তু বাবাকে ছাড়লো না। বোকা ইঁদুর কোথাকার!

যেই না বাবা আরাম করে বিছানায় বসেছেন ইঁদুরটা তক্ষুনি বুক ফুলিয়ে এলো বেরিয়ে। শুধু বেরিয়েই এলো না, দু' পায়ে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে বাবাকে করতে লাগলো পরীক্ষা। সে যেন বলতে চায়, "ওহে শোনো, তোমার নাকটা জখম করতে আমি চাইনি। হঠাৎ লেগে গেছে। ওই ছেলে আর আমি হচ্ছি বন্ধু। পৃথিবীতে সত্যিকারের বন্ধু খুঁজে পাওয়া নেহাৎ সহজ ব্যাপার নয়। ছোটো ছেলের পক্ষে তো খুবই কঠিন। আর ইঁদুরের পক্ষে তো প্রায় অসম্ভব। এ ব্যাপারটার আলোচনা তোমাতে-আমাতে কি করতে পারি না?"

কিন্তু হায়, আমার বাবা কত সুন্দর জিনিসই তো বুঝতে পারেন, কিন্তু ইঁদুরের কথাটা তিনি বুঝতে পারলেন না! তিনি দেখলেন শুধু একটা জানোয়ারকে, আর চাইলেন তাকে হত্যা করতে। ইঁদুরটা নিশ্চয়ই মানুষের মনের অনেক খবর রাখে, তাই তাক বুঝে অদৃশ্য হতে দেরি করলো না।

পরের দিন হোলো কল পাতা। সেই কলে খানিকটা পনির লাগানো। ইঁদুরের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করে আমি কিন্তু পনিরটা চুরি করলুম। চুরি করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী!

পরের দিন ইঁদুরও নেই পনিরও নেই দেখে বাবা তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "আমাদের এখানকার ইঁদুরটা তো ভারি আশ্চর্য! পনিরটা সে ঠিক এমনভাবে খেয়ে যায় যাতে কলটা তার পিঠে পড়ে না!"

চোখ দুটো ঘুরিয়ে ইস্কুলে-দেখা দেবদূতের ছবির মতো মুখের চেহারাটা করতে চেষ্টা করলুম।

"খুব একটা চালাক ইঁদুর কিন্তু এ-ধরণের কাণ্ড করতে পারে।"

আমার চোখের দিকে চেয়ে বাবা বললেন, "কিছুতেই এটা সম্ভব নয়।" তারপর আরো দৃঢ় স্বরে বললেন, "কিন্তু এটাই খুব সম্ভব যে ছোট্ট একটি ছেলে, যার মাথায় এক ফোঁটাও বুদ্ধি নেই, ফাঁদ থেকে সেই পনিরটা সরিয়ে নিচ্ছে।"

"কে সেই ছোটো ছেলে বাবা?" আমি প্রশ্ন করলুম।

উত্তরে বাবা জানালেন, "আয়নার মধ্যে চাইলেই তাকে দেখতে পাবি।"

তারপর তিনি আদেশ দিলেন আমি যেন সেই পনির না ছুঁই। অতিশয় মারাত্মক সেই আদেশ। আমাকে তা মানতেই হোলো।

আর একবার ইঁদুরটির জন্যে আমি প্রার্থনা করতে বসলুম, "হে ভগবান, ইঁদুরকে একবার আমি বাঁচিয়েছি। আমি যা পারি তুমিও নিশ্চয় তা পারো। যদি কোনো উপায় না থাকে ইঁদুরের মন থেকে পনিরের লোভ তুমি মুছে দাও। লোভ দেখিয়ে তাকে টেনে নিয়ে এসো না; ওই ভয়ঙ্কর ফাঁদ থেকে মুক্তি দাও তাকে।"

তবু কিন্তু আমার বিশ্বস্ত বন্ধুর মৃত্যুর জন্যে দুরুদুরু বুকে লাগলুম অপেক্ষা করতে।

মা'র কাছে কথাটা আমি পাড়লুম, "আচ্ছা মা, যদি তোমার এমন কোনো বন্ধু থাকে যার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না—তা হলে, অন্যে যখন সেই বন্ধুর ক্ষতি করতে চায়, তুমি কি সেই বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়াও না?"

বাবার মোজার একটা বিরাট ফুটোকে মা সেলাই করে সারছিলেন। আমার প্রশ্ন শুনে বললেন, "নিশ্চয়ই।"

বিজয়ীর স্বরে আমি চেঁচিয়ে উঠলুম, "তা হলে ইঁদুরটাকে আমরা কেন ধরতে যাচ্ছি?"

চোখ দুটো বড়বড় করে মা তক্ষুণি দাঁড়িয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন, "ইঁদুর?" তারপর খুব ভয়-পাওয়া স্বরে আবার বললেন, "কোন ইঁদুর? কোথায় ইঁদুর?"

পেয়ালায় দুয়েক চুমুক দিয়ে বাবা খবরের কাগজটা রাখলেন নামিয়ে। খুব বিজ্ঞের মতো মুখ করে ঘরের কোণ থেকে আমার দিকে তিনি তাকালেন। তখনি বুঝলুম আমার চালে মারাত্মক একটা ভুল হয়েছে: ইঁদুরকে মা দারুণ ভয় করেন!

খুব শান্ত গলায় বাবা জানালেন, "খোকার ঘরে একটা ইঁদুর আছে। ওরা দুজনে আবার বন্ধু। অন্তত খোকা তাই বলে। ইঁদুরটা অবশ্য কিছুই বলেনি।"

"শিগগীর ফাঁদ পাতো," আর্তনাদ করে চললেন মা, "শিগগীর ফাঁদ পাতো।"

বাবা শান্ত গলায় বুঝিয়ে বললেন, "কল তো পাতা হয়েছিলো। ইঁদুরটা কিন্তু এমন ভাবে পনির খেয়ে পালালো যে স্প্রিংটা লাফিয়ে পড়লো না!"

"অসম্ভব, হতেই পারে না!" বললেন মা তারপর আমার দিকে চেয়ে শাসালেন, "খবরদার। আর পনিরে হাত দিবি না; বুঝেছিস?"

হতাশ স্বরে আমাকে বলতেই হোলো, "আমি আর কখনো পনির সরাবো না। কিন্তু কেবলমাত্র কাপুরুষই চুপ করে থাকতে পারে তার সবচেয়ে নিকট বন্ধুকে যখন জঘন্য ভাবে হত্যা করা হচ্ছে।"

একটু ঘাবড়ে গিয়ে বাবা বললেন, "শুনছো ওর কথা!"

আমি বললুম, "মা নিজেই তো বলেছেন এ-ধরণের কাজ কখনো করতে নেই।"

মা বললেন, "ইঁদুরের কথা কিন্তু আলাদা।"

উত্তরে বললুম, "যে-ই হোক সে আমার বন্ধু। তার সঙ্গে লড়তে হলে ভালো করে লড়াই করাই উচিত—ফাঁদ পেতে নয়।"

বাবা বলে উঠলেন, "কী সব অদ্ভুত কথা! আমি কি নিজে একটা ল্যাজ বানিয়ে হামাগুড়ি মেরে দাঁত দিয়ে ইঁদুরটাকে কামড়ে ধরবো?"

উপরের ঘরে গিয়ে অন্যায় রকম বড় আর অদ্ভুত রকম সুন্দর পনিরের এক টুকরো গেঁথে বাবা ফাঁদ পাতলেন।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়লুম। বুঝলুম আর উপায় নেই। ভগবান ছাড়া ইঁদুরটিকে আর কেউই বাঁচাতে পারবে না।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি পনিরটা তখনো রয়েছে। বিছানা থেকে লাফিয়ে নেমে, নতজানু হয়ে বসে, ঈশ্বরকে বললুম, "তোমার কী আশ্চর্য দয়া, প্রভু!" তারপর কাপড় জামা বদলে গুনগুন করতে-করতে খুসি মনে খেতে এলুম নেমে। ওটমিল খাওয়া হোলো আর আমার খাওয়া শেষ হতে-না-হতেই উপর থেকে শোনা গেলো নানা খসখস শব্দ।

বাবা প্রশ্ন করলেন, "ইঁদুরটা নাকি?"

দম বন্ধ করে আর একবার করলুম প্রার্থণা। মা টোস্ট বানানো নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। কিছু বললেন না। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার শোনা গেলো সেই খসখস শব্দ। এবার যেন মনে হোলো শব্দটা বেজায় কাছে।

বিস্মিত হয়ে বাবা প্রশ্ন করলেন, "ইঁদুরটা কি নীচে আসার পথও চেনে?"

কোনো উত্তর দিলুম না। ব্যস্তভাবে টোস্টের উপর জ্যাম লাগাতে লাগলুম। ঠিক বুঝলুম না বাবা কী করতে চান। সম্ভবত ইঁদুরের হাত থেকে মাকে বাঁচানোই ছিলো

তাঁর উদ্দেশ্য! কিন্তু কিছুতেই তখন কিছু এসে যায় না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই ইঁদুরটা গড়িয়ে এসে পড়লো আমার পায়ের কাছে। সে মরে গেছে। তার চোখ দুটো দিয়ে আমাকে কিছু না বলে সে মরতে পারেনি।

দৌড়ে উপরে গেলেন বাবা। তারপর উত্তেজিত হয়ে ফিরে এসে বললেন, "কী আশ্চর্য! কলের মধ্যে পনিরটা নেই। পনিরটায় কামড় দেবার পরেই স্প্রিংটা এসে ইঁদুরের চোয়ালে লাগে। ভাবো একবার, ইঁদুরটা চোয়ালে ধাক্কা খেয়ে মরেছে!"

বাবার কাছে ব্যাপারটা যে-রকম আশ্চর্য মনে হোলো আমার মনে তা কোনো রকম রেখাপাত করলো না। আমি তো জানতুমই ইঁদুরটার সাহসের অভাব ছিলো না। কিন্তু নিজের সম্বন্ধেই সব খবর আমি জানতুম না। সে যেন তার চোখ দিয়ে আমাকে বললো:

"শোনো, আমি তোমার বন্ধু ছিলুম আর তুমিই মারলে আমাকে। কিন্তু এইখানেই দেখো মজা—আমি এখনো তোমার বন্ধুই রয়েছি! দেখো, মরতে এসেছি তোমার পায়ের তলায় আর সেই সঙ্গে এসেছি তোমাকে ক্ষমা করতে। যাদের কাছে ভালো ব্যবহার পাওয়া যায় তাদের ভালোবাসা কী সহজ। যারা শত্রুতা করে তাদেরও ভালোবাসা উচিত—কী কঠিন অথচ কত দরকার!"

হয়তো এ-ধরণের কোনো কথাই ইঁদুরটার মনে ছিলো না। হয়তো এ-সব আমারই মনের কথা—কথাগুলি বলছি আর শিখছি আর বড় হয়ে উঠছি।

শান্ত স্বরে প্রশ্ন করলুম, "বাবা, ইঁদুরদের জন্যে কি কোনো স্বর্গ আছে?"

বাবার স্বরে কোনো ফুর্তি নেই। তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, সবাইকার জন্যেই স্বর্গ আছে।"

এই করুণ ঘটনার মধ্যে ফ্যাকাশে শাদা মুখ নিয়ে নির্বাক হয়ে মা দাঁড়িয়ে ছিলেন। এইবার ভয়-ভয় স্বরে বললেন, "এরপর একটা বড় বেড়াল পোষা যাক। তা হলে এ-ধরণের কাণ্ড আমাদের আর করতে হবে না।"

গত ২১শে নভেম্বর, বুধবার, কলকতায় ছাত্রদের উপর পুলিশের যে অত্যাচার চলেছিলো তার তীব্র প্রতিবাদ ভারতবর্ষের এবং পৃথিবীর নানা দূর দেশ থেকে এসেছে। পুলিশের গুলি চালানোর ফলে রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, অব্দুল সালাম, রামকুমার, অনিমেষ চৌধুরী এবং আরো ৩২ জনের মৃত্যু হয়: এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের তীব্র প্রতিবাদ আমরা জানাচ্ছি। ভারতবর্ষ এই তরুণ বীরদের কোনোদিন ভুলবে না। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই তরুণদের নির্ভিক মন, দৃঢ়তা, স্বদেশপ্রেম এবং বীরত্বের স্মৃতি কোনো দিন ম্লান হবে না।

* * * *

গত ১লা ডিসেম্বর, শনিবার, মহাত্মা গান্ধী বাংলাদেশে এসে পৌঁছন। কলকাতার কাছে সোদপুরের আশ্রমে তাঁর থাকবার ব্যবস্থা করা হয়। রাতারাতি সোদপুর যেন তীর্থ-স্থানে পরিণত হয়ে গেলো। লক্ষ-লক্ষ লোক চললো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে দেখতে, তাঁর বৈকালিক প্রার্থণায় যোগ

দিতে। দুর্ভিক্ষ-মহামারী-বন্যা-বিধ্বস্ত বাংলাদেশ এই মহামানবের স্পর্শ পেয়ে যেন নতুন করে জেগে উঠলো: নতুন আশায় হোলো স্পন্দিত, নতুন প্রেরণায় হোলো রোমাঞ্চিত।

* * * *

গত ৯ই ডিসেম্বর, শনিবার, কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কে অই. এন্. এ. সপ্তাহ আরম্ভ হওয়া উপলক্ষ্যে একটি সভা হয়। সভায় অন্তত চার লক্ষ লোক জমা হয়েছিলো। না দেখলে বিশ্বাস হয় না কত মানুষ সেদিন আমাদের দেশের নেতাদের দেখতে এবং তাঁদের বক্তৃতা শুনতে জড় হয়েছিলো। ভারতবর্ষের কোনো সভায় এতো জনসমাগম ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। সমস্ত কলকাতা তার মানুষের ভারকে যেন উজাড় করে ঢেলে দিয়েছিলো দেশপ্রিয় পার্কের উপর। শুধু কলকাতা নয়, কলকাতার কাছাকাছি জায়গা থেকেও এসেছিলো অসংখ্য মানুষ। মানুষের ভিড়ের কাছে বিরাট দেশপ্রিয় পার্ককে হাস্যকর রকম ছোটো বলে মনে হচ্ছিলো। সমস্ত পার্কে তো তিল ধরবার জায়গা ছিলোই না, এমন কি কাছেপিঠের সমস্ত রাস্তা, আশেপাশের সমস্ত বাড়ির ছাত, গাছের ডাল, ল্যাম্প-পোস্টের চূড়ো, বাড়ির কার্নিস, দোকানের সাইনবোর্ডের উপরকার ফাঁকা জায়গা—প্রত্যেক সম্ভব-অসম্ভব জায়গাতেই দেখা যাচ্ছিলো শুধু মানুষ আর মানুষ। সকাল থেকেই মানুষের সারি দেখা যেতে লাগলো। দূর গ্রামের চাষীরা পর্যন্ত এসেছিলো চালচিঁড়ে বেঁধে। দুপুর একটা থেকেই খানিকটা আন্দাজ করা গেলো সন্ধের সভায় জনসমাগমের পরিমাণের কথা। সেদিন কলকাতায় অন্য কোনো দিক ছিলো না দেশপ্রিয় পার্কের দিক ছাড়া। সত্যিকারের মানুষের স্রোত যাকে বলে। জনতা ফেঁপে উঠেছিলো সমুদ্রের মতো। আর সেই সমুদ্রে যে জোয়ার এসেছে—এমন দুর্বার শক্তিতে, এমন প্রচণ্ড গতিতে—সে-কথা বুঝতে কিছুমাত্র দেরী কারুর হয়নি। দেশের নাম, নেতাদের নাম সত্যিকারের মন্ত্রের মতো সবাইকার বুকে জাগিয়াছে স্পন্দন। এমন আশ্চর্য কাণ্ড ইতিপূর্বে কলকাতায় কখনো ঘটেনি।

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

এই বিভাগটি যে তোমাদের খুব ভালো লাগছে অনেকেই সে-কথা জানিয়েছো। তোমাদের মনের মতন হতেই রংমশাল চায়। তাই তোমাদের চিঠিপত্রে সে-খবর পেয়ে আমাদের খুব ভালো লাগলো।

একটি ব্যাপার আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগে। সেটি হচ্ছে ইংরিজিতে চিঠি লেখা। তোমাদের অনেকের কাছ থেকেই আমরা ইংরিজিতে চিঠি পাই। ভেবে দেখো আমাদের কাছে ইংরিজিতে চিঠি লেখার কি কোনো মানে হয়? বিলেতের কোনো ইংরিজি পত্রিকাতে কোনো ইংরেজ কে ইংরিজি ছাড়া অন্য কোনো ভাষায় চিঠি লেখে? কখনই না। বাংলা পত্রিকার সম্পাদকের কাছে গ্রাহক-গ্রাহিকারা নিশ্চয়ই বাংলাতে চিঠি লিখবে। ইংরিজির কথা মনেও আনবে না। আজকের দিনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা কোটি-কোটি ভারতবাসীর মনে স্পন্দিত হচ্ছে। এই স্বাধীনতা সবদিক দিয়ে আসা দরকার। তোমরা দেশকে যে-রকম ভালোবাসো মাতৃভাষাকে তার চেয়ে কম কখনো ভালোবেসো না। ইংরিজি ভাষা কিংবা সাহিত্য যে খারাপ সে-রকম কোনো কথা বলছি না। কিন্তু তার উপযুক্ত ক্ষেত্র আছে। কিছুদিন আগে গান্ধীজী সোদপুরে তাঁর প্রাত্যহিক বৈকালিক প্রার্থনার সময় যা বলেছেন তা উদ্ধৃত করলুম:

"ইংরিজির মতো কোনো বিদেশী ভাষা শেখা ভালো। কিন্তু ভারতবাসীরা তাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনায় কিংবা চিঠিপত্র লেখার সময় যখন ইংরিজি ভাষা ব্যবহার করে তখন তারা যে কতটা ক্ষতি করেছে সে-কথা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনা। যে-কোনো ভাষাতেই কোনো বিখ্যাত বই প্রকাশিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই তার ইংরিজি অনুবাদ বেরিয়ে যায়। ফলে পৃথিবীর সর্বত্র ইংরিজি-জানা লোকেরা সে-বই পড়তে পায়। এতে একদিকে ইংরিজি ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হয় অন্যদিকে তেমনি ইংরিজি পাঠকমহলও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায়। ভারতবাসীরাই বা কেন ঠিক এই ধরণের সুযোগ পাবে না? ভারতীয় ভাষাগুলিই বা কেন এইভাবে সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে না? ভারতবাসীরা যদি ইংরিজি ভাষার সহায়তা না নিয়ে নিজেদের কাজ চালাতে পারে তাহলে অন্তত দাসত্বের একটি শৃঙ্খল থেকে তারা মুক্তি পাবে।"

আশাকরি ভবিষ্যতে তোমরা আর কখনো ইংরিজিতে চিঠি লিখবে না এবং নিজেদের কথাবার্তার মধ্যে যথাসম্ভব কম ইংরিজি শব্দ ব্যবহার করবে।

এইবার তোমাদের চিঠিপত্রের জবাব দিতে সুরু করি:

'মধ্যমণি', সহবতপুর (২৪৯৭)—তোমাদের পাঠানো 'বীর' নামে কবিতাটি ছাপা গেলো না। ছন্দের অনেক গোলমাল আছে, তা ছাড়া ভাষাও সব জায়গায় ঠিক হয়নি। কবিতায় যা বলতে চেয়েছো তা একেবারেই বলা হয়নি। লেখা পাঠাবার সময় লেখকের নাম থাকা দরকার। কোনো প্রতিষ্ঠানের নামে রচনা ছাপা সম্ভব নয়। **উষা বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৫৭০)—তোমার ভাষা ভালো কিন্তু গল্পটি জমেনি। **গৌরাঙ্গ কুণ্ডু** (২৫৭৩)—তোমার চিঠির মধ্যে 'প্রণামপূর্বক নিবেদন,' এবং 'আপনারাই বিশ্বস্ত' কথাগুলি পড়ে ভালো লাগলো না। আমাদের প্রণাম করার কোনো প্রয়োজন নেই। তোমার চিঠির ধাঁচটা অনেকটা দরখাস্ত লেখার মতো হয়েছে। যেমন করে বন্ধুদের চিঠি লেখো সেইরকম সহজ ও অনাড়ষ্টভাবে লিখতে চেষ্টা কোরো। 'দাদু' সম্বোধনও ভালো লাগলো না। তুমি লিখেছো যেন আশীর্বাদ করি পরীক্ষায় তুমি তৃতীয় স্থান অধিকার কর। তৃতীয় কেন? প্রথম নয় কেন? তোমার কবিতাগুলি ফেরৎ পাঠালুম। রংমশালের জন্যে কী ধরণের রচনা চাই রংমশাল ভালো করে পড়লেই বুঝতে পারবে। **সৈয়দ নুরল আলম** (২০৬৬)—ঈদের সাদর-সম্ভাষণ পেয়ে খুব খুসি হলুম। তোমার পাঠানো গল্পটি কোন ইংরিজি গল্প অবলম্বনে লেখা জানিও। **আশিস দত্ত** (১৫৬৯)—তোমার কবিতার ধাঁধাগুলি ছাপছি। বেশ হয়েছে। **বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** (৬৯)—তোমার কবিতাটি ছাপা গেলো না। অন্য বিষয়বস্তু নিয়ে চেষ্টা কোরো। কিন্তু তার আগে পরীক্ষা পাশ করা দরকার। **কাশীনাথ পালিত** (২৫৫০)—স্থানাভাবের জন্যে নামের সঙ্গে জায়গার নাম ছাপা হয় না। ভবিষ্যতে ছাপাবার ইচ্ছে রইলো। তুমি যে-দুটি প্রশ্ন করেছো তার প্রথমটি কি তোমার নিজের? মনে হচ্ছে তুমি এর উত্তর জানো। দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে একজনের নামই সবচেয়ে আগে মনে আসে। তুমিও জানো। **পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক** (২৪১)—তোমার কবিতায় কয়েক জায়গায় ছন্দ-পতন হয়েছে। বিষয়বস্তুটিও অতি পরিচিত। সেজন্যে ছাপা গেলো না। **পীযুষকান্তি ঘোষ** (২১৬০)—'ছাতুবাবুর ছাতা' আবার পাঠানো হয়েছে। এবার ঠিকমতো পাবে আশাকরি। **অহিভূষণ চৌধুরী** (২৪১৭)—তোমার হাতের লেখা দেখে খুব খুসি হলুম। তুমি যে-সব কথা লিখেছো সেগুলির কতকাংশে ইতিপূর্বেই করা হয়েছে। তোমার চিঠি পাবার অনেক আগেই রংমশাল ভি. পি. করা হয়েছে। **চিনু চৌধুরী** (১৯৭৭)—তোমার লেখাটি ছাপা গেলো না। তুমি যে-বইগুলির কথা লিখেছো সেগুলি পাঠাবার জন্যে 'বিশ্বভারতী'কে লিখো। **মনোরঞ্জন রায়** (৯২)—

তোমার পাঠানো দুটি কবিতার মধ্যে প্রথমটিই ভালো হয়েছে। সেটিই ছাপলুম। **জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার** (১৯৪০)—তোমার চিঠি ও লেখা পড়ে তুমি যে কতদূর বিচলিত হয়েছো বুঝতে পারছি। এখনো তোমার মনে তোলপাড় চলেছে এবং পৃথিবীর অভিজ্ঞতাও কম। তাই রচনাগুলি দুর্বল হয়েছে। এ-ধরণের সার্থক রচনার জন্যে প্রথম দরকার শান্ত হওয়া। আশাকরি তোমার এই কিশোর মনের স্রোত অন্যদিকে বইবে না। ভবিষ্যতে তোমার কাছ থেকে ভালো লেখা আশাকরি। **অরবিন্দ সোম** (২৫৪৫)—তোমার প্রবন্ধটিতে তেমন কোনো নতুন খবর নেই। যারা খবরের কাগজ পড়ে তারাই এ-বিষয়ে আরো অনেক বেশি জানে। সেজন্যে ছাপা গেলো না। **ধনঞ্জয় নস্কর** (২৫৯২)—তোমার নতুন গ্রাহক নম্বর মনে রেখো। আগে চিঠি লিখে জানানো উচিত ছিলো। ভুল করে সত্যেনের কাছে পত্রিকা যাচ্ছিলো। **বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায়** (২৩৯৩)—ছবি সম্বন্ধে ঠিকই ধরেছো। ঐ বইতেই এই ছবি ছাপা হবে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে ভালো রচনা যে-কোনো মাসেই ছাপা হতে পারে। ছবি ছাপার ব্যবস্থা করছি। **পশুপতি দাসগুপ্ত** (২৪৩১)—নিজেরা প্রেস করছি। নইলে কিছুতেই সময় মতো রংমশাল ছাপা হয়ে উঠছে না। একটু ধৈর্য ধর। **বেণুগোপাল চট্টোপাধ্যায়** (২৩৮৫) —প্রদর্শনীর কথা ঠিক জানি না। 'বড়দের ছোটোবেলা' তোমাদের ভালো লাগবেই জানতুম। **শ্রীলা ঠাকুর** (?) —তোমার কবিতাগুলিতে কোনো নাম নেই, অনেক ছন্দ পতনও হয়েছে। গল্পটিও ছাপাবার উপযোগী হয়নি। আশাকবি এতে নিরুৎসাহ হবে না। ভালো লিখতে হলে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তুমি লেখার অভ্যেস ছেড়ো না। পড়ার অভ্যেসও কমিও না। ভালো বই কিংবা কবিতা পড়বার সময় যদি জানতে চেষ্টা করো কেনো সেগুলি ভালো তা হলে দেখবে তোমার লেখার দোষ কোথায়। চিঠিপত্রের সঙ্গে সর্বদা গ্রাহক নম্বর জানাবে। **যশোধন ভট্টাচার্য** (১২০৯)—তোমার গল্পটি ছাপা গেলো না। **মঞ্জুলা গুপ্তা** (২৪২৯)—তোমার গদ্য লেখা মোটামুটি ভালো, কিন্তু গল্পের বিষয়বস্তু বড় কাঁচা। আশাকরি পরে ভালো বিষয়বস্তু নিয়ে আরো ছোটো করে আরো ভালো লিখতে পারবে। তখন নিশ্চয়ই ছাপা হবে। দাদা-দিদিদের জব্দ করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে খুব ভালো লিখতে শেখা। আশাকরি তাদের ঠাট্টা-তামাসার যোগ্য উত্তর দিতে তুমি চেষ্টার ত্রুটি করবে না। গল্প পাঠাবার সময় কাগজের এক পিঠে লিখে পাঠিও। **সলিলকুমার বসু** (২১৬২)—গদ্যের সঙ্গে পদ্যের কোনো মিল নেই! অথচ তাই তুমি মিলিয়েছো! অন্য কবিতাটি মন্দ হয়নি। তবে সেটা ছাপালে অন্যান্য গ্রাহক-গ্রাহিকারা ভাবতে পারে রংমশালের প্রশংসা করেছো বলেই কবিতাটি ছাপা হোলো। তাই ছাপা গেলো না। বর্তমানে 'লেখনীবন্ধু'র ব্যবস্থা করা সম্ভব হচ্ছে না। ইতি

তোমাদের্ সম্পাকমশাই

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট দল

২১শে নভেম্বর চমৎকার ঠাণ্ডা সকাল। ইডেন গার্ডেনের দীর্ঘ দেবদারু গাছ-ঘেরা সবুজ মাঠের চারিদিকে দর্শকের ভিড় দেখতে-দেখতে জমে উঠলো। ইস্ট জোনের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া দলের আজ খেলা। ইস্ট জোনের ক্যাপ্টেন সি. কে. নাইডু, অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেন হ্যাসেট।

টসে জিত অস্ট্রেলিয়া দল ব্যাট করতে নামলো। প্রথমে এলেন হুইটিংটন আর ওআর্কম্যান। কিন্তু প্রথম মিনিটেই সমস্ত মাঠ ভরে অদ্ভুত চাঞ্চল্য দিলো দেখা। স্যুটে বাঁড়ুজ্জে তাঁর দ্বিতীয় বলেই হুইটিংটনকে নিজেই ক্যাচ আউট করলেন। তারপর এলেন পেটিফোর্ড। নিশ্চলকার আর স্যুটে বাঁড়ুজ্জে বল দিয়ে চললেন। অস্ট্রেলিয়া দলের যখন মাত্র ২৭ রান তখন সি. কে. নাইডু নিশ্চলকারের বদলে বল দিলেন বাংলার তরুণ বোলার এন্. চৌধুরীকে। চৌধুরীর তৃতীয় বলেই পেটিফোর্ড মাত্র ৯ রানে একেবারে বোল্ড আউট হলেন। খেলা সুরু হবার মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার দুটি খেলোয়াড় আউট হওয়ায় আমরা সবাই অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে উঠলুম। এর পর এলেন ক্যাপ্টেন নিজে। ছোট্ট মানুষ, মাথায় শাদা টুপি। তিনি মাঠে নার্মার পর তবু অস্ট্রেলিয়ার রান চটপট উঠতে লাগলো। পাকা খেলোয়াড় হ্যাসেট। নির্ভুল জোরালো মার। দেখতে-দেখতে তিনবার বলকে তিনি বাউণ্ডারি দড়ি পার করলেন। কিন্তু বেশিক্ষণ তাঁকেও টিঁকতে হোলো না। সবে তিনি ২৫ রান তখন করেছেন, অস্ট্রেলিয়ার মোট রান সংখ্যা তখন ৫৭, এমন সময় চৌধুরীর একটি বল মারবার পর মুস্তক আলি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে লুফে নিলেন। অস্ট্রেলিয়ার ক্যাপ্টেনকে মাত্র ২৫ রান করেই তাঁবুতে ফিরতে হোলো। তবু তখনো আমরা কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না। কত রান যে উঠবে কল্পনা করাও কঠিন। কারণ অস্ট্রেলিয়া দলের প্রায় প্রত্যেকেই ওস্তাদ ব্যাট-চালিয়ে—যে কোনো দুজন একবার জমে গেলেই খেলার রঙ বদলে যাবে।

হ্যাসেটের পর এলেন ভাইস ক্যাপ্টেন মিলার। সুন্দর চেহারা, লম্বা শরীর, সুপুষ্ট দেহ, গোলাপী রঙ। এঁর কথা অনেক আমরা শুনেছি, অস্ট্রেলিয়া দলের মধ্যে এঁর নাম-ডাকই এখন সবচেয়ে বেশি। এমন কথাও শোনা গেছে যে ব্র্যাডম্যানের শূন্য আসনে ইনিই নাকি প্রতিষ্ঠিত হবেন।

ইতিমধ্যে সি. এস্. নাইডু বল দিতে সুরু করেছেন। মিলার আসবার পর ৩ রান উঠতে-না-উঠতেই সি. এস্-এর বলে ওআর্কম্যানকে তাঁবুতে ফিরতে হোলো। এলেন পেপার। কিন্তু পরের বলেই সি. এস্. তাঁকে করলেন বোল্ড আউট। মাত্র ৬০ রানে অস্ট্রেলিয়ার ভালো-ভালো পাঁচটি

ব্যাট পড়ে গেলো। পেপারের পর এলেন ক্রিস্টোফানি, সবচেয়ে তরুণ খেলোয়াড়। ব্যাটিং এবং বোলিং দুয়েতেই ইনি সমান ওস্তাদ। কিন্তু মাত্র ১০ রান করার পরেই সি. এস্. তাঁকেও বোল্ড আউট করে ফেরৎ পাঠালেন। অস্ট্রেলিয়ার টোটাল তখন মাত্র ৭২। সবে তখন সোয়া ঘণ্টা খেলা আরম্ভ হয়েছে!

ক্রিস্টোফানির পর এলেন উইলিয়াম্স্। কিন্তু মাত্র ৩ রান করার পরেই চৌধুরীর বলে এবং নিম্বলকারের হাতে তিনি ক্যাচ আউট হলেন। লাঞ্চের আগেই অস্ট্রেলিয়া দল আউট হবে কিনা এই নিয়ে তখন আমাদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চলেছে। যে ভাবে খেলা চলেছে আর সি. এস্. আর চৌধুরী আর সারওয়েট যা রকম মারাত্মক বল দিচ্ছেন তাতে লাঞ্চ পর্যন্ত যে অস্ট্রেলিয়ার টেঁকা দুষ্কর সে-কথা সবাই আমরা বুঝেছি—কিন্তু তাও কি সম্ভব?

উইলিয়াম্স্-এর পরে এলেন প্রাইস। সি. কে. নাইডু তখন চৌধুরীর বদলে বল দিলেন সারওয়েটের হাতে। আর সারওয়েটই বাকী ক'জনকে টপাটপ তাঁবুতে ফেরৎ পাঠালেন। সারওয়েটের হাতে প্রথমে গেলেন মিলার ১৭ রানে। পার্থসারথী তাঁকে স্ট্যাম্প আউট করলেন। এলেন রোপার। কিন্তু এক রানও করতে হোলো না। সারওয়েটের বলে হলেন এল. বি. ডাবলিউ। এলেন শেষ খেলোয়াড় ব্রেমনার। সারওয়েটের বলে তিনিও এক রান করার আগেই হলেন পরিষ্কার বোল্ড আউট। লাঞ্চের পাঁচ মিনিট আগেই মাত্র ১০৭ রানে অস্ট্রেলিয়া দলের ইনিংস শেষ হোলো। প্রাইস নট আউট রইলেন ১৫ রান করে।

• এতো তাড়াতাড়ি প্রথম ইনিংস শেষ হোলো যে আমরা ভালো বুঝতেই পারলুম কে কেমন ব্যাট করেন। যেন আউট হওয়া দেখতেই এসেছি!

লাঞ্চের পর ইস্ট জোনের হয়ে প্রথমে ব্যাট করতে নামলেন স্যুটে বাঁড়ুজ্জে আর সারওয়েট। কিন্তু রোপারের প্রথম ওভারের শেষ বলেই মাত্র দু রান করে সারওয়েট হ্যাসেটের হাতে ক্যাচ আউট হলেন।

এলেন মুস্তক। মাঠের জনতা জানালো তাঁকে বিপুল অভিনন্দন—বাংলাদেশে তাঁর চেয়ে প্রিয় খেলোয়াড় বোধ হয় আর কেউ নয়—অদ্ভুত এই খেলোয়াড়। তাঁর নিজস্ব ঢং কখনো তিনি ছাড়েন না। তাঁর তীক্ষ্ণ চোখ, জোরালো হাত আর পায়ের চতুর কায়দা—সব কটি মিলিয়ে তাঁকে প্রথম শ্রেণীর ব্যাটসম্যান করেছে। ঠিক তাঁর মতো খেলোয়াড় আর দ্বিতীয় নেই। খেলার প্রচলিত নিয়ম-কানুন তিনি বড় একটা মানেন না—যেখানকার বল যেখানে মারা উচিত নয় তিনি সেখানেই মারেন! আর সে কী অদ্ভুত মার! দেখতে-দেখতে মুস্তকের রান হু হু করে বেড়ে চললো আর সমস্ত মাঠের লোক যেন একটি মানুষ হয়ে বারবার দিতে লাগলো হাততালি।

স্যুটে বাঁড়ুজ্জে বেশ ভালোই খেলছিলেন। কিন্তু ক্রিস্টোফানির বলে ব্রেম্নার তাঁকে চমৎকার স্ট্যাম্প আউট করলেন (৫০-২-১১)। আর তার পরের পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইস্ট জোনের তিনটি ভালো-ভালো উইকেট চটপট পড়ে গেলো। স্যুটে বাঁড়ুজ্জের পর এলেন ডেনিস কম্পটন—ইংলণ্ডের টেস্ট খেলোয়াড়। ফুটবল এবং ক্রিকেট—এই দুই খেলাতেই সমান ওস্তাদ। মুস্তক আর কম্পটনের জুড়িতে কী রকম দ্রুত রান উঠবে ভাবছি—এমন সময় এক রান না করেই কম্পটন তাঁবুতে ফিরলেন রান আউট হয়ে। তারপরেই পেপারের বলে এবং রোপারের হাতে গেলেন নিম্বলকার (এক রানও না করে) এবং ক্রিস্টোফানির বলে আর ওআর্কম্যানের হাতে গেলেন মুস্তক আলি (৭০-৫-৪৬)। চক্ষের নিমেষে সমস্ত খেলাটা যেন উল্টো-পাল্টা হয়ে গেলো। ইস্ট জোন ১০৭ পর্যন্তও পৌঁছয় কিনা তখন সন্দেহ হয়ে দাঁড়িয়েছে! একেই বলে ক্রিকেট।

চা-এর পরেই ভারতীয়দের ইনিংস শেষ হোলো মাত্র ১৩১ রানে। এর মধ্যে সি. কে. এবং সি. এস্ ২৫ এবং ২৪ করেছিলেন। নির্মল চাটুজ্জে করেছিলেন ১১। নাইডু ভাইরা বেশ খেলেছিলেন, বিশেষ করে ছোটো নাইডু।

কিন্তু সবচেয়ে দুঃখ হোলো নির্মলের খেলা দেখে। তিনি যে আর কোনো দিন ভালো খেলায় নির্বাচিত হবেন তাঁর খেলা দেখে সে-আশা কারুর মনেই রইলো না।

দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে ২৯ রানে অস্ট্রেলিয়া দল দুইটিংটন, ওআর্কম্যান আর প্রাইসকে হারালো। দ্বিতীয় ইনিংসের প্রথম ওভারের প্রথম বলেই স্যুটে বাঁড়ুজ্জে দুইটিংটনকে এল. বি. ডাবলিউ আউট করেছিলেন।

ইডেন গার্ডেনে প্রথম দিন গেলো বোলারের দিন। প্রথম ইনিংসে ইস্ট জোনের চৌধুরী সারওয়েট আর সি. এস্. প্রত্যেকেই তিনটি করে উইকেট নিয়েছিলেন আর অস্ট্রেলিয়ার ক্রিস্টোফানি আর প্রাইস পেয়েছিলেন চারটে আর তিনটি উইকেট।

ইডেন গার্ডেন যে সত্যিই অদ্ভুত মাঠ আর ক্রিকেট যে সত্যিই a game of uncertainties দ্বিতীয় দিনের খেলার পর সবাই ভালো করে সে-কথা বুঝলুম। দ্বিতীয় দিন ছিলো সত্যিই ব্যাট্স্ম্যানের দিন! দ্বিতীয় দিন অস্ট্রেলিয়া দল দ্বিতীয় ইনিংসে করলো ৩০৪ রান! এর মধ্যে হ্যাসেটের ১২৫, ক্রিস্টোফানির ৬৯, রোপারের ২৮ আর উইলিয়াম্স্-এর ২৭ রান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে হ্যাসেটের নিখুঁত খেলা সবাই খুব উপভোগ করেছিলুম। ভাবতবর্ষে এসে এই তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। হ্যাসেট সত্যিকারের ক্যাপ্টেনের মতো খেলেছিলেন এবং তিনি না থাকলে অস্ট্রেলিয়া দলকে দ্বিতীয় ইনিংস-এও হাজার কম টোটালে নেমে যেতে হোতো। দ্বিতীয় ইনিংসে চৌধুরী ৩টি, সারওয়েট ৩টি এবং বাঁড়ুজ্জে ও সি. এস্. প্রত্যেক ২টি করে উইকেট পেয়েছিলেন।

২৮০ রান পিছিয়ে থেকে ইস্ট জোন তাদের দ্বিতীয় ইনিংস-এর খেলা সুরু করলো। দ্বিতীয় দিনেই স্যুটে বাঁড়ুজ্জে এবং সারওয়েট মাত্র ৬ আর ১৩ করে আউট হলেন, কিন্তু মুস্তক এবং ডেনিস কম্পটন ৫৩ এবং ৩৯ করে রইলেন নট আউট। খেলার শেষে ২ উইকেটে ইস্ট জোন করলো ১২২ রান—তার মানে আরো ১৫৭ রান করতে পারলে তারা জয়ী হবে। হাতে তখনো তাদের আটটি উইকেট। দ্বিতীয় দিনের শেষেও জোর করে বলা গেলো না কারা জিতবে—তবে এ খেলা যে ড্র হবে না সে কথা স্পষ্টই বোঝা গেলো এবং অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে এই খেলাতেই যে প্রথম একটি চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে সেই সম্ভাবনার স্পষ্ট ইঙ্গিতে সবাই আমরা উত্তেজিত আলোচনা করতে-করতে বাড়ি ফিরলুম।

২৩শে নভেম্বর বাংলা দেশের খেলাধূলোর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নর্থ জোন আর ওয়েস্ট জোন যা পারেনি ইস্ট জোন তাই পারলো। ভারতবর্ষের মাটিতে অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম হারলো। কিন্তু শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও জোর করে বলা যায়নি কারা জিতবে। লাঞ্চের পর আট উইকেটে ইস্ট জোন ২৮৪ রান করে অস্ট্রেলিয়া দলকে দু উইকেটে হারালো। এই ২৮৪'র মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কম্পটনের নিখুঁত ১০১, মুস্তাকের ৫৮ সি. এস্-এর ৩৩ এবং নিম্বলকারের নট-আউট ৩৩।

২৫শে নভেম্বর দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হোলো। প্রথম দিনে যা ভিড় হয়েছিলো তা কলকাতার যে-কোনো বড় ফুটবল ম্যাচের সময়েও প্রায় দেখা যায় না। চার দিন ধরে এ খেলা চললো এবং শেষ পর্যন্ত ফলাফল হোলো ড্র। দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হবার কোনো মানে হয় না। ভারতীয় দল যদি ভালো ফিল্ডিং করতো, যদি স্যুটে বাঁড়ুজ্জের মতো ফাস্ট বোলার দলের মধ্যে কেউ থাকতেন এবং মার্চেন্ট যদি আর একটু বিচক্ষণতার সঙ্গে নিজের দলকে পরিচালনা করতে পারতেন, তা হলে ইডেন গার্ডেনে অস্ট্রেলিয়া দলকে নিশ্চয়ই টেস্টেও হার স্বীকার করতে হোতো। একটি ব্যাপার স্পষ্ট বোঝা গেলো: ব্যাটিং-এর দিক থেকে ভারতীয় দল পৃথিবীর যে-কোনো ক্রিকেট দলের সামনে বুক ফুলিয়ে আজ দাঁড়াতে পারে। এই দলে আছেন মার্চেন্ট, মোদি, অমরনাথ, হাজারি, হাফিজ, মানকাদ, মুস্তক এবং সি. এস্—এঁরা যে-কেউ একবার জমে গেলে হোসখেলে সেঞ্চুরি, এমন কি ডবল সেঞ্চুরিও, করতে পারেন। কিন্তু নিসার

কিংবা অমরসিং-এর মতো বোলার এ-দলে আর নেই। ভারতীয় দলে যদি কোনো নতুন ফাস্ট বোলার পাওয়া যায় তা হলেই এই দল বিনা দ্বিধায় যে-কোনো দলকে আজ হারাতে পারবে। ভালো বোলার পাওয়া এবং ভালো ফিল্ডিং করতে শেখা—এই দুয়ের উপর ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ সাফল্য সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। হাত ফস্কে বল বেরিয়ে যাওয়ায় ভারতীয় দল অন্তত দু শো রান বেশি দিয়েছে অস্ট্রেলিয়ান দলকে। সহজ ক্যাচ লুফতে না পারার জন্যে অস্ট্রেলিয়ার দুজন অতি সাধারণ খেলোয়াড় দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরি করে নিজেদের দলকে হারের হাত থেকে বাঁচালো। ক্রিকেট বাস্তবিক ভারি অদ্ভুত খেলা। একটি ভুলের জন্যে এমন দাম বোধ হয় অন্য কোনো খেলাতে দিতে হয় না।

ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে করেছিলো ৩৮৬ (মানকাদ ৭৮, মুস্তফ ৩১, হাজারি ৬৫, মোদি ৭৫, হাফিজ ৩৭ এবং সি. এস্. ৩৮)। অমরবাথ প্রথম ইনিংসে এক রানও করতে পারেননি। প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া দল করলো ৪৭২ (কার্মোডি ৪০, হুইটিংটন ১৫৫, পোটিফোর্ড ১০১, মিলার ৮২)। হুইটিংটন ও পেটিফোর্ড অতি সাধারণ খেলেছিলেন এবং ভারতীয় দল একটু ভালো ফিল্ডিং করতে পারলে সেঞ্চুরি করার বহু পূর্বেই তাঁদের তাঁবুতে ফিরতে হোতো। এঁদের মধ্যে মিলরের খেলাই সবচেয়ে উপভোগ্য হয়েছিলো। মিলারের চারটি ওভার-বাউণ্ডারির কথা যাঁরা দেখেছেন তাঁরা আর কখনোই ভুলতে পারবেন বলে মনে হয় না।

দ্বিতীয় ইনিংসে ভারতীয় দল ৪ উইকেটে ৩৫০ করে ডিক্লেয়ার করলো। এর মধ্যে মার্চেণ্টের নট-আউট ১৫৫, অমরনাথের ৪৮ এবং হাফিজের নট-আউট ৮৬ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অস্ট্রেলিয়া দল যখন দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নামলো খেলা শেষ হতে মাত্র আর এক ঘণ্টা তখন বাকী। এর অনেক আগে থেকেই বোঝা গিয়েছিলো এ-খেলার ফলাফল ড্র ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। ২ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দল ৪৯ করার পর খেলা শেষ হোলো। শেষের দিকে ধৈর্য ধরে বসে থাকাও কষ্টকর হয়েছিলো।

ভারতীয় দলের সি. এস্, অমরনাথ এবং মানকদ এবং অস্ট্রেলিয়া দলের পেপার, উইলিয়াম্‌স্ এবং ক্রিস্টোফানি খুব ভালো বল দিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় টেস্টের চেয়ে ইস্ট জোনের খেলা যে খেলা হিসেবে অনেক উঁচুদরের হয়েছিলো যাঁরাই দেখতে গিয়েছিলেন তাঁরাই সে-কথা স্বীকার করবেন।

এর পরের খেলা হোলো মাদ্রাজে সাউথ জোনের সঙ্গে এবং সেখানেই অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম জিৎলো। প্রথম ইনিংসে সাউথ জোন করলো ২৫৯ (পালিয়া ৪৮, আলবারা নট আউট ৪৯), অস্ট্রেলিয়া দল করলো ১৯৫ (কার্মোডি ৩৩, ওআর্কম্যান ৭৬, প্রাইস ৩১)। দ্বিতীয় ইনিংসে সাউথ জোন করলো ২৩৩ (জনস্টোন ২১, পালিয়া ২৪, আলবারা ৪৫, রাম সিং ৪২, গোপালন ৪১) আর অস্ট্রেলিয়া করলো চার উইকেটে ১৯৮ (কার্মোডি নট আউট ৮৭, ক্রিস্টোফানি নট আউট ৫৪)—ফলে ৬ উইকেটে জিৎলো অস্ট্রেলিয়া। এই খেলায় হ্যাসেট খেলেননি। তাঁর বদলে মিলার ছিলেন ক্যাপ্টেন।

তারপরের খেলাও হোলো মাদ্রাজে—তৃতীয় টেস্ট। এইটাই ছিলো ভারতবর্ষে অস্ট্রেলিয়া দলের শেষ খেলা এবং এই খেলাতে অস্ট্রেলিয়া দলকে আবার হোলো হারতে। টেস্টে হার বড় সহজ কথা নয়। এবং তিনটি টেস্টের মধ্যে দুটিতে ড্র করায় এবং একটিতে হারানোয় ভারতীয় দলেরই হোলো জিৎ। টেস্টে জেতার প্রধান কারণ মনে হয় স্যাটে বাঁড়ুজ্জেকে দলে নেওয়া। আমরা ভেবেছিলুম কলকাতায় চৌধুরীর অভূতপূর্ব সাফল্য দেখে তাঁকেও তৃতীয় টেস্টে নেওয়া হবে। কিন্তু তাঁকে না নেওয়ায় অনেকেই হতাশ হয়েছেন এবং খেলোয়াড়-নির্বাচক দলের উপর আস্থা হারিয়েছেন।

তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দল প্রথম ইনিংসে ৩৩৯ (হুইটিংটন ৩৩, হ্যাসেট ১৪৩, পেপার ৮৭) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৫ (কার্মোডি ৯২, হুইটিংটন ৬৭, ক্রিস্টোফানি ২৯) করেছিলো। ভারতীয় দল প্রথম ইনিংসে করেছিলো ৫২৫ (অমরনাথ ১১৩, মুস্তফ ২৮, মোদি ২০৩, গুল মহম্মদ ৫৫, সি. এস্. ৬৪) এবং দ্বিতীয় ইনিংসে ৪ উইকেটে ৯২ (মার্চেণ্ট ৩৫, মুস্তফ ৩৭)। ফলে ৬ উইকেটে অস্ট্রেলিয়া দলকে হোলো হারতে—রীতিমতো হার বৈকি! প্রত্যেক ইনিংসেই বাঁড়ুজ্জে ও সারওয়েট চারটি করে উইকেট পেয়েছিলেন। অস্ট্রেলিয়া দলের পেপার, প্রাইস, এলিস এবং ক্রিস্টোফানি ভালো বল দিয়েছিলেন।

ভারতবর্ষে অস্ট্রেলিয়া দল মোট ৯টি ম্যাচ খেলে। তার মধ্যে ৬টি হয় ড্র, একটি জেতে এবং দুটি হারে।

একটি ফুল

মনোরঞ্জন রায় (৯২)

রোদ উঠেছে, ঝ'রছে সকল শেফালিকার ফুল,
একটি শুধু ঝরেনিকো, ক'রছে সে কি ভুল ?
না, না, না, ভুল করেনি, সেই তো সবার খাঁটি।
সে রয়েছে বলতে আমায় শেষের কথাটি ॥

কবিতার ধাঁধা

আশিস দত্ত (১৫৬৯),

(১)

বাঁচিয়েছি নাজিমেরে আমি বহুবার,
অনশন বাংলায় আমলে আমার।
ভালো লোক বলে তবু খ্যাতি মোর বেশী,
নামটি বলো তো মোর ? ছোটলাট '—' ! [কেসি]

(২)

সহজেই ভারতেরে দিতে পারি ধোঁকা,
নিজেরে চালাক ভাবে, নেতারা কী বোকা !
সিমলায় দেখিয়েছি কী আজব খেল,
নামটি বলো তো মোর ? লর্ড '—' ! [ওয়াভেল]

(৩)

জেলখানা ভরিয়েছি সারা ভারতের,
কাপড়, খাবার নেই সব নেটিভের।
কেঁদেছে সকল বেটা, 'হা মেরী, হা মেরী,'
নামটি বলো তো মোর ? মিঃ '—' ! [আমেরি]

(৪)

মোর হাতে আসলে যে সব চাবিকাঠি,
হারাতে আসিনি আমি রাজ্যের মাটি।
ভারতেরে দিয়ে রণ জিতে খুশ দিল,
নামটি বলো তোমার ? গ্রেট '—' ! [চার্চিল]

রংমশালের ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমরা হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবে না, কিন্তু সত্যি বলছি আজ তোমাদের যে কথা বলব তা একেবারে একটুও বানানো নয়। শুনতে আজগুবি বা গাঁজাখুরি মনে হলেও ব্যাপারটা একদম খাঁটি খবর। এক রকমের পোকা আছে তাদের বয়েস বাড়ে-কমে। বয়েস বাড়াটা কি তা নিশ্চই বোঝাতে হবে না। কিন্তু বয়েস কমা যে কি ধরণের ব্যাপার তা নিশ্চই বুঝতে অসুবিধে হবে। বুঝতে যে অসুবিধে হবে তার কারণ নিশ্চই এ নয় যে বোঝবার মতো বুদ্ধি তোমাদের নেই। আসলে, তোমরা যে সবাই ভয়ানক ভয়ানক বুদ্ধিমান এ কথা ত সবাই জানো। বুঝতে যে অসুবিধে হবে তার কারণ এও নয় যে বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। আসলে, আমি ঠিক জানি যে আমিও বেশ একটু বুদ্ধিমান! তবু, বুঝতে অসুবিধে হবে। তার আসল কারণ ব্যাপারটাই যে একদম বেখাপ্পা সৃষ্টিছাড়া কথা। বয়েস কমা আবার কোন দেশের কথা? এরকম ত শুধু "হজবরল"-র গেছো-দাদার মাথায় আসতে পারে, এবং গেছোদাদা লোকটি ভালোমন্দ যাই হোক তার মগজের কয়েকটা স্ক্রু যে ঢিলে সে সম্বন্ধে ত কারুর সন্দেহ নেই।

অথচ মজা এই যে যে ভদ্দরলোক প্রথম এই বয়েস কমার কথা প্রচার করলেন তাঁর মাথার একটা স্ক্রুও একটুও ঢিলে নয়। কেন না, তিনি দুনিয়ার একজন নামজাদা পণ্ডিত, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক। তাঁর নাম হল অধ্যাপক চাইল্ড। কিন্তু child শুনেই ছেলেমানুষ ভেবে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কোরো না। নাম চাইল্ড হলে কি হয়, ভদ্দরলোক মোটেই ছেলেমানুষ নন। চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে তাঁর খোঁজ করো, দেখবে সবাই তাঁকে বিচক্ষণ পণ্ডিত হিসেবে কী রকম খাতির করে।

এ হেন পণ্ডিত ব্যক্তি অধ্যাপক চাইল্ড একদিন বলে বসলেন এক রকমের পোকা আছে যাদের বয়েস কিছুদিন বাড়ে আবার তারপর কিছুদিন ধরে কমে। আবার বাড়ে। আবার কমে। বয়েস যে বাড়ে-কমে তার লক্ষণ হচ্ছে পোকাগুলো কিছুদিন ধরে বড়ো হয় আবার তারপর কিছুদিন ধরে ছেলেমানুষ হয় এমনকি একেবারে পুঁটকে হয়ে যায়। তারপর আবার তাদের বয়েস বাড়ে, আবার

তারা বড়ো হয়ে বুড়ো হয়ে যাবার জোগাড় করে। কিন্তু বুড়ো হতে হতে শেষ পর্য্যন্ত যে পটল তোলে তা নয়; একটু চেষ্টা করলেই তাদের বয়েস-এর মোড়টা খোকামির দিকে ফিরিয়ে দেওয়া যায়। তখন আবার তারা খোকা হতে সুরু করে।

তোমরা হয়ত বিশ্বাস করবে না, হয়ত ভাববে আমি গাপ্পা মারছি। কিন্তু সত্যি বলছি, এ সব কথা একটুও বানানো হয়। জুলিয়ান হাক্সলি বলে আজকালকার একজন নামকরা বৈজ্ঞানিকের বইতে এ কথা পড়েছি। বানিয়ে বলবার মতো লোক আমি মোটেই নই।

তবে শোন; সব কথা খুলেই বলছি। এক রকমের পোকা আছে, ইংরিজিতে তাদের নাম দেওয়া হয়েছে প্লানোরিয়ান পোকা। অতবড় নাম হলে কি হয়, পোকাগুলো খুব ছোট-ছোট। সাধারণত তারা জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। চেহারা তাদের থ্যাবড়া ধরণের, তাই অনেক সময় ইংরেজিতে তাদের থ্যাবড়া পোকা নাম দেওয়া হয়। এই পোকাগুলোরই বয়েস কিছুদিন বেড়ে চলে, তারপর কিছুদিন ধরে কমে চলতে পারে। ব্যাপারটা কেমন করে প্রথম বোঝা গেল বলছি। দেখা গেল, কিছুদিন ধরে খাবার না জুটলে পোকাগুলো দিব্বি নিজেরা নিজেদের খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে। খুব বড়লোকের হঠাৎ যদি কখনো অনেক টাকাকড়ি লোকসান হয়ে যায় তা হলে সেই বড়লোক যেমন করে, এও অনেকটা সেই রকমের। কেন না, বড়লোক ত তখন নিজের সম্পত্তির অর্দ্ধেকটা বিক্রী করে বাকি অর্দ্ধেকটা নিয়ে কোনমতে দিন কাটায়। থ্যাবড়া পোকার বেলাতেও অনেকটা তাই: কিছুদিন ধরে খাবার না জুটলে সে করে কি নিজের শরীরের আধখানা খেতে সুরু করে আর বাকি আধখানা নিয়ে কষ্টেসৃষ্টে দিন কাটায়। তার পরেও যদি তার খাবার না জোটে তাহলে সে বাকি শরীরটুকু থেকে আবার খানিকটা খেতে থাকে। এইভাবে, দিনের পর দিন সে ছোট হয়ে যায় বটে কিন্তু মরে না। অবশ্য, তাই বলে নিজের শরীরও ত হাতির মতো নয়! কতদিনই বা তাই দিয়ে জলযোগ করা যায় বল? কমতে কমতে বেছারা যখন ভয়ানক ছোট হয়ে যায়, ডিম ফুটে বেরুবার সময় যতটুকু ছিলো তার চেয়েও ছোট—এত ছোট যে অণুবীক্ষণ না দিয়ে দেখাই যায় না, তখন বেছারা নিরুপায় হয়ে অক্কা পায়। অবশ্য, আর এক ভাবেও তাদের মৃত্যু হতে পারে—পেট পুরে খাবার জিনিস খেতে খেতে আর বুড়ো হতে হতে যেরকম দুনিয়ায় আর সবাই মরে যায় সেই রকম ভাবে।

শুধু তাই নয়। অধ্যাপক চাইল্ড আবিষ্কার করেছেন যে না খেতে পেয়ে পোকাগুলোর শুধু যে আকার ছোট হয়ে যায় তাই নয়, সেগুলো সত্যিই কচি হয়ে যায়, খোকা হয়ে যায়! তাদের হালচাল, তাদের চেহারা সবই ক্রমশ একেবারে শিশুর মতো হয়ে যায়, এমনকি ক্রমশ সদ্যজাত বেবির মতো হয়ে পড়ে। কিন্তু তখন যদি তাদের আবার খাবার জোটে তাহলে তাদের যে শরীরটা বড় হয় তাই নয়, বয়েস বাড়বার সমস্ত লক্ষণ তাদের মধ্যে দেখা দেয়। তারা বড়ো হয়ে চলে, বুড়ো হয়ে চলে। কিন্তু তখন যদি আবার তাদের খাবার বন্ধ হয়ে যায় তাহলে আবার তারা খোকা হতে সুরু করে।

অধ্যাপক চাইল্ড এদের নিয়ে একটা বেশ মজার পরীক্ষা করেছিলেন। দুটো পাত্রে আলাদা করে দু-দল থ্যাবড়া পোকা রাখলেন। তাদের এক দলকে নিয়মিত খাবার দিয়ে চললেন এবং আর একদল যতদিন না খেতে পেয়ে একেবারে পুঁটকে হয়ে যায় ততদিন আর তাদের কিছু খেতে দিলেন না। এইভাবে দেখা গেল, প্রথম পাত্রের পোকারা কিছুদিন পরে ছেলেপুলে রেখে দেহত্যাগ করল, সেই ছেলেপুলেরাও আবার নিজেদের ছেলেপুলে রেখে দেহত্যাগ করল। এইভাবে প্রথম পাত্রের পোকাদের নাতির নাতি হতে হতে উনিশ পুরুষ কেটে গেল; কিন্তু দ্বিতীয় পাত্রের পোকাদের শুধু বয়েস বাড়ে আর কমে কিন্তু কারুর মরবার লক্ষণ নেই।

মানুষের বেলাতেও যদি এইরকম হত তা হলে আজ একটা পাত্রে কলম্বাসের সময়কার লোকদের দিব্বি জিইয়ে রাখা যেতো। তবে, বিজ্ঞান পারে না এমন জিনিষ খুব কম আছে—হয়ত একদিন চলন্তিকায় খবর দেখবে কোন দেশের কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে ফেলেছেন মানুষের বয়স কি করে কমতির দিকে নিয়ে যাওয়া যায় তার উপায়। তখন কিন্তু রংমশালের তরফ থেকে আমি তাঁকে সেলাম পাঠাবো কেন না তাহলে আজকে যাঁরা বুড়ো হয়ে রংমশালের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছেন দুদিন পরে আবার তাঁরাই খোকা হয়ে তোমাদের দলে যোগ দেবেন!

অরুণ আর বরুণের দিদিমা এখনো বেঁচে। প্রত্যেক পূজোয় এই দুই নাতিকে তিনি টাকা পাঠান। প্রত্যেক বছরেই ছ'টাকা করে বেশি আসে।

এই বেশি টাকা আসার কারণটা বলি। একটা মজার অঙ্ক কষে দিদিমা তাদের টাকা পাঠান। প্রত্যেক বছরেই অরুণের যত বয়স ঠিক তত দিয়ে তিনি গুণ করেন আর সেই গুণফল থেকে বরুণের যত বয়স ঠিক তত দিয়ে গুণ করে অরুণের বয়সের গুণফল থেকে বরুণের বয়সের গুণফল বাদ দেন। বাদ দেবার পর যে-সংখ্যাটা দাঁড়ায় ততগুলি টাকা তিনি প্রত্যেক বছর পূজোর সময় পাঠান।

এইবার পূজোয় অরুণের বয়স যদি ৩৭ হয় তাহলে বরুণের বয়স কত?

ধাঁধার উত্তর

যদি সন্ধ্যার কথা (বীরেণ দ্বিতীয় হয়েছে) ঠিক হয় তা হলে বীরেণের কথা (সন্ধ্যা দ্বিতীয় হয়েছে) ভুল এবং অজয় হয়েছে সবচেয়ে নীচে ঠিক। এইভাবে দেখলে সমীরের প্রথম কথাটা ঠিক এবং দেখা যাবে দ্বিতীয় হয়েছিলো একসঙ্গে দুজনে।

অতএব সন্ধ্যার কথার প্রথম অংশ সত্যি। তা হলে সমীর এবং বীরেণের কথার দ্বিতীয় অংশ সত্যি। প্রতিযোগিতার ফলাফল তা হলে এই রকম দাঁড়ালো: (প্রথম) বীরেণ, (দ্বিতীয়) সন্ধ্যা, (তৃতীয়) অজয় এবং (চতুর্থ) সমীর।

উত্তরদাতাদের নাম

সুব্রত কালীপদ কৃষ্ণা রঞ্জন শান্তা (২০০৫), পারুল অঞ্জলি হিমাদ্রি হরেন কুমার (২৫৭০), প্রতিমা সেন (২০৮৪), সৌম্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (২২৬৭), শোভনা দেবব্রত (১৯১৫), প্রবীরকুমার রায়চৌধুরী (২২৬৯), বেনুগোপাল চট্টোপাধ্যায় (২৩৮৫), বিভাতী নারায়ণ (২৫৪৭), সোমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৭৯৬), দুর্গাদাস ভট্ট (২৫৫৭), বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩৯৩), জিয়াগঞ্জ গার্লস এম ই স্কুলের ছাত্রীরা (২৪২৩), গৌরাঙ্গ কুণ্ডু (২৫৭৩), চিনু চৌধুরী (১৯৭৭), অবনীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (?), যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), জানকীকান্ত পাল (২৪৫৩), দেবু জয়ন্তী পশুপতি (২৪৩১) মতি ক্ষিরোদ বীণা বেবি পীযূষ (২১৬০), কাশীনাথ পালিত (২৫৫০) সুধাংশু চৌধুরী (২২৯৭), সব্যসাচী ঘোষ দস্তিদার (২২২১), মিনা পিন্টু নির্মল (২৫৯১), সুকুমার সাহা (২৪৯২), সৈয়দ নুরুল আলম (২০৬৬), কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায় (৯০)।

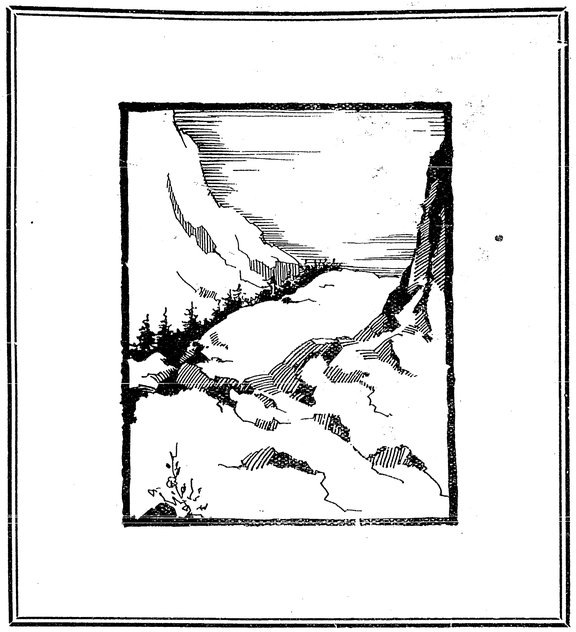

তুষার-বৃষ্টির পর

শিল্পী : সূর্য রায়

[দশম বর্ষ, দশম সংখ্যা : মাঘ, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

অতি-কিশোরের ছড়া

সুকান্ত ভট্টাচার্য

তোমরা আমায় নিন্দে ক'রে দাও না যতই গালি,
আমি কিন্তু মাখছি আমার গালেতে চূণকালি,
কোনো কাজটাই পারি নাকো ব'লতে পারি ছড়া,
পাশের পড়া পড়ি না ছাই পড়ি ফেলের পড়া।
তেতো ওষুধ গিলি নাকো, মিষ্টি কিংবা টক
খাওয়ার দিকেই জেনো আমার চিরকালের শখ।
বাবা-দাদা সবার কাছেই গোঁয়ার এবং মন্দ
ভালো হ'য়ে থাকার সঙ্গে লেগেই আছে দ্বন্দ্ব।
প'ড়তে ব'সে থাকে আমার পথের দিকে চোখ,
পথের চেয়ে পথের লোকের দিকেই বেশি ঝোঁক।
স্কুলের কেয়ার করি নাকো মধুর জন্যে ছুটি,
যেখানে ভিড় সেইখানেতেই লাগাই ছুটোছুটি।
পণ্ডিত এবং বিজ্ঞজনের দেখলে মাথা নাড়া
ভাবি উপদেশের ঘাঁড়ে ক'রলে বুঝি তাড়া।
তাইতো ফিরি ভয়ে ভয়ে, দেখলে পরে তর্ক,
বুঝি কেবল গোময় সেটা,—নয়কো মধুপর্ক।
ভুল করি ভাই যখন তখন, শোধ্‌রাবার আহ্লাদে
খেয়ালমতো কাজ ক'রে যাই, কষ্ট পাই কি সাধে?
সোজাসুজি যা' হয় বুঝি, হায় অদৃষ্ট চক্র!
আমার কথা বোঝে না কেউ, পৃথিবীটাই বক্র।

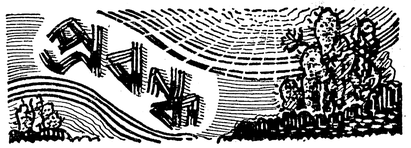

বড়দের ছোটোবেলা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

[দেশের জ্ঞানী এবং গুণীদের ছোটোবেলার কথা জানতে নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছে করে। এই বিভাগে মাঝেমাঝে সে-ধরণের লেখা ছাপবার আমরা ব্যবস্থা করেছি। রঃ সঃ]

ভাঁড়ার ঘরের একটা সেল্‌ফে বড় একটা কাঁচের জার আমি তাক্ করে রেখেছি, কোন ফাঁকে সেইটে সরিয়ে ফেলতেই হবে।

ছোটবড় অনেকগুলো কাঁচের শিশি ইতিমধ্যে জোগাড় হয়েছে, কিন্তু বড় কাঁচের বোয়েমটা না হ'লে সব মজা মাটি।

ব্যাপারটা আর কিছুই নয়, আমি আর আমার সমবয়সী এক মামা মিলে তখন একটি চিড়িয়াখানা বানাব ঠিক করে ফেলেছি।

কলকাতা সহর তখনও দেখিনি, কিন্তু কলকাতার চিড়িয়াখানার সুখ্যাতি আমাদের বেশ একটু চঞ্চল করে তুলেছে। কলকাতার মত একটা চিড়িয়াখানা কি আমরা বানাতে পারি না! কি আর এমন শক্ত!

কয়েকটি শিশিতে ক্ষুদে লাল, কালো সুড়সুড়ে ডেঁও ও কাঠপিঁপড়ে ও দুতিন জাতের ফড়িং ভরে ফেলা হয়েছে। একটা হলদে বোলতা কুয়োতলায় জলের ওপর বসতে গিয়ে বেকায়দায় আমাদের হাতে বন্দী হয়েছে। বাঘের অভাবে বাসার মেনি বেড়ালটাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছি। নিজেদের বাড়িতে কোন কুকুর নেই কিন্তু আশা আছে সিংহের বদলি বেওয়ারিশ কোন একটা কুকুর শীগ্‌গীরই জোগাড় করতে পারব। আমার মামার উৎসাহ ও নব নব উন্মেষশালিনী বুদ্ধির তুলনা হয় না। বিষধর সাপের বদলে কয়েকটা কেঁচো দিয়ে যে অনায়াসে কাজ চালিয়ে দেওয়া যায় এ বুদ্ধিও তার মাথায় খেলেছে। একটা শিশির মধ্যে তারাও আমাদের চিড়িয়াখানার শোভাবর্দ্ধন করছে। কিন্তু মুস্কিল হয়েছে মামার একেবারে আনকোরা নতুন মতলব নিয়ে। ইঁদুরের উপদ্রবে কদিন ধরে ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর-ধরা-কল পাতা হচ্ছিল। কলটা এমন মজার যে ইঁদুরেরা কেন যে এখনো তাতে ধরা পড়বার জন্যে কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি মামাভাগ্নে দুজনেই আমরা তা ভেবে অত্যন্ত অবাক্ হচ্ছিলাম। তবু শেষ পর্য্যন্ত কলের লোভ যে তারা সামলাতে পারবে না এ বিশ্বাস আমাদের ছিল। তাই মামার নতুন মতলবের জন্ম সেই ইঁদুর-ধরা কলের মধ্যে। ইঁদুর যদি একটা কলে ধরা পড়ে—এবং ধরা নিশ্চয় পড়বেই, তাহলে আমাদের চিড়িয়াখানা অমন একটা পরমাশ্চর্য্য প্রাণী থেকে বঞ্চিত থাকবে কেন? থাকবার কোন কারণই নেই শুধু তাদের রাখবার স্থানেরই একান্ত অভাব। যেসব ওষুধের শিশি আমরা নানা ফিকিরে জোগাড় করেছি, সেগুলো যাদেরই তৈরী হোক বুদ্ধি-শুদ্ধি তাদের খুব বেশী নিশ্চয়ই নয়। এত সরু গলা দিয়ে আস্ত একটা জ্যান্ত ইঁদুর যে কোনরকমেই চালানো যায় না, এ-কথাটা তারা কিনা একেবারেই ভাবেনি।

ইঁদুরের উপযুক্ত আশ্রয় খুঁজতে গিয়েই ভাঁড়ারঘরের বোয়েমটির দিকে আমাদের নজর পড়েছে। হ্যাঁ, ইঁদুর যদি চিড়িয়াখানায় রাখতে হয় তাহলে ওই রকম একটা কাঁচের বোয়েমেই তা রাখা উচিত। কিন্তু এ-বিষয়ে যিনি একাধারে আমার মামার দিদি ও আমার মা, তিনি আমাদের সঙ্গে একমত হবেন কিনা সে সম্বন্ধে আমাদের ঈষৎ সন্দেহ ছিল। তাই মামার পরামর্শ মত কোন এক সময় কাঁচের বোয়েমটি অনুমতি না নিয়েই লোপাট করে দেব আমরা ঠিক্ করেছিলাম। লোপাট করবার পর সেটা সামলাতে ও হজম করতে অত হাঙ্গাম হবে জানলে কি আর অমন আহাম্মকি করি!

ভাঁড়ার ঘর থেকে চাল যা বার করবার করে ডাল নিয়ে মা সবে গেছেন রান্নাঘরে। ভাঁড়ার ঘর খোলা, বাইরের দরজাতেও কাউকে দেখা যাচ্ছে না। এই ফাঁকে চট করে ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে কাঠের একটা সিন্দুকের ওপর দাঁড়িয়ে কাঁচের বোয়েমটি পেড়ে নিয়ে দিলাম বাইরে চম্পট। তারপরই বাধল মুস্কিল। এই বোয়েম নিয়ে এখন যাই কোথায়? বোয়েমটা ছাই যে এত ভারী তাই কি জানা ছিল। মামা আমার আগে থাকতেই বাইরে গিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে এই রকম ছিল কথা। কিন্তু এদিকে ওদিকে কোথাও তার চুলের টিকিটি পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কোন রকমে পেটের ওপর সেই ঢাউস্ বোয়েম জড়িয়ে ধরে আমি হতাশ ভাবে এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। তারের বেড়া দেওয়া আমাদের বাড়ির সীমানার পর শুকনো রাঙামাটির মাঠ দূরের ছোট রেল স্টেশনের রাঙা টালির গড়ানে ছাদে গিয়ে যেন ঢেউ তুলেছে। স্টেশনের দুধারে ...তে যে রেল লাইন দুদিকে বেরিয়ে গেছে তা দেখলে মনে হয় যেন দুটো ঘরছাড়া ছেলে, কেউ কোথাও নেই বলে উদাসভাবে নিরুদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছে। এতবড় বিরাট আকাশ-ঘেরা পৃথিবী, তবু আমার চুরি-করা করা বোয়েমটা লুকোবার একটা জায়গা নেই। বোয়েমটার ভার আর সইতে না পেরে সেটা মাটিতে নামিয়ে রাখতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি আমাদের বাড়ির চাকর লালজিয়া বাজার থেকে তরী-তরকারী কিনে আমার দিকেই আসছে। চুরির বোঝা আবার তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়বার চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু তা আর হ'ল না।

"ওটায় কী আছে, খোকাবাবু?"

হাতে হাতে ধরা পড়ে তখন মরিয়া হয়ে উঠেছি। এরকম বোকার মত প্রশ্নের উত্তরে যতখানি সম্ভব মেজাজ দেখিয়ে বল্লাম, "কী, দেখতে পাচ্ছ না? কাঁচের বোয়েম।"

লালজিয়া অনেক কালের পুরনো চাকর। আমার মা'কেই সে ছেলেবেলায় মানুষ করেছে। সুতরাং এরকম একটা ধমক খেয়েও কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে বল্লে, "তাত দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু কাঁচের বোয়েম তুমি পেলে কোথায়, নিয়ে যাচ্ছই বা কোনখানে!"

"যেখানে খুশি যাচ্চি, তোমার কি?"

"আচ্ছা চল তাহলে মা'র কাছে", বলে লালজিয়া বামাল সমেত চোরকে অবলীলাক্রমে কোলে তুলে নিয়ে একেবারে মা'র কাছে গিয়ে হাজির হল। পৃথিবীর আশ্চর্য্যতম চিড়িয়াখানার অন্যতম মালিকের হাত-পা ছোঁড়া চীৎকার প্রভৃতির কোন মূল্যই তার কাছে নেই দেখা গেল।

মা সব দেখে শুনে ত অবাক। জিজ্ঞেস করলেন, "সে কিরে! ওটা নিয়ে যাচ্ছিলি কোথায়!"

সমস্ত রাগ তখন আমার মামার ওপর গিয়ে পড়েছে। এমন একটা বিপদের মুহূর্ত্তে সে কিনা একেবারে গা ঢাকা দিলে! গায়ের ঝাল মেটাবার জন্যে অম্লানবদনে বিশ্বাস্‌-ঘাতকতা করে বল্লাম, "মামা নিয়ে যেতে বলেছিল।"

"কে বলেছিল, বীরু?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"ইঁদুর রাখবে বলে।"

"বোয়েমে ইঁদুর রাখবে কিরে!" এই না বলেই সকলের

সে কি হাসি ! এ-কথায় এত হাসির যে কী থাকতে পারে তা সত্যি আমার বুদ্ধির অতীত। বাড়িশুদ্ধ সবাই হেসেই খুন। হাসির তোড়ে আমার শাস্তিটা ভেসে গেল বটে কিন্তু আমি তাতে মোটেই খুশি হলাম কেউ যেন মনে না করে। এত বড় একটা পরিকল্পনার এমন অপমানের চেয়ে দুটো কানমলা খাওয়া আমার কাছে ঢের ভালো ছিল।

মামার সঙ্গে তার খানিক পরেই অবশ্য দেখা হয়েছিল। কিন্তু রাগ করে ঝগড়া করবার ফুরসৎ আর হয়নি। মামা তখন আর একটা আশ্চর্য্য জিনিষ আবিষ্কার করে এসেছে। চিড়িয়াখানা তৈরী-করা তার তুলনায় কিছুই নয়। থার্মোমিটারের খোল থেকে কী করে সত্যিকার ফাউন্টেন-পেন বানান যায় সে বিদ্যা তখন তার আয়ত্ত। এরকম প্রতিভাবান লোকের ওপর কতক্ষণ রাগ করা যায়! যখন শুনলাম সারা সকাল এই নতুন বিদ্যা নিয়ে পরীক্ষা করার দরুণই সে আমায় সাহায্য করতে আসতে পারেনি তখন এক মুহূর্ত্তেই তাকে ক্ষমা করে ফেললাম। ফাউন্টেনপেন বানিয়ে সকলকে থ করে দেবার উৎসাহে দুজনেই একমত হয়ে গেলাম যে চিড়িয়াখানা ব্যাপারটা নেহাৎই ছেলে-মানুষী। কেঁচো কখনও সাপ হতে পারে, না মিনি বেড়ালকে কেউ কখনও বাঘ বলে ভুল করে? এসব ছেলেখেলার অনেক ওপরে আমরা উঠে গেছি বুঝতে পেরে বেশ একটু গর্ব্ব অনুভব করলাম এবং পাছে এই ছেলে-মানুষী দুর্ব্বলতা কখনো আবার পেয়ে বসে সেই ভয়ে হঠাৎ অত্যন্ত উদার হয়ে চিড়িয়াখানার যাবতীয় প্রাণীকে মুক্ত করে দিলাম এক সঙ্গে।

যাক, এইবার আমাদের ফাউন্টেন তৈরীর তপস্যার আর বিঘ্ন হবার নয়। কিন্তু ফাউন্টেনপেনের জন্যে একটি জিনিষ প্রয়োজন—সেটি হল থার্মোমিটারের খোল। মামা অতি কষ্টে একটা ভাঙা থার্মোমিটারের খোল জোগাড় করেছে কিন্তু আর একটি খোল নইলে আমার চলে কী করে! অথচ থার্মোমিটার এমন একটা বিশ্রী জিনিষ যে বাড়িতে রোজ রোজ ভাঙেনা, কবে ভাঙবে তার জন্যে অপেক্ষা করার ধৈর্য্যও আমাদের নেই। সুতরাং অনেক গবেষণার পর ঠিক করা গেল মা'র হাতবাক্সে যে থার্মো-মিটারটি আছে বলে জানি কোন এক সুযোগে সেটিকে নিরাবরণ করে ফেলতে হবে। খোলের মধ্যে না থাকলে থার্মোমিটারের বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় বলে ত মনে হয় না। তা ছাড়া ফাউন্টেনপেন তৈরীর মত এতবড় একটা মহৎ কাজের জন্যে সামান্য একটু চুরি কী এমন দোষের!

হাত বাক্সটায় কখন মা চাবি দিয়ে যেতে ভুলে যায় সেই তক্কেই রইলাম।

কবিতা

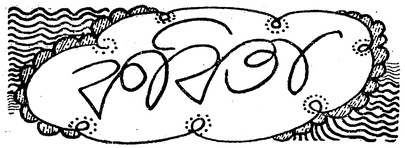

সোনার বরণ চিল

অমল চট্টোপাধ্যায়

সবুজে সবুজ, আহা,
নীলে নীলে নীল,
তারই মাঝে যাচ্ছে উড়ে
সোনার বরণ চিল।

সোনার বরণ রাজকন্যে
কাজল বরণ কেশ,
তাহার খোঁজে যায় কি গো চিল
সাগর পারের দেশ ?

ঘরে আছে কাজলা-দিদি
দুধে আলতা গা,
মুখখানি পটের শোভা
রাঙা দুটি পা।
দুটি ঠোঁটে মিষ্টি হাসি
আলো ঝিলমিল,
এমন দিদি যাচ্ছে ফেলে
কেমন সে গো চিল !

সবুজে সবুজ, আহা,
নীলে নীলে নীল।

শ্বেত-চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

রমেনবাবুর মাস্টারমশাই

শ্রীরামপুরে অঘোরবাবুর বাড়িটি ছোট্ট। একতলায় শাক-সবজির গাছ লাগিয়েছেন। সমস্ত জীবন কেটেছে
দুটি তিনেক ঘর, দোতলায় ছোটো একটি চিলে-কুঠরি। তাঁর ছাত্র পড়িয়ে। এখন বয়স বেড়েছে বলে ছাত্র
ভিতর দিকে খানিকটা জমি। সেই জমিতে তিনি আর পড়ান না। এই ছোটো বাগান নিয়েই থাকেন।

সঞ্জীব যখন পৌঁছলো সবে তখন তিনি বাগানের কাজ সেরে, স্নানাহার শেষ করে, ভিতর দিকের বারান্দায় ইজিচেয়ারে বসে গড়গড়ায় তামাক্ টানছিলেন।

মানুষটি ছোট্ট, একমাথা টাক, ঘাড়ের দিকের চুলগুলি ধবধবে শাদা। গায়ের রঙ তামাটে। শরীর শীর্ণ ই বলা যায়। সেই ছোট্টখাট্ট বৃদ্ধ মানুষটির চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা সবচেয়ে আগে নজরে পড়ে। সেই মোটা ফ্রেমের চশমার পুরু কাঁচের তলায় অঘোরবাবুর চোখ দুটিকে যেন অস্বাভাবিক রকম বড় দেখায়।

তাঁর ইজিচেয়ারের পাশের মোড়ায় বসে সঞ্জীব ধীরে-ধীরে তাঁকে রমেণের মৃত্যুসংবাদ জানালো। গতকাল রাত্রের ঐ দুর্ঘটনার কথা আজকের সব কাগজেই ছাপা হয়েছে। কিন্তু অঘোরবাবু কাগজ পড়েন খাওয়া-দাওয়ার পর দুপুরবেলায়, তাই সঞ্জীবের কাছে শোনার আগে অঘোরবাবু এই দুর্ঘটনার খবর জানতেন না।

সমস্ত শুনে এই বৃদ্ধের চোখ সজল হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ কোনো কথা তিনি বলতে পারলেন না। বার দুই শুধু পুরু ফ্রেমের চশমাটা খুলে নিজের চোখ দুটি মুছলেন। রমেন তাঁর অতি প্রিয় ছাত্রদের মধ্যে একজন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁকে জানতেন। এই বৃদ্ধ বয়সে হঠাৎ তাঁর মৃত্যুসংবাদ অঘোরবাবুকে একেবারে অভিভূত করে ফেললো।

সঞ্জীব আরো খানিক চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস জয়ন্ত আর রমেনবাবুর হত্যাকারী একই লোক। আর রমেনবাবুর মৃত্যুতেই সেই হত্যাকারী যে থামবে তা নয়, নিশ্চয়ই ভবিষ্যতে আরো অনেককেই হত্যা করতে চেষ্টা করবে। ভবিষ্যতে ঠিক কার জীবন যে বিপন্ন সে-কথা আমরা এখনো জানি না বটে, তবে শিগগীরই যে জানতে পারবো তাতে সন্দেহ নেই। কারণ এই হত্যাকারী বরাবরই দেখছি হত্যার ঠিক আগেই একটি খামে করে নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পাঠায়। সেই শাদা চাক্তি পৌঁছবার পর হত্যার কাজ সে চালায়। তিন নম্বরের শাদা চাক্তি যিনি পাবেন তখুনি নিশ্চয়ই তিনি সেই চাক্তিসমেত পুলিশের শরণাপন্ন হবেন। কিন্তু এই অদৃশ্য হত্যাকারী এতো চালাক আর তার বন্দোবস্ত এতো নিখুঁত যে এই ধরণের সম্ভাবনার কথা জানা সত্ত্বেও মোটেই সে ভয় পায় না। সে যেন নিঃশব্দে পুলিশকে এই লড়াইতে ডাকছে আর দেখিয়ে দিতে চাইছে তার ফর্দে যাদের নাম আছে তাদের রক্ষা করতে পারে পৃথিবীতে এমন কোনো ক্ষমতাই নেই!"

"কিন্তু কে সেই অদ্ভুত হত্যাকারী?" ভাঙা-গলায় অঘোরবাবু প্রশ্ন করলেন, "কেনই বা সে হত্যা করতে চায়? হঠাৎ সে পাগল হোলো নাকি?"

উত্তরে সঞ্জীব বললো, "সেই হত্যাকারী কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের লোক কিনা এ-কথা আমিও বহুবার ভেবেছি। ক্ষেপে গিয়ে একটির পর একটি লোককে খুন করে চলেছে এ-রকম পাগলের দৃষ্টান্তও অজানা নয়। কিন্তু যার মাথা একদিকে এতো সূক্ষ্ম হিসেব করে চলেছে তারই মাথা আবার অন্যদিকে বিকৃত এটা ভাবা কঠিন নয় কি? যে পাগল সে-পাগলই; সে খুন করতে চাইলে পাগলের মতোই খুন করে চলবে—এমন হিসেব করে প্ল্যান করে খুন করতে যাবে কেন সে? আর পারবেই বা কেন? আমার কথা হচ্ছে, যার মাথার ভেত গোলমাল হয়ে গেছে—তার সমস্ত কাজের ভেতরেও সে গোলমালের আভাস থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে কোনো রকম গোলমালের আভাস দেখছিই না, বরঞ্চ চর ধূর্ততার উদাহরণ পাচ্ছি তার কাজের মধ্যে। জয়ন্ত' হত্যাকাণ্ডের কথাটাই ধরুন না। তাকে মিথ্যে চি দিয়ে ফাঁকা বাড়িতে টেনে আনা, শিখ সেজে সে বাড়ির চোরা-কুঠরিতে বিষাক্ত বোমা রেখে আসা, টেলি ফোনে জয়ন্তকে চাবি দেবার ব্যবস্থা করা—এ-সব কি কোনো পাগলের কাজ? ওই রকম কোনো অদ্ভুত বো বানানো কি বিকৃত মস্তিষ্কের পক্ষে সম্ভব? কখনই না।"

ভালো করে এইসব কথা ভাবলেন অঘোরবা

তারপর বললেন, "তোমার কথাই ঠিক বলে মনে হচ্ছে। এ কোনো বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় নয়। বরঞ্চ ঠিক তার উল্টোটাই। কিন্তু কে সেই লোক?" শেষের প্রশ্নটি অঘোরবাবু সঞ্জীবকে করলেন না, অনেকটা যেন নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করলেন।

সঞ্জীব বললো, "হত্যাকারী কে বলা এখন পর্যন্ত অসম্ভব। কিন্তু কেন সে হত্যা করছে সেটা ভালো করে ভাবা আগে দরকার। তার উদ্দেশ্যটা কী? যতই এই উদ্দেশ্যের কথা ভাবছি ততই সমস্ত ব্যাপারটা যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। কারণ জয়ন্তকে যে হত্যা করেছে সেই একই লোক হত্যা করেছে রমেনবাবুকে। অথচ শোনা গেছে জয়ন্ত মোটেই সুবিধের লোক ছিলো না। চোরামাল কেনাবেচাই ছিলো তার ব্যবসা। অথচ রমেনবাবু বই ছাড়া জীবনে আর কিছু জানতেন না, চোরাই মালের ব্যবসা করার প্রশ্ন তো তাঁর ক্ষেত্রে উঠতেই পারে না। তাই আমার সবচেয়ে আশ্চর্য্য লাগছে যে-লোক জয়ন্তকে শত্রু মনে করে, সেই লোক কী করে রমেনবাবুকে মনে করে শত্রু? এই প্রশ্নের সমাধান করতেই এসেছি আপনার কাছে। আমার সঙ্গে রমেনবাবুর যতদিনকার পরিচয় তার মধ্যে একদিনও তাঁর মুখে জয়ন্তর নাম শুনিনি। অনেকের কাছে খবরও নিয়েছি। কিন্তু কেউই বলতে পারলো না কোনো সূত্রে রমেনবাবুর মুখে জয়ন্তর নাম শোনা গেছে বলে। আপনি বহুকাল ধরে রমেনবাবুকে চেনেন। তাই ভাবলুম আপনার কাছে একবার খোঁজ নিয়ে যাই।"

ইজিচেয়ার ছেড়ে অঘোরবাবু বারান্দায় পায়চারি করতে সুরু করলেন। সঞ্জীব কোনো প্রশ্ন না করে চুপ করে বসে রইলো। এই বৃদ্ধ মানুষটি যে গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন স্পষ্টই সে-কথা বোঝা যায়।

বেশ খানিকক্ষণ অঘোরবাবু পায়চারি করলেন। শেষে একটু ক্লান্ত হয়েই ইজিচেয়ারে আবার আশ্রয় নিয়ে বললেন, "নাঃ, বুড়ো হচ্ছি, সব কথা ঠিক সময়ে মনে পড়ে না! কিন্তু রমেনের সব কথা তো মনে পড়া উচিত। সব সময়েই দেখেছি তাকে চোখের ওপর। জীবনে যখনই যা কিছু করতে গেছে সবচেয়ে আগে এসেছে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে। যখনি বিপদে পড়েছে তখনি আগে ছুটে এসেছে আমার কাছে—"

বাধা দিয়ে সঞ্জীব বললো, "বিপদে পড়েছেন? কী ধরণের বিপদ?"

হেসে অঘোরবাবু বললেন, "না-না, কোনো বিশেষ ধরণের বিপদ নয়! নিতান্ত সাধারণ সব বিপদ, বেঁচে থাকতে গেলেই গেরস্ত মানুষদের যে-সব বিপদ আসে —অসুখ-বিসুখ, টাকার অভাব, ব্যবসার ব্যাপার—এইসব আর কি।"

একটু হতাশ হয়েই সঞ্জীব বললো, "কোনো অসাধারণ ঘটনা রমেনবাবুর জীবনে কোনোদিন ঘটেনি?"

মাথা নাড়তে-নাড়তে অঘোরবাবু উত্তর দিলেন, "না, কোনো অসাধারণ ঘটনাই নয়। এমন কি ফুটবল খেলতে গিয়ে হাত-পা ভাঙা বা সাইকেল চাপা পড়ার মতো ঘটনাও তার জীবনে কোনোদিন ঘটেনি। নিতান্ত সহজ, সরল জীবন। শুধু একবার—সে বহু বছর আগেকার কথা—একবার হঠাৎ তাকে এক মামলার ব্যাপারে জুরি হতে হয়েছিলো। এই জুরি হবার ব্যাপারটাকে যদি খানিকটা অসাধারণ বলো। তা জুরি তো যে-কোনো লোকই হতে পারে—পাটগুদমের মালিক থেকে, সরকারি চাকুরে থেকে, ইস্কুল মাস্টার থেকে, আলু-বেগুনের কারবারীর পর্যন্ত জুরি হতে কোনো রকম বাধা নেই।—কিন্তু রমেনের জীবন এমন সোজা সহজ পথে বয়ে গেছে যাতে এই জুরি হওয়াটাকেই খানিকটা অসাধারণ ঘটনা বলতে পারো। অনেক কাল আগেকার কথা—কিন্তু সমস্ত ঘটনাই আমার মনে আছে। কে যেন এক ডাক্তার ছিলো। সে নাকি তার কোন এক রোগী বন্ধুকে মেরে ফেলেছিলো। তারই বিচারের জুরি হয়েছিলো রমেন। আরও ছ'জন জুরি ছিলেন রমেন

ছাড়া।—তাইতো! দাঁড়াও—" বলতে-বলতে অঘোর-বাবুর শান্ত মুখের মধ্যে হঠাৎ যেন বিদ্যুৎ খেলে গেলো। পেয়েছেন, এতোক্ষণে খুঁজে পেয়েছেন তিনি! অবাক বিস্ময়ে সঞ্জীব দেখতে লাগলো: বৃদ্ধের কপালের শিরাগুলো উত্তেজনায় দপ-দপ করছে, মোটা কাঁচের চশমার পিছনে তাঁর চেখ দুটি যেন আরো বড়-বড় হয়ে উঠেছে। হঠাৎ তিনি যেন একেবারে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন—উৎসাহে, উত্তেজনায় তাঁর বয়স যেন অনেক কমে গেছে।

প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন অঘোরবাবু, "ঠিক কথা! পেয়েছি সঞ্জীব, পেয়েছি। এতোক্ষণে মনে পড়েছে সব কথা। রমেন আর ছ'জন জুরি ছিলেন সেই মামলায়। তাঁদের নামগুলো অনেকবার রমেনের কাছে শুনেছি—জয়ন্ত, অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ, আসানুল আর মাধব।"

এইবার উত্তেজিত হবার পালা সঞ্জীবের। মাধবও ছিলো ঐ জুরিদের মধ্যে একজন? তার বাবা মাধব! ধীরে-ধীরে তারও আবছা মনে পড়লো বহুকাল আগে রমেনের কাছে সে-ও যেন শুনেছিলো এই কথা: তিনি আর সঞ্জীবের বাবা এক মামলার ব্যাপারে জুরি ছিলেন। সেই থেকেই তাঁদের দুজনের পরিচয়। তারপর বহু বছর কেটে গেছে। দু'জনে গিয়েছেন দু'পথে। একজনের মনিহারি দোকান, আর একজনের দোকান বই-এর। মাধব আর রমেনের মধ্যে দেখাশুনো বড় একটা আর হয়নি। সঞ্জীব তাঁদের মধ্যে শুধু যোগসূত্র এতদিন বজায় রেখেছে।

কিন্তু বহুকাল আগে যে-মামলার সূত্রে একদিন এঁরা পরিচিত হয়েছিলেন সেই মামলার কথা কোনোদিনই সঞ্জীব জিগগেস করা প্রয়োজন মনে করেনি। এতোদিন পরে আজ সেই মামলার ব্যাপারটাই সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এতোদিন পরে সে-কথা কি কারুর মনে থাকা সম্ভব?

নিজের মনের সমস্ত উত্তেজনা দমন করে সঞ্জীব শুধু প্রশ্ন করলো, "কিন্তু মামলাটা কিসের? কার বিরুদ্ধে মামলা? আপনি কিছু জানেন নাকি?"

ইজিচেয়ারে অঘোরবাবুর দেহ শিথিল হয়ে এসেছে। পুরু কাঁচের ওপাশে তাঁর দুটি চোখ বোজা। তিনি মৃদু-মৃদু শুধু হাসছেন! সঞ্জীবের মনে হোলো এই মুহূর্তে অঘোরবাবুর মনে আর কোনো চিন্তা নেই। বহুকাল আগেকার ঘটনার মধ্যে একেবারেই তিনি ডুবে গিয়েছেন।

সত্যিই তাই, সঞ্জীব ভুল করেনি। তার প্রশ্ন শুনে তিনি চোখ খুললেন না। ইজিচেয়ারে শরীর ঢেলে যেমন শুয়েছিলেন তেমনিই রইলেন। সঞ্জীব রুদ্ধ নিশ্বেসে অঘোরবাবুর কথা শুনে যেতে লাগলো।

"জানি না?" অঘোরবাবু বলে চললেন, "নিশ্চয়ই জানি। কতবার রমেনের মুখে ঐ ঘটনার কথা শুনেছি, তা ছাড়া খবরের কাগজেও ব্যাপারটা নিয়ে তখন কম তোলপাড় হয়নি। দেখো, ঠিক বলে যেতে পারি কিনা:

"আসামীর নাম ছিলো মৃত্যুঞ্জয় পালিত। তিনি ছিলেন ডাক্তার। তাঁর এক বন্ধু ছিলেন, নাম সত্যেন রায়। সত্যেন ছিলেন মস্ত ধনী লোক। নিজের পাটের ব্যবসায় অনেক টাকা করেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয় আর সত্যেন ছিলেন ছেলেবেলার বন্ধু। মৃত্যুঞ্জয় গেলেন ডাক্তারীতে আর বি-এ পাস করে সত্যেন ঢুকলেন ব্যবসায়। দুজনই খুব উন্নতি করলেন: একজন ডাক্তার হিসেবে আর একজন ব্যবসায়ী হিসেবে। বড় হবার পর অনেক ছেলেবেলার বন্ধুরা যেমন হারিয়ে যায়, পরস্পরের কাছ থেকে সরে যায় দূরে—তাঁদের মধ্যে কিন্তু সে-রকম কোনো ছাড়াছাড়িই হয়নি। বরঞ্চ বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁদের বন্ধুত্ব যেন আরো গভীর হয়ে উঠেছিলো।

"মৃত্যুঞ্জয় সত্যেনের সব অসুখেই চিকিৎসা করতেন। নামী ডাক্তার হওয়া হত্ত্বেও সত্যেনের বাড়িতে প্রতিদিন তিনি অনেকটা করে সময় কাটাতে যে পারতেন তার কারণ শুধু পরস্পরের মধ্যে বন্ধুত্বই নয়: সত্যেন ছিলেন বরাবরই অত্যন্ত রুগ্ন গোছের। আজ এটা কাল সেটা তাঁর লেগেই আছে। নিজের অসুখে সত্যেন যেমন অন্য কোনো

ডাক্তারের চিকিৎসায় থাকতে চাইতেন না, মৃত্যুঞ্জয়ও সে-রকম চাইতেন না অন্য কারুর হাতে সত্যেনের চিকিৎসার ভার দিতে।

"ঐ কেসের বিচার আরম্ভ হবার প্রায় বছর দেড়েক আগে সত্যেনকে একদিন ভালো করে পরীক্ষা করার পর মৃত্যুঞ্জয়ের মুখচোখ ভাবনায় কালো হয়ে উঠলো। তিনি বিচক্ষণ ডাক্তার, বুঝতে তাঁর দেরী হোলো না তাঁর বন্ধুর আসল অসুখটা আর কিছুই নয়, ক্যান্সার! অনেক দিন থেকেই এই ভয়ই তিনি করছিলেন। কিন্তু এতোদিন কোনো স্পষ্ট প্রমাণ পাননি, সেইদিন পেলেন। এই ভয়ঙ্কর অসুখের কথা সত্যেনের কাছে তিনি গোপন করতে পারলেন না। বলতে হোলো সত্যেনের অসুখ একেবারে সেরে যাবার সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। তবে একটা অপারেশন করে দেখা যেতে পারে। কিন্তু অপারেশনের পর ঐ বিষাক্ত ঘা যে আবার হবে না এ-রকম কথা কেউ জোর করে বলতে পারে না।

"সমস্ত ঘটনা শুনে সত্যেন অপারেশন করাবেন বলেই ঠিক করলেন। হোলোও অপারেশন। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় যা ভয় করেছিলেন ঠিক তাই হোলো। আবার দেখা দিলো সেই মারাত্মক ঘা।

"সত্যেন নিজে কোনো লুকোচুরি পছন্দ করতেন না। তাই ঐ রোগ আবার দেখা দেবার পর মৃত্যুঞ্জয়কে সোজা তিনি প্রশ্ন করলেন তাঁর সারবার কোনো উপায় আছে কিনা আর যদি না থাকে তা হলে কতদিন তিনি বাঁচবেন বলে মৃত্যুঞ্জয় মনে করেন। ডাক্তার হয়ে রোগীকে তার জীবনের কোনো আশা নেই জানানো বড় সহজ কথা নয়, বিশেষ করে মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে তো তা হয়ইনি—কারণ রোগী তাঁর পরম বন্ধু। তবু কথাটা তিনি চেপে রাখতে পারলেন না। সত্যেনের বহু প্রশ্নের উত্তরে ধীরে-ধীরে সব কথাই তাঁকে প্রকাশ করতে হোলো। তিনি জানালেন এই অসুখের হাত থেকে সত্যেনের ভালো হয়ে ওঠবার কোনো রকম সম্ভাবনাই নেই—তাঁর জীবনের শেষ দিন আসতে ছয় থেকে বড় জোর মাস দশেকে বাকী।

"এর পর থেকে মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্র্যাকটিস ইচ্ছে করেই যেন কমিয়ে ফেললেন। অধিকাংশ সময় তাঁর কাটতো সত্যেনের বিছানার পাশে। সত্যেনের নিকট আত্মীয় বলতে গেলে কেউই ছিলো না। মৃত্যুঞ্জয় একাধারে বন্ধু, আত্মীয় এবং ডাক্তারের সব কাজ করে চললেন।

"কিন্তু মাসখানেক বাদেই দেখা গেলো সত্যেনের অসুখ যত তাড়াতাড়ি বাড়বে বলে মৃত্যুঞ্জয় মনে করে-ছিলেন তার চেয়ে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি অসুখটা বাড়ছে। যন্ত্রণার হাত থেকে রোগীকে বাঁচানোর জন্যে মৃত্যুঞ্জয় ঘন-ঘন মর্ফিয়া দিতে লাগলেন। ফলে অধিকাংশ সময়েই সত্যেন থাকতেন অজ্ঞান হয়ে। মৃত্যুঞ্জয় নিজের কাজে প্রায় বেরুতেনই না। থাকতেন সত্যেনের বিছানার পাশে। অল্পক্ষণের জন্যে জ্ঞান হলে সত্যেন দেখতেন তাঁর ঘরে মৃত্যুঞ্জয় আর এক নার্স আছেন। তাঁদের সঙ্গেই যা সামান্য কথাবার্তা বলতেন সত্যেন।

"আরো মাস খানেক পরে হোলো সত্যেনের মৃত্যু। মৃত্যুর আগে যে-মর্ফিয়া ইনজেকসন দেওয়া হয়েছিলো তারপর আর তাঁর জ্ঞান হয়নি। মর্ফিয়ার আচ্ছন্ন অবস্থা থেকে ধীরে-ধীরে মৃত্যুর দেশে তিনি চলে গেলেন। সত্যেনের অতি দূর সম্পর্কের এক ভাই ছিলো, তার নাম রামপদ। সত্যেনের মৃত্যুর দিন পনেরো আগে থেকে সে এসে ছিলো। সে ছাড়া সত্যেনের আর কোনো আত্মীয় ছিলো না। সত্যেনের মৃত্যুর পর মৃত্যুঞ্জয় রামপদকে ডেকে বললেন যে তিনি বাড়ি থেকে প্রয়োজনীয় 'ডেথ সার্টিফিকেট' লিখে আনতে যাচ্ছেন। কিন্তু বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছবার পর অন্যমনস্ক হয়ে চলার জন্যে তিনি একটা গাড়ি চাপা পড়েন। অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ার জন্যে খুব জখম হয়েছিলেন এবং সেইখানেই তাঁর জ্ঞান লোপ পায়। রাস্তার লোক ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে যায়। নিজের বাড়িতে প্রায় দিন সাতেক তিনি অজ্ঞান হয়ে ছিলেন। যখন জ্ঞান হোলো মৃত্যুঞ্জয় দেখলেন তাঁর বাড়ি পুলিশের কবলে রয়েছে।

"সত্যেনের ভাই রামপদ মৃত্যুঞ্জয়ের অসুস্থতার খবর পেয়ে 'ডেথ সার্টিফিকেটে'র জন্যে অন্য এক ডাক্তার ডাকে। মৃতদেহ দেখে এবং অসুস্থতার সমস্ত বিবরণ শুনে সেই ডাক্তারের কেমন যেন সন্দেহ হয়। তিনি পুলিশে খবর দিয়ে সত্যেনের মৃতদেহকে মর্গে পাঠান এবং সেখানে পোস্ট মর্টেম পরীক্ষার পর জানা যায় অতিরিক্ত পরিমাণ মর্ফিয়া ইনজেকশনের দরুন সত্যেনের মৃত্যু হয়েছে। ডাক্তাররা জানালেন সত্যেন অন্তত আরো বছর খানেক বাঁচতে পারতেন। ফলে খুনীর আসামী হিসেবে মৃত্যুঞ্জয়কে ধরবার জন্যে সঙ্গে-সঙ্গে পুলিসের লোক তাঁর বাড়ি ছোটে।

"এদিকে সত্যেনের উইলে দেখা যায় তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়ে গেছেন। মৃত্যুর মাস খানেক আগে সেই উইল তৈরি হয়েছিলো।

"মৃত্যুঞ্জয়ের বিরুদ্ধে নর-হত্যার মামলা রুজু হোলো। সরকার পক্ষের উকিল বললেন মৃত্যুঞ্জয় সত্যেনের উইলের কথা জানতেন। ফলে সত্যেন সজ্ঞানে থাকলে পাছে নিজের মত বদলে সমস্ত সম্পত্তি অন্য কাউকে দিয়ে দেন এই ভয়েই মৃত্যুঞ্জয় তাঁকে ক্রমাগত মর্ফিয়া দিয়া আচ্ছন্ন করে রাখতেন। এবং তাড়াতাড়ি সম্পত্তি পাবার জন্যে শেষটায় অতিরিক্ত পরিমাণ মর্ফিয়া ইনজেক্ট করে তিনি সত্যেনকে হত্যা করেন।

"কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের উকিল জানালেন অন্য কথা। তিনি বললেন মৃত্যুঞ্জয় যে অতিরিক্ত মর্ফিয়া দিয়ে সত্যেনের মৃত্যু ঘটিয়েছেন তাতে কোনো ভুল নেই। কিন্তু ঐ পরিমাণ মর্ফিয়া দেওয়া হয়েছিলো সত্যেনের আদেশে এবং ইচ্ছেয়। ইতিমধ্যেই সত্যেন অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন এবং তাঁর দেহে অস্ত্রপোচার করাও হয়েছিলো। আর যন্ত্রণা ভোগ করতে তিনি একেবারেই রাজী ছিলেন না। তাই মৃত্যুঞ্জয়ের মুখে তাঁর জীবনের আর কোনো রকম আশা নেই শোনার পর থেকে সত্যেন বারবার তাঁর বন্ধুকে অনুরোধ জানান ঐ মর্মান্তিক যন্ত্রণায় হাত থেকে তাঁকে বাঁচাতে, মর্ফিয়া দিয়ে তাঁকে চিরকালের মতো ঘুম পাড়িয়ে দিতে। সত্যেন বারবার বলতেন তাঁর মৃত্যু হলে কারুরই কোনো ক্ষতি নেই—কারণ আত্মীয়-স্বজন বলতে কেউই নেই তাঁর। মৃত্যুঞ্জয় প্রথমে তাঁর বন্ধুর কথায় কানই দেননি। কিন্তু শেষে সত্যেন একদিন জানালেন মৃত্যুঞ্জয় তাঁকে মর্ফিয়া দিতে রাজী না হলে যেমন করে হোক অন্য উপায়ে আত্মহত্যা তিনি করবেনই। মৃত্যুঞ্জয় অনেক ভাবলেন। তিনি নিজে অত্যন্ত বিচক্ষণ ডাক্তার। হিসেব করে দেখলেন সত্যেনের কথাই ঠিক—তাঁর তো বাঁচবার কোনো আশাই নেই, বরঞ্চ যে ক'মাস বেঁচে থাকবেন সে-ক'মাসই ভুগতে হবে অসহ্য যন্ত্রণায়। মৃত্যুঞ্জয় তাই ক্রমশ মর্ফিয়ার পরিমাণ লাগলেন বাড়াতে। শেষবার সত্যেনের জ্ঞান হবার পর দু' বন্ধুতে খানিক কথাবার্তা কইলেন। শেষে পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। মৃত্যুঞ্জয় দিলেন শেষ মর্ফিয়া ইনজেকশন। ঐ ইনজেকশনের ফলেই হোলো সত্যেনের মৃত্যু। মৃত্যুঞ্জয়ের উকিল জানলেন সত্যেন যে উইল করে সমস্ত সম্পত্তি মৃত্যুঞ্জয়কে দিয়ে গিয়েছেন এ-খবর ঘুণাক্ষরেও তিনি জানতেন না। এমন কি সত্যেনের কোনো উইল আছে কিনা সে-খবর জানতেও কোনোদিন তিনি চেষ্টা করেননি।

"মৃত্যুঞ্জয়ের মামলা নিয়ে চারদিকে সে-সময় দারুণ চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিলো। অধিকাংশ লোকই বলেছিলো মৃত্যুঞ্জয় ঠিক কাজই করেছেন, তাঁর মুক্তি পাওয়াই উচিত। কিন্তু ঐ মামলার জুরি মৃত্যুঞ্জয়কে অপরাধী সাব্যস্ত করলেন এবং জানালেন নরহত্যার জন্যে তাঁর ফাঁসি হওয়াই উচিত। আপিলে অবশ্য ফাঁসির বদলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ হোলো।"

এতোক্ষণ একটানা কথা বলে অঘোরবাবু থামলেন। মন্ত্রমুগ্ধর মতো শুনছিলো সঞ্জীব। এবার সে প্রশ্ন করলো, "কিন্তু তারপর কী হোলো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের? তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? নাকি জেলে রয়েছেন?"

অঘোরবাবু মাথা নাড়তে লাগলেন ধীরে-ধীরে। বললেন, "না সঞ্জীব, মৃত্যুঞ্জয় আর বেঁচে নেই। রমেনের ...ছে এতোবার তাঁর কথা শুনেছি যে ব্যাপারটা কোনো ...ন ভুলতে পারিনি। বছর দশেক আগে কাগজে ছোটো ...কটি খবর ছাপা হয়েছিলো। সেটা মনে থাকার কথা ...য় তবু মনে আছে তার কারণ বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয়ের মামলা ...য়ে এক সময়ে আমিও খুব মাথা ঘামিয়েছিলুম। রমেনের ...ঙ্গে সে-সময় প্রায়ই আমার তর্ক হোতো। রমেন বলতো ...ইন অনুসারে মৃত্যুঞ্জয়ের ফাঁসি হওয়াই উচিত ছিলো—...গী যন্ত্রণা পেলে তো আবোল-তাবোল কথা বলবেই, ...লবেই তো যন্ত্রণার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাই বলে ডাক্তার ...ক রোগীর কথা শুনে তাকে মেরে ফেলবে? এ-ক্ষেত্রে ...তো মৃত্যুঞ্জয় ঠিকই অনুমান করেছিলেন রোগী বেশি দিন ...চবে না। কিন্তু এমনো তো হাত পারে যে ডাক্তারের ...নুমান ভুল। কতবার তো দেখা গেছে যে ডাক্তার জবাব ...য়ে যাবার পরেও রোগী ক্রমশ সেরে উঠেছে। মৃত্যুঞ্জয়ের ...জা না হলে অন্যান্য ডাক্তারদের সাহস যাবে বেড়ে। ...নেকেই হয়তো ভুল করে যন্ত্রণার হাত থেকে রোগীদের ...ক্তি দেবার জন্যে তাদের হত্যা করবে। সমাজের পক্ষে ...টা ভালো কথা নয়। সেই জন্যেই, অন্তত যাতে ঐ ধরণের ...না আর না ঘটে, মৃত্যুঞ্জয়ের ফাঁসি হওয়াই উচিত। আমি ...লতুম হয়তো আইনের চোখে মৃত্যুঞ্জয় অপরাধী। কিন্তু ...ধু আইনের চোখ দিয়েই তো সব ব্যাপার দেখা উচিত নয়। ...নুষের চোখ দিয়ে দেখলে মৃত্যুঞ্জয়কে অপরাধী কোনো ...তেই বলা যায় না!—যাই হোক, এই একটি ব্যাপারে ...মেনের সঙ্গে কোনোদিন একমত হতে পারিনি। তাই ...ছর দশেক আগে যখন কাগজের এক কোণে খবর বেরুলো ...দেওঘরে মৃত্যুঞ্জয় নামে এক নজরবন্দী আসামীর আগুনে ...ড়ে মৃত্যু হয়েছে, ব্যাপারটা তখন অনেকেই লক্ষ্য না ...রলেও আমি বিশেষভাবেই লক্ষ্য করেছিলুম। খবরটা ...ব সংক্ষেপে ছাপা হয়েছিলো। ব্যাপারটা এই: মৃত্যুঞ্জয় ...রো বছর জেলে থাকার পর কর্তৃপক্ষ তাঁকে জেল থেকে ...ক্তি দিয়ে দেওঘরে নজরবন্দী করে রাখেন। মৃত্যুঞ্জয় সেখানে ...লা একটি ছোটো বাড়িতে, অত্যন্ত নিরিবিলি জায়গায়, থাকতে সুরু করেন। কারুর সঙ্গেই বড় একটা তিনি মিশতেন না, নিজের ছোটো-বাড়িতে শুধু পড়াশুনো করতেন আর করতেন নানা ধরণের ডাক্তারী পরীক্ষা। ঐ ছোটো বাড়ির মধ্যেই তিনি একটি কাজ-চালানো গোছের ল্যাবরেটরি বানিয়েছিলেন আর তাই নিয়েই থাকতেন ব্যস্ত। কারুর সঙ্গেই তিনি মিশতেন না, কেউ আলাপ করতে এলে তেড়ে যেতেন। সমস্ত মানুষই যেন তাঁর শত্রু—এই রকম ছিলো একটা ভাব। সপ্তাহে শুধু একবার সেখানকার থানায় গিয়ে তিনি হাজিরা দিয়ে আসতেন।—একদিন মাঝরাত্রে হঠাৎ দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয়ের ছোটো বাড়িটা দাউ-দাউ করে জ্বলছে। বাড়িটা এতো দূরে আর জলের এতো অভাব যে নেভানো সম্ভব হোলো না। পরের দিন সকালে আগুন আপনা থেকে নেভবার পর পুলিশের লোকেরা খুঁজে দেখলো বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুধু কয়লার মতো কালো কতগুলো পোড়া হাড় রয়েছে আর রয়েছে খানিকটা গলা সোনা। মৃত্যুঞ্জয়ের হাতে একটি সোনার আংটি সর্বদা থাকতো। পুলিশের লোকরা অনুমান করে ঐ হাড় এবং সোনা মৃত্যুঞ্জয়েরই শেষ চিহ্ন।"

সমস্ত দিনটা বেশ পরিষ্কার ছিলো। সন্ধের মুখে সঞ্জীব যখন অঘোরবাবুর বাড়ি থেকে বেরুলো ততক্ষণে আবার মেঘ করে এসেছে। ট্রেনে ওঠার পরেই বইতে লাগলো ঠাণ্ডা বাতাস, তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই নামলো তুমুল বৃষ্টি। হঠাৎ যেন রাত হয়ে গেলো। চারিদিক ঘিরে নামলো রাত্রির কালো ঢাকা। সঞ্জীব বুঝলো আজকের মতো দিনের আলোর এইখানেই শেষ। কাল সকালেও সূর্য উঠলে হয়।

সকালে সেই যে সঞ্জীব বেরিয়েছে তারপর থেকে এতোক্ষণ সে বাড়ির বাইরে। একটা খবরও দেওয়া হয়নি। হয়তো বাবা তার ভাবছে। তবে সে বলেই বেরিয়েছিলো ফিরতে তার দেরী হবে। এতো দেরী যে হবে সে-কথা অবশ্য তখনো সে ভাবতেই পারেনি।

অঘোরবাবুর কাছে ঐ অদ্ভুত মামলার কাহিনী শোনার পর থেকে তার যেন সমস্তটাই গোলমাল হয়ে গেছে। এখনো সে ভেবে ঠিক করতে পারছে না যাদের কাছে শাদা চাক্তি আসে তারা ঐ মামলার জুরি ছিলো কিনা। জয়ন্ত আর রমেনবাবু অবশ্য জুরি ছিলেন। কিন্তু এটা হয়তো ইংরিজিতে যাকে বলে এ্যাকসিডেণ্ট তাই। অন্তত আর একজন ঐ চাক্তি না পেলে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা ঠিক কি। মনে মনে ভাবতে লাগলো সঞ্জীব : এখনো বাকী আছেন অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ, আসানুল আর তার বাবা মাধব। তখনো সে জানে না মাধবের কাছে তিন নম্বর লেখা লেই শাদা চাক্তিটা সকালে সে বাড়ি ছেড়ে বেরুবার পরেই গেছে পৌঁছে!

সঞ্জীব ভাবতে লাগলো হাওড়া ইস্টিশানে পৌঁছতে প্রায় ন'টা—গাড়ি যদি লেট না করে। তারপর এই বৃষ্টির মধ্যে ট্রাম-বাসে সে যদি সোজা বাড়ি যায় তাহলেও অন্তত আরো এক ঘণ্টা। অর্থাৎ রাত দশটার আগে বাড়ি পৌঁছনো সম্ভব নয়। সাড়ে দশটা ধরে রাখাই ভালো। সোজা বাড়িতে গিয়ে তার বাবাকে সে প্রশ্ন করবে অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুলের ঠিকানা তিনি জানেন কিনা। তারপর কাল সকালেই বেরুবে ঐ ভদ্রলোকদের খোঁজে। তাঁদেরও খানিকটা সাবধান করে দেওয়া দরকার বৈকি। তবে তার কল্পনাটা নিতান্তই হয়তো আজগুবি। মৃত্যুঞ্জয় তো বহুদিন আগেই দেওঘরে মারা গেছেন। তিনি বেঁচে থাকলে আর বাইরে থাকলে তবু বরং কথা ছিলো। তা হলে কে এই হত্যাকারী?

সমস্ত দিনের উত্তেজনা আর পরিশ্রমের পর ট্রেনের ঢুলুনিতে তার ভারি ক্লান্ত লাগলো। আরাম করে বিছানায় একবার গড়িয়ে নিতে পারলে হোতো।... কারুর সঙ্গে যদি সে একবার ভালো করে পরামর্শ করতে পারতো। মেধো-বর্ণিত ওই শিখের কথাটাও ভেবে দেখা উচিত বৈকি। তার মনে হতে লাগলো অনেক কিছুই সে যেন জেনে গেছে, অথচ তাদের ঠিক মতে[া] জোড়া লাগাতে পারছে না। কোথায় যেন কো[ন] জিনিসটা গেছে হারিয়ে। সে কি রঞ্জিতকে সব কথ[া] খুলে বলবে? কিন্তু রঞ্জিতকে তার ভালো লাগে না[।] এমন করে তার দিকে তাকায় আর মাঝেমাঝে এম[ন] অদ্ভুত সুরে তাকে প্রশ্ন করে তাতে মনে হয় তাকে যে[ন] রঞ্জিত সন্দেহ করে। সে খুন করেছে?—ভাবতে-ভাবতে নিজের মনেই হাসলো সঞ্জীব। তার মতো চালা[ক] ছেলেকে কে ধরতে পারবে? কে পারবে তাকে বিপদে ফেলতে! তবে এক-এক সময় তার মনে হয় ব[...] রঞ্জিতটাকে শেষ করে দিলেই ভালো হয়। তার ঐ চাউনি আর বাঁকা-বাঁকা কথা সহ্য হয় না। সে তো দেখেইছে তাদের দোকানের টাইপরাটারে রঞ্জিতকে টাই[প] করতে, তাদের দোকানের লাল কালিতে দোকানে[র] কলম দিয়ে হিজিবিজি লিখতে। তারপর আরো লক্ষ্য করছে টাইপকরা সেই কাগজ আর লাল কালির সেই লেখ[া] তাকে কায়দা করে পকেটে পুরতে। রঞ্জিত ভেবেছ বুঝি কেউই তার চালাকী ধরতে পারেনি। সন্দেহ করেছে সেই চাক্তি পাঠাবার খামের উপরকার টাইপকরা লেখাট[া] তাদেরই মেশিনে ছাপা হয়েছে, সেই শাদা চাক্তি[র] উপরকার লালকালির সংখ্যাগুলো হয়েছে তাদের[ই] কালিতে লেখা। ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই নানা বৈজ্ঞানি[ক] উপায়ে সমস্ত পরীক্ষা সে শেষ করেছে! মনে-মনে সঞ্জীব আবার হাসতে লাগলো! অত সহজ নাকি সম[স্ত] ব্যাপারটা! টাইপের অক্ষরগুলো যদিই বা মেলে, লা[ল] কালিটাও যদি এক বলে জানা যায়—তা হলেই ব[া] প্রমাণ কী হোলো? কে দেখেছে তাকে টাইপ করে ঐ শাদা চাক্তি পাঠাতে? কে দেখেছে তাকে শাদা চাক্তি[র] উপর লাল কালিতে ওই সংখ্যাগুলো বসাতে? কে দেখেছে তাকে সেই বিষাক্ত বাল্ব লাগাতে? কে দেখেছে তাকে রমেনের পিঠে ছুরি বসাতে? এ-সবে[র] উত্তর দেবে কে?

আসলে রঞ্জিতটার ঘটে এক ফোঁটাও বুদ্ধি নেই। সে ভুল পথে চলেছে। তার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেই নানা গোলমাল বাধবে। দরকার নেই তার। বরঞ্চ প্রবীন লোক ধনঞ্জয় কবিরাজ। আজ রাত্রেই তাঁর সঙ্গে দেখা করবে সঞ্জীব। তাঁর সঙ্গেই বরঞ্চ আলোচনা করবে। ভাবতে-ভাবতে ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এলো। মনে হোলো সমস্ত পরামর্শ-টরামর্শ বাজে। সবচেয়ে আগে দরকার শাদা নরম বিছানায় হাত-পা মেলে শুয়ে পড়ার!

[ক্রমশ]

বেদের কুকুর

প্রবোধ ঘোষ

আমাদের ডিটেক্‌টিভ্ ক্লাবের নাম 'শিবির'। তিনজন সভ্য : শিলা সেন (ইউনিভার্সিটির নাম করা ছাত্রী'), বিভূতি রায় (ডাক্তার) ও রবিশঙ্কর চৌধুরী (ইউনিভার্সিটির বিখ্যাত ছাত্র)। আমাদের প্রথম অক্ষর নিয়ে হয়েছে ক্লাবের নাম। ক্যামাক্ ষ্ট্রীটে শিলার বাড়ীতে সেদিন সন্ধ্যায় আমাদের বেশ আড্ডা জমে উঠেছে। আমাদের প্রধান অতিথি : ডিটেক্‌টিভ্ ইন্‌স্পেক্‌টর্ অমর লাহিড়ি। আমাদের দু-একটি বন্ধুও এসেছে। এম্-এ পরীক্ষায় ইংরিজীতে রবিশঙ্কর ও শিলা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে, আমিও ডাক্তারি পাশ করেছি। আমাদের ক্লাব্ বা অফিস্ থেকে এর মধ্যেই কয়েকটি তদন্ত করা হয়েছে। আমি ক্লাবের রিপোর্টার্ : শীঘ্রই আমাদের প্রথম কেস্ উপন্যাসের আকারে প্রকাশিত হবে।

অর্চা মজুমদার বল্‌ল : "একটা অদ্ভুত রকমের গল্প কেউ বলো, কিন্তু সত্যি ঘটনা হওয়া চাই।"

মালিনী চ্যাটার্জির ভাই কুণাল বলল : "অমরবাবু, আপনি নিশ্চয় বল্‌তে পারবেন—এতদিন অনেক কেস্ করেছেন।"

আমরা সকলেই তার কথায় সায় দিয়ে বল্‌লাম : "তথাস্তু।" অনেক আপত্তির পর অমরবাবু জিগেস্ করলেন : "কী রকম গল্প?"

শিলা বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে বল্‌ল : "বেশ বৃষ্টি আরম্ভ হয়েছে। এমন গল্প বলুন যা হবে ভৌতিক ও খৌনিক, মানে, ভূত ও খুন সংক্রান্ত দুই-ই।"

অমরবাবু সুরু করলেন :

"কলকাতা থেকে প্রায় পঞ্চাশ মাইল দূরে ব্যাপারটা ঘটে জমিদার যুধাজিৎ মল্লিকের বাড়ীতে। যুধাজিৎ মারা যান রাত্রি প্রায় দুটোর সময়ে : ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল, ঘরে ছিল শুধু যুধাজিতের প্রিয় খানসামা—একজন মুসলমান ক্রিশ্চান্ ইব্রাহিম্ পেরেরা।"

রবিশঙ্কর জিগেস করল : "ঘরে কোনোরকমে বাইরে থেকে ঢোকা সম্ভব ছিল না?"

অমরবাবু বললেন : "না।"

মালিনী চ্যাটার্জি বলল : "তাহলে তো বোঝাই যাচ্ছে। খানসামাই নিশ্চয় খুন করেছিল।"

"অনেকেই তাই মনে করেছিল। কিন্তু আমি তাকে

গ্রেপ্তার করিনি। সে এখন আমার এক বন্ধু রেলওয়ে অফিসার সত্যেন মৈত্রের খানসামা। ভারি চমৎকার রাঁধে।" অমরবাবু চুরুট টানতে লাগলেন। শিলার চাকর ভজুয়া দ্বিতীয়বার চা দিয়ে গেল।

"খানসামার কাছ থেকে যা শুনেছি ও নিজে যা দেখেছি তা থেকে গল্পের মতো করে গুছিয়ে তোমাদের কাছে বলছি।"

যুধাজিতের বাড়ীর সঙ্গে লাগানো প্রকাণ্ড মাঠ ও বাগান, চারদিকেই গাছপালা। তার পরেই গ্রামের সদর রাস্তা। জমিদার বাড়ী থেকে প্রায় এক মাইল দূরে একটা মাঠ; সেখানে একজন বেদে তাঁবু ফেলল। যুধাজিতের বয়স প্রায় পঞ্চাশ: স্ত্রী অনেক দিন আগেই মারা গেছেন, ছেলেমেয়ে নেই। প্রকাণ্ড বাড়ী খাঁ-খাঁ করছে, শুধু কয়েকজন ঝি-চাকর আর খানসামা ইব্রাহিম পেরেরা। সে-ই বাড়ীর দেখাশোনা করে।

ইব্রাহিম বলে যুধাজিতের মতো বদমেজাজি ও রাগী লোক দেখাই যায় না। বাড়ীতে ঝি-চাকর রাখা ভারি শক্ত, কিছুদিন কায করেই তারা একে একে সরে পড়ে। যেদিন যুধাজিৎ মারা যান সেদিন ঝি-চাকর কেউ ছিল না: আগেই তারা কায ছেড়ে দিয়েছিল।

আমি যখন তদন্ত করতে গেলাম তখন বেলা প্রায় তিনটে। গ্রামের কয়েকজন লোক সামনের মাঠে বসেছিল, আমাকে নিয়ে গেল জমিদারের শোবার ঘরে। একতলায় প্রকাণ্ড একটা ঘর, মাঠ থেকে প্রায় ছ ফিট্ উঁচুতে চারটে জানলা, নিচেই ফুলের বাগান, তারপর প্রকাণ্ড এক দিঘী। ঘরে বিছানার ওপর যুধাজিতের লাস পড়ে রয়েছে: চোখ দুটো খোলা, গলাটা কে যেন ছিঁড়ে ফেলেছে, বিছানার চাদরের ওপর চাপ চাপ রক্ত শুকিয়ে উঠেছে। ঘরে, মাঠে, বাড়ীর সব জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম; কিন্তু কোথাও এমন কোনো চিহ্ন পেলাম না যা থেকে এই মৃত্যুর রহস্য বোঝা যায়।

বিকেলের ম্লান সোনালি আলো সবুজ ঘাসের ওপর ছড়িয়ে আছে। আকাশের সূর্যও যেন অলস, যাই-যাই করেও যেতে পারছে না। ফুলের বাগান থেকে হাওয়ায় গন্ধ ভেসে আসছে, দিঘীর কালো জলে মাঝে মাঝে বড়ো বড়ো মাছ লাফিয়ে উঠছে। মাঠের এক কোণে এক দল শালিখ পাখীর জটলা, ঘাসের মধ্যে কয়েকটা কাঠবেড়ালীর ছুটোছুটি। ঘরের মধ্যে দুধের মতো শাদা বিছানায় পড়ে আছে যুধাজিতের মৃতদেহ। চোখদুটো যেন কোন অস্বাভাবিক ভয়ে ফেটে পড়ছে।

শুকনো মুখে ইব্রাহিম কাছে দাঁড়িয়েছিল। সে জানে সকলেই তাকে সন্দেহ করছে। কিন্তু আমার গোড়া থেকেই মনে হচ্ছিল যে সে এ কাজ করেনি। কেন করবে তাছাড়া তার কথা থেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে এই বদমেজাজি মনিবের ওপর আন্তরিক দরদ তার ছিল তার কাছ থেকে জানলাম কয়েকদিন আগে থেকেই যুধাজিৎ কেমন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। রাত্রি হলেই এই অস্থিরতা বেড়ে উঠত। খুনের রাত্রে ঘরে আলো জ্বলছিল—কয়েকদিন থেকেই কী এক অজানা ভয়ে তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন, আলো তাই সারা রাত জ্বালা থাকত।

রাত প্রায় দুটোর সময় হঠাৎ একটা চীৎকার শুনে ইব্রাহিম জেগে ওঠে—সে ঘরের মেঝের ওপরেই শুয়েছিল ঘুমের ঘোরেই বিছানার কাছে ছুটে গিয়ে সে দেখে যুধাজিৎ ছটফট করছেন—গলাটা যেন ছিঁড়ে গেছে, রক্তের স্রোত বয়ে চলেছে। ইব্রাহিম স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তার চোখের সামনেই আর একবার চীৎকার করে তার মনিব মারা গেলেন।

ঘরের দরজা বন্ধই ছিল ভেতর থেকে। শুধু একটা জানলা খোলা ছিল, কিন্তু সে জানলাতেও লোহার গরাদ। ইব্রাহিম বলল সে জেগে উঠে ঘরের মধ্যে কাকেও দেখতে পায়নি। অনেক জেরা করলাম তাকে। কাকেও সন্দেহ হয় তার? ঝি-চাকরদের কেউ এ কাজ করতে পারে?

কিন্তু সে কিছুই বলতে পারল না। বাইরে এসে গ্রামের লোকদের অনেক কথা জিগেস করলাম। তারা শুধু বললো যে ভোরবেলায় ইব্রাহিম তাদের ডেকে তুলেছে, পুলিশে খবর পাঠিয়েছে। খুন সম্বন্ধে তারা কিছুই জানেনা। যে সব ঝি-চাকর কায ছেড়ে দিয়ে চলে গেছে তাদের কাছ থেকে এরা শুনেছে যে জমিদারবাবু ভারি বদরাগী লোক ছিলেন। বাড়ীতে কিছুদিন থেকে ভূতের উপদ্রব নাকি আরম্ভ হয়েছিল, তাছাড়া কয়েকদিন থেকে রাত্রে তারা কুকুরের ডাক ও সেই সঙ্গে জমিদারবাবুর চীৎকারও শুনেছিল। এই সব ব্যাপারে ভয় পেয়ে তারা কায ছেড়ে দেয়।

আবার ঘরের ভেতরে এলাম। আবার ভালো করে খোঁজ করলাম। না, কোনোখানে কোনো চিহ্ন নেই। ইব্রাহিমকে গ্রেপ্তার করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কিন্তু মন বলছে ইব্রাহিম নির্দোষ। যে জানলাটা খোলা ছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়ালাম। আকাশের রঙ ধীরে ধীরে বদলে চলেছে, আর খানিকটা পরেই সন্ধ্যা হবে। বাইরের হাওয়া ঠাণ্ডা হয়ে আসছে, দলে দলে পাখী বাসায় ফিরতে আরম্ভ করেছে। ইব্রাহিম দরজার কাছে বসে আছে—সকাল থেকে কিছু খায়নি। বাইরে কাঠবেড়ালীদের খেলা তখন শেষ; দিঘীর জলে রঙীন আকাশের ছায়া পড়েছে। প্রকাণ্ড একটা মাছ লাফ দিয়ে উঠল, এক মুহূর্তের জন্য রুপালি আঁশ আলোয় ঝলমল করে উঠল। তারপর শুধু জলে গোল গোল রেখাগুলো বড়ো থেকে আরো বড়ো হয়ে ছড়িয়ে চলেছে। অনেক দূরে একটা ভাঙা শিবমন্দিরের চূড়ো থেকে একটা চিল ডানা নেড়ে চীৎকার করে উঠল; নানা ফুলের গন্ধে ভরা হাওয়া চিরে সেই শীর্ণ চীৎকার ভেসে এল ঘরের ভেতরে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে এগিয়ে এলাম বিছানার ধারে। একদৃষ্টে মৃতদেহটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটা বড় নীল মাছি ভোঁ-ভোঁ করে উড়ে বেড়াচ্ছে, একবার লাসের ঠোঁটে বসছে, আবার কপালে। বেঁচে থাকলে যুধাজিৎ অস্থির হয়ে উঠতেন। আমার নিজেরই কেমন অস্বস্তি হতে লাগল, যদি ঐ মাছিটা আমার মুখে এসে বসে। একথা ভাবতেই শরীরটা শিউরে উঠল। লাসের চোখদুটো যেন ফেটে বেরিয়ে পড়ছে, দেখলে ভয় করে। চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ চমকে উঠলাম। কী দেখলাম পরে বলব, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস হল যে ইব্রাহিম খুন করেনি। একথাও বুঝলাম যে পুলিশের করবার কিছুই নেই।

পরে ইব্রাহিমের কাছে সব কথা শুনি। সে প্রথমে আমাকে বলেনি, কারণ সে ভেবেছিল আমি বিশ্বাস করব না। আমি যখন তাকে বললাম যে আমার বিশ্বাস সে নির্দোষ তখন কাঁদতে কাঁদতে সে সব কথা বলল। খুনের ব্যাপারটা কোনোমতে চাপা দিয়ে চলে এলাম। ইব্রাহিমকে কায যোগাড় করে দিলাম সত্যেন মৈত্রের কাছে। মাঝে মাঝে যখন যাই সে রেঁধে খাওয়ায়—ভারি চমৎকার রাঁধে।

কয়েকদিন আগে গ্রামের মাঠে জাহিয়া নামে এক বেদে তাঁবু ফেলল। তাঁবুর সামনেই তাকে প্রায় সব সময়েই দেখা যায়। সে কোন দেশের লোক কেউ জানেনা। নানারকম রঙের টুকরো টুকরো কাপড় দিয়ে পোষাক তৈরি, যেমন ময়লা তেমনি দুর্গন্ধ। গ্রামের ঘরে ঘরে সে যায় নানারকম অদ্ভুত জিনিষ নিয়ে, ছোট ছেলে-মেয়েরা উৎসাহে বেরিয়ে এসেই তার বিকট চেহারা দেখে পালিয়ে যায়। বয়স্থ লোকেদের ভয় পাছে সে কোনো ছেলেমেয়েকে চুরি করে নিয়ে যায়। বেদেদের নাকি এই গুণটি আছে! লোকটা মিশমিশে কালো, কোনোকালে বোধ হয় গায়ে জল পড়েনি। মাথার চুল ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া, সঙ্গে বাঘের মতো প্রকাণ্ড একটা শাদা কুকুর। লোকটা কী বলে বোঝাই যায় না—শুধু মাঝে মাঝে দু-একটা হিন্দি শব্দ চেনা যায়।

এর সঙ্গে হল যুধাজিতের ঝগড়া। একদিন ইব্রাহিম

এসে তার মনিবকে বলল যে এই বেদেটা এসে দিঘির ধারে মাছ ধরতে বসেছে। একজন চাকর তাকে অনেক বারণ করে, লোকটা কিছুতেই শোনে না। তখন চাকরটা তাকে মারবার ভয় দেখাতেই কুকুরটা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কামড়ে দিয়েছে।

যুধাজিৎ ক্ষেপে গেলেন। তিনি জমিদার, তাঁর দিঘিতে এসে মাছ ধরছে এই বেদেটা, তাঁরই চাকরকে কামড়েছে তার কুকুর! "কোথায় সেই বেদে? কোথায় তার কুকুর?" যুধাজিৎ তাঁর বন্দুক বার করলেন।

ইব্রাহিম ভয় পেয়ে জানাল যে বেদে তার কুকুর নিয়ে চলে গেছে। যুধাজিৎ রাগে ফোঁস্ ফোঁস্ করতে লাগলেন, ভয়ে ঝি-চাকর কেউ কাছেই আসতে পারে না। যে চাকরকে কুকুরে কামড়েছিল যুধাজিৎ তখনি তাকে তাড়িয়ে দিলেন। সে একেবারেই অপদার্থ! তার জন্য তিনি অপমান বোধ করলেন।

এর পরদিনেই সন্ধ্যার একটু আগেই যুধাজিৎ তাঁর মোটরে চড়ে গ্রামের রাস্তা দিয়ে বাড়ী ফিরছেন। জমিদার বাড়ী থেকে খানিকটা দূরেই দেখেন পথের ওপর সেই বেদে তাঁর আর এক চাকরের সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করছে। তার কুকুরটাও সেই সঙ্গে চীৎকার করে লাফাচ্ছে।

রাগে ফেটে পড়লেন যুধাজিৎ। পাশে ইব্রাহিম ভয়ে থরথর্ করে কাঁপছে। ভরসা এই যে সঙ্গে বন্দুক নেই, থাকলে নিশ্চয় খুনজখম হয়ে যেত। যুধাজিৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। বেদেটা ঘুরে দাঁড়িয়ে অবজ্ঞার ভাবে ভাঙা দাঁতগুলো বার করে হাসতে লাগলো। কী সাহস! যুধাজিৎ রাগে অপমানে যেন পাগল হয়ে গেলেন। মোটরের আওয়াজ পেয়ে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। যুধাজিতের সমস্ত রাগ হঠাৎ গিয়ে পড়ল ঐ কুকুরটার ওপর। ইব্রাহিমের কাছে তিনি আগেই শুনেছিলেন কুকুরটা নাকি বেদেটার ভারি প্রিয়। আর কোনো কথা না বলে যুধাজিৎ মোটর চালিয়ে দিলেন কুকুরটার ওপর। এক মুহূর্তের জন্য ইব্রাহিমের নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। তারপরেই একটা ঝাঁকনি, আর আহত পশুর একটা কুৎসিত আর্তনাদ।

বেদেটা ছুটে এসে চাকার তলা থেকে কুকুরটাকে টেনে বার করল। মাথাটা ভেঙে গেছে, রক্তে সমস্ত শরীর মাখামাখি। যুধাজিতের রাগ তখন পড়ে গেছে। তিনিও গাড়ী থেকে নেমে এলেন। মরা কুকুরটাকে দুহাতে তুলে ধরে বেদেটা তার সামনে এসে দাঁড়াল। তার চোখে জল, ময়লা পোষাক রক্তে ভেসে যাচ্ছে। একদৃষ্টে যুধাজিতের দিকে তাকিয়ে সে বিড়্বিড়্ করে কী যেন বলতে লাগল, মুখটা তার বিকৃত হয়ে গেল একটা পশুর মতো। তারপরেই কুকুরের মাথাটা এক হাতে তুলে ধরে যুধাজিতের মুখের ওপর গুঁজে ধরেই সে শিস্ দিয়ে উঠল। ইব্রাহিম বলে যে সেই শীর্ণ তীব্র আওয়াজে তার মাথার ভেতরটা যেন চিরে গেল। কুকুরটাকে বুকে চেপে ধরে লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল।

স্তম্ভিত হয়ে খানিকক্ষণ যুধাজিৎ দাঁড়িয়ে থেকে রুমালে মুখ মুছে বাড়ীতে ফিরে এলেন। সেদিন রাত থেকেই আরম্ভ হল ভয়াবহ ব্যাপার। সারা রাত কুকুরের চীৎকার, ঘুমোতে পারা যায় না। মাঝে মাঝে যুধাজিৎ তাঁর বন্দুক বার করছেন, চেঁচিয়ে উঠছেন: "মারো মারো কুকুরটাকে।" ইব্রাহিম রাতে অন্তত দশবার মাঠে বেরিয়ে এসে দেখেছে মনিবের হুকুমে। কিন্তু কোথায় কুকুর? সারারাত কুকুরের চীৎকারে ঝি-চাকর অস্থির। মনে হচ্ছে সারাবাড়ীতে, মাঠে, বাগানে যেন কোনো কুকুর চীৎকার করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে সেই শিসের শব্দ।

কিন্তু ভোর হতেই সব সব আওয়াজ থেমে গেল। ইব্রাহিমকে সঙ্গে নিয়ে যুধজিৎ ঘুরে ঘুরে দেখে এলেন— কিন্তু কোথাও কুকুরের পায়ের ছাপ নেই, অথচ রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে। গ্রামের মাঠে গিয়ে ইব্রাহিম দেখে এল যে তাঁবুটা পড়ে রয়েছে, কিন্তু বেদে সেখানে নেই।

ঝি-চাকর ভয়ে অস্থির, কেউ থাকতে চায় না। তারা সব ব্যাপার শুনেছে, মনে তাদের দারুণ আতঙ্ক। সন্ধ্যা হতেই আবার সেই চীৎকার আরম্ভ হল। একজন ঝি ভয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল! বাকি ক'জনে তাকে ধরাধরি করে একটা ঘরের মধ্যে এনে দরজা বন্ধ করে নিজেরা সারা রাত বসে রইল। ইব্রাহিম তার মনিবের কাছে কাছে ঘুরছে। যুধাজিৎ উন্মাদের মতো পায়চারি করতে লাগলেন। হাতে বন্দুক। মাঠের দিকে, বাড়ীর মধ্যে চার-পাঁচ বার বন্দুক ছুঁড়লেন। কাঁচ-বাঁধানো প্রকাণ্ড একটা ছবি গুলি লেগে দেয়াল থেকে পড়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। কুকুরের ডাক আরো বেড়ে উঠল। মাঝে মাঝে শিসের শব্দ।

তার পরদিন ভোর বেলায় ঝি-চাকররা কায ছেড়ে দিয়ে চলে গেল, কোনো মতেই তাদের রাখা গেল না। দিনের বেলায় যুধাজিৎ ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন, দুদিন প্রায় কিছুই খাননি। একে বদরাগী লোক, তার ওপর এই ব্যাপার, একেবারে পশুর মতো হয়ে উঠেছেন। ক্লান্তিতে ইব্রাহিমের শরীর ভেঙে পড়ছে, কিন্তু দুশ্চিন্তায় তার ঘুম এলো না। সারা দুপুর সে যুধাজিতের শোবার ঘরে পাহারা দিয়ে বসে রইল।

সন্ধ্যার আগেই যুধাজিৎ জেগে উঠলেন। বিশ্রী মেজাজ। রাগে ও মানসিক অশান্তিতে মুখ কালো হয়ে উঠেছে। মাতালের মতো টলতে টলতে ইব্রাহিম তাঁর সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সন্ধ্যার আগেই সারা বাড়ীতে আলো জালা হয়ে গেল, দরজা বন্ধ হল বাইরের দিকে।

সন্ধ্যার একটু পরেই হল্ ঘরের ভেতর থেকে যুধাজিৎ চেঁচিয়ে উঠলেন। ইব্রাহিম ছুটে গিয়ে দেখল তিনি রাগে কাঁপছেন আর বলছেন: "ঐ দেখ ঘরের কোণে কুকুরটা বসে আছে।" ইব্রাহিম কিছুই দেখতে পেল না, কিন্তু একথা বলবার সাহস তার নেই। যুধিজিৎকে কোনোমতে সে সরিয়ে নিয়ে এল। এদিকে কুকুরের ডাক একটানা চলেছে—মাঝে মাঝে শিসের শব্দ, যেন কে কুকুরকে উৎসাহ দিচ্ছে।

রাত প্রায় দশটার সময়ে যুধাজিৎ আবার চেঁচিয়ে উঠলেন। ইব্রাহিম শোবার ঘরের দরজার সামনে বসে ঢুলছিল, লাফিয়ে উঠল। গর্জন করে উঠলেন যুধাজিৎ: "কুকুরটা বড়ো জালাতন করছে, লাফিয়ে পড়ছে আমার গায়ে।" ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইব্রাহিম দেখল যুধাজিৎ দুহাত ছুঁড়ছেন, যেন কী একটা গলার কাছ থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করছেন।

রাত বারোটা: ইব্রাহিম আর বসে থাকতে পারছে না, ঘুমে সমস্ত শরীর এলিয়ে পড়ছে। যুধাজিৎকে অনেক বুঝিয়ে সে শোবার ঘরের মধ্যে এসে দরজা-জানলা বন্ধ করে ছিল। শুধু বিছানার দিকে একটা জানলা খোলা রইল, হাওয়া আস্বার জন্য। খানিক পরেই আবার যুধাজিৎ চেঁচিয়ে উঠলেন: "শোন, শোন, দরজায় নখের আঁচড়ের শব্দ।" কুকুরের ডাক আরো বেড়ে উঠল। শিসের তীব্র আওয়াজে ইব্রাহিমের মাথার মধ্যে যেন একটা যন্ত্রণা হতে লাগল। কোনোরকমেই সে আর জেগে থাকতে পারলো না। ঘুমে অবসাদে তার শরীর মেঝের ওপর এলিয়ে পড়ল।

হঠাৎ একটা চীৎকারে জেগে উঠেই ইব্রাহিম ঐ বীভৎস দৃশ্য দেখে। দেখে বিছানার ওপর যুধাজিৎ ছটফট করছেন, ছেঁড়া গলা থেকে রক্তের স্রোতে বিছানার চাদর ভেসে যাচ্ছে।

অমরবাবু চুরুট টানতে লাগলেন। মালিনী চ্যাটার্জির ভাই কুণাল জিগেস করল: "ইব্রাহিম আর কিছুই দেখতে পায়নি?"

অমরবাবু বললেন: "হ্যাঁ। খোলা জানলা দিয়ে সে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখল একটা ছায়া লাফাতে লাফাতে চলে যাচ্ছে আর একটা ছায়ার দিকে। তারপর দুটোই মিলিয়ে গেল।"

আমরা চুপ করে রইলাম। বাইরে বৃষ্টি তখনো বেশ জোরে পড়ছে। রবিশঙ্কর হঠাৎ জিগেস করল: "কিন্তু আপনি লাসের চোখে কী দেখেছিলেন তা বল্‌লেন না?"

অমরবাবু একটু চুপ করে রইলেন। বললেন: "হয়ত তোমরা বিশ্বাস করবে না, আমিও শুনলে বিশ্বাস করতাম না। চোখের ঠিক মণির ওপর ফোটোগ্রাফের ছবির মতো দেখা যাচ্ছে একটা কুকুরের মাথা—ভেঙে গেছে, ঝর্‌ঝর্‌ করে রক্ত পড়ছে।"

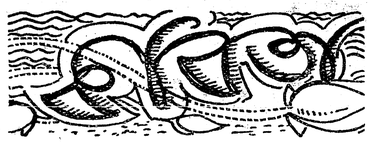

ওঠা

পরিমল রায়

কথা ওঠে মেলা, চাঁদা ওঠে কম,
চুল-ওঠা ব্যামো রোগের অধম,
দাঁত ওঠে যবে ফুলে ওঠে মাড়ি,
চোখ ওঠে যদি—দুর্ভোগ ভারী।
দাড়ি যদি ওঠে সে-ও বড় জ্বালা,
রোজ ভোরে উঠে কামানো-র পালা।

বাজারে আনাজ ওঠে না তেমন
খেতে বসে' তাই ওঠে না কো মন।
পাশের বাড়ী-রা উঠে গেছে কাল
রোদ উঠে গেছে—হয়েচে সকাল।
পেন্সিলে লেখা ওঠে না কো ভালো,
আর কী ওঠে হে? এবার ওঠালো।

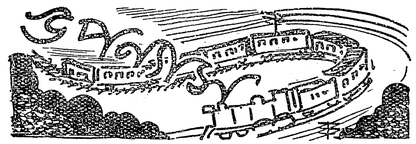

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

"কুনু", বাড়ি ফিরে খাওয়া দাওয়ার পর অশোক বলল, "এখন তুই একটু বিশ্রাম নিতে পারিস; বিকেলে একবার আমার সঙ্গে বেরুলেই হবে। কিন্তু এখন তোর কোনো কাজ নেই।"

"তুইও একটু বিশ্রাম নে না", কুনু বলল, "তোর খাটুনিও ত কম হয়নি"—ভাবখানা এই যে আসল যা কাজকর্ম তার সবটাই যেন কুনুই করেছে, অশোক নেহাত সহকারির মতো পেছুপেছু ঘুরেছে মাত্র।

"উঁহুঁ, আমার এখন আলসেমির সময় নেই"—অশোকের গলায় কেমন যেন একটা অন্যমনস্ক ভাব—"বিকেলের আগেই খাতাটার সঙ্গে বোঝাপাড়া শেষ করতে হবে।"

"খাতাটার সঙ্গে বোঝাপাড়া?"— দিদি অবাক গলায় বললেন।

"বলো কি?"—ভবতোষবাবুর গলাতেও বিস্ময় কম নয়।

"হুঁ। ওকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে। দেখতে হবে ওর সাক্ষী আসল না নকল।"

"হেঁয়ালী-হেঁয়ালী কথা রাখো," দুটো গালে একসঙ্গে ছটা পান পুরে চিবুবার চেষ্টা করতে করতে ভবতোষবাবু বললেন, "বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে বলো খাতাটাকে কী করতে চাও।"

"আপনারা, মানে উকিলরা", অশোক বলল, "সোজা বাংলায় যাকে বলেন cross examine—"

"তার মানে?"

"মানে, জেরা।"

"নাঃ দিদি," কুনু এতক্ষণে বেশ একটু উৎসাহ ভরে বলল, "ভবতোষদা যে কেমন উকিল তা এতক্ষণে বুঝলুম। জেরা মানে জানেন না? যাকে বলে cross examine—"

"আঃ হা," ভবতোষবাবুর গলায় গভীর অস্বস্তি—"এখনো হেঁয়ালী! এদিকে বলে আমার মক্কেলের মাথা খারাপ হয়ে সম্পত্তি বেহাত হবার জোগাড়—কোথায় তার একটা হিল্লে করবে, আর তা নয় হেঁয়ালী!"

"হেয়ালী মানে? সত্যিই খাতাটাকে জেরা করতে হবে"—অশোক বলল।

"হেঁয়ালী নয় মানে? খাতা কি ভাড়াটে সাক্ষী যে জেরা করবে?"

"এ ক্ষেত্রে ত প্রথম থেকেই আমার তাই সন্দেহ হচ্ছে।" অশোকের গলায় একটা চাপা গাম্ভীর্য, বোঝা যায় যে আর বেশী কথা বাড়াতে চাইছে না। হয়ত সময় নেই। তাই। "আচ্ছা ভবতোষদা", অশোক একটু থেমে আবার বলল, "এতদিন ত' ওকালতি করেছেন, আজ আপনাকে হাকিম করে দিলুম, আমি হলুম উকিল, আর কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাক্ খাতাটাকে।"

"আর আমরা?" দিদি ফস করে প্রশ্ন করলেন।

"হুঁ আমরা?" কুনুর গলায় বেশ একটু ঝাঁঝ—"আমরা কি ঘোড়ার ঘাস কাটতে এসেছি?"

"এই বিচার ব্যাপারটার মধ্যে তুইও থাকতে চাস? বেশ দিদি, তাহলে তুমি আর কুনু জুরী হও—এমন সুযোগ আর জীবনে পাবে না, জুরী হওয়া কম খাতিরের নয়।"

"আঃ হা, ছেলেমানুষি রাখো।" ভবতোষবাবু উদ্বিগ্ন ভাবে বললেন, "ভুলে যেও না আমার মক্কেলের মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে, খবরের কাগজে তা প্রকাশও হয়ে গিয়েছে, এখন বাকি শুধু তার সম্পত্তিটুকু বেহাত হওয়া।"

"হুঁ", অশোক বলে চলল, "প্রত্যেকটি কথা মনে রাখতে হবে এবং তা ছাড়া ভুললে চলবে না যে এই খাতাখানা জাল!"

"চুলোয় যাক খাতা," ভবতোষবাবু বললেন, "ওসব তোমার গোয়েন্দাগিরির প্যাঁচ, ওসব প্যাঁচ রাখো। খাতাটা জালই হোক আর আসলই হোক, আমার মক্কেলের মাথার কী হবে? তার সম্পত্তির কী হবে?"

"সে সব পরের কথা," অশোক যেন তোড়ে বক্তৃতা দিতে সুরু করল, এমন তোড়ে যে আর কেউ যাতে বাধা দিতে না পারে—"আপাতত কথা হল খাতাটা জাল এবং খাতাটা যে জাল এ সন্দেহ আমার মনে আসে যখন প্রথম খাতাটার চেহারা দেখলুম। দু'শো বছরের পুরোনো খাতার চেহারা অমন হতেই পারে না।

"তার মানে?" কুনু প্রায় রুখে উঠল, "চেহারা দেখে ত' বরং মনেই হয় খুব পুরোনো, একেবারে ঝুরঝুরে পুরোনো। ঠিক কত পুরোনো তা কেমন করে হিসেব করব, কিন্তু পুরোনো যে তাতে সন্দেহ নেই। পাতা-গুলো একেবারে হলদে হয়ে গিয়েছে, কালির রঙ হয়েছে

ফিকে-বাদামী ; এমন কি বাঁধাই—বাঁধানোটা দেখলেই বোঝা যায় কত দিনকার খাতা।"

"হুঁ," অশোকের গলা একেবারে অবিচলিত, "বেশ, বাঁধাই আর মলাটের কথাই প্রথম ধরো।" অশোক খাতাটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করতে লাগলো। "মলাট আর বাঁধাই খুব পুরোনো মনে হচ্ছে, নয়? হবার ত কথাই। যে চামড়া দিয়ে খাতাটা বাঁধনো তা অবশ্যই খুব পুরোনো চামড়া। সন্দেহ নেই।"

"নিশ্চয়ই"—কুনু বলল।

"কিন্তু এমন ত' হতেই পারে যে খুব পুরোনো চামড়া দিয়েই কেউ খাতাটা সম্প্রতি বাঁধিয়েছে। খুব পুরোনো চামড়া বোম্বাই সহরে দুর্লভ নয়; এখানে দরকার হলে শুনেছি এক ঘণ্টার মধ্যে বাঘের দুধ জোগাড় করা যায় আর খুব পুরোনো চামড়া জোগাড় করা যায় না?"

"তা না হয় যায়," কুনু বলল, "কিন্তু শুধুই ত পুরোনো চামড়া নয়! দেখছ না, বইটার গায়ে, মলাটের ওপর, কত চিহ্ন রয়েছে? এসব চিহ্ন যে ব্যবহারের চিহ্ন তা দেখলেই বোঝা যায়। কতদিন ধরে কত মানুষ বইটাকে ব্যবহার করেছে, আলমারিতে রেখেছে, নেড়েছে-চেড়েছে-পড়েছে—তার সব চিহ্ন। এগুলোকে অস্বীকার করবে কেমন করে? এগুলোর মধ্যে যে ইতিহাসের স্পষ্ট পদচিহ্ন!"

"ঠিক বলেছিস। এগুলোকে অস্বীকার করবার উপায় নেই। এবং উপায় নেই বলেই বাধ্য হলুম বইটাকে জাল বলে সন্দেহ করতে।"

"তার মানে?"

"মানে চিহ্নগুলো ঠিকই আছে তবে সবই ভুল জায়গায় রয়েছে। একটা বই খুব বেশীদিন ধরে ব্যবহৃত হলে ঠিক কোন কোনো জায়গায় ব্যবহারের চিহ্ন পড়া উচিত? প্রথমত, মলাটের নীচের দিকটা যে দিকটা আলমারির সেলফ্-এর সঙ্গে ক্রমাগত ঘষা খায়। তার পর, মলাটের কোণাগুলো; কেন না, সে জায়গাগুলোর চামড়া সবচেয়ে পাতলা আর এই কোণাগুলোর ওপরেই পড়ে সবচেয়ে বেশী ঝক্কি। তারপর, বইটাকে আলমারি থেকে টেনে বের করবার সময় বাঁধাই-এর মাথায় যে জায়গাটায় আঙুলের চাপ পড়ে সেই জায়গাটা। বইটার বাঁধাই-এর সুতোগুলোও বারবার খোলা বন্ধ হওয়ার দরুণ ঢিলে হয়ে যাওয়া উচিত। পুরোনো বই ভালো করে লক্ষ্য করলেই বুঝতে পারবি যে সামনের আর পেছনের মলাটের ওপর দুটোই জখম হয় সবচেয়ে কম। কিন্তু এই খাতাটাকে যখন প্রথম দেখলুম তখনই আমার কতকগুলো সন্দেহ হল: দেখলুম এর মলাটের নীচের দিকটা, কোণাগুলো এমন কি বাঁধাইএর সুতোগুলো একেবারে খাসা রয়েছে। তবুও খাতাটার ওপর রয়েছে অনেক সব দাগ; ব্যাবহৃত হবার দাগ; কিন্তু সবই এলোমেলো, অজায়গায়, কুজায়গায়। যেমন ধর, মলাটের ওপরের দাগগুলো, ওগুলো ব্যবহারের চিহ্ন নয়, ব্যবহারের ধাপ্পা! এক কথায়, খাতাটা প্রাচীন নয়, পুরোনো চামড়া দিয়ে বাঁধিয়ে ওকে যেন প্রাচীনতার মুখোস পরানো হয়েছে। ভালো করে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়।"

অশোক একটু থামলো।

কারুর মুখে কোনো কথা নেই।

অশোক আবার বলে চলল, "তা ছাড়া, আর একটা কথা ত খুবই স্পষ্ট। এটুকু ত সকলেরই মাথায় আসা উচিত ছিলো। দুশো বছর আগেকার খাতা, অথচ বাঁধাইটা একেবারে হাল ফ্যাসানের।"

"তার মানে?"

"মানে দু'শো বছর আগে আমাদের দেশে এ জাতের বাঁধাই মোটে সম্ভবই নয়। দেখছ না, বাঁধাই-যন্ত্রের অস্পষ্ট দাগ পর্যন্ত খাতাটার গায়ে, অথচ একটু ভাবলেই বুঝতে পারবে দু'শো বছর আগে বাঁধাই-যন্ত্র আমাদের দেশে থাকা সম্ভবই নয়। তখন অধিকাংশ বই পাতায় লেখা হত, এবং পাতাগুলোর তাড়ি বাঁধাকেই যা বাঁধাই বলা যায়!"

"কিন্তু কাগজ?" কুনু বলল, "কাগজটার চেহারা কি বাস্তবিকই খুব পুরোনো নয়?"

"তা অবশ্য ঠিক। এবং দু'শো বছর আগে চীন ও ইয়োরোপের কোনো কোনো জায়গায় কাগজে লেখার প্রচলন সত্যিই হয়েছে! বাটলিওয়ালা বংশের সঙ্গে জলদস্যুতার প্রবাদ যখন সংযুক্ত তখন এমন কথা মনে হতেই পারে যে অতদিন আগে প্রতাপচন্দ্রের কোনো পূর্বপুরুষের হাতে কোনো উপায়ে লেখার কাগজ এসেছিলো। পাণ্ডুলিপিটা তাই পুরোনো হতেই পারে যদিও বাঁধাইটা মাত্র হালের!"

"হুঁ। আমার ত' এখন তাই মনে হচ্ছে।"

"মনে হবার আর একটা কারণ কালি—কালিটা কী রকম ফ্যাকাসে বাদামি দেখাচ্ছে!"

"হুঁ। তা ত বটেই।"

"এসব কথা আমি আগেই ভেবেছি। কিন্তু তবুও একটা সন্দেহ মন থেকে মুছতে পারিনি। যদি পাণ্ডুলিপিটা পুরোনোই হয় এবং বাঁধাইটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক হয় তা হলে পুরোনো চামড়া দিয়ে বাঁধাই করারই বা দরকার কী আর সেই বাঁধাই-এর ওপর এলোমেলো দাগ ফেলে প্রাচীনতার ধাপ্পা দেবারই বা কী মানে হয়? এ সবের পেছনেই একটা প্রচ্ছন্ন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না কি?"

"উদ্দেশ্য যাই থাক, কাগজ আর কালি যদি বাস্তবিকই পুরোনো হয় তা হলে বাঁধাই সম্বন্ধে তুই যত সন্দেহই করিস না কেন আসল পাণ্ডুলিপিকে কোনো মতেই জাল বলে চালাতে পারিস না।"

"ঠিক। তাই পরীক্ষা করে দেখতে হবে কাগজ আর কালি সত্যি পুরোনো কিনা! এবং সে পরীক্ষা যতক্ষণ না শেষ করছি ততক্ষণ অবশ্যই তোরা কেউ কোনো রায় দিতে পারিস নে। তবে আমার মনে মনে বিশ্বাস মলাট-এর ওপর যখন ধাপ্পা ধরা পড়েছে তখন কাগজ এবং কালির ওপরও ধাপ্পা আবিস্কৃত হবে।"

"কিন্তু ধাপ্পা কি না ধরবি কেমন করে?"

"তারই ত' দাওয়াই কিনে এনেছি।" অশোক বলল, এবং তারপর দিদির দিকে ফিরে, "আমার সেই চামড়ার ছোট্ট বাক্সটা?"

দিদি উঠে গিয়ে বাক্সটা নিয়ে এলেন। অশোক ওষুধের দোকানের প্যাকেট খুলে ওষুধগুলো টেবিলে সাজালো। তারপর ব্যাগটা থেকে ছোটো ভাঁজ-করা চকচকে একটা অনুবীক্ষণ বের করে টেবিলের উপর ঠিক করে বসালো আর বের করল ড্রপার, সরু চিমটে, কাঁচের দু'একটা পাত্র।

টেবিলের উপর তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ।

অশোকের চোখে কৌতূহল নেই। স্থির, শান্ত, দৃষ্টি। সে যেন আপন মনেই বলে চলল—

"খাতার পাতাগুলোকে যে সন্দেহ করছি তার একটা স্পষ্ট কারণ অবশ্যই রয়েছে। কাগজ পুরোনো হলে হলদে হয়ে যায় বটে; কিন্তু কোনো খুব পুরোনো বই যদি ভালো করে লক্ষ্য করা যায় তা হলে চোখে পড়ে পাতাগুলোর সমস্তটাই সমান হলদেটে না। তার কিনারাগুলো বেশী হলদেটে, মাঝের দিকটা অনেক কম হলদেটে। এর কারণ অবশ্য—" অশোক কথা বলছে আর সযত্নে ওষুধপাতি এবং যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ গোছাচ্ছে—"এর কারণ অবশ্য স্পষ্ট: বইটা যখন বন্ধ করা থাকে তখন পাতাগুলোর ভেতর দিকটায় হাওয়া লাগে না, কিনারগুলোতেই হাওয়া লাগে। আর হাওয়ার মধ্যে যে অক্সিজেন আছে তার ফলেই কাগজ অমন হলদে ঝুরঝুরে হয়ে যায়। অথচ, এই খাতাটার প্রত্যেকটা পাতার সমস্ত অংশই সমান হলদে ঝুরঝুরে!"

"তার কারণ অবশ্য এও হতে পারে যে খাতাটার পাতাগুলো বহুদিন আবাঁধাই অবস্থায় খোলা পড়েছিলো—তখন পাতাগুলোর পুরো অংশ সমান হাওয়া খেয়ে সমান হলদে হয়ে গিয়েছে!"

"হতে পারে বই কি! কিন্তু এও ত' হতে পারে ফিকে চায়ের জলে ডুবিয়ে পাতাগুলোকে পুরোনো হলদেটে দেখতে করা হয়েছে!"

"তাও কি সম্ভব নাকি ?"

"খুব সম্ভব। আসলে যে ব্যাপারটা কী তা একটু পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারা যাবে।"

ততক্ষনে অশোকের তৎপর হাতের গুনে টেবিলের উপর একটা ছোট্ট স্পিরিট ল্যাম্প জ্বলেছে। একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে পরিষ্কার জল ঢেলে এবং তার মধ্যে খাতাটা থেকে একটুকরো ছোট্ট কাগজ ছিঁড়ে দিয়ে অশোক স্পিরিট ল্যাম্পের আগুনে সেটা ফোটাচ্ছে।

তিন জোড়া কৌতূহলী চোখ টেবিলের উপর।

অশোকের চোখে কৌতূহল নেই। স্থির, শান্ত, দৃষ্টি।

একটু চুপচাপ।

কাগজটা বেশ একটু ফোটবার পর অশোক সাবধানে সরু চিমটের ডগায় সেটা তুলে নিল। তারপর একটুকরো চৌকো কাঁচের উপর সেদ্ধ কাগজের টুকরোটা ফেলে একটা লম্বা ছুঁচ দিয়ে সেটা বেশ করে পিঁজে ফেলবার মতন করল। তারপর একটা শিশি থেকে একফোঁটা গাঢ় রঙের তরল জিনিস তুলে তার উপর ফেলল।

"ওটা কী ওষুধ রে ?"—কুনু প্রশ্ন করল।

"ওষুধ-টষুধ নয়। এর নাম এ্যানিলাইন্ স্টেন্। অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখবার সুবিধে হবে।" বলতে বলতে অশোক সবুজ সুটকেশ থেকে একটুকরো ব্লটিং কাগজ বের করে কাঁচের উপর থেকে বাড়তি রঙটা শুষে নিলো। তারপর আর একটা শিশি থেকে আর এক ফোঁটা কি ফেলল সেদ্ধ আর পেঁজা কাগজের টুকরোর উপর।

"ওটা আবার কি ?"—কুনু আবার প্রশ্ন করল।

"গ্লিসারিন।" বলতে বলতে আর এক টুকরো চৌকো কাঁচ প্রথমটার উপর সাবধানে টিপে বসালো।

তিন জোড়া কৌতুহলী চোখ টেবিলের উপর। অশোক সাবধানে কাঁচের টুকরো দুটো মাইক্রোস্কোপে ভরে দিলো এবং তারপর এক চোখ বন্ধ করে নলের উপর দিককার ফুটোর মধ্যে আর এক চোখ বসালো।

কারুর মুখে কথা নেই।

স্তব্ধতা ভাঙলো অশোকই, "যা ভেবেছিলুম ঠিক তাই। কাগজটা একেবারে আধুনিক কাগজ।"—বলতে বলতে অনুবীক্ষণ থেকে ও চোখ সরিয়ে নিলো।

"কেমন করে বুঝলে ?"—এতক্ষণে প্রশ্ন করেলেন দিদি।

"কঠিন নয়। তুমিই একবার এটায় চোখ দিয়ে দেখ। স্পষ্ট দেখতে পাবে কাঠের টুকরো, বাঁশের টুকরো, ছেঁড়া কাপড়, পেঁজা তুলো—এই সব। এসব জিনিস দিয়ে কাগজ তৈরি মাত্র শ' খানেক বছর হল চালু হয়েছে। ১৮৪০-এ কেলার বলে একজন ইয়োরোপীয়ন্ বাঁশ এবং কাঠ থেকে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি চালু করেন; এ পদ্ধতির তাই নাম কেলার-পদ্ধতি। তাহলে বুঝতেই পারছো, খাতাটার বয়েস দুশো বছর হতেই পারে না, কেন না মাত্র একশো বছর আগে এইভাবে কাগজ তৈরি করার পদ্ধতি পৃথিবীতে এসেছে। আমার ত' মনে হচ্ছে কাগজটা খুবই আধুনিক; কেন না ওর মধ্যে আর একটা জিনিস রয়েছে যাকে বলে esparto—সে জিনিস দিয়ে তৈরি কাগজের চল খুব বেশীদিন হয়নি। তাই বলছিলুম, কাগজটা যে হলদে হয়েছে তা বয়সের দরুণ নয়, খুব সম্ভব চায়ের জলে চান করার দরুণ।"

"কিন্তু লেখার কালি ?"

"হুঁ। লেখার কালিও পরীক্ষা করে দেখতে হবে বই কি। যে রকম বাদামি রঙ তাতে ত' মনে হয় যে খুবই সেকেলে!"

ফুঁ দিয়ে অশোক স্পিরিট ল্যাম্পটা নিভিয়ে দিলো আর অণুবীক্ষণটা সযত্নে বন্ধ করে রাখলো চামড়ার ব্যাগে।

"এবার কালিটা নিয়ে পরীক্ষা করা যাক। তবে, তার আগেই নিজের একটা অপকর্মের কথা স্বীকার করে নিচ্ছি।" বলতে বলতে বুক পকেট থেকে সযত্নে অশোক একটা খাম বের করল এবং সেই খামের থেকে বের করল একটা পুরোনো চিরকুট। "এটা", অশোক বলল, "সত্যিই খুব পুরোনো চিরকুট। আমি চুরি করে এনেছি।"

"চুরি!" একসঙ্গে তিনটে বিস্মিত গলার ঐকতান।

"হুঁ।" অত্যন্ত সহজ গলা অশোকের "অধ্যাপক ত্রিবেদী যখন তন্ময়ভাবে এই খাতা নিয়ে আলোচনা করেছিলেন তখন তাঁর লাইব্রেরীর তাক থেকে হাত সাফাই করে এনেছি।"

"কিন্তু এটা কি তোর উচিত হল ?"—কুনু অত্যন্ত গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করল, যেন ইস্কুলের মাস্টারমশাই নীতি-শিক্ষা পড়াচ্ছেন।

"ন, সত্যি উচিত হয়নি"—অম্লান বদনে বলে চলল অশোক—"কিন্তু উপায়ও যে ছিলো না। সত্যিকারের দুশো বছরের পুরোনো চিরকুট এই বিদেশ-বিভূঁয়ে পাই-ই বা কোথায় ? তা ছাড়া, একে ঠিক চুরি বলতেও পারিস না, কারণ পরীক্ষা হয়ে গেলেই ফেরত দিয়ে আসব।"

"কিসের পরীক্ষা ?"

"এই দেখ না। শ' দুয়েক বছর আগে এক রকম কালি মানুষ ব্যবহার করত বলে জানি যে কালির মধ্যে iron-sulphite বলে একটা জিনিস আছে। সে কালি সত্যিই পুরোনো হলে হলদেটে হয়ে যায়। ত্রিবেদীর ঘর থেকে যে চিরকুটটা এনেছি তার লেখাগুলো হলদে হয়ে রয়েছে। প্রথম আমি পরীক্ষা করে দেখবো এই চিরকুটের লেখাগুলো iron-sulphite-এর কালির কিনা। যদি তাই হয় তাহলে প্রমাণিত হবে প্রাচীন গুজরাটে ও কালির প্রচলন ছিলো এবং তাহলে আশা করতে হবে এই খাতার কালিও একই জাতের। তারপর দেখব খাতার কালিতে iron-sulphite আছে কিনা।"

"আছে কিনা বুঝবি কী করে ?"

"যদি iron-sulphite থাকে তাহলে লেখার ওপর একফোঁটা এ্যামোনিয়াম সালফাইট্ ফেললেই ধরা পড়বে। দেখ না।"

তারপর অশোক অত্যন্ত স্থির হাতে একটা বোতল থেকে ড্রপারে করে তুলল একটু আরক এবং ত্রিবেদীর ঘর থেকে আনা চিরকুটের এক কোণায় একটা অক্ষরের উপর ফেলল একফোঁটা সেই আরক।

তিন জোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ চিরকুটটার উপর।

দেখতে দেখতে চিরকুটের অক্ষরটা একেবারে মিশমিশে কালো হয়ে গেল।

অশোক সেটাকে সাবধানে টেবিলের এক কোণায় সরিয়ে রাখলো আর তারপর খাতাটার একটা পাতা খুলে একটা অক্ষরের উপর আবার এক ফোঁটা আরক ফেললো।

তিনজোড়া উদ্‌গ্রীব চোখ টেবিলের উপর।

কিন্তু খাতার ফিকে বাদামী অক্ষর গভীর কালো হয়ে ফুটে উঠল না। বরং, আরও ফিকে হয়ে অস্পষ্ট বেগুনি রঙ হয়ে উঠল যেন।

এতক্ষণে পাতলা হাসি দেখা দিলো অশোকের মুখে। হালকা চুলগুলো কপালের উপর থেকে পেছুনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে দুটো কনুই-এর ভর দিলো টেবিলের উপর। ভবতোষবাবুর দিকে চেয়ে বলল, "জেরা শেষ করেছি। এবার আপনার হাকিমী রায় দিন।"

ভবতোষবাবু সেই যে তখন দু'গালে একসঙ্গে ছটা পান পুরেছিলেন এতক্ষণ তা চিবোতে বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তন্ময় হয়ে শুনছিলেন অশোকের কথা। যেন হুঁস ফিরে এলো অশোকের কথায়। একসঙ্গে কচমচ করে চিবোতে সুরু করলেন সেই ছটা পান। আর তারপর বলে চললেন—

"বাস্তবিক আশ্চর্য! অশোক, তুমি যে এত জানো, অমন খুঁটিয়ে ভেবে দেখো তা আমি কল্পনাও করতে পারতুম না। বুদ্ধির খেলায় তোমার সঙ্গে পারা মনে হচ্ছে অসম্ভব: তুমি যদি উকিল হতে তাহলে নিশ্চই অসাধারণ ভালো উকিল হতে। যদি তুমি ডাক্তার হতে—"

"কিন্তু", অশোক বাধা দিলো। নিজের প্রশংসা শুনতে সত্যিই বড় অস্বস্তি হয়। "কিন্তু, আমি উকিলও নই, ডাক্তারও নই। আমি হলুম—"

"জানি আমি। তবে যদি উকিল হতে, অন্তত আইন সম্বন্ধে খানিকটা জ্ঞান থাকতো তাহলে সত্যিই

বড় ভালো হতো। সে জ্ঞান নেই বলেই তোমার এত সব আশ্চর্য পরীক্ষা সবই বিফল হল।"

"তার মানে ?"

"একটু ঠাণ্ডাভাবে ভেবে দেখো", ভবতোষবাবু বললেন,—"আমাদের আসল সমস্যাটার দিক থেকে ভেবে দেখবার চেষ্টা করো। আসল কথা হচ্ছে আইনের কথা : প্রতাপচন্দ্রের যদি বাস্তবিকই মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়ে থাকে তাহলে সমস্ত সম্পত্তি থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন। উইলে এমন কথা নেই যে একটা খাঁটি খাতা দেখে এই মাথা খারাপ হওয়া দরকার। মাথা যদি খারাপ হয় তা হলেই হল ; তা আসল খাতা দেখেই হোক আর নকল খাতা দেখেই হোক—তফাৎ কিছুই হয় না। তুমি যদি এর বদল উদয়চন্দ্রর—প্রতাপচন্দ্রের কাকার—উইলটাকে এইভাবে নকল বলে প্রমাণ করতে পারতে, তাহলে না হয় একটা হিল্লে হোত।"

"ঠিক বলেছেন," অশোক অতিমাত্রায় উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল, "আপনি বলতে চান সাপ দেখে ভয় পাওয়া আর দড়িতে সাপ দেখে ভয় পাওয়া দুইই একদিক থেকে এককথা—নিছক ভয় পাওয়ার দিক থেকে। এই ত ?"

"হুঁ। তাই নয় কি ?"

"নিশ্চই।"

"আমাদের উদ্দেশ্যটার কথা ভুললে ত' চলবে না। কী বলো ?"

"নিশ্চই। আমাদের উদ্দেশ্য হল প্রতাপচন্দ্রকে বাঁচানো, কিম্বা তাঁর সম্পত্তি বাঁচানো—এই ত ?"

"হুঁ। তাই নয় কি ?"

"নিশ্চই।"

"তা হলে ?"

"তাহলে চলুন সেই চেষ্টাই করা যাক। কুনু যাবি নাকি সঙ্গে ?"

"কোথায় ?"

"উদয়-ভবন। প্রতাপচন্দ্রের বাড়ি। পথে শুধু একবার ত্রিবেদীর চিরকুটটা ফেরত দিয়ে যেতে হবে।"

"আমি প্রস্তুত।"—কুনু বেশী কথা বলছে না। ওরও নেশা ধরেছে বোঝা যায়।

"তাহলে চলুন ভবতোষদা, প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন চলুন।"

(ক্রমশ)

ঘুম-পাড়ানী গান

(সরোজিনী নাইডুর 'Cradle-Song অবলম্বনে)

সতী মুখোপাধ্যায়

মশলা বনের গন্ধ মেখে
ধানের ক্ষেতের ওপার থেকে
পদ্ম-স্রোতের উপর দিয়ে টানি,
এলেম নিয়ে তোমার তরে
শিশির দিয়ে পালিশ করে
ছোট্ট মধুর স্বপন একখানি।

মিষ্টি তুমি চোখটি বোজো
বন-জোনাকী নাচছে আজো
ঐ যে ঐ পরীর নিমের গাছে,
আফিম ফুলের পাত্র থেকে
লুকিয়ে এনে গেলেম রেখে
ছোট্ট মধুর স্বপ্ন তোর কাছে।

ঘুমাও মধুর চোখ দু'খানি,
সোনার আলোর রেখায় টানি
তারাগুলি জ্বলুক চারিদিকে,
আমার অনেক আদর ভরে
গেলাম আজি তোমার তরে
ছোট্ট মধুর স্বপ্নখানি রেখে।

অনেক চাঁদ

(বিদেশী রূপকথা)

অনেক দিন আগে সমুদ্রের তীরে এক রাজ্যে এক রাজকন্যা থাকতো। দশ পূর্ণ হয়ে তখন সে এগারোয় পড়েছে। একদিন হঠাৎ তার অসুখ হোলো। এতোই অসুখ যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না।

রাজবদ্যি এসে তার জর দেখলেন, নাড়ি পরীক্ষা করলেন, জিভটা টেনে পরীক্ষা করতেও কসুর করলেন না। দেখেশুনে ভদ্রলোকের মুখ ভাবনায় কালো হয়ে গেলো। ডেকে পাঠালেন তিনি রাজাকে।

এলেন রাজা।

রাজা তাঁর মেয়েকে বললেন, "তুমি যা চাইবে তাই দেবো। কী চাও বলো।"

রাজকন্যে বললো, "চাই বইকি! চাঁদাটাকে চাই। চাঁদকে পেলেই আবার আমি ভালো হয়ে উঠবো।"

শুনে রাজা গেলেন যে-ঘরটায় সিংহাসন আছে। তারপর ঘণ্টা-বাঁধা দড়িটা ধরে জোরে-জোরে তিনবার আর আস্তে একবার দিলেন টান। সেই শব্দ শুনেই হাজির হলেন রাজার মন্ত্রী। লোকটি প্রকাণ্ড, বিরাট মোটা, চোখে পুরু কাঁচের চশমা। ফলে তাঁর চোখ দুটো আসলে যে-রকম তার দ্বিগুণ মোটা দেখায় আর যে-রকম তিনি বুদ্ধিমান তার দ্বিগুণ বুদ্ধি তাঁর আছে বলে ভুল হয়।

রাজা বললেন, "রাজকন্যের জন্যে চাঁদটা তোমাকে আনতে হবে। চাঁদটা পেলেই তার সব অসুখ সারবে। আজ রাত্রেই সেটা আমার চাই, দেরী হলে বড় জোর কাল পর্যন্ত সময় দেওয়া যায়।"

শুনে মন্ত্রীমশাই রুমাল দিয়ে মুছলেন কপালের ঘাম। তারপর বিকট শব্দ করে নাক ঝাড়লেন। তারপর বললেন, "মহারাজ! আপনার জন্যে জীবনে আমি অনেক রকম অসম্ভব জিনিস জোগাড় করে দিয়েছি। এই দেখুন না তার ফর্দও আমার পকেটে রয়েছে।" বলে মস্ত লম্বা পাকানো একতাড়া কাগজ পকেট থেকে বার করে তিনি পড়তে সুরু করলেন, "আপনার জন্যে জোগাড় করেছি হাতির দাঁত, বনমানুষ আর ময়ূর ; চুণি, মুক্তো আর পান্না ; কালো অর্কিড, লাল হাতি আর নীল কুকুর বাচ্চা ; গাইয়ে পাখীর জিভ, দেবদূতের পালক আর গণ্ডারের শিং ; দৈত্য, বামন আর জলকন্যা ; ধূনো, সুগন্ধী ওষুধ আর আরব দেশের গন্ধরস ; এক পাউণ্ড মাখন, দু ডজন ডিম আর এক বস্তা চিনি—ওঃহো, শুধু শেষের কটা জিনিসের পাশে আমার স্ত্রী লিখে রেখেছেন : দুঃখিত, কোথাও পাওয়া গেলো না।"

রাজা বললেন, "যাকগে যাকগে ; এখন আমার ঐ চাঁদটাকে দরকার।"

মন্ত্রীমশাই বললেন, "চাঁদটা পাওয়া অসম্ভব। ওটা পৃথিবী থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল দূরে আর রাজকন্যে যে-ঘরে শুয়ে আছেন সেই ঘরের চেয়ে বড়। তার ওপর ওটা আবার গলা তাঁবা দিয়ে তৈরি। চাঁদটা আমি এনে

দিতে পারবো না। নীল কুকুর ছানা বলুন, পারি; কিন্তু চাঁদ? না।"

শুনে রেগে রাজা তাঁকে যেতে বললেন আর বললেন রাজসভার যাদুকরকে পাঠিয়ে দিতে। যাদুকর ছোট্টখাট্ট রোগা মানুষ, মুখখানা বেজায় লম্বা। তার মাথায় এক টুপি, টুপির উপরটা আবার লাল আর তার উপর রূপুলি তারা বসানো। তার গায়ে নীল আলখাল্লা, সেটর আর উপর আঁকা সোনালি প্যাঁচা। রাজকন্যের জন্যে তাকে চাঁদ আনতে হবে শুনে যাদুকরের রঙটা ভারি ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

সে বললো, "মহারাজ! জীবনে আপনার জন্যে বহু জিনিস এনে দিয়েছি যাদুবিদ্যা দিয়ে। কী-কী জিনিস যাদুবিদ্যার সাহায্যে আপনার জন্যে এনেছি তার একটা ফর্দও আমার পকেটে রয়েছে, এই দেখুন! আপনার জন্যে শালগম টিপে রক্ত বার করেছি এবং রক্ত থেকে আবার বানিয়েছি শালগম। সিল্কের টুপি থেকে বার করেছি খরগোস আবার খরগোস থেকে বানিয়েছি সিল্কের টুপি। ফুল আর একতারা আর পায়রা এনেছি শূন্য থেকে আবার শূন্যে উবিয়ে দিয়েছি ফুল আর একতারা আর পায়রাকে। আপনাকে এনে দিয়েছি যাদুযষ্টি আর ভবিষ্যৎ দেখবার স্ফটিক পাত্র। রাত্রির ভূত প্রেত দৈত্যা-দানা তাড়াবার জন্যে আমার প্রেসক্রিপশন মাফিক নেকড়ের হাড়, রাত্রির অন্ধকার আর ঈগল পাখীর চোখের জল দিয়ে বানিয়ে দিয়েছি মিক্চার। আপনাকে দিয়েছি চোদ্দ মাইল লম্বা বুট্ জুতো, সোনালি স্পর্শ আর সেই অদৃশ্য হবার জামাটা—"

রাজা বললেন, "অদৃশ্য হবার জামাটা কিন্তু কোনো কাজের নয়। সেটা পরার পরেও আগের মতোই সব জিনিসের সঙ্গে এখনো আমাকে ঠোক্কর খেতে হয়।"

উত্তরে রাজসভায় যাদুকর বললো, "জামাটা পরলে আপনি অদৃশ্য হবেন, অন্য জিনিস অদৃশ্য হবে না।" তারপর নিজের ফর্দের দিকে চেয়ে আবার পড়তে সুরু করলো, "আপনার জন্যে এনে দিয়েছি দৈত্য রাজ্যের শিং, শাঁখের করাতের শাঁখ, রামধনু থেকে সোনা। হ্যাঁ, আরো এনেছি বটে—এক বাণ্ডিল সুতো, কতকগুলো ছুঁচ আর খানিকটা মোম—ওঃহো, শেষের তিনটে জিনিসের পাশে আমার স্ত্রী লিখে দিয়েছেন: দুঃখিত। ওগুলো কোথাও পাওয়া গেলো না।"

রাজা বললেন, "কিন্তু তোমার কাছে এখন চাওয়া হচ্ছে চাঁদটা। রাজকন্যের জন্যে ওই চাঁদটার দরকার। সেটা পেলেই রাজকন্যে সেরে উঠবে।"

রাজসভার যাদুকরবললো, "চাঁদকে কেউ আনতে পারে না। পৃথিবী থেকে ওটা এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে রয়েছে, ওটা আবার সবুজ পনীর দিয়ে তৈরি আর রাজকন্যে যে-ঘরে শুয়ে আছে তার চেয়ে দ্বিগুণ বড়।"

শুনে রাজা আবার রেগে গেলেন। যাদুকরকে তার গুহায় ফেরৎ পাঠিয়ে ডেকে পাঠালেন রাজসভার গণিতজ্ঞকে। লোকটার মাথায় টাক, সেই টাকের মাঝখানে ছোটো একটা টুপি, চোখে তার চশমা আর কানে গোঁজা পেন্সিল।

রাজা বললেন, "১৯০৭ সাল থেকে আমার জন্যে কী-কী তুমি করেছো তার ফর্দ শুনতে চাই না। এখন শুধু জানতে চাই কী উপায়ে রাজকন্যের জন্যে চাঁদটা আনা যায়।"

রাজসভার গণিতজ্ঞ বললো, "মহারাজ! ভারি তৃপ্তি পেলুম ১৯০৭ সাল থেকে আপনার জন্যে যে-সব কাজ করেছি তার উল্লেখ করলেন বলে। এই দেখুন ঐ সব কাজের পুরো ফর্দ আমার সঙ্গেই রয়েছে। আপনার জন্যে হিসেব করে বার করেছি উভয়-সংকটের মাঝখানের ব্যবধান কতটা, দিন আর রাত্রির মধ্যে কতটা দূরত্ব, 'ক' থেকে চন্দ্রবিন্দুটাই বা কত দূরের পথ। অঙ্ক কষে বার করেছি 'উন্নতি' বলতে ঠিক কতটা উঁচু বোঝায়, 'দূর হ' বলার পর চলে যেতে কতটা সময় লাগে, 'ইহলোক' থেকে 'পরলোকে' যেতেই বা কতটা সময় খরচা হয়। সমুদ্র-সাপ কতটা লম্বা আমি কষে বার করেছি, 'অমূল্য'র দাম ঠিক কত টাকা-

আনা-পয়সা সে-খবরও অঙ্ক কষে জানিয়ে দিয়েছি আপনাকে। জলহস্তী-কে স্কোয়ার করলে কী হয় তাও বলেছি। আবিষ্কার করেছি ন'কড়িবাবুর দাম কত, 'সাত-পাঁচ' লোকে যখন ভাবে তখন আসলে কী ভাবনা তার মনে, বলেছি 'কর্মফল'-কে 'কর্ম' দিয়ে ভাগ করলে কী ফল পড়ে থাকে, বার করেছি কোকিলের আর পাপিয়ার ডাকের গ. সা. গু. কষলে ঠিক কতটা চিনি পাওয়া যায়, কত মানুষ কতক্ষণ কাঁদলে ঠিক একটি সমুদ্র তৈরি হতে পারে। সেই সমুদ্রের নুন দিয়ে কতগুলো পাখী আপনি ধরতে পারেন—সে-খবর জানাতেও ভুলিনি আমি। মহারাজ! আপনার সেই পাখীর সংখ্যাটা মনে আছে তো? না থাকলে আর একবার শুনে রাখুন: ঠিক ৮৮৭৬৫৪৩২১০১২৩৪৫৬৭৮৯১৯গুলো পাখী।"

রাজা বললেন, "পৃথিবীতে অতগুলো পাখীই নেই, তা আবার ধরা! কিন্তু যাকগে সে-সব কথা। এখন আমার চাঁদকে দরকার।"

শুনে রাজসভার গণিতজ্ঞ জানালো, "চাঁদ রয়েছে তিন লক্ষ মাইল দূরে। চারদিকটা তার গোল, ভেতরটা পয়সার মতো চ্যাপ্টা। এ্যাসবেসটস দিয়ে ওটা তৈরি আর আপনার রাজ্যের ঠিক অর্ধেক তার আয়তন। চাঁদাকে কেউ আনতে পারে না।"

শুনে আবার রাজা চটে উঠলেন। চটে উঠে ফেরৎ পাঠালেন সেই গণিতজ্ঞকে। তারপর ঘণ্টা বাজিয়ে ডাকলেন রাজসভার ভাঁড়কে। লোকটা কিম্ভূত টুপি মাথায় পরে হাতে ঘণ্টা নিয়ে এক লাফে ঘরে ঢুকলো তারপর বসলো গিয়ে রাজার সিংহাসনের পায়ের কাছে।

"মহারাজ! আজ্ঞা করুন।"

কাতর স্বরে রাজা বললেন, "রাজকন্যে চাঁদ চাইছে। চাঁদকে না পেলে তার অসুখ ভালো হবে না। কিন্তু কেউই চাঁদকে এনে দিতে পারছে না। প্রত্যেকবার এক-একটি পণ্ডিতকে ধরে চাঁদের কথা বলি আর শুনি চাঁদটা ক্রমশ বড় হচ্ছে আর দূরে যাচ্ছে সরে। তুমি আর আমার কী উপকার করতে পারবে? শুধু বাজাও তোমার বাঁশি। আমি শুনি। খুব করুণ কোনো সুর বাজাও।"

ভাঁড় প্রশ্ন করলো, "চাঁদটাকে ওরা কত বড় বলছে? আর কতই বা দূরে?"

উত্তরে রাজা বললেন, "প্রধান মন্ত্রী বলছে পঁয়ত্রিশ হাজার মাইল দূরে আর রাজকন্যের ঘরের চেয়ে বড়। রাজসভার যাদুকর বলছে এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার মাইল দূরে আর এই প্রাসাদের দ্বিগুণ তার আয়তন। রাজসভার প্রধান গণিতজ্ঞ বলছে তিন লক্ষ মাইল দূরে আর এই রাজ্যের অর্ধেক সেটা হবে।"

খানিক বাঁশি বাজিয়ে ভাঁড় বললো, "মহারাজ! তাঁরা সবাই পণ্ডিত লোক। তা হলে তাঁদের সবাইকার কথাই ঠিক। আর তাঁদের প্রত্যেকের কথাই ঠিক হলে তাঁরা প্রত্যেকে চাঁদটাকে যতটা বড় আর যতটা দূরে বলছেন চাঁদটা সত্যিই ঠিক ততটা করে বড় আর ততটা করে দূরে। এখন আমাদের দেখতে হবে রাজকন্যে তাকে কতটা বড় আর কতটা দূর মনে করে।"

রাজা বললেন, "এ-কথাটা তো আমার মাথায় খেলেনি।"

"মহারাজ! আমি নিজে গিয়ে রাজকন্যেকে এই প্রশ্ন করবো।"

ভাঁড়কে দেখে রাজকন্যে খুসি হোলো সত্যি, কিন্তু তার মুখটা ভারি শুকনো আর স্বরটা ভারি দুর্বল দেখা গেলো।

সে বললো, "আমার জন্যে চাঁদকে তুমি কি এনেছো?"

ভাঁড় উত্তর দিলো, "না রাজকন্যে, এখনো আনতে পারিনি। শিগগীরই কিন্তু নিয়ে আসবো। চাঁদটাকে তোমার কত বড় বলে মনে হয়?"

রাজকন্যে বললো, "আমার বুড়ো আঙুলের নোখের চেয়েও ছোটো। কারণ যখনই বুড়ো আঙুলটা চাঁদের দিকে তুলেছি তখনি দেখেছি বুড়ো আঙুলের নোখ দিয়েই ঢাকা যায় তাকে।"

ভাঁড় আবার প্রশ্ন করলো, "কত দূরে চাঁদ রয়েছে বলে তুমি মনে কর ?"

রাজকন্যে উত্তর দিলো, "আমার জানলার বাইরের ঐ লম্বা গাছটার মতোও চাঁদটা উঁচু নয়। কারণ মাঝে-মাঝে দেখেছি চাঁদ তো ওর মগডালে আটকে গেছে।"

ভাঁড় বললো, আজ রাতে চাঁদটা যখন মগডালে আটকে যাবে আমি তখন গাছে উঠে তোমার জন্যে পেড়ে আনবো।" তারপর কী মনে হওয়ায় প্রশ্ন করলো, "রাজকন্যে ! কী দিয়ে চাঁদটা তৈরি ?"

রাজকন্যে বললো, "আরে বোকা ! তাও জানো না ? চাঁদটা যে সোনা দিয়ে তৈরি !"

ভাঁড় তখনি গেলো রাজসভার স্যাকরার কাছে তারপর তাকে দিয়ে দাজকন্যের নোখের চেয়ে কিছু ছোটো একটা সোনার চাঁদ বানিয়ে নিলো। তারপর একটি পাতলা সোনার চেনে সেই চাঁদকে দিলো জুড়ে রাজকন্যে যাতে গলায় পরতে পারে।

স্যাকরা প্রশ্ন করলো, "কিন্তু ঐ জিনিসটা হোলো কী ?"

ভাঁড় বললো, "তুমি চাঁদ বানিয়েছো। বুঝতে পারছো না এটা চাঁদ ?"

স্যাকরা বললো, "কিন্তু চাঁদ তো পাঁচ লাখ মাইল দূরে আর ব্রোঞ্জ দিয়ে তৈরি আর মার্বেলের মতো গোল।"

সেই চাঁদটা নিয়ে যেতে-যেতে ভাঁড় বললো, "অর্থাৎ তুমি তাই মনে করো।"

রাজকন্যের কাছে চাঁদকে নিয়ে এলো ভাঁড় আর খুসিতে উপছে পড়লো রাজকন্যে। পরের দিন আবার সে সুস্থ হয়ে উঠলো। পারলো উঠে দাঁড়াতে, বাগানে গিয়ে খেলতে।

কিন্তু রাজা জানেন আজ রাত্রেও আকাশে আবার চাঁদ উঠবে আর সেটা নজরে পড়লেই রাজকন্যে বুঝবে হারের সঙ্গে তার বুকে যে-চাঁদ ঝুলছে সেটা আসল চাঁদ নয়। তাই তিনি প্রধান মন্ত্রীকে বললেন, "আজ রাতে রাজকন্যে কিছুতে যেন চাঁদকে দেখতে না পায়। একটা উপায় বাৎলাও।"

আঙুল দিয়ে কপালে কয়েকটা টোকা মেরে মন্ত্রীমশাই বললেন, "রাজকন্যের জন্যে আমরা একটা কালো চশমা বানিয়ে দিতে পারি।"

শুনে রাজা ভীষণ রেগে বললেন, "কালো চশমা পরলে রাজকন্যে সব জিনিসের সঙ্গে ধাক্কা খাবে। আর তারপর আবার পড়বে অসুখে।"

আবার তিনি ডেকে পাঠালেন যাদুকরকে। যাদুকর এসেই প্রথমে হাতে, তারপর মাথায় তারপর আবার পায়ের উপর দাঁড়ালো।

সে বললো, "কী করতে হবে জানি। সার্কাসের তাঁবুর মতো রাজপ্রাসাদের বাগানের ওপর আমরা বাঁশের আগায় কালো ভেলভেট টাঙিয়ে আকাশটাকে ঢেকে দিতে পারি।"

শুনে ভীষণ খাপ্পা হয়ে হাত নাড়তে-নাড়তে রাজা বললেন, "কালো পর্দা টাঙালে বাতাস আসতে পারবে না আর তার ফলে রাজকন্যে আবার পড়বে অসুখে।"

তিনি ডেকে পাঠালেন গণিতজ্ঞকে।

গণিতজ্ঞ প্রথম ঘুরলো বক্রাকারে, তারপর চৌরস পথে, তারপর দাঁড়ালো স্থির হয়ে আর তারপর বললো, "পেয়েছি মহারাজ ! প্রত্যেক রাত্রে বাগান থেকে আমরা বাজি পোড়াবো। আর রূপোলি ফোয়ারা আর সোনালি ঝর্ণা বানাবো আর সেগুলো খুলে দিলেই সমস্ত আকাশে রঙের এতো ফুলঝুরি উড়বে যে আলোয় একেবারে হয়ে যাবে দিন। ফলে রাজকন্যে চাঁদকে আর দেখতে পাবে না।"

শুনে বেজায় খাপ্পা হয়ে রাজা লাফঝাঁপ সুরু করলেন। তিনি বললেন, "বাজি পোড়ালে রাজকন্যে ঘুমোতে পারবে না—ফলে আবার পড়বে অসুখে।" বিদায় করলেন তিনি গণিতজ্ঞকে।

আকাশের দিকে চেয়ে তিনি দেখেন বাইরেটা অন্ধকার হয়ে গেছে আর দিগন্ত থেকে চাঁদের উজ্জ্বল মাথা সবে উঁকি মারতে সুরু করেছে।

ভীষণ ভয় পেয়ে তিনি ভাঁড়াক ডেকে পাঠালেন।

ভাঁড় এলে রাজা বললেন, "খুব করুণ কোনো সুর শোনাও। রাজকন্যে চাঁদকে দেখলেই আবার অসুখে পড়বে।"

বাঁশিতে খানিক টোকা মেরে ভাঁড় প্রশ্ন করলো, "আপনার পণ্ডিতরা সবাই কী বলেন ?"

রাজা বললেন, "রাজকন্যেকে অসুস্থ না করে তারা চাঁদ ঢাকবার উপায় বাৎলাতে পারে না।"

আর একটি সুর খুব মৃদু সুরে বাজিয়ে ভাঁড় বললো, "আপনার পণ্ডিতরা চাঁদকে যদি ঢাকতে না পারে তা হলে বুঝতে হবে চাঁদকে কখনো ঢাকা যায় না। কিন্তু চাঁদকে ঢাকার উপায় কে বলতে পেরেছিলো ? সে রাজকন্যে নিজেই। তাহলেই বুঝতে হবে রাজকন্যের বুদ্ধি আপনার সমস্ত পণ্ডিতের চেয়ে বেশি, আর চাঁদের বিষয় তাঁদের চেয়ে ঢের অনেক বেশি খবর রাখে। অতএব তাকেই জিগগেস করতে চললুম।" রাজা ভাঁড়কে বাধা দেবার আগেই নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে বিরাট মার্বেল পাথরের সিঁড়ি ভেঙে উঠে রাজকন্যের শোবার ঘরে এসে সে পৌঁছলো।

রাজকন্যে বিছনায় শুয়েছিলো বটে কিন্তু ঘুমোয়নি। বড়-বড় চোখ মেলে বাইরের আকাশের উজ্জ্বল চাঁদের দিকে চেয়েছিলো। তার হাতে চকচক করছিলো ভাঁড়ের দেওয়া সেই ছোট্ট চাঁদটা। তার চোখ মুখ ভারি করুণ আর মনে হোলো তার চোখেও বুঝি জল।

কাতর স্বরে ভাঁড় বললো, "রাজকন্যে ! আমাকে বুঝিয়ে দাও তো তোমার গলায় যখন চাঁদটা হার থেকে দুলছে সেই চাঁদটাই কী করে তখন আবার আকাশে ঝকমক করতে পারে ?"

তার দিকে চেয়ে রাজকন্যে হেসে ফেললো। বললো, "আরে বোকা ! এই সহজ কথাটাও বোঝ না ! আমার যখন একটা দাঁত পড়ে যায় তখন আর একটা দাঁত কি সে-জায়গায় উঠে আসে না ? মালি যখন বাগানের ফুলগুলো কেটে দেয় তাদের জায়গায় আবার তো নতুন ফুল ফোটে।"

ভাঁড় বললো, "আমার এ-কথাটা মাথায় আসা উচিত ছিলো। এটা তো জলের মতোই পরিষ্কার !"

রাজকন্যে বললো, "চাঁদের বেলাতেও ঠিক সেই রকম। একটা চাঁদ তুলে আনলে আর একটা চাঁদ ওঠে। আমার মনে হয় সমস্ত ঘটনাই ঘটে এই একই নিয়মে।" বলতে-বলতে রাজকন্যের কথা মৃদু হয়ে মিলিয়ে গেলো। ভাঁড় দেখলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ধীরে-ধীরে তার গায়ে টেনে দিলো সে চাদর।

কিন্তু ঘর ছেড়ে যাবার আগে জানালার কাছে গিয়ে চাঁদের দিকে চেয়ে সে একবার চোখ মটকালো, কারণ ভাঁড়ের মনে হোলো চাঁদটাও যেন তার দিকে চেয়ে চোখ মটকাচ্ছে ! [কা চ.]

ত ওরা জানুয়ারি শাহ্ নাওয়াজ, ধীলন এবং শেহ্গল ক্তি পেয়েছেন। ভারতবর্ষের সমবেত জনমতের জোরেই ই ঘটনা আজ সম্ভব হোলো। আমরা আশাকরি আরো অন্যান্য আই. এন্. এ. ফৌজের বন্দীরা, যাঁদের বিরুদ্ধে এখনো বিচার চলছে, শীঘ্রই মুক্তি পাবেন।

* * *

গত ১৯শে জানুয়ারি ৪৮ দিন বাংলা দেশ এবং আসামে থাকবার পর মহাত্মা গান্ধী সোদপুর থেকে স্পেশ্যাল ট্রেনে মাদ্রাজ যাত্রা করেছেন। প্রত্যেক বাঙালীই আশা করেন শীঘ্রই মহাত্মাজীকে আবার নিজেদের মধ্যে ফিরে পেতে। বাংলা দেশের মতো এমন নির্যাতীত এবং বিপন্ন প্রদেশ আজকের দিনে ভারতবর্ষে বোধ হয় আর কোথাও নেই। কিছুদিন আগেই চট্টগ্রামের কাছে সাথাজারী গ্রামে 'সিভিল পায়োনিয়র ফোর্স ইউনিটে'র এক দল লোক অকথ্য অত্যাচার করেছে। গ্রামকে গ্রাম তারা পুড়িয়ে করেছে ছারখার, জলন্ত আগুনের ভিতরেও নাকি মানুষকে ফেলে পুড়িয়েছে, অসহায় গ্রামবাসীদের ধরে করেছে নির্দয়ভাবে প্রহার। ঐ খবর জানা যেতে-না-যেতেই কাগজে আবার বড়-বড় হরফে খবর বেরুলো স্টিমার-ঘাটের জেটি ভেঙে যাওয়ায় গঙ্গাসাগরের তীর্থযাত্রীদের মধ্যে ১৫০ জনের উপর স্ত্রী-পুরুষের অপঘাত মৃত্যু হয়েছে, আহত হয়েছে আরো অনেক লোক। বাংলা দেশে দুর্ভিক্ষ, মহামারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগেরও কামাই নেই। একটির পর একটি তারা লেগেই আছে। এই বাংলা দেশে চাই সুব্যবস্থা, চাই সুবিচার, চাই বিপন্ন নরনারীকে সেবা-শুশ্রূষা-সাহায্য, চাই তাদের বিদ্ধস্ত জীবনে আশার কথা, আনন্দের কথা শোনানো, চাই তাদের মনে বাঁচবার উৎসাহ আর প্রেরণা জাগানো। আজকের দিনে মহাত্মাজীকে বাংলা দেশ তাই এতো বেশি কার কাছে পেতে চায়।

* * *

হিলিয়ম নামে এক ধরণের গ্যাস আছে যা শুধু মার্কিন দেশেই পাওয়া যায়। প্রকৃতির অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে মিশে থাকে এই গ্যাস। কোনো জিনিস থেকেই এই গ্যাসকে তৈরি করা যায় না। হিলিয়মের না আছে স্বাদ, না গন্ধ কিংবা রঙ। আগুনে এ জ্বলে না, কোনো রকম বিস্ফোরণের ভয় নেই এই গ্যাস থেকে, এমন কি এটা বিষাক্তও নয়। তবে হিলিয়মের কথা লিখছি কেন? তার কারণ আজকের দিনে এই গ্যাসের মতো প্রয়োজনীয় জিনিস খুব কমই আছে।

হিলিয়মের ওজন বাতাসের একের সাত ভাগ। আগে এই গ্যাস ভরে বেলুন ওড়ানো হোতো—ছোটো আর বড় বেলুন। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে হিলিয়ম নিয়ে নানা রকম পরীক্ষা হয়ে গেছে। তাইতেই জানা গেছে হিলিয়মের আশ্চর্য প্রয়োজনীয়তা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে উভয় পক্ষই অসংখ্য জাহাজ ডুবিয়াছে। লড়াই থামার পর আজ দিন এসেছে সমুদ্রের তলা থেকে সেই সব ডুবো-জাহাজগুলিকে উদ্ধার করা। এই উদ্ধার কাজে হিলিয়ম অদ্ভুত সাহায্য করছে। আগে ডুবুরির জলের মাত্র ৩০০ ফিট তলায় কয়েক মিনিটের জন্যে থাকতে পারতো। আজকের দিনে কিন্তু জলের ৬০০ ফি[ট] তলাতেও অনায়াসে মানুষ যেতে পারে। এটা সম্ভ[ব] হোলো হিলিয়মের জন্যে। ডুবুরি যে-বাতাসে নিশ্বেস নে[য়] সেই বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে হিলিয়মও থাকে মেশানো। ফলে জলের তলায় সাধারণ বাতাসে নিশ্বেস নেবার ফ[লে] ডুবুরিদের যে-রকম সাময়িকভাবে জ্ঞান লোপ পেতো [তা] আজ আর হয় না। হিলিয়ম-মেশানো আবহাওয়ায় তাদে[র] মন পরিষ্কার ও সুস্থ থাকে।

উড়োজাহাজ যত হাল্কা হয় ততই ভালো। উড়োজাহাজে[র] টায়ারে এতোদিন সাধারণ বাতাসই ভরা হোতো। আজকাল বড়-বড় উড়ো-জাহাজের টায়ারে হিলিয়ম ভ[রে] দেখা গেছে ওজন দেড় মনের চেয়েও বেশি কমেছে।

কিন্তু হিলিয়মের সবচেয়ে বেশি উপকারীতা বোধ হ[য়] চিকিৎসা'র ক্ষেত্রে। অনেক কষ্টদায়ক অসুখ এবং যন্ত্র[ণা] হিলিয়মের সাহায্যে কমানো হচ্ছে। যেমন ধর হাঁপানী। হিলিয়ম ও অক্সিজেন গ্যাস মেশানো আবহাওয়ায় দু-চা[র] বার নিশ্বেস নিলেই রোগী সুস্থ বোধ করে। নিউমোনি[য়া] এবং নিশ্বেসের কষ্টতেও হিলিয়ম আশ্চর্য উপকার ক[রে] বলে দেখা গিয়েছে। অনেক শিশু জন্মাবার পর নিশ্বে[স] টানতে পারে না। হিলিয়ম তাদেরও প্রাণ বাঁচাচ্ছে।

অপারেশন করার আগে রোগীকে ওযুধ দিয়ে অজ্ঞা[ন] করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে ঐ ওযুধ ফুসফুসে[র] মধ্যে গিয়ে মৃত্যু ঘটায়। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে অজ্ঞান-করা ওষুধের সঙ্গে হিলিয়ম মিশিয়ে রোগীর উপর প্রয়োগ করার পর কোথাও মৃত্যু ঘটেনি।

হিলিয়মের সাহায্যে বহু ধাতু সহজেই জোড়া আজকাল সম্ভব হয়েছে। তা হলে দেখা যাচ্ছে আগামী দিনে চিকিৎসা এবং ব্যবসা দুয়েতেই এই অদ্ভুত গ্যাস যুগান্তর আনবে। কিন্তু সবচেয়ে মজার কথা আগেই বলেছি—কেউ জানে না কোথা থেকে এই গ্যাস এলো, কী করেই বা এটার হোলো সৃষ্টি, কেনই বা পৃথিবীর মধ্যে কেবলমাত্র মার্কিন রাজ্যেই এর দেখা মেলে!

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

তোমাদের কাছ থেকে পাওয়া রাশি-রাশি চিঠি জমেছে। তোমরা প্রত্যেকেই চাও 'চিঠির বাক্সে'র মধ্যে সেই সব চিঠির জবাব। অথচ জায়গা ভারি কম। সবাইকে প্রত্যেকবার উত্তর দিয়ে খুসি করা তাই সম্ভব নয়। তোমাদের কাছে একটি অনুরোধ আছে। যার চিঠির উত্তর একবার ছাপা হোলো সে যেন অন্তত দু মাসের মধ্যে আর চিঠি না লেখে। মনে রেখো সবাই-ই চায় চিঠির উত্তর। তাই একই গ্রাহকের চিঠির উপরি-উপরি সংখ্যায় উত্তর দিলে অন্য অনেকে, যাদের চিঠির উত্তর একবারও দেওয়া হয়নি, বাদ পড়ে যায়। সেটা তো ভালো কথা নয়, উচিতও নয়। তাই এই ব্যবস্থা।

অনেকের চিঠি পড়েই দেখি বিশেষ কিছুই বলবার নেই। সেই সব চিঠির উত্তর দেওয়া তাই নিরর্থক। এই বিভাগ তো শুধু নাম-ছাপাবার জন্যে করা হয়নি। ভালো চিঠির উত্তর দেবার জন্যেই করা হয়েছে। অনেকের চিঠিতে আবার এমন প্রশ্ন থাকে যার উত্তর এই বিভাগে আগেই ছাপা হয়েছে। সেই জন্যে বলি চিঠি লেখার আগে ভালো করে দেখে নেবে তোমার যা প্রশ্ন সেই প্রশ্ন আগে কেউ করেছে কিনা এবং তার উত্তর ছাপা হয়েছে কিনা।

আমাদের দেশে অনেক বয়স্ক লোক আছেন যাঁরা বড় হয়েছেন সত্যি কিন্তু সময়ের দাম বোঝেন না। তোমরা বড় হয়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে সময়ের দাম বুঝতে শিখো। এই বিভাগের মধ্যে দিয়ে সেটা শেখা খানিকটা সহজ হবে বলে মনে করি। বক্তব্য অল্প কথায় বলা, অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় কথায় চিঠি না-ভরানো অত্যন্ত দরকার। এখনো দেখছি অনেকে আট-দশ পাতা ভরে চিঠি লেখো। অথচ সেই সব চিঠিতে বলবার কিছু নেই। তাতে শুধু যে তোমাদের সময় নষ্ট হয় তাই নয়, আমাদেরও হয়। প্রতি মাসেই অন্তত হাজার খানেক চিঠি আসে। অতগুলি ঐ ধরণের অনাবশ্যক দীর্ঘ চিঠি পড়তে হলে আমাদের কী উপায় হবে একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি!

এইবার তোমাদের চিঠির উত্তর দিতে সুরু করা গেলো।

অহিভূষণ চৌধুরী (২৪১৭)—তোমার 'মুখে আর মনে' কবিতাটি ছাপা হোলো। তুমি লিখেছো: "আপনি আমাদের বড্ড 'তুমি' 'তুমি' করেন লেখেন। এবার থেকে 'আপনি' 'আপনি' কার লিখবেন আশাকরি। জানেন, আমাদের বাড়ির ওই বুড়ো নায়েব মশাই পর্যন্ত আমাকে 'আপনি' 'আপনি' করে কথা বলেন, আপনি কি তাঁর

চাইতেও বুড়ো?" তোমাদের নায়েবমশাই-এর মতো বুড়ো না হলেও তোমার চেয়ে আমরা নিঃসন্দেহে অনেক বড়। তিনি তোমাদের কর্মচারী, তাই তিনি তোমাকে যে-ভাবে সম্বোধন করবেন সে-ভাবে আমরাও করবো এটা একটু বেশি আশা করা নয় কি? রংমশালের 'চিঠিপত্র' বিভাগে কিংবা 'সম্পাদকের দপ্তরে'র মধ্যে 'আপনি' বলে লেখা অত্যন্ত খাপছাড়া দেখায়। অবশ্যই তুমি খুসি হলে এমনি যখন চিঠিপত্র লেখা হবে, কিংবা যদি কখনো পরিচয় হয় তখন, তোমাকে নিশ্চয়ই 'আপনি' সম্বোধন করা হবে। **কাশীনাথ পালিত (২৫৫০)**—নানা দুর্ঘটনায় এখনো মাসের প্রথম সপ্তাহে রংমশাল ছাপিয়ে উঠতে পারছি না। তবে মাসের প্রথম দিনে প্রকাশ করবার জন্যে খুবই চেষ্টা চলেছে। পাছে আবার কথা দিয়ে কথা রাখতে না পারি তাই আর কোনো বিশেষ মাসের উল্লেখ করলুম না যখন থেকে মাসের প্রথম দিনে রংমশাল পাবে—তবে শিগগীরই তোমাদের খুসি করতে পারবো বলে মনে করি। **অমলকুমার ঘোষ (২৩১৫)** 'মশালে'র লেখক এখনো উপন্যাসটি লিখে উঠতে পারছেন না। আমরা তো তাঁকে বলে-বলে হায়রান। এবার তোমরা তাঁকে সোজা চিঠি লেখো না! হয়তো তোমাদের কথা তিনি ঠেলতে পারবেন না। মাণিকবাবুর নামে রংমশালের ঠিকানায় তোমরা চিঠি দিলেই আমরা পাঠাবার ব্যবস্থা করবো। **অপর্ণা মুখোপাধ্যায় (২৫৭৮)**—কী করলে ভালো কবিতা লেখা যায়—এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর কেউ দিতে পারেন বলে তো মনে হচ্ছে না। অন্তত আমি পারলুম না। তোমার কবিতাটি ছাপা গেলো না। **নির্মলেন্দু ঘোষ (২৫৯১)**—ইন্দোনেশিয়ার উপর তোমার কবিতাটি প্রকাশযোগ্য হয়নি। আশাকরি নিরুৎসাহ হবে না। **সুকুমার সাহা (২৪৯২)**—মাণিকবাবুকে অনুরোধ জানিয়ে তুমিও চিঠি লিখো। **তপতী বাকচী (২৫৯০)**—তোমার দুটি কবিতাই ভালো হয়েছে। একটি এই সঙ্গে ছাপলুম। অন্যটি ভবিষ্যতে ছাপা হবে। 'বড়দের ছোটোবেলা' সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে তুমি যা লিখেছো এখানে তা উদ্ধৃত করলুম: "একটি ছোটো ছেলে রবীন্দ্রনাথকে একবার প্রশ্ন করেছিলো কী করে এতো বড় কবি তিনি হয়েছেন! উত্তরে রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেন, 'কী করে তুমি এতো বড়টি হয়েছো?'" **পীযূষকান্তি ঘোষ (২১৬০)**—পোস্ট কার্ডে তুমি যে কবিতাটি লিখে পাঠিয়েছো সেটি একেবারেই পড়তে পারলুম না। ছাপাবার জন্যে কোনো রচনা পাঠাতে হলে কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার করে লিখে পাঠাতে হয়। **জ্যোতির্ময় ঘোষ দস্তিদার (১৯৪১)**—ছোটোদের অনেক কিছু করতে ভালো লাগে না। কিন্তু ভালো লাগে না বলেই সে-কাজ না করা ঠিক নয়। কারণ এমন অনেক জিনিস আছে বড় না হলে যা ভালো বোঝা যায় না। গান্ধীজীর মতবাদ সম্বন্ধে অল্প জায়গায় এক কথায় কোনো কথা বলতে যাওয়া অসম্ভব। **গৌরাঙ্গ কুণ্ডু (২৫৭৩)**—তোমার পাঠানো কবিতাগুলি ছাপা গেলো না। অনেক দোষ আছে। তুমি ঠিকই কয়েকটি ছাপার ভুলের কথা দেখিয়েছো। একটি কথা জানো বোধ হয়—সেটা হচ্ছে ছাপাখানার ভূত! এই ভূত এমন সব আজগুবি কাণ্ড করে যা ছাপা অক্ষরে না দেখলে বিশ্বাসই হয় না। আগামী বছরের জন্যে এখন থেকেই নানা পরিকল্পনা করছি। ইতি

তোমাদের
সম্পাদকমশাই

বাংলা বনাম হোলকার

একদিকে সি. কে. নাইডু, সি. এস. নাইডু, মুস্তক, সারওয়েট, নিম্বলকার, জগদেল আর অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য নামের জায়গায় শুধু কার্তিক, চৌধুরী আর নির্মল—এ-খেলার ফলাফল যে কী হবে আগে থাকতেই অনেকটা তা আঁচ করা গিয়েছিলো। তবু মনে-মনে আশা ছিলো এ-পর্যন্ত হোলকার দল বাংলাকে কখনোই হারাতে পারেনি: হোলকার নামে খেলতে এসেও না, সেন্ট্রাল ইণ্ডিয়া নামেও না। তা ছাড়া ক্রিকেটে যে-কোনো অসম্ভব ঘটনা ঘটতেও দেখা গেছে। তাই রঞ্জি ট্রফির খেলা দেখতে ১৯শে জানুয়ারি যখন মাঠে গেলুম তখনো খুব একটা নিরাশ ভাব নিয়ে যাইনি।

আগের প্রত্যেকবারই বাংলার দল হোলকারকে হারিয়েছে সত্যি কিন্তু আগের প্রত্যেকবারের সঙ্গে এবারের তফাৎ অনেক। এবার বাংলা দলে একটিও সাহেব খেলোয়াড় নেই এবং লজ্জার কথা সন্দেহ নেই, এই সাহেবরাই বলতে গেলে বাংলা দলের মান রেখেছে—বাঙালী খেলোয়াড়রা নয়। তা ছাড়া সবাই তো দেখেইছে এখনকার নির্মল আগেকার নির্মলের ছায়া মাত্র, দলের নায়ক কার্তিক যে কখন ভালো খেলবেন আর কখন শূন্য করবেন সে-কথা ভগবানও জানেন না। এর উপর আবার কে. ভট্টাচার্যের মতো চৌকোষ খেলোয়াড়কে দল নির্বাচকরা বুদ্ধি করে বাদ দিয়েছেন! এটা যে কত বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয় ক্রিকেট নিয়ে যাঁরাই অল্প বিস্তর মাথা ঘামান তাঁরাই জানেন।

যাই হোক, তবু খেলা দেখতে যাওয়া গেলো আর ইডেন গার্ডেনের পরিচিত জায়গায় বসে তুমুল আলোচনা চললো ইতিপূর্বে কোন ম্যাচে কী-কী অসম্ভব কাণ্ড ঘটেছে। বাংলার দল টসে জিতে প্রথম নামলো ব্যাট করতে। কিন্তু ঐ পর্যন্তই! দেখতে-দেখতে ভোজবাজীর মতো উইকেট পড়তে লাগলো—আট উইকেট হারিয়ে বাংলা দল করলো মাত্র ৪০ রাণ। তার মধ্যে কার্তিক ১৫, নির্মল ১, ধ্রুব ০, পি. বি. দত্ত ২, ইত্যাদি। অধিকাংশ খেলোয়াড়ই হলেন বোল্ড আউট—শুধু কার্তিক আউট হলেন বোকার মতো 'প্লেড অন' আর নির্মল হলেন 'হিট উইকেট'-এ। শুধু মস্তফি, ব্যানার্জি আর চৌধুরী খানিকটা মান রাখলেন—৪০ থেকে রান নিয়ে গেলেন ১১৯-এ। বিশেষ করে মুস্তফির খেলা সত্যিই প্রশংসনীয় হয়েছিলো—১১৯ টোটালের মধ্যে তিনি একাই যে ৫২ করেছিলেন শুধু তাই নয়—তাঁর খেলার স্টাইলও হয়েছিলো খুব সুন্দর। বিশেষ করে দলের বড়-বড় রথীরা

যখন মুখ চূর্ণ করে শূন্য কিংবা তুই আর এক রান করে প্যাভিলিয়নে চটপট ফিরে যাচ্ছেন তখন দৃঢ় পায়ে দাঁড়ানো আর বল পেটানো খুব কম কথা নয়। লাঞ্চের পরেই তবু বাংলার ইনিংস শেষ হোলো। মুস্তফি রান আউট হয়ে গেলেন। হোলকার দলের নিম্বলকার ২, জগদেল ৪, সি. এস. ২ এবং সারওয়েট ১টি উইকেট পেলেন।

প্রথম দিন খেলা শেষ হবার পর চার উইকেটে হোলকার করলো ১৭০। এর মধ্যে ভাণ্ডারকার ৫, সরওয়েট ৪২, মুস্তক ২৮ এবং সি. এস্. ১৩ করে আউট হলেন। সি. কে. আর নিম্বলকার ৩৫ আর ৩৩ করে নট আউট রইলেন।

প্রথম দিনের চেয়ে দ্বিতীয় দিনের খেলা অনেকটা ভালো হয়েছিলো সত্যি, কিন্তু দ্বিতীয় দিন খেলার শেষে স্পষ্টই বোঝা গেলো একটা আশ্চর্য কাণ্ড না হলে বাংলা দলের জেতবার কোনো আশা নেই। ক্রিকেটে আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে বটে-কিন্তু ফরমাস মতো তা তো আর ঘটে না!

দ্বিতীয় দিনে হোলকারের প্রথম ইনিংস শেষ হোলো ২৮৮ রানে—অর্থাৎ বাংলা দলের চেয়ে ১৬৯ রান বেশি। বাংলার হয়ে সবচেয়ে ভালো বল দিয়েছিলেন ব্যানার্জি আর চৌধুরি—দু'জনে যথাক্রমে ৪ টি আর ৩টি উইকেট পেয়েছিলেন।

দ্বিতীয় ইনিংস-এর খেলায় দত্ত আর ধ্রুব মোটামুটি ভালোই আরম্ভ করলেন। দত্ত অবশ্য ১৪ রান করে আউট হলেন কিন্তু তারপর পি. সেন আর ধ্রুব বেশ ভালো খেলে টোটাল নিয়ে গেলেন ৯৩-তে। পি. সেন ভালোই খেলছিলেন, কিন্তু অসাবধানতার জন্যে মাত্র ২৭ করেই এল্. বি. ডাবলিউ আউট হলেন। কিন্তু দ্বিতীয় দিনে সবচেয়ে ভালো খেলা দেখা গিয়েছিলো ধ্রুব আর নির্মলের জুড়িতে। সবচেয়ে ভালো লাগলো নির্মলের খেলা। অনেক দিন পরে নির্মল সত্যিকারের ভালো খেললেন—সেই পুরনো নির্মলের খেলা। উইকেটের চারদিকে সেই পিটিয়ে মার, কোথাও ভুলচুক নেই, কোথাও দ্বিধা-সংকোচ নেই। নিজের উপর রয়েছে সম্পূর্ণ বিশ্বাস—নির্ভুল ভাবে বুঝছেন বলের গতি তারপর সুন্দর মারছেন প্রত্যেকটি বল। বাস্তবিক বহুদিন পরে নির্মলের ভালো খেলা দেখা গেলো আর সেই সঙ্গে মনে হোলো বাংলা দেশের এই তরুণ খেলোয়াড় আবার ফিরিয়ে আনবেন নিজের লুপ্ত গৌরব।

প্রথম দিন ৬ উইকেটে বাংলা দল করলো ২২২ রান। কার্তিক করলেন ০। মণ্টু আর নির্মল রইলেন নট আউট ৬৮ আর ২৫ করে।

তৃতীয় দিনে লাঞ্চের আধ ঘণ্টা পরেই খেলা শেষ হোলো। হোলকার এই প্রথম হারালো বাংলা দলকে পাঁচ উইকেটে। বাংলার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হোলো ২৬৬ রানে। তার মধ্যে নির্মল করলেন ৯৯। ক্রিকেটে ৯৯ আর ১০০'র মধ্যে মাত্র একটি রানেরই তফাৎ নয়—তফাৎ অনেক। তবু নির্মলের খেলা দেখে সেদিন সবাই যে-রকম খুসি হয়েছিলো তাতে নির্মল সেঞ্চুরি করলেও আর বেশি খুসি করতে পারতেন না। নির্মলের খেলাই বাংলা দলের মধ্যে—এমন কি উভয় দলের মধ্যেই—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হয়েছিলো। কোথাও এতোটুকু ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই, কোনোখানে খুঁত নেই।

প্রথম ইনিংস-এর ঐ কেলেঙ্কারির পর কেউই অবশ্য ভাবতে পারেনি যে বাংলা দল জিতবে। তবু বাংলা দল শেষের দিকে যে-রকম লড়েছিলো সেটাও কম আশ্চর্য নয়।

হোলকার দল দ্বিতীয় ইনিংসে খেলতে নামলো মাত্র ৯৮ রান করতে হবে ভেবে। ৫ উইকেটে তারা করলো ১০২—নাইডু ভাইরাই খেলটা জিতলেন : সি. এস্. করলেন ৪০ আর সি. কে. করলেন ৬—দু'জনেই নট আউট।

দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যানার্জি পেলেন ৩ আর মণ্টু সেন পেলেন ২টি উইকেট। আর হোলকার দলের জগদেল ২, সি. এস্. ৪, সারওয়েট ৩ আর নিম্বলকার পেলেন ১টি উইকেট।

বাংলা দেশকে এখনো ক্রিকেট খেলা শিখতে হবে।

মুখে আর মনে

অহিভূষণ চৌধুরী (২৪১৭)

ব্রজেশবাবু? কী ভাগ্যি মোর! আসুন, আসুন, নমস্কার,
[সকাল বেলায় ভালো আপদ জুটলো দেখি হঠাৎ কার!]
দীনের বাড়ি পায়ের ধূলি,—আজকে আমার সুপ্রভাত,
[ক'দ্দিন বা দু' বেলাতেই নেই-খরচায় মারবে ভাত!]
খবর কী সব দেশের বাড়ীর—আছেন সবাই কেমন কে?
[ব'য়েই গেল আমার তা'তে বাঁচুক কিংবা মরুক গে।]
ছেলেপুলে সবাই শুনি নম্র, ধীর ও গুণবান্?
[কি গুণধর পুত্র আহা—এক একটি তো হনুমান!]
দয়া ক'রে এলেন যদি থাকুন দু'দিন মোর বাড়ী;
[হে মা কালী! রক্ষা করো, কিসে আপদ দিই পাড়ী।]
ওরে রামা! তাড়াতাড়ি চা নিয়ে আয় জলখাবার,
[কালকে যেটা উপরি পেলাম—সবটা বুঝি হয় কাবার।]
কী বল্লেন এ্যাঁ, খাবেন না চা? আরে মশাই তাও কি হয়?
[সাত পুরুষের কুটুম কিনা? পিণ্ডিটা না দিলেই নয়?]
একটুখানি মিষ্টি কিছু, তাও না? আমার বরাত দোষ,
[উঠলে বাঁচি হে মা কালী, ঘুচে মনের এ আফ্‌শোষ।]
উঠছেন এ্যাঁ, নানা মশাই,—এ বেলাটা অন্তত,
[একটি বেলার ঠেলা নিতেই প্রাণটি হ'তো অন্ত তো!]
আচ্ছা আসুন, বারান্তরে রইলো আবার আমন্ত্রণ,
[এক্ষুণি এক "টু লেট" লিখে দিই বাহিরে বিজ্ঞাপন।]

চুল-হারার গান

(রবীন্দ্রনাথের অনুশরণে)

তপতী বাগচী (২৫৯০)

চুলগুলি মোর টেকো মাথায় রইল না—রইল না
সেই যে আমার কাঁচা-পাকা চুলগুলি
ঠাট্টাহাসির বাঁধন তারা সইল না সইল না।
নানান-তেলের কুহকভাষা
—টিঁকবে তারা ছিল আশা
উঠে গেলো একটিও গো রইল না রইল না।
স্বপন দেখি তারা যেন ফিরে আসে
ফেরে আমার খালি মাথার চারপাশে
সেই যে আমার কাঁচাপাকা চুলগুলি।
এতো যতন হয় কি ফাঁকি
ওরা কী সব ভেলকি নাকি
মাথার উপর কিছুই যে গো রইল না রইল না।

প্রমাণ

সিদ্ধার্থকুমার মুখোপাধ্যায় (৯১)

(বয়স—৭ বছর)

তোমাদের কাছে এইসব ঘটনা বলছি, কিন্তু ঘটনাটা ভূতের। আমরা তখন সিলপুরে থাকি। একদিন রাতে দিব্বি ঘুম দিচ্ছি এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকলো। ডাক শুনে আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। দেখলাম, অনেকগুলো ভূত আমাকে ডাকছে। আমার তো ভয়ে গা ছমছম করতে লাগলো। পরের দিন সকালে এ-কথা আমার দাদা-দিদিকে বললাম। কিন্তু শুনে তারা বললে, যত সব গাঁজাখুরি গল্প। বললে, মা'র কাছে গল্প শুনে তাই আবার আমাদের বলতে এসেছে। দাদা-দিদিরা তো বিশ্বাস করবে না, তাই তোমাদের কাছে বলছি। তোমরাই বলো, এটা কি গাঁজাখুরি গল্প হোলো ?

চলার শেষ

সৈয়দ নুরল আলম (২০৬৬)

শীতল বায় পথিক যায়, মিলিয়ে এলো দিনের আলো,
বনের পথ নীরব প্রায়, ঝিঁঝিঁর ডাক লাগছে ভালো।
পাপিয়া ডাকে গাছের শাখে, সন্ধ্যা দেবী আঁচল খানি
বধূর দল কলসী কাঁখে। ধরার বুকে দিলেন টানি।
গাঁয়ের পথ ধূসর বাঁকা, পথিক এসে থামলো গ্রামে
পথিক তা'তে চলছে একা। যখন ধরায় আঁধার নামে।

বস্ত্রসংকট সমাধান

আশিস দত্ত (১৫৬৯)

মন্ত্রবিহীন কেসি সাহেব আদেশ দেবেন অতঃপর,
"বাংলাদেশে নতুন সময় করব চালু খুব জবর।
ভারত-রক্ষা-আইনে :
হুকুম দেব, দিনকে দিবস করতে মনে চাইনে।
রাত্রি হবে দিবস এবং দিবস হবে রাত্র,
জেলে যাবে হুকুম আমার মানবে না যে পাত্র।
থিওরি সব লিখুন বসে যতেক স্বাস্থ্যবিদরা,
আমার আদেশ রাত্তিরে কাজ, দিবসকালে নিদ্রা।
নিস্প্রদীপের আজ্ঞা দেব, লিখে দু-এক ছত্র,
রাত্রিকালে আঁধার মাঝে লাগবে না কো বস্ত্র !"

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

ভারতবর্ষের গ্রামে-গ্রামে সহরে-সহরে ২৬শে জানুয়ারিতে "স্বাধীনতা দিবস" পালন করা হয়। এ-বছরেও হোলো। কিন্তু কেন এই দিনটিকে "স্বাধীনতা দিবস" বলে ঘোষণা করা হয়েছে, কবে থেকেই বা হয়েছে সে-খবর ভালো করে তোমরা বোধ হয় জানো না। আজ তোমাদের সেই গল্প বলবো।

তোমরা যারা জানো না শুনে নিশ্চয়ই দারুণ আশ্চর্য হবে যে প্রথম যখন ভারতবর্ষে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হোলো তার প্রতিষ্ঠাতারা কল্পনাই করতে পারেননি একদিন ঐ কংগ্রেস সমস্ত ভারতবর্ষ জুড়ে কোটি-কোটি মানুষের বুকে স্বাধীনতার তৃষ্ণা জাগাবে, চালাবে আন্দোলন, লড়াই করবে ইংরেজদের সঙ্গে ! কংগ্রেসের স্রষ্টারা স্বাধীনতার কথা ভাবতেও পারতেন না, উচ্চারণ করা তো দূরের কথা। তাঁরা মনে প্রাণে তখন বিশ্বাস করতেন ইংরেজরা ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি করেছে, উদ্ধার করেছে ভারতীয়দের, দিচ্ছে শিক্ষা, শেখাচ্ছে সভ্যতা। তাঁদের বিশ্বাস ছিলো মোগলরাজ্যের পতনের পর আভ্যন্তরীণ মারামারি কাটাকাটি থেকে ভারতীয়দের বাঁচিয়ে আবার স্বাভাবিক নিয়মবদ্ধ জীবন ফিরিয়ে এনে ইংরেজরা ভারতীয়দের স্বায়ত্তশাসন পাবার যোগ্য করে তুলছে এবং যেদিনই ভারতীয়রা যোগ্য হবে সেদিন থেকেই ইংরেজরা তাদের হাতে স্বায়ত্তশাসনের ভার তুলে দেবে। তখনকার দিনের সমস্ত বড়-বড় চাকরিই দেওয়া হোতো ইংরেজদের, ভারতীয়দের নয়—এইটাই তখন ছিলো কংগ্রেসের প্রধান নালিশ ! আরো মজার কথা শোনো : তখনকার দিনে প্রত্যেক কংগ্রেস অধিবেশন বসার আগে ইংরেজদের প্রতি রাজভক্তি অটুট রাখার প্রস্তাব গৃহীত করে সভার কাজ আরম্ভ হোতো। আসলে কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিলো অত্যন্ত দুর্বল একটি সমাজ-সংস্কারক প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

কিন্তু বেশিদিন এই সুর টিঁকলো। ডাবলিউ. সি. বাঁড়ুজ্জে ছিলেন প্রথম কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট। পরের বছর প্রেসিডেণ্ট হলেন দাদাভাই নৌরজি এবং তিনিই

প্রথম ঘোষণা করলেন কংগ্রেস পুরোপুরি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

লর্ড কার্জনের আমলে বাংলাদেশকে দ্বিধা-বিভক্ত করা নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে প্রথম একটি শক্তিশালী দল গড়ে ওঠে। সেই দলের নেতা ছিলেন তিলক ও অরবিন্দ। তাঁরাই প্রথম নিঃসংকোচে প্রচার করলেন কংগ্রেসের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বায়ত্তশাসন আদায় করে নেওয়া। এইভাবে অগ্রসর হতে-হতে ১৯০৮ সালে এলাহাবাদে কংগ্রেস অধিবেশনে প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য কী, কী পেতে সে চায়, কী-ভাবে সে এগুবে।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতবর্ষের মতো পরাধীন দেশরা খুব আশা করেছিলো লড়াই থামার পর স্বাধীনতা বুঝি পাওয়া যাবে। কিন্তু লড়াই থামার পর পুরস্কার হিসেবে সরকার বাহাদুর ভারতবর্ষে রাওলাট বিল প্রবর্তন করেন। তার ফলে ১৯১৯ সালের প্রথম দিকে মহাত্মাজী আন্দোলন সুরু করেন এবং তার প্রতিক্রিয়া হিসেবে সরকার পক্ষ থেকে পাঞ্জাবে নৃশংস কাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, জালিয়ানবালা বাগের ইতিহাস-কলঙ্কিত ঘটনাও ঘটে। উক্ত অত্যাচার সম্বন্ধে ইংরেজ জনসাধারণ এবং ইংরেজ সরকারের মনোভাব দেখে ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কংগ্রেসের একটি জরুরি বৈঠক বসে এবং সেইখানেই গান্ধীজীর বিখ্যাত অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয়।

১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে বলা হয় যে কংগ্রেসের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয়দের সাহায্যে শান্তিপূর্ণ ভাবে স্বরাজ লাভ করা। কিন্তু "স্বরাজ" বলতে ঠিক কী বোঝায় সে-কথা ইচ্ছে করেই তখন বিষদ করে বলা হয়নি। গান্ধীজী সে-সময় বলেছিলেন, "ইংরেজদের সঙ্গে আমাদের সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা আমি একবারও বলিনি। ইংরেজদের সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখার ফলে যদি ভারতবর্ষের উন্নতি হয় আমরা তা হলে সেই সম্পর্ক নষ্ট করতে চাইবো না। কিন্তু আমাদের জাতীয় সম্মানের সঙ্গে যদি তা খাপ না খায় তা হলে নিঃসন্দেহে আমাদের কর্তব্য হবে সেই সম্পর্ককে ছিন্ন করা।"

তারপর থেকে ক্রমাগত চেষ্টা চলে গান্ধীজীর ঐ মতকে বদলাবার। বহুবার চেষ্টা হয় কংগ্রেস প্রস্তাবের ঐ "স্বরাজ" কথাটিকে বদলে "পূর্ণ স্বরাজ" করার এবং কংগ্রেসের উদ্দেশ্যকে এইভাবে প্রচার করার : বাইরের কারুর আওতায় না থেকে পূর্ণ স্বরাজ পাওয়া। তারপর কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় কংগ্রেসের তরুণ এবং প্রাচীন নেতারা একটি চুক্তিতে আসেন। ঠিক হয় যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন (Dominion Status) না দেয় তাহলে কংগ্রেস তার প্রস্তাবের ঐ "স্বরাজ" কথাটিকে বদলে "পূর্ণ স্বরাজ" করবে।

১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর শেষ হোলো। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে বিশেষ কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না। মাঝ রাত্রে বারটার ঠিক পরেই, অর্থাৎ ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারির প্রথম প্রহরে কংগ্রেসের নেতারা সেই প্রস্তাবের "স্বরাজ" কথাটির জায়গায় "পূর্ণ স্বরাজ" লিখলেন।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ২৬শে জানুয়ারিকে "স্বাধীনতা দিবস" বলে ঘোষণা করে। ১৯৩০-এর পর থেকে প্রত্যেক ২৬শে জানুয়ারি'র দিনে দেশবাসীরা "স্বাধীনতা দিবস" পালন করে আর প্রতিজ্ঞা করে "পূর্ণ স্বরাজ" না পাওয়া পর্যন্ত তারা চুপ করে থাকবে না : পূর্ণ স্বরাজের জন্যে তারা লড়বে—অনেক দুঃখ অনেক যন্ত্রণা তারা পাবে, অনেক বিপদ অনেক বাধা আসবে তাদের সামনে, তবু দৃঢ় হাতে তিন-রঙা পতাকা তারা উঁচু করে তুলে ধরবে।

এক যে আছে সহর। সেই সহরে থাকেন পাঁচজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁদের নাম : অনাদি বসু, বিরূপাক্ষ সেন, বিজন রায়, শান্তি পাল এবং বিজয় গুপ্ত। তাঁরা এতোই গণ্যমান্য যে তাঁদের প্রত্যেকেরই নামে একটি করে রাস্তা আছে এবং প্রত্যেকেরই বড়ি ঐ নামের যে-কোনো একটি রাস্তায়। কেউ কিন্তু নিজের নামের রাস্তায় নিজে থাকেন না। বছরে পুজোর সময়ে একবার তাঁরা বাড়ি বদল করে ঐ পাঁচটির মধ্যে যে-কোনো একটি নামের পথের বাড়িতে গিয়ে থাকেন।

ঐ পাঁচজনের কোনো দুজন একই নামের পথে থাকেন না বা পুজোর সময় একই পথে আসেন না। এবং পুজোর সময় কেউই আবার নিজের নামের পথে থাকেন না।

শান্তি পাল পুজোর সময় যান বিজয় গুপ্ত রোডে। বিজন রায় পুজোর সময় যে-পথে যান সে-পথের নাম বিজয় গুপ্ত রোডে যিনি থাকেন তাঁরই নামে।

যে-ভদ্রলোক অনাদি বসু রোডে থাকেন তিনি পুজোর সময় যান শান্তি পাল রোডে এবং বিজয় গুপ্ত রোডের যিনি অধিবাসী পুজোর সময় তিনি যান যে-রাস্তায় অনাদি বসু রোডে যিনি থাকেন তাঁর নামের সঙ্গে তা মিলে যায়।

এখন হিসেব করে কি বলতে পারো বিজন রায় রোডে পুজোর সময় কোন ভদ্রলোক যান?

বরুণের বয়েস ৩৪ বছর।

উত্তরদাতাদের নাম

অগ্রহায়ণ মাসের ধাঁধার উত্তর যারা দেরি করে পাঠিয়েছো : মীরা ঘোষ (২৪৭২), মুকুল বিশ্বাস (২৪৭৬), অজিতকুমার হোর রায় (২৫২৮)।

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তরদাতাদের নাম :

প্রসন্নকুমার দাস (২৪২৩), সুকুমার সাহা (২৪৯২), প্রবীরকুমার রায়চৌধুরী (২২৬৯), হিমাংশুকুমার রায় (২৫২১)।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

ছোটদের উপযোগী উপন্যাস

সুশীল রায় প্রণীত

আকাশ স্বপ্ন

যে ধরণের উপন্যাস তোমরা এতদিন পড়ে এসেছো এই বই সে ধরনের নয়। ভৌতিক ভোজবাজী ও অসম্ভব ঘটনা নিয়ে আজগুবী কাহিনী রচনা করেননি সুশীল রায়। যা তোমার জীবনে ঘটতে পারে, তোমার বন্ধুর জীবনে ঘটতে পারে—সেই সাধারণ ঘটনাই এর বিষয় বস্তু। সুশীল রায়ের শিল্পকুশলতা এইখানেই যে তিনি সেই সাধারণ ঘটনাকেই নিপুণ হাতে সাজিয়েছেন, আর পাশে বসে গল্প বলার মত করে লিখেছেন। তোমরা কথার সঙ্গে ছড়া পছন্দ কর? ছড়ার সঙ্গে ছবি? তাহলে একখণ্ড 'আকাশ স্বপ্ন' তোমার চাইই।

দাম—১৲ টাকা

নন্দী পাবলিশিং হাউস

২২৭, রাসবিহারী এ্যাভেনিউ, কলিকাতা।

কা ল পু রু ষ

সিরিজ

কী

?

আ গা মী সং খ্যা রং ম শা ল দে খো

উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী

[দশম বর্ষ, একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

যার চেয়ে নাই সুন্দর

ফল্গু কর

পৃথিবীতে কিবা সবচেয়ে মনোরম ? যদি তোমাদের জিজ্ঞাসি আমি কবি
সজীব কথার মালাটি গাঁথিবে জানি, ফুটায়ে তুলিবে মনের রঙীন ছবি।
কেহবা বলিবে রাতে ঝিলিমিলি তারা, কেহবা বলিবে সোনালি সূর্যালোক,
রঙীন আকাশ কারও প্রাণে দেয় সাড়া, বাঁকানো নদীর রূপে বিমুগ্ধ চোখ।
পড়িয়াছে ধরা শত সহস্র রূপ আমারও চোখেতে ঠিক তোমাদের মত
শিশুর মুখেতে মায়ের দীঘল আঁখি, রূপেতে বিবস চাঁদ-ছাওয়া মেঘ নত।
কিন্তু জানিও মরুর জ্যোতির চেয়ে, ধবলগিরির শোভারে অতিক্রমি,
একটি সেরূপ আমার জীবন ছেয়ে, চির-জাগন্ত রহিয়াছে দিবাযামি।
একটি দিনের স্মৃতির প্রদীপখানি, তোমাদের মুখে তুলিয়া এবার ধরি,
সে আলোকে তুমি যেরূপ দেখিতে পাবে, জীবনে তাহারে রাখিও স্মরণ করি।

* * *

একটি মানুষ দেখিলাম পথে যেতে, থমকি দাঁড়াল আমার দুয়ারে এসে,
মাংসবিহীন অস্থিরা সারিসারি, বর্ণনাতীত ক্লিন্ন মলিন বেশে।
অক্ষিকোটরে মৃত্যুর কালোছায়া—তবু দেখিলাম চোখ দুটি ভয়ানক
শিরায় তাহার ক্ষুধার আগুন জ্বলে, হৃদয় পিণ্ড করিতেছে ধক ধক।
বন্য ক্ষুধায় বোবা চোখ তুলে চায়, অতি সত্বর অন্ন দিলাম আনি,
অমনি বসিয়া অসীম ব্যগ্রতায়, আপনার কোলে খাদ্য লইল টানি।
কঠিন মাটির উপাসী শিকড়শম, অঙ্গুলিগুলি অন্নের পানে ধায়,
পাতার বুকেতে সবুজ কণার মত, প্রতিটি অন্ন খুঁটিয়া খুঁটিয়া খায়।
মলিন মুখেতে তৃপ্তির আভা ফেটে, চোখ দুটি কাঁপে আনন্দ বেদনায়,
নব বর্ষায় জীর্ণ তরুর মত, জীবনে যেন সে আবার বাঁচিতে চায়।
স্বর্গ-সুষমা এর কাছে কোন ছার, এই যে তৃপ্তি মানুষের মুখে ভাই,
সকল রূপের মাঝারে এ অপরূপ, চির অমলিন যেনরে দেখিতে পাই।

ঘুম যেদিন ভাঙলো

শ্রীশামুক

সাধারণ মানুষের সময়মতো ঘুম আসে না ঘুম হয় না—এই নিয়ে কত বিপদ, কত মুসকিল। বিছানায় শুয়ে হা-হুতাশ ছট্‌ফট্ করা, ঘরের মধ্যে পায়চারি করা, চোখেমুখে জল ছিটোনো, নানারকম ঘুমের ওষুধ খাওয়া—ঘুমের জন্য এই সমস্ত সাধ্যসাধনা—অসাধ্য-সাধনাও বলা চলে—মানুষের জীবনে নিত্যকার ব্যাপার বলেই জানি। কিন্তু আমাদের যদুনাথের ছিল ঠিক একেবারে উলটো।

যদুনাথের ঘুম ছাড়তে চাইতো না, ভাঙতে চাইতো না কিছুতেই। তার কাছে দিন বা রাত্রির কিছু প্রভেদ ছিল না, ভালো বা খারাপ বিছানার তারতম্য কোনো ছিল না, এমন কি অবস্থাবিশেষে শরীরমহাশয় বসা বা দাঁড়ানোর যে কোন ভঙ্গিতে কিছু আশ্রয় পেলেই ঘুমিয়ে পড়তে পারতো। মাত্র দু'টি জিনিস হলেই এর হোতো ঘুম যে-কোনো সময়ে: সামান্য একটু অবসর আর তার চেয়েও কম এতটুকু একটু নিরিবিলি জায়গা।

তোমাদের মনে নিশ্চয় জাগছে বিশ্ব-বিখ্যাত কুম্ভকর্ণের কথা। কিন্তু না, এ ক্ষেত্রে সমান সমান তুলনা চলে না। কুম্ভকর্ণ ছ'টি মাস একটানা নিঃসাড়ে ঘুমাতো বটে, তারপরে একটি দিন জাগতো—ভয়ানক ভীষণ ভাবেই জেগে উঠতো, নয় কি? তার জেগে-থাকা দিনটির হাঁকডাক ও খাওয়ার বহরের বিবরণ পড়ে এ কথা মেনে নিতেই হয়।

কিন্তু আমাদের যদুনাথের ঘুমের কোনো হিসেব-নিকেশ, কোনো ঠিকঠিকানা ছিল না। যাকে বলে আদি-অন্ত খুঁজে পাওয়া ভার। ওর ঘুমের কোথায় আরম্ভ আর কখন শেষ এ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে সবার আগে নিজের মূল্যবান ঘুমটুকুকে জলাঞ্জলি দিতে হ'ত এবং তাতেও কোন সুফল বিশেষ হয়নি কোনদিন। তবে মাত্র এইটুকু আজ নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে যদুনাথ যখন ঘুমোতো না তখন সে জেগে থাকতো, এবং যখন আর জেগে নেই তখন নিশ্চয় অঘোর অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো।

এমনও শোনা যায় যে যদুনাথের ছোটোবেলায় ঘুমের কোন বালাই ছিল না। সুর করে 'বর্গী এলো দেশে' গানটি গাইতে হয়নি, 'ঐ এলো হুমো' বলে ভয় দেখাতে হয়নি, এবং বাটাভরে পান দেওয়া ত' দূরের কথা ঘুম পাড়ানিয়া মাসীপিসীকে কোনোদিন ডাকতে পর্যন্ত হয়নি। যদুনাথ শুয়েছে আর ঘুমিয়েছে। একটু বড় হতে খেলা করতে-করতে বসে-বসে ঘুমিয়েছে, আরেকটুকু বড় হতে জানলা দিয়ে পথ ও পথের মানুষ দেখতে-দেখতে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বাড়ির লোকেরা কত চেষ্টা করেছে এই অসময়ে অস্বাভাবিক ঘুম যাতে না হয়। কিন্তু সফলকাম হতে পারেনি কেউ। বড় হতে তাকে ভালো কথায় নানারকম বুঝানো হ'ল, তিরস্কারও হ'ল অনেক। এ কী ঘুম সারাটি জীবন এমনি ঘুমিয়েই কাটাতে হবে নাকি

তাহালে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকার দরকার কী—নিজের দিক থেকে এবং অন্যের দিক থেকেও?

যদুনাথের স্বভাবটি বড় সরল, বড় কোমল, এবং মগজে বুদ্ধিও আছে স্বীকার করতে হয়। ও বুঝতো সব কিন্তু নিরুপায়, যাকে বলে ঘুমের কাছে একেবারে সম্পূর্ণ অসহায়। লজ্জিতভাবে মাথা নীচু করে সকলের অভিযোগের উত্তরে জানাতো—আমি ত' আর ইচ্ছে করে ঘুমোই না। কখন যে কোথা থেকে ঘুম এসে পড়ে জানতেও পারিনে!

বড় হয়ে সে নিজেই নানারকম চেষ্টা করল কিছুদিন এমন দুর্দান্ত ঘুম বন্ধ করবার জন্যে। খুব কড়া-কড়া চা বা কফি খায়, হাত-পা ছুঁড়ে ব্যায়াম করে বা খানিকটা তাণ্ডব নাচ নাচে, এমনকি চোখের ভিতর সরষের তেলও লাগিয়ে দেখলো। কিন্তু কই, হ'ল না কিছু!

ঘুম যখন আসে ত' আসেই। ঘুম যেন সাগরের ঢেউ: উপরি-উপরি এসে নাস্তানাবুদ করে দেয়, ডুবিয়ে দেয়, আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাতালের অতল তলে ঘুমন্তপুরীতে সটান নিয়ে চলে যায়।

একদিন সে খুব বুদ্ধি করে নিজের চুলের সঙ্গে দড়ি বেঁধে দেওয়ালের পেরেকে শক্ত করে লাগিয়ে দিল। ভাবে, তন্দ্রার ঢুল এলেই হেঁচ্‌কা টানে ঘুম ভেঙে যাবে নিশ্চয়। কিন্তু ভাঙলো না! বাড়ির লোকেরা কিছু পরে এসে অবাক হয়ে দেখে এই অদ্ভুত ঘুম। যদুনাথের দড়িবাঁধা মাথাটি স্থিরভাবে ঝুলছে—যেন কোন মানুষের মুণ্ড ওটি নয়!

এরপর থেকে সমস্ত চেষ্টা করা সে একেবারে ছেড়ে দিলে। মিছিমিছি মাথা ঘামিয়ে কষ্ট করে শরীরের নানারকম অস্বস্তি করে লাভটা কী? বরং একটু অবসর ও তার চেয়ে কম এতটুকু একটু নিরালা আশ্রয়—ব্যাস্, গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়া যাক নির্বিঘ্নে।

আমরা সকলে বলাবলি করতাম পৃথিবীতে সব জিনিসের সীমা আছে, শেষ আছে; শুধু যদুনাথের ঘুমটি ফুরোবার নয়। আমাদের এই ধারণা কিন্তু একদিনে প্রমাণ হয়ে গেল যে ভুল। কী হ'ল তাই বলি।

সেদিন বিকেল থেকেই যদুনাথ ঘুমোচ্ছে। সন্ধে হয়ে রাত্রি এসে গেল, তবুও হুঁস নেই। ওর ঘুম দিনক্ষণ সময়-অসময় মানে না, তাই সে নিশ্চিন্তভাবে একটানা ঘুমোচ্ছে। একটা খুব ক্ষীণ অথচ তীক্ষ্ণ করুণ আওয়াজ তার কানে এসে আঘাত করতে থাকে বারবার। গাঢ় ঘুম পাতলা হয়ে আসে, ঘুম ভেঙে যায়। কান্নার আওয়াজ? কান্নার চেয়েও আরো ভারী, আরো ভয়ানক। যেন চাইছে কি এবং তা না পেলে চলবে না—একটি মুহূর্তও চলবে না!

যদুনাথ পাশ ফিরে আবার ঘুমোতে যায়। কিন্তু না, এবারে ঐ আওয়াজের কথাগুলি স্পষ্ট হয়ে কানে এসে বাজে, "মাগো একটু ফ্যান দাওগো, একটু ফ্যান খেতে দাও!"

ধড়ফড় করে বিছানায় উঠে বসে সে। ফ্যান খেতে চাইছে? ভাত-ডাল-রুটি-পয়সা চাইছে না ত' কিছুই! শুধু ভাতের ফেলে দেওয়া ফ্যানটুকু খেতে চাইছে? পৃথিবীর সমস্ত ওলোটপালোট হয়ে গেল নাকি? যদুনাথের ঘুম ভেঙে গেল, একেবারে ভেঙে গেল। তার ত্রিসীমানার ভিতর ঘুমের এতোটুকুও আর বাকী রইলো না কোথাও। গায়ে জামা দিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ে এদিক-ওদিক ব্যস্তভাবে সে ঘুরে বেড়াতে লাগলো।

দেখে ঘোর অন্ধকার পথে কালো-কালো শীর্ণ ছায়ার মতন সব মূর্তি চলেছে এলোমেলো ভাবে। ছোটো ছেলেমেয়েরা উলঙ্গ বাপ-মায়েদের দেহে টুকরো-টাকরো জামাকাপড় জড়ানো। আর মাঝেমাঝে অন্ধকার ফুঁড়ে সেই ভীষণ ভয়ঙ্কর চীৎকার: "মাগো একটু ফ্যান দেবেগো, একটুকু ফ্যান দাও মা।"

যদুনাথ ব্যস্তভাবে পথের অন্য পথিকদের জিজ্ঞাসা করে, "এরা কারা, এদের হয়েছে কী, এরা কেন এমন ধারা করছে?"

আশ্চর্য হয়ে সকলে উত্তর দেয়, "জানোনা তুমি? তুর্ভিক্ষ—ভীষন তুর্ভিক্ষ এসেছে শস্য-শ্যামলা বাংলা দেশে। এরকম হয়নি কোনোদিন কোনোখানে, সারা পৃথিবীতে। গ্রাম থেকে অনাহারী তুর্বল মানুষেরা দলে-দলে এসে জুটেছে সহরে কিছু না কিছু পাবার আশায়। পাচ্ছে না খাবার, পাচ্ছে না এতটুকু আশ্রয়। দেবে কে, সহরের লোকেরাই কি আর রাজার হালে আছে? এ সমস্ত জানো না তুমি—অশ্চর্য!"

যতুনাথ লজ্জিত ও তুঃখিত হয়ে পড়ে। সত্যি ত' সে জানে না কিছু। ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে সময় গেছে কেটে, জানবার ফুরসৎ কোথায় এতদিন? মুখ তুলে সাবধানে বলে, "কিন্তু আমরা ত' খাবার পাচ্ছি, খেতে পাচ্ছি সকলে? আশ্রয়ও ত' আছে আমাদের। ওদের সাহায্য করছি না কেন?"

সহরের সাবধানী হুঁসিয়ার মানুযেরা এই সরল ও সত্য কথাটি শুনে রেগে জলে যায় যেন, বলে, "কোথাকার আহাম্মুক তুমি? আমাদের যা আছে দিলে তারপর আমাদের হবে কী শুনি? তুমি ভারি বুদ্ধিমান দেখছি! এক কাজ কর হে, তোমার যা আছে সব ওদের বিলিয়ে দিয়ে তারপর অমনি রাস্তায় রাস্তায় ফ্যান দাও গো' ব'লে চীৎকার করে বেড়াওগে, বুঝলে? মজাটি একদিনেই টের পেয়ে যাবে!"

বিরক্তভাবে সকলে চলে যায়। যতুনাথ চুপ করে দাঁড়িয়ে ভাবে ওদের কথা, শোনে ঐ অভুক্তদের করুণ চীৎকার। ভাবে কতদূর থেকে ওরা চলে-চলে এসেছে নিজেদের গ্রাম, নিজেদের টুকরো জমিটুকু ছেড়ে। কিন্তু তবু খাওয়া পাচ্ছে না, আশ্রয় পাচ্ছে না। কঠিন রাজপথের উপর চলতে-চলতেই ওদের জীবন হয়ে যাবে হঠাৎ শেষ। হয়তো শেষবারের মতো চোখ বুজবার আগে দেখতে পাবে না নিজেদের চেনা সব মুখ, নিজেদের পোষা গরু বাছুর কুকুর, নিজেদের অতি পরিচিত মাঠ-ঘাট-গাছপালা-দিগন্ত-আকাশ!

নানা কথা ভাবতে-ভাবতে সে বাড়ি ফিরে এল।

চুপিচুপি রান্নাঘর থেকে নিজের খাবারটুকু চেয়ে নিয়ে যাদের সামনে পেল বিলিয়ে দিলে। পকেটে যা পয়সাকড়ি ছিল তাও দিয়ে দিল সমস্ত। তারপর নিজের ঘরে গিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল।

আশ্চর্য, পরম আশ্চর্য ব্যাপার! যতুনাথের জীবনে এই প্রথম। ঘুম আসে না! কষ্ট করে চেষ্টা করেও ঘুম আসতে চায় না! দারুণ সজাগ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, আর ওদের চীৎকার যেন সবসময় শুনতে পায়, "ফ্যান দাও গো, ফ্যান দাও মা!"

সে রাত্রে যতুনাথের ঘুম ভালো হ'ল না। বারবার ঘুম গেল ভেঙে শুধু ছটফট করেছে আর মনে পড়ে যাচ্ছে ওদের কথা, ওদের চীৎকার।

পরের দিন থেকে আমাদের যতুনাথ একেবারে বদলে অন্য মানুষ হয়ে গেল। এক সাহায্য প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলে, তাদের দিয়ে দিলে নিজের যা কিছু সব, ভবিষ্যতের কথা কিছুমাত্র চিন্তা না করে। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত সমানে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে চলেছে তুঃখীর তুঃখ ও কষ্ট ঘোচাবার জন্যে।

মনে তার কেবল একটি মাত্র চিন্তা—নিরন্নকে অন্ন দিতে হবে, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া চাই। প্রত্যেক মানুষের এই প্রধান ও প্রথম কর্তব্য।

আর সবচেয়ে আশ্চর্য যে সেই ভয়ানক ঘুম পালিয়ে গেছে একেবারে! আজকাল অতি সামান্য ঘুম ঘুমিয়ে স্বচ্ছন্দে তার দিন কেটে যায়।

বন্ধুরা তার আগেকার ঘুম নিয়ে তামাসা করে। যতুনাথ হেসে বলে, "আরে ভাই, আগে ভাবতাম আমি একলাই বুঝি কেবল পড়ে পড়ে ঘুমতাম। কিন্তু এখন দেখছি দেশের বহু মানুষ চোখ চেয়ে জেগে জেগে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে!"

কথাটি কি সত্যি? ভেবে দেখলে মনে হয় সত্যি, ভারি সত্যি। তাহালে? যতুনাথের ত ঘুম ভাঙলো, এবার সমস্ত দেশের ঘুম ভাঙবে কবে?

শ্বেত-চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ভাঙা ছুঁচ

রাত্রি সাড়ে দশটা।

ঘণ্টা খানেক আগে থেকেই আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমেছে। সমস্ত আকাশ গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। রাতের কলকাতায় মাঝে-মাঝে আলো দেখা যাচ্ছে বটে, তবু এই অন্ধকারের সান্নিধ্যে সমস্ত সহরটা কেমন যেন ভয় পেয়ে গেছে। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই, মাঝে-মাঝে শুধু মেঘের চাপা গুরুগুরু ধ্বনি। ঐ চাপা শব্দে আপনা থেকেই যেন বুকের ভিতরটা কেঁপে ওঠে।

এই বৃষ্টি-ভেজা মেঘ-ডাকা নির্জন রাতে বড় একটা কেউ জেগে নেই। ঘরে-ঘরে দরজা বন্ধ। পথে লোকজন নেই বললেই চলে। কিন্তু ধনঞ্জয় কবিরাজ এখনো ঘুমোতে যাননি। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কাজ করা তাঁর অভ্যাস। আজকের রাতেও তাঁর কাজের কামাই নেই। একতলায় দোকান-ঘর বন্ধ করে তিনি দোতলার ঘরে বসে আলো জালিয়ে-কাজ করছেন। এই ঘরটি বিশেষ ছোটো নয়, কিন্তু সমস্ত ঘরময় কাগজের ছোটোবড় ঠোঙা ও কাঠের প্যাকিং বাক্স ছড়িয়ে রয়েছে। এতোটুকু জায়গা খালি পাওয়াও মুশকিল। ফলে ঘরটি আসলে যত না ছোটো তার চেয়ে অনেক ছোটো বলে মনে হয়। ঘরের এক পাশে গদি-মোড়া একটি ইজিচেয়ার ও আরো একটি বেতের চেয়ার রয়েছে, লেখার জন্যে রয়েছে একটি টেবিল। চারদিকের দেয়ালেই কাঠের তাক মেঝে থেকে প্রায় ছাত পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠেছে। তাকগুলি প্রায় এখন খালি। দেখলেই বোঝা যায় ঐ তাক থেকেই ঠোঙা আর কাঠের প্যাকিং বাক্সগুলো নামানো হয়েছে। ধনঞ্জয় চেয়ার-টেবিলে বসে কাজ করতে পছন্দ করেন না। মেঝেয় সমস্ত জিনিসপত্র নামিয়ে কাজ করতে তাঁর সুবিধে হয়।

ওই ছোটোবড় ঠোঙা আর কাঠের বাক্স'য় ভরা রয়েছে নানা ধরণের গাছপালার পাতা-শেকড়-ডাল। সযত্নে একটির পর একটি ঠোঙা পরীক্ষা করে তিনি দেখতে লাগলেন। বাজে শেকড়-বাকড়-গুলো বেছে এক পাশে রাখলেন জমা করে। কাঠের বাক্সগুলোয় পরিচ্ছন্ন হাতে কাগজের টুকরোয় গাছপালার কবিরাজী নাম লিখে আঠা দিয়ে এঁটে দিতে লাগলেন। কখনোই তাঁর এই কাজ সম্পূর্ণ হয় না। সপ্তাহে একবার করে তিনি গাছপালার খোঁজে বেরোন, ফলে শেকড়-বাকড়ের সংখ্যা ও পরিমাণ ক্রমাগতই বেড়ে যায়। আশ্চর্য মানুষ ধনঞ্জয়। তাঁর শরীরে ক্লান্তিও নেই, মনে বিরক্তিও নেই। কাজে কখনো অবহেলা করেন না। প্রসন্ন মুখে তিনি কাজ করে চলেন।

আজকের সকালটা যে-রকম সুন্দর হয়ে দেখা দিয়েছিলো এখন আর তার আভাস নেই। আসলে মানুষের জীবনটাই এই রকম। কখনো সূর্যের আলোয় ঝলমল করে, কখনো

মেঘের বিষন্নতায় ঢেকে যায়। কখন যে কী হয় কেউ সঠিক বলতে পারে না।

কাজের ফাঁকে মাঝেমাঝে চোখ তুলে জানলার ভিতর দিয়ে ধনঞ্জয় দেখতে লাগলেন। রাস্তা পেরিয়ে ঠিক সামনের বাড়িটি মাধবের। মাধবের শোবার ঘরটা এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। এখনো মাধব জেগে আছে কি ঘুমিয়েছে ঠিক বোঝা যায় না, তবে তার ঘরের আলোটা নেভানো নয়। বেচারা মাধব। দারুণ ভয় পেয়েছে। এমনিতেই সে ভীরু প্রকৃতির। তার উপর ঐ তিন নম্বর লেখা চাক্তিটা এসে পৌঁছনোয় তার ভিতরে সাহসের কণামাত্রও আর অবশিষ্ট নেই। মাধবের ছেলে সঞ্জীবই বা কী ধরণের! সেই যে সকাল থেকে বেরিয়েছে, এখনো দেখা নেই। কোথায় যে গেছে কেউ জানে না। অবশ্য সে জানবে কী করে তার বাবার নামে তিন নম্বর লেখা চাক্তি এসেছে; কিন্তু সকালে বেরিয়ে রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত এই ঝড়-জলের সময়ে বাইরে থাকাটাই বা কোন ধরনের কাজের কথা হোলো? সঞ্জীব ঐ এক খাপছাড়া ছেলে। সব সময়েই যেন কী ভাবে, নিজের মনের কথা কাউকেই বলতে চায় না। বিশেষ করে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের এই ধরণের খুন-খারাপীর পর থেকে সে যেন আরো অনেক বদলে গেছে। সেই বিষাক্ত বোমার কথাটা ঠিকই সে ধরেছিলো। পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিত তাতে যে রীতিমতো বিস্মিত হয়েছে সে-কথা ধনঞ্জয় জানে। রঞ্জিত মুখে অন্য কিছু বলেনি, কিন্তু তার হাবভাবে কেমন যেন মনে হয়! সঞ্জীবকে সে যেন ঠিক সোজা চোখে দেখছে না।

কথাগুলো মনে হতে ধনঞ্জয় নিজের মনেই একটু হাসলেন। সঞ্জীব খুন করেছে? এটা বিশ্বাস করার মতো একটা কথা হোলো? তারপর আবার মিলিয়ে গেলো ধনঞ্জয়ের হাসি। কিন্তু বাইরেটা দেখেই কি লোক চেনা যায়? মানুষের বাইরের চেহারা এক রকম, কিন্তু মনের চেহারার কথা কে বলতে পারে?

বৃষ্টি-পড়া রাতের শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের অনুজ্জ্বল আলোয় ধনঞ্জয় চুপ করে খানিক দেখতে লাগলেন। মাধবের বাড়ির কাছাকাছি একটি লোক বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় ধীরেধীরে নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে। তার হাতের জলন্ত সিগারেটের লালচে আলো মাঝেমাঝে চোখে পড়ে। লোকটা পুলিশের, মাধবের করুন মিনতিকে রঞ্জিত উপেক্ষা করতে পারেনি। মুখে অবশ্যই তিন নম্বর লেখা চাক্তিটাকে কোন বদ ছোক্‌রার রশিকতা বলে সে জোর করে উড়িয়ে দিয়েছে সত্যি, কিন্তু তার মনের চেহারাটা ধনঞ্জয় অনেকটা দেখে ফেলেছে। শাদা চাক্তিকে কেন্দ্র করে পর-পর দুটি অবিশ্বাস্য ঘটনার পর রঞ্জিতও বেশ ঘাবড়ে রয়েছে। কোনো দিক দিয়ে নিজের কাজের অবহেলা যাতে না হয় সেদিকে তার কড়া নজর। তাই পুলিস আপিস থেকে একজন ডিটেকটিভকে সে পাঠিয়েছে সমস্ত রাত বাড়িটার উপর নজর রাখতে, মাধবকে পাহারা দিতে। সেই লোকটাই ঝড়-বৃষ্টির রাত্রে আজ ওখানে পায়চারি করছে, হাতে জলন্ত সিগারেট। নিজের অবস্থার কথা ভেবে লোকটা নিশ্চয়ই মনে-মনে প্রসন্ন নয়, মাধবের মৃত্যু কামনাও সে যে করছে না এমন কথা জোর করে কে বলতে পারে?

কিন্তু যে-যাই ভাবুক, যে যতই সাবধানে থাকুক— কপালের লেখাকে কে খণ্ডাতে পারে? যা হবার তা তো হবেই—ভাবতে-ভাবতে ধনঞ্জয়ের চোখমুখ কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে গেলো। তারপর আবার নিজের কাজে তিনি মন দিলেন। দূর ছাই, যত সব বিদঘুটে ভাবনা!

সম্ভবত মিনিট পনেরো এক মনে ধনঞ্জয় কাজ করেছেন এমন সময় নীচের তলার ঘরের দরজায় ঠিক যেন ডাকাত-পড়া শব্দ হতে লাগলো দুম-দুম করে। মুহূর্তের মধ্যে কাজ থামিয়ে ধনঞ্জয় মুখ তুললেন। সামনের দেয়াল-ঘড়িতে তখন ঠিক এগারটা বাজতে দশ মিনিট। কিন্তু দরজা ধাক্কার কামাই নেই। জিনিসপত্র যে-রকম ছড়ানো ছিলো সে-রকমই রইলো। দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নেমে দরজা খুললেন তিনি।

বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সঞ্জীব। বৃষ্টিতে জামা-কাপড় আধভেজা। কিন্তু সেদিকে তার কোনো খেয়াল নেই। মুখচোখের দৃষ্টি পাগলের মতো উদ্‌ভ্রান্ত। ধনঞ্জয়কে কোনো কথাও বলতে না দিয়ে সঞ্জীব বললো, "শিগগির একবার আসুন, বাবাকে একবার দেখতে চলুন।"

"কেন, কী হয়েছে?" প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই প্রশ্ন করলেন ধনঞ্জয়।

"কী জানি! ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু শোবার ঘরের মেঝেয় তিনি পড়ে রয়েছেন। দেহে প্রাণ আছে কিনা জানি না। সম্ভবত নেই। আমি কিছু বুঝতে পারছি না। এইমাত্র বাড়ি ফিরে তাঁর ঘরে ঢুকে ঐ দৃশ্য দেখলুম। কিন্তু দোহাই আপনার, আর দেরী করবেন না —শিগগীর আমার সঙ্গে একবার আসুন।"

"নিশ্চয়ই সঞ্জীব, আমি যাবো বৈকি। কিন্তু তুমি বোধ হয় জানো না আজ সকলেই তোমার বাবা তিন নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেয়েছিলেন। আর এক মুহূর্তও দেরী নয়—এখনি গিয়ে তুমি কোনো ডাক্তার ডেকে আনো। পুলিশ ইন্সপেক্টর রঞ্জিত তোমাদের বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে একজন ডিটেকটিভকে মোতায়েন রেখেছেন। ঐ যে ঐ ভদ্রলোক। এদিকেই আসছেন বলে মনে হয়। তাঁকে নিয়ে আমি তোমার বাবার ঘরে চললুম। ডাক্তার নিয়ে এখনি তুমি এসো, পারো তো রঞ্জিতকেও একটা টেলিফোন করে দিয়ো।"

এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সঞ্জীব সেই ভিজে পথ ধরে দৌড়তে সুরু করলো ডাক্তারের বাড়ির উদ্দেশ্যে। তাঁদের উত্তেজিত কথাবার্তা শুনে সেই ডিটেকটিভ এদিকেই এগিয়ে আসছিলো। ধনঞ্জয় দ্রুত পায়ে তার কাছে গিয়ে বললেন, "মাধবের কিছু একটা হয়েছে। তার ছেলেকে আমি পাঠিয়েছি ডাক্তার ডাকতে। চলুন আপনাতে-আমাতে এখনি ভেতরে যাই।"

"কিছু একটা হয়েছে? বলেন কি?" উত্তেজিত হয়ে হাতের সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে লোকটি বললো, "কিন্তু কী হয়েছে জানেন না? আমি তো সন্ধে থেকে বাড়িটা পাহারা দিচ্ছি। বিকেলে আপনার বাড়ি থেকে বেরিয়ে মাধববাবু সেই যে নিজের বাড়িতে ঢুকেছেন তারপর থেকে আর বেরোননি। বাইরের কোনো লোকও তাঁর বাড়িতে আসেনি। শুধু মিনিট পাঁচেক আগে তাঁর ছেলে ঢুকেছিলেন। বাইরের দরজাটা নিজের পকেটের চাবি দিয়ে তিনি খুলে ফেললেন। দরজাটার দুটো চাবি আছে জানতুম, তা ছাড়া মাধববাবুর ছেলে সঞ্জীবকে আমি অনেকবার দেখেছি। তাই আর কোনো প্রশ্ন করিনি, কিংবা বাধাও দিইনি।" প্রায় গড়-গড় করে কথাগুলো বলা যখন শেষ হোলো, ততক্ষণে তাকে প্রায় ঠেলে ধনঞ্জয় রাস্তা পেরিয়ে মাধবের দোকানের দরজায় এসে পৌঁছেছেন।

"সন্ধে থেকেই মাধবের ঘরে আলো জলছে। একবারও নেভেনি। ঐ দেখুন এখনো জ্বলছে।" বলে লোকটি একবার উপরের খোলা জানালার দিকে আঙুল দেখালো তারপর আবার প্রশ্ন করলো, "কিন্তু মাধববাবুর কী হয়েছে আপনি কিছু জানেন না?"

"আমি কিছুই জানি না," চাপা দৃঢ় স্বরে ধনঞ্জয় বললেন। তারপর সেই ডিটেকটিভকে নিয়ে উঠে এলেন উপরে। মাধবের শোবার ঘরের দরজাটা খোলা। সেই খোলা দরজার ভিতর দিয়ে দেখা গেলো ঘরের মেঝের মাঝখানটায় মাধব পড়ে রয়েছে। গা খালি—বাড়িতে প্রায় সব সময়েই সে খালি গায়ে থাকতো। তার মুখে ভয়ের কোনো রকম চিহ্ন নেই: শুধু একটা দারুণ বিস্ময়ের ভঙ্গী।

ডাক্তার নিয়ে ফিরতে সঞ্জীবের প্রায় আধ ঘণ্টা দেরী হোলো। কাছাকাছি কোনো ডাক্তারকে না পাওয়ায় ট্যাক্সি নিয়ে মাইল তিনেক দূরের এক ডাক্তারকে সে এনেছে।

ডাক্তার যতক্ষণ ধরে প্রাথমিক পরীক্ষা শেষ করলো ততক্ষণে ঘরের সবাই প্রায় রুদ্ধনিশ্বেসে অপেক্ষা করতে লাগলেন। বেশিক্ষণ সময় লাগলো না। ডাক্তার সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "দেহে প্রাণ নেই। কিন্তু কিসে মৃত্যু হয়েছে জানতে হলে আরো ভালো করে পরীক্ষা করা

দরকার। যতক্ষণ না পুলিশ ইন্সপেক্টর আসেন ততক্ষণ বোধ নাড়াচাড়া না করাই ভালো।”

ধনঞ্জয় শান্ত গম্ভীর গলায় বললেন, “নিশ্চয়ই। আমরা কিছু ছোঁবো না, নাড়াচাড়া করবো না। রঞ্জিতবাবুকে তুমি খবর দিয়ে এসেছো সঞ্জীব?”

সঞ্জীব যেন কেমন হয়ে গেছে। ঘরের এক কোণে পাথরের মতো চুপ করে সে দাঁড়িয়ে। কী যেন সে বলতে গেলো, কিন্তু পারলো না। শুধু ঘাড় নাড়িয়ে জানালো যে খবর সে দিয়েছে।

আর প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বাড়ির বাইরে ট্যাক্সি থামার শব্দ হোলো, তারপরেই শোনা গেলো সিঁড়িতে দ্রুত পায়ের শব্দ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই উত্তেজিত হয়ে ঢুকলো রঞ্জিত।

“মাধবের মৃত্যু হয়েছে,” ধনঞ্জয়ই প্রথম কথা বললেন, “ডাক্তারবাবু কোনো কিছু না ঘেঁটে বাইরে থেকে পরীক্ষা করে দেখেছেন। এখন আপনার জন্যে আমরা সবাই অপেক্ষা করছি।”

রঞ্জিত সবাইকার মুখের উপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললো, “কোনো জিনিসপত্র সরানো হয়নি তো?”

ধনঞ্জয় উত্তর দিলেন, “না।”

রঞ্জিত ক্ষিপ্রহাতে পকেট থেকে একটা খড়ি বার করে মাধবের দেহ যেখানে পড়ে সেখানে কতকগুলি দাগ দিলো, নোটবুকে ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থানের কথা টুকে নিলো, তারপর ডাক্তারের দিকে ফিরে বললো, “কিন্তু কী করে মৃত্যু হয়েছে এবং কটার সময়েই বা হয়েছে সে-কথা কিছু বলতে পারেন?”

“আধ ঘণ্টা থেকে তিন কোয়ার্টারের মধ্যে হয়েছে মনে হয়।”

ঘড়ির দিকে চেয়ে রঞ্জিত বললো, “এখন সাড়ে এগারোটা। তার মনে পৌনে এগারটা থেকে এগারোটার মধ্যে মৃত্যু হয়েছে।” তারপর ডিটেকটিভের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলো, “তখন তুমি কোথায় ছিলে?”

“আমি তো বাড়ির সামনেই পাহারা দিচ্ছলুম। প্রায় পৌনে এগারোটায় সঞ্জীবাবু চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলেন। ওপরে আবো জলছিলো। সন্ধে থেকেই জলছিলো। ঐ সময়ের মধ্যে আর কেউ ভেতরে যায়নি কিংবা ভেতর থেকে বাইরে আসেনি।”

রঞ্জিত ভালো করে একবার সঞ্জীবের মুখের দিকে চাইলো, কিন্তু তাকে কিছু না বলে ডাক্তারের দিকে চেয়ে বললো, “কিন্তু কী করে মৃত্যু হয় সে-বিষয়ে এখন কিছু বলা আপনার পক্ষে কি সম্ভব?”

ডাক্তার উত্তর দিলেন, “বোধ হয় না। কিন্তু আগে একবার ভালো করে পরীক্ষা করা দরকার।”

রঞ্জিত সম্মতি দিলে ডাক্তার নতজানু হয়ে মাধবের মৃতদেহের পাশে বসলেন। চিৎ হয়ে মাধব পড়েছিলো। ধীরে-ধীরে দেহটিকে তিনি পাশ ফেরালেন তারপর পিঠের উপর ঝুঁকে পড়ে কী যেন দেখতে লাগলেন।

“কী দেখছেন?” রঞ্জিত প্রশ্ন করলো।

“পিঠের ঠিক মাঝখানে প্রায় গোল লাল একটি দাগ। যেন রক্ত জমে গেছে। ঠিক তরে মাঝখানে কী যেন বিঁধে রয়েছে। এক মিনিট অপেক্ষা করুন। ফরসেপ দিয়ে ওটা বার করি।—এই যে, কিন্তু কী আশ্চর্য! এটা যে ইনজেকসন দেবার সিরিঞ্জের একটা ছুঁচ। খানিকটা অংশ ভেঙে গেছে। বাকীটা কোথায়?—রঞ্জিতবাবু, খানিকটা এখন আঁচ করতে পারছি। সাপের বিষের মতো তীব্র কোনো বিষ ঐ সিরিঞ্জে ছিলো। ঠিক কী বিষ ভালো করে ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা না করলে বুঝতে পারবো না। ঐ বিষ প্রয়োগেই মাধববাবুর মৃত্যু হয়েছে।” বলে ডাক্তার অতি সাবধানে সেই ভাঙা ছুঁচটিকে একটি কাঁচের শিশিতে ভরে রাখলেন।

চার নম্বরের চাক্তি

রঞ্জিত বলতে লাগলো, “সমস্ত ঘটনাটির এই ভাবে উল্লেখ করলে বোধ হয় অন্যায় হয় না: জয়কৃষ্ণ সামন্ত’র

চোরাই জিনিস কেনাবেচার কারবার ছিলো। ফলে নানা রকম চোর গুণ্ডা বদমাইসের সঙ্গে তাকে মিশতে হয়। কোনো এক ঘটনায় জয়কৃষ্ণের সঙ্গে ঐ ধরনের কোনো একটি লোকের ঝগড়া থেকে ক্রমশ দারুণ শত্রুতায় পরিণত হয়। সেই লোকটি কায়দা করে জয়কৃষ্ণকে শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের একটি খালি বাড়িতে ডেকে এনে বিষাক্ত বোমার সাহায্যে হত্যা করে। ঐ বিষাক্ত বোমাটি ঠিক কী ভাবে তৈরি হয়েছিলো বিজ্ঞানের ছাত্র সঞ্জীববাবু সে-কথা আপনাদের ভালো করে বুঝিয়ে বলতে পারেন,” বলে সঞ্জীবের দিকে রঞ্জিত কয়েক মুহূর্তের জন্যে চেয়ে রইলো।

সঞ্জীব কিন্তু কোনো উত্তর দিলো না।

রঞ্জিত আবার সুরু করলো, “তারপর আবার মৃত্যু হোলো রমেনবাবুর। রমেনবাবু প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। সঞ্জীববাবুর সঙ্গে বয়সের ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও রমেনবাবুর যথেষ্ট আলাপ ছিলো। প্রতি শুক্রবারেই রমেনবাবু যে তাঁর দিদিমার সঙ্গে দেখা করতে আসতেন সে-কথা সঞ্জীববাবুর মুখেই আমরা শুনেছি। কোনো-কারণে জয়কৃষ্ণের হত্যাকারীর সঙ্গে রমেনবাবুর হয়তো মনোমালিন্য হয়েছিলো—হয়তো রমেনবাবু ঐ হত্যার কোনো গোপন রহস্য জেনে ফেলে-ছিলেন। তাই রমেনবাবুকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা জয়কৃষ্ণ সামন্ত’র হত্যাকারীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন বলে মনে হয়েছিলো। গতকাল সন্ধে আটটার সময় রমেনবাবু এই অঞ্চলের একটি গলির মধ্যে অত্যন্ত সন্দেহজনকভাবে খুন হন। তাঁর মৃতদেহ প্রথম আবিষ্কার করেন সঞ্জীববাবু। ঠিক আটটার সময়েই আবিষ্কার করেন। রমেনবাবুকে যে-ছুরিটা দিয়ে হত্যা করা হয় সেই ছুরিটা অদ্ভুত ধাঁচের, তার হাতল নেই। ফলে সন্দেহ হয় ছুরিটা বোধ হয় কোনো রকম বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূর থেকে রমেনবাবুর পিঠে বেঁধানো হয়েছিলো। এ-বিষয়ে সঞ্জীববাবু সম্ভবত আমাদের সাহায্য করতে পারবেন।” বলে রঞ্জিত আবার চাইলে সঞ্জীবের দিকে।

সঞ্জীব এবারেও নিরুত্তর। শুধু উত্তেজনায় তার আঙুলের ডগাগুলো থরথর করে কাঁপছে দেখা গেলো।

রঞ্জিত আবার সুরু করলো, “তারপর আজ সকালে মাধববাবু তিন নম্বর লেখা শাদ চাক্তি পেলেন। সঞ্জীববাবু তখন বাড়ি ছিলেন না। সমস্ত দিন তিনি নিখোঁজ। সন্ধে থেকে মাধববাবুর বাড়ি পাহারা দেবার জন্যে আমি একজন ডিটেকটিভকে মোতায়েন রাখি। তিনি লক্ষ্য করেছেন সন্ধে থেকে পৌনে এগারটা পর্যন্ত মাধববাবুর বাড়িতে কেউ ঢোকেননি। পৌনে এগারটায় সঞ্জীববাবু বাড়ি ফেরেন। প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই বেরিয়ে এসে তিনি খবর দেন মাধববাবুর মৃত্যু হয়েছে। মাধববাবুর মৃত্যুর কারণ শুনছি কোনো এক মারাত্মক বিষ—ইনজেকসন দেবার সিরিঞ্জের মধ্যে ভরে তাঁর পিঠে ঐ বিষ প্রয়োগ করা হয়। আপনারা সবাই লক্ষ্য করুন মাধববাবুর মুখে একটা বিস্ময়ের ছাপ। এ রকম ভাবা মোটেই অন্যায় হয় না যে মাধববাবু তাঁর শোবার ঘরে দরজার দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এমন সময় কারুর পায়ের শব্দে তিনি চমকে ফিরে দেখেন তাঁরই অতি-পরিচিত কেউ খুব সাবধানে হাতে একটি ইনজেকসনের সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে আসছে। তিনি বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে ওঠার আগেই হত্যাকারী সেই বিষ ক্ষিপ্রহাতে মাধববাবুর পিঠে ফুটিয়ে দেয়—তাড়াতাড়ি নিখুঁতভাবে কাজ সে শেষ করতে পারেনি, তাই সিরিঞ্জের ওপরকার ছুঁচটা ভেঙে গিয়ে মাধববাবুর পিঠে আটকে থাকে।”

তারপর প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থেকে সঞ্জীবের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রঞ্জিত বললো, “আমি খবর নিয়ে জেনেছি সঞ্জীববাবুর সঙ্গে তার বাবার মোটেই সদ্ভাব ছিলো না।”

সঞ্জীবের আঙুলের ডগাগুলো থরথর করে কাঁপছে, তবু প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সামলে নিয়ে দৃঢ় গলায় সে বললো, “আপনার সমস্ত কথা মন দিয়ে শুনলুম রঞ্জিত-বাবু। খুবই ইন্টারেস্টিং সন্দেহ নেই, কিন্তু আগাগোড়া সমস্তটাই আপনার কল্পনা। কল্পনা দিয়ে কোনো প্রমাণ

হয় না। আপনাকে প্রমাণ করতে হবে জয়কৃষ্ণ সামন্ত'র সঙ্গে আমার চোরাই মাল নিয়ে কারবার ছিলো, প্রমাণ করতে হবে বিষাক্ত বোমাটা বানিয়ে আমিই রেখে আসি, প্রমাণ করতে হবে রমেনবাবু এই গুপ্ত-রহস্য জেনেছিলেন, প্রমাণ করতে হবে এই বিষ সংগ্রহ করে আমিই সিরিঞ্জে ভরে বাবার পিঠে প্রয়োগ করেছি—সেই ভাঙা সিরিঞ্জটাকেও এখান থেকে আবিষ্কার করতে হবে।—রঞ্জিতবাবু, আপনার হাতে কোনো ঘটনারই প্রমাণ নেই শুধু ঘটনাচক্রে কয়েকবার হত্যার সময় আমাকে নিহত লোকের কাছে আবিষ্কার করা ছাড়া। এটা দৈবাৎ হতে পারে, কিংবা সেই চতুর হত্যাকারীর একটি সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র হতে পারে যাতে সমস্ত সন্দেহটা আমার ঘাড়েই পড়ে।"

রঞ্জিত মৃদু হেসে বললো, "প্রমাণ যে একেবারেই নেই সে কথা মানলুম না। কিছু-কিছু প্রমাণ আমার কাছে আছে বৈকি। যাঁরা তিনজন নিহত হয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকেই ডাকে বালির কাগজের খামে নম্বর লেখা চাক্তি পেয়েছেন। সেই খামের ওপর টাইপ করে নাম-ঠিকানা লেখা আছে। বৈজ্ঞানিকদের দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছি যে যে-টাইপরাইটার দিয়ে ঐ খামগুলো ছাপা হয়েছে সেটা আপনাদেরই। শাদা চাক্তির ওপর যে-লাল কালি দিয়ে সংখ্যাগুলো লেখা হয়েছে সেই কালি নীচের তলায় আপনাদের দোকান ঘরের টেবিলেই রয়েছে।"

"এটাও হত্যাকারীর আর একটা সূক্ষ্ম চাল—যাতে আমারই ওপর সন্দেহটা দৃঢ় হয়। কিন্তু রঞ্জিতবাবু, আজ সমস্ত দিন ঘুরে আমি অনেক নতুন খবর আবিষ্কার করেছি। আপনাকে খোঁজ নিতে হবে মৃত্যুঞ্জয় নামে কোনো ডাক্তার এখনো বেঁচে আছেন কিনা। কিন্তু তার চেয়েও আগে দরকার অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুল নামে ভদ্রলোকদের খুঁজে বার করা এবং তাঁদের জীবন যাতে বিপন্ন না হয় তার বন্দোবস্ত করা। আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি নিঃসন্দেহে জেনেছি তাঁদের জীবনও আজ বিপন্ন এবং এই মুহূর্ত থেকে সাবধান না হলে আরো হত্যাকাণ্ড পরপর যে ঘটবে তাতে সন্দেহ নেই।"

সঞ্জীবের কথায় ঘরের মধ্যেকার সবাই নির্বাক হয়ে রইলো। কথা কইলো রঞ্জিত, "আপনি ভারী চালাক সঞ্জীববাবু। কিন্তু আজ আর আপনাকে ছাড়ছি না। আপনার প্রলাপ থানায় গিয়ে বলবেন। কিন্তু আপাতত আমার সঙ্গে চলুন।"

এক মুহূর্তের মধ্যে সঞ্জীব কী যেন ভেবে নিলো। পরমুহূর্তেই একটি আশ্চর্য কাণ্ড সে করলো। সে যেখানে দাঁড়িয়েছিলো ঠিক তার পিছনেই ইলেকট্রিক আলোর স্বুইচ। রঞ্জিতের কথা শেষ হবার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই আলোর স্বুইচটা নিভিয়ে এক লাফে ঘরের বাইরে এসে বাইরে থেকে সে শিকল তুলে দিলো তারপর দ্রুত পায়ে নেমে এসে এদিক ওদিক চেয়ে অন্ধকারের ভিতর নানা অলিগলির মধ্যে কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে গেলো কেউ জানলো না।

সদলবলে রঞ্জিত যখন বাইরে এলো পনেরো মিনিট তখন কেটে গেছে। এই অন্ধকার বৃষ্টিপড়া রাতে সঞ্জীবের খোঁজ করা প্রায় অসম্ভব। তবু ডিটেকটিভের হাতে এক লাইন লিখে সে থানায় পাঠালো।

ধনঞ্জয় কবিরাজ রঞ্জিতের সঙ্গে পথে নেমে এসে বললেন, "সত্যি—এতো দিন গেলো, মানুষকে এখনো ঠিকমতো চিনতে পারলুম না। সঞ্জীবকে তো ছেলেবেলা থেকে দেখেছি। কিন্তু তার ওপর এতোটুকু সন্দেহ কখনো আমার হয়নি।—কিন্তু চকচক করছে ওটা কী?" বলে মাধবের সদর দরজার পাশ থেকে নীচু হয়ে তিনি তুলে ধরলেন একটি জিনিস। পকেট থেকে টর্চ বার করে রঞ্জিত ভালো করে সেটা পরীক্ষা করলো—ইনজেকসন দেবার সিরিঞ্জ, তার উপরকার ছুঁচটা ভাঙা।

রঞ্জিত বিস্মিত দৃষ্টিতে ধনঞ্জয়ের মুখের দিকে চাইলো। ধনঞ্জয়ের শান্ত চোখের দৃষ্টি রাত্রির কালো অন্ধকারের সঙ্গে প্রায় মিশে গেছে।

"একটা পরিষ্কার কাগজ দরকার এটা মুড়ে রাখার জন্যে।" রঞ্জিত বললো।

"আমার বাড়িতে এক মিনিটের জন্যে আসুন রঞ্জিতবাবু। পরিষ্কার কাগজ ওখানে রয়েছে।" বলতে-বলতে প্রায় জোর করেই রঞ্জিতকে নিয়ে ধনঞ্জয় কবিরাজ রাস্তা পেরিয়া নিজের বাড়ীতে ঢুকলেন। সদর দরজাটা খোলাই রয়েছে, ভিতরে জ্বলছে বিদ্যুতের আলো।

"একি, দরজা খুলেই চলে এসেছিলেন?" রঞ্জিত প্রশ্ন করলো।

একটু হেসে ধনঞ্জয় বললেন, "হ্যাঁ, তাড়াতাড়িতে দরজা বন্ধ করার কথা মনেই ছিলেনা।" তারপর ঘরের মাঝখানের ছোটো টেবিলটার কাছে এগিয়ে এসে আবার তিনি বললেন, "কিন্তু দরজা খুলে যাওয়াটা ঠিক হয়নি রঞ্জিতবাবু। সেই ভদ্রলোক ছ' পয়সার ডাক-খরচা বাঁচিয়েছেন! এবারে ডাকে আর না পাঠিয়ে নিজে হাতেই রেখে গেছেন চাক্তিটা!"

রঞ্জিত উত্তেজনায় কোনো কথা বলতে পারলো না। তার সামনের ছোটো টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটি গোল শাদা চাক্তি। তার উপর লাল কালিতে শুধু একটি সংখ্যা লেখা রয়েছে: চার! [আগামী বারে সমাপ্য]

কালো বেড়াল

প্রবোধ ঘোষ

ডক্ থেকে খানিকটা দূরেই প্রকাণ্ড একটা বস্তি: এখানে নানাজাতের ও নানারকমের লস্কর-মাঝি-মল্লার বাস। বর্ষার সময় ডকের কাছে জলের স্রোত যখন ঘোলাটে হয়ে ওঠে তখন সন্ধ্যাবেলায় অন্ধকার আকাশের তলায় এই বস্তির ধারের কাদায় পিছল রাস্তায় কতো অদ্ভুত লোক আনাগোনা করে। বৃষ্টির ছাটে ঘরের সামনের চটের পর্দা ভিজে যায়, ভেতরে কেরোসিনের কুপি জ্বেলে ঢোল তাড়ি ও মাংস নিয়ে হল্লা চলে। জুয়ো তো আছেই, খুনজখমও প্রায়ই হয়।

কাছেই একটা ব্যারাকের মতো বাড়ী: এখানে জাহাজ বা ষ্টীমারের একটু উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকে। স্থায়ী বাসিন্দাও অনেকে আছে—জাহাজ কোম্পানির কেরানী, মালগুদামের বাবুরা, আরো অনেক রকমের লোক। বাড়ীর তলায় একটা হোটেল, পেছন দিকে বেশ একটি বড়ো জুয়ার আড্ডা। এরকম নোংরা পল্লীতে যে রাতের পর রাত হাজার হাজার টাকা ঘুরে চলে তা না জানলে বিশ্বাসই করা যায় না।

৩১ নং ঘরে আজ তিন দিন ইয়াসিন্ সারেং জ্বরে প্রায় অচৈতন্য; ২২ নং ঘরে থাকে এক মাদ্রাজি—নাম সদাশিবন্। বছরে তিনবার সে আসে, প্রায় দিন পনেরো থাকে। একটি পা কাটা, কাঠের পায়ের খট্‌খট্ আওয়াজে সে সারা বাড়ী জমিয়ে রাখে। দু-একটি ইহুদি ও ইউরোপীয় লোক মাঝে মাঝে তার সঙ্গে দেখা করতে আসে, গোপন পরামর্শ চলে। সদাশিবন্ লোক ভালো: পরণে সাদা কাপড়ের লুঙ্গি, কাঁধে একটি ধোপদস্ত তোয়ালে, মুখে হাসি।

৩০ নং ঘরের মাধব জোশী গম্ভীর লোক, সবসময়েই

খুব চুপচাপ থাকে—এসেছে স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে। এ খবর বাড়ীর ম্যানেজারের কাছ থেকে সদাশিবন্ যোগাড় করেছে। জোশী এখানে কোন জাহাজকোম্পানীর মালখালাসের কর্ম্মচারী, কখনো কখনো রাত্রে ডক্ থেকে খানিকটা দূরে গুদামেই তাকে থাকতে হয়।

বর্ষাকাল: তুদিনের অবিশ্রাম বৃষ্টিতে ডক্-পল্লী যেন পচে উঠেছে। চারদিকে ধোঁয়া, বৃষ্টির মধ্যেই মাল ওঠা নামা চল্লেছে। জাহাজের ভোঁ-ভোঁ শব্দ তো আছেই, তার ওপর আবার মেরামতি কাযও চলছে—নানারকম আওয়াজের উৎপাতে কানে তালা লেগে যায়।

ভোরের দিকে জোশী ঘরে ফিরল। শারীরিক ক্লান্তি ও একটা চাপা উত্তেজনায় সে ভেঙে পড়েছে। আজ কয়েকদিন হল সে জুয়ায় একটানা হারছে, অনেক টাকা দেনা হয়ে গেছে। কিন্তু জুয়ার নেশা মারাত্মক: সন্ধ্যা হলেই শরীরের রক্ত যেন গরম হয়ে ওঠে, বুকের মধ্যে একটা উত্তেজনার ডেলা দপ্ দপ্ করতে থাকে। শিরায় শিরায় জুয়ার ডাক সে অনুভব করে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে এগিয়ে চলে আড্ডার দিকে। আর আজ কয়েকদিন হল কী যে হয়েছে—সে একটানা হেরে চলেছে, অথচ পাকা জুয়াড়ি সে।

টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে। জোশী আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখ্লো শুধু মেঘ, শুধু মেঘ—মেঘে ভরা আকাশ এখনি ভেঙে ছিঁড়ে গলে পড়্বে জলের অবিশ্রান্ত ধারায়। বর্ষাতিটা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে সে জোরে পা চালিয়ে দিল। কোম্পানির কিছু টাকা তার হাতে ছিল, আজ তাও গেছে জুয়ার আড্ডায়, তু-তিন দিনের মধ্যে টাকা জমা না দিতে পারলে চাকরিও যাবে। জোশী একটু হাসলো। না, এভাবে আর চলেনা……টাকা চাই। টাকার অভাবে আর কয়েকদিনের মধ্যেই আহার জোটানো শক্ত হয়ে উঠবে। টাকা চাই।

হাওয়া দিচ্ছে, শীতের হাওয়ার মতোই কন্কনে ঠাণ্ডা। জোশী বর্ষাতিটা আবার জড়িয়ে নিল। ব্যারাক্-বাড়ীর গেটের কাছে একটা বেড়াল কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে। জোশীর মনটা হঠাৎ করুণ হয়ে উঠল—হয়ত শীঘ্রই এই বেড়ালের মতোই তার অবস্থা হবে: অনাহারে রাস্তায় বসে ঝড়জলে কষ্ট পাবে। বেড়ালটা যেন তারই জন্য অপেক্ষা করে ছিল। জোশীকে দেখেই তার পেছনে চলতে লাগল। নোংরা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পেছন ফিরে জোশী ম্লান আলোয় দেখল একটা কালো বেড়াল—পান্নার মতো সবুজ তুটো চোখ ঝক্ঝক্ করছে। জোশীর বুকটা উত্তেজনায় লাফিয়ে উঠল। কালো বেড়াল! জুয়াড়ির অন্ধ কুসংস্কার মনের মধ্যে বলে উঠল যে এবার হয়ত ভাগ্য ফিরবে।

ঘরের দরজা খুলে আলো জ্বেলে জোশী দেখল বেড়ালটা এক কোনে এসে বসে আছে, চোখতুটো ধারালো ছুরির মতো তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছে। অনেকদিন বোধ হয় ভালো করে খেতে পায়নি—শরীর শুকিয়ে শীর্ণ হয়ে উঠেছে। ঘরে একটা টেবিলের ওপর তুধ চাপা দেওয়া ছিল। হঠাৎ জোশীর কী মনে হল, একটা পেয়ালায় তুধটা ঢেলে মেঝের ওপর নামিয়ে দিল। বেড়ালটার গায়ের লোম উত্তেজনায় খাড়া হয়ে উঠল, একবার জোশীর দিকে তাকিয়েই সে লাফিয়ে এল পেয়ালার কাছে—তারপরেই চক্…চক্…চক্।

গা থেকে বর্ষাতিটা খুলে জোশী জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়াল। বেশ জোরে বৃষ্টি নেমেছে: কালো আকাশ ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেছে। আকাশের তলায় দূরে ঘোলাটে জলের স্রোত, দিগন্তে জাহাজের মাস্তুলের অরণ্য।

জোশী ফিরে দাঁড়াল। বেড়ালটা পেয়ালার তুধ শেষ করে বিছানায় পায়ের দিকে নিশ্চিন্ত মনে গুঁড়ি মেরে শুয়ে আছে। চাদরে তু-এক জায়গায় থাবার ছাপ! হঠাৎ রাগে জোশীর শরীর জ্বলে গেল। রাস্তার এই নোংরা বেড়ালটা বিছানায় উঠে শুয়েছে! এক লাফে জোশী এগিয়ে এল বিছানার দিকে। পায়ের আওয়াজে বেড়ালটা চমকে উঠে বসেছে। দাঁতে দাঁত দিয়ে জোশী বেড়ালটার ঘাড় চেপে ধরতে গেল। হলদে দাঁতগুলো বার করে একটা

বা তুলে বেড়ালটা ফ্যাঁস্ করে উঠল—তার সবুজ চোখ লছে, গায়ের কালো লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। জোশী ছিয়ে এল, বিছানায় মুখ গুঁজে বেড়ালটা শুয়ে পড়ল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জোশী ভাবল এখন কী করা য়। জুয়াড়ীর অন্ধ কুসংস্কার বলছে: "কালো বেড়াল! কে বিরক্ত কোরোনা, থাকতে দাও। কে জানে হয়তো তামার কপাল ফিরে যাবে।" কিন্তু এই নোংরা বেড়াল-র সঙ্গে বিছানায় শোয়াও তো কষ্টকর। জোশী ঘরের ধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগল, হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে খল—ভোর প্রায় হয়ে এসেছে। জানলা দিয়ে বৃষ্টির ট আস্‌চে: কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় জোশীর শরীর কেঁপে ঠল। সে জানালাটা বন্ধ করে দিল। কী করে টাকা াসবে? কী করে? তুশ্চিন্তায় তার মাথা ঘুরতে লাগল। কাম্পানির টাকাটা তু-তিন দিনের মধ্যে দেওয়া চাই।

কতো দূর থেকে সমুদ্রের হাওয়া ডকের জাহাজের ওপর রে ঘুরে জানলার ওপর আছড়ে পড়ছে। বাইরে বৃষ্টির কটানা ঝম্ঝম্ শব্দ। কিন্তু জোশীর ছোট ঘরটি হঠাৎ ন বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। বিছানার াদা চাদরের ওপর ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় নিশ্চিন্ত মনে ালো বেড়ালটা ঘুমিয়ে আছে: নিঃশ্বাসের সঙ্গে শরীরটা াপছে। ঘুমে জোশীর চোখ জড়িয়ে আসছে, শরীর বসন্ন। সে চেয়ারে বসে পড়ল। এক মুহূর্তের জন্য চেতন হঠাৎ যেন নিভে যাচ্ছে, তারপরেই সে আবার জেগে ঠছে। বেড়ালটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে জোশী টবিলের ওপর মাথা রাখল—চোখ বুজে গেছে। ঘুমের ঘোরে তার একবার মনে হল সমস্ত বিছানাটা জুড়ে বালিশে মাথা রেখে যেন একটা প্রকাণ্ড কালো বেড়াল ুয়ে আছে।

দিনের আলোয় জোশী দেখল একটা কুৎসিত কালো বেড়াল, দেখলে ঘৃণা হয়। এ কয়দিন রাত্রে হেরে সকালের দিকে তার মনটা ভারি বিষণ্ণ থাকত। আজ কী জানি কেন মনটা যেন অনেকটা হালকা হয়ে গেছে। ম্যানেজারের কাছ থেকে খানিকটা তুধ চেয়ে বেড়ালটাকে দিয়ে দরজায় তালা লাগিয়ে সে চলে গেল জাহাজের অফিসে।

তুপুরের দিকে আকাশের মেঘ কেটে রোদ উঠল। জোশীর মনটা এখন অনেক ভালো হয়েছে। সারাদিন ডকের নানারকম শব্দ ও চীৎকারের মধ্যে, নানারকম কাযের মধ্যেও তার বারবার মনে হতে লাগল বেড়ালটার কথা। কী অদ্ভুত বেড়াল! কেমন নিশ্চিন্ত মনে কাল রাতে বিছানাটি দখল করে শুয়ে রইল! আজ সকালে তুধ আনতেই বিছানা থেকে নেমে এসে খেয়ে আবার বিছানায় গিয়ে উঠেছে! কী জানি কেন জোশীর হাসি পেল বেড়াল-টার আচরণের কথা মনে করে। কিন্তু রোজ রোজ তো চেয়ারে বসে রাত কাটানো চলবেনা। জোশী একটু চিন্তিত হয়ে পড়ল—যাক্, আজ রাতে নাহয় বেড়ালটার সঙ্গেই সে ও বিছানায় শোবে! উপায় কী? কালো বেড়াল!

সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে জোশী বেড়ালটাকে খাইয়ে বেরিয়ে পড়ল জুয়ার আড্ডার দিকে। পকেটে কয়েকটা মাত্র টাকা—আজ সারাদিনের উপরি রোজগার। মনে আশা আজ সে জিতবেই, না জিতলে চলবেনা, পথে দাঁড়াতে হবে। শুধু মনে ক্ষোভ এই যে আরো কিছু বেশি টাকা থাকলে লাভটাও বেশি হত। যাক্, দেখা যাক্ কী হয়। জুয়োর আড্ডার প্রথম ঘরে ছোট একটা হোটেল। জোশী সে ঘরে ঢুকতেই কোণ থেকে একজন জাহাজী লোক উঠে দাঁড়াল: "জোশী, তোমাকেই তো খুঁজছি।"

জোশী একটু অবাক হয়ে লোকটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। লোকটাকে তো কিছুতেই মনে পড়ছেনা! অনেক চেষ্টা করল সে মনে করতে—না, মনে পড়ছেনা। "চিনতে পারছিনা তো!"

লোকটা একটু হেসে বলল: "আমি চিনতে পারছি। অনেক খুঁজে তোমার দেখা পাওয়া গেছে। জাহাজে জাহাজে অনেক জায়গায় ঘুরছি, তাই তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি এতোদিন। তোমার ধার শোধ করছি।"

এক গোছা নোট সে জোশীর হাতে গুঁজে দিল। অবাক হয়ে জোশী দাঁড়িয়ে রইল : কই, কিছুই তো মনে পড়ে না! লোকটা একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

জুয়ার আড্ডায় গিয়ে খানিক পরে লোকটাকে মনে পড়ল। কিন্তু কী আশ্চর্য! সে তো শুনেছে লোকটা কিছুদিন আগে জাভায় মারা গেছে!

তারপর জোশীর ভাগ্য ফিরল। রাতের পর রাত উন্মাদের মতো জুয়ায় সে মেতে রইল। সে জিতছে...... জিতছে......ঝড়ের মতো দুর্নিবার গতিতে সে জিতে চলেছে। তাড়া তাড়া নোট তার ঘরে জমে উঠছে। সারাদিন একটা মোহের ঘোরে সে কায করে চলে, রাত হলেই যেন জীবন আসে। তীক্ষ্ণ মনে, স্থির বুদ্ধিতে সে খেলে চলে, জুয়ার টেবিলে তার সামনে গোছা গোছা নোট জমে ওঠে। জয়ের নেশায় জোশী যেন পাগল হয়ে উঠল। টাকার সংখ্যা সে গোণেনা, টল্‌তে টল্‌তে ঘরে ফিরে সে চেয়ারেই ঘুমিয়ে পড়ে। থাক্, কালো বেড়ালটা বিছানায় থাক্, সে চেয়ারেই ঘুমিয়ে নেবে।

জুয়ার উত্তেজনায় জোশী যেন মাতাল হয়ে গেল। চোখে আর ঘুম নেই। এখন চেয়ারে বসে সে ভাবে কখন দিন হবে, অফিসে কাযের মধ্যে সন্ধ্যার জন্য অপেক্ষা করে। তার পরেই রাত্রির মহোৎসব, জুয়ার পাশবিক উল্লাস। জুয়ার ঘরে অসম্ভব ভিড় জমে উঠছে। চারদিকে চাপা গলার আওয়াজের মধ্যে জোশী দানবের মতো, অসুরের মতো খেলে চলেছে আর জিতছে। জোশী জিতছে রাতের পর রাত অন্ধ ভাগ্যের অদৃশ্য পরিহাসে। চারদিকে খবর ছড়িয়ে পড়েছে আগুনের মতো। জুয়ার আড্ডায় রোজ অসংখ্য লোক আসছে এই দানবের বিরুদ্ধে নিজেদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। শেষ রাতে তারা হেরে ফিরে যায়, জোশী জিতে চলে। পর দিন আবার তারা আসে অন্ধ তাড়নায়, অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে—জোশী অপরাজেয়।

কিন্তু জোশীর শরীর ভেঙে পড়ছে। শরীর শুকিয়ে আসছে। চোখদুটো দিন দিন অস্বাভাবিক রকম উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। চোখে ঘুম নেই, রাতের পর রাত সে বন্ধ ঘরে বসে মদ খায় আর আপন মনে কথা বলে—পাশের ঘরের ইয়াসিন্ সারেং ম্যানেজারের কাছে অভিযোগ করেছে। দিনের বেলার ছোট কুৎসিত কালো বেড়ালটা রাত্রে জোশীর চোখের সামনে সারা বিছানা জুড়ে শুয়ে থাকে। জোশী কি স্বপ্ন দেখে? সেদিন জুয়ার আড্ডাতেই সে অজ্ঞান হয়ে গেল। খেলা বন্ধ করে পথে ফিরে আসবার সময়ে ক্লান্তিতে তার শরীর ভেঙে পড়ছে। পা আর চলেনা। রাতের পর রাত অনিদ্রা, রাতের পর রাত জুয়ার অস্বাভাবিক উত্তেজনা। আজ ঘুমে সমস্ত শরীর তার ভরে উঠেছে। একটার পর একটা ঘুমের ঢেউ তার দেহের ওপর আছড়ে পড়ছে, ঘুমে শরীর তার থর থর করে কাঁপছে। পথ দিয়ে চলছে জোশী আর তার মনে হচ্ছে চোখের সামনে যেন নীলপদ্মের কুঁড়ি ফেটে ফুল হয়ে গেল, আবার সে ফুল হল কুঁড়ি।

মাথার মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণার মতো ঘুমের আগ্রহ নিয়ে জোশী ঘরে ফিরল। মদ খেয়ে সে দেখল বেড়ালটা আজো বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে আছে। জোশী টলতে টলতে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল। পায়ের আওয়াজে বেড়ালটা জেগে উঠে বসল। শোবার জন্য বিছানার কাছে যেতেই বেড়ালটা হলদে দাঁত বার করে বিশ্রী গর্জন করে উঠল। তার গায়ের কালো লোম খাড়া হয়ে উঠেছে, চোখ দিয়ে সবুজ আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। হঠাৎ প্রচণ্ড রাগে জোশীর মাথার ভেতরটা যেন ফেটে গেল, কাঁপতে কাঁপতে সে বেড়ালটার গলা দুহাতে টিপে ধরে বিছানা থেকে টেনে তুলল। হাতের চাপে পান্নার মতো সবুজ ঝক্‌ঝকে চোখ-দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে আসছে। সামনের থাবাদুটো দিয়ে বেড়ালটা হঠাৎ জোশীর মুখ ভীষণভাবে আঁচড়ে দিল। রাগে ভয়ে যন্ত্রণায় পাগলের মতো জোশী প্রাণপণ শক্তিতে দুহাত দিয়ে গলা টিপে ধরল। হলদে দাঁতের সারির মধ্য দিয়ে পাতলা লাল জিভটা এবার ঝুলে পড়েছে, কালো মুখে

চোখের সবুজ ডেলাদুটো বীভৎস দেখাচ্ছে। বেড়ালটা মরে গেল।

এক হাতে বেড়ালটাকে ধরে অপর হাতে কপালের ঘাম মুছে জোশী টলতে টলতে নিচে নেমে গেল। ব্যারাক্ থেকে বেরিয়ে সে ডকের ধারে জলে বেড়ালটাকে ফেলে দেবে।

কতোক্ষণ যে ঘুমিয়ে ছিল জোশী জানেনা। ঘুম ভাঙতে সে দেখল তখনো ভোর হয়নি। গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরোলো—সে চমকে উঠলো, আওয়াজটা স্বাভাবিক নয়, কেমন যেন বিকৃত, যেন ঠিক মানুষের গলার শব্দ নয়। উঠে বসবার চেষ্টা করতে গিয়ে সে দেখল যে কী রকম অদ্ভুতভাবে সে কুঁকড়ে শুয়ে আছে। ভারি আশ্চর্য লাগল। হঠাৎ হাতের দিকে নজর পড়ল, দেখল যেন হাতের ওপর খুব সরু সরু শোঁয়ার মত কালো লোম দেখা যাচ্ছে। ভয়ে জোশী বিছানা থেকে নেমে পড়ল। কিন্তু কোমর সোজা করে দাঁড়াতে বেশ কষ্ট হল। হাতের নখগুলো যেন কেমন সরু সরু লম্বা মতো মনে হচ্ছে। হঠাৎ একটা কুৎসিত ভয়ে তার শরীর কেঁপে উঠল। আরসির সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই আর সন্দেহ রইল না : ইলেক্‌ট্রিকের আলোয় মুখের ওপর যেন কালো কালো কতগুলো লোম দেখা যাচ্ছে আর বেড়ালের আঁচড়ের দাগ।

জোশী পাগলের মতো দরজার দিকে ছুটল। কোমর বার বার ভেঙে পড়ছে, মুখ দিয়ে একটা করুণ আর্তনাদ বেরোচ্ছে। সারা বাড়ী নিস্তব্ধ, সকলে তখনো ঘুমোচ্ছে। সিঁড়ি দিয়ে জোশী অতিকষ্টে নেমে এল। গেটের বাইরে এসে দেখল আকাশ অন্ধকার, টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। জোশী মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগিয়ে চলল, কিন্তু আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না। অন্ধকারে বস্তির আনাচে কানাচে হামাগুড়ি দিয়ে সে ডকের দিকে এগোতে লাগল।

দূরে জাহাজের খোলে জল লেগে মাঝে মাঝে শব্দ উঠছে, কয়েকটা ছোট নৌকা থেকে লণ্ঠনের আলো দেখা যাচ্ছে। মালগুদামের পাশ দিয়ে অসহায় ভাবে জোশী চলেছে এগিয়ে। কোনো লোকের দেখা নেই, কেউ তাকে আর সাহায্য করতে পারবেনা। চোখের সামনে ঘোলাটে জলের স্রোত চক্‌চক্ করে উঠল। মাটিতে প্রায় মুখ ঠেকিয়ে জোশী জলের ধারে এগিয়ে এল। কোথায়, কোথায় সেই কালো বেড়াল! মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা যদি তার দেখা পায় তাহলে সে আবার মুক্তি পাবে। চোখ দিয়ে জল ঝরছে, ভয়ে অসহায় হয়ে সে জলের ধারে এলো।

ঐ যে, ঐ যে, দূরে কালো বেড়ালটা জলের ভেতর থেকে থাবা তুলে তাকে ডাকছে। একটা চাপা কান্নার সঙ্গে বিশ্রী আর্তনাদ করে জোশী জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে ডুবে গেল।

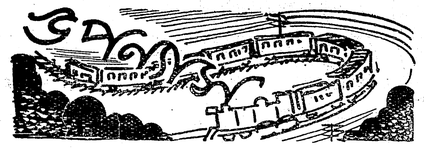

প্রেতের আহ্বান

(ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস)

প্রসাদ উপাধ্যায়

অশোক, কুহু আর ভবতোষবাবু যখন উদয়-ভিলার সামনে পৌছোলেন তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে। আকাশে আলো ম্লান হয়ে এসেছে, আর সেই ম্লান আলোয় সমুদ্র আর পিচের 'পথ, কালো এবড়ো খেবড়ো পাথর আর দূরের ঝাপসা তালগাছের বন—সব যেন কি রকম মৃত অদ্ভুত মনে হচ্ছে।

কারুর মুখে কথা নেই। দেউড়িতে দরোয়ান উঠে দাঁড়ালো, অভিবাদন জানালো—কিন্তু নিঃশব্দে।

তারপর প্রকাণ্ড প্রাসাদ। অথচ কি রকম যেন খাঁ-খাঁ করছে। বড়বড় ঘর। আসবাবের বিন্দুমাত্র অভাব নেই। বরং বাহুল্যই। অথচ কিসের অস্পষ্ট অভিশাপ যেন বোবা উদ্ধত ভঙ্গিতে স্তব্ধভাবে পাহারা দিচ্ছে। এখানে মৃত্যুর হাওয়া। এখানে জীবনের কোন জায়গাই নেই। আগন্তুকের দল অনধিকার প্রবেশ করেছে মনে হয়।

কোথাও কিছুমাত্র শব্দ নেই। শুধু তিনজনের পায়ের শব্দ। কি রকম খাপছাড়া, কি রকম অবাঞ্ছনীয় মনে হয় এই পায়ের শব্দ। সেই শব্দে কেঁপে উঠছে সমস্ত বাড়ির স্তব্ধতা—যেন সূর্য্যপূজারীর অভিশাপের মূক সাক্ষীর কপাল কুঁচকে উঠেছে!

অলৌকিককে কুহু মানে না। ভয় বলে কোন জিনিষকে সে জীবনে চিনতে শেখেনি। তবুও একটা বোবা অস্বস্তিতে তার দম প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিলো। কেমন সঙ্কোচ হচ্ছিল স্তব্ধতার এই অখণ্ড রাজত্ব ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে এগিয়ে চলতে।

অথচ ভেবে দেখতে গেলে এর কোন মানেই হয় না। ফাঁকা বাড়ি। লোকজন নেই। এই যা। তবুও ইতিহাস এই বাড়ির, এই বংশের পেছনে যে অদ্ভুত ইতিহাস রয়েছে সেই ইতিহাসকে কেমন করে অস্বীকার করা যাবে? হয় অলৌকিক কিছুই নয়। হয়ত কেন, নিশ্চয় কিছু নয়, কেন সে রকম কিছু হতেই পারে না—কুহু মনে মনে নিজে সঙ্গে তর্ক করে। তবু সেই ইতিহাস, সূর্য্যপূজারীর অভিশাপ—সে যেন বাড়ির প্রত্যেকটি ধূলোকণার মধ্যে বোবা সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে। এ ইতিহাসকে কেমন করে অস্বীকার করা যায়—এ ইতিহাস যে দুঃস্বপ্নের মতন সমস্ত বাড়িময় থমথম করছে।

কোথাও বিন্দুমাত্র শব্দ নেই। যেন জীবনের সীমানা পার হয়ে মৃত্যুর মৌনতার মধ্যে পা ফেলতে ফেলতে তিনজনে এগিয়ে চলেছে। কারুর মুখে কথা নেই, কুহু মনে নানান রকম কথা তোড়পাড় করছে। আর এক অস্বস্তি—ভয় নয়, একটা অদ্ভুত অস্বস্তি দুঃস্বপ্নের মতো, বুকে চাপার মতো। কারণ নেই, তবুও নিজেকে কেমন অপরাধী মনে হয়; মনে হয় এই স্তব্ধতাকে অমনভাবে ভেঙে এগিয়ে চলা বুঝি উচিত হচ্ছে না। ভাবতে গেলে হাসি পায়, হাসি পাবারই কথা। কিন্তু এই অভিশপ্ত প্রাসাদ রক্তে কিসের ঢেউ তোলে; বুদ্ধির বাঁধ সে ঢেউতে ভেঙে

চুরমার হয়ে যায়। কুহু ভালো করে, পরিষ্কার ভাবে ভেবে দেখবে কেমন করে?

ভবতোষবাবু চলেছিলেন সব প্রথম। এ বাড়ির ঘরদোর তাঁর চেনাশুনো, পরিচিত। তারপর অশোক। অশোকের মনের মধ্যে কি রকম ভাব তা মুখ দেখে মোটেই বোঝবার উপায় নেই। কেননা, অশোকের মুখের উপর মনের ভাব কোনদিনই কোন ছায়া ফেলতে পারে না। শুধু ওর তীক্ষ্ণ চোখদুটো চকচক করে। কিন্তু তার বেশী আর কিছুই নয়। ওইটুকুই।

"ডানদিকে লাইব্রেরী-ঘর", হঠাৎ থেমে দাঁড়িয়ে ভবতোষবাবু বললেন, কি রকম খাপছাড়া মনে হল তাঁর গলার স্বর—"এই ঘরেই সম্ভবত তাঁকে পাওয়া যাবে।"

কাকে? বুঝতে অসুবিধে হয় না প্রতাপচন্দ্র সম্বন্ধেই কথাটা তিনি বললেন। কেন না, প্রতাপচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই তিনজন এখানে উপস্থিত। "কে জানে এখন কেমন অবস্থায় আছেন," ভবতোষবাবু প্রায় আপন মনেই বললেন, "একে মাথা খারাপ, তায় সম্প্রতি খুব আফিম ধরেছেন।"

কুহু বা অশোক এ কথার জবাব দিলো না। জবাব আছেই বা কি?

ভবতোষবাবু লাইব্রেরীর দরজার উপর সন্তর্পণে টোকা দিলেন। ভিতর থেকে শব্দ এলো, "ভেতরে আসুন।"

দোর ঠেলে ঢুকলেন ভবতোষবাবু, তারপর অশোক, তারপর কুহু।

প্রকাণ্ড ঘর। একেবারে কড়িকাঠ পর্য্যন্ত ঠাসা বই। দক্ষিণ দিকের জানলাটা খোলা, তার মধ্যে সমুদ্রের একফালি নজরে পড়ে। সমুদ্রের উপর সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। সমস্ত সমুদ্র রক্তাক্ত।

আর সেই জানলার সামনে দাঁড়িয়ে একটি শীর্ণ পুরুষ। আস্তে আস্তে সমুদ্রের দিক থেকে মুখ ফেরোলো, তারপর চোখের চশমাটা খুলে পকেট থেকে ধবধবে রুমাল বের করে চশমার কাঁচ মুছতে লাগলো।

সূর্য্যাস্তের আলোয় চশমার পুরু কাঁচ চকচক করে উঠল।

লোকটি চশমাটা আবার চোখের উপর দিলো, তারপর অত্যন্ত ঠাণ্ডা নিস্তেজ গলায় বলল, "আসুন।"

ভবতোষবাবু আলাপ করিয়ে দিলেন।

প্রতাপচন্দ্রের মুখে ফুটে উঠ্‌ল দুর্ব্বল ফিকে হাসি। "আমাদের দেশে এলেন," প্রতাপচন্দ্র আশোক আর কুহুকে উদ্দেশ্য করে বলে চললেন, "কিন্তু এমন সময় এলেন যখন আমার শেষ হয়ে এসেছে। আমার শেষ হয়ে এসেছে, আমার সময় নেই—নইলে আপনাদের মতো অতিথিদের নিয়ে কত আনন্দই করতে পারতুম। এই সহর, এই সমুদ্র এদের আমি কী ভালো যে বাসি তা কেমন করে বলব! অথচ, আমার শেষ হয়ে এসেছে, আমায় চলে যেতে হবে—এই সহর, এই সমুদ্র ছেড়ে আমায় চলে যেতে হবে; আমার সময় হয়ে এলো।"

প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন। কেমন যেন হাঁপিয়ে পড়েছেন মনে হল। তারপর আস্তে আস্তে নীচু টেবিলের একটা দেরাজ থেকে ওষুধের একটা শিশি বের করে একটা ছোট্ট গেলাসে কি ঢাললেন; তারপর ঢক করে গিলে ফেললেন।

নিশ্চই বিস্বাদ ওষুধ। তাঁর ফ্যাকাশে মুখ কি রকম বিকৃত হয়ে গেল।

পকেট থেকে রুমাল বের করে ঠোঁট মুছতে মুছতে প্রতাপচন্দ্র আবার এগিয়ে গেলেন পশ্চিমের জানলটার দিকে, আর বিহ্বল ভাবে চেয়ে রইলেন জানলার বাইরে।

বাইরে সমুদ্রের উপর লাল সূর্য্যাস্ত। সমস্ত সমুদ্র রক্তাক্ত মনে হয়।

আর সমুদ্র থেকে ঠিকরে আসা লালচে আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল তাঁর চোখদুটো চকচক করছে।

চোখের কোণে জল!

এ অবস্থায় কীই বা বলা যায়! ছেলেমানুষ নয়,

বোকাহাবা নয়—তবুও যদি অমন ছেলেমানুষি করে তা হলে তাকে কি বলে সান্ত্বনা দেওয়া যাবে ?

কুহু দাঁড়িয়ে রইলো বিহ্বল ভাবে।

ভবতোষবাবু এগিয়ে গিয়ে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলেন, "আপনি অনর্থক বিচলিত হয়েছেন প্রতাপচন্দ্র।"

প্রতাপচন্দ্র হাসলেন। আবার সেই দুর্বল ফ্যাকাশে হাসি। "এটা যে তর্কের বিষয় মোটেই নয় ভবতোষবাবু," প্রতাপচন্দ্র বলে চললেন, "আমি দর্শনের ছাত্র, আমি তর্ক-বিদ্যার শেষ পর্য্যন্ত তলিয়ে দেখেছি। যদি তর্কের বিষয় হত তা হলে আমি তর্ক করতুম, হয়ত আপনাদের কাছে হার মানতুম না।"

প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন। তারপর যেন আচমকা একটা উত্তেজনার ঢেউ এল তাঁর মধ্যে, তাঁর ক্ষীণ সরু সরু আঙ্গুলগুলো অস্থিরভাবে ঘুরতে লাগলো পাশের টেবিলটার উপর—

"অমি নিজে দেখছি। একবার নয়, দুবার নয়, বারবার। প্রথমে অবিশ্বাস করেছি নিজের চোখ, প্রথমে আমল দিইনি অলৌকিক কোন কথা। কিন্তু একবার নয়, দুবার নয়—বারবার। সেই সূর্য্যপূজারীর অভিশাপ আমার সামনে সমন পাঠিয়েছে। এ সমনকে নিজের চোখে দেখতে পেয়ে—একবার নয় দুবার নয়, বারবার দেখতে পেয়েও আমি কেমন করে অস্বীকার করতে পারি ? এখন নিজের সঙ্গে তর্ক করা বন্ধ করেছি—এখন আমি বুঝতে পেরেছি এ জিনিষ তর্কের বিষয় নয়। সূর্য্যপূজারীর অভিশাপ আমার সমস্ত জ্ঞান, আমার সমস্ত সঞ্চিত অভিজ্ঞতাকে মিথ্যে করে দিয়েছে। আমি আর নিজের সঙ্গে তর্ক করি না……"

রোগা দুর্বল শরীরে যেন শক্তি ক্ষয়ে যাচ্ছিল। দম নেবার জন্যে প্রতাপচন্দ্র আবার থামলেন। সমুদ্র থেকে ঠিকরে আসা সূর্যাস্তের আলোয় তাঁর চোখদুটো কী রকম অসহায়, কী রকম করুণ মনে হচ্ছিল।

ভবতোষবাবু তাঁর কাছে আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলেন। অনেকটা সান্ত্বনা দেবার সুরেই তিনি আবার বললেন, "আপনি অনর্থক বিচলিত হয়েছেন, প্রতাপচন্দ্র। একটা খবর বোধহয় আপনি জানেন না—যে খাতায় সূর্য্যপূজারীর অভিশাপের কথা রয়েছে সে খাতাটা জাল বলে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছে।"

প্রতাপচন্দ্রের পাতলা ঠোঁটে আবার ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল। এ হাসি তাঁর চোখের কোণায় জলের চেয়ে করুণ, তার চেয়েও অসহায়।—"জাল বলে প্রমাণ হয়েছে ?"—প্রতাপচন্দ্র প্রশ্ন করলেন। কিন্তু প্রশ্নের সুরে এতটুকু উৎসাহের সাড়া নেই।

উৎসাহ বরং ভবতোষবাবুর গলায়: "হুঁ। জাল। কোলকাতার একজন বিশিষ্ট অপরাধ-বিজ্ঞানী বিচার করে দেখিয়েছেন যে খাতাটা মোটেই প্রাচীন নয়, তার উপর প্রাচীনতার মুখোস পরানো হয়েছে মাত্র।"

"কিন্তু তাতে প্রমাণ হল কি ?"—তার্কিক প্রতাপচন্দ্র যেন বহুদিন পরে আড়ামোড়া ভেঙ্গে উঠে বসলেন, "খাতাটা আসলে পুরোনো নয়, অনেক ভুলচুকে ভরা খাতা—এ আমি অনেকদিন আগেই জানতুম। প্রথম যখন ওটার পাতা ওলটাই তখনই আমি দেখতে পেয়েছিলুম ওর মধ্যে নানান রকম ভুল কথা আছে, প্রাচীন গুজরাটের ইতিহাসের সঙ্গে যা একদম মেলে না। গোয়েন্দার দরকার কি বলুন—খাতার পাতায় যে কাগজ তা ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে পৃথিবীতে প্রস্তুত হতে পারে না, খাতায় যে কালিতে লেখা তা মোটেই পুরোনো কালি নয়। আর অত কেন, খাতাটার বাঁধাই দেখলেই বুঝতে পারা যায় ও খাতা প্রাচীন নয়। দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে বাঁধাই-এর যে জায়গায় চিহ্ন পড়া উচিত ও খাতার সে সব জায়গায় চিহ্ন নেই, ভুল কয়েকটা দাগ আছে মাত্র।"

কুহু যেন এক মুহূর্তে নিভে গেল। পাগল দেখতে এসে একী কাণ্ড! কিছুক্ষণ আগে যে কথা আবিষ্কার করার দরুণ অশোকের প্রতি মনে মনে সে শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়েছিলো, সেই কথাই কিনা এই দুরন্ত পাগল অতি

অনায়াসে, গড় গড় করে, প্রায় মুখস্থ বলার মতো বলে গেল। খাতাটা আসলে পুরোনো নয়, প্রাচীনতার কয়েকটা ভ্রান্ত ইঙ্গিতে মোড়া মাত্র—এ কথা আবিষ্কার করার মধ্যে বুদ্ধিভ্রংশের প্রমাণ ত দূরের কথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ-শক্তির প্রমাণ রয়েছে বরং। তা হলে ?

এতক্ষণ পরে অশোক প্রথম কথা বলল: "খাতাটা যে বাস্তবিক পুরোনো নয় এ কথা তা হলে আপনি অনেক দিন আগেই বুঝতে পেরেছিলেন ?"

"হুঁ", অত্যন্ত সহজ গলায় বললে প্রতাপচন্দ্র, "যেদিন প্রথম হাতে পাই সেই দিনই।"

"তাহলে খাতাটাকে অতখানি বিশ্বাস করলেন কেমন করে ?"

"খাতাকে বিশ্বাস ? কই খাতাকে ত আমি প্রাচীন বলে বিশ্বাস করিনি! আমি বিশ্বাস করেছি নিজের চোখ-কে। খাতাটা আমার হাতে পৌছোবার আগেই প্রেতলোকের প্রতীককে দেখতে পেলুম, দেখতে পেলুম মৃত সূর্য্যপূজারীর সমন আমায় ডাকতে এসেছে। তারপর খাতাটা আমার হাতে এলো: বুঝলুম এটা আসলে পুরোনো নয়, তবুও এর ভেতরের খবরটুকু আসল। মনে হল, আমাদের বংশের কেউ—খুব বেশীদিন নয় হয়ত ঐ খাতায় আমাদের বংশের অতীত অভিশাপের কথা লিখেছিলেন। ঘটনা যখন ঘটেছে খাতাটা যে তখনকারই হতে হবে তার কোন যুক্তি নেই"

"নিশ্চই নয়," অশোক বলল, "কন্তু একটা কথা ভেবে দেখুন: খাতাটা যাতে দেখতে পুরোনো লাগে লেখক সে চেষ্টা করলেন কেন ?"

অশোকের প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে প্রতাপচন্দ্রের চেহারা যেন বদলে যেতে লাগলো। একটা আকস্মিক চাপা উত্তেজনা হঠাৎ যেন তাঁর দুর্বল ফ্যাকাশে চেহারার উপর কালো ছায়ার পর্দা টেনে দিল। কয়েক মুহূর্ত তিনি চুপ করে রইলেন, তারপর ভবতোষবাবুর দিকে চোখ তুলে চাইলেন। সে চোখ স্থির, শান্ত, অথচ তার আড়ালে একটা তীব্র ভর্ৎসনা।

"ভবতোষবাবু", প্রতাপচন্দ্রের গলা এমন স্থির, এমন শান্ত, যে প্রত্যেকটি শব্দের টুকরোকে স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ মনে হয়, "ভবতোষবাবু, আলাপ করিয়ে দেবার সময় আপনি বললেই পারতেন আমায় জেরা করাবার জন্যে আপনি এই অপরাধ-বিজ্ঞানী ভদ্রলোককে এনেছেন। অবশ্য এতে যে অন্যায় কিছু আছে তা আমি বলতে চাই না; আর আনবেন না-ই বা কেন ? সহর শুদ্ধু সকলেরই যখন ধারণা আমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে তখন ত' আমার যাঁরা মঙ্গলাকাঙ্খী তাঁরা সকলেই সব রকম চেষ্টা করবেন। এতে দোষের কিছু নেই; বরং আমার প্রতি মমতারই প্রকাশ রয়েছে। তবে একটা কথা বিশ্বাস করুন; আমার মাথা খারাপ যদিই বা হয়ে থাকে তা হলেও এতখানি খারাপ নিশ্চই হয়নি যে ওঁকে অপরাধ-বিজ্ঞানী বলে পরিচয় করিয়ে দিলে আমি দুঃখিত হতুম।"

কুহু আর ভবতোষবাবু একেবারে স্তম্ভিত!

অত্যন্ত সপ্রতিভ ভাবে অশোক বলল, "আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে ভবতোষবাবুর বা আমাদের কারুর বাস্তবিক কোন দোষ নেই। কেন না, আপনার এখানে আসবার আগে পর্য্যন্ত আমাদের কারুর কোন ধারণাই ছিলো না যে আপনার বুদ্ধি এখনো ঝকঝকে নির্মল রয়েছে। আজ সকালের কাগজ আমরা পড়েছি; হয়ত আপনিও পড়েছেন এবং আপনিই বলুন যে ভাবে তারা খবর ছাপিয়েছে তাতে আমাদের সকলের পক্ষেই শঙ্কিত হওয়া স্বাভাবিক কি না। যাই হোক, খবরটা যে মিথ্যে এ দেখে আমরা সকলেই আশ্বস্ত হয়েছি।"

"তা হলে আমার মাথা যে খারাপ হয়নি এ কথা আপনি বিশ্বাস করছেন ?"

"নিশ্চই"—অশোক খুব জোর দিয়েই বলল।

"ধন্যবাদ", প্রতাপচন্দ্র বললেন। আর কথা নয়।

তারপর সমস্ত ঘরে একটা চাপা অস্বস্তির স্তব্ধতা। কারুর মুখে কথা নেই। কি-ই বা এখন বলা যায়।

সন্ধে হয়ে আসছে। সমুদ্র আরও টকটকে, আরও রক্তাক্ত মনে হয়। আর মনে হয় সমুদ্র থেকে ঠিকরে আসা মৃদু লাল আলো সমস্ত ঘরের আবহাওয়াকে বড় বেশী গুমোট করে তুলছে।

কারুর মুখে কথা নেই।

কিন্তু এমন বোকার মতন দাঁড়িয়ে থাকলে ত' আর চলবে না। অশোক আস্তে আস্তে প্রতাপচন্দ্রের দিকে এগিয়ে গেল। প্রতাপচন্দ্র জানলার বাইরে চেয়ে কি যেন ভাবছেন।

"শুনুন প্রতাপচন্দ্র", অশোকের গলা অত্যন্ত কোমল অথচ অত্যন্ত দৃঢ় মনে হল, "আমি সত্যই অপরাধ-বিজ্ঞানী হিসেবে আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।"

"অপরাধ বিজ্ঞানের আওতায় আমার কেস-টা একেবারেই পড়ে না অশোকবাবু। আপনাকে ছোট করতে চাইছি না; কিন্তু প্রেতলোক সম্বন্ধে অজস্র তথ্য জেনে আমি অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছি যে এ ব্যাপার অপরাধ বিজ্ঞানের বাইরে। আমায় সাহায্য করবার যে চেষ্টা করছেন তার জন্যে ধন্যবাদ; কিন্তু আমার পূর্বপুরুষের কুকীর্তির যে ঋণশোধ আমায় করতেই হবে সে ব্যাপারে আপনার একটুও হাত থাকতে পারে না। আপনি বৃথা সময় নষ্ট করবেন না।"

"কিন্তু প্রেতলোকই যে আমি স্বীকার করি না।"

"তাতে প্রেতলোকের কিছুই আসে-যায় না।"

"প্রেতলোককে আমি অস্বীকার করি কেন না এ পর্য্যন্ত জীবনে তার কোন প্রমাণ পাইনি।"

"আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। আপনার বংশে কোনো অতীত কুকীর্তি নেই। ঈর্ষা করার মতো মনের জোর থাকলে আপনাকে আমি ঈর্ষা করতুম। কিন্তু সে জোর আমার আর নেই; আমার সময়ও শেষ হয়ে এসেছে। আমি শুনেছি প্রেতের আহ্বান।"

"সেই কথা বলুন। আমায় আগাগোড়া বলুন।"

"কিন্তু লাভ কি?"

"আর কোন লাভ থাকুক আর নাই থাকুক, অন্তত আমার নিজের মস্তবড় ভুল ভাঙ্গতে পারে। প্রেতলোক সম্বন্ধে ভ্রান্ত বিশ্বাসকে আমি যেমন খারাপ মনে করি প্রেতলোক সম্বন্ধে ভ্রান্ত অবিশ্বাসকেও আমি তেমনি খারাপ মনে করি। আমার অবিশ্বাস যদি ভ্রান্তই হয় তা হলে আপনার উচিত তা ভেঙ্গে দেওয়া।"—অশোকের গলায় ক্রমশ একটা আদেশের স্বর ফুটে উঠতে লাগলো।

"কিন্তু তর্ক করতে আর ভালো লাগে না। নিজের সঙ্গে অনেকদিন অনেক তর্ক করেছি; ক্লান্তি লাগে—আর তর্ক করতে ইচ্ছে করে না।"

"আমি তর্ক করতে চাই না।"

"তবে কি চান?"

"যা ঘটেছে তাই শুনতে চাই।"

"সে সব কথা ভবতোষবাবুকে অগেই বলেছি। তাঁর কাছ থেকেই শুনতে পারেন।"

"উঁহু। আমি এমন কয়েকটা কথা শুনতে চাই ভবতোষবাবু যা জানেন না।"

"বলুন কি কথা?"

"প্রথম কথা, আগনি প্রথম কোথায় প্রেতলোকের সাক্ষাৎ পেলেন?"

"আমার ড্রেসিং রুমে।"

"সে ঘরে কটা দরজা জানলা?"

"মাত্র একটা দরজা—আমার শোবার ঘর থেকে ঢোকবার দরজা। ঘরটার বাকি তিনদিকে একেবারে ঠাস ইঁটের গাঁথনি।"

"কি দেখলেন বলুন।"

"খুলেই বলছি। ঘরটায় ঢোকবার দরজার ঠিক মাথার ওপর একটা ইলেকট্রিক আলো আছে। আমার শোবার ঘর থেকে কয়েক ধাপ নেমে ডানদিকে আলোর সুইচটা পড়ে। সেদিন রাতে শোবার আগে জামা কাপড় বদলাবার জন্যে

ড্রেসিংরুমে নামছি, সামনে দোরটা বন্ধ ছিলো। দোরটা খুললুম। ঘর অন্ধকার। মনে হল অন্ধকার থেকে একটা বাদুড় উড়ে বেরিয়ে গেল। এমনিতে অবাক হবার কিছু নেই; কিন্তু সে বাদুড়টা অদ্ভুত, ভারি অদ্ভুত। তার গা থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে নীলচে আলো। অবাক হয়ে ফিরে চাইলুম। কিন্তু বাদুরটাকে আর দেখতে পেলুম না। মনে হল মনের ভুল হয়ত বা। তাই মন থেকে ও কথা মুছে ফেলতে ফেলতে ডানদিকের সুইচটা টিপলুম। আর চমকে উঠলুম। ঘরের মধ্যে আমার ঠিক মুখোমুখি একটা মাথা উলটো হয়ে শূন্যে ভাসছে। আমি কিন্তু ভয় পাইনি একটুও নয়। লাফিয়ে ঢুকলুম ঘরের মধ্যে। অন্ধকার ঘর; বাইরের দোরের উপরের আলোটা চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে তেমন পৌঁছোয় না। কিন্তু ঘরের মধ্যে অন্য আলো আছে। -তাড়াতাড়ি তার সুইচ টিপে ভেতরের আলো জ্বাললুম। কিন্তু আশ্চর্য্য; আলোয় ঘর ভরে উঠলে ভেতরে শুধু আমার ওয়ার্ডরোব আর ড্রেসিং টেব্‌ল ছাড়া কিছুই চোখে পড়ল না।"

"অথচ ইতিমধ্যে যে ঘর থেকে কেউ বেরিয়ে গিয়েছে তাও মনে হল না?"

"হতেই পারে না; কেন না, ঘরে ঢোকবা মাত্র একটি দরজা, এবং সে দরজা জুড়ে ঢুকেছি আমি নিজে। কোনো কিছু ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে গেলে আমায় ধাক্কা না দিয়ে বেরুতেই পারে না।"

"তারপর আপনি কি করলেন?"

"বলছি শুনুন। সেদিন আর বিশেষ কিছু করিনি। কেবল, মনটা কি রকম ছমছম করতে লাগলো। শোবার ঘরে ফিরে শুয়ে পড়লুম। তারপর একমাস চুপচাপ। ঠিক একমাস পরে আবার ঘটল সেই ঘটনা। এবার কিন্তু প্রথমেই আমি অনেক বেশী সজাগ ছিলুম; ঘরের মধ্যে সেই ভাসমান মুণ্ডু দেখতে পেয়েই এক লাফে ঢুকলুম ভেতরে এবং মুহূর্তের মধ্যেই ভেতর থেকে দোরটা বন্ধ করে দিলুম। তারপর আলো জ্বাললুম। কিন্তু আশ্চর্য্য! তন্ন তন্ন করে খুঁজেও ঘরের মধ্যে আর কিছু পেলুম না; শুধু আমার কাপড়ের আলমারিটা আর ড্রেসিং টেব্‌ল। ...আর সেদিন আমি ভয় পেলুম; জীবনে প্রথম ভয় পেলুম। আমার চামড়ার মধ্যেটা শিরশির করতে লাগলো; বেশ বুঝতে পারলুম আমার হার হয়েছে। আমার সমস্ত বুদ্ধি, আমার সমস্ত অভিজ্ঞতা—সব কিছুর হার হয়েছে। আর আমার ভয় লাগলো; আমার চামড়ার মধ্যেটা শিরশির করতে লাগলো—আর সমস্ত রাত আমার চোখে ঘুম এলো না। শুধু ভয়ে নয়; একটা দারুণ অস্বস্তিতে। হেরে যাবার অস্বস্তি—কেন না, তার আগে জীবনে এমন কিছুতে বিশ্বাস করিনি যার স্বপক্ষে বুদ্ধির সাক্ষী নেই। সেই রাতে প্রথম বুঝলাম বুদ্ধির হার হয়েছে; বুঝলাম এবার থেকে নতুন করে সব কিছু শিখতে হবে। তাই পরদিন ভোর বেলায় লাইব্রেরী-ঘরে ঢুকে অতি-প্রিয় দর্শণ আর বিজ্ঞানের পুঁথির দিকে একদম মন গেল না। যেসব বইকে এতদিন অবহেলা করে ঠেলে রেখেছিলুম টান পড়ল সেগুলোর দিকেই—অধ্যাত্মবিদ্যা আর তন্ত্র সম্বন্ধে বইগুলো। আর অবাক হয়ে গেলুল; সেগুলো ঘাঁটতে ঘাঁটতে আর পড়তে পড়তে দিনকতক পরে হঠাৎ একদিন বেরুলো ওই খাতাটা। খাতাটায় অনেক ভুলচুক চোখে পড়ল—কিন্তু তবুও সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে গেল চোখের সামনে। বুঝলাম ঠিক এক মাস অন্তর, প্রতি অমাবস্যার রাতে, কিসের মূর্তি আমি দেখতে পাই। ক্রমে যেন সমস্ত ব্যাপারটা প্রায় নেশার মতন আমায় পেয়ে বসল; অমাবস্যা আসবার মুখে কী রকম অধৈর্য্য লাগতে লাগলো। সূর্য্যপূজারীর সেই কাটা মুখ—"

অশোক হঠাৎ বাধা দিলো, "সূর্য্যপূজারীর মুখ মনে করলেন কেমন করে?"

"আর কার মুখ মনে করতে পারি বলুন—অবশ্যই উল্টো ভাবে যে মুখ দূরে ভাসছে তাকে চিনতে পারা অসম্ভব; তাছাড়া, সূর্য্যপূজারীর চেহারা কেমন ছিলো

তারও উল্লেখ খাতাটায় কোথাও নেই। কিন্তু আর কার মুখ ওভাবে হাওয়ায় ভাসতে পারে বলুন ?’

“তা ঠিক। তারপর কি হল ?”

“তারপর কি হল তা নিশ্চই আপনি ভবতোষবাবুর কাছ থেকে মোটামুটি জানতে পেরেছেন। সমস্ত কথা আবার স্থরুর থেকে গুছিয়ে বলবার মতো শক্তিও আমার নেই। কেবল যেটুকু জানেন না সেটুকু শুনতে পারেন।” প্রতাপচন্দ্র একটু থামলেন, তারপর আবার বলতে স্থরু করলেন, “আপনাদের হয়ত খেয়াল নেই, কিন্তু আজ হল অমাবস্থা; এবং আজকের এই সূর্য্যাস্ত আমার জীবনে শেষ সূর্য্যাস্ত। আমায় আজ চলে যেতে হবে,” প্রতাপ-চন্দ্রের গলা আবার আগেকার মতো দুর্বল হয়ে এলো। আবার তিনি আগেকার কথাগুলোই করুণভাবে বলে যেতে লাগলেন, “এই সহর এই সমুদ্র, এই সূর্য্যাস্ত—এদের যে আমি কি ভালবাসি তা কেমন করে বলব ? অথচ যেতে হবে চলে, যেতে হবে—আমার বংশের অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবার দিন এসেছে আজ।”

প্রতাপচন্দ্রর চোখে কি রকম ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠলো। —মৃত্যুর মুখোমুখি অসহায় মানুষের চোখে যেরকম ফাঁকা দৃষ্টি ফুটে উঠে। আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে তিনি বাইরের দিকে মুখ ফেরালেন। সূর্য্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে, তবুও লালচে আভা ছড়ানো দিগন্ত পর্য্যন্ত।

“সূর্য্যদেব, আমায় ক্ষমা কোরো; আমায় ক্ষমা কোরো। তোমার প্রিয়তম পূজারীর........” প্রতাপচন্দ্রের পাতলা ঠোঁট দুটো কাঁপতে লাগলো, গলা ভারি হয়ে এলো।

কুন্থ আর ভবতোষবাবু বিমূঢ়ের মতো শুনছিলেন প্রতাপচন্দ্রের শেষ প্রার্থনা। উভয়েরই মন একেবারে যেন নেতিয়ে পড়ছিলো। অসম্ভব করুণ; অসম্ভব অসহায়। অথচ কিছুই যেন করবার নেই। এ লোককে সান্ত্বনা দেবার কি কোনো মানে হয় ? আর কি বলেই বা সান্ত্বনা দেওয়া যাবে ? তাই দুজনে স্তব্ধ; পাথরের মূর্তির মতো স্তব্ধ।

কুন্থর হুঁস হল। হঠাৎ হুঁস হল যে ঘরে অশোক নেই, “অশোক গেল কোথায় ?”

“তাইত। অশোক গেল কোথায় ?” ভবতোষবাবুও প্রায় চমকে উঠলেন।

কিন্তু কারুর পক্ষেই জোরে কথা বলা সম্ভব নয় জীবনের যেন শেষ সান্ত্বনা উপভোগ করছেন প্রতাপচন্দ্র—প্রার্থণার সান্ত্বনা। একটানা চাপা গম্ভীর প্রার্থনায় বিঘ্ন আনা অসম্ভব।

অথচ, অশোক গেল কোথায় ? অশোক কি এই প্রেত-পুরীতে এসে উবে গেল না কি ? ভবতোষবাবুর মধ্যেটা কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠলো। একেবারে প্রেতপুরীতে দাঁড়িয়ে প্রেত সম্বন্ধে অমন নাস্তিকতা ঘোষণা করাটা একটু বাড়াবাড়ি নয় কি ?

[আগামীবারে সমাপ্য]

কবিতা

সোনালী রঙ

দিলীপ দে চৌধুরী

আজ সকালের রৌদ্র-রাঙা
আকাশখানা সত্যি ভাই,
ছড়ায় আলো দুয়ার-ভাঙা
ওর মাঝে আজ হারিয়ে যাই !
দেখতে পাই—
নিজের কোন সত্তা নাই।

চোখ খুলে চায় ফুলকুঁড়ি,
মৌ-বনে আজ মৌমাছিদের খুনস্থড়ি ;
মন থেকে এই মন-চুরি !

খুসির হাওয়ায় সবখানে—
কোন স্থরভি বয় প্রাণে ?
কে জানে ভাই, কে জানে !

মাঠের বুকের শ্যামল ঘাস
শীতের ভোরের এই বাতাস,
রৌদ্র-রাঙা নীল আকাশ
বাজায় বসে কোন সানাই ?
কী দিয়ে আজ মন মানাই ?
হারিয়ে গেছে মন খানাই
কোন দেশে, কোন তেপান্তরে
কার যাদুতে কী মন্তরে !
ঝলমলে এই রৌদ্র ঝরে
আজ সকালে !

কে ঢালে এই সোনালী রঙ কে ঢালে
পাতায় পাতায় সব ডালে !

বিশ্বাস কর

বালি’র কাগজ বালি থেকে তৈরি হয় না। বালি নামে জায়গায় তৈরি হোতো বলে বালির কাগজ বলা হয়।

লেড পেন্সিলে ‘লেড’ অর্থাৎ সিসে নেই। গ্রাফাইট নামে একটি জিনিস দিয়ে তৈরি।

গিনিপিগ ‘পিগ’ অর্থাৎ শূয়র নয়, ‘গিনি’ (Guinea) নামে জায়গা থেকেও আসেনি। দক্ষিণ আমেরিকার তীরে এদের বাস। এরা যে কী তোমরা তো সে-কথা জানোই।

‘জার্মন সিলভার’-এর মধ্যে সিলভার অর্থাৎ রূপো নেই। পেতল, নিকেল এবং দস্তা মিশিয়ে এটা তৈরি হয়।

‘ড্রেসডেন চায়না’ ড্রেসডেন থেকে আসে না। মিসেন (Meissen)-এ তৈরি হয়।

'রাইস পেপার' রাইস অর্থাৎ ভাত থেকে তৈরি হয় না, পিচ্ কিংবা কাঠ থেকে তৈরি।

'কিড গ্লাভ্স্' 'কিড' অর্থাৎ ছাগলছানা'র চামড়া দিয়ে তৈরি হয় না, ভেড়ার ছানার চামড়া দিয়ে তৈরি।

'টেব্ল্ সল্ট'-এর মধ্যে 'সল্ট' অর্থাৎ নুন নেই। ক্লোরাইড অফ সোডিয়াম দিয়ে তৈরি।

'সোডা ওয়াটার'র মধ্যে সোডা নেই। জলের মধ্যে কার্বনিক এ্যাসিডের গ্যাস দিয়ে তৈরি হয়!

'কাট্ল্ ফিস্' মাছ নয়, অক্টোপাস।

'পানামা হ্যাট' পানামায় তৈরি হয় না, একুয়েডর (Ecuador)-এ তৈরি।

'ফ্লাইং ফক্স' কোনো জাতের শেয়াল নয়, আসলে তারা মস্ত বড় জাতের বাদুড়।

'শ্যাময় লেদার' শ্যাময়-এর চামড়া দিয়ে তৈরি নয়, ভেড়ার চামড়া দিয়ে তৈরি।

'ক্যামেল'স্ হেয়ার ব্রাস'-এ উটের লোম নেই, কাঠ বিল্লির লোম দিয়ে তৈরি।

গত ৬ই ফেব্রুয়ারি সকালে ৭০ বছর বয়সে বিশ্ববিখ্যাত উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারির মৃত্যু হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁর নাম পৃথিবীর ইতিহাসে চিরকাল উজ্জ্বল হয়ে থাকবে। তাঁর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার কালাজ্বরের ওষুধ—ইউরিয়া স্টিবামাইন। ওই ওষুধ আবিষ্কৃত হবার আগে কালাজ্বরের কোনো চিকিৎসাই বলতে গেলে ছিলো না। তখনকার দিনে কালাজ্বর হওয়া মানেই ছিলো নিশ্চিত মৃত্যু। ওই ভয়ঙ্কর অসুখে ইতিপূর্বে লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। তোমরা হয়তো অনেকেই জানো না যে 'আবোল-তাবোল'-এর রচয়িতা সুকুমার রায়েরও অকাল-মৃত্যু হয়েছিলো ওই কালাজ্বরের হাতে। উপেন্দ্রনাথ এই মারাত্মক কালাজ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই করে পৃথিবীর মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন জয়ী। কালাজ্বরের বিভীষিকা পৃথিবী থেকে চিরকালের জন্যে যে দূর হয়েছে তার মূলে রয়েছেন উপেন্দ্রনাথ। ইতিহাসে যত বড়-বড় লড়াই-জেতার কাহিনী পাওয়া যায় তার তুলনায় উপেন্দ্রনাথের এই জিত কোনো অংশে ছোটো তো নয়ই—এমন কি এক দিক দিয়ে দেখলে অনেক বড়। আসল যুদ্ধে যে-পক্ষই জিতুক না দেখা যায় উভয়পক্ষেই অসংখ্য হতাহত হয়েছে। সে-কথা গভীর ভাবে ভাবলে লড়াই জেতার পরেও লড়াই-জেতার আনন্দ থাকে না। কিন্তু উপেন্দ্রনাথ জয় করেছিলেন কালাজ্বরকে, অর্থাৎ মৃত্যুকে—এবং এই লড়াই-জেতার ফলে পৃথিবীর অসংখ্য নরনারী আজ নতুন করে জীবন ফিরে পেয়েছে। তাই এই জয় অনেক বেশি গৌরবের, অনেক বেশি উঁচু দরের। উপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে তাই সমস্ত পৃথিবীই আজ শোকাচ্ছন্ন। কিন্তু ভালো করে ভেবে দেখলে দেখবে মণীষীদের মৃত্যু নেই। যতদিন পৃথিবীতে সভ্যতা টিঁকে থাকবে ততদিন কোটি-কোটি নরনারী শ্রদ্ধার সঙ্গে উপেন্দ্রনাথের কথা স্মরণ করবে।

* * * *

কালাজ্বরের মতো ম্যালেরিয়াও একটি ভয়ানক অসুখ। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা শিশুকাল থেকেই ম্যালেরিয়ার

কথা শুনছে, ম্যালেরিয়া রোগীকেও দেখছে, নিজেরাও যে ভুগছে না, তা নয়। ম্যালেরিয়া হলে আমরা দেখি লেপ-কাঁথা মুড়ি দিয়ে রোগী খানিক হু-হু করে কাঁপে, তারপর আবার জ্বর যায় ছেড়ে। এই সব দেখেশুনে ম্যালেরিয়া সম্বন্ধে অনেকের মনেই খুব একটা আতঙ্ক নেই। কিন্তু হিসেব করে দেখলে আর তলিয়ে ভাবলে দেখা যাবে ম্যালেরিয়া কতখানি ভয়ানক অসুখ। সবল সুস্থ লোকের সমস্ত জীবনীশক্তি সে শুষে নেয়, মানুষকে একবারে অমানুষ করে ফেলে, তারপর ধীরে-ধীরে তাকে টেনে আনে মৃত্যুর কাছে। গত কয়েক বছরে বাংলা দেশে যত লোক ম্যালেরিয়াতে মরেছে দারুণ মহামারীতেও কোনো দেশে অত লোকের মৃত্যু সচরাচর দেখা যায় না। এই ম্যালেরিয়ার একমাত্র ওষুধ জানা ছিলো কুইনাইন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ম্যালেরিয়া নিয়ে নানা গবেষণা চলে। তার ফলে 'পলুড্রিন' নাকে একটি ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ওষুধ নাকি কুইনানের চেয়ে দশগুণ বেশি শক্তিশালী। পলুড্রিন আবিষ্কারের কথা আগেই রংমশালে ছাপা হয়েছে। কী উপায়ে পলুড্রিন তৈরী হয় এটা এতোদিন প্রকাশ করা হয়নি। কিন্তু হালে ঐ ওষুধটির ফরম্যুলা ছাপা হয়েছে। ফলে যে-কোনো দেশের লোকেই পলুড্রিন নিয়ে আজ গবেষণা করতে পারে। আমরা আশাকরি ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকরা পলুড্রিন নিয়ে আরো নানা গবেষণা করবেন এবং, কে জানে, হয়তো পৃথিবীর মধ্যে কোনো ভারতীয়ই প্রথম আবিষ্কার করবেন ম্যালেরিয়াকে সমূলে উচ্ছেদ করার মন্ত্র।

* * * *

কিন্তু পৃথিবীতে এক ধরণের লোক আছে যারা ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। সেদিন খবরের কাগজে দেখলুম ছাপা হয়েছে ৬,৭৫০ টাকার মানুষের হাড় ভারতবর্ষ থেকে চালান হয়েছে মার্কিন রাজ্যে। ভাবতে পারো একবার, মৃত মানুষের হাড় নিয়ে কেনা-বেচার কথা? বাংলা দেশে শেষ দুর্ভিক্ষের সময় তোমরা তো সবাই দেখেছো পথে-ঘাটে ছেলে-মেয়ে-শিশুর মৃতদেহ ছিলো ছড়ানো! তাদের জীবনের যে কোনো মূল্য আছে সেদিন সে-কথা জানা যায়নি। আজ দেখা যাচ্ছে জীবনের কোনো মূল্য নেই বটে, কিন্তু মৃত্যুর পর মানুষের হাড়ের তবু একটা দাম হয়। কিন্তু আবার একটি বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের আভাস এখন থেকেই বাতাসে ভেসে আসছে। এবার কিন্তু শুধু ভারতবর্ষেই এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে না—য়ুরোপের অনেকটা জুড়ে, এসিয়া এবং আফ্রিকার উপরেও এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে বলে অনেকে অনুমান করেন। অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, মার্কিন দেশ এবং সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছ থেকে এই সব দেশ সাহায্য পাবে কিনা তাই নিয়ে এখন থেকে জোর আলোচনা চলেছে। কে জানে, মানুষের হাড়-বিক্রির খবর ছাপা হবার পর, এখন থেকেই হয়তো অনেক চতুর ব্যবসাদার চাল-ডাল-আটা নানা চোরা কুঠুরিতে ভরে রাখছে! তাতে দু-দিক দিয়ে ব্যবসা জমবে ভালো। প্রথমত চাল-ডাল-আটা দুর্ভিক্ষের সময় খুব চড়া দামে যাবে বেচা—আর ঐ চড়া দাম দিয়ে ক'জনেই বা পারবে কিনতে? যারা কিনতে না পেরে মরবে তাদের হাড়গুলা নিয়ে তখন আর একপ্রস্থ ব্যবসা নিশ্চয়ই করা চলবে!

* * * *

মানুষের জীবনের দাম যে সত্যিই কমে গেছে সে-কথা আবার স্পষ্ট করে জানা গেলো। মাত্র চার মাস আগেই কলকাতায় ছাত্রদের উপর গোলাগুলি চালানোর ফলে বহু হতাহত হয়েছিলো। গত ১২ই ফেব্রুয়ারি থেকে কলকাতায় আবার গোলাগুলি সুরু হয়। এবারকার হতাহতের সংখ্যা অনেক বেশি। এবারকারও গোলমালের সূত্রপাত হয় আই. এন্. এ. ফৌজের ক্যাপ্টেন আবদুল রসিদের সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ প্রকাশ হবার পর। এই বিচারের প্রতিবাদ হিসেবে ছাত্রদের একটি শোভাযাত্রা বেরোয় এবং এবারেও তারা ডালহৌসি স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে যেতে চায়। পুলিশ তাতে বাধা

দেয় এবং লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। পুলিশের এই জুলুমের প্রতিবাদে দেখতে-দেখতে সমস্ত কলকাতা গরম হয়ে উঠলো। ট্রাম-বাস বন্ধ হয়ে গেলো, রিক্স-ট্যাক্সি যাত্রী নিলো না, এখানে-ওখানে মিলিটরি লরি পুড়তে লাগলো। তারপর ক্রমাগত চার দিন ধরে সমস্ত কলকাতার উপর যেন ঝড় বইতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত এই গোলযোগ বন্ধ করার জন্যে সরকারি ফৌজ এলো বেরিয়ে—ক্রমাগত গোলাগুলি চলতে স্থরু হোলো। এবারে নিহতের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ, আহত হয়েছে পাঁচ শ'র উপর।

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

শীত গেলো, এলো ফাল্গুন। চারিধারের শীর্ণ গাছগুলিতে নতুন পাতা ঝিরঝির করছে। যারা গ্রামে থাকো ইতি-মধ্যেই আমের মঞ্জরীর গন্ধে রোমাঞ্চিত হচ্ছো। আমরা যারা সহরে থাকি তারাও মাঝেমাঝে আমের মঞ্জরীর গন্ধ পাই, পলাশের রঙীন আভাও হঠাৎ-হঠাৎ এখানে-ওখানে চোখে পড়ে। আর কেমন যেন মন খারাপ হয়ে যায়। বুঝি প্রত্যেকেরই মনের মধ্যে যে একটি মানুষ আছে তার আসল দেশ সহরে নয়, গ্রামে। যেখানে অবাধ খোলা আকাশ, বাতাসে পলাশের রঙ, আম-মঞ্জরীর গন্ধ। যেখানকার চাষী, তাঁতি, কুমোর, মাঝি হচ্ছে আসল মানুষ—বাংলা-দেশের আসল মানুষ—যারা কেবল হিন্দু নয় কিংবা মুসলমান নয়—যারা আসল বাঙালী—যাদের নাড়ির সম্বন্ধ রয়েছে মাটির সঙ্গে, জলের সঙ্গে। নানা কারণে আমরা আজ ছিটকে এসেছি সহরে, এখানকার ছোটো গলির খুপরি-খুপরি ঘরে থাকি। সহরের প্রতিদিনকার নানা অপমৃত্যু আমাদের জীর্ণ করছে, ভুলিয়ে দিচ্ছে আমাদের আসল দেশের কথা। কিন্তু আজ যখন শীত গেলো, দক্ষিণের নতুন বাতাস বইতে স্থরু করলো—তখন কেমন যেন গ্রামের জন্যে মন-কেমন করতে স্থরু করেছে। গ্রামের কথা আজ আবার নতুন করে ভাবছি। তাই বোধ হয় ফাল্গুনকে আজ এতো ভালো লাগছে।

তোমাদের চিঠিগুলির এবার উত্তর দিতে স্থরু করি।

স্থব্রত ঘোষাল (২১৩৭)—তুমি যাঁদের লেখা ছাপবার কথা বলেছো তাঁদের লেখা দেবার চেষ্টা করছি। **প্রশান্ত বস্থ** (১৭৮১)—নিশ্চয়ই তুমি ডাক-টিকিটের পয়সা দাবী করতে পারো। ডাক-টিকিট পাঠালুম। **কাশীনাথ পালিত** (২৫৪০)—তোমার চিঠিতে সাধু এবং চলতি ভাষা মেশানো রয়েছে। একই রচনায় যে-কোনো এক ধরণের ভাষা ব্যবহার না করা দোষের। চলতি ভাষায় লিখো। **প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** (২৫৯৭) —তুমি যে-বইটির কথা লিখেছো সেটি বাজারে বেরুতে আরো মাস দুয়েক দেরী আছে। বেরুলেই রংমশালের পৃষ্ঠায় জানতে পারবে। তখন লিখো। **দুর্গাদাস ভট্ট** (২৫৫৭)—'বুধবারের' মধ্যে বইটি পৌঁছনো সম্ভব ছিলো না, তাই পাঠাইনি। ভি. পি-তে পাঠানোর কোনো বাধা নেই। কোন ঠিকানায় পাঠাবো জানিও। তোমার রচনা-গুলি ছাপা সম্ভব হোলো না। **রণজিৎ ঘোষ** (?) —গ্রাহক নম্বর দাওনি কেন? শুধু গ্রাহক-গ্রাহিকাদের লেখা দিয়ে রংমশালের কোনো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা বর্তমানে সম্ভব নয়। মাণিকবাবুর উপন্যাস সম্বন্ধে আগেই জবাব দেওয়া হয়েছে। **বুলবুল বন্দ্যোপাধ্যায়** (২৩৯৬)—তোমার চিঠি পেয়ে লজ্জিত। আশাকরি পত্রিকা পেয়েছো। **শকুন্তলা গুপ্ত**(২৫৫২)—আশাকরি ইতিমধ্যে পত্রিকা

আবার পৌঁছেছে। **শচীন ভৌমিক** (২৪৩৮)—ছাত্রদের বর্তমানে কর্তব্য কী বলা বড় কঠিন। আমার তো মনে হয় ছাত্রদের কর্তব্য খুব ভালো করে লেখাপড়া শেখা। দেশের কাজ করবো বললেই সব হয় না। কাজ করার উপযুক্ত আগে হতে হয়। তার জন্যে প্রথম দরকার নিয়মানুবর্তিতা, পারিপার্শিক পৃথিবীর জ্ঞান, দেশের প্রকৃত অবস্থা জানা, কী উপায়ে দেশকে, মানুষকে আবার উন্নত করা যায় সে বিষয়ে ভাবা। তুমি যদি ভালো করে লেখা-পড়া করে ভালো ডাক্তার হও, কিংবা ভালো ইঞ্জিনিয়ার হও, কিংবা ভালো শিক্ষক হও তা হলে দেশের যে-রকম উপকার করা তোমার পক্ষে সম্ভব অন্য কোনো উপায় তা নয়। তবে লেখাপড়া করার সময়েও প্রতিদিন কী ঘটছে তার খবর ভালো করে রাখা দরকার। **মণিমালা দেবী** (৫৭৭)—তোমার ভাই-এর কবিতাটি ছাপবার উপযুক্ত হয়নি। **শ্রীমতি বি. পি. দাস** (২৫৬০)—তোমার অনেকগুলি নাম আছে এবং কোনটি ছেড়ে কোনটি বলবে তা এখনো ঠিক করতে পারোনি বলে সংক্ষেপে উক্ত নাম ব্যবহার কর বলে জানিয়েছো। কিন্তু নাম তো একদিন ঠিক করতেই হবে, তাই এখনই ঠিক করে ফেলো। উপরের নাম লেখার চেয়ে বীণাপাণি, বিষ্ণুপ্রিয়া কি বিজয়া নাম ঢের ভালো। স্থকুমার রায়ের কোনো রচনা পড়নি শুনে ভারি অবাক লাগছে। যতদূর সম্ভব শীঘ্র তাঁর বই জোগাড় করে পোড়ো। নইলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হতেই পারে না। রংমশালে অক্ষরক্রীড়া এবং গ্রাহক-গ্রাহিকাদের পাঠানো ধাঁধা ছাপা হয় না। কবিতাটি ছাপা গেলো না। **বীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়** (২৩১৩) —ইংরিজিতে অঙ্ক করতে শেখানো হয় বলে ইংরিজিতে ধাঁধার উত্তর অঙ্ক কষে তুমি পাঠিয়েছো। কিন্তু একটু চেষ্টা করলে অনায়াসেই ওই অঙ্কটি বাংলায় তুমি লিখতে পারতে। 'ক' 'খ' 'গ' ইত্যাদি অক্ষর বসিয়ে এবার থেকে চেষ্টা কোরো। ইংরিজি ভাষা যতদূর সম্ভব আমাদের ছাড়তে হবে। সাধুভাষা ছেড়ে চলতি ভাষায় লেখা অভ্যেস কর। সাধুভাষার দিন গিয়েছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত চলতি ভাষাকেই সাহিত্যের ভাষা করে জাতে তুলে দিয়েছেন। লেখার মধ্যে দিয়ে যতটুকু সম্ভব কাছে আশা যায় রংমশালের অন্যান্য গ্রাহক-গ্রাহিকাদের সঙ্গে ততটুকু কাছে আসাই সম্ভব। **পীযুষকান্তি ঘোষ** (২১৬০)—টুকরো টুকরো কাগজে কেন চিঠি লেখো? ভারি অস্থবিধে হয়। কবিতাগুলি অত্যন্ত কাঁচা, 'র' এবং 'ড়'র ক্রমাগত গোলমাল হয়েছে। ধাঁধা সম্বন্ধে আগেই লিখেছি। **অসীমদেব গোস্বামী** (১৮৬২)—সাধু-ভাষা ছেড়ে চলতি ভাষা তুমিও ধর। কোনো হাল্কা ফুর্তির ব্যাপার নিয়ে গল্প লিখতে চেষ্টা কোরো। ঈশ্বর, স্বর্গ, মৃত্যুদূত—এই সব বড়-বড় ব্যাপার তোমাদের পক্ষে লেখা এখন ঠিক নয়—যখন বড় হবে, অনেক ভাবতে শিখবে, অনেক লেখাপড়া করবে, অনেক অভিজ্ঞতা জমা হবে—তখন চেষ্টা কোরো। **পশুপতি দাসগুপ্ত** (২৪৩১)—ইংরিজি ভাষার ব্যবহার কমানো এক কথা আর বাংলাভাষায় কতকগুলি চালু ইংরিজি কথার ব্যবহার অন্য কথা। নিয়ম করে কখনো ঠিক করা যায় না ওমুক-ওমুক কথা বাংলা-ভাষায় কিংবা কোনো ভাষায় চালাবো। ভাষার মজা ওইখানে। সে তার নিজের ইচ্ছেমতো বিদেশী শব্দ বেছে নিয়ে বেমালুম হজম করে ফেলে—তোমার আমার কিংবা পণ্ডিতদের কোনো আদেশকেই সে মানে না। ইংরিজি ভাষার মধ্যে অনায়াসে বহু ফরাসি, জার্মান, ইতালিয়, স্পানিস এমন কি হিন্দি কথাও ঢুকে গেছে। আবার ইংরিজি ভাষার নানা কথা ঢুকে গেছে অন্যান্য সব ভাষায়। বাংলাতেও অনেক ইংরিজি শব্দ চলতি হয়ে গেছে। সেটা দোষের নয়। দোষের হচ্ছে অনাবশ্যক ইংরিজি কথা ব্যবহার করা। যে-ইংরিজি কথার চালু ও স্থন্দর বাংলা প্রতিশব্দ আছে সেখানে কখনোই আমরা ইংরিজি কথা ব্যবহার করবো না। কিন্তু জোর করে 'চেয়ার'-কে যদি 'কাষ্ঠাসন', 'স্থইচ'-কে যদি 'আলো-জ্বালাবার কল' বলতে স্থরু করি তা হলে ফল

হবে হাস্যকর। তুমি স্থন্দর চিঠি লিখেছো, পড়ে ভারি খুসি হয়েছি—যদিও ন' পাতা লম্বা চিঠি! Good Luck লেখা খামটি কোথা থেকে জোগাড় করলে? আশাকরি নিজে পছন্দ করে ওই ধরণের খাম তুমি কেনো নি! ইতি

তোমাদের
সম্পাদকমশাই

এ-বছরের অলিম্পিক

স্থনীলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

এ-বছরে 'দ্বাদশ ভারতীয় অলিম্পিক' খেলাধূলো হোলা ব্যাঙ্গালোরে। ভারতবর্ষে অলিম্পিক খেলা এক বছর ছাড়া-ছাড়া হয়। প্রত্যেক দেশেরই নিজস্ব অলিম্পিক অনুষ্ঠানের বাবস্থা আছে। এই ধরনের অলিম্পিকে যারা কৃতিত্বের পরিচয় দেয় তাদের মধ্যে বাছাই করে খেলোয়াড়-দের পাঠানো হয় 'ওআর্লড্ অলিম্পিকে'। ওআর্লড্ অলিম্পিক চার বছরে একবার করে অনুষ্ঠিত হয়। এক-একবার এক-এক দেশ এই ওআর্লড্ অলিম্পিকের ব্যবস্থা করে। গত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে শেষ ওআর্লড অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় বার্লিনে। তারপর থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহের হাঙ্গামায় এতোদিন এই ওআর্লড্ অলিম্পিক বন্ধ ছিলো। আবার তার তোড়জোড় স্থরু হয়েছে। শোনা যাচ্ছে এবারকার ওআর্লড্ অলিম্পিক হবে লণ্ডনে।

গত ৩রা ফেব্রুয়ারি সকালে আমরা বাংলাদেশের এক দল খেলোয়াড় ব্যাঙ্গালোরে পৌঁছলুম। বাংলা দেশের আর একটি দল পৌঁছলো তার পরের দিন সকালে। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন স্থন্দর জায়গা ব্যাঙ্গালোর। ভারতবর্ষের ১৭টি প্রদেশ থেকে বাছাইকরা ৭০০ খেলোয়ড় এখানে এসে জমা হয়েছে। সারি-সারি ছোটো-ছোটো তাঁবু পড়েছে। যেন শাদা একটি গ্রাম উঠেছে গড়ে। এই গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছে 'জয়চমরাজেন্দ্র অলিম্পিক গ্রাম।' অতিথিদের জন্যে সবরকম ভালো ব্যবস্থা করতে কর্তৃপক্ষ কোনো রকম ত্রুটি করেননি।

মাত্র তিন মাসের মধ্যে সাম্পাঙ্গি নামে পুকুরটাকে অলিম্পিক স্টেডিয়মে পরিণত করা হয়। এতো অল্প সময়ের মধ্যে পাকা স্টেডিয়ম বানানো সম্ভব হয়নি। তাই বর্তমানে কাঁচা মাটি দিয়েই তৈরী করা হয়েছে। এখানে প্রায় পঁচিশ হাজার দর্শক বসতে পারে।

গত ৫ই ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ন'টায় অলিম্পিক গ্রামের উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হোলো। উদ্বোধন করলেন মহীশূরের দেওয়ান প্রধান শিরোমণি এস্. মাধব রাও। সেদিন আর কিছু হোলো না। অলিম্পিক নগরের মধ্যে

একটি স্থন্দর এগজিবিশন হয়েছিলো। সেই এগজিবিশন ও আরো নানা জিনিস দেখে সমস্ত দিন কাটলো। ঐ এগজিবিশনে একটি ভারি স্থন্দর জিনিস দেখলুম: মহীশূরের স্বর্ণখনিতে কী ভাবে নানা কাজ হয় তার সমস্ত ঘটনা উঁচু বেদিতে ছোটো-ছোটো ঘর-বাড়ি-কপিকল মানুষ তৈরি করে দেখানো হয়েছিলো। বিদ্যুতে সমস্ত কিছুই নড়ছে-চড়ছে—মানুষ হাঁটছে, কপিকল ওঠানামা করছে, ছোটো-ছোটো ট্রলি ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখতে-দেখতে হঠাৎ মানে হোলো বুঝি লিলিপুটের দেশে এসে পৌঁছেছি!

৬ই ফেব্রুয়ারি দুপুর সাড়ে বারটায় অলিম্পিক মাঠকে প্রদক্ষিণ বরলো প্রায় সমস্ত খেলোয়াড়রাই। ইংরিজিতে তাকে বলে: march past। প্রত্যেক প্রদেশ নিজস্ব য়ুনিফর্ম পরে নিজস্ব প্রদেশের পতাকা নিয়ে সার-বন্দী হয়ে ঘুরে এলো। গতবার (১৯৪৪) সালে পাতিয়ালা এথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছিলো বলে প্রদক্ষিণের সময় পাতিয়ালা দলই চললো আগে, পিছন-পিছন বর্ণানুক্রমিক ভাবে অন্যান্য প্রদেশ অনুসরণ করলো। আমরা বাংলা-দেশের দল প্রদক্ষিণের সময় ছিলুম তৃতীয় স্থানে।

এইখানে আমার একটু বক্তব্য আছে। ১৯৪০ সালের আগে পর্যন্ত অলিম্পিক খেলায় গ্রাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ বলে একটি ব্যাপার ছিলো। অলিম্পিক অনুষ্ঠানে সমস্ত খেলাধূলো মিশিয়ে মোট ৪৫টি বিষয় আছে। গ্র্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপ দেওয়া হোতো ঐ ৪৫টি বিষয়ের মধ্যে যে-প্রদেশ সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পাবে তাকে। কিন্তু ১৯৪০ সালের পর থেকে ঐ গ্রাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা তুলে দিয়ে এখন শুধু এথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপকেই আসল চ্যাম্পিয়নশিপ ধরা হয়। এবং অন্যান্য বিষয়গুলিকে—যেমন সাইকেল রেস, কুস্তি, ভারত্তোলন, বাস্কেট-বল, ভলিবল, কবাডি ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিকে স্বতন্ত্র চাম্পিয়নশিপ দেওয়া হয়। আমার নিজের মতে খেলাধূলোর জগতে অন্যান্য সমস্ত বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করে কেবল মাত্র এথলেটিককে প্রাধান্য দেবার কোনো মানে হয় না। কারণ ভালো এথলিটের চেয়ে ভালো খেলোয়াড় কোনো মতেই ছোটো নয়—এবং সব মিলিয়ে যে প্রদেশ যে-রকম পয়েন্ট পাবে সেইটেই আসল হারজিতের মাপকাঠি হওয়া উচিত। অর্থাৎ ১৯৪০-এর আগে পর্যন্ত যে-রকম গ্র্যাণ্ড চ্যাম্পিয়নশিপের ব্যবস্থা ছিলো সবদিক দিয়ে বিবেচনা করলে সেটিই ছিলো আসল ভালো ব্যবস্থা। এই মার্চ পাস্ট-এ শুধু এথলিটরাই (অর্থাৎ যারা দৌড়, লাফানো, ছোঁড়া ইত্যাদি) যখন অংশ গ্রহণ করেন না খেলোয়াড়রাও (অর্থাৎ বাস্কেট-বল টিম ভলি-বল টিম ইত্যাদি) যখন অংশ গ্রহণ করেন এবং মার্চ পাস্ট-এর সময় প্রথমে যাওয়া যখন বিশেষ একটি সম্মানেরই নমুনা তখন, শুধু এথলেটিক বিষয়গুলিতে যে-প্রদেশ সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়েছে তাদের প্রথমে যাওয়ার বিশেষ সম্মানলাভের ব্যবস্থা অনুচিত বলে মনে হয়।

অলিম্পিকের স্থরু হোলো ৬ই ফেব্রুয়ারি এবং শেষ হোলো ৮ই ফেব্রুয়ারি। মাত্র তিন দিনের মধ্যে অতগুলি অনুষ্ঠান (মোট ৪৫) শেষ করার জন্যে অনেক খেলোয়াড় এবং এথলিটকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে। ফলে অনেকেই চূড়ান্ত কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেননি। এমন অনেকেই ছিলেন যাঁদের পর-পর তিন দিনেই দৌড়তে হয়েছে এবং প্রতিদিনে অনেককে বিভিন্ন বিষয়ে চারবার করেও দৌড়তে হয়েছে। খেলোয়াড় এবং এথলিটদের জন্যে অনেক বেশি বিশ্রামের প্রয়োজন এবং তা সম্ভব হয় যদি অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে তিন দিনে শেষ না করে অন্তত সাত দিনে শেষ করা হয়।

এবারকার অলিম্পিকে উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির কথা নীচে লিখলুম:

১। লোহার হাতুড়ি ছোঁড়া—পাতিয়ালা'র সোমনাথ ১৫৩ ফিট ৮ইঞ্চি ছুঁড়ে নিজের আগেকার রেকর্ড ১৪৭ ফিট ১০ ইঞ্চি ভঙ্গ করেন। এটি ভারতবর্ষের নতুন রেকর্ড।

২। ৫০ মিটার দৌড় (মেয়েদের)—বোম্বাই-এর

বান্নু গজদার ৬.৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন।

৩। ১১০ মিটার হার্ডল্—বোম্বাই-এর জে ভাইকার্স ১৫.২ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেন।

৪। ৫০০০ মিটার হাঁটা—পাতিয়ালার সাধু সিং ২৬ মিনিট ৩০.৫ সেকেণ্ডে অতিক্রম করে নতুন ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেন।

এথলেটিকে সবচেয়ে বেশি পয়েন্ট পেয়ে (৮৭) পাতিয়ালা এবার চ্যাম্পিয়ন হয়। ফলে স্যর দোরাবজি পুরস্কার লাভ করে। এথলেটিকে দ্বিতীয় হয় বোম্বাই (৪৬ পয়েন্ট), তৃতীয় হয় পাঞ্জাব (৩২ পয়েন্ট), চতুর্থ হয় মহীশূর (১৮ পয়েন্ট) এবং পঞ্চম হয় বাংলাদেশ (১৬ পয়েন্ট)। কিন্তু এই ব্যাপারটি লক্ষ্য কোরো : পাতিয়ালা থেকে যোগদান করেছিলেন ৪০ জন এথলেট, বোম্বাই থেকে ৩৮, পাঞ্জাব থেকে ৪১, মহীশূর থেকে ৪৩ (সবচেয়ে বেশি) এবং বাংলা দেশ থেকে মাত্র ১৬ জন।

মেয়েদের মধ্যে এথলেটিক চ্যাম্পিয়ন হয় মহীশূর (৩৭ পয়েন্ট), দ্বিতীয় হয় বোম্বাই (২৩ পয়েন্ট) এবং তৃতীয় হয় বাংলাদেশ (১৩ পয়েন্ট)। মহীশূর এথলেটিক দলে ছিলেন ১০জন মেয়ে, বোম্বাই দলে ছিলেন ৮ জন এবং বাংলা দলে ছিলেন ৬ জন।

ম্যারাথন রেসটির কথাও উল্লেখযোগ্য। এই দৌড়ের দূরত্ব ২৬ মাইল এবং ৩৮৫ গজ। প্রথম হন পাতিয়ালার ছোটা সিং। বোম্বাই-এর অম্বু নগর নামে এক ৬৭ বছরের বৃদ্ধ ম্যারাথন রেসে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে সবাইকার তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। রেস শেষ হবার পর অন্যান্য সকলে যখন ক্লান্তিতে শুয়ে পড়েছিলেন অম্বু নগর তখন অম্লানমুখে হেঁটে লাফিয়ে ফুর্তি করে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন!

মেয়েদের সাইকেল রেসে বাংলাদেশ থেকে যে-দুটি মেয়ে গিয়াছিলেন তাঁরা দুজনেই বাঙালী—তপতী মিত্র এবং পদ্মা দত্ত। অলিম্পিকে এই বছরেই প্রথম বাঙালী মেয়েরা যোগদান করলেন। সাইকেল রেসে বোম্বাই ১০ পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয়, বাংলাদেশ ৬ পয়েন্ট পেয়ে হয় দ্বিতীয়।

আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে ৪০০ × ৪ মিটার রিলে রেস—প্রত্যেক দলেই চারজন করে ছিলেন। প্রথম-বার দৌড় হবার পর বাংলাদেশ জয়ী হয় কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বোম্বাই, পাতিয়ালা এবং আরো দু-একটি প্রদেশ একটি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপত্তি জানায়। ফলে রেসটি আবার নতুন করে দৌড়নো হয় এবং তাতেও বাংলাদেশ দ্বিতীয় দল থেকে প্রায় ২৫ গজ এগিয়ে থেকে আবার প্রথম হয়।

গত দুবার ভারতীয় অলিম্পিকে বাংলা দেশের এ. কে. দত্ত হাঁটা-তে প্রথম হয়েছিলেন এবং ভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। এ-বছর অলিম্পিকের হাঁটা প্রতিযোগিতায় তিন পাক ঘোরার পর তাঁকে যেন জোর করেই বাতিল করা হোলো। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ : তাঁর হাঁটা ঠিক হয়নি। কিন্তু তাঁর হাঁটা যদি আইনসঙ্গত না হয়ে থাকে তা হলে যিনি প্রথম হলেন তাঁকেও প্রথমেই বাতিল করা উচিত। এ বছরেও এ. কে. দত্ত খুব ভালো হাঁটছিলেন এবং বাংলা-দেশের অলিম্পিকে ভারতীয় রেকর্ড সময়েই নির্দিষ্ট সীমা পার হয়েছিলেন।

বাকী বিষয়গুলির মধ্যে ভরত্তোলন প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশ বোম্বাই-এর সঙ্গে একই পয়েন্ট পেয়ে প্রথম হয় এবং পরে 'টস' করে বাংলাদেশকেই জয়ী সাব্যস্ত করা হয়।

কবাডি'তে বাংলাদেশ ফাইনালে উঠে মাদ্রাজের কাছে হেরে গেলো। বাস্কেট বলেও বাংলাদেশকে মহীশূরের কাছে ফাইনালে হার স্বীকার করতে হোলো। ভলিবলে বাংলাদেশ প্রথমেই দিল্লির কাছে হেরে যায় এবং ফাইনালে পাঞ্জাব যুক্তপ্রদেশকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

এথলোটিকে বাংলা দেশ বরাররই পিছিয়ে থাকে। যদিও বা ভালো এথলিট দেখা যায় তারাও বাঙালী নয়, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বাংলাদেশের ইস্কুলে-ইস্কুলে প্রতি বছরেই

স্পোর্ট্স্ হয় সত্যি কিন্তু কী করে দৌড়তে হয়, কী করে লাফাতে হয় তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিক্ষা দেবার কোনো রকম ব্যবস্থা নেই। খেলাধূলোয় বাংলাদেশ মোটামুটি ভালো। কিন্তু এ-বছর তারা যে ভালো করতে পারেনি তার প্রধান কারণ খুব অল্প ক'দিন তারা প্র্যাকটিস্ করছিলো। ভলি-বল কিংবা বাস্কেট-বল কিংবা যে-কোন খেলাতেই বিশেষ উন্নতি করতে হলে সমস্ত বছর ধরেই অভ্যাস রাখার একান্ত দরকার। বাংলাদেশে কিন্তু তা হয় না। আরো একটি বিষয়েও বাংলা দেশকে লক্ষ্য রাখতে হবে। অলিম্পিকে খেলাধূলোর অনুষ্ঠান প্রতিবারেই সকালে হয়। অথচ বাংলাদেশের খেলোয়াড়রা প্র্যাকটিস করে বিকেলের দিকে। এতে অলিম্পিক খেলতে গিয়ে বিশেষ অসুবিধে ভোগ করতে হয়।*

* লেখক গতবার অলিম্পিকে বাংলাদেশ থেকে ভলি-বল এবং বাস্কেট-বল দলের অধিনায়ক হয়ে গিয়েছিলেন। এবারেও ভলি-বলের অধিনায়ক তিনি ছিলেন এবং বাস্কেট-বল দলেও খেলেছিলেন। রঃ সঃ

ধাঁধা দেওয়া

কল্পনা চট্টোপাধ্যায়

"বুঝলে ভায়া, ধাঁধা দেওয়া সহজ জিনিস নয়!" এই বলে দিনতারণ খুড়ো স্থরু করলেন, "মহারাজ কেষ্টচন্দরের সভায় একদিন এক যাদুকর এসে এই ধাঁধা দেওয়া খেলা স্থরু করছিল। মহারাজ কেষ্টচন্দর তো আর যে সে লোক নয়, স্বয়ং গোপালভাঁড় তাঁর সভায় থাকতেন! আরে গোপালভাঁড়ের নাম শোননি? এমন হাস্যরসিক লোক তখনকার বাংলাদেশ ঢুঁড়লেও পাওয়া যেতো না। তবে আমাদের যুগে একজনের সঙ্গে তাঁর তুলনা দেওয়া যেতে পারে। সে হল আমাদের কালীসিংহ। এই যে মহা-ভারত লিখে ভদ্রলোক পেল্লায় নাম কিনেছেন! একদিন ক্লাসে পড়া হচ্ছে উনি অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে শিক্ষক-মশায়ের কথা শুনছেন, হঠাৎ ধাঁই করে পাশের এক ছাত্রের মাথায় মারলেন এক চড়। শিক্ষকমশায় জিগগেস করলেন, 'কেন মারলে?' কালীসিংহ জবাব দিলেন, 'আমি জাতিতে সিংহ, নিজের স্বভাব ত্যাগ করতে না পেরে মেরেছি।' এই না শুনে ক্লাসে এক হাসির হররা উঠলো। পাশের রাস্তা দিয়ে ন্যায়রত্ন বিদ্যাচঞ্চুমশাই যাচ্ছিলেন। সেই হাসির রব শুনে পাড়ায় বাঘ পড়েছে ভেবে দিলেন চোঁ-চোঁ দৌড়। দৌড়তে-দৌড়তে এসে পড়বি তো পড় এক্কেবারে রামধন মুটের গায়ের ওপর। রামধন তো মহা খাপ্পা হয়ে তখ্খুনি থানায় গিয়ে বিদ্যাচঞ্চুর নামে মানহানির কেস আনলো। ম্যাজিস্ট্রেট হ্যারিসন সাহেবের এজলাসে সেই মামলা উঠলো। হ্যারিসন সাহেবকে চেনে না কে? অমন দুর্দ্দান্ত হাকিম আর দেখতে পাওয়া যায় না। জমিদার শরৎ চাটুজ্জের নাম শুনেছ? ভদ্রলোককে মান-হানির কেসে ফেলে সেবারে এমন নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল যে সারা জেলার লোক সেই থেকে তার নাম শুনলে থরিহর কাঁপতো! মানহানির কেস কারে বলে জানো? মনে কর তোমার গরু আমার বাগানে ঘাস খেয়েছে বেড়া ভেঙে ঢুকে। আমি মনের দুঃখে রেগে গাল দিতে স্থরু করলাম, তখনি তুমি আমার নামে মান-হানির কেস জুড়ে দিলে। এ' সব মামলায় উকিল লাগাতে

হয় ভালো-ভালো। উকিলগুলো কিন্তু ভারি মজার। শামলা গায়ে চড়িয়ে নাকে চশমা লাগিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় তখন একটা দেখবার মত দৃশ্য হয় বটে ; বামুন-শকুন দেখেছ? ঠিক ওর সঙ্গে মিশ্ খেয়ে যায়।……”

এত দূর বলে দিন্‌তারণ খুড়ো দম নেবার জন্য থামলেন। আমরা তো দস্তুর মতো শঙ্কিত হয়ে উঠলাম! খুড়ো ধাঁধা দেওয়ার কৌশল বলতে গিয়ে এ’ সব কী সুরু ক’রেছেন? রথিন জিগগেস্ করলো, “কী কর্ত্তা, এ’ সব কী কইছেন? ধাঁধা দেওয়ার কৌশল শেখাইবেন কই, আবোল তাবোল বক্‌তে সুরু করছেন। আসল কথা কন্! আপনার লগে বাজে কথা শুনতে আহি নাই।”

দিন্‌তারন খুড়ো রহস্যময় ভাবে মাথা নেড়ে বল্লেন, “আরে বাপু বাঙালের পোলা, ধাঁধা দেওয়া কী আর যা’তা’ জিনিস, তারপাশার বড় ডাকতাররে জানিস? বাঁকু বাজিকরের ধাঁধায় পড়ে একবার একটা রোগীর বাড়ি যেতে যেতে সোজা আমার কুল ধরে একেবারে ভাগ্যকুলে এসে হাজির ; ভাগ্যকুলে আগে যেথায় স্টিমার স্টেশল ছিল, পদ্মার ভাঙন লেগে আছে সেখান থেকে তিন মাইল দূরে স্টেশন উঠে গেছে। সেদিন কলকাতা থেকে ঢাকা মেলে উঠে তো আমি ভাগ্যকুলে গিয়েই তোদের শ্রীনগরে এলাম।……এই যে শ্রীনগর হাটে এসে গেছি,” বলে খুড়ো মেছো-হাটায় ঢুকে গেলেন। আমি পরিতোষকে বল্লাম, “না হে! খুড়ো সত্যি ধাঁধা দিতেই জানেন! দেখছো না আসল কথাটাই ধাঁধা দিয়ে চেপে গিয়ে খুড়ো সরে পড়লেন!” পরিতোষ রবিন এরা সবাই আমার কথায় সায় দিয়ে বল্লে, “যা বলছিস্!”

ঘুমের আগে

স্বকৃতি বাকচী (২৫৯০)

ছোট্ট পরী ঘুমের পরী
আসো তুমি রাত্রিতে
চন্দ্র হ’তে মর্ত্তে আসা,
এরই তুমি যাত্রী যে।
হাওয়ার মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে
পাখনা এলাও জোছনাতে
কোন সুরভি হাওয়ায় বিলাও
ঘুমকাঠিটি বিছনাতে।
রোজই এসে দাঁড়াও হেসে
আমার মাথার কাছে
চোখ আঁধিয়ে যাওগো নিয়ে
হয়তো তোমার পাছে।
চাঁদের আলোয় জানলাধারে
রোজই তোমার তরে
চেয়ে চেয়ে ঘুমিয়ে পড়ি
এলিয়ে হাতের ভরে।
অনেক রাতে আসেন মা
শোয়ান তাঁহার পাশে,
চুপটি করে চেয়ে থাকি
ঘুম পরীরই আশে।

পাড়িয়াছে টিকটিকি

যশোবন ভট্টাচার্য (১২০৯)

“ডিম চাই ডিম চাই”—ফিরিওলা হাঁকে জোর
চট করে বাহিরেতে আসে যদু খুলে দোর।
“ডিমওলা এদিগেতে এসো দিকি একবার,
ডিমগুলো সব নেবো প্রয়োজন দেখবার।”
ডাক শুনে ফিরিওলা ঝুড়ি নিয়ে কাছে আসে,
নিকটেতে আসতেই ফিক ফিক যদু হাসে।
বাবা বলে মোর নাকি বুদ্ধিটা কিছু নাই,
ডিম কিনে বুদ্ধিটা দেবো আমি দেখিয়েই।

বুদ্ধির চিন্তায় যদু তবে হল কাবু,
ঝুড়িখানা নীচে রেখে ফিরিওলা বলে, “বাবু,
ডিম দেখে সবগুলো টাটকা ও খুব ভালো,
সব কটা শাদা রঙ একটাও নয় কালো।”
যদু বলে, “হুঁ হুঁ বাবা ঘুঘু তুমি অতিশয়,
ধড়িবাছ যদু ভড় ছ্যাবলা বা বোকা নয়।
মার্ব্বেল আকারের ক্ষুদে ক্ষুদে সব ডিম,
তার’পরে সবগুলো কনকনে যেন হিম।”
ফিরিওলা হেসে বলে, “চটো কেন মহাশয়,
ছোট ছোট মুরগীর ছোট ছোট ডিম হয়।
দাম এর কম নেবো এক আনায় এক কুড়ি,
সে হিসাবে দাম হয় তিন টাকা সব ঝুড়ি।”
কম দাম শুনে যাদু ভাবে বসে মনে মনে,
কিনে ফেলি দেরী কেন বসে আছি অকারণে।
বলে,“ওগো ফিরিওলা কম কিছু হবে নাকি,
আমি বলি এর দাম হয় মোটে দশ সিকি।”
ফিরিওলা ভেবে বলে, “বেশ তবে তাই দাও,”
তক্ষুনি দশ সিকি দিয়ে যদু বলে, “নাও।”
দশ সিকি ট্যাঁকে গুঁজে ফিরিওলা গেল চলে,
খুসি মনে যদু ভড় গান করে আর দোলে।
“বাবামণি দেখে যাও কিনিয়াছি নিজে আমি,
এক কুড়ি ডিম আজ, সস্তায় নয় দামী।”
ঝোপগুঁফো বাবা এসে হেসে বলে, “ওরে যদু,
‘আমি নিজে কিনিয়াছি’ কথা নয় যেন মধু।
দেখি দেখি কত ডিম নিজে তুই কিনেছিস্,
ওরে ওরে হতভাগা একি তুই করেছিস।”
যদু বলে, “কেন বাবা দাম মোটে দশ সিকি,
এক কুড়ি ডিম তুমি এত কমে আন দিকি!
বাবা বলে, “বুঝলাম দাম এর দশ সিকি,
কিন্তু যে ডিমগুলো পাড়িয়াছে টিকটিকি!”

ময়নামতীর দেশ: রঞ্জিত সিংহ প্রণীত ও শৈল চক্রবর্ত্তী চিত্রিত। প্রকাশক: বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স কলিকাতা। দাম: এক টাকা।

লেখকের প্রথম বই। রূপকথা। ময়নামতীর দেশ, কাঞ্চনমালা, মধুকমালার দেশে ও অনেক-আশার দেশে—এই চারটি গল্প। ভূমিকায় লেখক বলেছেন, “আমি নোতুন।…ময়নামতীর দেশের সব গল্পই আমার মনগড়া কাহিনী—গল্পবলার তাগিদে এদের দেহে রং বোলাতে, হ’য়েছে।…এসব রূপকথার ‘রূপ’টাই আসল, ‘কথা’টা কিছুই নয়।” রূপকথার এই অপরূপ ব্যাখ্যার পর লেখকের কাছ থেকে স্বভাবতই বিশেষ কিছুর প্রত্যাশা থাকে না। বাস্তবিক পক্ষে, আজকাল বাজারের শস্তা বিদঘুটে ডিটেক্‌টিভ্ গল্পগুলো ছোটদের যা ক্ষতি করছে এ-ধরণের রূপকথাও তার চেয়ে কম ক্ষতি করছে না। যে বর্ণনার গুণে অত্যন্ত অসম্ভব গল্পও সত্যিকারের সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে, বর্তমান লেখকের সে-ক্ষমতা

নেই। অবশ্য, 'অসম্ভবে'রও একটা সীমা থাকা দরকার। 'ময়নামতীর দেশের' নায়ক রূপকুমার সোনার পাথর বাটির সন্ধানে বেরিয়েছিলো, লেখকও ঠিক তাই। 'তোমাদের কাছে' শিরোণামা দিয়ে লেখা লেখকের অসংলগ্ন ভূমিকাটি এবং 'গল্প শোনার আগে' ও 'গল্প শোনার পরে' শীর্ষক কবিতা দুটি একেবারেই অসহ্য। ছাপা, বাঁধাই ছবি ইত্যাদি ভালোই।

মরনিং স্কুল: ইন্দিরা দেবী প্রণীত। প্রকাশক: বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা। দাম: এক টাকা।

গল্পের বই। সূচীপত্রে উল্লিখিত মোট বারোটি গল্প ছাড়া আরও তিনটি গল্প বইতে পাওয়া গেলো। "ময়নামতীর দেশের" খাপছাড়া আবহাওয়ায় খানিকক্ষণ কাটিয়ে এসে এ-বইটি পড়তে মন্দ লাগে না। লেখিকার ভাষা বেশ মিষ্টি, গল্প বলার ভঙ্গিও মন্দ নয়, কিন্তু সর্বত্র কল্পনার সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়নি। তা ছাড়া লেখিকা আপন খেয়ালে তাঁর কল্পনার জাল ছড়িয়ে দিয়ে চলেন, কিন্তু সর্বত্র তা ঠিক মতো গুটোতে পারেন না। ঠিক এই কারণে কয়েকটি গল্প উৎরোতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত উৎরোয়নি।

বাদশাহী গল্প: এস ওয়াজেদ আলী বি. এ. (ক্যান্টাব) বার-এট্-ল। প্রকাশক: বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিঃ। দাম: বারো আনা।

সাতটি গল্প। গল্পগুলি পড়তে সকলেরই ভালো লাগবে। পড়তে পড়তে আরব্যোপন্যাসের জগতে মন চলে যায়। 'বাদশার করুণা' গল্পের শেষে চোরের প্রত্যুত্তরটি ভারি চমৎকার। চুরি করে ধরা পড়ে একটুও না ঘাবড়িয়ে নিজের চৌর্যকে বাদশার দয়া এবং মহত্বের খোলসে বেমালুম চালিয়ে দিতে পারা কতখানি বুকের পাটা এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয়, তা অনুরূপ অবস্থায় না পড়লে বোঝা যায় না। প্রত্যেকটি গল্পই ছোটদের মনকে দুর্নিবার টানবে। গল্পগুলিতে ব্যবহৃত কয়েকটি উর্দু ও ফারসী শব্দ মাঝে মাঝে পথরোধ করলেও সবটা মিলিয়ে বেশ একটা বাদশাহী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। বারো আনা দাম আজকালকার দিনে শস্তাই বলতে হয়।

—মনোজ নিয়োগী

● বিশেষ দ্রষ্টব্য ●
১৩৫৩ সালের বার্ষিক চাঁদা ৩৸০, ষান্মাষিক ১৸০, প্রতি সংখ্যা ।৵০ ।
চাঁদা পাঠাবার সময় ভুল করো না।

রংমশালের ছোট্ট বন্ধুরা,

এবার আর একদম বাজে কথা নয়; একেবারে সোজা-সুজি কাজের কথা পাড়ব ঠিক করেছি। আসল কাজের কথা যে খাওয়াদাওয়ার কথা এ সম্বন্ধে যার সন্দেহ আছে সে মোটেই মানুষ নয়; আর যদি কেউ বলে বসে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারটা কথায় না সেরে একেবারে পাতা পেড়ে সেরে ফেলাই ভালো তাহলে সেও মানুষ নয়, কেননা সে হল যাকে বলে পেটুক! ফলে খাওয়াদাওয়ার কথায় তোমাদের কারুর আপত্তি থাকতেই পারে না—তোমরা যে শুধু মানুষ তাই নও, প্রত্যেকেই ভালোমানুষ। তাই ভাবছি দিনকতক নির্ভাবনায় তোমাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়ার ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে।

কিন্তু মুস্কিল হল খাওয়াদাওয়া একরকমের নয়, নানান রকমের—পায়েস খাওয়া, পরীক্ষায় রসগোল্লা খাওয়া, পাস করলে আনন্দে ডিগবাজি খওয়া—এই রকম কত কি! আবার নানান লোকের নানান রুচি: কেউ ভালোবাসে ডাঁটাচচ্চড়ি, কেউ ভালোবাসে দো-পেঁয়াজী, কেউ বা ফল পাকুড় কেউ বা মুর্গি- মটন্। যদি প্রত্যেকের কথা নিয়ে আলাদা আলাদা করে আলোচনা সুরু করি তা হলে সুরু করাই সার হবে, ইহজীবনে আর শেষ করে ওঠা যাবে না। তাই আলোচনা করা উচিত এমন সব জিনিষ নিয়ে যা তুমি খাও, আমি খাই—আরও সকলেই খায়; অর্থাৎ যা নইলে কোন মানুষেরই একেবারে চলে না।

একটু লোহা, একটু চুন, আর একটু কয়লা ধরণের জিনিষ পেটে না পড়লে মানুষের বাস্তবিক একদম বাঁচাই সম্ভব হয় না। তাই, এগুলোকেই তার প্রধান খাবার বলে স্বীকার করতে হবে। তাই বলে, আমাদের যে বিম-বর্গা বা দেয়াল কামড়ে পড়ে থাকতে হবে তার কোন মানে নেই। সাধারণত আমরা যা খাই—ডাল, ভাত, ডিম, দুধ মাছ,—এ সবের মধ্যে লোহা-চুন-কয়লা গা ঢাকা দিয়ে থাকে, যেমন ধরো গা ঢাকা দিয়ে থাকে চপের মধ্যে পাঁঠার রক্তমাংশ। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদের নজর বড় কড়া: তাদের সামনে কোন ছদ্মবেশই টিঁকতে চায় না। তাই সাধারণ খাবারদাবারের মধ্যে কোনটার মধ্যে কতখানি লোহা গা ঢাকা দিয়ে আছে সে সব হিসেব হয়ে গিয়েছে। বৈজ্ঞানিকেরা তলিয়ে দেখেছেন যে শরীরের মধ্যে খাবার-দাবারগুলো ঢুকলে পর আমাদের শরীর খাবারগুলোর মধ্যে থেকে এই সব লোহা-টোহা আলাদা করে বেছে

নেয়, বেছে নিয়ে নিজের কাজে লাগায়। অবশ্য, শরীর খারাপ হলে অন্য কথা; তখন আর আমরা খাবারের মধ্যে থেকে এ সব জিনিষ বেছে নিয়ে নিজের কাজে লাগাতে পারি নে'। তাই ডাক্তারবাবু ওষুধের দোকান থেকে এই সব কিনে এনে গায়ে ফুঁড়ে দেন বা বড়ি করে খাইয়ে দেন। ক্যালসিয়াম্-এর বড়ি দেখো নি? ক্যালসিয়াম্ ইনজেকসন দেখো নি?

শরীরের জন্যে এ ছাড়া আরও কতকগুলো খাবারের বেশী দরকার—গোটাকতক গ্যাস, যাদের নাম হচ্ছে হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, কার্ব্বন্ এবং নাইট্রোজেন। কেননা, শরীরের আসল দরকার দুটো—প্রাণ আর শক্তি। প্রাণ ব্যাপারটা যে জিনিষ দিয়ে তৈরি তার নাম প্রোটো-প্লাজম্ এবং প্রোটোপ্লাজম্ একরকম গ্যাসেরই লীলা মাত্র। কিন্তু ধড়ে প্রাণ থাকলেই ত' হল না। শরীর অনেকটা এঞ্জিনের মতন। এঞ্জিন যেমন চালাতে হয় শরীরকেও তেমনি চালাতে হয়। এঞ্জিন চালাবার জন্যে দরকার শক্তির, শরীর চালাবার জন্যেও তাই। এঞ্জিন চলার শক্তি আসে জল-ফোটান বাষ্প থেকে, শরীরের শক্তি আসে খাবারদাবার থেকে বের-করা কতকগুলো গ্যাস থেকে। তাই গ্যাসগুলো নইলে শরীর একেবারে অচল। তবে রক্ষে এই যে গ্যাসগুলো নানান ভাবে গা ঢাকা দিয়ে শরীরের মধ্যে ঢুকে শরীরের কাজে লেগে যায়—তা নইলে মানুষ রাতদিন হা-গ্যাস, হা-গ্যাস করে ঘুরতে ঘুরতে পাগল হয়ে যেতো।

পণ্ডিতেরা হিসেব করে দেখেছেন যে এই সব গ্যাসের মধ্যে নাইট্রোজেনের কদরই সবচেয়ে বেশী। তাই মানুষের খাবারদাবার দুভাগে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে—এক হল যাতে নাইট্রোজেন আছে আর একদল যাতে নাইট্রোজেন নেই। নাইট্রোজেনওয়ালা খাবারগুলোর নাম প্রোটিন, এই প্রোটিন থেকে তৈরি হয় প্রোটোপ্লাজম্—তাই জন্যেই ত' নাইট্রোজেনের এত খাতির। আর নাইট্রোজেন-হীন খাবার দুরকমের—চর্ব্বি আর কার্বোহাইড্রেড্। পণ্ডিতেরা হিসেব করে বলে দিয়েছেন কোন কোন খাবারের মধ্যে কতটা প্রোটিন, কতটা চর্ব্বি, কতটা কার্বোহাইড্রেড্। চিনির মধ্যে শুধুই কার্বোহাইড্রেড্; আলুর মধ্যে একশো ভাগের প্রায় ৩০ ভাগ কার্বোহাইড্রেড্, আড়াইভাগ প্রোটিন আর সামান্য একটু চর্ব্বি। মাছের মধ্যে একশো ভাগের প্রায় ১৮ ভাগ প্রোটিন, ১৮ ভাগ চর্ব্বি—কার্বোহাইড্রেড্ একদম নেই। দুধের মধ্যে একশো ভাগের প্রায় সাড়ে-তিনভাগ প্রোটিন্, চারভাগ চর্ব্বি আর সাড়ে চারভাগের চেয়েও বেশী কার্বোহাইড্রেড্। এ ছাড়া প্রায় প্রত্যেক খাবারের মধ্যেই বেশ খানিকটা করে জল রয়েছে—ডিমের একশো ভাগের প্রায় ৭৪ ভাগ, দুধের মধ্যে ৮৭ ভাগ, ফলের মধ্যে ৬৩ ভাগ জল। এই জলটুকু মোটেই অনর্থক নয়; কেন না জলের মধ্যে আছে দুরকম গ্যাস—হাইড্রোজেন আর অক্সিজেন; আর এই দুটো গ্যাস বাদ দিয়ে শরীর চলে না।

তা হলে বুঝতেই পারছো, কিছু লোহালক্কড় কয়লা চুন আর গোটাকতক গ্যাস—এই হল আসল খাবার জিনিষ। কিন্তু মানুষ না পারে কাঁচা লোহা খেতে, না পারে খেতে কাঁচা গ্যাস। কাঁচা খাবার দরকার নেই—প্রকৃতির মধ্যেই এমন বন্দোবস্ত রয়েছে যে এগুলো দিব্বি রান্না হওয়া অবস্থায় আমাদের সামনে ধরে দেওয়া হয়। তাই পৃথিবীকে একটা বিরাট রান্নাঘর বলে কল্পনা করা যেতে পারে—মস্ত বড় রান্নাঘর—যজ্ঞিবাড়ির রান্নার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ বড়। বড় হবে নাই বা কেন? এই রান্নাঘর থেকেই যে কোটি কোটি প্রাণীর খাবার সরবরাহ করা হচ্ছে।

পৃথিবীটা যে একটা রান্নাঘর তা সোজা কথায় প্রমাণ দিচ্ছি। রান্নাঘরে থাকে (১) উনুন, (২) কাঁচা আনাজ, চাল, ডাল ইত্যাদি, (৩) রাঁধা জিনিষ—তরকারির খোসা, মাছের আঁস ইত্যাদি, যা ফেলে দিতে হয়। পৃথিবীর অবস্থাও ঠিক তাই। প্রথম ধরো উনুন। এ উনুনকে দেখতে পাবে দিনের বেলায় আকাশের দিকে চাইলে। সূর্য্য বিরাট উনুন সন্দেহ নাই। রান্নাঘরটার চেয়ে লক্ষ-

লক্ষ গুণ বড়ো, তাই যেন রান্নাঘরটুকুতে ধরে নি—লক্ষ লক্ষ মাইল দূরে রাখা হয়েছে। অতদূর থেকে উনুনটার যেটুকু আঁচ আসে সেইটুকু যেন যথেষ্ট। সেই আঁচেই রান্না হয় পৃথিবীর সমস্ত খাবার দাবার: শাকশবজি, গরুর দুধ, পাঁঠার মাংশ, পাখীর ডিম। সূর্য্য থেকে তাপ না এলে এগুলোর একটাও পৃথিবীতে সম্ভব হতো না। এগুলোই হল পৃথিবীর রান্নাঘরে রাঁধা খাবার। আমাদের রান্নাঘরে যেমন থাকে ভাত, ডাল, ডিমের ডালনা। তবে মানুষ বড় সৌখিন লোক—পৃথিবীর রান্নাকরা জিনিষ আর একবার নিজে না রন্না করে নিলে কিছুতেই মন ওঠে না। পশু-পক্ষীর এ বালাই নেই—পৃথিবী তাদের যে রান্না করে দেয় তাই হাসিমুখে পেটপুরে খায়।

তাহলে, উনুন আর রাঁধা জিনিষ, দুটোর কথাই হল। এবার দেখা যাক পৃথিবীর রান্নাঘরে কাঁচা আনাজ আর আবর্জনাগুলো ঠিক কি কি? কাঁচা আনাজের কথা আগেই বলেছি—কিছু লোহা, কিছু চুন, কিছু কয়লা, গোটাকতক গ্যাস এই রকম নানান জিনিষ। এই সব কাঁচা আনাজ ছড়ানো রয়েছে সমস্ত পৃথিবীময়—হাওয়ায়, জলে, মাটির মধ্যে—নানান জায়গায়, নানান ভাবে। তারপর আবর্জনা—পৃথিবীর রান্নাঘরে এই সব আবর্জনার অন্ত নেই। তবে, এখানে যেন পাকা গিন্নীর বন্দোবস্ত—একটু কিছু ফেলাছড়া যায় না। পাকা গিন্নীরা যেমন তরকারীর খোসা ফেলে না দিয়ে খোসা-চচ্চড়ি তৈরি করেন, পৃথিবীর বেলাতেও ঠিক তাই: শাকশব্জি তৈরি করবার সময় হাওয়া থেকে নাইট্রোজেন বের করে নিয়ে অক্সিজেনটা ফেলে দেওয়া হয়েছিলো, সেই ফেলে দেওয়া অক্সিজেন কাজে লাগানো হল গরুর দুধ তৈরি করবার সময়। আবার গরুর দুধ তৈরি করবার সময় আবর্জনা হিসেবে ফেলে দেওয়া হয়েছিল গোবর এই গোবর কাজে লাগানো হল আবার শাকশব্জি তৈরি করবার সময়। এক্কেবারে পাকা গিন্নীর বন্দোবস্ত।

আগেই বলছিলুম, শরীরের অবস্থা অনেকটা এঞ্জিনের মতন: এঞ্জিন চালাতে হলে একটা শক্তির দরকার, সে শক্তি জোগাড় কয়তে হয় জল ফুটিয়ে বাষ্প তৈরি করে। আমাদের শরীরে বেলাতেও তাই। একে চালাবার জন্যেও একরকম শক্তির দরকার। সে শক্তি তৈরি হয় খাবার-দাবার থেকে। কোন কোন খাবার শরীরে কতখানি ক'রে শক্তির জোগান দেয় তার হিসেব পর্য্যন্ত বৈজ্ঞানিকেরা করে ফেলেছেন। কিন্তু এই শক্তি জিনিষটাকে মাপা যায় কেমন করে? কাপড় মাপবার জন্যে দর্জিরা গজ-ইঞ্চি বেছে নিয়েছে, দুধ মাপবার জন্যে গয়লারা ঠিক করেছে সের-পোয়া। আর শরীর চালাবার শক্তির বেলায়? পণ্ডিতেরা ঠিক করেছেন শক্তিকে মাপবার যে মাপ তার নাম হল ক্যালোরী। নানান রকমের খাবার নানন মাপের শক্তি আমাদের দেহে যোগায়; কোন কোন খাবার কতখানি করে শক্তি শরীরের মধ্যে যোগায় তা হিসেব করতে হলে তলার কথা দুটো মনে রাখতে হবে:

(ক) এক পাউণ্ড প্রোটিন বা এক সের কার্বোহাইড্রেড থেকে পাওয়া যায় ১৮৬০ ক্যালোরী,

(খ) এক পাউণ্ড চর্বি থেকে পাওয়া যায় ৪২২০ ক্যালোরী। কোন খাবারের মধ্যে কতটা প্রোটিন, কতটা কার্বোহাইড্রেড্ আছে তা' ত' আগেই বলেছি। এখন ত' তোমরাই আঁক কসে বের করে ফেলতে পারবে কোন কোন খাবার কত ক্যালোরী জোগান দেয়। হিসেব করলে কেখতে পাবে:

(ক)	১ পাঃ	মাখন	৩৬১৫	ক্যালোরী	শক্তি	শরীরে	জোগান	দেয়
(খ)	,,	মাংস	৯০০	,,	,,	,,	,,	,,
(গ)	,,	ভাত	৫১০	,,	,,	,,	,,	,,
(ঘ)	,,	আলু	৪৪০	,,	,,	,,	,,	,,
(ঙ)	,,	আপেল	২৯০	,,	,,	,,	,,	,,
(চ)	,,	চিনি	১৮৬০	,,	,,	,,	,,	,,
(ছ)	,,	শাক	১৪৫	,,	,,	,,	,,	,,

(পাঃ অর্থাৎ পাউণ্ড)

এই রকম ভাবে প্রত্যেকটা খাবারকে ধরে ধরে হিসেব করা যায় যে কোন কোন খাবার কতখানি শক্তি শরীরে জোগান দিতে পারে।

এখন যদি তুমি প্রশ্ন করে বসো শরীরকে চালাতে হলে ঠিক কত ক্যালোরীর শক্তি দরকার তা হলে কিন্তু আমি একটু ঘাবড়ে যাবো। কেননা, এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব আমি দিতে পারবো না। যেমন ধরো এঞ্জিনের বেলায়: এঞ্জিনের কতটা শক্তি লাগে, এ প্রশ্নের জবাব কি এক কথায় দেওয়া যায়? বড় এঞ্জিনের বেশী শক্তি লাগে, ছোট এঞ্জিনের কম শক্তি লাগে। যে এঞ্জিন বেশী খাটে, দূর পাল্লায় দৌড়ায়, তার বেশী শক্তি লাগে; যে এঞ্জিন কলকাতা বজবজ করে তার অনেক কম শক্তি লাগে। মানুষের বেলাতেও তাই। বড়দের শরীর চালাবার জন্যে বেশী ক্যালোরী লাগে, ছোটদের লাগে কম। আর যে লোক সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলছে তার শরীরের জন্যে বেশী ক্যালোরী শক্তি লাগে; যে লোক রাতদিন বসে বসে হাই তুলছে কিম্বা নিছক কুঁড়েমী করে দিন কাটাচ্ছে তার ঢের কম ক্যালোরীতে চলে যায়। ক্রিকেট-খেলোয়াড়ের চেয়ে দাবা খেলোয়াড়ের ঢের কম ক্যালোরি লাগে। (অতএব, একটা কথা ত বুঝতেই পারছ—দিনরাত যদি কুঁড়েমী করো তা হলে খাবারও দেওয়া হবে কম।)

পণ্ডিতেরা অবশ্য মোটামুটি একটা হিসেব করেছেন, কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত তাঁদের ধারণা ছিলো একজন-সাধারণ জোয়ান লোকের পক্ষে দিনে হাজার তিনেক ক্যালোরীতেই কাজ চলা উচিত। তবে, সে যদি ফ্যাক্টরীর মজুর হয় তা হলে ক্যালোরীর দরকার পড়বে প্রায় হাজার পাঁচেক; আর যদি অপিসের বাবু হয় তা হলে দিনে হাজার আড়াই হলেই চলা উচিত। এই ছিলো কিছুদিন আগে পণ্ডিতদের ধারণা। হালে অবশ্য তাঁদের মত বদলেছে। তাঁরা বলছেন—না না অত ক্যালোরীতে মানুষের কোন দরকার নেই। সাধারণ একজন লোকের পক্ষে দিনে হাজার আড়াই ক্যালোরীই যথেষ্ট।

এই পর্য্যন্ত শুনে তোমার মনে হতে পারে, বাপ্‌স্! মানুষ ত' আচ্ছা হ্যাংলা লোক! যা দরকার হয় তার চেয়ে ঢের বেশী খায়। সকাল থেকে রাত পর্য্যন্ত একটা সাধারণ লোক যা খায় তার থেকে হাজার আড়াই-এর চেয়ে ঢের বেশী ক্যালোরী তার শরীরে হবার কথা।

আমরা কি সবাই সত্যিই খুব হ্যাংলা? যা দরকার তার চেয়ে আমরা সত্যিই কি খুব বেশী খাই?

এ কথা নিয়ে পরে আবার একদিন আলোচনা করা যাবে। এখন আমার খিদে পেয়ে গিয়েছে, খাবারের কথা আলোচনায় আর মন উঠছে না, মন চাইছে সত্যিকারের খাবার।

ইতি তোমাদের
সম্পাদকমশাই

● বিশেষ দ্রষ্টব্য ●

আগামী বছরের রংমশালের জন্যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে। চৈত্র-সংখ্যায় তার পুরো ফর্দ পাবে।

এক যে আছে আজব দ্বীপ। সেখানে থাকে একদল জংলী লোক। বাইরের কেউ সেই দ্বীপে এলেই সেই জংলী লোকগুলো তাকে ধরে মেরে ফেলে। মারবার আগে সেই লোকটিকে তারা বলে যে-কোনো একটি কথা বলতে। কথাটি যদি সত্যি হয় তা হলে তাকে মারে বিষ-মাখানো তীর বিঁধে, কথাটি মিথ্যে হলে মারে আগুনে পুড়িয়ে। একটি চালাক লোক সেই আজব দ্বীপে একবার গিয়ে জংলীদের হাতে বন্দী হয়েছিলো। চালাক লোকটি এই দ্বীপের অদ্ভুত আইন-কানুনের কথা জানতো। তাই তাকে জংলীরা যখন বললো কথা বলতে সেই চালাক লোকটি চটপট ভেবে এমন একটি কথা বললো যার ফলে জংলীরা তাদের আইন অনুসারে সেই চালাক লোকটিকে মারতে পারলো না। তোমাদের মধ্যে এমন চালাক কেউ কি আছো যে ঐ চালাক লোকটি জংলীদের কী-কথা বলেছিলো বলতে পারো? রংমশালের কাছে সত্যি কথা বললে কোনো শাস্তির ব্যবস্থা নেই, বরঞ্চ ছাপার অক্ষরে নিজের নাম দেখা যায়!

ধাঁধাঁর উত্তর

১। আমরা যে তথ্যগুলি জানি সেগুলিকে এইভাবে সাজাও:

নাম	থাকেন	পূজোয় যান
ক	বিরূপাক্ষ সেন রোড	শান্তি পাল রোড
	অনাদি বসু রোড	
	বিজন রায় রোড	
	বিজয় গুপ্ত রোড	ক
	শান্তি পাল রোড	

২। 'ক' কে? নিশ্চয়ই অনাদি, শান্তি কিংবা বিজয় নন। 'ক' বিজনও হতে পারেন না কারণ বিজন পূজোয় যে পথে যান তার নাম হচ্ছে বিজয় গুপ্ত রোডের বাসিন্দার নাম; অর্থাৎ 'ক' হচ্ছে বিরূপাক্ষ।

৩। বিজয় গুপ্ত রোডে কে থাকেন?

বিজন নন, কারণ বিজনকে তা হলে বিজন রায় রোডেই পূজোর ছুটিতে যেতে হয়।

বিজয় গুপ্তও নন (কারণ নিজের নামের রাস্তায় নিজে থাকেন না)।

বিরূপাক্ষ সেন নন, কারণ তিনি থাকেন অনাদি বসু রোডে।

শান্তি পালও নন, কারণ তিনি পূজোয় যান বিজয় গুপ্ত রোডে।

৪। অতএব অনাদি থাকেন বিজয় গুপ্ত রোডে এবং পূজোয় যান বিরূপাক্ষ সেন রোডে।

প্রথম ফর্দটিকে নতুন করে সাজালে এবার তাহলে এই রকম দাঁড়ায় :

নাম	থাকেন	পূজায় যান
	বিরূপাক্ষ সেন রোড	
বিরূপাক্ষ	অনাদি বসু রোড	শান্তি পাল রোড
	বিজন রায় রোড	
অনাদি	বিজয় গুপ্ত রোড	বিরূপাক্ষ সেন রোড
	শান্তি পাল রোড	

৫। পূজোর সময় বিজন রায় রোডে যিনি যান তিনি—
বিজন রায় নন (নিজের নামের রাস্তায় পূজোয় নিজে যান না),
বিরূপাক্ষ সেন নন, কারণ তিনি যান শান্তি পাল রোডে,
শান্তি পাল নন, কারণ তিনি যান বিজয় গুপ্ত রোডে,
অনাদি বসু নন, কারণ তিনি যান বিরূপাক্ষ সেন রোডে,

অতএব বিজয় গুপ্ত পূজোয় যান বিজন রায় রোডে।

দ্রষ্টব্য : ধাঁধায় যে-সব কথা বলা হয়েছিলো তাই থেকে কিন্তু জানা যায় না বিজয় গুপ্ত কোথায় থাকেন। তিনি বিরূপাক্ষ রোডেও থাকতে পারেন কিংবা শান্তি পাল রোডেও থাকতে পারেন।

উত্তরদাতাদের নাম

পৌষ মাসের ধাঁধার উত্তর যারা দেরি করে পাঠিয়েছো : শ্রীমতী বি. পি. দাস (২৫৬০), বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (২৩১৩), যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), পীযূষকান্তি মতি কাতু ইত্যাদি (২১৬০), কাশীনাথ ও দিলীপকুমার (২৫৫০), অরুণ প্রীতি ছায়া মায়া ইত্যাদি (২৫৯৬), বিভাতী নারায়ণ (২৫৪৭), পারিজাত রায় (?) প্রতীপেন্দ্র নাথ ভোস (২৫৩৩), হিমাদ্রি পারু হাঁদু ইত্যাদি (২৫৭০), মৈত্রেয়ী দাস (২৫৮৬), নির্মলেন্দু মীনা পিন্টু (২৫৯১), বিজু দয়াল বিজয়া জামাইবাবু ছোড়দি (২৩৫৯)

মাঘ মাসের উত্তরদাতাদের নাম

মৃণাল অশেষ অসীম ও আশিস (১৫৬৯), বেণু ও বিজয় (২৩৮৫), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (২০৬১) অনিল্য কৃষ্ণা ও শীলা (২৫৯৯), যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯), প্রতিমা সেন (২০৮৪), দিলু মন্টি কাশীনাথ (২৫৫০), সুধাংশু চৌধুরী (২২৯৭), মৈত্রেয়ী দাস (২৫৮৬), নির্মল গুহ (২০৯৪), সুনন্দা সত্যবান সুব্রত (২০০৫), সুকুমার সাহা (২৪৯২), হিমু শিশির (২৫২১), বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায় (২০৬১), শৈলেন্দ্র কুমার সরকার (২২২৬)।

● বিশেষ দ্রষ্টব্য ●

১৩৫৩ সালের রংমশালে ২০০৲ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। চৈত্র-সংখ্যায় সব খবর পাবে।

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.
Founded by Prof. K. N. Sen.

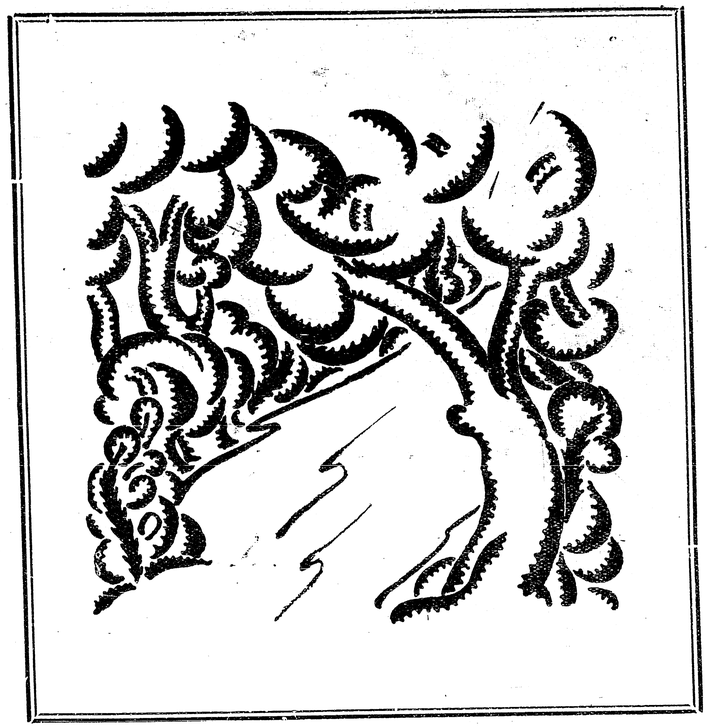

অরণ্য-পথ

শিল্পী : হিতাংশু রায়

বিচিত্রা

[দশম বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা : চৈত্র, ১৩৫২]

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত

৩ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রিট, পোঃ আঃ এলগিন রোড, কলকাতা

কালীঘাট

সৌরীন্দ্রকুমার দে

সহরের দক্ষিণে কালীঘাট
নয় মোটে একটুও ফিট্‌ফাট্‌
হিন্দুর মন্দির মস্ত,
পশ্চিমে ঝিরঝিরে গঙ্গা
ঘোলাজলে ছিপছিপে ডোঙ্গা
ঠেলাঠেলি চারিদিক ত্রস্ত।

পাণ্ডার গুণ্ডামি সয়না
প্রসাধন-ইজ্জত রয়না
ডালা নিয়ে চীৎকারে মালীটা,
আঁধারের গহ্বরে মা-কালী
ফ্যাসানের যুগে সব গা-খালি
ঝংকারে প্রণামীর থালিটা।

পাথরের, খেলনার দোকানে
সকালে ও সন্ধ্যার লগনে
ঠাকুরমা ও নাতিদের জটলা,
ভিক্ষার থলি ঘাড়ে ল্যাংড়া
ফক্কড়ি করে যত চ্যাংড়া
বৈরাগী কোঁ-কোঁ করে বেহালা।

ঘাঁটি বেঁধে রাস্তার দুধারে
সারাদিন সন্ধ্যার আঁধারে
বাটি নিয়ে বসে আছে ভিখারী,
মেটে-মেটে শাড়ি পরা বিধবা,
পিতলের ঘটি হাতে সাধবা,
শাঁখা নিয়ে হাঁক দেয় শাঁখারি।

গঙ্গার বাঁধা ঘাটে দোকানী
বাঁধা দরে, জন প্রতি একানি
আঁকে সুখে মজুরীর বদলে
চন্দন রক্ত পবিত্র
আধুনিক বৈদিক চিত্র
যাত্রীর কপালে ও কপোলে।

শ্মশানের পথটার এপাশে
মোটা গোল থামটার গা ঘেঁসে
কাঁদে বসে স্বামীহারা বেহুলা,
সাবিত্রী সত্যের মূর্তি
দেখে সব নিভে যায় ফুর্তি,
মনে হয় সংসার বিফলা।

জাগরণ

প্রবোধ ঘোষ

নদীটা যেখানে হঠাৎ একটা বাঁক নিয়েছে সেখানে খোলা মাঠে প্রকাণ্ড তাঁবু ফেলেছে এক সার্কাস্-পার্টি। তাঁবুতে ঢোকবার মুখে টিকিটঘরের সামনে অনেকটা উঁচুতে দুটো ডে-লাইট্ বাতি জ্বলছে, আলো এসে পড়েছে মাঠ ছাড়িয়ে পথের ওপর, এমন কি নদীর জলেও। শাদা আলোয় নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে ঢাক বাজিয়ে চলেছে দুটো লোক: মুখে তাদের লাল-কালো-হল্‌দে ছাপ, মাথায় সবুজ রঙের তিনকোণা টুপি। যারা টিকিট কিনতে পারেনি তারা ভিড় করে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, মাঝে মাঝে সামনের পর্দার ফাঁকে চুরি করে খেলা দেখবার চেষ্টায় আছে।

ডে-লাইটের ঝল্‌সানো আলোর দিকে তাকালে আকাশের ময়লা চাঁদ নজরেই লাগেনা। সন্ধ্যার সময় সামান্য এক পশলা বৃষ্টি হয়েছিল: মাঠের ঘাস ভিজে, জলের ফোঁটা চক্‌চক্ করছে। প্রথম রাত্রির খেলা শেষ হল, তাঁবু থেকে দলে দলে লোক বেরিয়ে আসছে। দূর থেকে যারা এসেছে তাদের ব্যস্ততার সীমা নেই। ছোট ছেলে-মেয়েরা হাতধরাধরি করে চলেছে এগিয়ে,মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছে তাঁবুটির দিকে। লোকেদের মুখে নানা-রকমের প্রশংসা ও নিন্দা।

তাঁবুর সঙ্গে লাগানো সাজঘরের পর্দা ঠেলে নদীর ধারে এগিয়ে এল কৃষ্ণচারি: কালো কুচকুচে চেহারা, মাথায় ছোট, মুখ থেকে রঙের দাগ ভালো করে ওঠেনি। মাদ্রাজী সার্কাস্-পার্টি: কৃষ্ণচারি ম্যাজিক্ দেখায়, ভাঁড় সেজে লোক হাসায়। তার সাজপোষাক, অঙ্গভঙ্গী ও ডিগবাজি দেখে হাসেনা এমন ছেলেমেয়ে নেই। তাঁবুর সামনের ডে-লাইট্ নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে। দূর থেকে দর্শকদের গলার আওয়াজ এখনো শোনা যাচ্ছে। সাজঘরে সার্কাস্-পার্টির লোকেদের জটলা, নদীর ধারে নৌকার গায়ে জলের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। ছেঁড়া মেঘের ফাঁক দিয়ে চাঁদের নরম আলো ভিজে ঘাসের ওপর চাদর বিছিয়েছে। একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণচারি নদীর ধারে এসে দাঁড়াল।

পকেটে খরগোস, টুপিতে শাদা পায়রা, মুখের মধ্যে ডিম। না, এসব পুরোনো ভেল্‌কি আর চলেনা, ভালোও লাগেনা। ভালো লাগেনা রোজ রাতে মুখে রং মেখে অদ্ভুত সাজপোষাক পরে ভাঁড়ামো করা—রাতের পর রাত। ভালো লাগেনা হাত-পা ছুঁড়ে ডিগবাজি খাওয়া। আজ কোদণ্ড রাও বড়ো জোরে নাকটা মলে দিয়েছে, কুণ্ডরাও আজ ঘোড়ার খেলা দেখাবার সময়ে তার পঁজরে লাথিটা জোরেই মেরেছে—কদিন ধরে ওদের সঙ্গে মনকষাকষি। ছোট ছেলেমেয়েদের কি ফুর্ত্তি! কিন্তু অপমানে কৃষ্ণচারির চোখ ফেটে জল বেরিয়ে এসেছিল। না, আর সে ভাঁড় সাজবে না—ওরা অন্য ক্লাউন্ যোগাড় করুক।

কোদণ্ড রাও পার্টির ম্যানেজার, পালোয়ানও বটে। বাঘের খেলা সে দেখায়, হাতির বাজিও জানে, বুকের ওপর পাথর ভাঙে। কালো পাথরের মতো মসৃণ শরীরে পেশীগুলো লোহার বলের মতো লাফিয়ে ওঠে, শিরগুলো

যেন দড়ি! কোদণ্ড রাও গোঁয়ার, বদমেজাজি। কিন্তু তাকে ছাড়া সার্কাস্-পার্টি চলতেই পারে না। কৃষ্ণচারিকে সে একেবারেই দেখ্‌তে পারেনা, প্রায়ই ঝগড়া করে, এমন কি দু-একবার মেরেছে। রাগে দুঃখে অপমানে কৃষ্ণচারি কী যে করাবে ভেবেই পায়না। শরীরে তার একটুও শক্তি নেই, তার সাধ্য নেই কোনোরকমে প্রতিশোধ নেয়। সে শিল্পী, সে বাজীকর, এক মুহূর্তে সে মানুষের মনকে দৈনিক জীবন থেকে নিয়ে যেতে চায় এমন জগতে যেখানে সম্ভব-অসম্ভবের মধ্যে কোনো পার্থক্যই নেই। ছোট ছেলেমেয়েদের মনে সেই ক্ষমতা আছে, তাই তাদের কাছেই কৃষ্ণচারির মতো আসল গুণীর আদর। তারা অবাক হয়ে দেখে এক মুহূর্তে সে কেমন করে মাটির টবে গাছ গজিয়ে ফুল ফোটায়, কোন যাদুমন্ত্রে কালো সার্টিনের টুপির ভেতর থেকে ডে-লাইটের ঝক্‌মকে আলোয় দুধের মতো শাদা পায়রা ডানা ঝটপট করে বেরিয়ে আসে, সাবান-গোলা জলে ফুঁ দিয়ে রঙীন বল উড়িয়ে বাজিকর মুখ থেকে বার করে আনে ডিমের পর ডিম। পকেটের মধ্যে সে রাখে তাজা দুটি কমলা লেবু, তারপর চেয়ে দেখ: নরম খর-গোসের ছানা কানদুটি খাড়া করে তুড়ুক্ করে লাফিয়ে উঠেছে। কিন্তু কোদণ্ড রাও বলে এসব খেলার দিন চলে গেছে, লোক চায় বাহাদুরির বাজি। আজ দুমাস হল সে কৃষ্ণচারিকে ছাড়িয়ে দেবে বলে শাসাচ্ছে। গোঁয়ার গুণ্ডা —সে কী করে বুঝবে আসল গুণীর দর!

অবশ্য কৃষ্ণচারিরও দোষ আছে। মদের নেশাই তার সর্বনাশ করেছে। অতিরিক্ত নেশার ফলে তার শরীর মন সব সময়েই খারাপ, একটুতেই ঝগড়া, তারপর হাতাহাতির উপক্রম হয়। বেশী মদ খাওয়ার ফলে থর থর করে হাত কাঁপে, খেলা দেখাবার আগে নার্ভাস হয়ে পড়ে, কথা জড়িয়ে যায়। নিজের দুর্বলতা ঢাকবার জন্য সাজঘরে গিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খায়। আজ এই নিয়ে কোদণ্ড রাওয়ের সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া হয়ে গেছে। ম্যাজিকও তাই আজ ভালো জমেনি, অনেক ভুল হয়ে গেছে। বার বার দর্শকের মধ্যে গণ্ডগোল হয়েছে: "বার করে দাও, বার করে দাও। ম্যাজিক চাইনা। বাঘের খেলা দেখাও।" অপমানে কৃষ্ণচারি কেঁদেই ফেলেছে। দোষ তার আছে, কিন্তু লোকে তো বোঝেনা যে মনে শান্তি না থাকলে কোনো শিল্পীই ভালো কাজ দেখাতে পারেনা। আজ পর্যন্ত এই কয়েক মাসের মধ্যেই তার বড়ো বেশি ভুল হচ্ছে। কৃষ্ণচারি বোঝে এরকম করে আর বেশিদিন চলবে না। মাইনে বাকি পড়েছে, সার্কাস্-পার্টির লোকেরা সকলেই তাকে তাচ্ছিল্য করছে।

কুন্তলা মেয়েটিকে কৃষ্ণচারির ভারি ভালো লাগে। লম্বা ছিপছিপে শরীর। ভুরুর ওপর একটা কালো তিল, ভারি ভালো দেখায়। একরাশ চুলে রঙীন ফিতে জড়িয়ে সে যখন চলন্ত শাদা ঘোড়ার ওপর বাজি দেখায় তখন কৃষ্ণচারির মনে হয় কালো মেঘেভরা আকাশে ঝড় উঠেছে। দিগন্তে সাগরের জলরেখা থেকে উঠে আসছে লক্ষ লক্ষ ঢেউয়ের মাথায় শাদা ঘোড়ার দল, তাদের পায়ের ঘায়ে সাগরের জল ফেনিল, তাদের পেছনে ছুটে আসছে হাসির হাহাকারে আকাশ ভেঙে দিয়ে এলোচুলে সাপের ফণা জড়িয়ে কুন্তলা, মণিকুন্তলা আভিরাও। সময় থেমে যায়, তাঁবুর মধ্যে ডে-লাইটের আলোয় নরমুণ্ডের অরণ্য চোখে আর পড়েনা, নিজের খেলার কথা ভুলে যায়, নিবিড় স্বপ্নের ঘোরে কৃষ্ণ-চারি শুধু দেখে লক্ষ লক্ষ ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠে কুন্তলার দীর্ঘ সুন্দর শরীর কী অদ্ভুত সুষমায় পাক খেয়ে চলে: মুখে হাসি ঝলসে ওঠে, কপাল ঘামে ভিজে যায়, এলোচুলের বনে রঙীন ফিতেগুলো পথ হারিয়ে ফেলে। হঠাৎ এক সময়ে চমকে উঠে কৃষ্ণচারি কাঠের গুঁড়ো বিছানো জমির ওপর ডিগবাজি খেয়ে অদ্ভুত গলায় চেঁচিয়ে ওঠে: ছোট ছেলে-মেয়েদের দল হাসিতে ফেটে পড়ে।

তারের ওপর কুন্তলা যখন সাইকেল চালায় কিংবা দোলনা থেকে দোলনায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন মাঝে মাঝে কৃষ্ণচারির মনে হঠাৎ প্রচণ্ড ভয় হয়। দম বন্ধ করে সে

ভাবে একবার যদি কুন্তলা হাত বা পা ফস্‌কে পড়ে যায় তাহলে······অনেক দিনের আগের কথা মনে পড়ে : এই রকম একটি মেয়ে দোলনার খেলা দেখাতে গিয়ে জালের বাইরে পড়ে যায়, তার শিরদাঁড়া আর ঘাড় ভেঙে গিয়েছিল। কৃষ্ণচারির মনে আছে সমস্ত শরীর কুঁকড়ে কেমন নিঃশব্দে মেয়েটি মারা গেল। যদি কুন্তলার······কৃষ্ণচারি ভাবতে পারেনা। আজ কয়েক দিন হল সে দেখছে যে কুন্তলাও তাকে অবহেলা করছে, কোদণ্ড রাওয়ের পক্ষ নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া করছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কৃষ্ণচারি নৌকোর ধারে বসে নদীর জলে পাদুটো ডুবিয়ে ধরল। চলন্ত ঠাণ্ডা জল ভারি ভালো লাগছে।

এখন চারদিক অন্ধকার হয়ে গেছে : দূরে খাঁচা থেকে মাঝে মাঝে আসছে বাঘের আওয়াজ, ঘোড়ার চিঁ-হিঁ-হিঁ শব্দ। একটা তাঁবুতে লণ্ঠনের আলোয় রাতের আহারের আয়োজন চলেছে। হঠাৎ কৃষ্ণচারি নিজেকে বড়ো অসহায় মনে করল। কতো দূরে মাদ্রাজের ছোট একটা গ্রামে তার বাড়ী ; মনে আছে ছেলেবেলায় তারা কতো রাত পর্যন্ত কূয়োর ধারে বসে গল্প করত। একটা বুনো ফুলের গন্ধ এখনো যেন নাকে লেগে আছে। মনে পড়ে ধানক্ষেতের আলের ওপর দাঁড়িয়ে হঠাৎ প্রকাণ্ড একটা ময়লা সোনার থালার মতো চাঁদ দেখে কী রকম আশ্চর্য লাগত। কৃষ্ণচারির বুকের ভেতরটা ব্যথায় যেন টন্‌টন্ করে উঠল। দূরে তাঁবুর পর্দা ঠেলে কারা যেন লণ্ঠন হাতে মাঠের ওপর দিয়ে চলেছে, উঁচু-নিচু জমির ভিজে ঘাসের মধ্যে পা ডুবিয়ে আসছে। অন্ধকারে তাদের মুখ ভালো করে দেখা যায় না, লণ্ঠনের দোলার সঙ্গে কোমর পর্যন্ত আলো হয়ে উঠেছে। কুন্তলা আর কোদণ্ড রাও।

ওরা কথা বলছে, হাস্‌ছে ; মাঝে মাঝে দু-একটা কথা কৃষ্ণচারির কানে এল। হঠাৎ একটা কথায় সে নৌকরা ধারে শক্ত হয়ে বসল : তারই সম্বন্ধে কথা হচ্ছে।

কোদণ্ডরাও মুখে একটা অবজ্ঞার শব্দ করে বলল : "ওকে আর রাখবো না। যতো বাজে পুরোনো ম্যাজিক দেখায়, তাত ভুল করে। ওর জন্যে সার্কাসের ক্ষতি হচ্ছে। কালই দেখো হয়তো লোকের ভিড় কমে যাবে। মাতলামি করলে কাজ চলে না। যদি ক্লাউন্ হয়ে থাকতে চায় তাহলে রাখতে পারি কিছুদিন।"

কিছুক্ষণ আবার চুপচাপ : ওরা মাঠের ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে ফিস্ ফাস্ করে দু একটা কথা বলছে, কখনো বা একটু হাসির আওয়াজ। রাগে দুঃখে কৃষ্ণচারির শরীর মন অস্থির হয়ে উঠল। না, এ প্রতিশোধ সে নেবে, সে দেখাবে তার বাহাদুরি। তার জীবনটা এতদিন ঘুমের ঘোরে কেটেছে ; এবার সে জেগে উঠবে।

আবার দুজনের হাসির আওয়াজ, কুন্তলার গলা শোনা গেল : "ওর গায়ে এতটুকু জোর নেই, একটি ছোট ছেলের মতোও নয়। কী সরু কুঁজো চেহারা!" কোদণ্ড রা... লোহার দরজার মতো ছাতিতে চাপড় মেরে হেসে উঠল।

কৃষ্ণচারির মনে হল ছুটে গিয়ে ওদের—না, না, কোদ... রাওয়ের টুঁটি চেপে ধরে। কিন্তু সাহস নেই : কোদ... তাকে টুকরো টুকরো করে ভেঙ্গে ফেলবে। কুন্তলা... কথায় তার মনটা বড়ো খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র এ... মেয়েটিকেই তার ভালো লাগত, সে ভাবতেই পারেনি কুন্তলা তার সম্বন্ধে এমন নিষ্ঠুরভাবে পরিহাস করবে। দুহাতে মুখ ঢেকে কৃষ্ণচারি বসে রইল। ওরা দুজন কথা বলতে বলতে তাঁবুর মধ্যে ঢুকে গেল। কৃষ্ণচারি আজ রাতে খাবে না, সে এখনি গিয়ে তাঁবুতে তার খাটিয়ায় শুয়ে পড়বে। শরীরে তার শক্তি নেই, কুঁজোর মতো তা... চেহারা! হে ভগবান, যদি শরীরে তার হঠাৎ ঢেউয়ের মতো ফুলে ওঠে স্বাস্থ্য ও শক্তি! কোদণ্ড রাওকে সে গুঁড়ো করে ফেলবে দুহাতের চপে, সে ভেঙে দেবে তা... অহঙ্কার। কান্নার জোয়ারে কৃষ্ণচারির গলা বন্ধ হয়ে গেল, চোখ দিয়ে জল ঝরছে। নৌকো থেকে নেমে চুপি চুপি সে তাঁবুর মধ্যে এসে শুয়ে পড়ল।

সন্ধ্যায় অন্ধকারে কৃষ্ণচারি বাজির দোকানে এলো।

এখানে ম্যাজিকের সবরকম সরঞ্জাম পাওয়া যায়, সার্কাসের জিনিসপত্রও। চারদিকে দোলনা ঝুলছে ছাত থেকে, দেয়ালের গায়ে নানা রকম মুখোস। আলমারির মধ্যে ক্লাউনের রঙীন পোষাক, টুপি, যাদুকরের বাক্স, লাঠি ইত্যাদি। একটা খুব বড়ো টেবিলের ওপরে রঙীন বলের গাদা, অনেক রকমের বাঁশী ও খেলনা। কৃষ্ণচারি কাউন্টারের দিকে এগিয়ে এল। এখনো দোকানের সব আলো জ্বালা হয়নি। ঘরের কোণে শুধু একটা আলো জ্বলছে। সন্ধ্যার অন্ধকারে জিনিষপত্রের গাদার মধ্যে যেন তাল পাকিয়ে আছে।

দোকানের একজন লোক এগিয়ে এল, আর কেউ নেই। কৃষ্ণচারি এখানকার নিয়মিত খরিদ্দার। কিন্তু একে আগে কখনো দেখেনি। কী রকম অসুস্থ মুখ লোকটার! মুখে রঙের কোনো আভাই নেই। কেমন নিষ্প্রাণ মুখ! কৃষ্ণচারির অস্বস্তি লাগল।

"কী চাই ?"

কৃষ্ণচারি হঠাৎ কথা হারিয়ে ফেলল। সত্যিই তো, কী যেন চাই! কিসের জন্য এসেছে সে ? নিজের গলার আওয়াজে সে চমকে উঠল, "আমি শরীর ক্ষমতা চাই, শক্তি চাই, শক্তি চাই। আর ম্যাজিক দেখাবো না, আর ক্লাউন্ সাজতে ভালো লাগে না। কোদণ্ড রাওকে ভেঙে ফেলতে পারি এমন শক্তি চাই।" কৃষ্ণচারির গলা বুজে এল উত্তেজনায়।

লোকটা একটু থেমে বলল : "এও তো ম্যাজিক— অনেক দাম লাগবে।"

"যা চাও তাই দেবো। আমাকে এ ম্যাজিক শিখিয়ে দাও।"

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে লোকটা এগিয়ে এল। দুহাতে সে কৃষ্ণচারির মাথাটা নিজের মুখের কাছে টেনে নিল। কী ঠাণ্ডা হাত! বরফের মতো ঠাণ্ডা ছোঁয়ায় তার শরীর হঠাৎ শিউরে উঠল, মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। অস্পষ্ট স্বরে কৃষ্ণচারির কানে সে কী যেন বলে গেল, কৃষ্ণচারি কিছুই বুঝল না। কিন্তু হঠাৎ শরীরটা যেন অসম্ভব হালকা লাগছে, শিরায় শিরায় যেন শক্তির বিদ্যুৎ ছুটে চলেছে। মনে আর কোনো গ্লানি নেই এবার, এবার কোদণ্ড রাওকে ভেঙে মুচড়ে ফেলবে।

এক মুখ হাসি নিয়ে কৃষ্ণচারি জিগগেস করল, "কতো দাম ?"

বিষণ্ণ মুখে লোকটা এগিয়ে এল। তার দিকে তাকিয়ে কৃষ্ণচারির আবার অস্বস্তি লাগল। চোখের গর্তে যেন গভীর অন্ধকার! কৃষ্ণচারি চমকে উঠল। মুখের ওপর আবার সেই ঠাণ্ডা হাতের ছোঁয়া। সে হঠাৎ ভয়ে চীৎকার করে উঠল, অবাক হয়ে দেখল তার মুখের ভেতর থেকে লোকটা নিপুণ বাজিকরের মতো বার করে নিয়েছে সোনালি একটা বল।

কোনো কথা না বলে সে দোকানের বাইরে চলে এল। পথে নেমে একবার পেছনে ফিরে সে দেখল সন্ধ্যার আবছায়ায় লোকটা নিজের মুখ হাতে তুলে নিয়ে দেয়ালে মুখোসের সারির মধ্যে ঝুলিয়ে রাখল। কাঁপতে কাঁপতে কৃষ্ণচারি ছুটে চলল সন্ধ্যার অন্ধকারে।

কী অদ্ভুত স্বপ্ন! ভোরের আলো তাঁবুর পর্দার ফাঁকে এসে পড়েছে। ঘুম থেকে উঠে খাটিয়ায় বসে কৃষ্ণচারি তখনো কাঁপছে।

সারাদিন কৃষ্ণচারির ভারি অস্বস্তিতে কাটল। বার বার শুধু স্বপ্নের কথাই মনে পড়ে, মনে পড়ে সেই মুখোস মুখ, সেই সোনালি বল। কিন্তু কী আশ্চর্য! শরীরটা কিন্তু অসম্ভব ভালো লাগছে, হালকা লাগছে, যেন অফুরন্ত শক্তি পেয়েছে। অধীর হয়ে কৃষ্ণচারি সন্ধ্যার জন্য আক্ষেপ করতে লাগল। আজ সে ম্যাজিক দেখাবে না, ক্লাউন সেজে হঠাৎ সে তার ক্ষমতা দেখিয়ে সকলকে স্তম্ভিত করে দেবে। কোদণ্ড রাওয়ের মুখের কল্পনা করে কৃষ্ণচারির হাসি এল। এতদিন তার মধ্যে যে শক্তি ঘুমিয়ে ছিল তার জাগরণ হয়েছে, শরীরের শিরায় প্রত্যেকটি পেশীতে বিদ্যুতের স্রোত বয়ে চলেছে। আর

ভয় নেই, আজ রাতেই মরে যাবে ক্ষীণজীবী বাজিকর, জেগে উঠবে পালোয়ান কৃষ্ণচারি।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আবার ডে-লাইট ঝলসে উঠেছে, ঢাকের আওয়াজে কানে তালা লেগে যায়। দলে দলে লোক আসছে টিকিট ঘরের সামনে, তাঁবুর ভেতরেও অসম্ভব ভিড়, ছোট ছেলেমেয়েদের চীৎকার। সহর ও কাছাকাছি গাঁয়ের গণ্যমান্য অনেকেই এসেছেন। সকলের মুখেই কুন্তলা আর কোদণ্ড রাওয়ের কথা।

যারা কাল খেলা দেখে গেছে বা যারা টিকিট কিনতে পারেনি তারা ঘোড়া আর বাঘের খাঁচার কাছে ঘোরাঘুরি করছে, সাজঘরের কাছে ভিড় জমাচ্ছে। সাজঘরের ভেতরে মাঝেমাঝে কোদণ্ড রাওয়ের হুঙ্কার, কুন্তলার খিল্ খিল্ হাসি। এক কোণে চুপ করে বসে আছে কৃষ্ণচারি, উত্তেজনায় তার শরীর মাঝে মাঝে কাঁপছে, মাঝে মাঝে হঠাৎ ভয়ে বুক হিম হয়ে যাচ্ছে। যদি, সে সফল না হয়! কাঁপতে কাঁপতে লুকিয়ে সে মদের ভাঁড়ে চুমুক দিচ্ছে।

চারদিকে হাততালি আর চীৎকারের মধ্যে সার্কাস সুরু হয়ে গেল। কোদণ্ডরাও আজ কয়েকটা নতুন খেলা দেখাবে। ঘোড়ার বাজি আরম্ভ হল, আবার স্বপ্ন নামল কৃষ্ণচারির চোখে। তাঁবুর আলো যেন নিভে এসেছে, সাগরের ঢেউ থেকে উঠে আসছে লক্ষ লক্ষ ক্ষ্যাপা ঘোড়া, মুখে তাদের ফেনা, দীর্ঘনিশ্বাসের ঝড় বয়ে চলেছে। আর কুন্তলা—কী অদ্ভুত ভাবে এলো চুলের অরণ্যে সমস্ত শরীর বাঁকিয়া পাক খেয়ে চলেছে ঘোড়ার পিঠে! উত্তেজনায় কৃষ্ণচারি কাঁপতে লাগল, খুসিতে তার চোখ জলে উঠছে।

হঠাৎ পিঠে এক লাথি! কৃষ্ণচারি চমকে উঠল কোদণ্ড-রাও তাকে ক্লাউনের খেলা দেখাতে বলছে। যন্ত্রের মতো কৃষ্ণচারি ডিগবাজি দিতে আরম্ভ করল। মনে তার হাসি: এইবার সময় আসবে, সুযোগ আসবে।

এর পরেই দোলনার খেলা আগুনের চাকা নিয়ে: খেলবে কুন্তলা আর কোদণ্ডরাও। দোলনা থেকে দোলনায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ছুঁড়ে দিচ্ছে আগুনের চাকা। চারদিকে হাততালি আর চীৎকার। মদের ঝোঁকে কৃষ্ণচারির মনে হল আগুনের চাকাটা যেন মাঝে মাঝে টুকরো টুকরো হয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। হঠাৎ তার মনে হল কে যেন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে: স্বপ্নে দেখা সেই মুখ, সেই বিষণ্ণ বিবর্ণ মুখ। চোখের কোটরে শুধু অন্ধকার! হাওয়ায় যেন ভেসে এল কয়েকটা কথা। কৃষ্ণচারি ক্ষেপে উঠল।

কোদণ্ডরাও খেলার মধ্যে একবার নিচে নামল। রাগে হিংসায় কৃষ্ণচারির মাথার ভেতরে হঠাৎ যেন একটা তীব্র যন্ত্রণা এল। ছুটে গিয়ে কোদণ্ডরাওয়ের পেটে দারুণ জোরে লাথি মারল। চারদিকে হাসির হল্লা—ক্লাউন্টার রকম দেখ! আচমকা আঘাতে কোদণ্ড-দুহাতে পেট চেপে মাটিতে পড়ল। তার হাত থেকে আগুনের চাকা ছিনিয়ে নিয়ে কৃষ্ণচারি লাফিয়ে উঠল দোলনায়। আবার হাসির ঝড়—ক্লাউনটার বাহাদুরি আছে! কিন্তু সার্কাসের লোকদের ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে, কুন্তলা সবচেয়ে উঁচু দোলনায় বসে ভয়ে কাঁপছে। কৃষ্ণচারি করছে কী! পাগলের মতো কৃষ্ণচারি আগুনের চাকা ছুঁড়ছে দোলনা থেকে, প্রাণপণ চেষ্টায় সে-চাকা ধরল কুন্তলা, ফিরিয়ে দিল কৃষ্ণচারির দিকে। ভয়ে তার চোখ বুজে গেছে—এবার সর্বনাশ। কিন্তু কী আশ্চর্য। দোলনা থেকে আর এক দোলনায় লাফিয়ে অদ্ভুত কায়দায় চাকা ধরে নিল কৃষ্ণচারি।

প্রথমে লোকেরা ভেবেছিল ক্লাউন্টা তামাসা করছে। কিন্তু তার চোখ মুখের ভাব দেখে এবার তারা ভয় পেল। মাটির ওপর কোদণ্ডরাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছে। সাজ-ঘরের মধ্যেও চাপা গলায় গোলমাল হতে লাগল। হঠাৎ কৃষ্ণচারির হাত থেকে আগুনের চাকা ছিটকে গিয়ে লাগল উঁচু একটি দোলনাতে, ঝুলে রইল সেইখানেই। ভয়ে কুন্তলা চীৎকার করে উঠল। তাঁবুর কাপড়ে আগুন

লেগে গেছে। চারদিকে গণ্ডগোল। চীৎকার: "আগুন লেগেছে, আগুন লেগেছে।" দর্শকরা সব ছুটে চলল তাঁবুর পর্দার দিকে ছোট ছেলেমেয়েরা ভিড়ের চাপে কাঁদছে। পাগলের মতো দোলনা থেকে দোলনায় ঝাঁপিয়ে পড়ছে কৃষ্ণচারি। জেগে উঠেছে সে, আর তার ভয় নেই, শরীরে তার অফুরন্ত শক্তি।

হঠাৎ কৃষ্ণচারি দেখল হাতে তার আগুনের চাকা নেই। অবাক হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখল দাউ দাউ করে আগুন জলছে, পোড়া তাঁবুর ফাঁকে অনেক ওপরে শাদা চাঁদ। হল কী! মদের ঘোর অনেকটা কেটে এসেছে, বুঝল তাঁবুতে অগুন লেগেছে। হঠাৎ কুন্তলা চীৎকার করে উঠল। একদিকের খুঁটি ভেঙে পড়ছে, জলন্ত তাঁবু সেদিকে ঝুলে পড়ল। চীৎকার শুনে কৃষ্ণচারি তাকিয়ে দেখল অনেক উঁচু দোলনায় কুন্তলা—সাপের মতো এঁকে বেঁকে আগুন চলেছে তার দিকে এগিয়ে। বিশ্রী আর্তনাদ করে দোলনা থেকে দোলনায় এগিয়ে চলল কৃষ্ণচারি। হাত ফসকে যাচ্ছে, কোনো মতে দোলনার কোণ ধরে লাফিয়ে চলল সে।

"কুন্তলা, পালাও, পালাও।" এতক্ষণে কুন্তলা যেন সচেতন হল। কিন্তু পরের দোলনা অনেক দূরে—সে দোলনা দুলিয়ে এগিয়ে দেবে কে? কৃষ্ণচারি কুন্তলার দোলনায় ঝাঁপিয়ে এল—দুলছে দুজনে একসঙ্গে। কৃষ্ণচারির মনটা হঠাৎ খুসিতে ভরে গেল: আজ দোলনার খেলোয়াড় সে, কোদণ্ডরাও নয়। আজ সে ম্যাজিক দেখায়নি। কুন্তলা কাঁদছে, লাফিয়ে লাফিয়ে আগুন এগিয়ে আসছে আর প্রাণের আশা নেই।

হঠাৎ কৃষ্ণচারির মাথায় বুদ্ধি খেলল: "কুন্তলা আমি ঝুলে পড়ছি, তুমি আমার পা ধরে পরের দোলনায় লাফিয়ে পড়ো।" কাঁপতে কাঁপতে কুন্তলা নেমে এল দোলনা থেকে দোলনায়। জমিতে পা ঠেকেছে, সে ছুটে চলেছে তাঁবুর পর্দার দিকে। আনন্দে কৃষ্ণচারি ছোট ছেলের মতো দোলনায় লাফাচ্ছে। বেরিয়ে গেছে তাঁবুর পারে, বেরিয়ে এসেছে নদীর ধারে লক্ষ ঘোড়ার সওয়ার।

একটা বিকট অর্তনাদ করে জলন্ত তাঁবুটা ভেঙে পড়ল।

শ্বেত চক্র

(রোমাঞ্চকর উপন্যাস)

কামক্ষীপ্রাসাদ চট্টোপাধ্যায়

মেধো'র বাড়ি

সেই ঝড়বৃষ্টির অন্ধকার রাতে পথে নেমে এসে প্রথমে সঞ্জীব কিছুই ঠিক করতে পারলো না: কোথায় এখন সে যাবে? কিন্তু ভাববার সময় অত্যন্ত কম। যা করার এখনি করতে হবে। একবার নিজের বাড়ির দিকে, একবার বৃষ্টি-ভেজা শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের দিকে চেয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে সে কী যেন ভাবলো। তারপর আর কোনো দ্বিধা না করে দ্রুত হাঁটতে লাগলো আধো-আলো আধো-অন্ধকার পথ ধরে।

খানিক এগিয়ে বাঁ-হাতের একটা সরু গলিতে সে ঢুকলো। আরো খানিক এগিয়ে একটি জীর্ণ ঝুরঝুরে অতি পুরনো বাড়ির একতলার দরজার শিকলটা নাড়লো।

বাড়িটা মেধো'র। মেধো আর তার মা থাকে এই বাড়িতে। আর কেউ না। তাদের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়, তাই চাকর-বাকর একটিও নেই। অনেক ভেবে এখানে আসাই সে ঠিক করেছে। পুলিশ তাকে আর যেখানেই খুঁজুক, এখানে খুঁজতে আসবে না।

মেধো'র মা'কে সঞ্জীব কাকীমা বলে। মেধো তাঁর একমাত্র সন্তান। আর কেউ তাঁর নেই। মেধো'র যে-রকম বুদ্ধি কম, তার মায়ের বুদ্ধি কিন্তু মোটেই সে-রকম নয়। বেশ চালাক বিধবা মহিলা। সঞ্জীবকে তিনি ভারি স্নেহ করেন। কয়েক বছর আগে মেধো'র যখন টাইফয়েড হয়েছিলো তখন সঞ্জীব দিন-রাত সেবা শুশ্রূষা করেছিলো। সে-কথা তিনি কোনো দিনই ভুলতে পারবেন না। সঞ্জীব না থাকলে তাঁর একমাত্র সন্তান যে আজ বেঁচে থাকতো না সে-কথা ভাবলেই তাঁর তু-চোখে জল এসে পড়ে।

দরজা খুলে মেধো'র মা বেরিয়ে আসতেই সঞ্জীব এক রকম জোর করেই ভিতরে ঢুকলো তারপর চাপা গলায় বললো, "কাকীমা! ভারি বিপদে পড়ে এসেছি। সমস্ত দিন বাড়ি ছিলুম না। একটু আগে বাড়ি ফিরে দেখি বাবা খুন হয়ে পড়ে আছেন। পুলিশ আমাকেই ধরতে চেষ্টা করছে। তাদের সন্দেহ আমিই নাকি খুন করেছি। কোনো রকমে আমি পালিয়ে এসেছি। আমাকে কি থাকতে দেবেন?"

ভদ্রমহিলা প্রথমটায় হকচকিয়ে গেলেন। পরের মুহূর্তে সঞ্জীবের হাত ধরে ঘরের ভিতর টেনে এনে বললেন, "নিশ্চয়ই বাবা! কিন্তু বাইরে আর নয়, কে জানে কে দেখে ফেলবে, যতদিন খুসি তুমি এখানে থাকো। তুমি যে কোনো অন্যায় কাজ করতে পারো না এ বিশ্বাস আমার আছে। আমাদের তুর্দিনে তুমি প্রাণপাত করে সাহায্য করেছিলে আর আজ তোমার বিপদে আমি কি সরে দাঁড়াতে পারি?"

মেধো অঘোর ঘুমুচ্ছিলো। সে উঠলে আবার অনর্থক হৈ-চৈ হল্লার সম্ভাবনায় কেউ তাকে ডাকলো না। মেধো'র মা ভিতর দিকের একটি ঘরে সঞ্জীবের বিছানা করে দিলেন তারপর এনে দিলেন এক বাটি গরম তুধ। খাবার প্রবৃত্তি তার ছিলো না। তবু কষ্ট করেই খেলো। সমস্ত দিনের পরিশ্রম এবং এই অসুস্থ উত্তেজনার পর গরম তুধ খেয়ে সঞ্জীব অনেকটা সুস্থ হোলো।

আবার সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। কোথাও এতোটুকু আলো নেই। বিছানায় শুয়ে চোখ মেলে সঞ্জীব জেগে রইলো। বাবা'র কথা বারবার তার মনে পড়তে লাগলো। বহুবার বহু বিষয় নিয়ে তার বাবা'র সঙ্গে নিজের মতের মিল হয়নি সত্যি, কিন্তু আজ রাতে হঠাৎ যখন সে আবার নতুন করে আবিষ্কার করলো তার বাবা'র সঙ্গে কোনোদিনও আর দেখা হবে না, তখন নিজেকে আর সে সামলাতে পারলো না। ছোটো ছেলের মতো সেই নির্জন ঘরে আকুল হয়ে কাঁদতে লাগলো।

তারপর বিছানার উপর উঠে বসে সেই অন্ধকার রাত্রে সে প্রতিজ্ঞা করলো তার বাবার হত্যাকারীকে যেমন করে হোক, যেখান থেকেই হোক খুঁজে সে বার করবেই, আর বাঁচাবে অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুলকে।

মনতোষকে চিঠি

পরের দিন সকালে মেধো খবরের কাগজ কিনে অনেলো।

প্রথম পাতায় সবচেয়ে বড় হরফে ছাপা হয়েছে গতকালকের খবর। সঞ্জীবের চেহারার বর্ণনাও তাতে রয়েছে এবং তাকে যে ধরে দিতে পারবে তার জন্যে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার ঘোষিত হয়েছে।

এসব খবরের জন্যে সে একরকম প্রস্তুতই ছিলো। তাই বিশেষ সে আশ্চর্য হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে এবং সত্যিকারের

আশ্চর্য হোলো চার নম্বরের চাক্তির কথা পড়ে। ধনঞ্জয় কেন ঐ চাক্তি পেলেন? ধনঞ্জয় তো জুরিদের মধ্যে কেউ ছিলেন না! তবে কি তার সমস্ত ধারণাই ভুল? এই সব হত্যাকাণ্ড কি অন্য কোনো হত্যাকারীর কাণ্ড যার সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের কোনো সম্পর্ক নেই?

ভাবনার তার শেষ নেই। গতকাল সমস্ত রাত সে ঘুমুতে পারেনি। অবসাদে সমস্ত শরীর ভেঙে পড়েছে সত্যি, তবু তু'চোখের পাতা সে এক করতে পারেনি। আজ সকালে খবরের কাগজ হাতে নিয়ে আবার সে নতুন করে ভাবতে লাগলো আর পায়চারি করতে লাগলো। সমস্তটা মিলেও শেষটা যেন মিলছে না। কোথায় যেন কি একটা জিনিস সে ছেড়ে যাচ্ছে। একটুর জন্যে আসল সত্যের নাগাল সে পাচ্ছে না।

কিন্তু সমস্ত ভাবনার আগে দরকার অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ এবং আসানুলকে সাবধান করে দেওয়া। কিন্তু কে তারা? তাদের ঠিকানা কী? কেমন করেই বা তাদের সাবধান করা চলে?···ভাবনার কি শেষ নেই? কিন্তু অত ভেবেও সে তো কোনো উপায় বার করতে পারছে না। কিন্তু উপায় একটা বার করতেই হবে, যেমন করেই হোক হবে। খুব তাড়াতাড়ি বার করা দরকার সেই উপায়।

মেধো কী বুঝেছে সে-ই জানে। কিন্তু সঞ্জীবকে সে যেমন ভয় করে তেমনি ভালোও বাসে। তাকে বলা হয়েছে সঞ্জীবের কোনো খবর ঘুণাক্ষরেও কাউকে সে যেন না জানায়। পাছে সে কারুর কাছে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে সেই ভয়ে বাড়ি থেকে বাইরে তাকে বড় একটা বেরুতে দেওয়া হচ্ছে না। মুখ শুকনো করে সঞ্জীবের দিকে সে জুলজুল করে চেয়ে আছে আর ভয়-মেশানো বিস্ময়ের সঙ্গে দেখছে সঞ্জীবের মুখের ভাব-পরিবর্তন।

সঞ্জীব পায়চারি করছে আর ভাবছে। হঠাৎ কি যেন মনে পড়ায় থমকে দাঁড়িয়ে সে বললো, "মেধো! তোকে একবার শ্যামবাজারে যেতে হবে। একটা চিঠি দিচ্ছি মনতোষের নামে। মনতোষকে চিঠিটা দিয়ে তুই বসে থাকবি। উত্তর পেতে দেরী হবে। যতক্ষণ না উত্তর পাস ততক্ষণ সেখান থেকে নড়িস না। উত্তর নিয়ে সোজা চলে আসবি।"

সঞ্জীবের কোনো আদেশ উপেক্ষা করার মতো মেধোর বুকের পাটা নেই। সে শুধু ঘাড় নাড়ালো।

একটি কাগজ দ্রুত হাতে সঞ্জীব চিঠিটা লিখলো। তারপর ভাঁজ করে খামে পুরে ভালো করে বন্ধ করে দিলো মেধোর হাতে। স্নানাহার সেরে মেধো তক্ষুনি বেরিয়ে গেলো। তাকে যে কেউ কিছু সন্দেহ করবে না এ-কথা সঞ্জীব ভালো করেই জানে। আর মেধো এমন ঘাবড়ে রয়েছে যে কারুর কাছে সে যে মুখ ফুটে কিছু বলবে সে সম্ভাবনাও কম। যদি বলে তা হলে অবশ্য সর্বনাশ। কিন্তু সব দিক ভেবে এটুকু বিপদের সম্ভাবনাকে মানতেই হোলো।

মনতোষ সঞ্জীবের সহপাঠী ও বিশেষ বন্ধু। তার বাবা নামকরা উকিল। মনতোষই একমাত্র লোক যে তার বাবার সহায়তায় সঠিক খবর বার করতে পারবে অনাদি হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুল সম্বন্ধে। মনতোষের উপর সঞ্জীবের অগাধ বিশ্বাস আছে। সে জানে টাকার লোভে অন্তত মনতোষ তাকে ধরিয়া দেবে না এবং তার এই বিপদে প্রাণ দিয়ে সে সাহায্য করবে।

সমস্ত দিন বৃষ্টির কামাই নেই। দিন হয়েও যেন সমস্ত দিনের মধ্যে রাতের ঘোর কাটলো না। ঝুপঝুপ করে অনবরতই জল পড়ছে। মাঝেমাঝে হু-হু করে বাতাস যাচ্ছে বয়ে। সমস্ত শরীর শীতে শিউরে ওঠে।

সমস্ত দিন সঞ্জীবের মনে বারবার কেবল ঘুরেঘুরে আসতে লাগলো চার নম্বর চাক্তিটার কথা। এতো লোক থাকতে—অনাদি, হৃদয়ররঞ্জন, বিশ্বনাথ আর আসানুল থাকতে—ধনঞ্জয় কবিরাজকে কেন ঐ চাক্তিটা পাঠানো হোলো? কে-ই বা দিলো? যে-সময় সবাই তারা

তার বাবার ঘরে জমা হয়েছিলো হত্যাকারীরও কি তখন ছিলো আশেপাশে কোথাও ? নিশ্চয়ই ছিলো, নইলে চাক্তিটা দিয়ে যাবে কে ? কিন্তু কে এই অদ্ভুত হত্যাকারী ? ধনঞ্জয়কে হত্যা করে তার লাভ কী ? ধনঞ্জয় কি তাকে চেনেন ? সেই ভায়েই কি তাঁকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে সে চায় ? যদি ধনঞ্জয় হত্যাকারীকে জানেন তা হলে পুলিশকে সে-কথা জানিয়ে দিচ্ছেন না কেন ? বললে কি তাঁর নিজের কোনো বিপদ হতে পারে ? কিন্তু মৃত্যুর চেয়ে বড় বিপদ তো কিছু নেই। এখনো তা হলে তিনি চুপ করে রয়েছেন কেন ?

টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে বসে সঞ্জীব ভাবতে লাগলো। ধীরে-ধীরে তার দেহ যেন নিস্তেজ হয়ে এলো। তারপর সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ালো তার মাথা। আর পর মুহূর্তে'ই গভীর ঘুমে সে আচ্ছন্ন হয়ে গেলো। এতো পরিশ্রম উত্তেজনা আর অনিয়মের পর পৃথিবীর যেখানে যতো ঘুম ছিলো সব যেন ছুটে এসে ভর করলো তার দেহের উপর। সঞ্জীবের এই দুর্বলতার সুযোগ নেবার জন্যেই এতোক্ষণ তারা যেন ঘুরঘুর করছিলো !

ঘুম ভাঙার পর

মেধোর মৃদু ঠেলা খেয়ে সঞ্জীবের যখন ঘুম ভাঙলো প্রথমে সে কিছুই তখন বুঝতে পারলো না। সে কোথায় রয়েছে, কেনই বা রয়েছে, কিছুই তার মনে নেই। কী ঘুমটাই সে না ঘুমিয়েছে ! এতো ঘুম যে কোথাও আছে সে খবর তার জানা ছিলো না।

সমস্ত দিনই দিনের আলো ঝাপসা ছিলো। এখন সেই ঝাপসা আলোও নেই। গোটা দিনটাই চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে কেটে গেছে !

মেধো আলো জ্বাললো। তারপর বুক পকেটের ভিতর থেকে অতি সন্তর্পণে একটি খাম দিলো বার করে। তাকে কথা বলতে বারণ করা হয়েছে বলে বাড়ি ফেরার পরেও কথা বলতে সে ভরসা পাচ্ছে না।

খামটা ছিঁড়ে এক নিশ্বেসে সঞ্জীব সেই ছোট্ট চিঠিটা পড়ে ফেললো। মনতোষ অদ্ভুত কাজের ছেলে ! নানাভাবে খোঁজ নিয়ে সে জেনেছে যে মৃতুঞ্জয়ের মামলার ব্যাপারে অনাদি, হৃদয়রঞ্জন, বিশ্বনাথ এবং আমানুল জুরি ছিলেন সত্যি কিন্তু আজ আর তারা কেউ বেঁচে নেই ! তাঁদের প্রত্যেকেরই মৃত্যু হয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে শেষে মারা গেছেন বিশ্বনাথ গতবছর টাইফয়েডে ভুগে।

চিঠিটা হাতে নিয়ে সঞ্জীব দাঁড়ায়ে উঠলো। এতোক্ষণ বিশ্রামের পর তার মাথার মধ্যেটা অদ্ভুত পরিষ্কার হয়ে গেছে। মুহূর্তে'র মধ্যে একটা কথা তার মাথার মধ্যে বিদ্যুতের মতো যেন বয়ে গেলো !—ঠিক, ঠিক তাই ! এতোক্ষণে সন্ধান সে পেয়েছে। হত্যাকারীকে চিনেছে সে ! হত্যাকারী ভারি চালাক, ভারি সাবধানী—তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু অতিরিক্ত চালাকী করতে গিয়ে সে ধরা পড়ে গেছে ! ধনঞ্জয়ের নামে শাদা চাক্তিটা পাঠানো খুবই চালাকী হয়েছে সন্দেহ নেই—কিন্তু একটু বেশী চালাকী করে ফেলেছে !

এখনই ধনঞ্জয়ের কাছে তাকে যেতে হবে। যেমন করেই হোক, যত বিপদই থাকুক না কেন—সে যাবেই। এ ছাড়া অন্য পথ নেই।

মেধো'র মা'কে সঞ্জীব বললো, "কাকীমা ! আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি বেরুচ্ছি। কিন্তু এবার মেধোকে আর কষ্ট দোবো না, আপনাকে কষ্ট দোবো। মেধো বাড়িতে থাকুক। আমি একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। আপনাকে নিজে হাতে কষ্ট করে এই চিঠি নিয়ে যেতে হবে। এ-ছাড়া উপায় নেই। হত্যাকারীর সন্ধান আমি পেয়েছি। কিন্তু আপনার সাহায্য না পেলে ধরতে আমি পারবো না।"

তিনি বললেন "নিশ্চয় বাবা, তুমি আমার মেধাকে বাঁচিয়েছিলে আর তোমাকে আমি সাহায্য করবো নয় ? যা বলবে তাই করবো।"

সঞ্জীব খসখস করে অনেকক্ষণ কী যেন লিখলো তারপর খামের উপর পরিষ্কার করে লিখলো একটি ঠিকানা।

ধনঞ্জয়ের বাড়িতে শিখ

বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

বৃষ্টি-ভেজা শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটের এখানে-সেখানে গ্যাসের আলো জ্বলে-উঠেছে। কিন্তু সেই অল্প আলোয় খুব ভালো করে কিছু নজরে পড়ে না। পথে লোকজন যথাসম্ভব কম চলছে। সমস্ত আবহাওয়া অস্বাভাবিক রকম ঠাণ্ডা।

ধনঞ্জয় কবিরাজের ঘরে আলো জ্বলছে। দূর থেকে সেই আলো একটি চাদর ঢাকা মূর্তি লক্ষ্য করলো।—যাক, কবিরাজকে ঘরের মাধ্যই পাওয়া যাবে। নিশ্চিন্ত হোলো সেই মূর্তি। সেই মূর্তি আর কেউ নয় : সঞ্জীব। বৃষ্টি-ভেজা এই রাত্রের অস্পষ্ট আলোয় তাকে একেবারেই চেনবার উপায় নেই।

ধনঞ্জয়ের বাড়ির কাছে শুধু একটি লোক ঘোরাঘুরি করছে। সঞ্জীব বুঝলো সে আর কেউ নয়—পুলিশের লোক, নিশ্চয়ই ধনঞ্জয়কে পাহারা দেবার জন্য সে মোতায়েন হয়েছে। তাকে এড়িয়ে কোনো রকমে কবিরাজের বাড়ি ঢুকতে হবে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই সুযোগ এলো। লোকটি অল্প দূরের পানের দোকানে গিয়ে ধনঞ্জয়ের বাড়ির দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত দড়ির আগুন থেকে সিগারেট ধরাতে লাগলো। বেশিক্ষণ অবশ্য সে পিছন ফিরে ছিলো না। কিন্তু সেই সময়টুকুই সঞ্জীবের পক্ষে যথেষ্ঠ। দরজাটা খোলাই ছিলো। ঠেলে ভিতরে ঢুকে ভিতর থেকে নিজে হাতেই বন্ধ করে দিলো সঞ্জীব। কিন্তু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখা যেতো সঞ্জীবের অসাবধানতায় ছিটকিটা ঠিক লাগেনি। বাইরে থেকে ঠেলা দিলেই খুলে যাবে।

ধনঞ্জয়ে নিচের ঘরেই ছিলেন। একটি চেয়ারে বসে গভীর মনোযোগ দিয়ে বই পড়ছিলেন। সঞ্জীবের পায়ের শব্দে এবং দরজার ছিটকি তোলার আওয়াজে তিনি চোখ তুললেন। চাদর খুলতে সঞ্জীবকে চিনতে পেরে তিনি বিস্মিত হলেন, কিন্তু চমকে উঠলেন না।

উঠে দাঁড়িয়ে শান্ত গলায় বললেন, "সঞ্জীব নাকি ? এসো-এসো। কেউ দেখতে পায়নি তো ?"

সঞ্জীব বললো, "না।"

"এঃ, চেহারা এ কী হয়েছে তোমার ? কোথায় লুকিয়ে ছিলে ? আমি জানতুম তুমি বুদ্ধিমান, অন্তত আমার কাছে লুকিয়ে আসবেই আসবে। আরো আগে আসা উচিত ছিলো।"

"সে-কথা জানি কবিরাজমশাই। কিন্তু কাল হঠাৎ যেন মাথা গোলমাল হয়ে গেলো। আমাকে ধরবার ভয় দেখাতে পালাতে বাধ্য হলুম। নিজের জন্যে নয়, অন্য চার জন ভদ্রলোককে বাঁচাবার কথাই ছিলো আমার মনের মধ্যে সবচেয়ে আগে। আমি অনেক কথা জেনেছি কবিরাজ-মশাই। আপনার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাই। তাই বিপদ মাথায় করেই এলুম। যে-চারজনকে বাঁচাবো ভেবেছিলুম খবর নিয়ে জেনেছি আগেই তাঁদের মৃত্যু হয়েছে।

ধনঞ্জয় কবিরাজ বললেন, "কালকেও তুমি যেন কাদের নাম বলছিলে। কোন ডাক্তারের কথাও যেন বলেছিলে। কিন্তু গোড়া থেকে সবটা না শুনলে আমি তো কিছুই বুঝতে পারবো না। একে-একে সব কথা আমাকে খুলে বল। কিন্তু তার আগে আমরা এ-ঘর থেকে উঠে দোতলার ঘরে যাই। তুমি বোধ হয় জানো না যে আমার নামে চার নম্বর লেখা একটা চাক্তি এসেছে। আমি বুড়ো হয়েছি, মরতে কোনো ভয় নেই। কিন্তু আমার চেয়ে দেখছি পুলিশের ভয়টাই বেশী। একজন পাহারাদার তারা ঠিক করেছে। আর আমি ঠিক বেঁচে আছি জানবার জন্য মাঝেমাঝে সেই ভদ্রলোক খবর নিয়ে যাচ্ছেন। খবর নিতে এসে তোমাকে দেখলে বোধ হয় ফল ভালো হবে না। তাই ওপরের ঘরে যাওয়াই ভালো।"

সঞ্জীব ববলো, "বেশ তো। ওপরে চলুন।"

তারা উপরে এলো। একটি চেয়ারে সঞ্জীবকে বসিয়ে

ধনঞ্জয় কবিরাজ বললেন, "কিন্তু আগে তুমি কিছু খাও। হয় গরম এক পেয়ালা কোকো কিংবা চা।"

সঞ্জীব দোতলার ঘরে বসে রইলো। সিঁড়িতে ধীরে-ধীরে মিলিয়ে গেলো ধনঞ্জয় কবিরাজের পায়ের শব্দ। পাশের জানালার কাঁচের ভিতর দিয়ে তাদের বাড়ির দোতলার ঘরটা দেখা যায়। ওই ঘরে তার বাবা থাকতো, ওই ঘরেই গতকাল রাত্রে সে খুন হয়েছে।

ভাবতে ভাবতে কেমম যেন অস্বস্তি হতে লাগলো সঞ্জীবের। সে চোখ ফিরিয়ে নিলো। ঘরের ভিতর জানালাটার ঠিক পাশে দেওয়ালের উপর একটা এয়ার-গান টাঙানো রয়েছে। আগেও অনেকবার সেটা সঞ্জীব দেখেছে। পাখী তাড়াবার জন্যে ধনঞ্জয় একবার ওটা কিনেছিলেন। বাইরে থেকে চোখ ফিরিয়ে সেটার দিকে নজর পড়তে সঞ্জীব আজ যেন নতুন করে সেটা আবিষ্কার করলো। দেয়াল থেকে সেটা পেড়ে নেড়েচেড়ে দেখার আগ্রহ তার হোলো। কিন্তু এই ছেলেমানুষী কৌতূহল দমন করলো। তারপর সিঁড়িতে আবার শোনা গেলো পায়ের শব্দ। দরজার কাছে এসে থামলো সেই শব্দ এক মুহূর্তের জন্যে তারপর ঘরে ঢুকলো।

আচমকা উত্তেজনায় সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো সঞ্জীব। কোথায় ধনঞ্জয় কবিরাজ? তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক দীর্ঘ-দেহী শিখ! মেধোর বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়: তার লাল দাড়ি, তার মাথায় ইয়া বড় পাগড়ি, তার গালে মস্ত বড় কাটার একটি দাগ! আরো একটি জিনিস লক্ষ্য করলো সঞ্জীব, মেধো যা দেখতে পায়নি। সেটা হোলো এই শিখের দু' চোখের চাউনি। যেন জলন্ত দু' টুকরো কয়লা ধ্বকধ্বক করছে!

"শুভ সন্ধ্যা সঞ্জীববাবু", কর্কশ তীক্ষ্ণ অথচ চাপা গলায় সেই শিখ বললো, বললো পরিষ্কার বাংলাতেই! "দাঁড়িয়ে উঠলেন কেন? বসুন!" তারপর সঞ্জীবের সামনে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পকেট থেকে শাদা গোল একটি জিনিস বার করে শূন্যে ছুঁড়েই আবার লুফে নিলো। "এটা কিছু নয়, সামান্য একটা হাতবোমা। নিজে হাতে বানিয়েছি। হাত ফস্কে মাটিতে পড়লেই আপনার আমার আর এই বাড়িটার কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না! নিতান্ত নিরীহ চেহারা বটে, ন্যাকড়ার পুঁটলির মতোই দেখতে—কিন্তু ভেতরটা সাজ্যাতিক! অনেকটা আমারই মতো!" বলে লোকটা হেসে উঠলো। তার হাসি শুনলে যে-কোনো লোকের সর্বাঙ্গ শিউরে ওঠে।

খুব ভালো করে সঞ্জীব সেই শাদা হাত-বোমটাকে লক্ষ্য করছিলো। লোকটির কথা বলা শেষ হলে নিঃশব্দে সে চেয়ারে বসে পড়লো তারপর অত্যন্ত সংযত গলায় বললো, "ধন্যবাদ। বসছি। কিন্তু আপনার হাতে বোমাই বা কেন আর ধনঞ্জয় কবিরাজেরই বা কী হোলো?"

"বোমা বোমার জন্যে। পিস্তলের চেয়ে অনেক বেশি আমি পছন্দ করি, বিশেষ করে নিজের জীবনের কোনো পরোয়া যখন আমি করিনা! আর ধনঞ্জয় কবিরাজ? তাঁর দেহটা নীচে পড়ে আছে বটে কিন্তু তিনি অনেক দূর চলে গেছেন।" বলে সেই শিখ আকাশের দিকে আঙুল তুলে বোঝাবার চেষ্টা করলো ধনঞ্জয় কবিরাজ কোথায় গেছেন।

"কিন্তু কবিরাজমশাইকে হত্যা করলেন কেন?"

"কারণ তিনি চার নম্বর লেখা শাদা চাক্তি পেয়েছিলেন।"

"সেই শাদা চাক্তি তো আপনিই পাঠিয়েছেন। কেন তাঁকে পাঠালেন বুঝলুম না। তিনি তো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের জুরিদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। জুরিদের চারজনের তো ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে। যে তিনজন বেঁচে ছিলেন তাঁদেরও তো আপনি শেষ করেছেন! তাই মৃত্যুঞ্জয় কবিরাজকে হত্যা করার কারন বুঝলুম না।"

"এ তো অতিশয় সোজা কথা! ভদ্রলোক গাছ-গাছড়ার খবর ছেড়ে এই খুনের ব্যাপার নিয়ে বড্ড বেশি মাথা ঘামাচ্ছিলেন। নিজেকে তিনি ভারি চালাক মনে করতেন। যদিও আমার কাজ শেষ হয়েছে, তবু আমার অসুবিধে করার জন্যে তাঁকে একটু শিক্ষা দিয়ে গেলুম।"

"ও, বুঝেছি! আপনিই তবে সেই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার"

শিখ আবার হেসে উঠলো। "আপনার বুদ্ধির তারিফ করছি সঞ্জীববাবু। যাক, পৃথিবীতে অন্তত একজন চালাক লোক আছে যে আমার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারবে! কিন্তু এইখানে আপনার একটু ভুল হয়েছে। অবশ্য তার জন্যে আপনাকে আমি দোষ দিই না। কিন্তু আমি মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার নই। তাঁর মৃত্যু হয়েছে—"

"কিন্তু আপনি যে-ই হোন, কোনো শিখ ভদ্রলোক নন। এটা আপনার ছদ্মবেশ।"

"ঠিক ধরেছেন। এটা আমার ছদ্মবেশ বৈকি। আমি সেই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের একজন নিকট বন্ধু। আমার হাতেই প্রতিশোধ নেবার ভার দিয়ে মৃত্যুঞ্জয় গিয়েছেন। আমি শিখও নই ভদ্রলোকও নই। ভদ্রলোক আজকের পৃথিবীতে কেউ আছে নাকি? সভ্যতাই বা আছে কি? সুবিচারই বা আছে কি? থাকলে মৃত্যুঞ্জয়ের জীবন কি এ ভাবে আজ ছারখার হয়ে যায়? অনর্থক একটি আশ্চর্য প্রতিভাবান ডাক্তারকে নির্মমভাবে জেল খাটানো হয় আর জেলের বাইরে তার স্ত্রী, তার ছেলেমেয়েদের একে-একে মৃত্যু হয় অভাব-অনটন আর অর্থাভাবে? যতবার এই সভ্য সমাজের বিচারের কথা ভাবি ততবার আমার মাথাতেও আগুন ধরে যায়। মনে হয় একে-একে সবাইকে শেষ করি, এই সভ্যতার পরিহাসকে ধূলোয় লুটিয়ে দিই!"

লোকটি যতক্ষণ কথা কইছিলো খুব মনযোগ দিয়ে সঞ্জীব শুনতে লাগলো তার কথা। আর ভাবতে লাগলো কী করে এই পাগলের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। একবার মেধো'র মার হাতে পাঠানো চিঠির কথাটা ভাবলো। একবার মনে হোলো যদি সেই চিঠির উপদেশ মতো কাজ না হয়, তা হলে? কিন্তু সবচেয়ে আগে দরকার এই লোকটিকে থামতে না দেওয়া। কথা বলতে-বলতে সে ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে। যতক্ষণ তার ঐ কথা বলার নেশা থাকবে ততক্ষণ সে নিরাপদ।

"আপনার কথা বুঝলুম। কিন্তু এখনো কয়েকটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা আছে। জয়ন্তবাবুর হত্যা কাণ্ডটা আমার কাছে পরিষ্কার। আপনিই শিখ সেজে বাড়ির চাবি নিয়ে সেই চোরা কুঠরিতে বিষাক্ত বোমা রেখে এসেছিলেন, তারপর টেলিফোনে পরিতোষবাবুকে বলেছিলেন আপনি আনন্দমোহন কথা কইছেন, চাবিটা যেন জয়ন্তবাবুকে দেওয়া হয়। তারপর জয়ন্তবাবুর মৃত্যুটা খুব আশ্চর্য লাগে না। কিন্তু রমেনবাবুকে কী করে হত্যা করলেন? তাঁর পিঠে যে ছুরি বিঁধেছিলে সেটায় তো কোনো হাতল ছিলো না!"

"ওঃ, এই ব্যাপার? এই সামান্য বিষয়টা বুঝতে পারছেন না?" বলে আবার হেসে সেই লোকটি পকেট থেকে কাঠের একটা হাতল বার করলো। "এই হাতলে একটা ফুটো আছে। সেই ফুটোয় ছোরার ফলার উল্টো দিকের স্টিলের ছুঁচলো অংশটা ঢুকিয়ে পিঠে বিঁধিয়েছিলুম। ছোরাটা শরীরে গেঁথে রইলো, তুলে আনবার সময় সেই হাতলটাই শুধু উঠে এলো।"

যতক্ষণ সে কথা বলছিলো তার মধ্যে বার দুয়েক সঞ্জীব তার মাথার উপর দিয়ে পিছনে চকিত দেখে নিলো। কথা শেষ হবার পর বললো, "বুঝলুম! কিন্তু অনেকক্ষণ সিগারেট খাইনি। একটা খেতে পারি কি?"

"স্বচ্ছন্দে," সেই লোকটি উত্তর দিলো, "কিন্তু পকেট থেকে সিগারেট আর দেশলাই শুধু বার করবেন, আর কোনো চালাকি করবেন না। হাত-বোমাটার কথা স্মরণ রাখবেন। ভারি সুবিধের এই জিনিসটা। টিপ করতে হয় না। হাত থেকে একবার মেঝেয় ফেলে দিলেই কাজ শেষ হয়।"

পকেট থেকে সিগারেট ধরিয়া সঞ্জীব দীর্ঘ একটি টান দিলো। তারপর প্রশ্ন করলো, "কিন্তু আমাকে নিয়ে কী করবেন তা তো বললেন না।"

আবার হোহো করে হেসে উঠলো সেই লোকটি। "আমার কাজ শেষ হয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের অনুরোধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। আবার আমি হাওয়ায়

মিলিয়ে যাবো। আমি কে, কোথা থেকে এসেছি, কোথায় বা গেলুম সে কথা আর কেউ জানবে না। কিন্তু যাবার আগে আপনাকে হাত-পা বেঁধে এই ঘরে ফেলে রেখে যাবো। আপনার মাথার কাছে থাকবে এই বোমা। নীচের তলায় গিয়ে পেট্রোল দিয়ে আগুন ধরিয়ে দোবো। মিনিট দশেকের মধ্যে আপনার আর কোনও চিহ্ন থাকবে না।—আপনিই একমাত্র চালাক লোক, ঠিক ধরেছিলেন। তাই আপনার পক্ষে পৃথিবীতে আরো না থাকাই মঙ্গল। কারণ মাঝেমাঝে আমি হাওয়ায় মিলায়ে যাবো, কিন্তু মাঝেমাঝে আবার আত্মপ্রকাশ করবো। দেখি বুদ্ধির লড়াইতে পৃথিবীর সমস্ত পুলিস আর জুরি আমার চুলের ডগা স্পর্শ করতে পারে কিনা!"

সঞ্জীব আরো দুয়েকবার সিগারেটে জোরে টান দিলো। তারপর হঠাৎ একটু উঁচু স্বরে বললো, "আসুন রঞ্জিতবাবু। আর অপেক্ষা করার দরকার নেই।"

চমকে ফিরে দাঁড়ালো সেই শিখ-বেশী লোক। কিন্তু ততক্ষণে দরজার পিছন থেকে রঞ্জিত তার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দিয়েছে। তার সঙ্গে আরো কয়েকজন পুলিশের লোক।

সঞ্জীব বললো, "যাক! চিঠিটা ঠিক সময়েই পেয়েছিলেন আর আমাকে বিশ্বাস করে এসেছিলেন! বাইরের দরজাটা খোলাই ছিলো, ঢুকতে আশাকরি অসুবিধে হয়নি। দরজাটা বন্ধ করার অভিনয় করেছিলুম মাত্র, আসলে ছিটকিনি লাগাইনি। কবিরাজমশাই আমাকে দেখে এতোই চমকে গিয়েছিলেন যে এই সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারটা লক্ষ্যই করেননি।"

রঞ্জিত বললো, "কিন্তু বোমাটা আগে সরিয়ে ফেলা দরকার।"

হেসে সঞ্জীব বললো, "কিছু ভয় পাবেন না! আসলে ওটা ন্যাকড়ার পুঁটলি, বোমা নয়। ভালো করে লক্ষ্য করে আমি দেখেছি। আসল বোমার বাইরেটা যথেষ্ট নিরীহ হয় সত্যি তবে ওরকম হয় না। এই শিখ ভদ্রলোককে সবাই আপনারা চেনেন, ইনি আর কেউ নন, স্বয়ং কবিরাজমশাই। একটা স্পঞ্জ জলে ভিজিয়ে এঁর মুখ আর দাড়ির ওপর ঘষলেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়বে। দাড়িগুলো হবে ধনঞ্জয় কবিরাজের শাদা দাড়ি আর মুখে কাটাদাগের কোনো চিহ্নই থাকবে না। সত্যিই তারিফ করতে হয়! এতো অল্প সময়ের মধ্যে এতো সুন্দর ছদ্মবেশ ধরা ভারি আশ্চর্য কাণ্ড, কোনো সন্দেহ নেই। কবিরাজমশাইকে বসতে দিন। অনর্থক দাঁড় করিয়ে রাখবেন না। কিন্তু এঁর আসল পরিচয় আপনারা বোধ হয় জানেন না। ইনিই হচ্ছেন আসল মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার। দশ বছর আগে দেওঘরে নিজের বাড়িতে আগুন দিয়ে ইনি পালিয়ে এসেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়-বাবু, আমার কোথাও ভুল হলে শুধরে দেবেন। সেই বাড়ির মধ্যে তিনি নিজে ছিলেন না। ছিলো এক তাল কাঁচা মাংস আর হাড় আর তাঁর হাতের সোনার আংটিটা। ফলে আগুন নেভবার পর পোড়া হাড় আর গলা সোনা দেখে কারুই সন্দেহ রইলো না মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের মৃত্যু হয়েছে বলে। তারপর দু বছর যে কোথায় তাঁর কেটেছে কেউ জানেনা। ভেবে নেওয়া কঠিন নয় সেই দুবছরের মধ্যে তাঁর দাড়ি গজালো। চুলগুলোও তিনি বড়-বড় করে রাখলেন। ফলে চেহারাটা একেবারেই বদলে গেলো। কিন্তু আমার বন্ধুর সাহায্যে মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের বিচারের সময়কার খবরের কাগজে ছাপা একটি ছবি আমি জোগাড় করেছি। এই দেখুন মিলিয়ে। দাড়ি-গোঁফ বাদ দিলে ধনঞ্জয় আর মৃত্যুঞ্জয় যে একই লোক সে-কথা বুঝতে কষ্ট হয় না। তারপর আট বছর আগে এই শঙ্কর মিত্র স্ট্রিটে আবির্ভাব হোলো কবিরাজ ধনঞ্জয় শর্মার।—জয়ন্তবাবুকে খুন করার ব্যাপারটা সবাই জানেন। সেই শিখ ভদ্রলোক আর কেউ নন, ধনঞ্জয় শর্মা নিজে। তারপর রমেনবাবুর হত্যাকাণ্ডও ঘটান ইনি নিজের হাতে। তার প্রমাণ এঁর পকেটেই রয়েছে—সেই ছোরার হাতলটা। তারপর এলো বাবার পালা।

এই জানলা দিয়ে আপনারা চেয়ে দেখুন—বাবার শোবার ঘরটা সম্পূর্ণ দেখা যায়। আর দেয়ালের গায়ে এই ছোট্ট এয়ার-গানটা লক্ষ্য করুন। অনুমান করা খুব কঠিন নয় যে ঐ বন্দুকের নলের ওপর ইনজেকশন দেবার ছুঁচে মারাত্মক বিষ লাগিয়ে এখান থেকে বাবার পিঠে টিপ করে ছোঁড়া খুব সহজ একটি ঘটনা! এতোদূর পর্যন্ত ইনি আশ্চর্য চালাকী দেখিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে বহু দিনকার পরিচয়ের সুযোগ নিয়ে আমাদেরই টাইপরাইটারে চিঠি ছাপা এবং আমাদেরই কলম এবং কালিতে শাদা চাক্তির ওপর নম্বর লেখা একমাত্র এঁর পক্ষেই সম্ভব। ফলে বরাবর সন্দেহটা এসে পড়ছে আমারই ওপর। কিন্তু তারপরেই মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার অত্যন্ত চালাকী করতে গিয়ে মস্ত ভুল করলেন। আমার ওপর সন্দেহ যাতে পুলিশের আরো দৃঢ় হয় সে জন্যে নিজেই নিজের ঘরের টেবিলের ওপর রেখেছিলেন ওই চার নম্বর লেখা চাক্তিটা। উনি যখন বাবাকে দেখতে আসার জন্যে গত কাল রাত্রে বাড়ি থেকে বেরোন সেই বেরুবার সময় চাক্তিটা তিনি রেখে গিয়েছিলেন। আর ওই ব্যাপারেই কবিরাজমশাইয়ের ওপর সন্দেহ আমার প্রথম হোলো। তাঁকে কেউ হত্যা করতে চাইবে কেন? তিনি তো ঐ জুরিদের মধ্যে কেউ ছিলেন না। তবে! এর একমাত্র কারণ হতে পারে আমাকে ধোঁকা দেওয়া এবং আমার ওপর পুলিশের সন্দেহ যাতে আরো দৃঢ় হয় তার ব্যবস্থা করা।—আমি নিজে খোঁজ নিয়ে যতটা জেনেছিলুম সে-কথা তো অল্প কথায়, রঞ্জিতবাবু, আপনাকে সমস্তটাই জানিয়েছি। আশাকরি শেষের দিকটা বুঝতে কোনো অসুবিধে হোলো না।"

চেয়ারের উপর সোজা হয়ে বসেছিলো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তার। সঞ্জীব থামলে একটু হেসে সে বললো, "হারলুম সত্যি। কিন্তু এ হারে আমার দুঃখ নেই। নিজের হাতে নিজেই আমি প্রতিহিংসা নিতে পেরেছি। এবার কিন্তু আমাকে কেউ আর ধরতে পারবে না, আবার ঐ বিচার আর জুরির প্রহসন ঘটতে আমি দোবো না।"

চেয়ারের উপর থেকে এক মুহূর্তের জন্যেও সে নড়লো না। শুধু তার মুখের ভিতর কুট করে কিসের যেন একটি শব্দ হোলো। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই নিস্পন্দ হয়ে ঢলে পড়লো মৃত্যুঞ্জয় ডাক্তারের দেহ। সে যে ছোট্ট শিশি করে মুখের মধ্যে মারাত্মক বিষ লুকিয়ে রেখেছিলো এ সন্দেহ আগে কেউ করতে পারেনি।

শেষ

দুটি কবিতা

ফল্গু কর

মেঘ ও রৌদ্র (পশ্চিম বঙ্গ)

সোনামখা রোদে আকাশ ছেয়েছে অনিমেষ চেয়ে থাকি
দিগন্ত যেন উড়ে-চলে-যাওয়া ডানা-মেলা নীল পাখী।
পায়ের তলায় সবুজ তৃণের কি বিপুল সমারোহ
ধবল ডানার বক উড়ে যায় মনেতে জাগায় মোহ।
ধ্বনি ওঠে কার দূরে বহুদূরে বুঝি ধান-ভাঙা গ্রাম
হিম-তীর্থের যাত্রী মেঘেরা চলিতেছে অবিরাম।
একটি ধুসর দলছাড়া মেঘ মাঝপথে গেল থামি
মাটির তৃষায় ধারা বর্ষণে ধরণীতে এলো নামি।
হেরি বুক-কাঁপা কাটবিড়ালীর ছুটোছুটি হল থির
আর্দ্র বাতাসে কাঁপন লাগিয়া থানকুনি শির শির।
রংচোরা এক টুনটুনি ছিল করবীর শাখে বসি
উড়ে গেল দূরে, হলুদ পাতারা বতাসে পড়িছে খসি।
কেটে গেল মেঘ, রোদ পেল রং আকাশ ইন্দ্রনীল
রূপালী জরির শাড়ীর মতন দূরে ঝিলিমিলি বিল।
সোনামাখা রোদ, বাতাস কোমল, নরম সবুজ ঘাস
আলো-ছায়া ঘেরা রঙীন আকাশে অনন্ত অবকাশ।

জলে থৈ থৈ (পূর্ব বঙ্গ)

পথ, মাঠ, ঘাট চিহ্ন কিছুই নাই
যেদিকে তাকাও জল আর শুধু জল
যেনরে প্রলয় পয়োধির পরে বসি
মেঘল পৃথিবী করিতেছে টলমল।
ডুব দিয়ে দিয়ে পাট কাটে ওই কারা
ধানক্ষেত সেও জলে ডুবে হল সারা
দূরে দূরে শুধু দ্বীপের মতন গ্রাম
বাদাম তুলিয়া চলে যায় নৌকারা।
লগি ঠেলি ঠেলি জোর করি ডিঙি চলে
ধানের ছরিরা সর সর করি ওঠে
হঠাৎ মেঘেরা দল ছাড়ি গেল চলি
দিক দিগন্তে আলোর জোয়ার ছোটে।
খালবিল যত হেসে ওঠে খিল খিল
শাপলা ফুলেরা দুধের সরেতে গড়া
নারিকেল আর সুপারি বোঝাই গ্রামে
রাত জেগে জেগে কাজ করে কিষানেরা।

* * *

মেঘ-নামা মেঘনা
চারিদিকে আঁধিয়ার নিঃসীম সন্ধ্যা।
অবিরল কালো জল ফনা তুলে খায় দোল
আলুথালু চারিদিক বাতাসেরা উতরোল।
হাল ধরে বসে আছে মেঘনার মাঝিভাই
নাও কাঁপে নাচে প্রাণ ভয় নাই ডর নাই।
ইলিসের মরশুম নৌকার ভরে খোল
চকচকে রূপে তার জিভে এসে যায় লোল।
ডুবু ডুবু মালভরা গয়নার নৌকো
শুধু তার দেখা যায় পাটাতন চৌকো!
ঘুম-ভাঙা জেলে-বৌ মন তার ভয় ভয়
মাঝি বুঝি এলো ফিরে রাত শেষ হয় হয়।

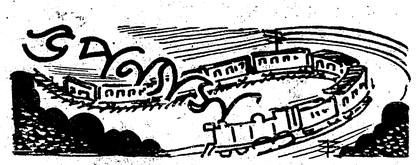

প্রেতের আহ্বান

প্রসাদ উপাধ্যায়

কিন্তু ভুত সম্বন্ধে যাদের রুচি নেই তাদের সম্বন্ধে ভুতেরও উৎসাহ নেই। তাই, এই প্রেতপুরীর মধ্যে অশোককে আবিষ্কার করা গেল দিব্বি সুস্থ এবং নিরাপদ শরীরেই। কিন্তু ওর সবটাই কি রকম যেন অদ্ভুত! কুন্থ আর ভবতোষ-বাবু যখন এ-ঘর ও-ঘর খুঁজতে খুঁজতে অবশেষে ওকে বের করলেন প্রতাপচন্দ্রের ড্রেসিং রুমের মধ্যে থেকে, ও তখন মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে অতি মনোযোগ সহকারে মাটিতে ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস দিয়ে কী যেন তন্ময় হয়ে খুঁজছে। প্রেত জিনিষটা যে সূক্ষ্ম এ কথা অবশ্য সবাই মানে, কিন্তু তাই বলে মাটিতে অমন ভাবে তাকে তল্লাস করতে হবে! ভবতোষবাবু অশোকের ছেলেমানুষি দেখে মনে মনে একটু হাসলেন। কিন্তু তারপরই অশোক যা সুরু করল তা দেখে হাসি আর মনে মনে চেপে রাখাও সম্ভব হল না: ড্রেসিং-টেবিলের তলায় একটা জলচৌকি মত ছিল, তার উপর টেবলটা বসানো। অশোক করল কি, পকেট থেকে একটা গজফিতে বের করে সেই চৌকিটা ঠিক কতখানি উঁচু তাই মাপতে সুরু করল! তাজ্জব ব্যাপার! "ভূতে ধরতে এসে এত মাপজোপ কিসের?" কিন্তু এ প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না অশোকের কাছ থেকে। ও শুধু গম্ভীরভাবে বলল "হুঁ! ভবতোষদার চেয়ে প্রতাপচন্দ্র কতটা লম্বা হবেন রে কুন্থ?" "তা প্রায় ইঞ্চি আষ্টেক হবেন বই কি!" "তাহলে ঠিক আছে। চলুন ভবতোষদা, বাড়ি ফেরা যাক। আজ একটু সকাল সকাল শুয়ে পড়তে হবে।"

"হঠাৎ সকাল সকাল শোওয়া আবার কেন?"

"মনে নেই, আজ অমাবস্যার রাত? এ রাতে ভুত বেরুবার কথা। তাই বলছি তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে সকাল সকাল শুয়ে পড়া ভালো। হুঁ। আর একটা কথা এ বাড়ির চাকর-বাকর দরোয়ান-টরোয়ান-কে বলে যেতে হবে খুব হুঁসিয়ার থাকতে, প্রতাপচন্দ্রকে শেষ পর্য্যন্ত ভুতে কোথাও ভুলিয়ে নিয়ে না যায়!"

ওরা তিনজন যখন রাস্তায় এসে পড়ল তখন আকাশে আর আলো নেই। বেশ অন্ধকার হয়ে এসেছে। অশোকের কি খেয়াল হল কে জানে: সমুদ্রের একেবারে পাশ দিয়ে জেলে পাড়া ভেদ করে একটু বেড়িয়ে তবে বাড়ি ফিরবে!

একটা নৌকো বালির উপর উবুড় করে ফেলে দুটো জেলে সেটাকে মেরামত করছিলো। হঠাৎ এ সম্বন্ধে অশোকের কৌতূহল যে কেন মাত্রা ছাড়িয়ে যাবার জোগাড় করল বোঝা গেল না।

"কিহে কর্তা, নৌকোটা মেরামত করতে লাগবে কতক্ষণ?"—অশোক ইতিমধ্যেই ভাঙ্গা ভাঙ্গা গোয়ানিস ভাষা রপ্ত করেছে!

"আর কতক্ষণ বাবু; সকাল থেকে ত এই নিয়েই পড়ে আছি,—মেরামত শেষ না করে আর জলস্পর্শ করছি নে।"

"তা বেশ! তা হলে জোয়ার আসার আগেই কাজ শেষ হবে?"

"নিশ্চই।"

"তাহলে, জোয়ার এলে এই নৌকো নিয়েই ঢেউ ভেঙ্গে এগুতে পারবে, কি বল?"

"তা যদি না পারি তা হলে এই মাঝিপাড়ায় সর্দ্দার নামে যে কলঙ্ক পড়বে।"—জেলের গলায় রীতিমত বীর-রস।

"তা বেশ; তা বেশ। কিন্তু একটা কথা, আজ রাতে আর না হয় মাছ নাই ধরলে।"

এ আবার কোন ধরণের অনুরোধ? কুনু আর ভবতোষবাবু—দুজনেরই চোখ গোলগোল!

"সে কি কথা বাবু? মাছ না ধরলে পেট চলবে কেমন করে?"

"আহা, তার বন্দোবস্ত আমি করছি"—বলতে বলতে অশোক জেলেব হাতে একটা পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিল।

এ আবার কি ভুতুড়ে ব্যাপার! চারজোড়া ফ্যালফ্যালে চোখ অশোকের উপর।

"ঘাবড়াচ্ছো কেন?" অশোক বলল—"এই পাঁচ টাকা অগ্রিম দিয়ে তোমাদের নৌকোটা এক রাতের জন্যে ভাড়া করলুম। তার মানে এইখানে নৌকো নিয়ে কাল সকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না সমুদ্রে আবার ভাটা আসে। রাতে সমুদ্রে জোয়ার এলে হয়ত একটু নৌকোয় বেড়াবার খেয়াল হতে পারে, আর তখন ঠিকমত বেড়িয়ে আসলে দেখবে কী রকম মোটা বকশিষ মেলে।"

বিহ্বল জেলেদুজনকে পেছুনে ফেলে কুনু আর ভবতোষ-দার সঙ্গে অশোক বাড়ি ফিরল। জেলেদের সঙ্গে কথাবার্তার পর কে যেন তার মুখে একদম চাবি বন্ধ করে দিয়েছে, একেবারে কথা বলতে চাইছে না।

চুপচাপ খেল। তারপর তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করল। কেবল তার আগে একজনের প্রতি ছোট্ট একটা অনুরোধ—"দিদি, শোবার আগে খুব কড়া করে কালো কফি তৈরি করে দুটো ফ্লাস্ক-এ ভরে রেখো। দেখো, যেন দুধ-চিনি মিশেল দেওয়া না হয়।"

ব্যাস। আর কিছু নয়।

রাত কত হবে বোঝা যায় না। শুধু কালো আর জমাট বাঁধা অন্ধকার। ধড়মড় করে বিছানার উপর উঠে বসল কুনু, বলল—"ব্যাপার কি?"

"কিছু নয়। এখুনি বেরুতে হবে; তৈরি হয়ে নে।" অশোক বলল, তারপর একটু হেসে—"ঘুম ভাঙ্গালুম বলে চটলি না কি?"

চোখ রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসে কুনু আবার সেই প্রশ্নই করল—"ব্যাপার কি?"

"কিছুই নয়। যা আশা করেছিলুম তাই। প্রতাপ-চন্দ্রকে ভুতে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছে; উদয়ভবনের দারোয়ান একটু আগে সুখবরটা এনেছে।"

ঘুম চোখে একটা প্রকাণ্ড বর্মা চুরোট ধরালেন ভবতোষবাবু। দিদি কুনুর হাতে কড়া কফির ফ্লাস্ক দুটো তুলে দিলেন। অশোকের হাতে তার সেই বিপদ-তারণ ব্যাগ!

কটা বেজেছে কেউ ঠিক ঠাহর করতে পারল না। উৎসাহও যেন কারুর নেই। যটাই বাজুক: আসল কথা হল প্রতাপচন্দ্রকে খুঁজে বের করতে হবে। কিন্তু কোন দিকে? অশোকের কি মাথা খারাপ হল না কি? সোজা সমুদ্রের কোল ঘেঁষে টর্চের বোতাম টিপে এগিয়ে চলল জেলে-পাড়ার দিকে। ভুতে কি শেষ পর্য্যন্ত প্রতাপচন্দ্রকে জেলে পাড়ায় ঠেলে দিল?

সে যাই হোক; দেখা গেল টাকার লোভ বড় ভয়ানক লোভ। পাঁচ টাকা হাতে পেয়ে এবং আরও অনেক টাকার আশা পেয়ে দুজন জেলেই সমুদ্রতীরে নৌকো নিয়ে প্রস্তুত। অশোক যেন সবই জানত, যেন ওরই গাড়ি নিয়ে

ড্রাইভার দোর খুলে অপেক্ষা করছে। সে উঠে বসল নৌকোয়, কুনুও উঠল, আর তারপর ভবতোষবাবু। প্রতাপচন্দ্রের দরোয়ান ফ্যালফ্যাল করে বালির উপর দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল, দেখতে লাগল ঢেউএর সঙ্গে ধস্তাধস্তি করে ছোট্ট নৌকো অন্ধকার সমুদ্রে মিশিয়ে যাচ্ছে।

"কিন্তু যাবে কোন দিকে? ব্যাপার কি?" ভবতোষ-বাবু এতক্ষণ পরে প্রশ্ন করলেন।

সে ভাবনা অশোকের। যে দিকে গেলে বোম্বাই সহর পাওয়া যাবে তার ঠিক উলটো দিক বরাবর যাবার নির্দেশ দিলো। সমুদ্রের জোয়ারের সঙ্গে লড়াই করার দারুণ পরিশ্রমের মধ্যেও মাঝি দুজনের ঠোঁটে নিশ্চয়ই মৃদু হাসি ফুটে উঠেছিলো,—মাঝ-রাতে পাগলা বাবুর খেয়াল হাসি। তবে অন্ধকারে সে হাসি কারুর চোখে দেখে পড়ে নি।

কুনু অবাক হয়ে সমুদ্র দেখছিলো। বিরাট জমাট বাঁধা অন্ধকারের মধ্যে মাঝে মাঝে ফসফরাসের রূপোলি আগুন। সব মিলে একটা ভয়ানক বড় দৈত্যের মত মনে হয়। এ রকম অভিজ্ঞতা তার জীবনে হয় নি। হবে বলে হয়ত আশাও করে নি। কোলের উপর কফির ফ্লাস্ক নিয়ে চুপচাপ বসে রইলো।

আর ভবতোয়বাবু জড়োসড়ো হয়ে চুরুট টানছিলেন। চুরুটের আলোয় তাঁর চোখমুখ মাঝে মাঝে জ্বলজ্বল করে উঠছিলো।

হঠাৎ অশোকের হাতে জ্বলে উঠল তীক্ষ্ণ আর তীব্র টর্চ। সমুদ্রের বুকের অন্ধকার চীরে আলোর বর্শা কী যেন খুঁজতে সুরু করল। ক্রমে চঞ্চল আলো স্থির হয়ে দাঁড়ালো একটা ছোট পাথরের দ্বীপের উপর; সেই দ্বীপে পুরোনো প্রাসাদ, বহু বছরের ঘা খেয়ে আজ সে প্রাসাদ জীর্ণ-প্রায়।

অন্ধকারে থমথম করছে বাড়িটা।

ওই বাড়িতে যেতে হবে? মাঝিরা দেখলে বাবুর পাগলামী এবার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। এই ঘোর অমাবস্যার রাতে ওই বাড়িতে? কে না জানে ওটা একটা হানাবাড়ি, আর হানাবাড়ি বলেই ত' স্বয়ং মালিকও ওখানে টিঁকতে পারেন নি—অনেক দূরে সরে গিয়ে সান্তা ক্রস-এ নিজের নতুন বাড়ি তৈরি করেছেন। সে বাড়ির নাম উদয়ভবন।

কিন্তু অশোকের হালচালে এমন দৃঢ়তা ফুটে উঠছে, তার কথায় বার্তায় এমন তীক্ষ্ণ একটা আদেশের সুর, যে উপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাঝিরা নৌকোর হাল বাঁকালো। কিন্তু এই জোয়ারের সময় বাড়ির চারদিকেই ত' জলে ভেসে গিয়েছে, কোন দিক দিয়ে গিয়ে কোথায় নৌকো বাঁধা যায়?

সে ভাবনা অশোকের। "এই বাড়ির নীচে কোথাও একটা গোপন পথ আছে। যে পথ দিয়ে আগে নাকি বাটলীওয়ালা বংশের পূর্বপুরুষরা গোপনে জলদস্যুর ব্যবসা চালাতেন। সেই পথ খুঁজে বের করতে হবে, সেখান দিয়ে ঢুকে যে সুড়ঙ্গ পাব সেই সুড়ঙ্গেই খুব সম্ভব প্রতাপচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যাবে।"

টর্চের তীব্র আলোয় পথ খুঁজতে খুঁজতে সুড়ঙ্গ বেরুলো; আর বেরুলো প্রতাপচন্দ্রের অচৈতন্য দেহ! অশোক কি যাদুকর হয়েছে? কেমন করে জানলো? কিন্তু সে সব ভাবনা পরের কথা, আপাতত কুনু আর অশোকের একেবারে দম নেবার পর্য্যন্ত সময় নেই। ধরাধরি করে প্রতাপ-চন্দ্রের অচৈতন্য দেহ উপর-তলায় তুলে শুইয়ে দেওয়া হল। অশোক ব্যাগ্রভাবে নাড়ী পরীক্ষা করল, বলল—"যাক, খুব বেশী দেরি হয় নি। অতিরিক্ত পরিমাণ আফিম পেটে পড়েছে বটে কিন্তু এখনো সময় আছে।"

তারপর নানান কাণ্ড! বমি করানো। ইনজেকসন দেওয়া। কালো কফি খাওয়ানো।

ঘণ্টা কতক পরে চোখ মেললেন প্রতাপচন্দ্র। তখন আকাশে সূর্য্য উঠেছে।

* * *

বিকেলে উদয় ভিলায় প্রতাপচন্দ্রের শোবার ঘরে ক্ষীণ দুর্বল শরীরে প্রতাপচন্দ্র শুয়ে আছেন। ডাক্তার নার্স-এ

ঘর ভরতি। ঘরে ঢুকলো অশোক আর কুন্থ আর ভবতোষবাবু।

"আমি কিছু বুঝতে পারছি না, অশোকবাবু"—প্রতাপচন্দ্র বললেন।

"বুঝিয়ে বলছি শুনুন"। স্থরু করল অশোক, "প্রথম কথা হচ্ছে, খাতাটায় ঝুটো দাগ দেখে বেশ পরিষ্কার বুঝতে পারা গেল এর পেছুনে কোনো মানুষের মগজ রয়েছে। প্রেতের নয়। মানুষের মগজ যদি থাকে তা হলে একটা স্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকা ত দরকার। উদ্দেশ্য কি হতে পারে? আপনাকে অলৌকিক ব্যাপারে শুধু বিশ্বাসী করে তোলাই নয়, অলৌকিক অভিশাপের অংশিদার করে তোলাও। কিন্তু আপনার মত তীক্ষ্ণবুদ্ধি লোক স্বচক্ষে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। তাই স্বচক্ষে দেখাবার বন্দোবস্ত হল।"

"সেটা কেমন করে হল?"

"বলছি শুনুন। আপনার ড্রেসিং টেবিলের ডান দিককার আয়নাটার কাঁচটা বাঁকা, যেমন অনেক দাড়ি কামাবার আয়নায় থাকে, অর্থাৎ তাতে প্রতিবিম্ব পড়ে উল্টো ভাবে। এবং ড্রেসিং রুমের ঠিক দোরের উপর যে আলো সেটা এমন ভাবে বসানো যে স্বইচের সামনে দাঁড়িয়ে আলো জ্বালালে শুধু মুখটার উপরই আলো পড়ে। সেই মুখের প্রতিবিম্ব আয়নায় উলটো ভাবে দেখে আপনি স্থর্যপূজারীর মুখ বলে মনে করেছিলেন।"

"কিন্তু তা হলে' প্রথম দিন থেকেই ত দেখতে পেতুম! শুধু অমাবস্যার রাত কেন?

"কারণ, আপনি বেশ লম্বা আছেন এবং ড্রেসিং টেব্‌লটা বেঁটে। তাই অমাবস্যার সন্ধ্যাবেলায় ড্রেসিং টেব্‌লটাকে জলচৌকির উপর বসানো হত। আপনি লক্ষ্য করেন নি। কিন্তু আমি জলচৌকিটাকে মেপে দেখেছি, ঠিক আপনার মাথার মাপ হিসেব করে সেটা তৈরি। ঘরের মেঝেতেও ধূলোর দাগ ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করে বোঝা যায় জলচৌকিটা বরাবর ড্রেসিং টেবল ঘাড়ে করে দাঁড়ায় না। মাসে একদিন করে দাঁড়ায় মাত্র।"

"কিন্তু সেই নীলচে আলো ভরা বাদুড়?"

"সেটা সম্ভবত সত্যিই বাদুড়, তবে ফসফরাসে চুবিয়ে নেওয়া বোধ হয়। নিশ্চয়ই আপনার অনুপস্থিতিতে ঘরে বেচারাকে বন্দী করা হত, দোর খোলার সঙ্গে সঙ্গে উড়ে বেরিয়ে যেত।"

"কিন্তু কে? কে এমন চক্রান্ত করেছিলো?"—ভবতোষবাবু অসহিষ্ণু ভাবে বলে ওঠেন।

"বলছি। সে যাই হোক, তার বুদ্ধির তারিফ না করে পারিনে'। কী নিখুঁত ভাবে সব প্লান করেছে বলুন? প্রথমত প্রতাপচন্দ্রকে স্বচক্ষে প্রেত প্রদর্শন করানো; তারপর বংশ ইতিহাসের সঙ্গে এই প্রেতকে জড়িয়ে ফেলে তাঁর মাথায় ঢোকানো যে অতীত অভিশাপের দেনা শোধ না করে উপায় নেই। খাতায় আফিম ধরার কথাটাও কত খানি হিসেব করে লেখা—লেখক জানতেন এত দিক থেকে প্রতাপচন্দ্রের মনকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে যে তাঁর পক্ষেও এই আফিম না ধরে উপায় নেই। এবং শেষ পর্যন্ত একদিন স্বপ্নচালিতের মত সেই স্থড়ঙ্গে ঢুকে আফিম খেয়ে আত্মহত্যা প্রতাপচন্দ্রকে করতেই হবে—কেননা দিনের পর দিন তাঁর মন এমন দুর্বল হয়ে পড়বে যে তখন খাতার হিসেব থেকে এক পা এদিক ওদিক হওয়া আর সম্ভব নয়। আমি কাল প্রতাপচন্দ্রের কথাবার্তা থেকে বুঝেছিলুম সেই সাংঘাতিক রাত উপস্থিত হয়েছে; পাছে জোয়ারের জন্যে পুরোনো বাড়িতে ঢোকা সম্ভব না হয় তাই নৌকোর বন্দবস্তও করেছিলুম।"

"সব ত' বুঝলুম কিন্তু, আসামীটা কে বলছ না কেন?" অত্যন্ত অধীরভাবে বলে উঠলেন ভবতোষবাবু।

"তাও বলে দিতে হবে? সবই ত বললুম। আপনারা বুঝে নিন।"

"কি আশ্চর্য! নামটা না বললে বুঝব কেমন করে?"

"কেন? প্রতাপচন্দ্র আত্মহত্যা করলে বা অন্তত পাগল হয়ে গেলে কার লাভ? কে সম্পত্তি পাবে?"

"সম্পত্তি পাবার যে লোক সে যে সম্পত্তি চায় না।

কেননা প্রতাপচন্দ্রের একমাত্র আত্মীয় ধীরবিক্রম, এবং সম্পত্তি পাবার চেয়ে সম্পত্তির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে সে অনেক বেশী পাগল।"

"কিন্তু সেইই!" অশোক বলল!

অশোকের কথা যেন ঘরে বজ্রপাত করল।

"অসম্ভব!" এক সঙ্গে প্রতাপচন্দ্র আর ভবতোষবাবুর উত্তেজিত চীৎকার।

অশোক শুধু মৃদু হাসতে লাগলো।—"সম্পত্তির আর কোন ওয়ারিশ নেই, তখন এ চক্রান্তের পেছুনে আর কারুর কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না। সময় পেলে ধীরবিক্রম-বাবুকে আমি নিশ্চই বোম্বাই সহরেই খুঁজে বের করতে পারবো। আমার বিশ্বাস এ বাড়ীতেই তিনি থাকেন।"

এ একেবারে আজগুবি কথা! অশোক যত ধুরন্ধর বুদ্ধিমানই হোক না কেন, তাই বলে যা খুশী বলবে? অথচ এইমাত্র অমন বিপদ থেকে উদ্ধার করেছে; কিছু বলাও যায় না!

কিন্তু বলতে আর হলনা কাউকে। বাড়ির ভৃত্য একটা চিঠি নিয়ে উপস্থিত, দেউড়ির দরোয়ান নাকি খানিক আগে বাড়ি ছেড়ে যাবার সময় চিঠিটা ভৃত্যের হাতে দিয়ে গিয়েছে বাবুকে দেবার জন্যে।

প্রতাপচন্দ্র চিঠিটা পড়ে চললেন—

"প্রতাপ, আমি চল্লুম দেশ ছেড়ে; আমার জাহাজ ছাড়বে আধঘণ্টা পরে। ফলে আমায় ধরতে পারবে না। চলে যাচ্ছি; কেননা আমার সমস্ত প্ল্যান ভেস্তে গেল। দেখলুম বাঙ্গালী গোয়েন্দা আমার চেয়ে চালাক। তবু তাঁকে ধন্যবাদ জানাই; কেননা সম্পত্তির লোভে ভাইকে খুন করবার যে চক্রান্ত করেছিলুম সত্যিই তাতে মনে মনে একটা দারুণ বিবেক-দংশনও ভোগ করছিলুম। অশোকবাবু আমায় অন্তত তার হাত থেকে বাঁচিয়েছেন, সেজন্যে কৃতজ্ঞ। আমায় আর বিশ্বাস করা সম্ভব নয়; তবু একটা কথা বিশ্বাস করতে অনুরোধ করি: প্রথম দিকে সত্যিই আমার এ অভিসন্ধি ছিলো না। তোমার ওই বিরাট সম্পত্তির স্বাদ না পেলে সম্পত্তির লোভই আমার হয়ত হত না। দিব্বি ছিলুম লক্ষ্ণৌতে খেলাধূলো নিয়ে।

"যাক ওসব কথা। তোমার কাছে ক্ষমা চেয়ে লাভ নেই; কেননা, জানি তোমার কাছ থেকে ক্ষমা পাবার যোগ্য নই। তবে, বিদেশ যাবার পথখরচার জন্যে যে সামান্য টাকা তোমার বাড়ি থেকে নিয়ে যাচ্ছি সেটুকু আমার রোজগারের টাকাই: এতদিন ধরে তোমার দেউড়িতে দরোয়ান সেজে পাহারা দিয়েছি, তারই জমানো মাইনে।

ক্ষমা তুমি করতে পারবে না, তবু আবার ক্ষমা চাইছি।

তোমার
ধীরবিক্রম।"

চিঠির শেষটুকু পড়তে পড়তে প্রতাপচন্দ্রের গলা ভিজে এল।

ফস করে প্রশ্ন করল অশোক—"আঃহা, ঠিকানাটা দিয়ে যান নি, না?"

"ফেরারী আসামী কি ঠিকানা রেখে যায়?"—ভবতোষবাবু একটু বিদ্রূপ মাখিয়েই প্রশ্নটা করলেন।

"নাঃ, ঠিকানাটা দিয়ে গেলে একটা ভালো উপদেশ লিখে পাঠাতে পারতুম: ভূতের গল্প ফাঁদতে তিনি যখন অমন ওস্তাদ তখন বিদেশ গিয়ে উনি যদি শুধু ভুতুড়ে গল্প লেখেন তা হলে বলা যায় না প্রতাপচন্দ্রের এখানে যা টাকা আছে সেটুকু হয়ত তিনি অনায়াসেই অল্পদিনে উপার্জন করতে পারবেন। ওদের দেশে শুনেছি লিখে বেশ দু পয়সা রোজগার করা যায়!"

শেষ

শিক্ষার চাকা

কৃষ্ণচন্দ্র লাহিড়ি

সকালবেলা :

সাধারণ সেনাবিত্যালয়ের প্রশস্ত হল-ঘর। ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষক ফ্রাইকভ্ ঘরে ঢুকেই প্ল্যাট্ফর্মের ওপর সোজা উঠেই প্রশ্ন আরম্ভ করলেন : "আচ্ছা, বলো দেখি, কোথায় কোথায় 'কমা' ব্যবহার করতে হয়? ওহে কমরেড্ জুরাভ্লেন্কো, এসো তুমিই এসো, বোর্ডে এসে নিয়মটা একবার লিখে ফেলো তো।"

জুরাভ্লেন্কো-র গাল দুটি লাল, বেশ শক্ত ঘাড়, বুকে তার ভোরোশিলভ্-ব্যাজ্—অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীর চিহ্ন। বোর্ডের কাছে এসে সে লিখতে লাগল : "হুইচ্, হোয়াট্, ইফ্ ইত্যাদি শব্দগুলোর আগে 'কমা' ব্যবহার করা হয়। আরো কয়েক জায়গায় কমা-র ব্যবহার আছে ; যথা……"

দুপুর একটা :

টিচার্স্ ট্রেনিং কলেজের ক্লাস্-রুম্। সকালের শিক্ষক ফ্রাইকভ্ এখানে ছাত্র, বেঞ্চে বসে এক মনে অধ্যাপক পসিয়াগ্যাট্স্কি-র ধনবিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনছেন।

"আমার যতো দূর মনে পড়ে, গত সপ্তাহে আমরা ভূমি-কর বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করেছি। বলো তো কম্রেড্ ফ্রাইকভ্, রিকার্ডো, অ্যাডাম্ স্মিথ্ ইত্যাদি অর্থবিদ্রা ভূমি-করের কী সংজ্ঞা দিয়েছেন?"

বিকেল ছ'টা :

মস্কো আর্টস্ অ্যাকাডেমি-র সেমিনার্-রুম্। ঘরের এক দিকে বসে আছেন দুপুরের অধ্যাপক পসিয়াগ্যাট্স্কি, বহু যত্নে গবেষক ফসিল্-এর বক্তৃতার নোট্ নিচ্ছেন। ফস্-ফস্ করে নোট্-বইয়ের পাতা উলটে যাচ্ছে। অধ্যাপক ফমিলের গবেষণার বিষয় হচ্ছে : 'লুড্ভিগ্ ফয়ারবাখের দার্শনিক মতবাদের ভিত্তি।'

রাত ন'টা :

সায়েন্টিষ্ট্ ক্লবের সামনে খেলার মাঠ। মাঠে অনেক খেলোয়াড়ের মধ্যে বিকেলের গবেষক ফমিল্কেও দেখা যাচ্ছে। তিনি বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে লক্ষ্যভেদ শিখছেন। ডান কাঁধের ওপর রাইফেল, চোখ রয়েছে দূরে টার্গেটের দিকে।

ফমিলের পিঠে হাত রেখে পাশে দাঁড়িয়ে আছে সকালের সেই জুরাভ্লেন্কো, বুকে তার ভোরোশিলভ্-ব্যাজ্—অব্যর্থ লক্ষ্যভেদীর চিহ্ন।

জুরাফ্লেন্কো ধমকে উঠ্ল : "কম্রেড্ ফমিল্, সোজা হয়ে দাঁড়াও, কাঁধ খাড়া করো। কাঁধের ওপর শক্ত করে বন্দুক ধরতে শিখলেই লক্ষ্য স্থির করতে পারবে। এরকম বেঁকে দাঁড়ালে কোনো কালে গুলি-ছোঁড়া শিখ্তে পারবে না।"

অ্যাকাডেমিসিয়ান্ ফমিল্ সুবোধ ছাত্রের মতো শিরদাঁড়া সোজা করে বুক ফুলিয়ে দাঁড়ালেন, বন্দুকের গোড়াটি ডান কাঁধের ওপর চেপে ধরলেন।*

* মস্কো ইন্টার্-ন্যাশ্নাল্ লিট্রেচার্ থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

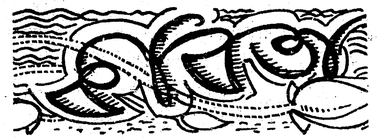

তিনটি কবিতা

পরিমল রায়

বর

চেহারায় কার্তিক
আচারেতে সাত্ত্বিক,
মনে ভার-ভার্তিক বরটি,
শালীরা না পায় যুত
বলে, "এ যে কিম্ভূত!"
বর নাহি দেয় উৎ-তরটি।

মাস্টার

যত বলি, "হতে থাকে দশ কড়া,"
বলে অতি-মুখরা,
"দশ নয়, দু'কড়া,"
ছাত্রীটি তাই নিয়ে তত করে মশকরা।
অবাধ্য ছাত্রীকে দায় হল বশকরা!

বিয়ে

বিবাহের সুরুতে
লাগলো দু'পুরুতে,
এ বলে, 'দাদানি', ও বলে, 'দদে,'
পাণ্ডিত্যে এ-ওর প্রাণে বাধে!
গোধুলিতে ছিলো লগ্ন,
সেটা বুঝি হয় ভগ্ন,
বাজতে আটটা দু'টি গাঁট্টা ঘনায় বরের ভুরুতে!

একটি সকাল

পৃথ্বীশ রায়চৌধুরী

ভোর হ'চ্ছে। ভোর তো সব জায়গাতেই হয় ; কিন্তু আমি যেখানকার কথা বলছি সেটা একটা গ্রামের কোনো নির্জন জায়গায়, বাঁশ-নারকেল আর সজনে গাছ-ঘেরা একটা মাঝারি আকারের পুকুর-পাড়। এ' পুকুরের জল খুব পরিষ্কার কিন্তু তবু বেশী কেউ ব্যবহার করেনা। পুকুরের কাছেই মানুষের বাড়ি, পাশেই জঙ্গলে-ভরা বাগান।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি সময়ের একটি সকাল আজ আরম্ভ হ'চ্ছে। পুকুরের চারপাশেই নারকেল গাছ, এক দিকে বাঁশবন আর ঘাটের কাছে একটা বিরাট সজনে গাছ অনেক ডালপালা নিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। জল থেকে প্রায় পাঁচ-ছ' হাত উঁচু পাড়, ঝরাপাতায় ঢাকা। খুব গভীর নয় পুকুরটা; পাড়টা আস্তে আস্তে নিচু হ'য়ে জলের মধ্যে ঢুকে গেছে, তা' দেখা যায়। পাড়ের ধারে ধারে বেনাবন, কলমিলতা আর লম্বা লম্বা ঘাস।

পূবের আকাশ থেকে, বাগানের অনেক গাছের, অনেক ডালপালার ফাঁক দিয়ে, সজনে গাছের ঝিরিঝিরি পাতা এড়িয়ে, কলমিলতা আর বেনাবনের গোড়ায় গোড়ায় পাঁকের উপর ঝিকিমিকি বাঁকাচোরা আলোর টুকরো এসে পড়েছে। ছোট ছোট ঢেউ গড়িয়ে এসে সেই আলোর মধ্যে পড়ে চিক্‌চিক্ ক'রে উঠছে। পাড়ের ধারে অর্ধেক শরীর জলের মধ্যে ডুবিয়ে একটা ব্যাঙ বসে বসে ঘুমচ্ছিলো। আস্তে আস্তে তার চোখের উপর সরু একটু আলো এসে পড়লো, চোখ খুলে সে গা ঝাড়া দিয়ে সেখান থেকে সরে গিয়ে একটু দূরেই একটা ছোট্ট কচুগাছের পাতার তলায় বসে আবার চোখ বুজলো।

ব্যাঙ চলে যেতেই, জলের মধ্যে ঢেউ উঠলো, সেই সঙ্গে অল্প হলদে সূর্যের আলোও কাঁপতে লাগলো ঢেউয়ের তালে তালে। বেনাবনের কাছাকাছি, ঘন-সবুজ শ্যাওলার ধারে একটি প্রায় দেড়-পোয়া ওজনের রুই-মাছের বাচ্চা শুধু শুধু দাঁড়িয়ে ছিলো, জলের মধ্যে আলোর নাচানাচি দেখে সে একটু চমকে গেলো তারপর ছুট দিলো সেখান থেকে। পালাবার সময় তার বাঁকা পিঠের উপর আলো ঝলসে উঠলো।

পাড়ের ধার থেকে সে সোজা একেবারে পুকুরের মাঝামাঝি গভীরে এসে লেজ নেড়ে ঘুরতে লাগলো। যেখানটায় সে ঘুরছে সেখানেই তার বাসা; খানিকটা গর্তের মতো; আসেপাশে কলসি-মালসার টুকরো পাঁকের মধ্যে গেঁথে গেছে। গর্তের কাছেই তা'র মা দাঁড়িয়ে; প্রায় আধ-মন ভারি আর দু'হাত লম্বা। তার লালচে হড়্‌কা গায়ের সঙ্গে গা লাগিয়ে ছোট্ট রুই-ছানাটি ঘুরতে লাগলো চারপাশে। কিন্তু একটু নড়লোনা তা'র মা; বোধ হয় এখনো ঘুম ভাঙেনি তা'র। বাচ্চাটি সেখান থেকে চলে গেলো অন্য জায়গায়, দেখলো দলে দলে রুই-কাত্‌লার বাচ্চারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘুমচ্ছে, মাঝে মাঝে তা'দের মা-বাবারা। কোনো জায়গায় মাটির মধ্যে মুখ গুঁজে সিঙ্গি-মাগুর, কোথাও শ্যাওলা কিংবা দামের মধ্যে চিংড়ি, কোথাও হাঁড়ির মধ্যে জলদাঁড়া সাপ। বাচ্চাটি খালি ঘুরে বেড়াতে লাগলো। প্রতিদিন তা'র সকলের আগে ঘুম ভেঙে যায়; অন্য বাচ্চারা কিংবা তা'র ভাই-বোনেরা যখন তাদের মা'র পাশে দাঁড়িয়ে ঘুমতে থাকে অনেক বেলা পর্যন্ত, সেই সময় সে ঘুরে ঘুরে দেখতে থাকে পুকুরের চারপাশ। মাত্র চার মাস বয়েস তা'র, কী-ই বা সে দেখেছে! অনেক বেলায় ঘাটের কাজ সেরে ঝিয়েরা যখন বাড়ি যায়, ফেলে রেখে যায় এঁটো ভাত-ডাল, তরি-তরকারি তখন তা'র মা বাচ্চাদের সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে খেতে থাকে সেই সমস্ত। অতো বেলা পর্যন্ত চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা এই বাচ্চাটি। ভোরের আলোয় জলের উপরটা একটু ফর্সা হ'লেই সে চলে আসে উপরে। আসবার সময় হয়তো একটু ধাক্কা দিয়ে আসে তা'র ভায়েদের, কিন্তু তা'রা জাগেনা, খুব খারাপ লাগে তা' রুই-ছানাটির। বেনা-বনে, কলমিলতার গোড়ার কাছে এসে সে রোজ সূর্যের আলো দেখে; সরু সরু আলোর ছড়ি এসে পড়ে জলে, জলের মধ্যে, কিন্তু কোত্থেকে আসে তা' সে জানেনা। খুবই ভালো লাগে তার এই সোনালী রোদ! খুব সাহস করেই সে জলের একেবারে উপরে উঠে এসে দেখে; আলোয় আলোয় বনের সমস্ত গাছগুলো ঝলমল করছে, নিচে গরু কিংবা ছাগলেরা কচিপাতা খেয়ে বেড়াচ্ছে, উপরে গাছের ডালে ডালে পাখিরা অদ্ভুত শব্দ করে নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। তা'র ইচ্ছে করে ডাঙায় উঠে ছোট ছোট আশ্যাওড়া গাছের তলা দিয়ে ঘুরে

বেড়াতে! তা'র যদি পা থাকতো! কতদিন ভেবেছে সে। একথা সে বলেওছিলো তার মা'কে; মা তো হেসেই খুন, মাছ আবার হাঁটবে কী! তা'র আবার পা হবে কী করে! মা'য়ের বন্ধুরাও শুনে অবাক হ'য়েছিলো; আর বাচ্চা মাছেরা সেইদিন থেকে তা'কে দেখলেই হাসতো আর কবি বলে ক্ষেপাতো। তা'র মা বলে: মানুষের অনেক বাচ্চারা কখনো মাছ হ'তে চায়, কখন পাখী হ'য়ে আকাশে উড়তে চায়, কখনো চাঁদ ধরতে চায় মানুষরা। মানুষরা তাদের পাগল বলে, 'কবি' বলে তা'দের নাকি ক্ষেপায়। বাচ্চাটিকে তা'র মা ভালো করে বারণ ক'রে দিয়েছিলো ওরকম ভাবতে, কিংবা একলা একলা যখন-তখন জলের উপর ভেসে উঠে আলো-টালো দেখতে, অথচ তবু সে কথা শোনে না।

সকালের থেকে দুপুর তার ভালো লাগে আরো বেশী। দুপুর বেলা চারিদিক যখন স্তব্ধ হয়, যখন মানুষেরা আর ঘাটে আসে না, সমস্ত পুকুরের জলটা যখন স্থির হ'য়ে থাকে, তখন সে ভেসে আসে উপরে। প্রায়ই সে দেখে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এই সময় ঘাটের উপর কিংবা গাছের ছায়ায় বসে বসে খেলা করে, কখনো গাছের মাথায় চাঁদ এসে পড়ে, গাছের কালো চুল বেয়ে, খয়েরী গা বেয়ে আলো ঝলমল করে। রুই-ছানার ইচ্ছে করে ওই আলো মাখতে, ওই রোদের মধ্যে নেচে বেড়াতে; জলের মধ্যে যে আলো সে তো তেমন নয়, সে কেমন ঘোলাটে, কেমন আবছায়া। ঘাটের সিঁড়ির কাছে গিয়ে সে দাঁড়ায়, একেবারে শেষ সিঁড়ি, আর একটি সিঁড়ি উঠতে পারলেই সে ডাঙার উপর শুয়ে শুয়ে রোদের আলোয় শুতে পারে, কিংবা গাছের তলা দিয়ে বেড়াতে পারে, কিন্তু ওঠা যায় না!

সিঁড়ির কাছে এলেই সে একটু সাবধান হয়। মানুষদের জন্যে নয়, মাছারাঙা পাখীর জন্যে। একদিন ঘুরে সে ঘাটে এসে ছানাদের খেলা দেখছিলো আর জলের মধ্যে লেজের আঘাত করে বার বার তাদের ডাকছিলো; হঠাৎ কোথা থেকে এক মাছরাঙা পাখী এসে তা'র পিঠে ঠোকর দিয়ে গেলো; ওজনে সে একটু ভারি বলে বোধ হয় তুলে নিতে পারেনি। কিন্তু পিঠটা কেটে দিয়েছিলো। মাছরাঙা পাখী দেখতে অতো সুন্দর, অথচ সে কামড়ায় কেন! মানুষরাতো কিছুই করে না! অন্য পাখীরাও তো ওরকম নয়! রুই-ছানার ভারি অবাক লাগে।

আজকের সকালটি কী সুন্দর লাগছে তা'র: হলদে রোদে সারা বন আলো করা, জলের ভিতর সে আলো পৌঁছয়না, শুধু পাড়ের ধারে ধারে, বেনাবনের গোড়ায় গোড়ায়, টুকরো টুকরো ছোট ছোট আলো। জলের উপর সেই জায়গায় 'সে' আবার ভেসে এলো। সেই ব্যাঙটি এখনো ঘুমচ্ছে কচুপানার নিচে।

রুই-ছানা পাড়ের কাছে গিয়ে বললো, 'আরে এখনো, ঘুমচ্ছেন আপনি!'

ব্যাঙ কিন্তু নড়লোও না, চোখও খুললো না।

আবার ডাকলো সে, 'ও ব্যাঙমশাই।'

এবার আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে অত্যন্ত গম্ভীর আর ভাঙা-ঘুমের গলায় ব্যাঙ বললে, 'কে হে ছোকরা!'

'আমি রুইছানা, এ'তো বেলা অব্দি ঘুমচ্ছেন! দেখুন না কী সুন্দর রোদ! কী সুন্দর রঙ। এখনো ঘুমবেন?'

'জ্যাঠামি কোরো না এঁচোড়ে-পাকা ছোকরা; ভোরবেলা উঠে রোদ দেখতে বেরিয়েছো, তোমাকেই তো সবই কবি বলে, না? যাও যাও বাড়ি গিয়ে পাঁকে মুখ গুজে ঘুমওগে যাও, ফাজিল কোথাকার!'

সেখান থেকে সরে ঘাটের কাছে এলো সে। ব্যাঙেদের কী মজা! তা'রা জলেও থাকে ডাঙাতেও থাকে!

একটু পরে ঘাটে কয়েকজন মানুষ এলো; তা'দের হাতে সরু সরু লাঠি, তা'তে সুতো বাঁধা। কী যেন তা'রা ছুঁড়ে ফেলতে লাগলো জলের মধ্যে। রুই-ছানা ভাবলো এ' বোধ হয় খেলা, খেলতে চায় ও'রা তা'র সঙ্গে। সে

ভেসে গেলো ঘাটের কাছে। একটা ডেলা এসে পড়লো তা'র মুখের সামনে, তারপর গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ভেঙে গিয়ে জলের তলায় তলিয়ে যেতে লাগলো। কী সুন্দর গন্ধ! রুই-ছানার চোখ জুড়িয়ে আসে মিষ্টি গন্ধে; খেতে ইচ্ছে করে তা'র সেই গন্ধকে। সে ভাবলো মানুষরা তো তা'র জন্যেই ফেলেছে এই সমস্ত জিনিস, তাই লেজ-ঝাপটে তা'দের ধন্যবাদ জানাতে লাগলো সে। কিন্তু বড়ো মানুষ দু'টো চলে গেলো তা'র উৎসাহের কোনো প্রত্যুত্তর না জানিয়েই। শুধু, ঘাটের উপর লেবু-গাছের তলায় ছোট ছেলেটি বসে রইলো। রুই-ছানা রোজ এই ছেলেটিকে দেখে।

যখন তখন ছেলেটি এসে বসে ঘাটে, কিংবা গাছের ছায়ায়, কখনো জলে নেমে হাত দিয়ে ঢেউ দেয় জলে। অন্য ছেলেদের সঙ্গে এ'র বেশী ভাব নেই। তা'রা যখন খেলে এ' তখন চুপ করে বসে জলের দিকে তাকিয়ে থাকে। সকালবেলা সে অন্য সব ছেলের আগে আসে, রুই-ছানাটির মতো; দুপুরে গাছের ডালে বসে কাঁচা আম খায় আর চুপ করে পা ঝুলিয়ে বসে থাকে। রুই-ছানাটির এতো ভালো লাগে এই ছেলেটিকে! তার ইচ্ছে করে ও'র সঙ্গে কথা বলতে, একসঙ্গে গাছে বসে থাকতে, আর মাটি খুঁড়ে তা'র মধ্যে গাছ বসাতে।

ছানাটি এগিয়ে যাচ্ছিলো ঘাটের কাছে হঠাৎ কোথা থেকে তা'র মা এসে তার লেজ কামড়ে ধরে টেনে নিয়ে যেতে লাগলো জলের তলায়। একেবারে বাসার কাছে এসে ছাড়লো তারপর বললো, 'খবরদার! এখন এখান থেকে একটুও নড়বে না, মানুষরা চার ফেলেছে। এখনি ধরতে আসবে আমাদের। মিষ্টি গন্ধের লোভে টোপ গিললেই একেবারে শেষ।' ছানাটি দেখলো তা'দের চারপাশে অসংখ্য রুই-কাতলা-মৃগেলের বাচ্চারা দাঁড়িয়ে আর তাদের সঙ্গে বড়ো মাছেরাও। সকলেই ভয়ে যেন কাঁপছে, এতোটুকু নড়ছে না কেউ, শুধু বুকগুলো ঢিপ ঢিপ করছে। এখানে অন্য মাছেরা থাকতে পাবে না; চিংড়ি-টেংরা-মাগুররা অন্য কোথাও আছে হয়তো দামের মধ্যে মধ্যে ছানাটি ভয় না পেয়ে আস্তে আস্তে তা'র মা'কে জিগগে করলো, 'কী হ'য়েছে!'

'মানুষরা আমাদের ধরতে এসেছে যে! মোটে তো চা মাস বয়েস তোর—এখনো জানিস না, ওরা আমাদের ধ খায়। এখন ছিপ ফে'লবে, তাতে টোপ থাকে, সে খেলেই একেবারে টেনে তুলবে ওপোরে; খুব সাবধান!'

'ডাঙায় তুলবে?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন তোমার ডাঙায় উঠতে ইচ্ছে করছে নাকি!'

ছানাটি বললো, এখনি তা'কে তুলে নিলে সে খুসী হয়।

তা'র কথা শুনে সমস্ত ছোট-বড়ো মাছেরা একসঙ্গে তার দিকে তাকালো। অন্য সময় হ'লে 'কবি কবি' ব চেঁচিয়ে উঠতো তারা কিন্তু এখন ভয়ের চোটে কিছু বলতে পারলো না।

অনেকক্ষণ এই ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো তারা। এ মধ্যে রুই-ছানাটির যে কতোবার উপরে ভাসতে ই হ'য়েছে! বারবার সে চেষ্টা করেছে তা'র মা'র চোখ এড়ি পালাবার। কিন্তু পারেনি। ঘাটে হয়তো ছেলেটি এখ তা'র জন্যে অপেক্ষা করছে।

কিছুক্ষণ পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো তিনটি কাত মাছের বাচ্চাকে পাওয়া যাচ্ছেনা, হয়তো তারা প পড়েছে। রুই-ছানাটির মা শক্ত করে তাকে কামড়ে ধ রইলো। দুরন্ত সে—কখন হয়তো উঠে যাবে উপরে। হ একটি প্রচণ্ড আওয়াজ হ'লো জলের উপর। এক স সমস্ত মাছেরা চমকে উঠলো। বড়ো মাছেরা সাবধা করে বললো, 'এবার জাল ফেলছে, ছিপে কিছু হয় পায়নি তাই, অত্যন্ত সাবধানে পাঁকের সঙ্গে একেব মিশে থাকতে হবে এখন।' রুই-ছানাকে আরো জো কামড়ে ধরলো তার মা।

আর একটা আওয়াজ। আগের চেয়ে এটা আরো কাছে। ঠিক মাথার উপর।

একটি বড়ো কাত্‌লা চেঁচিয়ে উঠলো, 'এখানে থাকা আর ঠিক নয় একটু ধারের দিকে চলো সকলে, খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু আস্তে।'

প্রায় চার শ' মাছ এক সঙ্গে সরে যেতে লাগলো পাড়ের ধারে। আর একটা আওয়াজ।

অনেকগুলো বাচ্চা চেঁচিয়ে উঠলো, 'আমরা ধরা পড়েছি, জালে জড়িয়ে গেছি আমরা!'

কিন্তু অন্য মাছেরা তাদের কথা না শুনে জোরে জোরে পালাতে লাগলো।

একটি মৃগেল-ছানা বললো, 'আহা ওরা ধরা পড়লো! ওদের বাঁচানো যায়না!'

তাকে ধমকে উঠলো একজন বৃদ্ধ-কাত্‌লা! 'জ্যাঠামো কোরোনা, নিজেই আগে পালিয়ে বাঁচো, আপনি বাঁচলে বাপের নাম। কয়েক জনের জন্যে সবাই মরবে নাকি! যা'রা গেছে তাদের আজ দিন ছিলো তাই গেছে, আরো কজন যায় তাই ছাখো!'

একটি যুবক-রুই বললো, 'কিন্তু এখুনি তো আপনিও ধরা পড়তে পারেন, আপনার জন্যে কি চেষ্টা করবোনা তখন?'

যুবকটির দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে বৃদ্ধটি বললেন, 'থাক হে থাক, আমার জন্যে কিছু করতে হবে না তোমার। চারটি বছর এই পুকুরে কাটিয়ে বুড়ো হ'লুম আজ পর্যন্ত একটি ছিপের টোপ-ও টানতে পারেনি আমায়। ভুল ক'রে যদিবা কাছে গেছি, দেখেই চিনতে পেরেছি। তক্ষুণি ট্যাঙ্‌রা কি সিঙ্গি মাগুরের বাচ্চাদের ডেকে দেখিয়ে দিয়েছি আর সেগুলো মরেছে কেঁচোর টোপের লোভে। আজকালকার ছ'মাসের সব ফচ্‌কে ছোঁড়াদের মতো কেদ্দানি ক'রে কখনো চারের ধারেও যাইনি। তাই বেঁচে আছি এখনো, সময় থাকতে সরে পড়াই ভালো বাপু, বুঝলে!'

'কিন্তু, একজনকে, বাঁচানো কি উচিত নয়!'

'বেশ তো, যাওনা হে তুমি; ওসব বাহাদুরি দেখিয়ে মেয়েদের কাছে হাততালি পাওয়া তোমাদেরি পোষায়!'

যুবকটি দেখলো, বুড়ো-কাত্‌লার কথা শুনে, রুয়ের বড়ো-মেয়েটি হাসছে, এই মেয়েটির সঙ্গে তার শিগগিরি বিয়ে হবার কথা; লজ্জায় সে মরে গেলো প্রায়; চেঁচিয়ে সকলকে বললো, 'আমি চললুম ওদের বাঁচাতে, দেখি পারি কিনা।' বলে সে সেখান থেকে অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

তার ভাবী-স্ত্রী রুইয়ের মেয়েটিও ছুটলো তার পেছনে।

আর একটা শব্দ। এ'বারে শুধু শব্দ নয়—বিরাট ঘের-ও'য়ালা কালো জাল এসে পড়লো এদের দলের উপর।

অনেকে ধরা পড়েছে, রুই-ছানাটি আর তার মা-ও। তা'র মা এতক্ষণ তাকে মুখে কামড়ে ধরেছিলো, এবার ছেড়ে দিয়ে নিজে পালাবার চেষ্টা করতে লাগলো। ছানাটি ভাবলো, আঃ বাঁচা গেল, এবার সে উপরে উঠবে। সেই ছেলেটিকে সে দেখতে পাবে এখন, সে ঘুরে বেড়াবে রদ্দুরের মধ্যে, জঙ্গলের গাছের তলায় তলায়। কী মজা!

সে একবার ভালো করে দেখে নিলো জালের মধ্যে কে কে আছে। তার সঙ্গে তার মা'ও যে আছে—ভালো লাগলোনা তার। কিন্তু না, ওই যে জালের তলা দিয়ে অনেক কষ্টে তার মা পালালো, তাকে ফেলেই। এখন সে একলা, মা আর বকবেনা তা'কে। বাঃ কী আরাম! কেমন আস্তে আস্তে এরা টানছে জালটা; এই তো আর একটু, একটু পরেই সে উপরে উঠবে। মাটি, মাটি, নরম-আলো, মানুষ বন্ধু, পাখীর গান! কিন্তু ওরা সব লাফাচ্ছে কেন অতো! সেই বুড়ো কাতলাও ধরা পড়েছেন আরো অনেক বাচ্চারা। সকলেই ছটফট করছে, কী বোকা ও'রা!

জাল উপরে উঠলো, এই প্রথম রুই-কাতলা মাটি স্পর্শ করলো। আনন্দে তা'র বুক ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, যদিও নিশ্বেস নিতে বেশ কষ্ট হ'চ্ছে, কানকো দুটি বার বার খুলছে বন্ধ হ'চ্ছে, দেহটি ভীষণ ভারি বোধ হচ্ছে।

কিন্তু এরকম তো একটু হবেই, নতুন জায়গায়, নতুন জন্ম হ'লো প্রায়, এর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে তো কয়েক দিন সময় লাগবেই। তাছাড়া কষ্ট সহ্য করতে না হ'লে আর আনন্দে আনন্দ কী!

ঘাটের শানের উপর এ'নে তা'দের জাল থেকে বার করা হ'লো; বেশ একটু জোরেই তাকে ফেলা হ'লো, শরীরের ভেতরটা চমকে উঠলো তাতে। যে মানুষটা ফেললো তার উপর একটু রাগ হ'লো তা'র। যাকগে, সব মানুষতো-আর সমান ভালো নয়, মাছেরাও যেমন। কিন্তু নিশ্বেস নিতে যে বেশ কষ্ট হ'চ্ছে!

রুই-ছানার পাশে বুড়ো-কাতলা ভীষণ ফটফট ক'রে লাফাচ্ছে, তার দেহের ভারে শানের মেজেটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। চারপাশে আরো অনেক মাছেরা, তার ভাই বোনেরা অনেকে আছে। করুণ ভাবে কাঁদছে কেউ, কেউ গোঙাচ্ছে, কেউ বা গালাগালি করছে মানুষদের। মানুষেরা বোধ হয় শুনছেনা তাদের চেঁচানো। নাকি শুনতেই পাচ্ছেনা! একটু অবাক হ'লো রুই-ছানা।

বুড়ো কাত্‌লা লাফিয়ে লাফিয়ে জলের দিকে চলে যাচ্ছিলো, একজন মানুষ তা'র লেজ ধরে টেনে আনলো অন্য দিকে, কিন্তু তবুও থামলো না বুড়ো। অন্য একজন কোথা থেকে এসে একটা শক্ত বাঁশ দিয়ে মারলো বুড়োর মাথায়।

খুব জোরে ছটফট করে, একটু ঠাণ্ডা হ'লো সে। তার পর তাকে নিয়ে গেলো বাড়ির দিকে। একজন বললো, বেশ চর্বি-ওলা মাছটা।

অপর একজন বলল, 'হবেনা! ওজনতো প্রায় ত্রিশ সেরটাক হবে। কিন্তু বড়ো বেশী পেকে গেছে, গায়ে শ্যাওলা পড়েছে যেন।'

অন্য ছোট মাছেদের একটা বালতিতে তুলে রাখা হ'লো। রুই-ছানা চুপ করে পড়েছিলো, তাকে বোধ হয় মৃত ভেবে কেউ তুললো না। রুই-ছানার খুবই কষ্ট হচ্ছে, বরং ক্রমেই বাড়ছে কষ্টটা, কিন্তু তবু সে অসভ্যের মতো লাফালাফি করতে পারবেনা; মানুষরা মনে করবে কী!

আবার জাল ফেলা হচ্ছে। সকলে পেছন ফিরে দাঁড়ালো। রুই-ছানা ভাবছে তাকে তো কেউ কিছু বলছে না কিংবা দেখছেই না। চারদিকে সে ভালো করে দেখলো—আরে! ওই যে সেই ছেলেটা। সে একলাই দাঁড়িয়ে আছে। মুখটা তার করুণ লাগাছে কেন?

রুই-ছানা তার কাছে যাবার জন্যে চেষ্টা করলো। কিন্তু কী আশ্চর্য—সে দাঁড়াতে পারছে না, কিংবা সাঁতার দিতেও পারছে না! সে ভাবলো, তার মানুষের মতো পা গজাতে বোধ হয় কিছুদিন সময় লাগবে; তাই লাফাতে লাফাতেই সে সরে যেতে লাগলো ছেলেটির কাছে।

ওই যে দেখতে পেয়েছে সে। রুই-ছানা তার দিকে চেয়ে ডাকলো তাকে।

ছেলেটি এগিয়ে এলো তার কাছে, তারপর এদিকে ওদিক চেয়ে তুলে নিলো তাকে। আঃ কী নরম হাত ছেলেটির! এইবার সে তাকে নিয়ে যাবে বাড়িতে, সেখানে গিয়ে সে কী দেখবে! শিরশির করছে রুই-ছানার গা!

রুই-ছানা বললো, 'নমস্কার ভাই!'

কিন্তু কোনো জবাব দিলো না ছেলেটি। নিশ্বেস নিতে তার কষ্ট হচ্ছে একথা একবার বলতে ইচ্ছে হলো তার। কিন্তু না, সেটা ঠিক হবে না বোধ হয়। ছেলেটি হয়তো ভাববে, কী আশ্চর্য সে! সে বললো, 'আমাকে তোমার বাড়ি নিয়ে চলো না।'

ছেলেটি তাকে কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো। খোলা আকাশের নিচে যেটুকু নিশ্বেস নিতে পারছিল। এবার তাও পারছে না। দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সে চেঁচাতে লাগলো, 'দম বন্ধ হয়ে গেলো যে আমার, কী মুস্কিল! কাপড়ের মধ্যে নিয়েছ কেন, বাইরের আলো-বাতাসই তো আমি। চাই ছেড়ে দাও, বার করো আমাকে।'

বা'র যখন করলো তখন রুই-ছানা দেখলো তার সামনে সেই পুকুর। ছেলেটা এদিক ওদিক তাকিয়ে চট ক'রে ছেড়ে দিলো তা'কে জলের মধ্যে। রুই-ছানা জলে গিয়ে ভালো করে কয়েকবার নিশ্বেস নিলো। আঃ, কী আরাম! তারপর চেঁচাতে লাগলো, 'একী, আমাকে আবার জলে ছাড়লে কেন? তুলে নাও, তুলে নাও শিগগির। তুমি মনে করছো আকি চেঁচাচ্ছিলুম কষ্ট হচ্ছিলো বলে? কিন্তু ও কিছু নয়, কাপড়ের মধ্যে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিলো যে তাই! তুলে নাও আমাকে!' ছেলেটি চলে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একটা লোক দৌড়তে দৌড়তে এসে পেছন থেকে তার কান ধরে এক চড় বসিয়ে দিলো গালে। বললো, 'হতভাগা মাছটা ছাড়লিযে! গাধা, পাজি কোথাকার! বারবার তোমার বড্ডো ন্যাকামি দেখানো হয়! প্রত্যেকবার তোমার মাছ ছেড়ে দেয়া! মজা পেয়েছো বড়ো, না! দূর হও এখান থেকে।'

রুই-ছানা তখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে জলের একেবারে ধারে। ছেলেটির জন্যে তার কষ্ট হলো। কিন্তু ওই বা ছাড়তে গেলো কেন!

হঠাৎ একটা জালের মতো গামছা এসে পড়লো রুই-ছানার উপর তারপর গামছার মধ্যে তাকে জড়িয়ে নিয়ে চললো লোকটি।

হঠাৎ এভাবে আক্রমণ করায় রুই-ছানার ভারি বিশ্রী লাগলো। তাছাড়া লোকটি এইমাত্র ছেলেটিকে মেরেছে বলেও তার খারাপ লাগছে। তার হাতে চড়ে যেতে রুই-ছানার ইচ্ছে করছে না। তা'ছাড়া এতো জোরে তাকে ধরা হয়েছে! উঃ, সেকি পালাবে নাকি! লোকটির হাতের মুঠোর মধ্যে ছটফট করতে লাগলো সে। লোকটা আরো জোরে চেপে ধরলো।

ঘাটে এসে লোকটি সকলকে বললো, 'কী আশ্চার্য, মাছটাকে ছেড়ে দিয়েছিলো, তবু পালায়নি বেটা।'

তারপর একটি ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে দৌড়ে এসে বললো, 'এই মাছটা কিন্তু আমি একলাই খাবো, কেমন?'

লোকটি বললো, 'দাঁড়াও দিচ্ছি, জ্যান্ত দিলে শেষ-কালে পালাবে।' বলে গামছার ভেতর থেকে তাকে বার করে ঘাটের শক্ত শানের উপর আছাড় মারার জন্যে শূন্যে তুললো।

সাত ভাই চম্পা—জ্ঞানদানন্দিনী দেবী প্রণীত। প্রকাশক: বিশ্বভারতী। দাম একটাকা চার আনা।

আশ্বর্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহিলা ছিলেন এই জ্ঞানদানন্দিনী দেবী। বাল্যকাল কেটেছিলো খাঁটি পাড়াগেঁয়ে বনেদি আবহাওয়ায়, বিয়ের পরে গিয়ে পড়লেন ফুটন্ত ফ্যাশানের রাজ্যে—স্বামী ছিলেন প্রথম ভারতীয় সিবিলিয়ান। এই নতুন পরিবেশে তিনি কিন্তু তাঁর ভারসাম্য কখনো হারিয়ে ফেলেন নি। আপন মহিমায়, বৈশিষ্ট্যে সকলের সামনে তাঁর

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। বাঙালী মেয়েরা তো তাঁর কথা চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন, কেন না আজকের বাঙালী মেয়েরা যে-বিশিষ্ট শাড়ি পরবার ধরণের জন্য সমস্ত সভ্য সমাজের প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন—সে মূলত তাঁরই দৌলতে। প্রায় নিরক্ষরা হয়েও, পরে বিবাহিত জীবনে নিজের ধৈর্যের গুণে ইংরেজি ও বাংলা তো ভালো করে শিখেছিলেনই, আরও দু-একটি ভাষা মোটামুটি বলতে ও পড়তে পারতেন। তখনকার দিনে বিলেতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে একা কাটিয়ে এসেছেন বছরের পর বছর। এটা কম সাহস ও মনোবলের পরিচয় নয়।

জ্ঞানদানন্দিনী দেবী এক সময় তাঁর বড়ো নাতির মনোরঞ্জনের জন্য কয়েকটি প্রচলিত দিশি রূপকথাকে নাটকের রূপ দিয়েছিলেন। 'সাত ভাই চম্পা' সেইরকম একটি নাটক। পরিষ্কার ঝরঝরে বাংলায় লেখা। মূল কাহিনী-টুকুর মধ্যে যেটুকু নাটকীয় সম্ভাবনা ছিলো তার সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা হয়েছে। নাটকের সংলাপ খুব মানানসই হয়েছে—চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত: রূপকথার ধূসর স্বপ্নলোক থেকে তারা একেবারে মাটির পৃথিবীতে নেমে এসেছে—বিশেষ করে হিংসুটে সুয়োরাণীর চরিত্রটি চমৎকার ফুটেছে। ছেলেমেয়েরা পড়ে এবং অভিনয় করে আনন্দ পাবে।

ছাপা ভালো, মলাটের ওপর গগন ঠাকুরের আঁকা ছবিটিও সুন্দর, তবে বাঁধাই আরো ভালো হলে ভালো হ'তো।

সোনার কাঠি: মণীন্দ্রলাল বসু প্রণীত। প্রকাশক: সরস্বতী লাইব্রেরী। দাম এক টাকা।

লেখকের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। মণীন্দ্রবাবু সেইজাতের লেখক যাঁদের লেখা না পড়েও নিঃসংশয়ে সকলের হাতে তুলে দেওয়া যায়। মূলত, বড়োদের লেখক হিসেবে যশস্বী হলেও, ছোটোদের সাহিত্যে তাঁর 'অজয়কুমার' যে সময় বেরিয়েছিলো সে সময়ে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিলো।

সোনার কাঠি ছোটোদের সাহিত্যে তাঁর দ্বিতীয় বই। ছোট দশটি গল্প রয়েছে—তার ভেতর চারটি অনুবাদ। 'সন্দেশের দেশে' ও 'ঝাঁটা বুরুশদের ঝগড়া' গল্পদু'টিতে রবীন্দ্রনাথের গল্পসল্পের সেই 'বড়ো খবর' রয়েছে যা বড়োদের অনেকেরও চোখ ফোটাবে। 'সিনডারেলার কাণ্ড' গল্পে "পিঁজরার পোষা বাঘ স্বপ্ন দেখে দুরন্ত বনের"—বুড়ো সিনডারেলার ক্ষণিক অরণ্যস্বপ্ন শেষ পর্যন্ত মনে একটি কোমল বিষণ্ণ সুর রেখে যায়। 'নরেশের বাংলা শিক্ষা' গল্পটি নিছক ভাবালুতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, গল্পাংশও অত্যন্ত ক্ষীণ।

অনুবাদ গল্পগুলি সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে আমি কিছু বলতে চাইনে। মূল যেখানে সুলভ এবং সহজপাঠ্য, সেখানে অনুবাদ অনুমোদিত করতে দ্বিধা হয়। ছাপা ও মলাট খুব পছন্দসই নয়।

গল্পের মজলিশ: এস, ওয়াজেদ আলী বি. এ. (ক্যান্টাব) বার-এট-ল। প্রকাশক: বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড, কলিকাতা। দাম বারো আনা।

চমৎকার ঝরঝরে কয়েকটি গল্প—যেন আরব্য উপন্যাসের এক-একটি উপন্যাস। ওয়াজেদ আলী সাহেব ছেলেদের জন্য মুসলমানী রূপকথাগুলি উদ্ধার করে বাংলা সাহিত্যের ভারি উপকার করলেন। পড়তে পড়তে অতীতের সেই স্বপ্নময় ইরান তুরাণের অদ্ভুত রহস্যময় জগত চোখের সামনে ভেসে ওঠে, মুহূর্তের জন্যে "অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা, লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ" ভিড় করে আসে, আরব মরুভূমির হলুদ বালি রৌদ্রে চিক্ চিক্ করে: মনে হয়, মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে হাজার হাজার বছর পেছনে রেখে এলাম। ছাপা, বাঁধাই, ছবি ভালোই।

ভ্রম সংশোধন

ফাল্গুন মাসের ৩৩৪ পৃষ্ঠায় 'বিশেষ দ্রষ্টব্যের' ভিতর রংমশালের যান্মাষিক চাঁদার কথা ভুল ছাপা হয়েছে। যান্মাসিক চাঁদা ১৵০ নয়—২৵০। **চাঁদা পাঠাবার সময় ভুল কোরো না।**

চিঠির বাক্স

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা,

রংমশালের বছর শেষ হোলো। আগামী বছরের রংমশালের জন্যে যে বিরাট আয়োজন করা হয়েছে তার কিছু আভাস এই সংখ্যাতেই পাবে। নানা ধরণের রচনায়, নানা সুন্দর ছবিতে নতুন বছরের রংমশাল ভরা থাকবে। তা ছাড়া অনেক টাকার পুরস্কার দেবার বন্দোবস্তও হয়েছে। ইতিপূর্বে কোনো ছোটোদের কাগজে এতো টাকার পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা কখনো হয়নি। রংমশালের মধ্যে দিয়ে যাতে তোমরা প্রচুর আনন্দ পাও এবং সেই আনন্দের সঙ্গে যাতে নানা বিষয়ে তোমাদের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় সেদিকে গভীর দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

চাঁদা পাঠাবার সময় একটি কথা মনে রেখো। নতুন বছরের রংমশালের দাম এ-বছরের চেয়ে কিছু বেশি হবে: **তিন টাকার** জায়গায় **তিন টাকা বারো আনা**। বার্ষিক বারো আনা বাড়ানো হোলো, অর্থাৎ প্রতিমাসে বাড়লো এক আনা করে। কিন্তু নতুন বছরের রংমশাল খুললেই দেখবে এক আনা বাড়তি দামের তুলনায় কত বেশি ভালো জিনিস তোমরা পাচ্ছো। চাঁদা পাঠাবার সময়ে তোমরা এই বাড়তি দামের কথা স্মরণ রেখো এবং ভুল করে যেন এ বছরের মতোই **তিন টাকা চাঁদা পাঠিও না**। যদি কেউ ভুল করে মাত্র তিন টাকা চাঁদা পাঠিয়ে থাকো অবিলম্বে আরো বারো আনা পাঠাবে এবং মনি-অর্ডার কুপনে নিজের গ্রাহক নম্বর এবং ভুলের কথা উল্লেখ করবে।

মনে রেখো পুরো বছরের গ্রাহক না হলে 'রংমশাল বৈঠকে' লেখা ছাপানো সম্ভব হবে না। যারা পুরো বছরের গ্রাহক হবে 'রংমশাল বৈঠকে' তাদের লেখাই বাছাই করে ছাপা হবে এবং বছরের শেষে ঐ 'রংমশাল বৈঠকে'র লেখা থেকেই আবার বাছাই করে দু'শো টাকার পুরস্কার দেওয়া হবে।

এ বছর যারা আমাদের গ্রাহক ছিলে তাদের সবাইকেই আমরা আন্তরিক ভালোবাসা জানাচ্ছি। আগামী বছর যারা আর গ্রাহক থাকবে না তাদের জন্যেও রইলো আমাদের ভালোবাসা আর শুভেচ্ছা। যারা নতুন গ্রাহক হবে তাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

এইবার তোমাদের চিঠিপত্রের উত্তর দিতে সুরু করি:

সলিল কুমার বসু (২১৬২)—তোমার কবিতাটির বিষয়বস্তু ভালো কিন্তু লেখাটি কবিতা হয়নি! অনেক ছন্দের গোলমালও আছে। আরো লেখো। **কল্যাণী সরকার** (১২৬৩)—তুমি লিখেছো মাঘ মাসের রংমশালে অহিভূষণের 'মুখে আর মনে' কবিতাটি অগ্রহায়ণের রামধনুতেও ছাপা হয়েছে। শুনে বিস্মিত ও ক্ষুণ্ণ হয়েছি। অহিভূষণ সে কথা আগে আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানায়নি। আরো বিস্মিত হচ্ছি ঐ সম্বন্ধে রংমশালের গ্রাহক যশোধন ভট্টাচার্যের (১২০৯) চিঠি পেয়ে। যশোধন ঐ কবিতাটি সম্বন্ধেই লিখেছে: "সুনির্মল বসুর লেখা 'মুখে আর মনে' নামে একটি কবিতা প্রায় বছর দেড়েক আগে 'আনন্দমেলায়' প্রকাশিত হয়েছিলো। সেই কবিতার ভাব নিয়ে রংমশাল গ্রাহক অহিভূষণ চৌধুরী একটি কবিতা (নাম বদলানো হয়নি) লিখেছেন। এ রকম বিখ্যাত কবির কবিতা অহিভূষণ কোন সাহসে রংমশাল প্রকাশ করতে দিলেন তাই সবিস্ময়ে ভাবছি।" আমার কথাও ঠিক তাই।

রংমশালের জন্যে তোমরা যারা লেখা পাঠাও তাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস রেখেই আমরা লেখাগুলি বাছাই করি। কিন্তু এর মধ্যে কেউ যদি চুরি কর, কেউ যদি একই সঙ্গে দুটি কবিতা দুটি পত্রিকায় পাঠাও তা হলে আমরা নিরুপায়। এরকম ঘটনার জন্যে আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত। **অহিভূষণ চৌধুরী** (২৪১৭)—তোমার চিঠি পেয়েছি। তোমার সম্বন্ধে আগেই মন্তব্য করেছি। **দিলীপকুমার দত্ত** (২৫৫০)—তোমার যদি মনে হয়ে থাকে অনেক দেরী করে ধাঁধার উত্তর পাঠাবার পরেও নাম ছাপা না হওয়ায় তোমার পক্ষে গ্রাহক থাকা সম্ভব হবে না তা হলে গ্রাহক থাকার দরকার নেই। **বিজয়া গাঙ্গুলী** (২৩৫৯)—তোমার দাদুর মৃত্যুসংবাদে অত্যন্ত দুঃখিত হলুম। আন্তরিক সমবেদনা গ্রহণ কর। মহাত্মাজীকে দেখতে পাওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা। সে-সৌভাগ্য তোমার যে হয়েছিলো সে-কথা জেনে খুসি হয়েছি। রংমশালের বাড়তি সংখ্যাটি ফেরৎ পেয়েছি। ধন্যবাদ। ঠিকানাটি যেমন চেয়েছিলে সেইমতো বদলে দিলুম। **সুখেন্দু মণ্ডল** (২২৬০)—তুমি প্রথম যে-প্রশ্নটি করেছো তার উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। তুমি যেখানকার সভ্য হয়েছো সেখানকার খবর আমি ভালো জানি না। তাই মতামত জানাতে পারলুম না। **গৌরাঙ্গ কুণ্ডু** (২৫৭৩)—পত্রিকা আবার পাঠানো হয়েছে। আশাকরি পেয়েছো। রচনা কেন যে অমনোনীত হয়েছে সে-কথা সব সময় জানানো সম্ভব নয়। জানাতে পারলে খুবই সুখী হতুম, কিন্তু আমাদের কাছে এত্তো লেখা আসে যে সবগুলি পড়ে দেখতে-দেখতেই সময় কেটে যায়। রচনা ভালো হলে নিশ্চয়ই ছাপা হবে শুধু এইটুকু বলতে পারি। রংমশালে অক্ষরক্রীড়া ছাপাবার কোনো ব্যবস্থা নেই। অতএব ওধরণের লেখা অনর্থক পাঠিও না। পেন্সিলে কেনো লেখো? কালিতে লিখবে এবং কাগজের এক পৃষ্ঠায় মার্জিন রেখে লেখার চেষ্টা করবে। **দুর্গাদাস ভট্ট** (২৫৫৭)—তোমার পাঠানো গল্প এবং কবিতা পাইনি, রিপ্লাই-কার্ডও নয়। আশাকরি ইতিমধ্যে 'ছাতুবাবুর ছাতা' পৌঁছে গেছে। তোমার কবিতাটি ভালো হয়নি। **গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়** (২৪৬৮)—তুমি যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রশ্ন করেছো রংমশালে প্রকাশিত 'ক্ষুদে শয়তানের রাজত্বে' সেই সব প্রশ্নের অনেকটা উত্তর পাবে। ভবিষ্যতে ওই বিষয়ে আলাদা প্রবন্ধ দেবার চেষ্টা করবো। অল্প কথায় বোঝানো সম্ভব নয়। **বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়** (২০৬১)—তোমার কবিতাটি ছাপা গেলো না। বানান সম্বন্ধে লক্ষ্য দাও। আর এক কপি রংমশাল পাঠানো হোলো। কলকাতার হাঙ্গামায় সবাই তোমার মত মর্মাহত হয়েছে। **মঞ্জুলা-গুপ্তা** (২৪২৯)—তোমার চিঠিতে রিশিপাড়া গ্রামের যে ছবি ফুটে উঠেছে সে-ছবি ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেকটি গ্রামের সঙ্গেই মিলে যায়। গ্রাম ভারতবর্ষের প্রাণ। নিশ্চয়ই এই সব গ্রামের অমূল পরিবর্তন ও সংস্কার করতে হবে। ভারতবর্ষের শাসনভার ভারতীয়দের হাতে যতদিন না এসে পড়ছে ততদিন সেই সংস্কারের কাজ ঠিকমতো আরম্ভ হবে না। **রণজিৎ বিশ্বাস** (২৪২৯)—তোমার দীর্ঘ চিঠি পড়লুম। তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু তোমার মতের সঙ্গে আমাদের কোনো মতই মিলছে না। চিঠি ছোটো করে লিখো। **জানকীকান্ত পাল** (২৪৫৩)—তোমার গল্পটি ছাপা গেলো না, বড্ড বড় হয়েছে। যতটা বড় হয়েছে ততটা ভালো হয়নি। ছোটো লেখা পাঠিও। **পূর্ণেন্দুকুমার মল্লিক** (২৪১)—তুমি ভারি সুন্দর চিঠি লিখেছো, অল্প কথায় অমন গুছিয়ে চিঠি লেখা সত্যিই বিস্ময়কর। বোঝা গেলো মানুষ যখন যেটি গভীরভাবে অনুভব করে তখন সেই কথাটি দীপ্ত কণ্ঠে বোঝাতে তার কিছুমাত্র অসুবিধে হয় না। একটি কথা, চলতি ভাষায় লেখার অভ্যেস কর। কবিতাটি কিন্তু উৎরোয়নি। **জ্যোতির্ময়** ও **হিরণ্ময়** (১৯৪১)—জ্যোতির্ময়ের কবিতাটি ছাপা গেলো না। হিরণ্ময়ের একটি কবিতা ছাপা হোলো। অন্যগুলি ছাপবার মতো নয়। **অমিয়কণা চট্টোপাধ্যায়** (?)—তোমার চিঠি

মাণিক বাবুকে পাঠালুম। **বিশ্বজিৎ সেন রায়** (১০১০)—আশাকরি 'ছাতুবাবুর ছাতা' পেয়েছো। **তারাপদ চক্রবর্তী** (২৪২৮)—নীচ জাতির সেবা করলে ধর্ম হানি হয় এমন কথা কোনো ধর্মে বলে না। তবে নিরক্ষরদের শিক্ষা দিতে গেলে সবচেয়ে আগে দরকার নিজেদের শিক্ষা সম্পূর্ণ করা। **শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়** (২০৯০)—অত অল্প সময়ে নানা গোলমালের মধ্যে বিশেষ সংখ্যা বার করা সম্ভব হয়নি। তবে বৈশাখ সংখ্যার জন্যে অনেক আয়োজন করা হয়েছে। আশাকরি চমকে দিতে পারবো। একই ইংরিজি কবিতা থেকে অনায়াসেই দু'জনে দুটি আলাদা অনুবাদ করতে পারে। তাতে দোষ হয় না। **সুব্রত রায় চৌধুরী** (২০০৫)—তুমি যে দুটি উপন্যাসের কথা লিখেছো তার সঙ্গে রংমশালে প্রকাশিত উপন্যাসের কোনো মিল নেই, শেষ হলে দেখো। এখন ফটো ছাপার সুবিধে নেই, কিন্তু ভবিষ্যতে ছাপবার খুবই ইচ্ছে আছে। রংমশাল তোমার খুব ভালো লাগে শুনে উৎসাহিত হলুম। নতুন বছরের রংমশাল আরো অনেক ভালো হবে, দেখো। **চিনু চৌধুরী** (১৯৭৭)—তোমার কবিতাটি ছাপা গেলো না। **শৈলেন্দ্রকুমার সরকার** (২২২৬)—'মুখে আর মনে' কবিতাটি সম্বন্ধে অগেই লিখেছি। **কাশীনাথ পালিত** (২৫৫০)—নতুন বছরের বার্ষিক চাঁদা ৩৸০, ষান্মাসিক ২৸০। গ্রাহকদের পাঠানো ধাঁধা ছাপানো সম্ভব নয়। আগেই লিখেছি। **কুমুদবন্ধু ভট্টাচার্য** (২৩০১)—তুমি যে খবরগুলি চেয়েছো সেগুলি জানা না থাকায় উত্তর দিতে পারলুম না। অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে। আশাকরি শীঘ্রই সুস্থ হবে। এতো দেরী করে ধাঁধার উত্তর এলে নাম কী করে ছাপানো যায়? ইতি

তোমাদের
সম্পাদকমশাই

ইংলণ্ডের তিন জন মন্ত্রী মার্চ মাসের শেষে ভারতবর্ষে আসছেন। তাঁদের নাম লর্ড পেথিক লরেন্স, স্যর স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স্ এবং মিঃ এলবার্ট আলেক্সাণ্ডার। তাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ শাসনপ্রণালী কী ধরণের হবে তাই নিয়ে আলোচনা করাবেন। আমরা কতটা স্বাধীনতা পাবো, কী ধরণের স্বাধীনতা পাবো তাই নিয়ে চতুর্দিকেই গরম আলোচনা শুনি। তবে ভারতবর্ষের লোকেরা এতোবার ইংলণ্ডের কাছ থেকে এই ধরণের কথা শুনেছে এবং এতো ধরণের ইংরেজের দৌত্য দেখেছে যে যতদিন কিছু একটা না হয় ততদিন কোনো কিছুতেই সহজে বিশ্বাস হয় না।

* * * *

কলকাতার গরম আবহাওয়া শান্ত হতে না হতেই বোম্বাই এবং করাচির আবহাওয়া গরম হয়ে উঠলো। কিছুদিন ধরেই 'রয়েল ইণ্ডিয়ান নেভি'র ভারতীয় কর্মচারীরা বোম্বাই এবং ভারতবর্ষের নানা জায়গায় নিজেদের কয়েকটি অভাব-অভিযোগের প্রতিবাদে কাজ করা বন্ধ রেখেছিলো। হঠাৎ তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। নৌবিভাগের কুড়িটি

জাহাজ এবং অনেক গোলাগুলি তারা দখল করে বসলো। প্রায় একটা লড়াই-এর আবহাওয়া। করাচি'তে তো ইংরেজ সরকার এবং বিদ্রোহী নৌ-বিভাগের সেনানীদের মধ্যে খণ্ড যুদ্ধও হয়ে গেছে। উভয়পক্ষই বন্দুক আর কামান ব্যবহার করেছে। এই খবর পেয়ে দেখতে দেখতে বোম্বাই-এর নানা জায়গায় জনতা ক্ষেপে ওঠে। সমস্ত গাড়ি-ঘোড়া বন্ধ হয়ে যায়, সহরবাসীরা হরতাল করে, মিলের শ্রমিক এবং রেলের কর্মচারীরা কাজ বন্ধ করে দেয়। লুঠপাট এবং গাড়ি-পোড়ানোও স্থরু হয়। যথারীতি পুলিশ এবং মিলিটারি গুলি চালায় এবং বহু লোক আহত ও নিহত হয়। নৌ-বিভাগের বিদ্রোহী সৈন্যরা অবশ্য আত্মসমর্পণ করেছে। তাদের কী ধরণের বিচার হয় জানবার জন্যে সমস্ত দেশবাসী উৎকণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

অলক গুপ্ত

ক'লকাতার মাঠে ক্রিকেট শেষ হয়ে হকি পড়েছে। লীগ খেলা চলছে, কিন্তু এখনও তেমন জমেনি। এখন পর্য্যন্ত কোন দলই খুব ভাল খেলা দেখতে পারছেনা। মহামেডান স্পোর্টিং ও মোহবাগান গেল বছর চ্যাম্পিয়ান ও রানার্স-আপ হয়েছিল, তাদের খেলাও এবারে অনেক নেমে গেছে। সত্যি বলতে গত কয়েক বছর হল ক'লকাতার হকির স্ট্যাণ্ডার্ড ক্রমশঃ নীচের দিকে নামছে, যারা পুরোনো কাষ্টম্স্ অথবা রেঞ্জার্স দলের খেলা দেখেছে তারাই একথা স্বীকার করবে। বছর বারো তের আগে বেটন্ কাপের ফাইনালে দুর্দ্ধর্ষ ঝাঁন্সি হীরোস্‌দের সঙ্গে ক'লকাতার কাষ্টম্স্ যে রকম লড়েছিল সে রকম খেলা আজ্‌কাল চোখে পড়ে না। শুধু ক'লকাতায় কেন, সমস্ত ভারতবর্ষেই হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড আগের তুলনায় এখন অনেক নিকৃষ্ট বলে মনে হয়। ১৯৩৬ সালে যে ভারতীয় হকি দল অনায়াসে পৃথিবীর সমস্ত দেশকে হারিয়ে অলিম্পিক জিতে এসেছিল তার তুল্য এগারো জন খেলোয়াড় আজকের ভারতবর্ষ থেকে বাছাই করা কঠিন। তখনকার বিখ্যাত খেলোয়াড়রা প্রায় সবাই একই সঙ্গে বুড়ো হয়ে পড়েছেন এবং তাঁদের জায়গা নিতে পারে এমন নতুন লোক খুব বেশী তৈরী হয়নি। ধ্যাঁনচাঁদের কথা ছেড়েই দিচ্ছি কারণ তাঁর মতো যাদুকর কালে ভদ্রে দেখা যায়। কিন্তু ধ্যাঁনচাঁদকে বাদ দিলেও মোটের উপর পুরোনো দিনের তুলনায় এখানকার হকি খেলা অনেক নিষ্প্রভ বোধ হয়।

অনেক বছর পরে এবারে ক'লকাতায় আন্তঃপ্রাদেশিক হকি খেলার আয়োজন করা হ'য়েছে। এই সব খেলা থেকে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের হকি খেলার স্ট্যাণ্ডার্ড সম্বন্ধে তোমরা একটা ধারণা করতে পারবে। আশাকরি এই প্রতিযোগীতায় অনেক নতুন ভালো খেলোয়াড়ের পরিচয় পাওয়া যাবে।

ক'লকাতার ক্রিকেট খেলা সাঙ্গ হ'লেও ক্রিকেটের খবর ও সেই সম্বন্ধে নানারকম জল্পনা-কল্পনা এখনও শেষ হয়নি। তোমরা বোধ হয় জানো এই এপ্রিল মাসে ভারতীয় ক্রিকেট টীম ইংলণ্ডে খেলতে যাচ্ছে। সবসুদ্ধ প্রায় তিরিশটি ম্যাচ্ খেলতে হবে। তার মধ্যে তিনটি হলো টেস্ট। ষোলজন খেলোয়াড়কে ইংলণ্ডে যাবার জন্য বাছাই করা হয়েছে। তাঁরা পাতৌদির নবাব (ক্যাপ্টেন্), বিজয় মার্চেণ্ট্, অমরনাথ, মুস্তাক আলী, সি এস্ নাইডু, ভি এস্ হাজারী, ভিনু মানকড়, ডি ডি হিণ্ডেলকার, এস্ ব্যানার্জি, আর এস্ মোদী, সি টি সারভাতে, আবদুল হাফিজ, আর বি নিম্বলকার অথবা জে কে ইরানী, সোহনী অথবা ডি জি ফাদকার, গুলমহম্মদ এবং এস জি সিন্ধে। মোটের উপর বেশ জোরালো করেই টীম তৈরী হ'য়েছে, যদিও দু চারটে ছোটো খাটো আপত্তি মনে আসে। এ বছরে ফর্ম বিচার করলে বোলার হিসেবে সোহনীর জায়গায় ফাদকারের আসা উচিত ছিল, গুল মহম্মদের বদলে অধিকারী অথবা ইব্রাহিম হ'লে ব্যাটিং-এর জোর হয়তো আরো একটু বাড়তো। আমীর ইলাহীকে একেবারে বাদ দেওয়াটাও বোধ হয় যুক্তিযুক্ত হয়নি। যাই হোক, এ পর্য্যন্ত এদেশে থেকে যে সব দল ক্রিকেট খেলতে ইংলণ্ডে গিয়েছে তাদের সবার চেয়ে এই টীম যে সবদিক দিয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ১৯৩৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দল ইংলণ্ডে যে দুর্ণাম কিনেছিল এবারে তা সম্পূর্ণ ঘোচাতে পারবে এ বিশ্বাস সবারই আছে। একসঙ্গে মার্চেণ্ট, মানকড়, মুস্তাক, অমরনাথ, হাজারী, মোদী ও হাফিজের মতো এতগুলো প্রথম শ্রেণীর ব্যাটস্‌ম্যান্ আজকাল ইংলণ্ডেরও আছে কিনা সন্দেহ। এঁদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই অজস্র রান্ আশা করা যায়।

একটা মুস্কিল এই যে সব ম্যাচই মাত্র তিনদিন করে খেলা হবে, এমন কি টেস্টম্যাচ সুদ্ধ। কেবল যদি প্রথম দুটো টেস্ট্ ড্র হয় তবে তৃতীয় টেস্টম্যাচটী চারদিনের হ'লেও হ'তে পারে। তিনদিনের খেলায় হার-জিৎ একটা কিছু হওয়া শক্ত। ভারতীয় ব্যটস্‌ম্যানদের তিনদিনে দুবার করে আউট করা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ঠিক তেমনি ইংলণ্ডকে এই সময়ের মধ্যে দুবার নামিয়ে দেওয়া আমাদের বোলারদের পক্ষে খুবই কঠিন। এ কাজ সম্ভব হতে পারতো একমাত্র অমরসিং অথবা নিসারকে দিয়ে। কিন্তু অমরসিং মৃত আর নিসার খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। সত্যি বলতে আমাদের একজন ভালো ফাষ্ট ও মিডিয়াম-ফাষ্ট বোলারের নিতান্ত অভাব। স্পিন-বোলিং-এ অবশ্য আমরা ইংলণ্ড বা অষ্ট্রেলিয়া যে কোনো দেশের সমকক্ষ। সি এস্ নাইডু এবং মানকড়ের উপর যথেষ্ট ভরসা রাখা চলে। কিন্তু বহুবার দেখা গেছে যে অন্য জাতের ভালো বোলারের সহযোগীতা ছাড়া স্পিনারদের হাত তেমন খোলে না। সুতরাং একা নাইডু বা মানকড় আর কতদূর কী করবেন। অনেকের মতে ইংলণ্ডের ভারী আবহাওয়া অমরনাথ এবং হাজারী যে ধরণের বল দিয়ে থাকেন তার পক্ষে খুবই অনুকূল। সত্যিই যদি বিলিতি জলহাওয়ায় হাজারী বা অমরনাথের বোলিং-এর হাত খুলে যায় তবে আশার কথা।

ভারতীয় দলের ক্যাপ্টেন করা হয়েছে পাতৌদির নবাবকে। এই নিয়ে বিস্তর মনকষাকষি হয়ে গিয়েছে। পাতৌদি এককালে বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু সে অনেককাল আগে। তারপর দশবছর তিনি ব্যাট ধরেন নি। আমাদের ক্রিকেট মহলের যাঁরা হর্ত্তাকর্ত্তা, তাঁদের রাজাউজীর প্রীতিটা একটু উগ্ররকমের। দেখা যাক বিলেতের মাটিতে পাতৌদি তাঁর পুরোনো ফর্ম ফিরে পান কিনা।

"পেট কামড়াবে, গাধা !"

যশোধন ভট্টাচার্য (১২০৯)

(রবীন্দ্রনাথের অনুশরণে)

আমি তো করিনি কিছু।
ঘরের বাহিরে খাইতেছিলাম
গণ্ডা দশেক লিচু।
তখনো সকলে ঘুমেতে কাবু যে
নাসিকা ডাকিছে জোর,
তখনো গরম বাতাস বহিছে
বন্ধ জানালা দোর।

জ্যৈষ্ঠ মাসের গরম ধুলোয়
দম শেষ হতে চায়,
আমি একাকী যে ঘরের বাহিরে
বসিয়া অশথ ছায়—
খোসা ছাড়াইয়া লালচে লিচুর
চেখে দেখিতেছি স্বাদ,
এমন সময় ন'কাকা জাগিয়া
সাধিয়া দিল যে বাদ ॥

আমি তো বলিনি কথা।
খাবার তরে সে চুপে চুপে গেল
লিচুগুলি ছিল যথা।
তারপরে কাকা খুঁজিয়া বেড়াল
ভাঁড়ারের আশেপাশে,
লিচুর ঝুড়িটি হাঁ হাঁ করিতেছে
মাছি খালি উড়ে আসে।

ভাঁড়ারের দোর খোলা দেখিয়াই
কাকা হাঁকাহাকি করে,
ঘুম ভেঙে গেল ঘরেতে বাবার
কাকার বিকট স্বরে।
কিছু পরে বাবা ঘুম চোখে দেখে
ঝুড়িতে নাইক' কিছু,
বিস্ময় বাড়ে কেবা খেয়ে গেছে
গণ্ডা দশেক লিচু ॥
আমি তো যাইনি কাছে।
বাবা ও নকাকা কাছে এসে দেখে
শুধু খোসা পড়ে আছে।
কানটি ধরিয়া বাবা তক্ষুনি
চড় কসে মেরে দিল,
পিঠেতে আমার আবার পড়িল
ডজনখানেক কিলও।
মার খেয়ে তবে মুখেতে আমার
বেরোল তখন বুলি,
ঘুমের ঘোরেতে ভুল করে আমি
খাইয়াছি লিচুগুলি।
নকাকা কহিল, "ক্ষমা করো ওকে
আর মেরো নাকো দাদা,"
ছেড়ে দিয়ে বাবা শাপ দিল মোরে,
"পেট কামড়াবে, গাধা ॥"

চা'র ছড়া

মনোরঞ্জন রায় (৯২)

আয় না ভাই
চায়না যাই !
চায়নার ভালো চা
কোথাও তা' মিলে না,
এক কাপ খে'য়ে তাই
গান গা'বো ছুয়ো ভাই,—
তা, না, না, না,
না, না, না,
হো, হো, হো, হো,

হা, হা, হা !
চায়নার চা,
চায়নার চা,
টগ্‌বগ্, টগ্‌বগ্,
গরম গরম তা
হা, হা, হা,
এক কাপ, এক কাপ
ধূমায়িত,
বা, বা, বা !!

কবিতার খাতা

হিরণ্ময় ঘোষ দস্তিদার (১৯৪১)

একখানি কবিতার খাতা,
তখনিতো মন ধায়···

লাল্ পুরু ঝুরঝুরে পাতা,
পড়ে তাই বুড়ো পিসিমাতা,

দূরগাঁয়ে সন্ধ্যায়
একখানি কবিতার খাতা।

রংমশালের ছোট্ট বন্ধুরা,

কি যেন বলছিলুম গত মাসে ? আমরা আসলে খুব হ্যাংলা কি না—এই কথা ত ? এমনিতে মনে হতে পারে যে শরীরের কাজের জন্যে ঠিক যত ক্যালোরী শক্তি দরকার আমরা খাবার খাই তার চেয়ে ঢের বেশী ক্যালোরী শক্তি দেবার মত। অতএব মানুষ যে হ্যাংলার জাত তাতে

আর সন্দেহ কি ? কিন্তু আসলে আর একটা কথাও আছে—ভেবে দেখবার কথা। খাবার দাবার শরীরে কাজ করবার জন্যে যে শক্তি জোগায় তারই মাপ হল ক্যালোরীর হিসেব ; কিন্তু শরীরে কাজের শক্তি ছাড়াও আরও সব নানান রকম দরকার আছে। এসবের মধ্যে প্রধান দরকার হল শরীরকে টেঁকিয়ে রাখা : এঞ্জিনকে শুধু ছোটালেই হয় না, রীতিমত তেলটেল ঢেলে তাকে চাঙ্গা রাখতে হয়। শরীরের বেলাতেও তাই। একে টিঁকিয়ে রাখতে হলে, চাঙ্গা রাখতে হলে—আগেই বলেছি — মোটামুটি তিনরকম জিনিষের দরকার : চর্বি, কার্বোহাইড্রেড্ আর প্রোটিন। তাহলে খাবার দাবার থেকে খাটবার শক্তি ছাড়াও এ তিনটে জিনিষ সংগ্রহ না করলেই নয় ; তাই ঠিক কতটুকু ক্যালোরী হলেই কাজ চলবে সে হিসেব করে খাবার ফর্দ ফাঁদলে চলবে না। শরীর টেঁকিয়ে রাখবার জন্যে চর্বি, কার্বোহাইড্রেড্ আর প্রোটিন এ তিনটে জিনিষেরই বিশেষ দরকার। তাই যে ছেলে শুধু হাউমাউ করে খাবলা-খাবলা চিনি আর লজেঞ্চুস খায় তার শরীর বেশীদিন টেঁকে না কারণ এর মধ্যে আছে শুধু কার্বোহাইড্রেড্। তাই পৃথিবীর মধ্যে সেরা খাবার হিসেবে প্রথম পুরস্কারের বিজয়মালা যদি কারুর গলায় পরাতে হয় তা হলে সে মালা দিতে হবে দুধের গলায় ; কেননা দুধের মধ্যে প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেড্ আর চর্বি তিনটেই আছে আর বেশ ভালো পরিমাণেই আছে। শুধু তাই নয়, দুধের মধ্যে আর একটা ভারি ভালো জিনিষ আছে—সেটা হল চুণ বা ক্যালসিয়াম! এই ক্যালসিয়াম সেবন করলে হাড়গোড় মজবুত হয়—গাছ থেকে পড়লে ঠাং ভাঙ্গতে চায় না, কথায় কথায় দাঁত কনকন করে না। আহা দুধ বড় ভালো জিনিষ।

লজেঞ্চুসের নিন্দে করে দুধের গুণ গাইছি দেখে হয়ত মনে মনে ভাবছ : সেরেছে। সম্পাদকমশাইটাও একেবারে গুরুজনদের দলে ভিড়েছে। তাই ভয়ে ভয়েই কবুল করছি যে শুধু মিষ্টি খাওয়া খারাপ হলেও মিষ্টি জিনিষটে শুধুই খারাপ নয়। এরও অনেক গুণ আছে। মিষ্টি হল বেবাক কার্বোহাইড্রেড্ আর কার্বোহাইড্রেড্ না হলে শরীর অচল। শুধু তাই নয়, মিষ্টির মধ্যে এই যে কার্বোহাইড্রেড্, এর একটা মস্ত গুণ হচ্ছে শরীরের মধ্যে চটপট তা মিশে যেতে পারে, তাই, খুব খেটে ক্লান্ত হয়ে পড়লে চটপট যদি চাঙ্গা হতে চাও ত একটু মিষ্টিমুখ করে নিও। তাই জন্যেই পল্টনদের প্রায়ই মিষ্টিমুখ করবার বন্দোবস্ত রয়েছে—খুব খাটুনির পর তারা চিনির ঢেলা, চকোলেট বা লজেন্স উপহার পায়।

যাক্, বেশী তর্ক করে লাভ নেই। আসলে চিনিও ভালো, দুধও ভালো (যদিও, চিনির চেয়ে দুধই ভালো)। বছর শেষ হয়ে আসছে, খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে বাকি জরুরী কথাগুলো শেষ করে ফেলা যাক।

হালে, পণ্ডিতেরা ঠিক করেছেন খাওয়াদাওয়া সম্বন্ধে আসল কথা হল ভিটামিনের কথা। 'ভিটামিন', 'ভিটামিন' —শুনতে শুনতে ত' কান ঝালাপালা হয়ে যাবার জোগাড়। "পা ফুলেছে ? বেরিবেরি। ভিটামিন খাও।" "টাক পড়ছে ? চুল উঠছে ? ভিটামিনের অভাব ?" "গায়ে চুলকুনি হয়েছে ? ঘ্যাস ঘ্যাস করে গা চুলকে কি হবে ? বরং কিছু কাঁচা ঘাসপাতা খাও, দেদার ভিটামিন তাতে—চুলকুনি উঠে গিয়ে চামড়া মোলায়েম হয়ে যাবে।"—এমনি কত কথা। শুনতে শুনতে ত কান ঝালাপালা হয়ে গেল। কিন্তু ব্যাপারটা কি ? এত ঝামেলা কিসের ? এ আবার কোন ধরণের খাবার ?

প্রশ্নটা কিন্তু বেজায় কড়া হয়ে গেল। কেনন, ভিটামিন আসলে একরকম খাবার জিনিষ হলেও ঠিক খাবার জিনিষ তাকে বলা যায় না।—সেই ট্যাস গুরু গুরু নয় গোছের অবস্থা! সত্যি কথা বলতে কি, ভিটামিন হল খাবারের চাবিকাঠি।

কথাটা খুলেই বলছি। এক সিন্ধুক টাকা দিয়ে যদি তোমায় আদর করে বলি—"বাছা, সিন্ধুকটি তোমার, কেবল চাবিকাঠিটি আমার"—তা হলে নিশ্চয়ই মনটা প্রফুল্ল হবার কোন কারণ নেই। খাবারের বেলাতেও ঠিক

তাই। এক পেট খাবার খেয়ে শরীর আইঢাই করতে লাগলো অথচ খাবারগুলো আসলে রইলো চাবি বন্ধ—শরীরের কাজে একটুও লাগলো না—তাহলে আর লাভ কি হল ? অনেকগুলো খাবার সত্যিই শরীরে ঢোকে প্রায় চাবিবন্ধ অবস্থাতেই, আর তাদের চাবিকাঠি হল ভিটামিন। পেল্লায়-রকম বড় একটা সিন্ধুককে একটা ছোট চাবি কাঠি খুটুস করে খুলে ফেলতে পারে। খাবারের বেলাতেও ঠিক তাই। ভিটামিন জিনিষটেও অতি সূক্ষ্ম, কয়েকরকম খাবারের সঙ্গে শরীরে ঢোকে আর ঢুকে নানান রকম খাবারের ঢাকনি খুলে দেয় তখন খাবারের ভেতরকার আসল যে সব মালমশলা সেগুলো শরীরের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে আর নানান রকম কাজে লেগে যায়। আবার, হরেক রকম সিন্ধুকের হরেক রকম চাবি হয়। খাবারের বেলাতেও ঠিক তাই, ভিটামিন এক রকমের নয়, হরেক রকমের। পণ্ডিতেরা ভেবেচিন্তে এই সব নানান রকমের ভিটামিনের নানান রকম নাম দিয়েছেন। নামগুলো কিন্তু ভারি ন্যাড়া ন্যাড়া—কারুর নাম শুধু A, কারুর নাম শুধু B, কারুর নাম স্রেফ্ C, কাউকে বা ডাকা হয় D বলে।

ভিটামিন সম্বন্ধে প্রথম কি ভাবে খবর পাওয়া গেল তাই বলছি। ক্যাপ্টেন কুক আর স্যর হাউকিন বলে সেকালে দুজন ডাকসাইটে নাবিক ছিলেন, সুদূর সমুদ্রে পাড়ি জমাতে অমন ওস্তাদ তখন আর কেউ ছিলো না। দুজনেই দেখতেন দিনকতক সমুদ্রযাত্রার পর, প্রায়ই খালাসিদের গায়ে একরকম বিধঘুটে চুলকুনি সুরু হয়। এ ত ভারি বিপদের কথা! উপায় কি ? তাঁরা আন্দাজে ঢিল মেরে একটা উপায় বের করলেন তা কিন্তু একেবারে খাসা : দিনকতক লেবুর রস খাইয়ে দিলেই দেখা গেল খালাসিদের চুলকুনি বেবাক সেরে গিয়েছে! রোগটা হয়ই বা কেন আর লেবু খেলে হঠাৎ সেরেই বা যায় কেমন করে ?—এ প্রশ্নের জবাব বের করলেন বৈজ্ঞানিকেরা। তখনকার দিনে খালাসিদের খেতে দেওয়া হত বাক্স করা নুন মাখানো শুকনো মাংস আর বিস্কুট। তাতে ভিটামিনের ভ-ও থাকে না। আর ভিটামিনের অভাবেই ওই মারাত্মক চুলকুনি। নেবুর রসে প্রচুর ভিটামিন C—এই ভিটামিন C চামড়ার রোগ সারিয়ে দেয়।

তারপর আর একটা রোগের কথাও ধরা যাক : বেরিবেরি। রোগটা কেন হয় বলছি। ধানের খোসা ছাড়িয়ে চাল বের করা যায় দু-ভাবে : এক হল ঢেঁকি পিটে আর এক হল কল চালিয়ে। আজকাল কলে ছাঁটা চালেরই রেওয়াজ বেশী। ধানের খোসার ঠিক নীচে ভিটামিন B বলে এক রকম ভিটামিনের আর একটা পাৎলা খোসামতন থাকে। কলে ধান ছাঁটতে গেলে, ধানের খোসার সঙ্গে এই ভিটামিন-টুকুও ছাঁটাই হয়ে যায়। আর ভিটামিন B পেটে না পড়লে বেরিবেরি হবার ভয়। তাই, একবার সহরে বেরিবেরি সুরু হলে ডাক্তারের দল হল্লা সুরু করে : "ঢেঁকি ছাঁটা চাল খাও,…ঢেঁকি ছাঁটা চাল খাও।"—ঢেঁকি ছাঁটা চাল কলে ছাঁটা চালের মতন অমন চাঁচাছোলা নয় ; তার থেকে ভিটামিন B উড়ে যায় না।

তাহলেই বুঝছ ত — শুধু খাবার খেলেই চলে না, খাবারের সঙ্গে কিছু ভিটামিনও খেতে হয়। কথাটার ভালো প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে অধ্যাপক হপকিন বলে একজন ভদ্দরলোকের একটা মজার পরীক্ষা থেকে। ভদ্দরলোক ভাবলেন : দেখাই যাক না, ভিটামিন বাদ দিয়ে শুধু প্রোটিন কার্বোহাইড্রেড্ আর চর্বি খেয়ে বেঁচে থাকা যায় কিনা। কিন্তু মানুষ নিয়ে ত আর পরীক্ষা করা যায় না। হপকিন তাই এক খাঁচা ইঁদুর ধরে পরীক্ষা করতে সুরু করলেন। সে গুলোকে পেটপুরে খাওয়ালেন শুধু কার্বোহাইড্রেড্ আর চর্বি জাতীয় জিনিষ ; কিন্তু কড়া পাহারা সর্বদা মোতায়েন রইলো যাতে কোনো ভিটামিনের ছিটেফোঁটাও না পড়ে। দেখা গেল, অত ভুরি ভোজ হলে হয় কি ইঁদুর গুলো চীমড়ে রোগা হয়ে পটল তুলতে লাগলো। তারপর হপকিন করলেন কি, আর এক খাঁচা ইঁদুর ধরে তাদের খাওয়ালেন ঠিক একই খাবার কেবল এই খাবারের সঙ্গে দু-এক ফোঁটা দুধ দেওয়া হল। দেখা গেল গণেশের

বাহনগুলি দিব্যি নেচে কুঁদে দিন কাটাচ্ছে এবং প্রায় গণেশের মতই গতর হচ্ছে তাদের! হবে নাই বা কেন? দুধের মধ্যে যে ভিটামিন প্রচুর রয়েছে!

হপকিনের পরীক্ষা দেখে পণ্ডিতের দল মহা ফুর্ত্তিতে লাফিয়ে উঠলেন, এবং আরও সব নানান রকম পরীক্ষা সুরু হল। দেখা গেল, আগে যে সব অসুখের কারণ আবিষ্কার করতে গিয়ে মোটা মোটা ডাক্তারের দলও গলদঘর্ম্ম হয়ে হার মেনেছে তার মধ্যে অনেক অসুখই ভিটামিনের অভাব থেকে হয়। মাথায় টাক, চোখ খারাপ, শরীরে বাড় নেই, দাঁতের ব্যাথায় চিল্লাচিল্লি করা—এ সবের কারণ প্রায়ই কোনো না কোনো ভিটামিনের অভাব। আরও দেখা গেল, ভিটামিন শুধু যে খাবারের সঙ্গে শরীরের মধ্যে ঢোকে তারও মানে নেই অন্য ভাবেও শরীর ভিটামিন পেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে বেশ একটু রোদ পোয়ালে পর শরীরের চামড়ার ঠিক নীচের একটা জিনিষ ভিটামিন D-তে পরিণত হয়। তাই জানোই ত' রোদ পোয়ানো অত ভালো। ভিটামিন সবচেয়ে বেশী পাওয়া যায় তাজা ফল বা কাঁচা সব্জীর মধ্যে।

নানান রকমের ভিটামিনের নানান রকম স্বভাব। ভিটামিন B কে জলে বেশী সেদ্ধ করলে গলে যায়—তাই ঢেঁকি ছাঁটা চালকেও যদি বেশী ফুটিয়ে তার ফ্যান গেলে ফেলে দেওয়া হয় তা হলে ফ্যানের সঙ্গে গলা ভিটামিন বেরিয়ে যায়। এই জন্যেই ত' ফ্যান-ভাত খাওয়া ভালো; আর তা যদি মুখে না রোচে ত' খিচুড়ীই বা মন্দ কি? আবার, ভিটামিন A বা D-কে যদি তেল বা ঘি দিয়ে বেধড়ক ভাজা যায় তা হলে সেগুলোও গলে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কিন্তু ভিটামিন C বড় শৌখীন লোক। একটু আধটু রান্না বান্না করে নিতে গেলেই এই ভিটামিন নষ্ট হয়ে যাবার ভয়।

জানই ত, বৈজ্ঞানিকের দল বড় কড়া লোক। কোন খাবারে কতটুকু ভিটামিন শুধু তাই আবিষ্কার করে তাঁরা সন্তুষ্ট নন—কেমন করে খাবার-দাবার থেকে ভিটামিনটুকু বের করে শুধু ভিটামিনের বড়ি পাকাতে হয় ওঁরা তাও বের করেছেন। তাই, বেগতিক দেখলেই ডাক্তারবাবু বলেন ওষুধের দোকান থেকে অমুক ভিটামিনের গুলি কিনে এনে খেয়ে ফেলো।

অবশ্য এ কথা ঠিক, এত সব ঝামেলার কথা আমাদের পূর্বপুরুষরা মোটেই জানতেন না। আর জানতেন না বলেই যে তাঁদের শরীর আমাদের চেয়ে খারাপ ছিলো তারও প্রমাণ নেই। কিন্তু তেমনি, আর একটা কথাও মনে রাখতে হবে—তাঁদের সময় কলে-ছাঁটা চালও ছিলো না, টিনে-বন্ধ মাংসও বাজারে মিলতো না। তাঁরা খেতেন তাজা খাবার, আর সেই খাবারের সঙ্গে শরীরে যেতো নানান রকম ভিটামিন। তাই ভিটামিনের খবর না জানলেও ভিটামিনের অভাব তাঁদের মোটেই হত না।

এই ত গেল ভিটামিনের কথা। ভিটামিন জিনিষটে যদি খেতে মিষ্টি হত তা হলে হাসি মুখে বলতে পারতুম মধুরেণ সমাপয়েৎ করেছি। কিন্তু ভিটামিন খেতে কেমন তা সত্যিই আমি জানি নে। সে যাই হোক; বছর শেষ হতে চলল। আপাতত আমরা বড় ব্যস্ত রান্নাবান্নার কাজে—কেননা আসছে বছর তোমাদের সবাইকার জন্যে আমরা ভুরি ভোজের বিরাট আয়োজন করেছি। তবে, দুঃখের কথা, খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে এত বক্তৃতা করেও নিজে যখন রাঁধতে বসলুম তখন তাতে না দিতে পারলুম চুণ-লোহা-গ্যাস, না দিতে পারলুম প্রোটিন-কার্বোহাইড্রেড-চর্বি—এমন কি ভিটামিনের ছিটে ফোঁটাও নয়! আর দেবই বা কেমন করে?—এ ত আর পেট-পুরে খাবার জিনিষ রাঁধছি নে, মন ভরে পড়বার জিনিষ বানাচ্ছি। লেখার ভুরি-ভোজ। নানান রকমের ভালো ভালো পাকা রাঁধুনি কোমর বেঁধে আমাদের সঙ্গে লেগে পড়েছেন, বাংলা সাহিত্যে যাঁদের রুচি আছে তাঁরা সবাই এই সব ডাকসাইটে রাঁধুনির নাম শুনলে লাফিয়ে ওঠেন। আর, যেটা সবচেয়ে বড়

সুখবর,—এই বিরাট যগ্‌গি বাড়ীর রান্নার জন্যে পয়লা তারিখে তোমাদের হাতে রংমশাল ঠিক চমৎকার উনুন জোগাড় করা গিয়েছে। রংমশালের নিজের ছাপাখানা হয়েছে। রান্না তৈরি করে পরিবেশন করতে আর দেরি হবে না—মাসের পৌঁছুবে।

ইতি তোমাদের
সম্পাদক মশাই

এক আজব রাজ্যের এক আজব রাজার হঠাৎ খেয়াল বতিল হোলো তাঁর রাজ্য থেকে '৩' এই সংখ্যাটিকে একেবারে বাতিল করে দেবেন। রাজাদের কেন যে কী খেয়াল হয় সে-কথা তুমি আমি কী করে বলবো? কিন্তু রাজার যখন খেয়াল তখন সেটা মানতে হবেই! কিছু দিন বাদেই কিন্তু রাজার ঘুম একেবারে শিকেয় উঠলো। তিনি পড়লেন মহাফাঁপরে। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি বললেন, "৩-কে তো বাতিল করেছি। তা হলে দেখো ২-এর পর আসে ৪, ২৯এর পর আসে ৪০—কিন্তু ৩৩-এর পর কী আসে? আমি পারছি না, তুমি হিসেব করে বলো। না পারলে গর্দান নোবো।"

মন্ত্রীমশাই নাকের ডগায় চশমা টেনে, মস্ত বড়-বড় পুঁথি পেড়ে, টাক চুলকে একেবারে সারা হলেন। কিছুতেই তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না ৩৩-এর পর কোন সংখ্যাটি আসবে। বেচারা বুড়ো মন্ত্রীমশাইকে তোমরা কি কেউ বাঁচাতে পারো?

ধাঁধাঁর উত্তর

সেই চালাক লোকটি বলেছিলো, "আমার মৃত্যু হবে আগুনে পুড়ে।" এখন এই কথাটি সত্যি হলে চালাক লোকটিকে মারতে হয় বিষ-মাখানো তীর বিঁধে। কিন্তু বিষ-মাখানো তীরে বিঁধে শেষ পর্যন্ত যদি লোকটির মৃত্যু হয় তা হলে দেখা যাচ্ছে লোকটি যে বলেছিলো তার মৃত্যু হবে আগুনে পুড়ে সে-কথাটা মিথ্যে। আর মিথ্যে কথার শাস্তি হচ্ছে আগুনে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে তাকে মারা হলে দেখা যাচ্ছে লোকটি সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু জংলীদের আইন অনুসারে সত্য কথা বলার শাস্তি হচ্ছে বিষ-মাখানো তীর বিঁধে মারা!

ফলে চালাক লোকটিকে জংলীরা মারতেই পারলো না।

উত্তরদাতাদের নাম

বিভাতী নারায়ণ (২৫৪৭), প্রতীপেন্দ্রনাথ ভোস (২৫৩০)

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

জোর খবর
জোর খবর
জোর খবর

"রংমশালে"র নিজের ছাপাখানা হয়েছে। বৈশাখ ১৩৫৩ থেকে কাগজ সেখানেই ছাপা হবে। তাই, এবার থেকে আর কাগজ বেরুতে দেরি হবে না।

জোর খবর
জোর খবর
জোর খবর

সুখবর,—এই বিরাট যগ্‌গি বাড়ীর রান্নার জন্যে পয়লা তারিখে তোমাদের হাতে রংমশাল ঠিক চমৎকার উনুন জোগাড় করা গিয়েছে। রংমশালের নিজের ছাপাখানা হয়েছে। রান্না তৈরি করে পরিবেশন করতে আর দেরি হবে না—মাসের পৌঁছুবে।

ইতি তোমাদের
সম্পাদক মশাই

ধাঁধার উত্তর

এক আজব রাজ্যের এক আজব রাজার হঠাৎ খেয়াল বতিল হোলো তাঁর রাজ্য থেকে '৩' এই সংখ্যাটিকে একেবারে বাতিল করে দেবেন। রাজাদের কেন যে কী খেয়াল হয় সে-কথা তুমি আমি কী করে বলবো? কিন্তু রাজার যখন খেয়াল তখন সেটা মানতে হবেই! কিছু দিন বাদেই কিন্তু রাজার ঘুম একেবারে শিকেয় উঠলো। তিনি পড়লেন মহাফাঁপরে। মন্ত্রীকে ডেকে তিনি বললেন, "৩-কে তো বাতিল করেছি। তা হলে দেখো ২-এর পর আসে ৪, ২৯এর পর আসে ৪০—কিন্তু ৩৩-এর পর কী আসে? আমি পারছি না, তুমি হিসেব করে বলো। না পারলে গর্দান নোবো।"

মন্ত্রীমশাই নাকের ডগায় চশমা টেনে, মস্ত বড়-বড় পুঁথি পেড়ে, টাক চুলকে একেবারে সারা হলেন। কিছুতেই তিনি আবিষ্কার করতে পারলেন না ৩৩-এর পর কোন সংখ্যাটি আসবে। বেচারা বুড়ো মন্ত্রীমশাইকে তোমরা কি কেউ বাঁচাতে পারো?

ধাঁধার উত্তর

সেই চালাক লোকটি বলেছিলো, "আমার মৃত্যু হবে আগুনে পুড়ে।" এখন এই কথাটি সত্যি হলে চালাক লোকটিকে মারতে হয় বিষ-মাখানো তীর বিঁধে। কিন্তু বিষ-মাখানো তীরে বিঁধে শেষ পর্যন্ত যদি লোকটির মৃত্যু হয় তা হলে দেখা যাচ্ছে লোকটি যে বলেছিলো তার মৃত্যু হবে আগুনে পুড়ে সে-কথাটা মিথ্যে। আর মিথ্যে কথার শাস্তি হচ্ছে আগুনে পুড়িয়ে মারা। কিন্তু আগুনে পুড়িয়ে তাকে মারা হলে দেখা যাচ্ছে লোকটি সত্যি কথাই বলেছে। কিন্তু জংলীদের আইন অনুসারে সত্য কথা বলার শাস্তি হচ্ছে বিষ-মাখানো তীর বিঁধে মারা!

ফলে চালাক লোকটিকে জংলীরা মারতেই পারলো না।

উত্তরদাতাদের নাম

বিভাতী নারায়ণ (২৫৪৭), প্রতীপেন্দ্রনাথ ভোস (২৫৩০)

Printed and Published by P. C. Ray at Sri Gouranga Press, 5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

জোর খবর
জোর খবর
জোর খবর

"রংমশালে"র নিজের ছাপাখানা হয়েছে। বৈশাখ ১৩৫৩ থেকে কাগজ সেখানেই ছাপা হবে। তাই, এবার থেকে আর কাগজ বেরুতে দেরি হবে না।

জোর খবর
জোর খবর
জোর খবর